ভারতবর্ষের ইতিহাস

কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ-লেভিন,
গ্রিগোরি কতোভ্‌স্কি

পরিবেষক

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৬০

মদন ভট্টাচার্য কর্তৃক পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও অশোক চৌধুরী কর্তৃক তরু প্রিণ্টিং, ১৭৪ রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সূচি

প্রাচীন ভারত

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যযুগীয় ভারত

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক ভারত

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

সাম্প্রতিক ইতিহাস

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

প্রাচীন ভারত

গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ-লেভিন

ভারত-সভ্যতার সূচনা

প্রস্তরযুগে ভারত

প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় খননক্ষেত্র

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাগুলির একটির উৎপত্তি ঘটে ভারতে। এখানেই গড়ে ওঠে অত্যন্ত উঁচুস্তরের উন্নত এক সংস্কৃতি যা এই দেশের পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে এবং সমগ্রভাবে গোটা প্রাচ্যের, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও দূর প্রাচ্যের বহু জাতির সংস্কৃতির অগ্রগতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, ইত্যাদির ফলে এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে মানবসমাজের একেবারে আদিতম কাল থেকেই ভারতে জনবসতি বর্তমান ছিল।

এ-দেশের বহু অঞ্চল থেকেই প্রত্নপ্রস্তরযুগের নিম্নতর ভূ-স্তরের আমলে তৈরি পাথরের হাতিয়ার, ইত্যাদি পাওয়া গেছে। পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে নিম্নতর প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির দুটি কেন্দ্র উদ্ভূত হয়েছিল একদা: উত্তরে সোন-নদীতীরবর্তী সংস্কৃতি (বর্তমান পাকিস্তানের সোন নদীর তীর-বরাবর) এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য-অঞ্চলে তথাকথিত মাদ্রাজি সংস্কৃতি। এই দুটি প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় কেন্দ্রই মনুষ্যবাসের পক্ষে অধিকতর অনুকূল নদী-উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। এদের মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৬৩ সালে মাদ্রাজ এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রটি। এ-কারণে দক্ষিণ ভারতে নিম্নতর প্রত্নপ্রস্তরযুগের বৈশিষ্ট্যসূচক কুঠার, ইত্যাদি যে-হাতিয়ার পাওয়া গেছে তাই-ই মাদ্রাজি কুঠার নামে পরিচিত হয়ে আসছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের নিম্নতর প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় খননক্ষেত্রগুলিতে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে, যেমন পাথরের নুড়ি কাটার বড়-বড় গুরুভার হাতিয়ার। এই হাতিয়ার ইংরেজি 'চপার' শব্দটি দিয়ে চিহ্নিত হয়ে আসছে। প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার ইত্যাদি দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও, যেমন মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও, অতঃপর আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে, সে-সমস্ত জায়গায় সোন ও মাদ্রাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেন পরস্পর খাপে-খাপে জোড়া লেগে মিলেমিশে গেছে। নতুন গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মাদ্রাজি কুঠারেরই প্রাধান্য বর্তমান, আর যত উত্তর দিকে এগোচ্ছি আমরা, সোন-অঞ্চলীয় হাতিয়ারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ততই।

হাতিয়ারের আকারপ্রকারে এই পার্থক্যের সবচেয়ে বড় কারণ অবশ্যই দুটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা এবং হাতিয়ার তৈরির উপযোগী পাথর পাওয়ার সম্ভাব্যতা। এই ধরনের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খননক্ষেত্র যে দাক্ষিণাত্যের নদী-উপত্যকাগুলিতে অবস্থিত গুহায় এবং উত্তর ভারতের পর্বতমালার পাদদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। উপরোক্ত এইসব অঞ্চলের আবহাওয়া যেমন অপেক্ষাকৃত বেশি অনুকূল তেমনই শিকারযোগ্য জীবজন্তুও এখানে অঢেল। আর ওই যুগের মানুষের প্রাণধারণের প্রধান উপায়ই ছিল পশুশিকার আর খাওয়ার উপযোগী গাছপালা, লতাপাতা সংগ্রহ। লোকে তখন বাস করত বড়-বড় দল বেঁধে। জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে ওই সময়কার অত্যন্ত কঠিন পরিবেশের বিচারে এটা অপরিহার্য ছিল।

মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর হল উচ্চতর ভূ-স্তরের প্রত্নপ্রস্তর যুগে তার উন্নয়ন। আজ যাদের আমরা 'হোমোস্যাপিআন্স' বা নৃগোষ্ঠী বলে জানি তাদের প্রথম উদ্ভব ঘটে এই যুগেই।

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই উচ্চতর প্রত্নপ্রস্তরযুগের বেশকিছু নিদর্শনক্ষেত্র খুঁড়ে বের করেছেন। দেখা গেছে যে ওই যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে মানবসমাজে বড় রকমের সব পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে উচ্চতর প্রত্নপ্রস্তর যুগে ভারতে প্রাধান্য ছিল নিগ্রো-গোত্রীয় জনগোষ্ঠীর, পরে মধ্যপ্রস্তর যুগে পশ্চিম ভারতে আবির্ভূত হয় ককেশীয় ও পূর্ব ভারতে মঙ্গোলীয় গোত্রের নৃগোষ্ঠী। গৃহে পশুপালন প্রথার চল শুরু হয় এই মধ্যপ্রস্তর যুগেই আর এ-যুগের অবসান সূচিত হয় মৃৎশিল্পের উদ্ভবের ও কৃষিকাজে ক্রমশ ব্যাপৃত হওয়ার মধ্যে দিয়ে।

মধ্য ও নবপ্রস্তরযুগ

ভারতে মধ্যপ্রস্তরযুগের সবচেয়ে সুপরিচিত নিদর্শনক্ষেত্র হল গুজরাটের লাঙ্ঘ্নাজ বসতি। এই বসতিতে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার-করা দ্রব্যসামগ্রী থেকে জানা গেছে মধ্যপ্রস্তর এবং নবপ্রস্তরযুগের প্রাথমিক পর্যায়ের আদিকালের মানুষ কেমনভাবে জীবনযাপন করত। এখানে খননকার্য চালাবার ফলে দেখা গেছে যে ওই সময়ে মানুষের ব্যবহৃত প্রধান হাতিয়ার ছিল পাথরের তৈরি অস্ত্রফলক এবং তীরের ফলা হিসেবে ব্যবহৃত নিয়মিত জ্যামিতিক আকারের ছোট-ছোট টুকরো পাথর।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা লাঙ্ঘ্নাজের ইতিহাসে দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়কে চিহ্নিত করেছেন। এর প্রথম পর্যায়টির শেষদিকে হাতে-গড়া মাটির বাসনের উদ্ভব ঘটে আর দ্বিতীয়

পর্যায়ে (নবপ্রস্তরযুগের গোড়ার দিকে) আবির্ভূত হয় কুমোরের চাকে-গড়া ও অলঙ্করণ-করা তৈজসপত্র। উপরোক্ত প্রথম পর্যায়ে পশুশিকার ও মাছধরা ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃষিকাজে ক্রমশ মনোনিবেশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

লাঙ্ঘ্‌নাজ এলাকায় পাওয়া গেছে হরিণ, কৃষ্ণসারমৃগ, গণ্ডার, বুনো শুয়োর ও ষাঁড়ের অস্থি।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও—যেমন দাক্ষিণাত্যে (তিনেভেল্লির কাছে) ও পূর্ব ভারতে (পশ্চিমবঙ্গের বীরভাবপুরে)—মধ্যপ্রস্তরযুগের বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এই সমস্ত নিদর্শনস্থল থেকেও পাওয়া গেছে নানা আকারের টুকরো-পাথরের হাতিয়ারের নমুনা। টুকরো-পাথরে শান দিয়ে অস্ত্র বানানোর এই কৃৎকৌশল এর পরবর্তী যুগে মানুষ যখন ধাতু দিয়ে হাতিয়ার বানানোর কৌশল আয়ত্ত করেছে তখনও প্রচলিত ছিল।

এমন কি সেই সুদূর মধ্যপ্রস্তর যুগ থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটে চলেছিল অসমান গতিতে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের সূচনায় দক্ষিণ ভারতের মধ্যপ্রস্তরযুগীয় বসতিগুলির অধিবাসীরা যখন নিয়োজিত ছিল পশুশিকারে আর মাছধরায়, তখনই উত্তরে সিন্ধুদেশে স্থায়ী কৃষিভিত্তিক কমিউনগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে চলেছিল দ্রুতগতিতে। মানবসমাজের এই একই ধরনের অসমান বিকাশ লক্ষ্য করা যায় এর পরবর্তী নবপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগগুলিতেও।

নবপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজ ও পশুপালন আরও উন্নত হয়ে ওঠে এবং মানুষ ক্রমশ যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বসবাস গড়ার দিকে ঝোঁকে। এই ধরনের সবচেয়ে উন্নত নবপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির সাক্ষাৎ মেলে বেলুচিস্তানে ও সিন্ধুদেশে, মনে হয় যেন এগুলি সিন্ধু-উপত্যকার আসন্ন নগর-সভ্যতারই উদ্ভবের ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

কিলি গুল মহম্মদে (বর্তমান পাকিস্তান ভূভাগের অংশভুক্ত কোয়েটা উপত্যকায়) খননকার্যের ফলাফল অনুসারে বলতে হয়, এমন কি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের গোড়ার দিকেই উত্তর বেলুচিস্তানে পশুপালন ও দানাফসল চাষের কাজে ব্যাপৃত নবপ্রস্তরযুগীয় উপজাতিসমূহের অস্তিত্ব ছিল। এই সমস্ত উপজাতির মানুষেরা ঘর বানাত রোদে-পোড়ানো ইট দিয়ে, জীবজন্তুকেও (ভেড়া ও ছাগল) পোষ মানিয়েছিল তারা। ধাতুর ব্যবহার অবশ্য তখনও অজ্ঞাত ছিল, এখানকার অধিবাসীরা হাতিয়ার বানাত প্রধানত পাথর দিয়ে, তবে তার সঙ্গে মিশেল দিত দামি জ্যাস্‌পার ও ক্যাল্‌সেডানি মণির টুকরো আর চকমকি পাথর। পরবর্তী যুগে এখানে মৃৎপাত্রের উদ্ভব ঘটে এবং পরিশেষে ধাতু ব্যবহারেরও প্রথম লক্ষণ দেখা যায়। এখানে খননকার্যের সময় স্থানীয় গৃহপালিত পশুদের যে-হাড় পাওয়া যায় তা থেকে এমন

একটা মতের সপক্ষে যুক্তির যোগান মেলে যে বেলুচিস্তানে যে-সংস্কৃতি তৎকালে বর্তমান ছিল তার উৎপত্তি হয়েছিল স্থানীয়ভাবে। এখানকার মতো এই একই ধরনের সংস্কৃতির কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে পূর্ব বেলুচিস্তানের রানা ঘুণ্ডাইতেও। ইরানের নবপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই শেষোক্ত সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট নানা ধরনের মিল চোখে পড়ে।

কিলি গুল মহম্মদের অদূরবর্তী ডাম্ব সাদাতে খননকার্য চালানোর ফলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে নবপ্রস্তর ও গোড়ার দিককার তাম্রপ্রস্তরযুগের সুনির্দিষ্ট স্তরবিভক্ত পরিচয়। তেজস্ক্রিয় কার্বন-আইসোটোপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন স্তরটি খ্রীস্টপূর্ব সাতাশ কিংবা ছাব্বিশ শতকে উদ্ভূত হয়েছিল। এর পরবর্তী কালপর্বের (খ্রীস্টপূর্ব ছাব্বিশ থেকে তেইশ শতকের মধ্যেকার) স্তরটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে ওই স্তরে পাওয়া পোড়ামাটির ছোট-ছোট মূর্তি' বার্নিশ-করা মৃৎপাত্র আর তামার তৈরি নানারকম দ্রব্যসামগ্রীর দৌলতে।

ইতিমধ্যে ভারতের উত্তরাঞ্চলে কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে উদ্ধার-করা বুর্জাহোম বসতিতে অপেক্ষাকৃত আদিম ধরনের কিছু-কিছু নবপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে আবিষ্কার করা হয়েছে কাদামাটির মধ্যে গর্ত-খুঁড়ে-বানানো প্রাচীন বাসস্থানের নমুনা। এই সমস্ত গর্তের মুখে-বানানো কিছু-কিছু চুল্লিও পাওয়া গেছে আর পাওয়া গেছে হাতে-গড়া, জ্যাবড়া-জোবড়া কিছু মৃৎপাত্রও। এছাড়া পাওয়া গেছে প্রচুরসংখ্যায় হাড়ের তৈরি মাছধরার ছোট বর্শা, কোঁচ, ছুঁচ, ইত্যাদিও। বোঝা গেছে যে এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল মাছধরা। এখানে জমির চাষবাসের কাজে উত্তরণ ঘটেছে আরও কয়েক শতাব্দী পরে, খ্রীষ্টপূর্ব উনিশ থেকে সতেরো শতকের মধ্যে। আর এই পরবর্তী পর্যায়ে এখানেও মাটির কিংবা রোদে-পোড়ানো ইটের তৈরি ঘরবাড়ি কখনও-সখনও তৈরি হচ্ছে বলে দেখা গেছে।

ভারতের দক্ষিণাংশে সবচেয়ে সুপরিচিত নবপ্রস্তরযুগীয় বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে সাঙ্গানাকাল্লু (বেল্লারি জেলায়) ও পিক্‌লিহালে খননকার্য চালাবার ফলে। এইসব বসতিতে পাওয়া পাথরের পালিশ-করা হাতিয়ার ও হাতে-গড়া মৃৎপাত্র গোড়ার দিককার নবপ্রস্তর যুগের ও আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব একুশ শতকের বলে সাব্যস্ত হয়েছে। উপরোক্ত ওই সময়ের মধ্যে ভেড়া ও ছাগল গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়েছিল এখানে আর ঘরবাড়ি তৈরি করা হচ্ছিল প্রধানত ছোট-ছোট পাহাড়ের মাথায় আর নয়তো পাহাড়ের মধ্যেকার সরু-সরু খাদের মধ্যে।

পিক্‌লিহাল বসতির মানুষজনের পেশা ছিল পশুপালন ও জমির চাষবাস। এখানে গৃহপালিত পশু রাখার জন্যে বিশেষভাবে-তৈরি খোঁয়াড় পাওয়া গেছে আর

পাওয়া গেছে মাটি আর বাঁশ দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ির চিহ্ন। কিছু-কিছু পণ্ডিতের মত এই যে এইসব বসতির পত্তন করেছিল সেই সমস্ত ইরানী উপজাতি যারা ভারতের অভ্যন্তরে এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছিল। তবে এখানে উপস্থাপিত প্রমাণাদি এই মতের বিরোধী, বরং তা স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেই এর যোগসূত্রের ইঙ্গিত দেয়।

পূর্ব ভারতের নবপ্রস্তরযুগের সংস্কৃতিগুলির মধ্যে দুটি সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক ধারা স্পষ্ট: এদের একটি হল বিহার-ওড়িষ্যার, অপরটি আসামের ধারা। শেষোক্ত এই আসামের ধারাটিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতিগুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, অপরপক্ষে বিহার-ওড়িষ্যার সাংস্কৃতিক ধারার গোড়ার দিকে প্রধান হয়ে উঠতে দেখা যায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকেই।

উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে যখন এই নবপ্রস্তর ও গোড়ার দিককার তাম্রপ্রস্তরযুগের সংস্কৃতিগুলি বিকশিত হয়ে উঠছিল তখনই সিন্ধু-উপত্যকায় বর্তমান ছিল ব্রোঞ্জযুগের এক উন্নত নগর-সভ্যতা।

হরপ্পার সভ্যতা

একটা সময় ছিল যখন পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে এই ধারণা পোষণ করতেন যে ভারতে সভ্যতার উদয় হয়েছিল অনেক পরে। বস্তুত, কিছু-কিছু পণ্ডিত এমন মতও পোষণ করতেন যে ভারতে সভ্যতার আমদানি করেছিল বাইরে-থেকে-আসা আর্য উপজাতিগুলি। তখন প্রায়ই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা এবং প্রাচীন প্রাচ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির পশ্চাৎপদতার কথা বলা হোত।

তবে হরপ্পা-সভ্যতার আবিষ্কার ও তা নিয়ে গবেষণার ফলে এখন ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব ও তার গভীর মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে লক্ষণীয় প্রমাণ মিলেছে। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দেই ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম হরপ্পায় (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম পঞ্জাবের মুলতান জেলায় অবস্থিত) অপরিচিত লিপি খোদাই-করা একখানি পঞ্জা আবিষ্কার করেন, তবে সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত খননকার্য শুরু হয় মাত্র এ-শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। সে-সময়ে দুই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডি. আর. সাহ্‌নি ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খননকার্য চালিয়ে হরপ্পা ও মোহেন্‌জো-দারোয় (বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লার্‌কানা জেলায় অবস্থিত) দুটি প্রাচীন নগর আবিষ্কার করেন। অতঃপর নব-আবিষ্কৃত এই সভ্যতার নিদর্শন বিভিন্ন দেশের ইতিহাসবেত্তা ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিপুল আগ্রহের সঞ্চার করে।

হরপ্পা-সভ্যতার উৎপত্তি-বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব

হরপ্পা-সভ্যতার গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির মধ্যে সবচেয়ে জটিল একটি সমস্যা হল এ-সভ্যতার উৎপত্তির বিষয়টি। এ-সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত আছে। তার মধ্যে একটি হল হরপ্পা-সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে সুমের-সংস্কৃতি। এছাড়া অপর একটি মত হল ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলিই হরপ্পা-সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা, অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী হরপ্পা-সভ্যতা আসলে বৈদিক সভ্যতাই। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিৎ আর. হাইনে-গেল্ড্নার এমন কি এরকম মতও ব্যক্ত করেছেন যে সিন্ধু-উপত্যকার এই সভ্যতা একদা আবির্ভূত হয়েছিল হঠাৎ, প্রায় শূন্য থেকে মাটিতে পড়েছিল যেন-বা, কেননা খননকার্য চালিয়ে গোড়ার দিকে এ-সভ্যতার পূর্ববর্তী বিকাশের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অবশ্য স্থানীয় ভিত্তিতে এই সংস্কৃতির উৎপত্তি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নতুন-নতুন উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত মাটির নিচে বহতা জলের স্রোত থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদদের পক্ষে আজও পর্যন্ত মোহেন্‌জো-দারোর সর্বনিম্ন স্তরটি অনুসন্ধান করে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

বেলুচিস্তানে ও সিন্ধু প্রদেশের নানাস্থানে খননকার্য চালাবার ফলে দেখা গেছে যে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রাব্দে ওইসব অঞ্চলে এমন সব সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল যাদের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ, গোড়ার দিককার হরপ্পা-সভ্যতার সঙ্গে যাদের মিল ছিল অনেক দিক থেকে এবং যাদের সঙ্গে হরপ্পার বসতিগুলি দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছিল (ডব্লু. এ. ফেয়ারসের্ভিস, বি. দ্য কার্দি, জে. এম. কাসাল, প্রভৃতির গবেষণালব্ধ ফল এই তথ্যগুলি)। সিন্ধু প্রদেশে কৃষির উদ্ভব ঘটে পরে। এ-থেকে এই অনুমানের সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় যে বেলুচিস্তান ও দক্ষিণ আফগানিস্তান থেকে কিছু-কিছু উপজাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এই অঞ্চল পর্যন্ত।

এটা স্পষ্ট যে সিন্ধুনদের উপত্যকায় হরপ্পার বসতিগুলি হঠাৎ একদিন রাতারাতি আবির্ভূত হয় নি এবং সবক'টি বসতি একসঙ্গেও আবির্ভূত হয় নি। স্পষ্টতই একটি বিশেষ কেন্দ্রে নগর-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রথমে, তারপর সেখান থেকে লোকজন ক্রমশ বাইরে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য বসতি গড়ে তোলে একে-একে। এ-ব্যাপারে আম্‌রি-বসতি নিয়ে ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিৎ জে. এম. কাসালের গবেষণাটি বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক। কাসাল আম্‌রি-বসতির প্রাক-হরপ্পা যুগ থেকে হরপ্পার শেষ যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তর-পরম্পরার একটি বিন্যাসের চিত্র গড়ে তুলেছেন। এই স্তরবিন্যাস থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির স্থানীয় বিকাশের ধারা অনুধাবন করা যায়। যখন প্রায় সব মৃৎপাত্র কুমোরের চাক ছাড়া হাতে গড়া হোত, ঘরবাড়ি তৈরি করা

ও ধাতুর ব্যবহার বিরল ছিল যখন, তখন থেকে শুরু করে অলঙ্কৃত মৃৎপাত্র ও না-পোড়ানো কাঁচা ইটে তৈরি অপেক্ষাকৃত পোক্ত বাড়িঘরের যুগলক্ষণ-চিহ্নিত অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরগুলি পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে এই স্তরবিন্যাসের ফলে। এখানকার প্রাক-হরপ্পা যুগের নিম্নতর স্তরগুলির সঙ্গে বেলুচিস্তানের গোড়ার দিককার কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতিগুলির নানা ধরনের মিল লক্ষ্য করা গেছে, আর ওই প্রাক-হরপ্পা যুগের পরবর্তী স্তরগুলিতে যে-মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, দেখা গেছে তা সিন্ধু-উপত্যকার হরপ্পা-বসতিগুলির গোড়ার আমলের সমকালে বানানো। পরিশেষে, এখানকার খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে আমরি-সংস্কৃতির বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত ঐতিহ্যগুলি হরপ্পার ঐতিহ্যসমূহের সঙ্গে পাশাপাশি সহ-অবস্থান করেছিল।

হরপ্পার সংস্কৃতি ও তার পূর্ববর্তী আমরি-সংস্কৃতির মধ্যে পরস্পর-সংযোগের প্রশ্নটি প্রত্নতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে তীব্র বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। একদিকে এ. ঘোষের প্রবণতা হল ওই দুই সংস্কৃতির মধ্যে সহজাত একটা সম্পর্ক স্বীকার করে নেয়া, অন্যদিকে জে. এম. কাসাল মনে করেন যে হরপ্পার সংস্কৃতি আপনা থেকেই বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরিতে মূর্ত হয়ে ওঠে নি, বরং তা ক্রমে-ক্রমে আমরির ওপর 'চাপিয়ে দেয়া' হয়েছিল।

হরপ্পাতেই শহরের দুর্গপ্রাকারের নিচে পাওয়া গেছে আমরি-সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ মৃৎপাত্র আর মোহেন্‌জো-দারোর নিম্নতর স্তরগুলিতে পাওয়া গেছে বেলুচিস্তানের সংস্কৃতির নিদর্শন মৃৎপাত্র। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, কেবল-যে সিন্ধু-উপত্যকার বসতিগুলি ও বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশের কৃষিজীবী সংস্কৃতিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা-ই নয়, হরপ্পার সভ্যতার নিজস্ব স্থানীয় ভিত্তিও ছিল। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ওই অঞ্চলের এবং সবচেয়ে বেশি করে সিন্ধুনদের উপত্যকার কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেই, যদিও সেইসঙ্গে এ ছিল এক নতুন পর্যায়ের প্রতিনিধি, ব্রোঞ্জ যুগের এক অভিনব নগর-সভ্যতা ছিল এ।

পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ববিদরা আধুনিক হাইপুর শহরের অদূরবর্তী কোট দিজিতে যে-খননকার্য চালান তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ওই অঞ্চলে প্রাক-হরপ্পা যুগে কিছুটা উন্নত ধরনেরই এক সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল। পণ্ডিতেরা এখানে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেন এক নগরদুর্গ ও বসতবাড়ির রীতিমতো কয়েকটি সারি। কোট দিজির প্রথম আমলের মৃৎপাত্রগুলির সঙ্গে সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কৃষিভিত্তিক বসতিগুলির এবং সিন্ধু-উপত্যকার প্রাক-হরপ্পা যুগের মৃৎপাত্রের মিল পাওয়া যায়, আর কোট দিজির পরের আমলের মৃৎপাত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে খোদ হরপ্পার মৃৎপাত্রের। এর ফলে সেখানকার স্থানীয় ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশের সূত্রটি খুঁজে পাওয়া

সম্ভব হয়। এদিকে হরপ্পার সভ্যতার অব্যবহিত পূর্বের একটি যুগের সন্ধান পান ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা। রাজস্থানের কালিবাঙ্গায় একটি জায়গায় খননকার্য চালিয়ে তাঁরা দুটি ঢিপির ওপর হরপ্পার মানুষের পূর্ববর্তীদের দুটি বসতি আবিষ্কার করেন এবং পরে এখানে যে-সব ঘরবাড়ি আবিষ্কার করেন তাঁরা, দেখা যায়, সেগুলি স্পষ্টতই হরপ্পা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতাদেরই কীর্তি। এখানে প্রাক-হরপ্পা যুগের বসতিগুলি থেকে পাওয়া মৃৎপাত্রগুলি আমরি ও কোট দিজিতে পাওয়া মৃৎপাত্রের সঙ্গে বহু দিক থেকে এক ধরনের। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে পণ্ডিতদের পক্ষে হরপ্পার সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের সূত্র এবং হরপ্পার গোড়ার দিককার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত পরিণত হরপ্পা-যুগের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহ-অবস্থানের সূত্রটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা হরপ্পার ও গোড়ার দিককার হরপ্পা-সংস্কৃতির আরও অনেক নতুন-নতুন নিদর্শন-স্মরণিক আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন। এর ফলে হরপ্পা-সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে নতুন-নতুন তত্ত্বেরও উদ্ভব ঘটেছে। হরপ্পার সভ্যতা স্থানীয় প্রাক-হরপ্পা ও আদি হরপ্পা-সংস্কৃতিগুলি থেকেই ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠেছে—এই তত্ত্বটি ছাড়াও এমন মতও চালু হয়েছে যে আদি হরপ্পার অর্থাৎ গ্রামীণ ধরনের সংস্কৃতিগুলি এবং খোদ হরপ্পা অর্থাৎ নগর-সভ্যতা সম্ভবত পাশাপাশিই অস্তিত্ব বজায় রেখে এবং সমান্তরাল ধারায় বিকশিত হয়ে চলেছিল একদিন। বস্তুত, নগর-জীবনের উদ্ভব এবং বড়-বড় নগর-জনপদের আবির্ভাবই সেদিন ঘোষণা করেছিল এক নতুন কালপর্বের, সকল স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (যেমন, লিপিখোদিত পঞ্জা, বর্ণলিপি ও লেখার শিল্প, মৃৎপাত্রে মৌল ধরনের অলঙ্করণ, ইত্যাদি) সহ পরিণত হরপ্পা-সভ্যতার জন্ম।

নগর-সভ্যতার দিকে পদক্ষেপের প্রবণতা অবশ্য আদি হরপ্পাযুগ থেকেই আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশের বহু নিদর্শন-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, তবু এ-ধরনের উন্নত নগর-সভ্যতার পত্তন ঘটেছিল একমাত্র সিন্ধুনদের উপত্যকাতেই।

এই শেষোক্ত সভ্যতার বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল অবশ্যই অঞ্চলটির ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থাৎ সিন্ধুনদ ও তার শাখানদীগুলির জালবিস্তার। নদীমাতৃক এই অঞ্চলই বৈষয়িক সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বিকাশের এবং নগর-জনপদের, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারুশিল্পের কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল পটভূমির যোগান দিয়েছিল। হরপ্পা-যুগের বসতিগুলি যে বিপুল সংখ্যায় সিন্ধুনদ ও তার শাখানদীগুলির তীর-বরাবর গড়ে উঠেছিল এটা কোনো আপতিক ঘটনা নয়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গঙ্গা ও যমুনা নদীর ওপর-অঞ্চলেও নদীতীর-বরাবর অনেকগুলি হরপ্পা-যুগের বসতি পরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

হরপ্পা-সংস্কৃতির উৎপত্তি-সম্পর্কিত ব্যাপারটি এখনও বহুপরিমাণে স্পষ্ট ও

বিশদ করে তোলার অপেক্ষা রাখে, তবে এ-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই যে ওই সভ্যতার উৎপত্তির সঙ্গে বহির্বিশ্বের, যেমন আর্য ও সুমের-সভ্যতার, প্রভাবের সম্পর্ক-বিষয়ক তত্ত্বগুলি এখন নিছক পেশাদার ইতিহাসবেত্তাদের কৌতূহলের বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে।

হরপ্পা-সভ্যতার সীমানা ও ব্যাপ্তি

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হরপ্পার সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধানের কাজ প্রথম শুরু হল যখন, তখন মনে করা হচ্ছিল যে এ-সংস্কৃতির ভৌগোলিক বিস্তারের সীমানা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণই। বস্তুত, গোড়ার দিকে হরপ্পা-যুগের বসতিগুলি কেবলমাত্র সিন্ধু-উপত্যকাতেই পাওয়া গিয়েছিল। তবে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে হরপ্পা-সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল বিশাল এক ভূখন্ড জুড়ে, উত্তর-দক্ষিণে যার বিস্তার ছিল ১,১০০ কিলোমিটারের বেশি ও পূর্ব-পশ্চিমে ১,৬০০ কিলোমিটারের বেশি।

কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে খননকার্য চালানোর ফলে জানা গেছে যে সিন্ধু-উপত্যকা থেকে জনগোষ্ঠীর একেকটি দল ক্রমশ দক্ষিণে চলে গিয়ে নতুন-নতুন এলাকায় জনবসতি গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে এই ধরনের হরপ্পা-যুগের সবচেয়ে দক্ষিণের যে-সমস্ত বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি পাওয়া গেছে নর্মদানদীর মোহানার কাছে। তবে এ-ও সম্ভব যে হরপ্পার জনগোষ্ঠী এর চেয়ে আরও দক্ষিণাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল। তারা দেশের পূর্বাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল, যাত্রাপথে নতুন-নতুন ভূখন্ড 'অধিকার' করতে-করতে। এর অর্থ, হরপ্পা-সংস্কৃতির কিছু-কিছু রকমফের গজিয়ে উঠেছিল এখানে-ওখানে, যদিও মোটের ওপর বলতে গেলে এগুলি সবই ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী একটিই অখন্ড সংস্কৃতির নিদর্শন।

সৌরাষ্ট্রে ও কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হরপ্পা-যুগের বসতিগুলি পন্ডিতদের দৃষ্টি ফের এই প্রশ্নটিতে নিবদ্ধ করেছে যে এত দূর-দূর অঞ্চলে হরপ্পার জনগোষ্ঠীর এইভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণ কী এবং তারা এত দূরে এসে পৌঁছলই-বা কী উপায়ে?

কিছু-কিছু পন্ডিতের আগে ধারণা ছিল যে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার তথাকথিত শেষ পর্যায়ে যখন প্রধান নগর-কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করেছিল একমাত্র তখনই হরপ্পার জনগোষ্ঠী দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আবার অন্য অনেকে এই ধরনের ব্যাপকহারে 'স্থানান্তরে গমন'এর কারণ হিসেবে অনুমান করতেন ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন অথবা বাইরে থেকে আগ্রাসনকে। কিন্তু পরবর্তীকালে সৌরাষ্ট্রে, গুজরাটে ও কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে

পূর্ণ-পরিণত হরপ্পা-সভ্যতার নগর-কেন্দ্রসমূহ (যেমন, গুজরাটে সারকোতাদ নামে নগর-বসতি) আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে পণ্ডিতেরা এখন মনে করছেন যে সিন্ধু-উপত্যকার নগরসমূহের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারুশিল্পের অধিকতর বিকাশের জন্যে উপযুক্ত জমি-জায়গা ও বন্দর, ইত্যাদির সন্ধানেই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই হরপ্পা-সভ্যতার 'সম্প্রসারণ'এরই স্বাভাবিক একটি পদ্ধতি।

ইতিহাসবেত্তারা মনে করেন যে হরপ্পার জনগোষ্ঠী সাধারণত স্থলপথে ও নদীপথেই ইতস্তত চলে গিয়েছিল (তারা সমুদ্রপথেও স্থানান্তরে গিয়েছিল বলে এস. আর. রাও যে তত্ত্বটি প্রচার করেছেন তা যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়)। কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে সেখানে হরপ্পার সংস্কৃতি ও তাম্র-প্রস্তরযুগীয় স্থানীয় সংস্কৃতি পরস্পরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে এই বিপুলায়তন সভ্যতার মধ্যে যে-বহুতর রকমফের লক্ষ্য করা যায় তা বেশকিছু বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতির এবং হরপ্পা-সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতারা যে-সমস্ত বিভিন্ন অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিল সেখানকার স্থানীয় বিকাশের অসমান স্তরেরই প্রতিফলনমাত্র।

হরপ্পা-সভ্যতার কাল-নিরূপণ

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখন নানা ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হরপ্পা-সভ্যতার কাল-নিরূপণে সমর্থ হয়েছেন। এ-কাজ করেছেন তাঁরা সিন্ধু-উপত্যকা ও মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত পুরা-নিদর্শনগুলির মধ্যে প্রতিতুলনার সাহায্যে (যেমন, সিন্ধু-উপত্যকার হরফে খোদিত লিপি সহ পঞ্জা পাওয়া গেছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যেকার কয়েকটি শহরে), মৃৎপাত্রগুলির বর্ণালি-বিশ্লেষণ করে, সাম্প্রতিক কালে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ পদ্ধতির দ্বারা এবং প্রাচ্য পৃথিবীর সঙ্গে বাণিজ্য-সংক্রান্ত আক্কাডীয় আকর দলিলের উল্লেখের ওপর নির্ভর করে। গোড়ার দিকে পণ্ডিতেরা হরপ্পা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব আরও অনেক বেশি দূরকালের বলে অনুমান করেছিলেন। তাঁদের এই অনুমানের ভিত্তি ছিল সুমেরে ও ভারতে সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে বহুবিধ মিল লক্ষ্য করে তা থেকে টানা সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি। অগ্রণী ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও 'ভারতীয় প্রত্নবিদ্যা'র অন্যতম জনক স্যর জন মার্শাল খ্রীস্টপূর্ব ৩২৫০ সাল থেকে ২৭৫০ সাল সিন্ধু-সভ্যতার জীবনকাল বলে নির্দেশ করেন। কিন্তু পরে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার শহরগুলিতে খননকার্য চালাবার সময় সিন্ধু-উপত্যকার ধাঁচের কিছু পঞ্জা আবিষ্কৃত হওয়ায় এটা ধরা পড়ল যে এই পঞ্জাগুলির মধ্যে বেশির ভাগই সারগনের রাজত্বকাল (খ্রীস্টপূর্ব ২৩১৬ সাল

থেকে ২২৬১ সাল), ইসিন-যুগ (খ্রীস্টপূর্ব ২০১৭ সাল থেকে ১৭৯৪ সাল) এবং লারসা-যুগ (খ্রীস্টপূর্ব ২০২৫ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে পণ্ডিতেরা শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মেসোপটেমিয়া ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব চব্বিশ থেকে আঠারো শতকের মধ্যেই নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আক্কাডীয় যে-সমস্ত দলিলপত্রে প্রাচ্যদেশীয় অঞ্চলগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে-অঞ্চলগুলিকে সিন্ধু-উপত্যকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা বলে সনাক্ত করেছেন সেই দিলমুন ও মেলুহ্হার সঙ্গে, বাণিজ্য-সম্পর্কের সবচেয়ে বেশি উল্লেখ আছে সেগুলি সবই উর্-এর তৃতীয় রাজবংশের (খ্রীস্টপূর্ব ২১১৮ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যেকার) এবং লারসার রাজবংশের আমলের। লারসার রাজা গুঙ্গুনুমার রাজত্বকালের দশম বর্ষের (খ্রীস্টপূর্ব ১৯২৩ সালের) তারিখচিহ্নিত কীলকাকার ফলকগুলির একটিতে সিন্ধু-উপত্যকার ধাঁচের পঞ্জার একটি ছাপ পাওয়া গেলে পণ্ডিতসমাজে একদা গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত এই সমস্ত তথ্য এই ধারণার সপক্ষেই সাক্ষ্য দেয় যে সিন্ধু-উপত্যকায় নগর-বসতিগুলির বাড়বাড়ন্ত ঘটে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষদিকে ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনায়। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন শহরগুলির খননকার্য চালাবার সময় সেখানকার কাস্সীয় যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত স্তরগুলিতেও সিন্ধু-উপত্যকার পঞ্জা পাওয়া যায়। এ-থেকে মনে হয় ওই পর্যায়েও এই অঞ্চলের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার সংযোগ ছিল। হরপ্পার খননক্ষেত্রগুলির উচ্চতর স্তরসমূহে যে-ফাইআঁস (বা অলঙ্করণ-করা পোড়ামাটির) গুটিকা পাওয়া গেছে, বর্ণালি-বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে সেগুলি ক্রীট দ্বীপের নোসোস-এ (খ্রীস্টপূর্ব ষোল শতকের) প্রাপ্ত গুটিকাগুলিরই সমতুল্য। এর ফলে হরপ্পার সভ্যতার শেষ কালপর্বটি খ্রীস্টপূর্ব ষোল শতকের বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে কালনির্ণয় করতে গিয়ে উপরোক্ত এই সন-তারিখের কিছুটা হেরফের ঘটাতে হয়েছে। বর্তমানে পণ্ডিতেরা কালিবাঙ্গায় অবস্থিত হরপ্পা-যুগের সংস্কৃতির প্রাথমিক স্তরগুলি খ্রীস্টপূর্ব বাইশ শতকে উদ্ভূত হয়েছিল বলে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এখন বলা হচ্ছে যে হরপ্পা-সংস্কৃতির শেষ স্তরটি বর্তমান ছিল খ্রীস্টপূর্ব আঠারো ও সতেরো শতক জুড়ে। মোহেনজো-দারোর খননক্ষেত্রে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি থেকেও একই ধরনের সন-তারিখের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে এই সভ্যতার পূর্ণ পরিণতির দিনগুলি কেটেছে খ্রীস্টপূর্ব বাইশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে এবং মনে হচ্ছে সভ্যতাটি সম্ভবত টিকে ছিল খ্রীস্টপূর্ব আঠারো শতক পর্যন্ত (±১১৫ বছর)।

বেশিদিন আগেকার কথা নয় 'ডেন্‌ড্রোক্রোনলজি' (বা বৃক্ষবলয়ের সাহায্যে কালনির্ণয়বিদ্যা) নামে পুরাকালের সন-তারিখ নির্ণয়ের নতুন একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিপ্রয়োগে স্থিরীকৃত হরপ্পা-যুগের নগর-বসতিগুলির যে-বয়স জানা যাচ্ছে তা পণ্ডিতদের আবার সেই তত্ত্বের কাছাকাছি নিয়ে আসছে যে-তত্ত্ব অনুযায়ী সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার বয়স সম্ভবত আরও কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দিতে হয়।

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করার সময় এই কথাটি মনে রাখা বিশেষ দরকার যে ভারতের উপরোক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে হরপ্পা-যুগের নগর ও বসতিগুলির অস্তিত্ব দীর্ঘ একটা সময় সীমা জুড়ে বর্তমান ছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে এমন কি সিন্ধু-উপত্যকার প্রধান নগর-কেন্দ্রগুলির অবলুপ্তির পরেও হরপ্পা-যুগের সংস্কৃতির বাহন নগর-জনপদ তখনও সেখানে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে, তবে তা কিছুটা পরিবর্তিত চেহারায়। ভারতীয় পণ্ডিতদের পঞ্জাব ও হরিয়ানায় নতুন-নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায় যে হরপ্পা-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের 'পূর্ব' প্রত্যন্তসীমায় পরেও বেশকিছু হরপ্পা-যুগের বসতির অস্তিত্ব ছিল।

নগর ও তার গঠনবৈশিষ্ট্য

সিন্ধু-উপত্যকায় বড়-বড় শহর এবং নগর-পরিকল্পনা ও নগর-স্থাপত্যের সযত্ন ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদির অস্তিত্ব প্রমাণ দেয় যে হবপ্পা-সভ্যতা একদা উন্নতির এক উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি প্রধান শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন, তাদের মধ্যে বৃহত্তম হল হরপ্পা ও মোহেন্‌জো-দারো।

মোহেন্‌জো-দারো শহরটি আনুমানিক আড়াই বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে বিস্তৃত ছিল আর এর জনসংখ্যা ৩৫ হাজারের মতো ছিল বলে অনুমান করা হয় (যদিও কিছু-কিছু পণ্ডিতের অনুমান এই যে শহরের জনসংখ্যা আরও অনেক বেশি ছিল, এমন কি কেউ-কেউ এই জনসংখ্যা এক লক্ষ ছিল বলেও অনুমান করেন)।

উপরোক্ত এইসব খননকার্যের ফলাফল দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় হরপ্পা-সভ্যতার নগর-কেন্দ্রগুলির সবক'টিই এক ধরনের একটি পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এখানকার বড়-বড় শহরের ছিল দুটি করে প্রধান অংশ। এদের একটি ছিল নগর-দুর্গ, যেখানে শহরের কর্তাব্যক্তিরা বাস করতেন, আর অপরটি ছিল তথাকথিত 'নিচের শহর', বসতবাড়িগুলির অবস্থান ছিল যেখানে। শহরের এই

দ্বিতীয় অংশটি সাধারণত তৈরি হোত জ্যামিতিক আয়তক্ষেত্রের আকারে। অপরপক্ষে শহরের নগর-দুর্গটি তৈরি করা হোত শহরের বাকি অংশের চেয়ে উঁচু করে, ইটের তৈরি বেশ উঁচু একটা মঞ্চের ওপর। এই উঁচু মঞ্চ নগর-দুর্গকে বন্যার হাত থেকেও রক্ষা করত, আর এই বন্যা ছিল এখানকার সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটি যা থেকে-থেকেই সিন্ধু-উপত্যকার শহরগুলিকে গ্রাস করত। শহরের উপরোক্ত দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্পষ্টতই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কালিবাঙ্গায় খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে নগর-দুর্গের সঙ্গে 'নিচের শহর'এর যোগাযোগ ঘটত মাত্র দুটি সংযোগ-ফটক দিয়ে। বোঝা যায়, দরকার পড়লে এই দুটি যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দেয়া যেত আর নগর-কর্তৃপক্ষ নিজেদের সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারতেন। সার্‌কোতাদ বসতিতে আবার নগর-দুর্গটি 'নিচের শহর' থেকে পৃথক করা হয়েছিল একটি দুর্গপ্রাকার দিয়ে।

হরপ্পায় নগর-দুর্গের সীমানায় শোভাযাত্রা চালনার উপযোগী একটি বিশেষ ধরনের রাজপথ নির্মিত হয়েছিল। স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই রাজপথ ধরে সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করে যেত কিংবা নানা ধরনের শোভাযাত্রা চলাচল করত। মোটা-মোটা প্রাকার ও বুরুজমিনার দিয়ে এখানে সুরক্ষিত ছিল নগর-দুর্গটি। কালিবাঙ্গায় খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে নগর-দুর্গের বহির্দিকস্থ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে প্রকাণ্ড চওড়া ইটের তৈরি একটি প্রাকার ছিল আর তার অভ্যন্তরে ছিল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ চালানোর উপযোগী এবং আপাতদৃষ্টিতে শাসনকার্য পরিচালনার উপযোগী দালানকোঠা। মোহেন্‌জো-দারোর নগর-দুর্গে প্রকাণ্ড একটি জলাধারও পাওয়া গেছে (এটির প্রস্থ ৭ মিটার, দৈর্ঘ্য ১২ মিটার এবং গভীরতা প্রায় ২·৫ মিটার), যা সম্ভবত ধর্মীয় অট্টালিকা বা মন্দিরের অংশ ছিল এবং বিশেষ আনুষ্ঠানিক পুণ্যস্নানের কাজে ব্যবহৃত হোত বলে মনে হয়। জল টেনে তোলার বিশেষ এক ব্যবস্থার সাহায্যে কুয়ো থেকে টাটকা জল সর্বদাই এই জলাশয়ে সরবরাহ করা হোত। জলাশয়টি থেকে অল্প-একটু দূরেই ছিল জনগণের ব্যবহার্য শস্যগোলাগুলি আর একটি থাকওয়ালা ঢাকা মণ্ডপ, যা সম্ভবত জনসভার অনুষ্ঠানের জন্যে ব্যবহৃত হোত (কিংবা কিছু-কিছু পণ্ডিতের মতে ব্যবহৃত হোত শহরের হাটখোলা হিসেবে)। এখানে খননকার্য চালিয়ে এইসব থামের ভিত্তিপীঠগুলিই পাওয়া গেছে মাত্র, যা থেকে অনুমিত হয় থামগুলি কাঠের তৈরি ছিল আর এ-কারণে এগুলি টিকে যায় নি।

হরপ্পা নগরেও এই ধরনের গণগোলার সারি পাওয়া গেছে আসল নগর-দুর্গের উত্তর দিকে, নদীর কাছে। এখানে গোলাগুলোর কাছে পাওয়া গেছে পাথরের তৈরি বিশেষ ধরনের কতগুলি মঞ্চ। এ-থেকে অনুমিত হয় এইসব মঞ্চে দানাফসল মাড়াই করা হোত। প্রত্নতত্ত্ববিৎরা এখানে পাথরের মেঝের ফাঁকে গম আর যবের দানাসুদ্ধ

শিষও খ‌ুঁজে পেয়েছেন। সম্ভবত এই ফসল শহরে আনা হোত নদীপথে নৌকো করে, তারপরে তা মজ‌ুত করা হোত গোলায়।

যে-সব সাধারণ বসতবাড়ি নিয়ে গড়ে উঠত 'নিচের শহর' সেগ‌ুলিও তৈরি হোত কড়াকড়িভাবে স‌ুনির্দিষ্ট এক পরিকল্পনা অন‌ুযায়ী। শহরের এই অংশে কয়েকটি প্রধান রাস্তা থাকত, মোহেন্‌জো-দারোয় এইসব রাস্তা এমন কি দশ মিটার পর্যন্ত চওড়া হতে দেখা গেছে। ছোট-ছোট রাস্তা এইসব বড় রাস্তার সঙ্গে য‌ুক্ত ছিল সমকোণ-বরাবর আর এই ছোট রাস্তাগ‌ুলো কখনও-কখনও এত সর‌ু হোত যে এদের মধ্যে দিয়ে ঠেলাগাড়ি যাবার মতো জায়গাও থাকত না।

বাড়িগ‌ুলোর আকারপ্রকারও ছিল হরেক রকমের। কিছ‌ু-কিছ‌ু এমন কি তিনতলা বাড়ি পর্যন্ত ছিল (বাড়িগ‌ুলোর সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ থেকে এটা অন‌ুমান করা যায়) আর তাদের ছাদ ছিল সমতল, চ্যাপ্টা। এগ‌ুলি স্পষ্টতই ছিল সম্পন্ন নাগরিকদের বাড়ি। এইসব বাড়িতে এমনিতে জানলা বলে কিছ‌ু ছিল না, বাড়ির ভেতরে আলো-হাওয়া ঢুকত দেয়ালের মাথার দিকে তৈরি ছোট-ছোট ফোকর দিয়ে। বাড়িগ‌ুলোর দরজা ছিল কাঠের তৈরি। কাঠ ছাড়াও পিটিয়ে-জমানো কাদামাটির পাতও বাড়ি-তৈরিতে ব্যবহৃত হোত। প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে থাকত বিশেষ ধরনের বারবাড়ি আর একটি করে উঠোন, আর সেই উঠোনেই তৈরি হোত রান্নার জায়গা। রান্নার জায়গায় বিশেষ ধরনের উন‌ুন থাকত আর থাকত দানাফসল ও তেল সঞ্চয় করে রাখার জন্যে বড়-বড় জালা। বিশেষ উন‌ুনে সেঁকা হোত র‌ুটি। ছোট-ছোট গৃহপালিত পশ‌ুকেও ওই উঠোনে থাকার জায়গা করে দেয়া হোত।

শহরের গরিব লোকেরা বাস করত কুঁড়েঘরে কিংবা ছোট-ছোট ছাউনির নিচে। হরপ্পায় নগর-দ‌ুর্গের প্রাকারগ‌ুলোর আর ফসল-মাড়াইয়ের মঞ্চের কাছাকাছি জায়গায় দ‌ু'সারি এমনই কুঁড়ে মাটি খ‌ুঁড়ে পাওয়া গেছে। দেখা গেছে এমন প্রতিটি কুঁড়েয় মাত্র একখানি করে ছোট্ট ঘর আছে। এই ধরনের গরিব-বস্তির সন্ধান পাওয়া গেছে মোহেন্‌জো-দারোতেও। দরিদ্র কারিগর, সাময়িকভাবে নিয‌ুক্ত মজ‌ুর ও ক্রীতদাসরা এইসব বস্তিবাড়িতে থাকতেন বলে মনে হয়। শহরের বড় রাস্তার দ‌ু'ধারে ছোট-ছোট দোকান আর কারখানাও পাওয়া গেছে।

'নিচের শহরে'ও ধর্মীয় অন‌ুষ্ঠান-পালনের উপযোগী বাড়িঘর ছিল বলে অন‌ুমিত হয়। ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মর্টিমার হ‌ুইলর মোহেন্‌জো-দারোয় প্রকাণ্ড একটা মঞ্চের ওপর স্থাপিত একখানা বাড়ি আবিষ্কার করেছেন। বাড়িটিতে বর্তমানে-ল‌ুপ্ত ওপরতলায় ওঠার সিঁড়ি ও পাথরের ভাস্কর্যম‌ূর্তির টুকরোটাকরা পাওয়া গেছে। এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গোটা বাড়িখানাই এককালে একটি মন্দির ছিল।

বাড়ি-তৈরির প্রধান উপাদান ছিল পোড়া ইট, অবশ্য না-পোড়া কাঁচামাটির ইটও

ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কালিবাঙ্গায় পোড়া ইট প্রধানত ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে পাতকুয়ো আর পুণ্যাভিষেক-কক্ষগুলির নির্মাণকার্যে।

এইসব শহরের পানীয় জল-সরবরাহ ও আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থার দিকে নগরকর্তাদের প্রচুর পরিমাণে মনোযোগ দিতে দেখা গেছে। শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই একটি করে কুয়ো থাকত আর জনসাধারণের ব্যবহার্য পাতকুয়ো তৈরি করা হোত বড় রাস্তার ধারে-ধারে। সিন্ধু-সভ্যতার অন্তর্গত শহরগুলিতে ময়লা আবর্জনা ও দূষিত জল, ইত্যাদি নিষ্কাশনের যে-ব্যবস্থা দেখা যায় তা একদার প্রাচীন প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত একটি ব্যবস্থা বলা যায়। শহরের রাস্তাগুলির মধ্যে জায়গায়-জায়গায় এমন সব বিশেষ গর্ত ছিল, যার মধ্যে দিয়ে তরল আবর্জনা চলে যেত বিশেষ ধরনের নালার মধ্যে আর সেই নালাগুলো নিয়মিত সময়ে পরিষ্কার করা হোত নিঃসন্দেহে। এই নালাগুলো তৈরি হোত ইট দিয়ে আর তাদের ওপরকার ঢাকনিও তৈরি হোত ইট কিংবা পাথরের ফলক দিয়ে। স্থানীয় জলবায়ুর অবস্থা, শহরের জনবসতির ঘনত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যবস্থার তৎকালীন নিচু মানের বিচারে পানীয় জল-সরবরাহ ও আবর্জনা-নিষ্কাশনের এই সুদক্ষ ও উঁচু মানের ব্যবস্থা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

সৌরাষ্ট্রের লোথালে এক অভিনব নগর-পরিকল্পনা সহ অপর একটি হরপ্পা-যুগের শহরও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শহরটি এককালে শুধু-যে বাণিজ্য-কেন্দ্রই ছিল তা-ই নয়, স্পষ্টতই একটি বন্দরও ছিল এটি। গোটা শহরটি ঘেরা ছিল পাথরের পাঁচিল দিয়ে আর বসতবাড়িগুলি বিশেষ ধরনে তৈরি এমন একটা উন্নত ভিত্তির ওপর স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত ছিল যার ফলে বন্যার কবল থেকে শহরটি রক্ষা পেত। এই নগর-বসতির পূর্বদিকে ছিল জাহাজ-নির্মাণ ও মেরামতের একটি কারখানা (কারখানাটির আয়তন ছিল ২১৮ মিটার×৩৭ মিটার)। কয়েকটি কাটা খাল দিয়ে কারখানাটি যুক্ত ছিল নদীর সঙ্গে ও তারপর নদী-মারফত সমুদ্রের সঙ্গে। খননকার্য চালাবার ফলে এখানে আড়াই কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা একটি খালের চিহ্নও পাওয়া গেছে। শহরের অবশিষ্টাংশে ছিল কেবল বসতবাড়ি। শহরের প্রধান রাস্তাগুলি ছিল চার থেকে ছয় মিটার চওড়া আর পাশের সরু রাস্তাগুলি দুই মিটারের চেয়ে বেশি চওড়া নয়। এখানকার প্রধান রাস্তাগুলির ধারে-ধারে হস্তশিল্পী কারিগরদের কারখানা-ঘরও পাওয়া গেছে।

অধিবাসীদের জীবিকা

নগর-নির্মাণের ক্ষেত্রে বিকাশের উন্নত স্তরে ওঠা সত্ত্বেও সিন্ধ-উপত্যকার জনসংখ্যার অধিকাংশই সেকালে বাস করত গ্রামের বসতিগুলিতে এবং প্রধানত ব্যাপৃত থাকত চাষ-আবাদে। সিন্ধু-উপত্যকা ছিল প্রাচী পৃথিবীতে চাষবাসের

আদিতম কেন্দ্রগুলির একটি। সভ্যতার একেবারে আদিতম কাল থেকেই নানাধরনের ফসলের চাষ হয়ে আসছিল এখানে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের আবিষ্কারের ভিত্তিতে বিচার করলে বলতে হয় হরপ্পা-সভ্যতার মানুষ দু'ধরনের গম, যব, তিল ও বরবটির চাষের সঙ্গে পরিচিত ছিল। সিন্ধু-উপত্যকার বসতিগুলিতে কিন্তু ধানচাষের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি, তবে লোথালে ও রঙপুরে (সৌরাষ্ট্রে) কাদামাটির স্তরে ও মৃৎপাত্রের টুকরোয় ধানের তুষ পাওয়া গেছে। এ-থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের লোকেরা ধানের চাষ করত। মোহেন্‌জো-দারোতে খননকার্য চালাবার সময় ছোট্ট একটুকরো সুতী কাপড় পাওয়া যায়, এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে-সময়ে ওই অঞ্চলে তুলোর চাষেরও চল ছিল। ফুলবাগান করারও প্রচলন ছিল সে-সময়ে। ওই যুগে কৃষকেরা সিন্ধুনদের বন্যাকে কৌশলে কাজে লাগাতে জানতেন এবং সম্ভবত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করতেন। কিছু-কিছু পণ্ডিতের মতে (যেমন, ডি. ডি. কোশাম্বির), তখন লাঙলের ব্যবহার জানা ছিল না এবং কৃষকেরা জমি চাষ করতেন হালকা এক ধরনের মইয়ের মতো কাঁটা দিয়ে।

কিন্তু কালিবাঙ্গায় যখন প্রাক-হরপ্পা যুগের স্তরগুলির খননকার্য চলছিল তখন সেখানেই জমিতে দেয়ার মইয়ের টুকরো পাওয়া যায়, আর এ-থেকে মনে করা যায় যে এমন কি প্রাক-হরপ্পা যুগের মানুষেরাও লাঙল ব্যবহার করতেন। কাজেই হরপ্পার মানুষেরা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃষির এই যন্ত্রটি ব্যবহার করতেন এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে অল্পই।

সিন্ধু-সভ্যতার আমলে গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওই সময়কার গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল ভেড়া, ছাগল, গোরু ও কুকুর। মুরগির চাষও হোত তখন। মনে হয়, হাতিও তখন পোষ মানানো হোত। ওখানকার লোকে যে তখন গৃহপালিত পশু হিসেবে ঘোড়ার ব্যবহার জানত এখনও পর্যন্ত এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবে এই প্রশ্নটি নিয়ে বর্তমানে অনুসন্ধান চলেছে।

তামা আর ব্রোঞ্জই ছিল তখন প্রধান ধাতু যা দিয়ে যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস বানানো হোত। ধাতু গলিয়ে আকরিক থেকে পৃথক করা, ধাতুকে ছাঁচে ঢালাই করা এবং আগুনে পুড়িয়ে ও পিটিয়ে ঢালাই করার কৃৎকৌশল তখনই, ওই সময়েই প্রয়োগ করা হচ্ছিল। ওই সময়ের ধাতুনির্মিত নানা বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে তামা বা ব্রোঞ্জের সঙ্গে স্বল্প-পরিমাণ নিকেল ও আর্সেনিকের মিশেলও দেয়া হোত তখন। ধাতুনির্মিত ছোট-ছোট মূর্তিও তখন তৈরি করা হোত তথাকথিত cire perdue (মোম-ছাড়ানো) পদ্ধতিতে।

তবে তাই বলে পাথরেরও গুরুত্ব কমে নি ওই সময়ে এবং পাথর কেটেও তখন দৈনন্দিনের ব্যবহার্য নানাবিধ জিনিসপত্র ও অলঙ্কারাদি বানানো

হোত। তবে লোহার অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন কিন্তু পাওয়া যায় নি সিন্ধু-উপত্যকার বসতিগুলোয়। ধাতু হিসেবে লোহা ভারতীয় ইতিহাসের এক পরবর্তী স্তরে আবির্ভূত হয়।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের মণিকাররা রুপোর এবং সোনার অলঙ্কারও বানাতেন। স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মধ্যে দামি অলঙ্কারের যথেষ্টই জনপ্রিয়তা ছিল।

সুতোকাটা এবং কাপড় বোনার মতো কুটিরশিল্পের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল হরপ্পা-সভ্যতার আমলে, তেমনই বহুল-প্রচলিত ছিল হাড়ের ওপর ও ধাতুর ওপর খোদাইয়ের কাজ এবং মাটির পাত্র তৈরির শিল্প। সিন্ধু-উপত্যকায় খননকার্য চালাবার সময় বহু বাড়িতে সুতোকাটার চরকা পাওয়া গিয়েছিল। ওই আমলের মৃৎপাত্রগুলিও ছিল চিত্রবিচিত্র করা, অলঙ্করণে-ভরা, তবে প্রধানত তাতে আঁকা হোত জ্যামিতিক নকশা ও গাছপালার বিমূর্ত চিত্র। কুমোরের চাকে গড়া হোত হাঁড়ি এবং থালা আর তারপর তা পোড়ানো হোত বিশেষ ধরনের উনুনে বা ভাঁটিতে। প্রলেপ-দেয়া জেল্লা-ধরানো মৃৎপাত্রও তৈরি হোত তখন।

রাজনৈতিক সংগঠন ও সমাজ-কাঠামো

পণ্ডিতদের মধ্যে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতি-সম্পর্কিত বিষয়টি এখনও বিতর্কের ব্যাপার। মোহেন্‌জো-দারো, হরপ্পা, কালিবাঙ্গা ও অন্যান্য নগর-বসতিতে নগর-দুর্গের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় ওই সমাজে শ্রেণী-বিন্যাসের অস্তিত্ব-বিষয়ক ধারণাটি সমর্থিতই হয়। এখনও পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে যে-সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা চলে যে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা শ্রেণী-সমাজ উদ্ভবের আগের যুগের এইমর্মে কিছু-কিছু পণ্ডিত যে মত পোষণ করে আসছেন তার সমর্থনে উপযুক্ত ভিত্তি নেই।

উপরোক্ত ওই সমস্ত শহরে অবস্থিত নগর-দুর্গগুলিতে খুব সম্ভব নগর-শাসকের (কিংবা শাসকদের) সদরদপ্তর ও তাঁর প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। মনে হয় শহরগুলির প্রধান শাসনকেন্দ্রও অবস্থিত ছিল এই নগর-দুর্গে এবং এইসব কেন্দ্র থেকেই শহরগুলির জল সরবরাহ ও আবর্জনা-নিষ্কাশনের জটিল ব্যবস্থাগুলি নিয়ন্ত্রিত হোত। আবার পৌরশাসনের এই প্রতিষ্ঠানগুলিই-যে গণ-খাদ্যগোলাসমূহের ভারপ্রাপ্ত ছিল এ-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ স্বল্প। স্পষ্টতই প্রতিটি শহরে একটি করে বিশেষ নগর-পরিষদের অস্তিত্ব ছিল। আর এইসব পরিষদের সদস্যরা-যে মোহেন্‌জো-দারোর খননক্ষেত্রে যেমনটি পাওয়া গেছে তেমনই এক ধরনের সম্মেলন-মণ্ডপে মাঝে-মাঝে মিলিত হতেন সেটিও সম্ভব বলে মনে হয়।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা কালিবাঙ্গায় যে-খননকার্য চালান তার ফলে বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। যেমন, জানা গেছে যে এখানে শুধু নগর-দুর্গটিই নয়, 'নিচের শহর'ও ঘেরা ছিল সুরক্ষিত বুরুজ সহ প্রাকার দিয়ে। কালিবাঙ্গায় নগর-দুর্গের দুটি অংশ ছিল—উত্তর ও দক্ষিণের অংশ। এই উত্তরের অংশে ছিল বসতবাড়িগুলি, কিন্তু নগর-দুর্গের দক্ষিণাংশে এরকম কোনো বাড়ি ছিল না। এই শেষোক্ত অংশে আবিষ্কৃত হয়েছে রোদে-পোড়ানো ইটে-তৈরি কয়েকটি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ভিত্তিমঞ্চ। এরকম একটি ভিত্তিমঞ্চের 'শীর্ষদেশ'এ কয়েকটি বেদীর ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারটা কিছু-কিছু ভারতীয় পণ্ডিতের (যেমন, বি. বি. লালের) এই অনুমানের সপক্ষে যুক্তির যোগান দিয়েছে যে নগর-দুর্গের দক্ষিণাংশে নগরকর্তার বাসভবন ছিল না, এখানে ছিল ধর্মানুষ্ঠান উদ্যাপনের জন্যে বিশেষ ধরনের মন্দিরাদি। এই বিশেষ শহরের ক্ষেত্রে নগর-দুর্গের উত্তরাংশে অবস্থিত বসতবাড়িগুলি পুরোহিতদের বসবাসের বাড়িও হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে সিন্ধু-সভ্যতার বৃহত্তম দুই নগর-কেন্দ্র ছিল মোহেন্জো-দারো ও হরপ্পা। কিছু-কিছু পণ্ডিত এ-দুটি শহরকে হয় একটি অখণ্ড রাজনৈতিক ইউনিটের আর নয়তো দুটি পৃথক ইউনিটের দুই রাজধানী ছিল বলে মনে করেন। তবে এখানকার সংশ্লিষ্ট বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল যে-বহুতর বসতি তাদের শাসনকার্য পরিচালনার মূল কেন্দ্র ও সেই কেন্দ্রের শাসনপদ্ধতিগুলির ধরনধারণ কেমন ছিল এ-প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি। এ-প্রসঙ্গে এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে একদার এই এলাকায় ওজন করার ও মাপজোকের একটিই অখণ্ড রীতি, একটিই লিখনপদ্ধতি, শহরগুলির বিন্যাসের ও বাড়ি-তৈরির কৃৎকৌশলের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ মিল, ইত্যাদি লক্ষ্য করা গেছে।

হরপ্পা-যুগের শহরগুলিতে রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং এই সভ্যতার আমলে গোটা সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোর চেহারা-সম্পর্কিত বিষয়টি এখনও তুমুল বিতর্কের ঝড় তুলে চলেছে। কিছু-কিছু পণ্ডিত (যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ. ভ. স্ত্রুভে ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ডব্লু. রুবেন) এই মত প্রচার করেছেন যে হরপ্পা-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এক ধরনের ক্রীতদাস-মালিকানা প্রথার ওপর ভিত্তি করে। তবে এই তত্ত্বের সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত নয়। অন্যান্য কিছু পণ্ডিত আবার এই সভ্যতার রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার রাজনৈতিক সংগঠনের তুলনা করেছেন এই অনুমানের ভিত্তিতে যে সিন্ধু-উপত্যকাতেও শাসন-ক্ষমতার আসল পরিচালক ছিলেন পুরোহিত-সম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়ই ছিলেন সকল জমির মালিক। তবে এটাও সম্ভব যে হরপ্পা-যুগের শহরগুলিতে রাষ্ট্রশাসনের প্রকৃতি ছিল ক্ষমতাপন্ন অল্পসংখ্যক ব্যক্তি-পরিচালিত প্রজাতন্ত্রীয় রাজ্য।

সিন্ধু-উপত্যকায় খননকার্য চালানোর ফলে জানা গেছে যে সমাজে বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে লক্ষণীয় রকমের অসাম্য বর্তমান ছিল। বড়-বড় বাড়িতে সম্পন্ন নাগরিকরা, অর্থাৎ বণিক ও অবস্থাপন্ন কারুশিল্পীরা যে বাস করতেন এটা স্পষ্ট, আর দরিদ্ররা মাথা গুঁজে থাকত অতি ছোট সব ঘরবাড়িতে। মৃত্যুর পর কবর দেয়ার প্রচলিত রীতি থেকেও অর্থ-সম্পত্তির ব্যাপারে লক্ষণীয় পার্থক্য চোখে পড়ে। ধনী নাগরিকদের কবর দেয়া হোত নানাবিধ রত্নালঙ্কার ও অলঙ্করণ-করা পাত্রাদি সহ। দরিদ্রের কবরের সাজসজ্জা ও উপকরণ ছিল অনেকগুণে বেশি শাদামাটা ধরনের। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে হরপ্পা-যুগের শহরগুলিতে ক্রীতদাসরাও ছিল। তারা বাস করত দীনহীন কুটিরে, আর ফসল মাড়াইয়ের কাজ করত, ভারি বোঝা বইত এবং সম্ভবত ভূগর্ভস্থ নর্দমার আবর্জনাদি পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাত। হরপ্পায় নগর-দুর্গের প্রাকারের ওধারে, গণ-খাদ্যগোলাগুলির কাছাকাছি ও ফসল-মাড়াইয়ের মঞ্চগুলির একেবারে পাশেই এমন সমস্ত দীনহীন কুটির পাওয়া গেছে যেগুলি দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে সেখানে ছিল মুচলেকাবদ্ধ মজুর কিংবা ক্রীতদাসদের বাস। কালিবাঙ্গায় কিংবা লোথালে এমন কোনো কুটির পাওয়া না-যাওয়ায় পণ্ডিতেরা (যেমন, ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিৎ জে. এম. কাসাল) এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শেষোক্ত এইসব শহরের শাসন-কাঠামো হরপ্পায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রভুত্বপরায়ণ শাসন-ব্যবস্থার চেয়ে অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী ছিল। যদিও এ-সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণ স্থিরসিদ্ধান্তে আসার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবু এটা সম্ভব বলেই মনে হয় যে হরপ্পা-যুগের একটি শহর থেকে অপর একটি শহরে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতিতেও তারতম্য ছিল। সিন্ধু-সভ্যতায় ক্রীতদাসদের অস্তিত্বের ব্যাপারে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডি. এচ. গর্ডন একটি ভারি কৌতূহলোদ্দীপক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলছেন যে এখানে পাওয়া পোড়ামাটির কিছু মূর্তি অসলে ক্রীতদাসদের মূর্তি ছাড়া কিছু নয় (এগুলি হল উপবেশনরত নারী-পুরুষের মূর্তি। এদের প্রত্যেকে দুই হাতে নিজের দুই হাঁটু জড়িয়ে রয়েছে আর মাথায় পরে আছে গোল বাটিটুপি)। এছাড়া কাসালও খুব সরল ও সংক্ষিপ্ত 'লিখন' সহ একপ্রস্থ অতি ক্ষুদ্র আকারের পঞ্জাকে শ্রমিক ও ক্রীতদাসদের 'পরিচয় পত্র' বলে সনাক্ত করেছেন।

যাই হোক, সবকিছু মিলিয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে খননকার্যের ফলাফল সিন্ধু-সভ্যতায় বেশ কয়েকটি সামাজিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়, যেমন, পুরোহিত, বণিক, কারুশিল্পী ও মুচলেকাবদ্ধ মজুর-সম্প্রদায়। সুনির্দিষ্ট একটি সামরিক গোষ্ঠীর অস্তিত্বও-যে এখানে ছিল সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। এই সামাজিক স্তরবিন্যাসের অস্তিত্ব দেখে কিছু-কিছু পণ্ডিত হরপ্পা-সভ্যতার আমলেই ভ্রূণাকারে পরবর্তী বর্ণাশ্রয়ী সমাজ-কাঠামোর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করছেন।

হরপ্পা-সভ্যতার আমলের শহরগুলি ছিল অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তখন সমুদ্রপথে ও স্থলপথে। মোহেন্‌জো-দারোয় খননকার্য চালাবার সময় দুই চাকাওয়ালা গাড়ির একটি খেলনা মডেল পাওয়া যায়। মনে হয় এই ধরনের বড় আকারের গাড়ি সিন্ধু-উপত্যকার সীমানার মধ্যে তখন ব্যবহার করা হোত মালপত্র আনা-নেয়ার জন্যে। তখন হরপ্পা-সভ্যতার শহরগুলি ও দক্ষিণ ভারতের কিছু-কিছু অংশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল, দক্ষিণ ভারত থেকেই মূল্যবান ধাতুসমূহের চালান আসত হরপ্পা-অঞ্চলে। আরও সম্প্রতিকালে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে হরপ্পা-সভ্যতার শহরগুলির সঙ্গে দক্ষিণ তুর্কমেনিয়ার তদানীন্তন বসতিগুলিরও বাণিজ্য-সম্পর্ক বর্তমান ছিল (আলতিন-তিপিতে ভি. এম. ম্যাসনের আবিষ্কার অনুযায়ী)।

পঞ্জা, মালার গুটিকা, কড়ি ও হরপ্পা-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসূচক অন্যান্য দ্রব্যাদি মেসোপটেমিয়ার শহরগুলিতে এবং মেসোপটেমীয় ধাঁচের পঞ্জা সিন্ধু-উপত্যকার শহরগুলিতে আবিষ্কৃত হওয়ায় একথার প্রমাণ মিলছে যে সিন্ধু-উপত্যকা ও সুমের-সভ্যতার মধ্যে একদা ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক বর্তমান ছিল। সুমের-অঞ্চলে খননকার্য চালাবার সময় হরপ্পার পঞ্জার ছাপ-দেয়া এক-টুকরো কাপড়ও আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয় সুমেরের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রাখা হোত সমুদ্রপথে, বাহ্‌রেন হয়ে, কারণ বাহ্‌রেনে হরপ্পা-যুগের তৈজসপত্রের স্মারক পাত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। লোথালেও নানা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বিদেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যাপক হারে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাক্ষ্য দেয়। খননকার্য চালাবার ফলে সেখানে প্রকাণ্ড একটি জাহাজঘাটা, আগন্তুক জাহাজ ভিড়িয়ে রাখার উপযোগী ডক এবং পাথরের তৈরি বহু নোঙর পাওয়া গেছে। মোহেন্‌জো-দারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত কিছু-কিছু পঞ্জা ও পোড়ামাটির ফলকের গায়ে জাহাজের ছবি খোদাই করা আছে বলে দেখা গেছে আর লোথালে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ভাগ্য আরও একটু বেশি প্রসন্ন হওয়াতে তাঁরা সেখানে জাহাজের একটি পোড়ামাটির তৈরি মডেল আর সেই মডেল-জাহাজের মাঝখানে আপাতদৃষ্টিতে মাস্তুলের ডাণ্ডা আটকানোর জন্যেই একটি খাঁজের চিহ্ন পর্যন্ত পেয়ে যান।

বাহ্‌রেনে ও মেসোপটেমিয়ার শহরগুলিতে যেরকম গোলাকার পঞ্জা পাওয়া গেছে প্রায় সেই একই ধরনের পঞ্জা পাওয়া গেছে লোথালেও।

আক্কাড দেশের পুথিতে উল্লিখিত আছে যে সেখানকার বণিকরা সমুদ্র পেরিয়ে দিল্‌মুন, মাগান ও মেলুহ্‌হা প্রভৃতি দেশে যেতেন।

কিছু-কিছু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই দিল্‌মুনকে উপরোক্ত বাহ্‌রেন বলে সনাক্ত করেছেন, আবার অন্যরা এই নামটি ব্যাখ্যা করেছেন হরপ্পা-সভ্যতার অন্তর্গত

কয়েকটি অঞ্চলের পরিচয়ের সূচক বলে। এছাড়া মাগানকে অনেকে বেলুচিস্তানের অন্তর্গত একটি জায়গা বলে আর মেলুহ্হাকে অনেকে খোদ মোহেন্‌জো-দারো অথবা ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোনো বসতি বলেই সনাক্ত করেন। যদিও উপরোক্ত এই সমস্ত জায়গাকে যথাযথভাবে সনাক্ত করার সমস্যাটি এখনও পর্যন্ত অসমাধিত রয়ে গেছে, তবু হরপ্পা-সভ্যতার শহরগুলির সঙ্গে একদা-যে মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ধর্মবিশ্বাস

প্রত্নতাত্ত্বিক নানা আবিষ্কারের ফলে হরপ্পা-সভ্যতার আমলে জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ কী ছিল সে-সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা পাই। ওই যুগের শহরগুলির নগর-দুর্গ ও বসত-এলাকা উভয় অংশেই এমন সমস্ত অট্টালিকা, ইত্যাদি পাওয়া গেছে যেগুলিকে পণ্ডিতেরা যথেষ্ট যুক্তির ভিত্তিতেই মন্দির বলে সনাক্ত করেছেন। স্পষ্টতই এই সমস্ত মন্দির ও আনুষ্ঠানিক পুণ্যস্নানের সরোবরগুলির মধ্যে এবং এসবের সঙ্গে মোহেন্‌জো-দারো ও হরপ্পায় পাওয়া পাথরের মূর্তিগুলির কিছু-একটা যোগসূত্র আছে। বিপুলসংখ্যক পণ্ডিতের মতে এইসব মন্দির ও কিছু-কিছু পাথরের মূর্তি কোনো এক পুরুষ-দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ছিল, যে-দেবতা নাকি শিবের আদিরূপের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে পাওয়া পঞ্জাগুলির মধ্যে একটিতে খোদাই করা আছে নিচু একটি পাদপীঠে বিশিষ্ট এক ধরনের 'যোগাসন'এ আসীন ত্রি-আনন এক দেবমূর্তির ভাস্কর্য ও তাঁর সঙ্গে যেন যুক্ত-হয়ে-থাকা কয়েকটি কৃষ্ণসারমৃগের ছোট-ছোট মূর্তি। এই দেবমূর্তির কেশদাম দুটি শৃঙ্গের আকারে বিন্যস্ত। মূর্তিটির দু'দিকে দাঁড়িয়ে আছে বন্য জীবজন্তু। স্যর জন মার্শাল যখন এখানকার খননকার্যের তদারক করছিলেন, তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই দেবমূর্তিটি হল পশুপতি শিবের, অর্থাৎ গবাদি পশুর পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক শিবের মূর্তি এটি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে আদি হিন্দুশাস্ত্রে শিবকে বলা হয়েছে যোগিন্‌ এবং শৃঙ্গের আকারে বিন্যস্ত কেশদাম সহ দেবতা। এই ব্যাখ্যাটি এখন অপরাপর বহু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের দ্বারাও সমর্থিত। মনে হয় এর ফলে হরপ্পা-সভ্যতার আমলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মগত ধ্যানধারণার সঙ্গে পরবর্তী হিন্দুধর্মের একটা যোগসূত্র যেন খুঁজে পাওয়া যায়। অপর একটি সাক্ষ্যও যেন এই তত্ত্বের সমর্থন যোগাচ্ছে বলে মনে হয়। তা হল, পঞ্জার ওপর ষণ্ড, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি জীবজন্তুর খোদিত মূর্তি। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বিশেষ-বিশেষ দেবতা বিশেষ-বিশেষ জীবজন্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত: যেমন, শিব ষণ্ড (বা নন্দিন)-এর সঙ্গে, আর তাঁর পত্নী দেবী পার্বতী ব্যাঘ্রের সঙ্গে।

সম্ভবত উপাস্য দেবদেবীর সঙ্গে জীবজন্তুর এই সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারটি ছিল পূর্বতন 'টোটেম'গত ধর্মবিশ্বাসের জের এবং এই ধরনের কিছু-কিছু প্রাণীই ছিল পূর্ববর্তী নানা উপজাতি-গোষ্ঠীর যতসব 'টোটেম' বা প্রতীক।

হরপ্পা-সভ্যতার ধ্যানধারণা ও ঐতিহ্য যে প্রাচীন ভারতের পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছিল এই ধারণাটির ব্যাপারে অবশ্য সম্প্রতিকালে (এ. ঘোষ সহ) কিছু-কিছু পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ত্রি-আনন দেবমূর্তিটি-যে 'হিন্দু' দেবতার আদিরূপ এই মতটিও প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁরা।

কালের গ্রাস থেকে রক্ষিত পঞ্জাগুলির বিচারে বলতে হয় যে সিন্ধু-সভ্যতার আমলে অগ্নি, জল ও বৃক্ষপূজার অনুষ্ঠানও উদ্‌যাপিত হোত। লোথাল ও কালিবাঙ্গায় এই পূজাবেদীর ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে।

হরপ্পা-আমলের পঞ্জাগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের ফলে ইতিহাসবেত্তারা ওই আমলের জনসাধারণের বিশ্বসৃষ্টির গঠনতত্ত্ব-বিষয়ক ধ্যানধারণার কিছু-কিছু দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন। দেখা গেছে ওইসব ধ্যানধারণার অনেকগুলিই প্রত্যক্ষত হিন্দুধর্মের ধর্মীয় মতাদর্শগুলির সমান্তরাল ধারণা।

এক্ষেত্রে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হল এই যে হরপ্পা-যুগের উপরোক্ত কিছু-কিছু কিংবদন্তীর সঙ্গে কয়েকটি সুমেরীয় কিংবদন্তীর সাদৃশ্য, বিশেষ করে সুমেরীয় বীর গিলগামেশের সুপরিচিত কিংবদন্তীটির কিছু-কিছু ঘটনার সঙ্গে প্রথমোক্ত কিংবদন্তীর আশ্চর্য মিল। তবে হরপ্পা-যুগের আলোচ্য পঞ্জাটিতে বীর নায়ককে সিংহের বদলে ব্যাঘ্রযূথকে পরিচালনা করতে দেখা যাচ্ছে।

এছাড়া সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া গেছে প্রচুর সংখ্যক পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তি। এগুলি সেখানে মাতৃ-দেবতার উপাসনারই সাক্ষ্য দেয়।

হরপ্পা-যুগের মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ-সম্পর্কিত এপর্যন্ত-প্রচলিত বহুবিধ ধ্যানধারণাই অনেকখানি পরিমাণে নিছক অনুমানমাত্র। এগুলির সত্যাসত্য যাচাই হবে তখন, যখন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিন্ধু-সভ্যতার বর্ণলিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হবেন। তবে ইতিমধ্যে যা সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলেছে এমন কি তার ভিত্তিতেও একথা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব যে হরপ্পা-সভ্যতার ঐতিহ্যসমূহ *পরবর্তী বৈদিক যুগের উপজাতিগুলির বিকাশে একদা সুনির্দিষ্ট* প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভাষা ও বর্ণলিপি

হরপ্পা-সভ্যতার বর্ণলিপির পাঠোদ্ধার যে এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়, তবে এই লিপির অস্তিত্বই প্রমাণ দিচ্ছে, ওই সভ্যতা বিকাশের কতটা-যে উচ্চ স্তরে উঠেছিল। এ-পর্যন্ত খোদাই-করা লিপি সহ এক হাজারেরও বেশি পঞ্জা আবিষ্কৃত হয়েছে আর এছাড়া পাওয়া গেছে মৃৎপাত্র ও ধাতুর-তৈরি জিনিসপত্রের ওপরও খোদাই-করা বেশ-কিছু লিপি। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে উপরোক্ত এই সমস্ত পঞ্জা পণ্যদ্রব্যের জন্যে রসিদও হতে পারে, আবার এদের মধ্যে কিছু-কিছু পঞ্জায় ছোট-ছোট ছিদ্র থাকায় সেগুলি মন্ত্রপূত কবচও হতে পারে। খুব সম্ভব এই ধরনের লিপি কেবল পঞ্জার ওপরই উৎকীর্ণ করা হয় নি, যে-সমস্ত বস্তুর ওপর লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ (যেমন তাল বা খেজুর-পাতা) তাতেও লেখা হয়েছিল বহু লিপি। তবে এই শেষোক্ত উপাদান খুবই সহজে নষ্ট হয়ে যায় বলে এ-ধরনের লিপি এতকাল টিকে থাকে নি ও খননকার্যের সময় পাওয়া যায় নি, মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এখানে মাটির-তৈরি একটি দোয়াত আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশেষ আগ্রহের উদ্রেক ঘটে।

এ-অঞ্চলে পাওয়া পঞ্জায় উৎকীর্ণ বর্ণ বা অক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৪০০'র মতো। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এর মধ্যে বেশির ভাগই হল ধ্বনিনির্দেশক চিহ্ন, তবে কিছু-কিছু আবার ভাবনির্দেশক চিহ্ন বা ভাবলেখও আছে। খোদিত লিপিগুলি সবই অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারের। বিশেষ ধরনে আঁচড় কেটে সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। কালিবাঙ্গায় এমন একটা ভাঙা মাটির পাত্র পাওয়া গেছে যা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা গেছে যে তখন লেখার চল ছিল ডানদিক থেকে বাঁয়ে।

গত কয়েক দশক ধরে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে আসছেন। এ-সম্পর্কে কয়েকটি বিভিন্ন তত্ত্বও প্রচারিত হয়েছে। সুপরিচিত পণ্ডিত বেড্‌রিচ হ্রত্‌স্‌নি হরপ্পা-লিপিকে হিট্টাইট চিত্রলিপির জ্ঞাতি বলে বর্ণনা করেছেন, তবে এই আত্মীয়-সম্বন্ধ অনুসন্ধানে কোনো ফল হয় নি। উৎকীর্ণ লিখনের পাঠোদ্ধার করতে হলে প্রথমেই অপরিহার্য হল সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা ঠিক কোন ভাষায় কথা বলতেন ও লিখতেন তা নির্ণয় করা। বহু সুপরিচিত পণ্ডিত (টি. বারো ও এম. বি. এমেনো সহ) মনে করেন যে ওই অধিবাসীদের ভাষা দ্রাবিড় (আদি-দ্রাবিড়) ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

যে-সমস্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হরপ্পা-সভ্যতার 'লিখিত পাঠ' কম্পিউটর যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন (সোভিয়েত এবং ফিনল্যান্ডের গবেষকরা পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে এই বিশ্লেষণের কাজটি করেছেন) তাঁরাও উপরোক্ত ওই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁদের মতে, এই আদি-ভারতীয় ভাষাকে (অর্থাৎ হরপ্পা-সভ্যতার

'লিখিত পাঠ'এর ভাষাকে) দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম বলে গণ্য করা চলে, তবে এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এটি ভারতের বর্তমানে-প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষাগুলির একটি নয়, এ হল এক আদি-দ্রাবিড় ভাষা। এই ভাষা পুনর্গঠনের কাজ এই বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছেন। হরপ্পা-লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হোত যদি দ্বিভাষার একটি পাঠ, অর্থাৎ দু'টি বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ, একই পাঠযুক্ত একখানি লিখন, পাওয়া যেত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত হরপ্পা-সভ্যতার ও মেসোপটেমিয়ার শহরগুলির মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের ইঙ্গিতবহ তথ্য-প্রমাণসমূহের কথা যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে এমন আশা পোষণ করা আমাদের পক্ষে অসমীচীন হবে না যে এমন একটি দ্বিভাষিক পাঠযুক্ত লিখন হয়তো পাওয়া যাবে।

সিন্ধুর নগর-সভ্যতার অবক্ষয় ও পতন

সাম্প্রতিক কালে খননকার্য চালাবার ফলে হরপ্পা-সভ্যতার ওপর যে-নতুন আলোকপাত ঘটেছে তাতে এই সভ্যতাকে আর অপরিবর্তনশীল ও অনড় বলে গণ্য করা চলে না। হরপ্পা-সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ বিকাশের ব্যাপারটি নিয়ে অনুসন্ধান চালানোর ফলে এই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত শহরগুলির জীবনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের হদিশ মিলেছে। জানা গেছে, বাড়বাড়ন্ত ও সমৃদ্ধির একটা পর্যায়ের পর তাদের জীবনে এসেছিল অবক্ষয়ের একটা যুগ। এই যুগের ছবিটি বিশেষ পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে মোহেন্‌জো-দারো, হরপ্পা, কালিবাঙ্গা. প্রভৃতি শহরে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত তথ্য-প্রমাণ থেকে। দেখা যায়, তথাকথিত এই পরবর্তী যুগে মোহেন্‌জো-দারোয় নির্মাণকার্য ধরাবাঁধা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই চলতে থাকে। আরও দেখা যায়, ওই সময়ের মধ্যে আগেকার বড়-বড় সরকারি অট্টালিকাগুলির কিছু-কিছু ভেঙে পড়েছে, আর তাদের জায়গায় দেখা দিয়েছে ছোট্ট-ছোট্ট বাড়ি। জল-সরবরাহের ব্যবস্থাও ওই সময়ে মেরামতির অভাবে অকেজো হয়ে পড়ছে। হরপ্পাতেও অনেক দালানকোঠা এ-সময়ে পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। আগেকার যুগের তেজীয়ান ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভাঁটা পড়েছে তখন। মৃৎপাত্র উৎপাদনের কায়দাকানুনও তখন বদলেছে, পাত্রের গায়ে নকশা অলঙ্করণের কাজ আগের চেয়ে কম করা হচ্ছে আর অবনতি ঘটেছে মৃৎশিল্পের গুণগত মানেরও।

কিন্তু হরপ্পা-সভ্যতার শহরগুলির অধঃপতন ঘটল কেন? এটি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের একটি বিষয়। দীর্ঘকাল ধরে এ-ব্যাপারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যাখ্যা ছিল এই যে হরপ্পা-আমলের শহরগুলির এবং গোটা হরপ্পা-

্যতারই ধ্বংসের অব্যবহিত কারণ হল আর্য উপজাতিদের আক্রমণ-অভিযান। কিন্তু আরও সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে এখন জানা গেছে যে এখানকার বেশকিছু শহরই ধারেকাছে কোনো বিদেশী উপজাতি-শত্রুর আবির্ভাবের আগেই অভ্যন্তরীণ নানা বিপর্যয়ের কারণে হীনবল হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে চাষের জমিতে লবণতাবৃদ্ধি, বন্যা, রাজপুতানার মরুভূমির সম্প্রসারণ ও সিন্ধুনদের গতিপথ পরিবর্তন উপরোক্ত ওই অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের কয়েকটি।

মোহেন্‌জো-দারো এলাকায় জলানুসন্ধান-বিদ্যাগত গবেষণা চালিয়ে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বহুদিন আগে ওই শহর থেকে স্বল্পদূরবর্তী একটি এলাকা ভূ-স্তরের বিন্যাসের ত্রুটিজনিত এক আলোড়নের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় তারই ধাক্কায় শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা আবার মনে করেন যে মোহেন্‌জো-দারো ধ্বংসের প্রধান কারণ হচ্ছে উপর্যুপরি কয়েকবারের বন্যা। কয়েকবার এইভাবে শহরটি জলে ডুবে যাওয়ায় অবশেষে অধিবাসীরা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় শহর ছেড়ে। এ-ও সম্ভব যে মোহেন্‌জো-দারো ছাড়া আরও কয়েকটি শহর এইভাবে বন্যার ফলে উৎসন্নে যায়। মোহেন্‌জো-দারো ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সম্প্রতি আরও একটি তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। সেটি হল এই যে সিন্ধুনদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে একদা যে-প্রচণ্ড খরা দেখা দেয় তাতে শহরটি দীন ও হীনবল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে বিদেশী আক্রমণকারীদের পক্ষে শহর দখল করে নেয়া সহজতর হয়।

তবে উপরোক্ত এই সমস্ত তত্ত্বকথাই বিশেষ-বিশেষ জনপদ বা শহরের অবক্ষয় ও পতনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, খ্রীস্টপূর্ব আঠারো ও সতেরো শতকে গোটা হরপ্পা-সভ্যতাই কেন ধ্বংস হয়ে গেল তার ব্যাখ্যা কিন্তু এসবের মধ্যে মেলে না। তবে মনে হয় এর সম্ভাব্য একটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে হরপ্পা-যুগের সমাজে প্রধান-প্রধান পরিবর্তন সংঘটনের মূলে ছিল বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে এই সভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণ ও সভ্যতা-বিকাশের দিক থেকে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিকে এর অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে এই সংস্কৃতির লক্ষণীয় বর্বরতা-প্রাপ্তি ও দূষণ। এই শেষোক্ত মতটি অবশ্য আরও অনুসন্ধান ও গবেষণার অপেক্ষা রাখে, তবে ইতিমধ্যেই এ-ব্যাপারটি কিন্তু পরিষ্কার যে অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীই ছিল হরপ্পা-সভ্যতার পতনের ও এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত শহরগুলির অবক্ষয়ের প্রধান কারণ।

কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপের মতো সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও সে-সভ্যতার এই একই ধরনের অবক্ষয় ও পতনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। এ-ব্যাপারটিও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। লোথালে এই অবক্ষয়ের প্রথম লক্ষণগুলি ধরা পড়ে সুদূর খ্রীস্টপূর্ব উনিশ শতকে, আর তারপর পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে এই

বৃহৎ বন্দর-নগরী এবং ততদিনে অভ্যন্তরীণ নানা সংকটে জর্জরিত সিন্ধু-উপত্যকার প্রধান-প্রধান নগরের যোগসূত্র ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে-হতে শেষপর্যন্ত যায় বিলুপ্ত হয়ে। কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে তথাকথিত হরপ্পা-যুগের পর দেখা দেয় নতুন এক হরপ্পা-উত্তর যুগ, আর সেই যুগে স্থানীয় সংস্কৃতি কিছু-পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যদিও তার বিকাশের অবিচ্ছিন্নতায় কোনো বিরতি ঘটে না। খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে হরপ্পা-যুগের সভ্যতার পড়ন্ত অবস্থা কোনোক্রমেই বহিঃশত্রুর আক্রমণের সঙ্গে জড়িত নয়। সিন্ধু-উপত্যকার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এই রকমই হওয়া সম্ভব। সেখানে কয়েকটি শহরের ক্ষেত্রে বিকাশের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায় অবশ্য ওই অঞ্চলে বিদেশী উপজাতিগুলির অনুপ্রবেশের সমকালীন বলে জানা গেছে। তবে এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ওই পর্যায়ে হরপ্পা-শহরটিকে বিদেশীদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে শহরের প্রতিরোধী দুর্গ-ব্যবস্থাও মজবুত করে গড়ে তোলা হয়। হরপ্পায় ও উপরোক্ত ওই সমস্ত শহরে আবিষ্কৃত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন এবং রাস্তার ওপর পড়ে-থাকা মানুষের অস্থি-কঙ্কাল (স্পষ্টতই আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল যে-সমস্ত শহরবাসী তাদের দেহাবশেষ) ইঙ্গিত দেয় যে একদা শহরবাসী ও বহিরাগত শত্রু উপজাতিদের মধ্যে ঘোর লড়াই চলেছিল।

খননকার্যের ফলাফল দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে-সমস্ত উপজাতি সিন্ধু-উপত্যকায় প্রবেশ করেছিল তারা ছিল একাধিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদের মধ্যে ছিল বেলুচিস্তানের কয়েকটি উপজাতি এবং অপর কয়েকটি, যাদের সঙ্গে ইরানের উপজাতিগুলির ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ছিল আরও কিছু উপজাতিগোষ্ঠী, হরপ্পা-সভ্যতার মানুষজনের সঙ্গে জাতিবিচারে যারা পৃথক ছিল না। এরা হরপ্পা-সভ্যতার শহরগুলির ধারেকাছেই বসবাস করত। বিদেশী যে-সমস্ত উপজাতি সিন্ধু-উপত্যকার শহরগুলি আক্রমণ করেছিল, জনসংখ্যার দিক থেকে বেশি ছিল না তারা। কখনও-কখনও এই রকম একেকটি উপজাতির উপস্থিতির চিহ্ন মাত্র একটিই হরপ্পা-যুগের জনবসতিতে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে। তবু একথাও কবুল না-করে উপায় নেই যে এই সমস্ত হানাদার উপজাতি হরপ্পা-সভ্যতার প্রধান নগরকেন্দ্রগুলির পড়তি অবস্থাকে তার চূড়ান্ত পরিণতিতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত হানাদার উপজাতির কিছু-কিছুকে ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীভুক্ত বলেও আখ্যাত করা সম্ভব। তবে সমগ্রভাবে বিচার করলে বলতে হয়, হরপ্পা-সভ্যতার অবক্ষয়ের সঙ্গে ভারতে আর্যদের অনুপ্রবেশকে সরাসরি সম্পর্কিত করার যে-প্রথাসিদ্ধ তত্ত্বটি প্রচলিত আছে তার মৌল পুনর্বিচার প্রয়োজন। অবশ্য ভারতে-যে একদা ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এই বাস্তব সত্যটি কিন্তু এর ফলে খণ্ডিত হচ্ছে না।

মধ্য, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার বাড়বাড়ন্তের যুগে ওই সভ্যতার সীমানার বাইরে ধাতুর ব্যবহার ছিল একেবারে আদিম স্তরে। তাম্রপ্রস্তরযুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এই ধরনের অসমবিকাশ আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মধ্য ও পশ্চিম ভারতে ওই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি তৎকালে বিকশিত হরপ্পা-সংস্কৃতির প্রভাবের প্রমাণ দেয়, তবে দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে তখন ওই প্রভাব ছিল অনেক কম।

কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপের ওই সময়কার জনবসতিগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল উন্নত হরপ্পা-যুগের ঐতিহ্যের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন স্থানীয় নবপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির নানা উপাদানের এক ধরনের মিশ্রণ। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত হরপ্পা-যুগীয় ঐতিহ্যগুলিও ক্রমশ এই অঞ্চল থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

কাথিয়াওয়াড়ের উত্তর-পূর্বে তথাকথিত বানাস সংস্কৃতিভুক্ত (আঞ্চলিক বানাস নদীর নামানুসারে) কিছু জনবসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই বসতিগুলির মধ্যে প্রাচীনতমটি খ্রীস্টপূর্ব ২ হাজার (কিংবা ১৮০০) বছরের পুরনো। উপরোক্ত এই জনবসতিগুলি ওই সময়ের অন্যান্য জনপদ থেকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পাথরের হাতিয়ারের অনুপস্থিতি ('প্রস্তরফলক-নির্মাণ শিল্প' সিন্ধু প্রদেশের হরপ্পা-যুগীয় সংস্কৃতির ও কাথিয়াওয়াড়ের উত্তর হরপ্পাযুগীয় সংস্কৃতির এক সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য) এবং প্রচুর সংখ্যক তামার জিনিসপত্রের উপস্থিতির কারণে। জনপদগুলির অধিবাসীরা বাস করত কিছুটা সেকেলে ধরনের পাথরের ও মাটির তৈরি বাড়িতে। এখানে যে-মৃৎশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে তা কাথিয়াওয়াড়ের তৎকাল প্রচলিত শিল্পের থেকে আলাদা। এখানকার এই বিশিষ্ট সংস্কৃতির ধারক একটি জনপদে হরপ্পা-যুগীয় বসতিগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক একটি ভিত্তিমঞ্চের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে।

নভ্‌দাতলি, নেভাসা, নাসিক ও যোরবেতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা যে-গবেষণা চালিয়েছেন তার ফলে মালব ও মহারাষ্ট্রের প্রাচীনকালের অধিবাসীরা কী ধরনের জীবন যাপন করতেন তার কিছুটা আভাস পাই আমরা। তাম্র-প্রস্তর যুগে এই অঞ্চলের মানুষের পেশা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন, তাঁরা গম, ধান ও কিছু-কিছু ধরনের শিমের চাষ করতেন। ভেড়া আর ছাগল পুষতেন তাঁরা। এখানে খ্রীস্টপূর্ব তেরো শতকের পুরনো এক ভূস্তরে মোটাজাতের রেশম আর তুলোর সুতোর মিশেল-দেয়া এক-টুকরো সুতো পাওয়া গেছে। এ-থেকে জানা যাচ্ছে যে ওই যুগেও

এখানকার মানুষ তাঁতশিল্পের কাজ জানতেন। সিন্ধু-উপত্যকার জনপদগুলির মতো নানা কাজে প্রচুর পরিমাণ পাথরের ফলক ব্যবহৃত হোত এখানেও, এবং তামার তৈরি হাতিয়ার ব্যবহৃত হোত যৎসামান্য। এই অঞ্চলের সকল তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির যা বৈশিষ্ট্য সেই কুমোরের চাকে তৈরি কালো এবং লাল রঙের মৃৎপাত্রও পাওয়া গেছে এসব জায়গায়। ঘরবাড়ি তৈরি হোত স্থিতিশীল উপাদান দিয়ে আর ঘরের দেয়ালে ভেতরে ও বাইরে কাদামাটির প্রলেপ লাগানো হোত। কখনও-কখনও কুঁড়েঘর তৈরি হোত কাঠ দিয়েও। নভ্দাতোলিতে খননকার্যের ফলে তিন ধরনের বাসগৃহ পাওয়া গেছে: গোল, চৌকো ও আয়তক্ষেত্রাকার। এইসব বাসগৃহ ছিল ক্ষুদ্রাকার, সবচেয়ে বড় আকারের ঘরও লম্বা-চওড়ায় সাড়ে চার মিটার × তিন মিটারের চেয়ে বেশি ছিল না। তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে তাম্র-প্রস্তর যুগের সূচনা ঘটেছিল খ্রীস্টপূর্ব সতেরো কিংবা ষোল শতকে।

এ-থেকে আরও দক্ষিণাঞ্চলে—নাসিক এবং যোরবেতে—হরপ্পা-যুগীয় সংস্কৃতির কিছু-কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একই ধরনের মৃৎপাত্র ও ধাতুর তৈরি হাতিয়ারও পাওয়া গেছে এখানে, তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে যত বেশি দক্ষিণের দিকে যাওয়া যায় হরপ্পা-সভ্যতার প্রভাব তত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে দেখা যায়। পূর্ব ভারতের তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় এসব জায়গায়। যোরবে-র তাম্রপ্রস্তরযুগীয় স্তরগুলি খ্রীস্টপূর্ব চৌদ্দ থেকে এগারো শতকের মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

মধ্য-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির উদ্ভব বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এখনও একটি বিতর্কিত বিষয়। এই সংস্কৃতির ইরানীয় উৎস কিংবা এর ওপর ইন্দো-আর্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ তত্ত্ব প্রচারিত আছে। তবে এসবের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় এই মতটি যে মধ্য-ভারতের তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি বিদেশী নানা সংস্কৃতির প্রভাব সত্ত্বেও এই অঞ্চলেরই পূর্ববর্তী নবপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতিগুলি থেকে একদা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত এই অঞ্চলের বাসিন্দা জাতিগোষ্ঠীগুলি জাতিবিচারে ছিল হরপ্পাবাসীদেরই সগোত্র। তবে এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে তাম্র-প্রস্তর যুগে ভারতের একটা বিশাল অংশে তখনও জনবসতির সূত্রপাত ঘটে নি এবং অন্যান্য বহু এলাকায় একমাত্র যে-সমস্ত উপজাতি বাস করত তাদের বিকাশের স্তর ছিল খুবই নিচু।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা পূর্ব ভারতে এক বিশিষ্ট তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি আবিষ্কার করেছেন। এটি হল তথাকথিত 'মজুত তাম্রভাণ্ডার' ও 'গেরিমাটি-রঙের মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃষকরা, তবে শিকার করা

ও মাছধরার পেশাও তখনও পর্যন্ত তাঁদের জীবনে গ্রুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিল। তামার তৈরি বহু বিচিত্র ধরনের হাতিয়ার বানাতেন তাঁরা, যেমন, চ্যাপ্টা ধরনের কুঠার, ছোট-বড় নানা আকারের বাটালি, মাছমারার কোঁচ, ইত্যাদি। এই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচারিত আছে। মধ্য-ভারত থেকে কিছু-কিছু উপজাতি পূর্বাঞ্চলে চলে এসে এই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করেছিল এমন একটি মতকে সমর্থন করেন কিছু-কিছু পণ্ডিত, অন্য কেউ-কেউ মনে করেন এই সংস্কৃতির শিকড় প্রোথিত ছিল হরপ্পা-সংস্কৃতিতে, আবার সুপরিচিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ আর হাইনে-গেল্ডনার মনে করেন 'মজুত তাম্রভাণ্ডার'এর সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা ছিল কয়েকটি আর্য উপজাতি।

তবে সম্প্রতিকালে ভারতে যে-সমস্ত অনুসন্ধান-কার্য চলেছে তা থেকে 'মজুত তাম্রভাণ্ডার'এর সংস্কৃতিতে ক্রমশ বেশি-বেশি নিশ্চিতভাবে মুণ্ডা উপজাতিগুলির পূর্বপুরুষদের সঙ্গেই যুক্ত করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা-অঞ্চলের 'মজুত তাম্রভাণ্ডার'এর এই সংস্কৃতি খ্রীস্টপূর্ব বারো ও এগারো শতকে এ-অঞ্চলের অনেক জনপদেই 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতিকে জায়গা ছেড়ে দেয়। অপর কয়েকটি অঞ্চলে আবার 'মজুত তাম্রভাণ্ডার'এর সংস্কৃতি অনেক দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং বহু পরে হারস্বীকার করে একমাত্র উন্নত সংস্কৃতিগুলির সংস্পর্শে আসার পরেই।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পূর্ব ভারতে এমন সব নতুন তাম্রপ্রস্তরযুগীয় বসতি পাওয়া গেছে যাদের সঙ্গে 'মজুত তাম্রভাণ্ডার'এর সংস্কৃতির কিছুমাত্র মিল নেই। যেমন, উত্তর বিহারের চিরান্দে দেখা গেছে যে সেখানকার তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি (কালো ও লালরঙের মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত) সরাসরি স্থানীয় নবপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি থেকে বিকশিত হয়ে উঠেছে। চিরান্দের কালো ও লালরঙে রঞ্জিত মৃৎপাত্রের সঙ্গে পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের তাম্রপ্রস্তরযুগীয় মৃৎপাত্রের মিলও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত হয়েছে যে চিরান্দের পরবর্তী তাম্রপ্রস্তরযুগীয় স্তরগুলি খ্রীস্টপূর্ব আট শতকে উদ্ভূত হয়েছিল। এর অল্প কিছুকাল পরেই লোহার এবং তথাকথিত উত্তরাঞ্চলীয় কালো রঙপালিশ-করা মৃৎপাত্রের আবির্ভাব ঘটে এই অঞ্চলে।

সবকিছু হিসেবের মধ্যে ধরলে বলতে হয়, নবপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগগুলিতে অধিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে-বৈচিত্র্য ও বিকাশের অসমতা হয় তা দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের পরবর্তী গতিপথকে লক্ষণীয়রকমে প্রভাবিত করে।

ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীসমূহ ও গঙ্গা-উপত্যকার সভ্যতা

‘আর্য’-আগমনের প্রশ্ন’

এ-শতাব্দীর বেশ কয়েকটি দশক ধরে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভারতে ‘আর্য’-আগমনের প্রশ্ন’টি নিয়ে বিতর্ক চালিয়ে আসছেন। তাঁরা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন, কোথা থেকে এবং কীভাবেই-বা ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি একদা ভারতে এসেছিল। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল, এ-প্রশ্নটিও বিতর্কিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

কিছু-কিছু পণ্ডিত আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশকে দেখেছেন অতি উন্নত আর্যদের দ্বারা পশ্চাৎপদ আদিবাসীদের পদানত করা হিসেবে। আর্যরাই নাকি ভারতে সভ্যতার আমদানি ঘটায় এবং উন্নত এক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে এদেশে। এই জাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন ব্যাখ্যা-অনুযায়ী জোর দিয়ে বলা হয় যে ‘জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ’ আর্যরা ও ভারতের তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে নাকি স্পষ্ট এক জাতি-বৈষম্য বর্তমান ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে স্বনির্ভর বিকাশ ও অগ্রগতির যে-কোনো সম্ভাবনাকেই সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয় এই সমস্ত ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানবিরোধী এইসব তত্ত্বকথা-অনুযায়ী বলতে হয় যে একমাত্র আর্যদের আবির্ভাবের পরেই ভারতে অতি উন্নত এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, মানব-সভ্যতা সুনির্দিষ্ট এক চেহারা নেয়।

পরবর্তীকালে সিন্ধু-উপত্যকায় উন্নত এক সভ্যতা হওয়ায় বহু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাঁদের পূর্ববর্তী মত পরিবর্তনে বাধ্য হন, তবে উপরোক্ত ওই অবৈজ্ঞানিক ‘তত্ত্বকথাগুলি’র প্রতিধ্বনি থেকে-থেকে শোনা যায় এখনও। একমাত্র যে-সমস্ত জনগোষ্ঠীকে আর্য নামে অভিহিত করা চলে তারা হল প্রাচীন ইরানীয় ও প্রাচীন ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠী। এরাই একদা নিজেদের আর্য আখ্যা দিয়েছিল এবং যে-সব অঞ্চলে এদের বাস ছিল তাদের আখ্যা দিয়েছিল ‘আর্যভূমি’। আসলে ‘আর্য’ শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে ‘অরি’ শব্দ থেকে, বৈদিক যুগে ‘অরি’ অর্থে বোঝাত ‘সাহসী’ কিংবা ‘বিদেশী’, আর ‘আর্য’ অর্থে ‘নবাগত’ কিংবা ‘নবাগতের প্রতি পক্ষপাতী’। পরবর্তী কালে অবশ্য ‘আর্য’ শব্দের অর্থ দাঁড়িয়ে যায় ‘মহৎ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি’।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে একদা এমন একটা সময় ছিল যখন প্রাচীন ইরানীয় ও প্রাচীন ভারতীয়রা একত্র বসবাস করতেন, তাঁরা ছিলেন তথাকথিত ইন্দো-ইরানীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। এর প্রমাণ মেলে এই দুই জাতির ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ও তাদের শাস্ত্র-সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে (প্রাচীন ইরানীয়দের ‘আবেস্তা’ ও প্রাচীন ভারতীয়দের ‘ঋগ্বেদ’ থেকে)।

তাছাড়া এই দুই জাতির ধর্মবিশ্বাস এবং তাদের বহু প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি, আচারবিচারের মিল থেকেও এর প্রমাণ মেলে। আর্যদের আদি বাসভূমি, অর্থাৎ ইরানীয় ও ভারতীয়দের পূর্বপুরুষের বাসভূমি, কিছু-কিছু পণ্ডিতের মতে ছিল মধ্য এশিয়ায়, আবার অপর কিছু পণ্ডিতের মতে ছিল দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমিতে। তদুপরি ঠিক কোন-কোন পথ ধরে ইরানীয়দের পূর্বপুরুষরা ইরানে ও ভারতীয়দের পূর্বপুরুষরা ভারতে পৌঁছে ছিলেন সে-ব্যাপারেও কোনো ঐকমত্য নেই। এটা খুবই সম্ভব যে এই দীর্ঘস্থায়ী জন-স্থানান্তরণের ব্যাপারটা চলেছিল দুই বা ততোধিক যাত্রাপথ ধরে এবং বেশ কয়েকটি তরঙ্গের দমকে।

দুঃখের বিষয়, অপর একটি প্রশ্ন যার এখনও পর্যন্ত কোনো সদুত্তর মেলে নি তা হল ইন্দো-আর্যরা ভারতের কোন অঞ্চলে প্রথম অনুপ্রবেশ করেন। প্রাচীন ইন্দো-আর্যদের লিখিত পুঁথি যা এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে তা থেকে এটা স্পষ্ট জানা গেছে যে তাঁরা পূর্ব পঞ্জাবে এবং যমুনা ও গঙ্গা নদীর ধারাদুটির উত্তরাংশ-বরাবর বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ-থেকে বোঝা যায় যে ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি হরপ্পা-সভ্যতার প্রধান নগরকেন্দ্রগুলি যে-অঞ্চলে অবস্থিত ছিল সে-অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নি। বস্তুত, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারাদির ফলে যে কাল-পরম্পরার হদিশ পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় যে সিন্ধু-সভ্যতার নগরকেন্দ্রগুলির অবক্ষয় ও ইন্দো-আর্যদের ভারত-আগমনের মধ্যে সময়ের বেশকিছু ফাঁক রয়ে গেছে। সিন্ধু-প্রদেশে হরপ্পা-সভ্যতার পতন ঘটে ইন্দো-আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের কয়েক শতাব্দী আগেই।

ঋগ্বেদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ

আদিতম ইন্দো-আর্যদের আকর সাহিত্য হল ঋগ্বেদ। বেশির ভাগ আধুনিক বিশেষজ্ঞই এই আদি বেদ খ্রীস্টপূর্ব এগারো কি দশ শতকে লিখিত বলে নির্দেশ করেছেন। এটা হল সেই সময় যখন ঋগ্বেদের প্রাচীন স্তোত্রগুলি প্রথম সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী পুঁথিগুলি—অর্থাৎ পরবর্তী সংহিতা, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণসমূহ—লিখিত হয় খ্রীস্টপূর্ব আট থেকে ছয় শতকের মধ্যে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৌতূহলোদ্দীপক নানা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে বৈদিক যুগের ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীগুলি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ হস্তগত হয়েছে আমাদের। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা (যেমন, সর্বশ্রী বি. বি. লাল, বি. কে. থাপর, আর. এস. গৌর ও জে. পি. যোশী) এক 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে এই

সংস্কৃতি একদা বিস্তার লাভ করেছিল সমগ্র পঞ্জাব, যমুনা ও গঙ্গা নদীর ধারাদুটির উত্তরাংশ-বরাবর ও নদীদুটির উপত্যকাগুলিতে (আধুনিক এলাহাবাদ শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা সহ) এবং উত্তর-পূর্ব রাজস্থান জুড়ে। অর্থাৎ, আদি বৈদিক যুগে ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি যে-সব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল সেই গোটা তল্লাট জুড়েই ছড়িয়ে ছিল উপরোক্ত সংস্কৃতি। উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদদের লিখিত প্রবন্ধ-সংকলনে ভৌগোলিক তথ্যসমূহের যে-বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে তার ফলে যে-অঞ্চলের সীমানার মধ্যে ঋগ্বেদের নানা সূক্ত একদা রচিত হয়েছিল সেই অঞ্চলটিকেও নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। জানা গেছে যে এই অঞ্চলটি হল একালের উত্তর-পূর্ব পঞ্জাব। কিছু-কিছু পণ্ডিত আবার ঋগ্বেদ রচনার আরও সুনির্দিষ্ট একটি জায়গা নির্দেশ করেছেন—তা হল পঞ্জাবের আম্বালা জেলা।

অত্রাঞ্জিখেরায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারাদির ভিত্তিতে বলতে গেলে, 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতি খ্রীস্টপূর্ব বারো কিংবা এগারো শতকের চেয়ে বেশি পুরনো নয়। এই সময়কাল আবার ঋগ্বেদের রচনাকালের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন যে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি যখন রচনা করা হচ্ছে সেই যুগের ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যান্য খননক্ষেত্রে (যেমন, হস্তিনাপুর ও নোহ্-তে) তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে জানা গেছে যে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতি খ্রীস্টপূর্ব নয় বা আট শতকের সঙ্গে সম্পর্কিত রীতিমতো পুরাকালের একটি ব্যাপার (শ্রী ডি. পি. আগরওয়ালের রচনা দ্রষ্টব্য)। এর অর্থ, গঙ্গা ও যমুনা নদীর উত্তরাংশের এলাকায় উপরোক্ত এই সংস্কৃতির আবির্ভাবকে সংশ্লিষ্ট অন্য নানা ব্যাপারের সঙ্গে সমকালের আধারে ধরা দরকার। কিছু-কিছু পণ্ডিত চেষ্টা করেছেন 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর যুগের বৈষয়িক সংস্কৃতির নানা উপাদানের সঙ্গে পরবর্তী বেদসমূহ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণের সাদৃশ্য উপস্থাপনের। অর্থাৎ, তাঁরা চাইছেন এই বিশেষ সংস্কৃতিকে পরবর্তী যুগের বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির—খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধের ইন্দো-আর্যদের—সঙ্গে যুক্ত করে দেখাতে (সর্বশ্রী আর. এস. শর্মা ও এ. ঘোষের রচনাবলী দ্রষ্টব্য)।

বর্তমানে এটুকু বলা চলে যে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতি বিভক্ত ছিল কয়েকটি স্তরে এবং সেগুলি যুক্ত ছিল প্রথমে পূর্ব-পঞ্জাব এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীর উত্তরাংশ-বরাবর বসতি স্থাপন করা ও পরে দক্ষিণের দিকে অগ্রসরমান নানা বৈদিক আর্য উপজাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে।

এ-প্রসঙ্গে বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হল, সোয়াট-এলাকায় ইতালীয় ও পাকিস্তানী প্রত্নতত্ত্ববিদদের সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলাফল। সোয়াটে খ্রীস্টপূর্ব

আনুমানিক নয় বা আট শতকের পুরনো কিছু সমাধিক্ষেত্র পাওয়া গেছে। এই সমাধিক্ষেত্রগুলিতে পাওয়া ধূসর ও লালরঙের মৃৎপাত্রের সঙ্গে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর কিছু সাদৃশ্য পাওয়া গেছে বলে কোনো-কোনো পণ্ডিত মনে করছেন। লোহার তৈরি অল্প-কিছু হাতিয়ার, ইত্যাদিও পাওয়া গেছে এখানে। ধরে নেয়া যেতে পারে যে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষদিকে ভারতে প্রবেশকারী একটি আর্য উপজাতি-গোষ্ঠীই ছিল সোয়াটের এই সমাধিক্ষেত্রগুলির মালিক।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পঞ্জাব ও হরিয়ানায় এমন সমস্ত জনবসতি আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে দেখা গেছে যে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতি শেষযুগের হরপ্পা-সংস্কৃতির স্তরগুলির ওপর আরোপিত। অতএব এমন ধারণা পোষণ করার কারণ আছে যে এই বিশেষ অঞ্চলে ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলির আবির্ভাব পর্যন্ত হরপ্পা-যুগীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল।

নতুন-নতুন খননকার্যের ফলে এখন আরও বেশি সুনিশ্চিতভাবে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতির স্রষ্টাদের বৈষয়িক সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে (পঞ্জাবে ও উত্তর হরিয়ানায়) বৈদিক আর্য উপজাতিগুলি ব্যবহার করত তামার তৈরি হাতিয়ার এবং একমাত্র এর পরেই, দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে সরে আসার পর, তাদের মধ্যে লোহার ব্যবহার শুরু হয় (খ্রীস্টপূর্ব নয় কিংবা আট শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে)।

ইন্দো-আর্যদের সম্প্রসারণ ও স্থানীয় সংস্কৃতিসমূহ

বেদসমূহ ও অন্য নানা প্রত্নতাত্ত্বিক আকর উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহের ফলে আর্য উপজাতিগুলির পূর্বাঞ্চলের দিকে অভিযান এবং গঙ্গা-উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের অনুপ্রবেশের একটি সাধারণ চিত্র আমরা পাচ্ছি। অবশ্য এটা ছিল কয়েক শতাব্দীব্যাপী এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। এই যুগপর্বে একদিকে যেমন ওইসব অঞ্চলের স্থানীয় উপজাতিদের সঙ্গে তেমনই বিভিন্ন আর্য উপজাতিদের নিজেদের মধ্যেই বহুতর সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির বক্তব্য থেকেও আমরা নির্ধারণ করতে পারি প্রাচীন ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি ঠিক কোন এলাকা জুড়ে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র নদী ছিল সরস্বতী। এছাড়া সিন্ধু, গোমল এবং পঞ্জাবের অপর কয়েকটি নদীর নামও উল্লিখিত আছে ওইসব সূক্তে। তবে গঙ্গানদীর নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায় মাত্র একবার, তার দশম মণ্ডলে। ঋগ্বেদীয় আর্য উপজাতিদের ভৌগোলিক জ্ঞান সম্বন্ধেও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যায় ওই গ্রন্থে। দেখা যায় তৎকালীন আর্যরা সকলেই হিমালয় পর্বতের সঙ্গে

সুপরিচিত, কিন্তু বিন্ধ্য পর্বতমালার সঙ্গে তাঁরা তখন পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না, কেননা ওই পর্বতের কথা সূক্তগুলির কোথাও উল্লিখিত নেই। বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সংগ্রহগুলিতে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা উল্লেখ আছে।

ঘন জঙ্গলে-ঢাকা অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসরণ মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জঙ্গল কেটে সাফ করে এবং পথের বাধা গাছপালা, বনজঙ্গল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে এগোতে হচ্ছিল তাদের। 'শতপথ ব্রাহ্মণ'এ এ-সম্বন্ধে এক কৌতূহলোদ্দীপক উপাখ্যানের সাক্ষাৎ পাই আমরা। এই উপাখ্যানটিতে বলা হয়েছে যে অগ্নিদেবতা সরস্বতী নদী (পূর্ব পঞ্জাবে) এবং সদানীর নদের (স্পষ্টতই পশ্চিম বিহারের গণ্ডক নদের কথা বলা হচ্ছে এখানে) মধ্যবর্তী ভূখণ্ড দগ্ধ করে দিচ্ছেন এবং রাজা মাধব বিদেঘ এই ত্রাণকর্তা অগ্নিকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন পূর্বদেশে। এই উপাখ্যান অনুযায়ী উপরোক্ত রাজা ও তাঁর প্রজাকুল এমন কি সদানীর নদেরও পূর্বদিকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত জমি-জায়গা দখল করে নিতে সমর্থ হচ্ছেন। এই বেদোক্ত উপাখ্যান থেকে আমরা ইন্দো-আর্যদের অগ্রগমনের সম্ভাব্য পথের নির্দেশ পাচ্ছি এবং জানতে পারছি যে ব্রাহ্মণগুলি রচনার কালে বৈদিক আর্য উপজাতিগুলি ভারতের সবচেয়ে পূর্বদিকের যে-অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল তা হল বিদেহ (বা বর্তমান বিহারের উত্তরাঞ্চলীয়) এলাকা।

স্বভাবতই ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ইন্দো-আর্যদের বসতি স্থাপন সবসময়ে একই ধরনে সাধিত হয় নি এবং এ-উপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসী উপজাতিদের সঙ্গে তাদের সংযোগসাধনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একেক জায়গায় একেক ভাবে সমাধিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় যে পঞ্জাবে আর্যদের বোঝাপড়া করতে হয়েছে প্রধানত দ্রাবিড় উপজাতিগুলির সঙ্গে। এককালের শেষোক্ত এই উন্নত সংস্কৃতির কিছু-কিছু প্রথা ও আচারগত ঐতিহ্য এখনও পর্যন্ত পঞ্জাবের কোনো-কোনো অঞ্চলে টিকে থাকায় মনে হয় আর্য গোষ্ঠীগুলি ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠা একদা সম্ভব হয়েছিল। পূর্ব পঞ্জাবের কিছু-কিছু অংশে আর্যরা স্থানীয় উপজাতিদের তরফ থেকে তেমন কোনো গুরুতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হন নি, ফলে তাঁরা নতুন-নতুন ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করতে-করতে দ্রুত এখান থেকে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যান। আর এর ফলে বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির ভাষা দ্রাবিড় ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে। ঋগ্বেদ ও অন্যান্য সংহিতার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে ধরা পড়ে যে দ্রাবিড় ভাষাসমূহ ইন্দো-আর্য ভাষাগুলিকে লক্ষণীয়ভাবে একদা প্রভাবিত করেছিল, যদিও তাদের মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রণের কাজটা চলেছিল অল্প সময়ের জন্যে।

ইন্দো-আর্য উপজাতিসমূহ এবং তৎকালে দেশের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী মুণ্ডা

উপজাতিগুলির মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার কাজটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনে। গঙ্গা-উপত্যকায় এই পরস্পর-অঙ্গীকরণের ব্যাপারটা পঞ্জাবের মতো অত দ্রুত ঘটে নি। বৈদিক আর্য উপজাতিগুলি এই সময়ের মধ্যে বিকাশের অপেক্ষাকৃত এক উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিল, নিজেরাই আগের চেয়ে বেশি 'ভারতীয়' হয়ে উঠেছিল তারা (ইতিমধ্যে তারা স্থানীয় ভারতীয় জনসাধারণের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল এবং তার অনেকখানিই আত্মস্থ করে নিয়েছিল)। বৈদিক আর্য উপজাতিরা বহু মুণ্ডা উপজাতি-গোষ্ঠীকে গভীর জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন এবং বেশ দীর্ঘ সময় ধরে শেষোক্তদের সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও ইন্দো-আর্যরা মুণ্ডাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে নি। এ-কারণে বৈদিক সংস্কৃতের ওপর মুণ্ডা ভাষাগুলির (মুণ্ডা উপজাতিগুলির অন্তঃস্তরের) প্রভাব লক্ষণীয়রকম কম দেখা যায়।

ওই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকেও এই একই চিত্র ফুটে ওঠে। কিছু-কিছু জনবসতিতে বহু পণ্ডিত যাকে বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন সেই 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র' পাওয়া গেছে মধ্য ও পশ্চিম ভারতের উপজাতিগুলির (এরা আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত) তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসূচক কালো ও লাল মৃৎপাত্রের স্তরের ওপরের স্তরে। অথচ, আগেই বলেছি, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় সম্প্রতিকালে খননকার্য চালিয়ে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতি ও শেষযুগের হরপ্পা-সংস্কৃতির (যে-সংস্কৃতির স্রষ্টারা দ্রাবিড়-ভাষাভাষী উপজাতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের প্রমাণ ধরা পড়েছে। অন্যান্য কিছু-কিছু জনবসতিতে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতি 'মজুত তাম্রভাণ্ডার'এর সংস্কৃতিকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছে বলে দেখা গেছে, অথচ এই শেষোক্ত সংস্কৃতি ছিল খুব সম্ভব পূর্ব ভারতের প্রাচীন মুণ্ডা উপজাতিগুলিরই সংস্কৃতি। এছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদরা এমন আরও বহুসংখ্যক জনবসতির সন্ধান পেয়েছেন যেখানে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্বতন সংস্কৃতিগুলির কোনোরকম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি।

যে-সমস্ত এলাকায় আর্য উপজাতিরা এককালে উন্নত সংস্কৃতি ছিল এমন সব ঐতিহ্যের অবশেষের সংস্পর্শে এসেছিল সেখানে আর্যদের নিজেদের সাংস্কৃতিক বিকাশও ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত দ্রুততালে, যেমন দ্রুত ঘটেছিল স্থানীয় উপজাতিগুলির সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ ও তাদের পূর্বাঞ্চল অভিমুখে যাত্রা। কিন্তু, অপরপক্ষে, যে-সমস্ত এলাকায় আর্যরাই ছিল কার্যত 'প্রথম বসতকারী' সেখানে বসতি স্থাপন করতে যেমন তাদের অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লেগেছিল, তেমনই এর ফলে এই নব আগন্তুকদের সংস্কৃতির মোটামুটি বিকাশও ঘটেছিল ধীরেসুস্থে।

ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি উত্তর ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্তে অগ্রসর

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (পরবর্তীকালে একইরকম ভাবে তারা দক্ষিণ ভারতেও অনুপ্রবেশ করেছিল) বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনও ক্রমশ উন্নত হয়ে চলল। বেদের পুথিগুলিতেও দেখা গেল এর প্রতিফলন: এক্ষেত্রে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হল গোড়ার দিককার বৈদিক সংহিতাগুলির সঙ্গে বৈদিক যুগের পরবর্তী পর্যায়ে রচিত পুথিগুলির তুলনামূলক আলোচনা। এছাড়া বৈদিক আর্য সমাজের কাঠামোয় উপরোক্ত সব পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাববিস্তার করেছিল ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীগুলি ও স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রকৃতিকেও।

ফলে ক্রমশ দেখা দিল এক নতুন সংস্কৃতি যা নিজের অঙ্গীভূত করে নিল আর্য ও স্থানীয় উপজাতিগুলির মিলিত সাংস্কৃতিক সাফল্যনিচয় এবং শিগ্‌গিরই তা হয়ে দাঁড়াল উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির এক সর্বজনীন সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে বিদেশ থেকে আমদানি-করা নিছক ইন্দো-আর্য সংস্কৃতি তো বলা চলেই না, এমন কি ঋগ্বেদের যুগের বৈদিক আর্য উপজাতিসমূহের সংস্কৃতি আখ্যাও একে দিতে হয় শর্তসাপেক্ষে, কারণ এ-সংস্কৃতি ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছিল খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের সুনির্দিষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতি।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতি 'উত্তরাঞ্চলীয় কালো রঙপালিশ-করা মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতিকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল প্রধানত খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে (খ্রীস্টপূর্ব ছয় থেকে দুই শতকের মধ্যে)। যদিও এই শেষোক্ত সংস্কৃতি বহুদিক থেকেই পূর্ববর্তী যুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইত্যাদির কাছে ঋণী, তবু ওই সময়ের মধ্যে এটি আর বৈদিক ইন্দো-আর্যদের সংস্কৃতি ছিল না, এটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল উত্তর ভারতের ভারতীয় উপজাতিসমূহের সংস্কৃতি। তৎকালীন যে-সমস্ত জনবসতিতে এই সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে সেগুলি ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে পঞ্জাব থেকে গঙ্গার দক্ষিণাংশের তীর-বরাবর। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি গঙ্গা-উপত্যকার প্রধান অঞ্চলগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিল, বলতে গেলে প্রায় গোটা উত্তর ভারত জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল তারা। উপরোক্ত ওই সময়টিকেই আবার যথার্থ বৈদিক যুগের শেষ ও পরবর্তী মগধ-মৌর্য যুগের সূচনার সীমারেখা বলে গণ্য করা চলে।

বৈদিক আর্য উপজাতিসমূহের প্রধান-প্রধান জীবিকা

বৈদিক যুগের মানুষের প্রধান দুটি জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন। কৃষির অগ্রগতি এবং জনসমষ্টির অধিকাংশের পক্ষে জমি আবাদ করার ভিত্তিতে সুস্থিত জীবনযাত্রায় উত্তরণ তখন সম্ভব হয় লোহার-তৈরি হাতিয়ার আবির্ভাবের

ফলে। উৎপাদনের নানা ধরনের কাজে তখন লোহার ব্যবহার ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করলে বলতে হয়, খ্রীস্টপূর্ব এগারো শতকেও উত্তর ভারতে স্বল্প পরিমাণে লোহা ব্যবহৃত হোত, তবে এই ধাতুর ব্যবহার বহুলপ্রচলিত হয় তারও বেশ কয়েক শতাব্দী পরে (পণ্ডিতেরা মনে করেন যে গঙ্গা-উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে লোহার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হয় খ্রীস্টপূর্ব সাত শতকে)। সম্ভবত ঋগ্বেদের রচয়িতারা লোহার ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তবে ওই সময়ে লোহাকে যে ঠিক কোন নামে আখ্যাত করা হোত তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও মতভেদ রয়ে গেছে (সম্ভবত তখনই 'অয়স্' শব্দে লোহা বোঝাত), পরবর্তী বেদগুলিতে অবশ্য ব্যবহৃত হয়েছে 'শ্যাম' (বা কৃষ্ণবর্ণ) 'অয়স্' শব্দ দুটি।

লোহার তৈরি হাতিয়ার গড়তে পারার পর আর্য উপজাতিগুলির পক্ষে গঙ্গা-উপত্যকার অরণ্য-অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা, জমির চাষ-আবাদ করা এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সহজ হয়ে দাঁড়াল। লোহার ব্যবহার জন্ম দিল আরও উন্নত ধরনের কারিগরি বিদ্যার। এর আগে জমি চাষ করা হোত কাঠের লাঙল ও নিড়ানি দিয়ে এবং ফসল কাটা হোত পাথরের ফলা-লাগানো কাস্তে দিয়ে। কিন্তু অতঃপর আদিম ধরনের কাঠের লাঙলের পরিবর্তে প্রচলন ঘটল লোহার ফাল-লাগানো লাঙলের। হাতিয়ারের এই উন্নতির ফলে পাথুরে মাটিতে আবাদ করার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিল। বৈদিক সাহিত্যে জমিতে লাঙল দেয়া, বীজ বোনা, ফসলকাটা ও ফসল মাড়াই করা সহ নানা ধরনের কৃষি-সংক্রান্ত কাজের উল্লেখ আছে। এমন কি ঋগ্বেদেই আমরা পাই 'অর্গলবদ্ধ' জল ও জলচক্রের উল্লেখ, যা নাকি জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। বৈদিক সংহিতাগুলিতেও বিশেষ ধরনের জলসেচের উপযোগী খালের উল্লেখ দেখা যায়।

ওই যুগের মানুষ যব, ধান, গম ও শিম সহ বহুসংখ্যক খাদ্যশস্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল। (খ্রীস্টপূর্ব এগারো থেকে নয় শতকের মধ্যেকার 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত জনবসতিগুলিতে খননকার্যের ফলে ধান এবং গমের দানা পাওয়া গেছে।) ব্যাপকহারে ধানের চাষ দেখা দেয় প্রায় সারা গঙ্গা-উপত্যকা জুড়ে ইন্দো-আর্য উপজাতিদের বসতি স্থাপনের ফলে। বেশকিছু সংখ্যক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন যে ভারতে আসার আগে আর্যরা ধানের চাষ করত না, একমাত্র ভারতের স্থানীয় উপজাতিদের কাছ থেকেই ধানচাষের কায়দাকানুন রপ্ত করে তারা।

কৃষিকাজ ছাড়াও পশুপালন ছিল বৈদিক আর্য উপজাতিদের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি জীবিকা। বেদগ্রন্থগুলিতে বারে-বারে একথার উল্লেখ রয়েছে যে গৃহপালিত পশুপালের মধ্যেই নিহিত মানুষের সকল ঐশ্বর্যের প্রধান উৎস। বৈদিক সূক্তগুলির রচয়িতারা বারে-বারে দেবতাদের সমীপে এই প্রার্থনাই জানাচ্ছেন

যে মানুষের ওপর অজস্র গোধন দানের করুণা বর্ষণ করা হোক; আরও অধিক সংখ্যক গোধন সংগ্রহের একটা উপায় যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া তা-ও বলছেন তাঁরা। বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রধান কারণই ছিল এই পরস্পরের গৃহপালিত পশুহরণ। বেদসমূহে 'অঘ্ন্য' (অর্থাৎ বধের অযোগ্য বা অবধ্য) বলতে প্রায়ই বোঝানো হোত গোরুকে। সম্ভবত বৈদিক আর্য সমাজের ওই পর্যায়ে গোরুকে পবিত্র প্রাণী হিসেবে গণ্য করারই প্রতিফলন এটি। ওই সময়ে গৃহপালিত প্রাণিকুল ও মাঠের ফসল নানা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে বিশেষ ধরনের যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হোত। হস্তিনাপুরে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপাত্র'এর ভূস্তরে খননকার্য চালিয়ে গৃহপালিত ষাঁড়, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর ও ঘোড়ার হাড় পাওয়া গেছে।

ওই যুগে যানবাহন বলতে ছিল বলদে-টানা গাড়ি ও ঘোড়ায়-টানা রথ।

বৈদিক আর্য উপজাতিগুলি বাস করত ছোট-ছোট প্রাকারবেষ্টিত জনবসতিতে। গঙ্গা-উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে এই বসতিগুলির সঙ্গে হরপ্পা-সভ্যতার অন্তর্গত বড়-বড় শহরগুলির মিল ছিল সামান্যই। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে যে-সব শহরের (বা 'পুর'এর) উল্লেখ আছে সেগুলি বড় ধরনের গ্রামের সঙ্গেই বেশি তুলনীয়। এই 'পুর'গুলি তৈরি হোত কাঠ কিংবা খড়মেশানো কাদামাটি-দিয়ে-গড়া ছোট-ছোট বসতবাড়ি ও কালেভদ্রে পাথরের তৈরি বাড়ি দিয়ে, আর মাটির তৈরি প্রাকার দিয়ে ঘেরা থাকত শহরগুলি। স্পষ্টতই এই ধরনের প্রাকার একেবারেই স্থায়ী বা ঘাতসহ ছিল না, বেদের সূক্তগুলিতে প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যায় যে 'পুর'গুলি শত্রু-কবলিত হচ্ছে ও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কৌশাম্বীতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদদের খননকার্যের ফলে যা জানা গেছে তা থেকে মনে হয় যে হরপ্পা-যুগের গৃহনির্মাণ-শিল্পের কৃৎকৌশল, ইত্যাদির কিছু-কিছু পূর্ব ভারতের বৈদিক আর্য উপজাতিদের জানা থাকা সম্ভব, তবে ওই কৃৎকৌশল এই শেষোক্ত উপজাতিদের গৃহনির্মাণশিল্পের ওপর নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। (সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শ্রী এ. ঘোষের মতো কিছু-কিছু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ বৈদিক আর্য উপজাতিদের মধ্যে হরপ্পা-যুগের গৃহনির্মাণের কৃৎকৌশল সম্বন্ধে অবগতির ব্যাপারটি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন যে কৌশাম্বীর দুর্গপ্রাকার বহু শতাব্দী পরে তৈরি হয়েছিল।)

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আরও জানা গেছে যে গঙ্গা-উপত্যকার নগরকেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নানাবিধ কারুশিল্পেরও অগ্রগতি ঘটেছিল। বেদগ্রন্থগুলিতেও নানাবিধ কারুশিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন, কামার, কুমোর, ছুতোর, মণিকার, অস্ত্র-নির্মাতা, ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা ছিল ছুতোর এবং কামারের, কারণ তাঁরা চাষের যন্ত্রপাতি ও

অস্ত্রশস্ত্র বানাতেন এবং বাড়ি তৈরি করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ওই সময়ে কেবল যে বিভিন্ন উপজাতি ও তাদের নগর-জনপদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল তা-ই নয়, বিদেশের সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল বাণিজ্য। সম্ভবত সমুদ্রপথেই গড়ে উঠেছিল তা। বৈদিক সূক্তগুলিতে এক শো-দাঁড়ওয়ালা সমুদ্রগামী জাহাজের উল্লেখ আছে আর উল্লেখ আছে সমুদ্রে নিহিত অতুল ঐশ্বর্যের। নদীপথে যাতায়াতের জন্যেও তখন বড়-বড় নৌকোর চলন থাকা সম্ভব। ক্রমশ এইসব নগর-বসতিতে দেখা দেয় পেশাদার ব্যবসায়ীদের বিশিষ্ট একেকটি গোষ্ঠী।

সম্পত্তির মালিকানা ও সামাজিক পদমর্যাদার পার্থক্যজাত অসাম্য

বৈদিক আর্য সমাজে ইতিমধ্যেই সম্পত্তির মালিকানার ওপর ভিত্তি করে অসাম্য দেখা দিয়েছিল। সমাজে প্রচুর গৃহপালিত পশুর মালিক ধনী উচ্চ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল অত্যন্ত দরিদ্র জনসমষ্টির স্তরগুলি। বেদগ্রন্থগুলিতেও থেকে-থেকে ধনী এবং দরিদ্র মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়, দেখা যায় ধনীরা বলিদানের জন্যে চমৎকার সব প্রাণী উৎসর্গ করছেন আর মুক্তহস্তে দান করছেন পুজোর নানাবিধ উপচার-উপহারাদি, অন্যপক্ষে সাধারণ গ্রামবাসীরা দিচ্ছেন দীন নানা উপচার। ঋগ্বেদে গবাদি পশুর গায়ে ছাপ দেয়ার উল্লেখ আছে, স্পষ্টতই বোঝা যায় কোন গৃহপালিত পশু কার মালিকানাধীন এটা বোঝানোর জন্যেই এই ছাপ দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল।

বৈদিক রচনায় (বিশেষত অপেক্ষাকৃত পরবর্তী বৈদিক যুগের রচনাগুলিতে) ভূমিদান ও ভূমিক্রয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণাদি পাওয়া যায়, যদিও তখন সম্পত্তির অধিকার ছিল বহুপরিমাণে 'গোষ্ঠীর ইচ্ছা' সাপেক্ষ। চাষের অধীন ভূখণ্ড উপজাতি-গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হোত তখন, আর এর ফলে সম্পত্তির অধিকার ও সামাজিক পদমর্যাদার পার্থক্যের ভিত্তিতে সামাজিক অসাম্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার পথ সুগম হয়ে উঠেছিল। আবার এ-কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের প্রশ্নাদিও, জমির ওপর অধিকারের দাবি নিয়ে বিরোধ ঘনিয়ে উঠতে লাগল ব্যক্তিবিশেষদের মধ্যে, এমন কি গোটা গোষ্ঠীর মধ্যেই। এইভাবে ক্রমশ উপজাতি-গোষ্ঠীর কিছু-কিছু সদস্য ধনী হয়ে উঠলেন এবং এককালে যা ছিল ঐক্যবদ্ধ সমাজ তার মধ্যে দেখা দিতে লাগল বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত একেকটি সম্প্রদায়। এইসব সদস্য এমন কি বহু দাসের (বা ক্রীতদাসের) মালিকও হয়ে উঠলেন, অথচ ওই একই সঙ্গে দারিদ্র্যদশায় পতিত সমাজের অন্যান্য সদস্য

ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে নিজেদেরই উপজাতি-গোষ্ঠী ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে অপরের অধীন হয়ে পড়লেন।

বৈদিক আর্য সমাজে এই ক্রীতদাস-প্রথার আবির্ভাব স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যের আবির্ভাবের। প্রথম দিকে যুদ্ধে পরাজিত শত্রুপক্ষের বন্দীরাই ক্রীতদাসে পরিণত হতেন (তখন ক্রীতদাস বলতে 'দস্যু' বা 'দাসঃ', অর্থাৎ শত্রুকেই বোঝাত মাত্র), কিন্তু পরে একই উপজাতি-গোষ্ঠীর কিছু-কিছু সদস্য নিজেদের উপজাতির মধ্যেই অন্যের অধীন বা প্রায় ক্রীতদাসের সামিল হয়ে পড়লেন। কিছু-কিছু পণ্ডিত ভ্রান্তিবশত ধরে নিয়েছেন যে 'দাস' বলতে বোঝায় আর্যদের থেকে নৃকুলের বিচারে পৃথক শুধুই অন্যান্য উপজাতির মানুষকে। অর্থাৎ তাঁরা বোঝাতে চান যে আর্যদের সমাজে ক্রীতদাস-প্রথার উদ্ভব সামাজিক অসাম্যের কারণে ঘটে নি, ঘটেছে নৃকুলগত পার্থক্যের কারণেই। অবশ্য 'দাস'দের মধ্যে ভারতের স্থানীয় উপজাতিদের লোকজন থাকাও যে যথেষ্ট সম্ভব সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথর্ববেদে দানাফসল চূর্ণ করার জন্যে মেয়ে ক্রীতদাসী নিয়োগের মতো কৌতূহলোদ্দীপক খবরও পাওয়া যায়। বেদগ্রন্থগুলিতে, এমন কি ঋগ্বেদেও, পাওয়া যায় প্রচুর সংখ্যক ক্রীতদাস নিয়োগের নানা উল্লেখ (কখনও-কখাও এমন কথাও বলা হয়েছে যে কারও-কারও শ'য়ে-শ'য়ে, এমন কি হাজারে-হাজারে ক্রীতদাস ছিল)। তবে এই সংখ্যাগুলি কতদূর বাস্তবসম্মত তা বলা কঠিন। এটা ধরে নেয়াই বোধহয় বেশি যুক্তিসম্মত যে এসব ক্ষেত্রে ক্রীতদাসের সংখ্যা স্পষ্টতই বাড়িয়ে বলা হয়েছে, যদিও বৈদিক যুগে যে ক্রীতদাস-প্রথার আবির্ভাব ঘটেছিল এতেও কোনো সন্দেহ নেই।

উপজাতি-গোষ্ঠী সমাজের স্তর ছাড়িয়ে তখনও উত্তীর্ণ হয় নি এমন-যে বৈদিক আর্য সমাজ তার তৎকালীন বিকাশের মান বিচার করে বলতে হয় যে ওই সময়ে (বিশেষ করে ঋগ্বেদের যুগে) সে-সমাজে যে ক্রীতদাস-প্রথার অস্তিত্ব ছিল তাকে মোটামুটি অপরিণত, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বলা উচিত।

রাজনৈতিক সংগঠন

বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির রাজনৈতিক সংগঠনের বর্ণনা দেয়া বেশ জটিল একটা ব্যাপার। এর কারণ শুধু এই নয় যে এ-ব্যাপারে উল্লেখ করার মতো সাক্ষ্য-প্রমাণ পণ্ডিতদের জানা আছে অল্পই। ঋগ্বেদের যুগের উপজাতিগুলি ও পরবর্তী কালের বৈদিক আর্য উপজাতিসমূহের রাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন ধরন ও সমগ্রভাবে তাদের অর্জিত ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য এতই বিপুল যে সেটিও এক্ষেত্রে জটিলতার এক প্রধান কারক।

এক্ষেত্রে তাই গ্রুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই প্রশ্নটিকে বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির সামগ্রিক বিকাশের পটভূমিতে বিচার করা। অর্থাৎ, এর বিচার করা সেই বিকাশের পটে যা সম্পন্ন হয়েছিল বেশ কয়েক শতাব্দী সময় নিয়ে এবং যা চিহ্নিত হয়ে আছে বৈদিক আর্য সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ও সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোয় বড়-বড় পরিবর্তনের অভিঘাতে।

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে গোড়ার দিককার বৈদিক যুগে আর্যরা ছিলেন উপজাতিগত সংগঠনের একটি স্তরে, কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে এবং বিশেষ করে মহাকাব্যীয় পৌরাণিক যুগে আর্যদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও উৎপত্তি ঘটেছিল রাষ্ট্র-ব্যবস্থার।

বৈদিক আর্য উপজাতিরা বাস করত 'গণ'এ বিভক্ত হয়ে। গোড়ার দিকে এই 'গণ' বলতে বোঝাত ছোট-ছোট ক্ল্যান বা উপজাতি-গোষ্ঠীকে। তবে পরে এই গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের কাঠামো। ঋগ্বেদের কতগুলি সূক্তে আমরা তৎকালে-অতীত এমন একটি যুগের নানা উপাখ্যান পাই যখন নাকি আর্যরা ঐক্যবদ্ধ, সুসমন্বিত নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করতেন, কাজকর্ম করতেন একসঙ্গে মিলেমিশে ও দেবতাদের কাছে বলিদানের প্রাণী উৎসর্গ করতেন মিলিতভাবে এবং পরিশ্রমলব্ধ ফল গোষ্ঠীর সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। আর্যদের এই 'গণ'গুলি শাসন করতেন 'গণপতি'রা।

বেদগ্রন্থগুলিতে সরাসরি উল্লেখ করা আছে যে স্ত্রীলোকদের 'গণ'এর সভায় যোগদানের অধিকার ছিল না। সব রকমের রাজনৈতিক অধিকার থেকেই তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন বলে মনে হয়। সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারস্যাপার ও শাসন-সংক্রান্ত সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা করতেন সমাজের পূর্ণাধিকার-প্রাপ্ত সদস্যরা 'বিদথ', 'সভা' ও 'সমিতি'র মতো সমাবেশে জমায়েত হয়ে।

উপরোক্ত এইসব শব্দের সঠিক অর্থ নিয়ে পণ্ডিতেরা অবশ্য দারুণ মুশকিলে পড়ে থাকেন, কারণ এইসব উপজাতীয় সমাবেশগুলির চরিত্র-সম্পর্কিত আকর উল্লেখগুলি প্রায়ই অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী হতে দেখা যায়। সম্ভবত 'বিদথ'ই ছিল এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সংগঠন এবং এটি দিয়ে তখন উপজাতীয় প্রবীণদের সমাবেশকেই বোঝাত। 'সমিতি'র থেকে এটির পার্থক্য ছিল এই দিক থেকে যে এই সমাবেশে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হোত রাজনৈতিক ব্যাপারস্যাপার। 'সমিতি' বলতে 'সভা'র চেয়ে আরও ব্যাপক ধরনের এক সমাবেশকে বোঝানো হোত বলে মনে হয়, তবে 'সমিতি'র সঠিক কাজ যে কী ছিল তা বলা কঠিন।

এই সমস্ত আর্য উপজাতির লোক বাস করতেন 'গ্রাম'এ, আর গ্রামগুলি গঠিত হোত বড়-বড় পিতৃশাসিত পরিবার বা 'কুল' নিয়ে। গোষ্ঠীর বন্ধন তখনও পর্যন্ত

অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুভূত হোত 'গোত্র'এর প্রভাব। গ্রামগুলিতে নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। ক্রমশ সম্পত্তি ও সামাজিক পদমর্যাদার ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা অসাম্য যত পাকাপোক্তভাবে শিকড় গাড়তে লাগল, উপজাতি-গোষ্ঠীগুলিও তত স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল এবং উপজাতীয় শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রগুলি বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে। ফলে 'গণপতি' পদেরও পরিবর্তন ঘটতে লাগল, উপজাতীয় নেতার বদলে তিনি ক্রমশ হয়ে উঠলেন সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রের শাসনকর্তা।

রাজশক্তির প্রথম আবির্ভাব নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যানগুলির আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এমনই একটি উপাখ্যান অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে গোড়ায় দেশে কোনো রাজা ছিল না, সকল মানুষই ছিল সমান এবং তারা সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে মেনে চলত। কিন্তু কালক্রমে অনেকে অতিরিক্ত আমোদপ্রমোদে গা ঢেলে দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে লাগল এবং সবল-প্রবল গ্রাস করতে লাগল দুর্বলকে। দেশের এই অরাজক অবস্থা দেখে অবশেষে দেবাদিদেব ব্রহ্মা রাজশক্তির সৃষ্টি করলেন ও প্রণয়ন করলেন দণ্ডবিধানের বিজ্ঞান।

অপর একটি বৈদিক উপাখ্যানে বলা হয়েছে কীভাবে সমাজের একজন রক্ষক নিযুক্ত করার জন্যে লোকে রাজা নির্বাচন করল তার কাহিনী। রাজা এবং রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের কারণ বর্ণনায় যে-যুক্তিরই অবতারণা করা হোক-না কেন, প্রাচীন ভারতীয়রা যে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েছিলেন এটাই এ-প্রসঙ্গে ভারি আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার।

গোড়ার যুগের বৈদিক ভাষ্য অনুযায়ী, প্রথম-প্রথম জনমণ্ডলীর দ্বারা রাজা নির্বাচিত হতেন এবং এ-উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই এক বিশেষ সমাবেশে সমবেত হোত জনসাধারণ। ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে রাজা-নির্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটি সূক্তও লিপিবদ্ধ আছে। অথর্ববেদের এই ধরনের একটি সূক্তের একটি পংক্তি হল নিম্নরূপ: 'বিশ-নির্বাচিত তুমি শাসনের তরে।' এখানে এবং ঋগ্বেদেরও অনুরূপ শ্লোকে 'বিশ' শব্দে জনসাধারণকে বোঝানো হয়েছে। এই নির্বাচিত রাজার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল নিজ প্রজাবর্গকে রক্ষা করা। রাজাকে জনসাধারণের রক্ষক বলে গণ্য করাই ছিল রীতি।

রাষ্ট্রগঠনের এই প্রক্রিয়াটি ছিল এক দীর্ঘবিলম্বিত ব্যাপার, আর সেই অন্তর্বর্তী কালে পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির জেরই টিকে গিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। এ-সময়ে উপজাতীয় সমাবেশগুলি—বিশেষ করে 'সভা' এবং 'সমিতি'—সমাজ-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছিল এবং রাজা নিয়োগের ব্যাপারটিকেও প্রভাবিত করেছিল। উপজাতীয় এই সমাবেশগুলির জায়গায় ক্রমে-ক্রমে স্থান করে

নেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের কিংবা রাজার পোষ্যবর্গের সমাবেশগুলি। (পরবর্তীকালে 'সভা' শব্দটি দিয়ে যেখানে সমাবেশ, বিতর্ক, এমন কি খেলাধুলোর অনুষ্ঠান হোত সেই কক্ষকে বোঝানো হোত। একসময়ে এক বিশেষ ধরনের আইনগত প্রতিষ্ঠানকেও বোঝানো হোত এই শব্দটি দিয়ে।) রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'সভা' এবং 'সমিতি'র ভূমিকার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকল। ক্রমে-ক্রমে আবির্ভাব ঘটল রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পদগুলির। জনসাধারণকে কর দেয়া শুরু করতে হল। এর আগে দেবতার কাছে কিংবা উপজাতির প্রধানের কাছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত যে-পুজোর উপচার অথবা উপহার দেয়া হোত তাকে বলা হোত 'বলি'। এখন সেই 'বলি' হয়ে দাঁড়াল বাধ্যতামূলক রাজকর, বিশেষভাবে নিযুক্ত রাজকর্মচারিদের মারফত রাজাকে এই কর দেয়ার নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে প্রবর্তন করা হল।

ইতিপূর্বের উপজাতীয় যোদ্ধৃদল ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠল বিশেষ ধরনের এক পরিচালকের ('সেনানী' অথবা 'সেনাপতি'র) নেতৃত্বাধীন স্থায়ী এক বাহিনীরূপে। রাজা এবং পেশাদার যোদ্ধারা লড়াই করতেন রথে চড়ে আর গ্রামীণ কৃষক কারিগর, ইত্যাদি স্বেচ্ছাসৈনিকরা পদাতিক হিসেবে।

বৈদিক সাহিত্যে রাজ-চক্রবর্তীর অভিষেক উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানের ('রাজসূয়' যজ্ঞের) বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়, সে-অনুষ্ঠানে রাজার ব্যক্তিত্বে আরোপিত হোত দেবত্ব। রাজার প্রধান 'পুরোহিত'এর ভূমিকা এই সময় থেকে ক্রমশ বেশি-বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে, পুরোহিত রাজার জ্যোতিষী ও উপদেষ্টার ভূমিকাতেও অধিষ্ঠিত হন। রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে সাহায্যকারী ব্যক্তিদের নামের কিছু-কিছু তালিকা এখনও পর্যন্ত টিকে আছে, এগুলিও বেশ আগ্রহোদ্দীপক। এই ব্যক্তিদের আখ্যা দেয়া হয়েছে 'রাজনির্বাচক'। রাজার নির্বাচকদের এই তালিকায় 'গ্রামণী' বা গ্রামের মোড়লেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ-থেকে বোঝা যায় যে তখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের ব্যাপারে গ্রামের স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের কিছুটা হাত ছিল। তবে ক্রমশ নির্বাচিত রাজার স্থান নিলেন বংশানুক্রমিক রাজা আর তখন রাজশক্তি নিয়মিতভাবেই পিতা থেকে পুত্রে হস্তান্তরিত হয়ে চলল। অতএব দেখা যাচ্ছে, গোড়ার যুগের বৈদিক 'গণ' থেকেই ক্রমশ সমাজ-বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে এবং পরে বহুবিধ সামাজিক অবস্থান্তরের মধ্যে দিয়ে এইসব রাষ্ট্র রূপ নিয়েছে বংশানুক্রমিক রাজ্যের কিংবা প্রজাতন্ত্রের। এই সমস্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডের আয়তন তখনও পর্যন্ত স্বল্পই ছিল। অচলিত অনুষ্ঠানাদি এবং আদিম সম-সমাজের সংগঠনগুলির কিছু-কিছু দিকও দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে ছিল এইসব বৈদিক আর্য রাজ্যে, বিশেষ করে এদের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে।

বর্ণের উৎপত্তি। জাতিভেদ-প্রথা

বর্ণ-বিভাগ ও জাতিভেদ-প্রথার অস্তিত্বকে সাধারণত কেবলমাত্র ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত করে দেখানো হয় বটে, তবে ঐতিহাসিক ও নৃকুল-বিদ্যাগত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সঙ্গে এই ধারণাটি কিন্তু পুরোপুরি সঠিকভাবে খাপ খায় না। বর্ণ-বিভাগের কিছু-কিছু দিক এবং জাতিভেদ-প্রথার নানা উপাদান বহু জাতির সমাজ-ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এটা ঠিক যে জাতিভেদ-প্রথার বিকাশের সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত মেলে ভারতেই এবং ভারতীয় সমাজের সুনির্দিষ্ট পরিবেশেই এই প্রথাটি অত্যন্ত অনমনীয় একটা চেহারা পায়।

পোর্তুগিজ ভাষায় 'কাস্তা' শব্দের অর্থ হল 'জাতি' অথবা 'বংশ' বা 'কুল'। গত ষোড়শ শতকে ভারতে অনুপ্রবেশ করে পোর্তুগিজরা ভারতীয় সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাদের কাছ থেকে পাওয়া এই 'কাস্তা' শব্দের নানা রকমফের বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় চারিয়ে যায় (যেমন, ইংরেজিতে এটি হয়ে ওঠে 'কাস্ট্') এবং এ দিয়ে ভারতীয় সমাজের মধ্যেকার কড়াকড়িভাবে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীগুলিকে বোঝানো হতে থাকে। খোদ ভারতে এই জনগোষ্ঠীগুলি সংস্কৃত 'জাতি' শব্দটির দ্বারা চিহ্নিত।

ভারতে এই বর্ণ বা জাতিভেদের (অর্থাৎ, কড়াকড়িভাবে একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখা এবং সীমাবদ্ধ কয়েকটি ও বংশানুক্রমিক বৃত্তি বা পেশার বৈশিষ্ট্যসূচক সুনির্দিষ্ট কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে তারতম্যকরণের এই ব্যবস্থাটির) উৎপত্তির প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতমহলের রচনায় তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠতে দেখা গেছে। এই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করার সময় বহুবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত ব্যাপার এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিকাশের সুনির্দিষ্ট ধারাটিকে বিবেচনার মধ্যে ধরা একান্ত অপরিহার্য।

বেশ কয়েকটি আলোচনা উপলক্ষে কার্ল মার্কস বলেছেন যে জাতিভেদ হল পূর্ববর্তী উপজাতীয় সমাজ-সংগঠনেরই একটি স্মারক-চিহ্ন। জাতিভেদের মধ্যেই পূর্ববর্তী গোষ্ঠী বা উপজাতীয় সমাজ-বন্ধন 'চরম ও সবচেয়ে কঠোর চেহারা' নিয়েছে।

জাতির পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে আরও একটি সুপ্রাচীন বিধানের, অর্থাৎ সামাজিক গোষ্ঠী বা 'বর্ণ'এর, অস্তিত্ব ছিল। এই 'বর্ণ'এর উৎপত্তি ঘটেছিল প্রাক-শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, যা পরে শ্রেণী-সমাজে দৃঢ়মূল ও পবিত্রীকৃত হয়ে ওঠে। ক্রমশ এই বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বা 'বর্ণ'গুলি (যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বেশি-বেশি স্থিরনির্দিষ্ট ও অনমনীয় হয়ে ওঠে এবং 'জাতি'র রূপ নেয়। এ-কারণেই ভারতীয় সমাজে 'বর্ণ'কে অনেক সময়ে 'জাতি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

'বর্ণ'এর উৎপত্তির প্রশ্নটি অতি জটিল একটি ব্যাপার। তবে সামাজিক গোষ্ঠী বা 'বর্ণ'এর আবির্ভাবের সঙ্গে আদিম সমসমাজ-সম্পর্কের ভাঙন এবং সম্পত্তির মালিকানা ও সামাজিক পদমর্যাদায় পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা অসাম্যের বিকাশকে যুক্ত করে দেখাটা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

প্রাচীন ভারতে সামাজিক গোষ্ঠী গঠনের এই সুনির্দিষ্ট ধরনটির আবির্ভাবেব ব্যাপারে এরকম ধারণা পোষণ করা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি উত্তর ভারতে অনুপ্রবেশের সময় যাদের সম্মুখীন হয়েছিল সেই স্থানীয় উপজাতিগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বাহন তাদের সামাজিক সংগঠনসমূহের সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি খুব সম্ভব এ-ব্যাপারে বিশেষই এক ভূমিকা পালন করেছিল।

সমাজের উচ্চতর বর্গের যোদ্ধৃ-সম্প্রদায়কে নিয়ে গঠিত হয় ক্ষত্রিয় বর্ণ, পুরোহিত বা যাজক-সম্প্রদায়কে নিয়ে ব্রাহ্মণ বর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজগুলির কৃষক, কারিগর, ইত্যাদিকে নিয়ে বৈশ্য বর্ণ এবং পরিশেষে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত হয় শূদ্র বর্ণ। প্রাক-বৈদিক যুগেই এই বর্ণ-বিভাগের আবির্ভাব ঘটে। এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে প্রাচীন ইরানেও কিছু-কিছু সামাজিক গোষ্ঠী ছিল (ইরানীয় ভাষায় এই গোষ্ঠীগুলিকে বলা হোত 'পিশ্ত্রা', বৈদিক 'বর্ণ'এর মতো যার অর্থ হল রঙ্) যেগুলির সঙ্গে উপরোক্ত প্রথম তিনটি ভারতীয় সামাজিক স্তরের মিল আছে। এজন্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে সমাজকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করার এই পদ্ধতি পূর্ববর্তী ইন্দো-ইরানীয় যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল, এমন কি কিছু-কিছু তথ্য এরকম ধারণা পোষণেরও অনুকূল যে সমাজ-বিন্যাসের এই পদ্ধতিটি সম্ভবত প্রচলিত ছিল এরও আগে থেকে।

ঋগ্বেদে উপরোক্ত প্রথম তিনটি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) বর্ণের বহুবিধ উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে একমাত্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই বিবৃত হয়েছে এই উপাখ্যানটি যাতে বলা হয়েছে যে এই চতুর্বর্ণেরই উৎপত্তি হয়েছে 'পুরুষ' থেকে। এই 'পুরুষ-সূক্ত'এ লেখা আছে যে ব্রাহ্মণরা উৎপন্ন হয়েছিলেন 'পুরুষ'এর মুখগহ্বর থেকে, ক্ষত্রিয়রা বাহুদ্বয় থেকে, বৈশ্যরা উরুদ্বয় থেকে এবং শূদ্ররা পদদ্বয় থেকে।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেও এই বিষয়টি বারবার বিবৃত হয়েছে, তবে সেখানে বলা হয়েছে যে বর্ণসমূহের আবির্ভাব ঘটেছে দেবাদিদেব ব্রহ্মা থেকে। এই চতুর্বর্ণের আবির্ভাব ও তাদের পদমর্যাদাকে আশীর্বাদপূত করেন যাজক ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-সমাজগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও তাঁদের সামাজিক পদে দেবভাব আরোপের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন ওই যাজক-সম্প্রদায়। কাজেই প্রায় সকল বৈদিক সাহিত্যে অপর তিন বর্ণের নামোল্লেখের আগে গোড়াতেই যে ব্রাহ্মণের নাম উচ্চারিত হবে এর কারণ বোঝা মোটেই তেমন শক্ত নয়। শুধু তা-ই নয়, পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞে পৌরোহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র পাঠের ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ অধিকারকে প্রবল

উৎসাহে সমর্থন ও রক্ষা করে চলেছিলেন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। তবে বাস্তবক্ষেত্রে সত্যিকার ক্ষমতা ছিল তখন যোদ্ধ্‌-সম্প্রদায় বা ক্ষত্রিয়দের হাতে।

প্রথাগতভাবেই ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা রাজপদে অধিষ্ঠিত হতেন। যেমন রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার শীর্ষপদে থাকতেন তাঁরা, তেমনই রাষ্ট্রক্ষমতা-প্রয়োগের প্রধান হাতিয়ার সেনাবাহিনীকেও তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং প্রধান-প্রধান সামরিক পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেই আমরা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের উল্লেখ দেখতে পাই, আর পৌরাণিক মহাকাব্যগুলিতে তো এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বের রীতিমতো বিস্তারিত কাহিনীই পাওয়া যায়।

পদমর্যাদায় পার্থক্য সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রাই ছিলেন সমাজের সবচেয়ে সুবিধাভোগী ও ধনী সম্প্রদায়। শ্রমজীবী জনসাধারণ ও ক্রীতদাসদের ওপরে প্রভুত্ব করতেন তাঁরা।

জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অবশ্য বৈশ্য-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন স্বয়ংশাসিত গ্রাম-সমাজের কৃষক, কারিগর, অপেক্ষাকৃত বড় খামারের মালিক এবং বণিকরা। রাজকরের বেশির ভাগ অংশই দিতেন বৈশ্যরা। বৈদিক যুগে বৈশ্যরা তখনও পর্যন্ত কিছুপরিমাণে রাজনৈতিক অধিকারের অংশীদার ছিলেন এবং এমন কি রাষ্ট্রের কোনো-কোনো ব্যাপার নির্ধারণেও তাঁদের হাত থাকত।

এই তিনটি উচ্চতর বর্ণকেই তখন গণ্য করা হোত 'দ্বিজ' বলে এবং এই তিনটি বর্ণের মানুষের অধিকার ছিল উপনয়ন হওয়ার, অর্থাৎ বৈদিক আচারে দীক্ষিত হওয়ার। শূদ্ররা কিন্তু 'দ্বিজ' ছিলেন না, কাজেই তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে, যাগযজ্ঞে অংশ নেয়া থেকে কিংবা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকার থেকে। শূদ্ররা স্বভাবতই হতেন দরিদ্র, তাঁদের চেয়ে যাঁরা ধনী তাঁদের ওপর অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল। সবচেয়ে নিচু স্তরগুলির কারিগর এবং গৃহভৃত্য পাওয়া যেত এই সম্প্রদায়ের মানুষের ভেতর থেকে। যদিও শূদ্ররা ঠিক ক্রীতদাস ছিলেন না, তবু যে-কোনো মুহূর্তে ক্রীতদাসের মতোই অন্যের অধীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল তাঁদের পক্ষে। উচ্চতর বর্ণগুলির প্রতিনিধিরা এই বর্ণ-বিভাগকে দুর্ভেদ্য বংশানুক্রমিক এক প্রথায় সংহত করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন, শূদ্রদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করতে ও যাতে শূদ্ররা 'দ্বিজ' বর্ণগুলিতে অনুপ্রবেশ না করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতেও সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা।

ঋগ্বেদের গোড়ার দিককার মণ্ডলগুলিতে শূদ্রদের কোনো উল্লেখ না-থাকায় কিছু-কিছু পণ্ডিত এই মত পোষণ করেছেন যে শূদ্ররা আসলে ছিলেন আর্যদের হাতে পরাভূত ও বশীভূত স্থানীয় অধিবাসী। এই পণ্ডিতেরা বলেন যে এ-ধরনের বর্ণভেদের সাহায্যেই আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, তাঁদের জাতিগত বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং কৃষ্ণকায় স্থানীয় অধিবাসীদের শূদ্রবর্ণের স্তরে অধঃপতিত করে রেখে

তাঁদের দমন করার উপায় ঠাউরেছিলেন আর্যরা। এই তত্ত্বের পরিপোষকরা বিশেষ করে জোর দিয়েছেন 'বর্ণ' কথাটির ওপর এবং বলেছেন যে 'বর্ণ'এর একটি অর্থ হল রঙ্। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে 'বর্ণ' শব্দটি বর্ণ-বিভাগের সময় মানুষের গায়ের চামড়ার রঙ্ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় নি। কেননা, প্রাচীন ইরানের মতো প্রাচীন ভারতেও উপাসনা-প্রথায় প্রতীকী বর্ণ স্মরণ করার একটি ঐতিহ্য চালু ছিল, প্রতিটি 'বর্ণ' বা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল তখন সুনির্দিষ্ট একেকটি প্রতীকী রঙ্।

বৈদিক যুগের শেষাংশে 'বর্ণ'গুলির মধ্যেই আবার পেশাভিত্তিক আরও ছোট-ছোট নানা ভেদ ও বিভাগ দেখা দিল। বৃহত্তর 'বর্ণ'গুলি সহ এই সমস্ত ক্ষুদ্র বিভাগও পরে দেখা দিল অনড় ও অনমনীয় নানা 'জাতি' রূপে।

উত্তর ভারতের প্রাচীন রাজবংশ ও রাষ্ট্রসমূহ

বৈদিক সাহিত্যে ও পৌরাণিক মহাকাব্যগুলিতে গঙ্গা-উপত্যকার বহুবিধ প্রাচীন রাজবংশ ও রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ওই সমস্ত তথ্যের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা বহুপরিমাণেই সন্দেহাতীত নয় এবং তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের সমর্থন মেলে না। মহাকাব্যগুলিতে যে-সমস্ত রাজবংশের নামের তালিকা পাওয়া যায়, দেখা যায় সেগুলি একেকটি গ্রন্থে একেক রকমের এবং সেগুলিতে ঘটনার যে-বিবরণ পাওয়া যায় তা-ও ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের। ফলত, এইসব ব্যাপার ভারততত্ত্ববিদের পক্ষে ওই যুগের ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের কাজটি বহুপরিমাণে জটিল করে তুলেছে। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগগুলিতে তৎকাল-প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যানধারণা প্রাচীন রাজাদের ও রাজবংশগুলির উৎপত্তির ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছে বিভিন্ন দেবদেবীর ইচ্ছাপ্রণোদিত বলে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে জানা যায় যে গঙ্গা-উপত্যকায় প্রধান দুটি রাজবংশের নাম ছিল সূর্য ও চন্দ্রবংশ এবং এই দুই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন সূর্য ও চন্দ্রদেবতা থেকে উদ্ভূত। রামায়ণের প্রধান চরিত্র রামচন্দ্রকে দেখানো হয়েছে সূর্য-বংশোদ্ভূত বলে আর মহাভারতের কুরুবংশকে চন্দ্র-বংশোদ্ভূত হিসেবে। ঋগ্বেদে যাঁর নাম উল্লিখিত আছে সেই রাজা ভরত ঐতিহ্য অনুসারে এই চন্দ্রবংশেরই প্রতিষ্ঠাতা।

ঋগ্বেদে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু-কিছু তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সেইসব তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা কিছু-পরিমাণে সন্দেহজনক। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদের সূক্তে উল্লিখিত আছে দশজন রাজার মধ্যে যুদ্ধের ঘটনার, কিংবা রাজা সুদাসের নেতৃত্বে ত্রিৎসু উপজাতি (ভরত-বংশেরই একটি শাখা) এবং সম্ভবত স্থানীয় অনার্য একটি উপজাতির (কারণ এই শেষোক্ত উপজাতির লোকজন সম্পর্কে

বলা হয়েছে যে তারা দেবতার কাছে পুজো-বলিদান, ইত্যাদি দেয় না) মধ্যে সংগ্রামের কাহিনী। ওই যুগে বৈদিক আর্য ও স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ যে অনবরত লেগে ছিল এই শেষোক্ত কাহিনী স্পষ্টতই তারই এক প্রমাণ। ঋগ্বেদের যুগে ভরত-বংশীয় রাজবংশ খুব সম্ভব সরস্বতী (সিন্ধুনদের প্রাচীন একটি শাখা) ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী এলাকাটিতে রাজত্ব করতেন।

বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির মধ্যে পুরু-বংশীয় উপজাতির প্রাধান্য ছিল বিশেষরকম। ঋগ্বেদে এই বংশের এক রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে যে তিনি 'ম্লেচ্ছ' বা স্থানীয় অনার্য উপজাতিগুলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বিজয়ী হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই পুরুরা কুরু (বা কৌরব) উপজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। ঋগ্বেদে অন্যান্য বহুতর উপজাতির কথাও উল্লিখিত আছে, যারা পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সমস্ত উপজাতির মধ্যে পড়ে চেদী, গান্ধার ও কিরাত নামের (মগধ উপজাতির প্রাচীন নাম) উপজাতিগুলি।

এসবের মধ্যে রাজা ভরতের নামটি বিশেষ গৌরবে দীপ্যমান। এই স্বনামধন্য রাজার সম্মানে এমন কি সেই সুদূর প্রাচীনকালেও গোটা উত্তর ভারত অভিহিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' বা 'ভরতের উত্তরপুরুষের দেশ' নামে (বর্তমানে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রও সরকারিভাবে 'ভারত' নামে পরিচিত)। মহাভারতের কিছু-কিছু বীর নায়কও ছিলেন ভরত-বংশীয়। এই মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে যে ভরতের উত্তরপুরুষ ওই মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

কুরুর প্রান্তরে বা কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংগ্রাম এই যুগের পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই যুদ্ধ-কাহিনীর সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক বিবরণের খুঁটিনাটি কতখানি প্রমাণসাপেক্ষ তা ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্কের বিষয়। এই যুদ্ধের বিবরণকে বহু পণ্ডিত সত্য ঘটনা বলেই মনে করেন এবং বলেন যে এ-ঘটনা ঘটেছিল খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ কিংবা তৃতীয় সহস্রাব্দের কোনো সময়ে। সমকালীন ভারততত্ত্ববিৎরা অবশ্য এই যুদ্ধের সময়টিকে খ্রীস্টপূর্ব এগারো থেকে নয় শতকের মধ্যে নির্দিষ্ট করতেই বেশি আগ্রহী। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎরা (শ্রী বি. বি. লালের নেতৃত্বে) হস্তিনাপুরে এই বিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিও সংগ্রহ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মহাভারত কাব্যে হস্তিনাপুরকেই কৌরবদের রাজধানী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। খননকার্যের ফলাফল দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে অধিবাসীরা হস্তিনাপুর নগর বন্যার প্লাবনের জন্যে পরিত্যাগ করে যায় খ্রীস্টপূর্ব এগারো থেকে নয় শতকের মধ্যে। এইসব তথ্য কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত তথ্যাদির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সতিসত্যিই কোনোকালে ঘটেছিল নাকি তা কাল্পনিক

একটি জনপ্রবাদমাত্র এ-প্রশ্নের আলোচনা বাদ দিলেও, কিছু-কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে ঘটনাটি সম্ভবত সুদূর ইন্দো-ইরানীয় যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যখন উত্তর ভারতের উপজাতিগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কিছু-কিছু উপজাতি অন্যান্য উপজাতির ওপর নিঃসন্দেহে আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ হয়। এ-প্রসঙ্গে এটি লক্ষণীয় যে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-সাহিত্যে সর্বত্রই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নতুন একটি যুগের সূচক হিসেবে গ্রাহ্য। মহাকাব্যটির বিবরণ অনুযায়ী সে-যুগের সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও প্রভাবশালী যে-পঞ্চাল ও কুরু উপজাতি-দুটি, তারা অতঃপর তাদের রাজনৈতিক প্রভাব হারায় এবং রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা দেয় পূর্ব ভারতের ছোট-ছোট রাষ্ট্র—বিশেষ করে কোশল (অযোধ্যা ও শ্রাবস্তীতে রাজধানী সহ), কাশী (বারাণসীতে রাজধানী) ও বিদেহ (মিথিলায় রাজধানী) রাষ্ট্র। এছাড়া আধুনিক বিহারের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে দেখা দেয় মগধ (গিরিব্রজ ও পরে রাজগৃহতে রাজধানী সহ) এবং পশ্চিম ভারতে অবন্তী (উজ্জয়িনীতে রাজধানী) নামের রাষ্ট্রদুটি।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে গোটা দেশে তিনটি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা. আর্যাবর্ত (বা আর্যদের বাসভূমি) অর্থাৎ উত্তর ভারতরাজ্য, মধ্যদেশ অর্থাৎ মধ্যাঞ্চলীয় রাজ্য এবং দক্ষিণাপথ অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতরাজ্য। গোটা দেশটি পাঁচ ভাগে, অর্থাৎ মধ্য, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশে, বিভক্ত ছিল এমন উল্লেখও পাওয়া যায় কোথাও-কোথাও।

দেখা যাচ্ছে পরবর্তী বৈদিক যুগের সংহিতা ও উপনিষদগুলির রচয়িতারা গোটা উত্তর ভারত, মধ্য-ভারতের (অর্থাৎ নর্মদা নদীর উত্তর দিকস্থ) বহু অংশ এবং পূর্ব ভারতের সঙ্গে ভালোরকম পরিচিত ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে পরবর্তী মগধ-মৌর্য যুগের উৎপত্তির পটভূমি হিসেবে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রখানি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

বৈদিক যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি

বৈদিক ধর্ম, পুরাণ-কথা ও আচারবিধি

বেদগ্রন্থগুলি বৈদিক যুগের ভারতীয় মানুষের ধর্ম-বিষয়ক মতামত ও তাঁদের পুরাণ-কথাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে ও সেগুলি আয়ত্ত করতে আমাদের সহায়ক হয়েছে।

বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির ধর্মবিশ্বাস, ইত্যাদি পরিণত হয়ে উঠতে ও বিশিষ্ট

চেহারা নিতে অত্যন্ত দীর্ঘ এক সময় নেয় আর এই পরিণতির দীর্ঘ পর্বের এককেটি বিশিষ্ট স্তর ভিন্ন-ভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত। অবশ্য বৈদিক ধর্ম বা বেদবাদকে কিছু-কিছু শর্তসাপেক্ষে গণ্য করা চলে একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মব্যবস্থা হিসেবে, সংশ্লিষ্ট সুসমঞ্জস প্রথা, আচার ও পূজাপার্বণ সহ ধর্মীয় (এবং অংশত ধর্মীয় ও দার্শনিক) বিশ্বাসসমূহের সামগ্রিক এক সমাহার রূপে। তবে এই গোটা ধর্মব্যবস্থার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মবিশ্বাসকে আলাদা করেও চিনে নেয়া চলে। এইসব ধর্মবিশ্বাস হল আদিম সমাজ-সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবে টিকে-থাকা অত্যন্ত সেকেলে কিছু-কিছু ধ্যানধারণা, কিংবা ইন্দো ইউরোপীয় বা ইন্দো-ইরানীয় যুগের প্রাচীন সংস্কৃতির অবশিষ্ট কিছু নিদর্শন এবং পরিশেষে যে-যুগে প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ গড়ে উঠছে বৈদিক আর্য সমাজের বিকাশের সেই বিশেষ স্তরের পরিণতিস্বরূপ উদ্ভূত ধর্মীয় ধ্যানধারণার সমষ্টি।

বেদবাদ হল ভারতে জাত ধর্মবিশ্বাসসমূহের সবচেয়ে প্রাচীন একটি সমন্বিত রূপ। এই ব্যবস্থা উপমহাদেশের পরবর্তী কালের ধর্মীয় মত-প্রবণতা ও দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। তবে বৌদ্ধধর্মের মতো এই ধর্মমত ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে নি।

বৈদিক ধর্মের এক অপরিহার্য অঙ্গ হল বহু-ঈশ্বরবাদ, অর্থাৎ নরত্ব-আরোপ-করা বহুসংখ্যক দেবদেবী ও অবতারের পূজা-আরাধনা।

বৈদিক যুগের ভারতীয়রা নানা প্রাকৃতিক ব্যাপার ও দেবদেবীদের ওপর মানবিক গুণাবলী আরোপ করতেন, তাঁদের ভূষিত করতেন মানবিক দোষত্রুটি ও গুণ দিয়ে। ঋগ্বেদে আরও কিছু দেবতার দেখা পাওয়া যায় যাঁদের ওপর আরোপিত হয়েছে পার্থিব অন্যান্য প্রাণীর আকারপ্রকার। এঁরা দেখা দিয়েছেন মানবেতর প্রাণীর রূপ ধরে এবং প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারের সঙ্গে মৌল সম্পর্কে যুক্ত হয়ে আছেন (যেমন, দেবতা ইন্দ্র কখনও-কখনও উপস্থিত হয়েছেন ষণ্ডের মূর্তিতে এবং অগ্নি দেবতা অশ্বের রূপ ধরে)। দেবতাদের উদ্দেশে বৈদিক আর্যরা নিবেদন করেছেন প্রার্থনা-স্তোত্র, তাঁদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করেছেন পূজার উপচার ও বলি। এইসব স্তোত্রে বৈদিক যুগের মানুষ দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছেন আরও বহুসংখ্যক গৃহপালিত পশু, যুদ্ধে বিজয়, ভালো ফসল কিংবা বিপর্যয় ও বিনষ্টির হাত থেকে নিষ্কৃতি। ঋগ্বেদে আরাধ্য দেবতাদের শ্রেণীবিন্যস্ত করার একটা প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক ভারতীয়দের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি শূন্য অংশ) এই তিন অংশে বিভক্ত করে দেখার যে-সাধারণ তত্ত্ব ছিল, উপাস্য দেবতাদেরও সেই অনুযায়ী মোটামুটি তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে নেয়া হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ডের ওই তিনটি অংশের প্রত্যেকটির নিজস্ব অধিবাসী দেবদেবী ছিলেন। স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে ছিলেন সূর্য দেবতা, ঊষার দেবী

উষস্ এবং 'ন্যায়নীতির নির্ধারক' দেবতা বরুণ। মর্ত্যের দেবতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আগুনের দেবতা অগ্নি এবং পবিত্র মাদক রসের দেবতা সোম। এছাড়া অন্তরীক্ষের দেবতাদের মধ্যে ছিলেন ঝড়ঝঞ্ঝার দেবতা রুদ্র, বাতাসের দেবতা বায়ু এবং মহা-পরাক্রান্ত ইন্দ্র। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির এই সমস্ত ধ্যানধারণার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিবিধ ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী যুগের পৌরাণিক তত্ত্বকথার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অপর কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির ইতিহাসে এই তত্ত্বকথার সাক্ষাৎ মেলে।

এই সমস্ত অতি-প্রাচীন দেবদেবী যাঁদের সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইন্দো-ইরানীয় পৌরাণিক দেব-কল্পনার তুলনা চলে (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কিছু-কিছু বৈদিক দেবদেবী তো স্পষ্টতই কয়েকটি গ্রীক দেবদেবীর সদৃশ*), তাঁদের পাশাপাশি বৈদিক দেবদেবীদের মধ্যে 'বিশেষভাবে ভারতীয়' দেবদেবীও আছেন। বৈদিক আর্যরা ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার সময়েই এই শেষোক্ত দেবদেবীদের পুজো-আরাধনার সূত্রপাত হয়।

সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতাদের একজন যাঁর নামের সঙ্গে অনেক বড়-বড় প্রাকৃতিক ঘটনার যোগাযোগ আছে তিনি হলেন ইন্দ্র। ঋগ্বেদে দু'শো পঞ্চাশটি সূক্ত (অর্থাৎ ওই গ্রন্থে সংকলিত সূক্তের প্রায় এক-চতুর্থাংশই) ইন্দ্র-দেবতার নামে নিবেদিত।

ইন্দ্রকে বর্ণনা করা হয়েছে বিরাটকায়, অসীম শক্তিধর এক পুরুষ হিসেবে, যিনি বজ্রধর, সহস্র-সহস্র শত্রুকে যিনি অবহেলায় নিধন করতে পারেন বিদ্যুদ্‌গর্ভ বজ্রশেল হেনে। এই পরাক্রান্ত যোদ্ধৃদেবতা পৃথিবীর জলশোষক নাগরাজ বৃত্রকে নিধন করেন। বেশ কয়েকটি বৈদিক উপাখ্যানে ইন্দ্রকে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকতে দেখা যায় এবং এগুলিতে তাঁর ওপর আরোপ করা হয় মানবোচিত বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করতেন যে দেবতা বরুণ গোটা আকাশের ওপর আধিপত্য করে থাকেন এবং রথে চড়ে আকাশ পরিক্রমা করে বেড়ান তিনি। তিনি হচ্ছেন জগৎ-সংসারের শৃঙ্খলা (ঋত)-রক্ষক, আর তাই তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন গ্রহনক্ষত্রের চলাচল ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ। তিনি পৃথিবী, মহাশূন্য ও বায়ুমণ্ডলের রক্ষক, ঋতুর পারম্পর্যের নিয়ন্তা তিনিই। পাপীর শাস্তিবিধানে বরুণ সুকঠোর, কিন্তু নিরাপরাধ ও অনুতপ্তের প্রতি তিনি করুণাময়। এমন কি দেবতাদেরও নৈতিক আদর্শের বিধিবিধান বেঁধে দেন তিনি। তাঁর এই রূপ-কল্পনার

* আকাশ-দেবতা দ্যুঃ-এর সঙ্গে তুলনা চলে গ্রীক দেবতা জিউস ও রোমান দেবতা জুপিটরের, সূর্য-দেবতার সঙ্গে গ্রীক দেবতা হেলিওসের, বরুণের সঙ্গে ইউরেনসের, উষার দেবী উষসের সঙ্গে গ্রীক দেবী ইয়াসের, ইত্যাদি। — লেখক

মধ্যে কিছু-কিছু নৈতিক দিক আছে যা প্রাচীন ভারতের পরবর্তী ধর্মীয় ও দার্শনিক মতাদর্শগুলিতে বিশেষভাবে বিশদ করা হয়েছে।

দেবতাদের মধ্যে এক কৌতূহলোদ্দীপক, অনন্য চরিত্র হলেন ঝড়ঝঞ্ঝার দেবতা রুদ্র। তিনি অন্যান্য দেবতার মতো নন, শুধুই নঙর্থক গুণের অধিকারী তিনি। ঋগ্বেদে তাঁকে গুরুত্বের বিচারে গৌণ স্থান দেয়া হয়েছে। যে-সমস্ত পূজা-উপচার ও বলি অন্যান্য দেবতারা গ্রহণ করেন না রুদ্র-দেবতা একমাত্র তাই-ই গ্রহণে সমর্থ। কিছু-কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে রুদ্র-দেবতাকে আর্যরা স্থানীয় অনার্য উপজাতিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক দেবদেবীদের মধ্যে রুদ্রের বিশেষ অবস্থানকে তাঁরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চান। পরে অবশ্য স্বর্গলোকের দুঃখহর রুদ্র অন্যতম জনপ্রিয় দেবতা শিবরূপে দেখা দেন।

বৈদিক উপজাতিরা দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। ঋগ্বেদে মাত্র ছ'টি সূক্ত তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত, সেগুলিতে স্তুতি করে বলা হয়েছে কীভাবে মাত্র তিনটি পদক্ষেপে বিষ্ণু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমণ করে থাকেন। হিন্দুধর্মে এই উপাখ্যান পরে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে, ফলে বিষ্ণু হয়ে ওঠেন হিন্দুদের অন্যতম প্রধান দেবতা।

বৈদিক দেবদেবী-মহলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন অগ্নি ও সোম-দেবতা। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বণে অগ্নি-দেবতা এক মৌল গুরুত্বের অধিকারী, কারণ একমাত্র তাঁরই দাক্ষিণ্যে মানুষ দেবতাদের সমীপে তার উপহার-উপচারাদি নিবেদন করতে সমর্থ। যজ্ঞের অগ্নিকে দেবতাদের অমরত্বের উৎস বলে বৈদিক যুগে গণ্য করা হোত। বৈদিক সূক্তগুলিতেও বলা হয়েছে যে অগ্নির আনুকূল্যেই দেবতারা অমরত্ব অর্জন করেছেন। একারণেই দেবকুল ও মানবকুলের মধ্যে অগ্নি যেন এক ধরনের যোগসূত্রের কাজ করে থাকেন। তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই অগ্নিকে তখন গণ্য করা হোত সংবাদবাহক বা দূত হিসেবে। আগুন পরিবারের মঙ্গলের কারক এই অতি প্রাচীন বোধ থেকেই যে অগ্নিপূজার এই পদ্ধতির উৎপত্তি ঘটেছিল এটা স্পষ্ট। ঋগ্বেদেও অগ্নিকে গৃহের রক্ষাকর্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে এক শো কুড়িটি ঋকমন্ত্র উৎসর্গ করা হয়েছে পূত মাদক পানীয়ের দেবতা সোমের উদ্দেশে। অগ্নির মতো সোমকেও দেবতাদের অমরত্ব অর্জনের অন্যতম কারক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। দেবতারা এই অমরত্ব-বিধায়ক পানীয় পাবার জন্যে ব্যাকুল। মানুষও এই পানীয়ের জন্যে ব্যাকুল, কারণ তারা মনে করে যে এটি পান করতে পেলে তারা দেবতাদের সগোত্রে পরিণত হবে।

মানুষের হিতকামী দেবতারা ছাড়াও বৈদিক যুগের ভারতীয়রা অনিষ্টকারী অপদেবতা ও দৈত্য—রাক্ষস ও অসুরদের—অস্তিত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন এরা দেবতাদের শত্রু।

পরবর্তী বৈদিক যুগে একদল 'বিমূর্ত' দেবদেবীরও আবির্ভাব ঘটে। এইসব দেবদেবীর ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র ছিল অস্পষ্ট এবং এ'রা কোনো দিক থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিবিধ বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। এ'দের মধ্যে একজন হলেন বাক্যস্ফূর্তির দেবতা বাক, অপরজন বিশ্বাসের দেবী শ্রদ্ধা, ইত্যাদি। এই নতুনতর দেবকুলের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল সর্বেশ্বরবাদী ধ্যানধারণার ক্রমবিকাশের ফলে। সর্বেশ্বরবাদের এই বিকাশ এমন কি ঋগ্বেদেও লক্ষ্য করা যায়, তবে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ও পৌরাণিক মহাকাব্যগুলিতে এই ধারণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ঋগ্বেদের সামগ্রিক পৌরাণিক উপাখ্যানাদির রূপরেখার মধ্যে ত্রিধা-বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণাটিই একমাত্র বিশ্ববোধের ছক নয়, যদিও বৈদিক উপাখ্যানাদির আওতার মধ্যে এই ছক দেবতাদের শ্রেণীবিন্যাসে কিছু-পরিমাণে সহায়ক হয়েছে।

বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেবতাদের সুস্পষ্ট ব্যক্তিস্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টার কিংবা তাঁদের ক্রিয়াকলাপে সুনির্দিষ্ট ভাগ-বাঁটোয়ারার অভাব।

বৈদিক সূক্তসমূহে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ওপর দেবত্ব-আরোপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ওপর মানবিক গুণাবলী আরোপের আকার নিয়েছিল। এর ফলে বিভিন্ন দেবতার বর্ণনায় দেখা দিয়েছিল কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য। তদুপরি একই ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা বিভিন্ন দেবতার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে দেবতাদের মধ্যে কোনো দৃঢ়বিন্যস্ত পদ-পরম্পরা গড়ে ওঠে নি, বরং যা গড়ে উঠেছিল তা হল একেক দল দেবতার মধ্যে এক ধরনের সর্বব্যাপী কিছু-কিছু গুণাগুণের অন্তঃসার। একেকটি মুহূর্তে অবশ্য একেক দেবতার স্তুতিগান করতে গিয়ে তাঁকে এক অনন্য, একমাত্র দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তাঁর ওপর তখন আরোপিত হয়েছে এমন সব ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতা, যা নাকি অন্য পরিস্থিতিতে অন্য দেবতার ওপরও সমভাবে আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে 'এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর'এর পূজার পরিবর্তে একেক সময়ে একেক দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন 'এক জাতীয় দেবতায় বিশ্বাস' নামে অভিহিত হয়ে আসছে (এই আখ্যাটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ ম্যাক্স মিউলর)। এক জাতীয় দেবতায় এই বিশ্বাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এক অত্যন্ত বিশিষ্ট ধরনের একেশ্বরবাদের প্রতি এক ধরনের প্রবণতা, যে-বিশিষ্ট একেশ্বরবাদ অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী উপনিষদসমূহে প্রচারিত তত্ত্বকথার মধ্যে দিয়ে।

পরবর্তী বৈদিক যুগে 'জীবজগতের প্রভু' দেব প্রজাপতি দেবতাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন, তবে তিনিও এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মর্যাদা পান নি। পরে এই প্রজাপতি-পূজার স্থান নিয়েছে দেবাদিদেব ব্রহ্মার আরাধনা।

দেবতাদের গুণবর্ণনায় উপরোক্ত এই সাদৃশ্যের মধ্যে সম্ভবত প্রতিফলন মেলে

বিভিন্ন বৈদিক আর্য উপজাতির ভিন্ন-ভিন্ন পৌরাণিক ভাব-কল্পনা মিলেমিশে ক্রমশ এক হয়ে ওঠার লক্ষণের।

বেদবাদ ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেদোক্ত দেবদেবী এবং বৈদিক উপাখ্যানাদি ও আচার-অনুষ্ঠানের সাধারণ ছকের মধ্যে তাঁদের স্থান-মাহাত্ম্যের তাৎপর্যেও পরিবর্তন ঘটতে লাগল। ক্রমশ প্রায় বিস্মৃত হলেন প্রাচীন দেবতারা; বরুণের মতো কিছু-কিছু 'জ্যেষ্ঠ' দেবতা তাঁদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য হারালেন আর তাঁদের স্থান অধিকার করে নিলেন দেবতা বিষ্ণুর মতো অন্য এমন সব দেবদেবী আগের আমলে যাঁদের দেবকুলে তেমন বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না।

ইন্দো-আর্য উপজাতিরা ভারতের নতুন-নতুন অঞ্চলে যত ছড়িয়ে পড়তে লাগল ততই স্থানীয় অনার্য উপজাতিদের ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের কিছু-কিছু আত্মসাৎ করে নিল বেদবাদ। উদাহরণস্বরূপ, এর প্রমাণ মেলে অথর্ব বেদের ঐন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ও জাদুমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এক সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (মহেশ্বর) এই 'একীভূত ত্রিমূর্তি' ক্রমশ প্রধান তিন দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন।

বৈদিক যুগের ভারতীয়রা বহুবিধ অপদেবতা এবং দেবত্ব আরোপ-করা নানা বৃক্ষলতা, পর্বত ও নদীর পূজাও করতেন।

দেবপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল যজ্ঞের অনুষ্ঠান। দেবতাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনাও ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য ছিল, যদিও এইসব স্তবগানের অনেকগুলিই প্রথাসিদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে বিশেষ করে অগ্নি ও সোমের পূজায় আচার-অনুষ্ঠান ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ।

যজ্ঞের নিয়মকানুন ক্রমশ এতই জটিল হয়ে উঠল যে এর ফলে গড়ে উঠল বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি পুরোহিতগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলি নানা ধরনের ধর্মীয় ও আচারগত অনুষ্ঠান পরিচালনা করত।

নানা ধরনের বিশেষ-বিশেষ পূজাপার্বণ উপলক্ষে বিশদভাবে আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ছাড়াও বৈদিক যুগের ভারতীয়কে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনেও বেশ কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতে হোত, এটা ছিল তাঁর 'ধর্ম' (দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও নিয়ম-নীতির বিধিবিধান)-পালনের অঙ্গ।

সন্তানের জন্ম, বিবাহ ও আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুশোক পালনের জন্যেও বিশেষ-বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের রীতি ছিল। পিতৃপিতামহের স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে পূজার অনুষ্ঠানও ছিল জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বা ব্রাহ্মণগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যজ্ঞের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর। বৈদিক দেবতা প্রজাপতিকে এক্ষেত্রে নির্বাচন করা হয়েছে

যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা দেবতা হিসেবে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন এই সময়ে মানুষের প্রধান গুণ, তার ধার্মিকতার পরিমাপ হিসেবে গণ্য হয়। একে দেখা হতে থাকে দেবতাদের ও মানুষের অস্তিত্বের সংঘটক জীবনের মূলভিত্তি হিসেবে। বলা হয় যে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ও উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ কেবলমাত্র দেবতাদেরই নয়, মানুষেরও অমরত্বলাভ সম্ভব করে তোলে: এর ফলে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে মানুষের বংশধারা বজায় রাখেন, সন্তানসন্ততি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেন তাদের।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করে তুলতে সাহায্য করেন। এমন ধারণার সঞ্চার করেন তাঁরা যে লোকে মনে করতে থাকে আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সময় বিশেষ এক মুহূর্তে তাঁরা দেবতাদের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যান এবং একমাত্র তাঁরাই দেবতাদের মধ্যে পূজার উৎসর্গীকৃত উপচার সঠিকভাবে বিতরণ করে দিতে সমর্থ।

ঋগ্বেদে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী যজ্ঞের অনুষ্ঠান পালিত হোত এইভাবে: প্রথমে বিশেষভাবে নির্মিত এক বেদীর ওপর মন্ত্রপূত খড় বিছিয়ে দেবতাদের অধিষ্ঠানের স্থান তৈরি করা হোত। অতঃপর যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হোত এবং কিছু-পরিমাণে সোমরস বা দুধ ঢেলে দেয়া হোত সেই যজ্ঞাগ্নিতে। এরপর ফসলের দানা ছড়িয়ে দেয়া হোত কিংবা পশুবলি অনুষ্ঠিত হোত।

গোড়ার দিকে বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির দেবপূজার জন্যে কোনো মন্দির থাকত না। পরে, সম্ভবত স্থানীয় উপজাতিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রভাবে, দেবপূজার জন্যে বিশেষ ধরনের বাড়ি বা মন্দির তৈরি করা হতে থাকে।

বৈদিক যুগে দেবপূজার জন্যে দেবতাদের প্রতিকৃতি বা কল্পনাভিত্তিক ছবি ব্যবহৃত হোত কিনা, এ নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেন নি। তবে বেদগ্রন্থগুলির কিছু-কিছু শ্লোক থেকে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই সময়ে দেবতাদের মানবিক রূপকল্পনার ছবি সম্ভবত প্রচলিত ছিল।

মহাকাব্যীয় পৌরাণিক উপাখ্যান

ভারতায় মহাকাব্যগুলিতে যে-পৌরাণিক উপাখ্যানসমষ্টি পাওয়া যায় তা সাধারণভাবে বেদের পৌরাণিক ভিত্তি থেকে পৃথক, যদিও মহাকাব্যগুলির কিছু-কিছু উপাখ্যান ও ধ্যানধারণার মধ্যে পূর্ববর্তী যুগেরও প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেমন বেদগ্রন্থগুলিতে তেমনই মহাকাব্যীয় পুরাণেও কিছু-কিছু দেবদেবীর ভাবরূপ-কল্পনায় বহু-ঈশ্বরবাদের ও দেবতায় নরত্ব-আরোপের নানাবিধ লক্ষণ স্পষ্ট; এক বিশেষ ধরনের সর্বেশ্বরবাদেরও কিছু-কিছু লক্ষণ সেখানে বর্তমান। অন্যদিকে

মহাকাব্যগুলিতে সামগ্রিকভাবে যে-পৌরাণিক উপাখ্যানসমষ্টি পাওয়া যায় তার কিছু-কিছু অংশে নতুন প্রবণতা ও বিষয়বস্তুরও সন্ধান মেলে।

মহাকাব্যগুলির পৌরাণিক উপাখ্যানসমষ্টি থেকে দুটি ঐতিহ্যের ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর একটি হল প্রাচীনতর ঐতিহ্য, যার মধ্যে দিয়ে বৈদিক কিংবা প্রাক-বৈদিক (ইন্দো-ইরানীয়) যুগের তৎকাল-প্রচলিত ধ্যানধারণা প্রতিফলিত; আর দ্বিতীয়টি হল পরবর্তী মহাকাব্যীয় ঐতিহ্য, যার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের সঙ্গে জড়িত নতুন প্রবণতাগুলি। এই দ্বিতীয় ঐতিহ্যটিই পরবর্তীকালে বিকশিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে মহাকাব্যীয় পুরাণের যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

বেদগ্রন্থসমূহের মতো মহাকাব্যগুলিতেও বিষ্ণু ইন্দ্র-দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত, তিনিও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমণ করেন 'তিনটি পদক্ষেপ'এ। তবে মহাকাব্যগুলিতে বিষ্ণুর ভূমিকা এই দুই দেবতার 'মৈত্রী'র ক্ষেত্রে প্রধান। মহাকাব্যগুলিতে চিত্রিত বিষ্ণু-দেবতা বিরল নানা ক্ষমতার অধিকারী: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে সেই সবই তিনি একাধারে সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংস করছেন। অর্থাৎ, পরবর্তী হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যে যে-কাজগুলি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতা বা ত্রিমূর্তির মধ্যে বণ্টিত হয়েছে, ওই স্তরে সেই সব কর্ম একাই সাধন করছেন স্বয়ং বিষ্ণু।

প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ্য যে মহাকাব্যগুলিতে ব্রহ্মাও বিষ্ণুর মতো একই কাজ নিষ্পন্ন করছেন। প্রধান-প্রধান দেবতার গুণাগুণের মধ্যে এই সাদৃশ্যের উপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মহাকাব্যগুলিতে তখনও পর্যন্ত দেবতাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো পার্থক্যের সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় নি এবং দেবতাদের 'একীভূত ত্রিমূর্তি'র ধারণাও গড়ে ওঠে নি তখনও।

মহাকাব্যগুলিতেই আমরা প্রথম রণদেবতা স্কন্দের সাক্ষাৎ পাই। এক্ষেত্রে অপর একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে ইন্দ্র ও বরুণের ভাবরূপ-কল্পনায় রূপান্তরসাধন। বেদগ্রন্থগুলিতে ইন্দ্র দেবসমাজে প্রধান স্থান অধিকার করে ছিলেন। কিন্তু মহাকাব্যগুলিতে যোদ্ধৃপ্রধান দেবতা স্কন্দ ইন্দ্রতুল্য শক্তির অধিকারী। বরুণ-দেবতাও এখানে আর বিশ্বের শৃঙ্খলা (ঋত) নিয়ন্ত্রণ করেন না, তিনিও এখন গৌণ গুরুত্বের অধিকারী এক দেবতামাত্র।

মহাকাব্যগুলিতে পৌরাণিক উপাখ্যানাদির যে-জটিলতা লক্ষ্য করা যায় খুব সম্ভব তার কারণ হল মহাকাব্যগুলির বিষয়বস্তুই ভিন্ন-ভিন্ন যুগপর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। কমবেশি প্রাচীনতর রচনার সঙ্গে সেখানে পাশাপাশি মিশে আছে বহু-পরবর্তী যুগের নানা পাঠ। রাম-চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ করে চোখে পড়ে। রামায়ণের গোড়ার অংশগুলিতে রাম উপস্থাপিত হয়েছেন সব রকম দৈবী ক্ষমতা-

বর্জিত সাধারণ এক মানুষ হিসেবে, কিন্তু কাব্যটির পরবর্তী অংশে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন বিষ্ণুর মনুষ্যরূপধারী অবতাররূপে।

এইরকম অপর একটি কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র হলেন কৃষ্ণ। মহাভারতে তিনি চিত্রিত হয়েছেন যাদব উপজাতির নেতা ও পাণ্ডবদের বন্ধু হিসেবেই শুধু নন, বিষ্ণুর অন্যতম এক অবতার, এক 'পরম পুরুষ' এবং পরিশেষে 'সমগ্র জগতের কার্যকারণ-ভিত্তিস্বরূপ' এক দেবতারূপে। অবশ্য মহাকাব্যীয় চরিত্রগুলির চিত্রণের ক্ষেত্রে এই রূপান্তরসাধন তৎকালীন মানুষের দর্শন ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে নব-সংযোজিত নানা বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলনমাত্র। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে তখন বৈষ্ণব-ধর্মমতের আবির্ভাব ও তার দ্রুত বিস্তার ঘটে চলেছে।

বৈদিক সাহিত্য

বেদগ্রন্থগুলি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত সাহিত্য। অবশ্য সেগুলির বিষয়বস্তু যেমন বহুবিচিত্র, তেমনই একাধিক ঐতিহাসিক কালপর্বের লিখিত পাঠ তার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেদগ্রন্থগুলিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে দেখাটাই রীতি। এদের মধ্যে প্রথম অংশ অন্তর্ভুক্ত হল স্তোত্র বা সূক্ত অথবা সংহিতাসমূহ। ঋগ্বেদ (সূক্তের সমষ্টি), সামবেদ (স্তবগানের সমষ্টি), যজুর্বেদ (প্রার্থনা ও যজ্ঞের সূত্রবন্ধের সমষ্টি) এবং অথর্ববেদ (ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণ ও জাদুবিদ্যা-অনুষ্ঠানের নিয়মাবলীর সমষ্টি) মিলিতভাবে ওই সংহিতা নামে পরিচিত। অতঃপর দ্বিতীয় অংশ হল ব্রাহ্মণসমূহ। সংহিতাসমূহের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত স্তোত্র ও মন্ত্রাদির ব্যাখ্যা এগুলি। তৃতীয় অংশ আরণ্যকসমূহ রচিত হয় বনবাসী তপস্বীদের জন্যে, আর চতুর্থ অংশ উপনিষদসমূহ হল একত্র-গ্রথিত ধর্ম ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা-গ্রন্থ।

এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হল ঋগ্বেদ। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষাংশে ও প্রথম সহস্রাব্দের সূচনায় এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবাহ-সম্বন্ধীয় স্তোত্রাদি সহ বহুবিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে রচিত এক হাজার আটাশটি সূক্ত এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এর কিছু পরবর্তী যুগে অথর্ববেদ লিখিত হয়। গোড়ায় পূর্ব ভারতের বৈদিক আর্য উপজাতিরাই-যে এর সূক্তগুলি রচনা করে এটা স্পষ্ট। তবে কয়েকটি খুব প্রাচীন সূক্তও এর অন্তর্ভুক্ত। অথর্ববেদের বেশকিছু সূক্তে অনার্য স্থানীয় উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন মেলে।

সংহিতাগুলিতে সংকলিত পাঠের অধিকাংশই অত্যন্ত বেশিরকম অসম মানের,

তবু এই প্রাচীন লিখিত রচনার সংকলনগুলিকে মুখে-মুখে প্রচলিত লোক-সাহিত্যের দীর্ঘকালীন এক ঐতিহ্যের প্রতিফলন সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা চলে। সংহিতাগুলির রচয়িতাদের বলা হয় ঋষি। তাঁদের শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করে প্রাচীন কালের চারণ-গায়করা গাইতেন। ঋগ্বেদের এমন কি সবচেয়ে প্রাচীন সূক্তগুলিও ছন্দোবন্ধের সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে রচনা করা হয়েছে এবং পরে অন্যান্য কাব্যরচনায়ও ব্যবহৃত হয়েছে এই সব ছন্দ। এগুলির মধ্যে একটি ছন্দোবন্ধ অনুষ্টুপ পরবর্তী যুগে শ্লোক বা বিশেষ এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ পদ-রচনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে আবার এই বিশেষ পদ-রচনার ধরনই হয়ে দাঁড়ায় কবিতার প্রধান বাহন।

বেদসমূহের বহু সূক্তেই প্রকৃতির ও মানবিক আবেগ-অনুভূতির এমন কাব্যময় বর্ণনা আছে এবং এমন সমৃদ্ধ উপমা ও চিত্রকল্পে সেগুলি পূর্ণ যে তাদের আদর্শ কবিতা বলা যেতে পারে। ঊষার দেবী ঊষসের উদ্দেশে রচিত স্তবগুলি তো বিশেষভাবেই অনুপ্রাণনায় পূর্ণ। সমগ্রভাবে দেখলে এই স্তোত্রগুলি সবই মূলত ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ, তবু প্রাত্যহিক জীবনে ও লোক-ঐতিহ্যে তাদের মূল নিহিত বলে প্রায়শই স্তোত্রগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ কাব্য বলে মনে হয়। বহু বৈদিক রচনার এই বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বেদবাদের সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি ও বহু বৈদিক ধ্যানধারণায় মানবত্ব-আরোপণ গুণেরই প্রতিফলন। বেদসমূহে দেবতাদের গণ্য করা হয়েছে মানুষের ঘনিষ্ঠ সদৃশ হিসেবে এবং তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত স্তোত্রগুলিতে ঋষিকবিরা নিজেদেরই জাগতিক অভিজ্ঞতা ও আবেগ-অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন, নিজেদের আনন্দ-বেদনার কথাই ব্যক্ত করেছেন।

বৈদিক সাহিত্যে, এমন কি ঋগ্বেদেও, নাটকীয় উপস্থাপনার নানা লক্ষণ নজরে পড়ে। পরবর্তী সাহিত্যে এই লক্ষণগুলিই পুরোদস্তুর নাটকের আকারে বিকশিত হয়ে ওঠে। এর একটি আগ্রহোদ্দীপক উদাহরণ হল ঋগ্বেদের তথাকথিত ‘স্তোত্রে কথোপকথন’ অংশগুলি। মনে হয় এগুলি নিছক ধর্মীয় মন্ত্রমাত্র ছিল না, নাটকীয় উপস্থাপনার জন্যেও লিখিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের কিছু-কিছু উপাখ্যান পরবর্তী কালে ভারতীয় কবি-নাট্যকারদের নাটক রচনার বিষয়বস্তুও যুগিয়েছে। যেমন, মহাকবি কালিদাস তাঁর ‘বিক্রমোর্বশী’ (বীরত্ববলে জয়-করা উর্বশী) নাটকের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রতি রাজা পুরুরবার প্রেমের বৈদিক উপাখ্যানটি।

বৈদিক সাহিত্যের বেশকিছু সূক্তে বর্ণিত হয়েছে শুভ ও অশুভ শক্তির মধ্যে, দেবতা ও দানবদের মধ্যে, বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কাহিনী। এক্ষেত্রে দশ নরপতির মধ্যে সংগ্রামের কাহিনীটি বিশেষরকম চিত্তাকর্ষক, যাতে বলা হয়েছে কীভাবে একমাত্র ইন্দ্র-দেবতার সহায়তায় পরাক্রান্ত রাজা সুদাস উত্তাল

ঢেউ ভেঙে পর্ষনী নদী পার হয়ে পরাজয় এড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা সঠিকভাবেই ঋগ্বেদকে মহাকাব্যগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক যে-সমস্ত বীরকথা, তাদের মূল উৎস বলে গণ্য করেন। সাহিত্য-ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ব্রাহ্মণগুলিকে সংহিতাসমূহের চেয়ে কম আগ্রহোদ্দীপক ঠেকে, যদিও ব্রাহ্মণগুলিতেও ধর্মীয় যজ্ঞ ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের গদ্যময় টীকা-ভাষ্যের পাশাপাশি আমরা সাক্ষাৎ পাই মহাপ্রলয়ের কাহিনী নিয়ে এক ধরনের ভারতীয় ভাষ্যের।

বেদাঙ্গগুলিও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। এগুলির মধ্যে দিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশের তৎকালীন নতুন এক স্তরের পরিচয় মেলে। বেদাঙ্গগুলি ছ'টি শাখায় বিভক্ত: শিক্ষা (শব্দবিদ্যা), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও মূল ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত বিদ্যা), কল্প (ধর্মীয় ভজনপূজন-পদ্ধতি সংক্রান্ত শাস্ত্র), ছান্দস্ (ছন্দোবিদ্যা) এবং জ্যোতিষ (জ্যোতির্বিদ্যা)। পরবর্তী যুগের লিখিত শাস্ত্রসমূহের পরিচয়সূচক 'স্মৃতি'র পরিবর্তে উপরোক্ত এই সমস্ত শাস্ত্রই সাধারণভাবে 'শ্রুতি' নামে পরিচিত।

মহাকাব্য-সাহিত্য

প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হল মহাভারত ও রামায়ণ। গ্রন্থাকারে এই দুটি কাব্য লিপিবদ্ধ হয় বহু পরে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে। তবে কাব্যদুটির মূল কাহিনী এবং গ্রন্থদুটির অন্তর্ভুক্ত বহু উপাখ্যান নিঃসন্দেহে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধের সময়কার।

মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু হল পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কাহিনী, যার পরিণতি ঘটে আঠারো দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে।

অপরপক্ষে রামায়ণে বর্নিত হয়েছে দুষ্ট রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃতা প্রিয়তমা সীতার উদ্ধারের জন্যে রাজা রামের লঙ্কা-অভিযান। কিছু-কিছু পণ্ডিত মহাভারতের কাহিনীকে সত্য ঘটনার প্রতিচিত্রণ হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন ঘটনাগুলি ঘটেছিল সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ ও প্রথম সহস্রাব্দের সূচনাকালে। অপরপক্ষে রামায়ণের কাহিনীকে প্রায়শই আর্য উপজাতিগুলি ও দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামের স্মারক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। তবে কাব্যদুটিতে বর্ণিত ঘটনাবলী ঐতিহাসিক বিচারে সুনির্দিষ্ট সত্য হোক বা না-ই হোক, দুটি কাব্যই তর্কাতীতভাবে বহু শতাব্দী জুড়ে জনমানসে ও ঐতিহ্যে প্রোথিত হয়ে আছে।

কিছু-কিছু পণ্ডিত রামায়ণকে গণ্য করে থাকেন উত্তর ভারত থেকে ইন্দো-আর্যদের দাক্ষিণে সুদূরে লঙ্কাদ্বীপ (বর্তমানের শ্রীলঙ্কা) পর্যন্ত অনুপ্রবেশের এক সাহিত্যিক দলিল হিসেবে।

দুটি মহাকাব্যই প্রকাণ্ড-কলেবর দুই সংকলন। মহাভারতে আছে প্রায় এক লক্ষ দ্বি-পংক্তিবিশিষ্ট পদ বা শ্লোক, আর রামায়ণে চব্বিশ হাজার শ্লোক।

এই দুটি কাব্যে মূল কাহিনী ছাড়াও অসংখ্য পার্শ্ব কিংবা প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দেখা মেলে। মহাভারতে এই পার্শ্ব উপাখ্যানগুলি গ্রন্থের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে। এর কিছু-কিছু উপাখ্যান হয় মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য সংক্ষিপ্ত গূঢ় অতিকথা, আর নয়তো 'নল-দময়ন্তী'র উপাখ্যানের মতো গোটা একেকটি গল্পকথা কিংবা ধর্ম-আলোচনা। তবু, এ-সমস্ত সত্ত্বেও, মহাভারত ও রামায়ণকে চমৎকার সু-সংহত রচনা বলে গণ্য না-করে উপায় নেই। কাব্যদুটি বিভিন্ন কাহিনী ও রচনারীতির জোড়াতাড়া-দেয়া মোজাইক প্যাটার্ন নয়, ঐক্যবদ্ধ দুটি রচনা এবং এর প্রত্যেকটি রচনা হিসেবে এক ও অখণ্ড। ঐতিহ্যগতভাবে ব্যাসদেবকে মহাভারতের রচয়িতা বলা হয়ে থাকে আর কবিগুরু বাল্মীকিকে বলা হয় রামায়ণকার, তবে এই দুই কবি বা ঋষি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছুই জানা যায় না। মনে হয় ব্যাস ও বাল্মীকি দুজনেই ছিলেন লোককবি, তবে তাঁরা অন্যদের চেয়ে এত বেশি বিখ্যাত হয়েছিলেন যে তাঁদের নাম বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে এসেছে। এই কাব্যদুটি কয়েক শতাব্দী ধরে লোকের মুখে-মুখে চলে আসায় এদের রচনারীতি ও ভাষার ওপর তার প্রভাব পড়েছে।

উত্তরপুরুষের কাছে বংশ-পরম্পরায় এই দুই মহাকাব্য প্রাচীন ভারতের দুটি খাঁটি বিশ্বকোষ হয়ে থেকেছে। প্রাচীন ভারতীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বহুবিচিত্র দিকের কৌতূহলোদ্দীপক নানা উপাদানের সংগ্রহ-ভাণ্ডার হয়ে আছে কাব্যদুটি। কথাটা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না যে ভারতে এখনও পর্যন্ত এই কাব্যদুটি জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাচীন কালে এবং মধ্য যুগে গ্রন্থদুটির খ্যাতি ভারতের চতুঃসীমার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বিস্তৃত হয়েছিল পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায়, দূর এবং মধ্য প্রাচ্যেও। এযুগে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষাতেও মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বীটোফেন, হাইনে, রোঁদ্যা, বেলিন্স্কি, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল নেহরু সহ পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতির বহু বিশিষ্ট প্রবক্তা মহাকাব্যদুটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই দুই মহাকাব্যের উপাখ্যানাদি ভারতের সবচেয়ে প্রিয় কাব্য-কাহিনীগুলির অন্তর্ভুক্ত থেকে গেছে।

বৈদিক সাহিত্য থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তা পাঠককে যে কেবল প্রাচীন যুগে সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয় তা-ই নয়, এ-সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণ কিছুটা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ ধরনের হলেও তা থেকে ওই বিশেষ যুগে অর্জিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তরেরও একটা আভাস মেলে।

বৈদিক যুগের মানুষের ধর্মীয় পূজা-অর্চনার সঙ্গে জড়িত ছিল জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে কিছু-পরিমাণে পরিচিতি। বৈদিক যুগের ভারতীয়রা শুধু-যে সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা-ই নয়, অন্যান্য গ্রহের অস্তিত্বের কথাও জানতেন তাঁরা, বস্তুত গোটা একেকটা নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গেই পরিচিতি ছিল তাঁদের। তাঁদের বর্ষপঞ্জি ও কাল গণনার পদ্ধতি ছিল বিস্তারিত ও যথাযথভাবে তা লিপিবদ্ধও ছিল। বছরটিকে তাঁরা ভাগ করেছিলেন বারো মাসে এবং প্রতি মাসের জন্যে ধার্য করেছিলেন তিরিশটি করে দিন।

সেই সুদূর অতীত যুগে অর্জিত গণিতের জ্ঞানের কথাও জানতে পারি আমরা বৈদিক সাহিত্য থেকে। এক্ষেত্রে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার ছিল শুল্পসূত্রসমূহ বা সুতোর মাপের নিয়মসমূহ। এই পদ্ধতিতে মাপজোকের বিভিন্ন রীতি প্রচলিত ছিল। সংশ্লিষ্ট বৈদিক পাঠে বেদীর মাপ জোক, নানা ধরনের জ্যামিতিক ছাঁদের অবয়ব নির্মাণ ও হিসাবনিকাশের বিশদ নিয়মকানুনের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে।

বৈদিক সমাজের ওই পর্যায়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। মানুষের বহু অসুখবিসুখ ও (লতাপাতা-শিকড়বাকড়, বিশেষ ধরনের মলম ও জল-চিকিৎসা, ইত্যাদির সাহায্যে) তার চিকিৎসার নানা ধরনের সঙ্গে তখন পরিচিত ছিলেন ভারতীয়রা। গোড়ার দিককার বৈদিক রচনাগুলি অনুযায়ী সেকালেই সমাজে পেশাদার চিকিৎসক (বা ভিষক্) ছিলেন। বিশেষ করে অথর্ববেদে ওষুধপত্র সম্বন্ধে বিশদ বিবরণাদি পাওয়া যায়, রোগ-দূরীকরণের নানা মন্ত্রতন্ত্রও লিপিবদ্ধ আছে সেখানে। পৌরাণিক সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণার পাশাপাশি আছে মোটামুটি যুক্তিসিদ্ধ মন্তব্য ও সিদ্ধান্তাদি।

বৈদিক যুগের ভারতীয়রা মানুষের অসুখবিসুখকে দেবদেবীদের ক্রোধ আর রোগ-নিরাময়কে তাঁদের প্রসন্ন হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করতেন। বেদে স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং 'ভিষক্-রাজদ্বয়' বলে গণ্য বরুণ ও সোম-দেবতার প্রতি নিবেদিত বিশেষ কতগুলি স্তোত্র আছে। ওই সময়ে রোগ-চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা ছিল জাদুবিদ্যার, তবে লতাপাতা-শিকড়বাকড়ের গুণাবলী এবং ওষুধ হিসেবে সেগুলির প্রয়োগ-পদ্ধতি জানা ছিল তখনই। সংহিতাগুলি থেকে

দেখা যায় যে ওই সময়কার চিকিৎসকরা চোখ, হৃদযন্ত্র, পাকস্থলী, ফুসফুস ও চর্মের নানা রোগের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে মানবদেহের প্রায় তিন শো'র মতো বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশের নাম পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও লিখিত রচনার সূত্র থেকে ওই যুগের বৈষয়িক সংস্কৃতি এবং বৈদিক যুগের প্রাচীন ভারতীয়দের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও খানিক-খানিক ধারণা করা সম্ভব।

উপনিষদসমূহ ও তাদের শিক্ষা

ভারতে উপনিষদগুলিকে বৈদিক সাহিত্যের চূড়ান্ত অংশ হিসেবে গণ্য করাই সাধারণ রীতি। উপনিষদ হল বেশ বড় একগুচ্ছ গ্রন্থ, বৈদিক অতিকথামূলক উপাখ্যান ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহের নানা ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যা যার অন্তর্ভুক্ত। উপনিষদগুলি বেদান্ত বা বেদের চূড়ান্ত অংশ নামেও গণ্য। পরে এই নামটি ষড়্‌দর্শনের মধ্যে একটি দার্শনিক ভাবধারার নাম হিসেবে বিশেষভাবে গৃহীত হয়। এই দার্শনিক মতের প্রবক্তা-গোষ্ঠী দাবি করতেন যে তাঁরা অন্যদের চেয়ে আরও কড়াকড়িভাবে প্রাচীন ধর্ম ও দার্শনিক মত অনুসারী। বৈদিক ধর্মের অনুশাসনাদি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বেশি-বেশি মূর্ত ও সুনির্দিষ্ট আকারে বিশদ হয়ে ওঠে। আবার এর সমান্তরাল রেখায় সমগ্র ধর্মব্যবস্থার মধ্যে থেকে কিছু-কিছু স্বনির্ভর চিন্তা-ভাবনাকে পৃথক করার কাজও চলতে থাকে। যে-সমস্ত গ্রন্থে এইসব চিন্তা-ভাবনাকে বিশদ করে তোলা হয় পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইত্যাদির সেগুলিই হয়ে ওঠে পথিকৃৎ।

উপনিষদ-গ্রন্থগুলি মূলত ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক যুগের বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় এবং ওই একই সঙ্গে তার স্বাভাবিক সীমারও পরিচয়বাহী। উপনিষদসমূহ রচনার আগে যে-সমস্ত ধ্যানধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল গোটা একটা যুগপর্যায় ধরে উপনিষদগুলিতে সমগ্রভাবে সেগুলির এক মৌল ধরনের আগ্রহোদ্দীপক পুনর্বিচার নিষ্পন্ন হয়েছে। মূলত ঐতিহ্যসিদ্ধ এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার শুরু করে এই গ্রন্থগুলির রচয়িতারা বৈদিক বিষয়সমূহের এক্তিয়ার বহুদূর অতিক্রম করে গিয়ে সমস্যাদির সমাধানে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন। এই অনুপ্রেরিত সিদ্ধির ফলাফল লক্ষ্য করা যেতে পারে ভারতের পরবর্তী সাংস্কৃতিক বিবর্তনের যুগ-পরম্পরায় আগাগোড়া উপনিষদসমূহের উজ্জ্বল ভূমিকা পালনের মধ্যে। পরবর্তী পুরুষ-পরম্পরার কাছে এই গ্রন্থগুলি একদিকে যেমন অত্যন্ত প্রাচীন এবং ফলত একান্ত শ্রদ্ধার্হ পবিত্র সংস্কৃতির আকর হয়ে থেকেছে, তেমনই অন্যদিকে তা হয়ে উঠেছে বেদবাদ থেকে ইতিমধ্যেই বহুদূরে অপসৃত এক নবীন ধারার

ধর্মীয় ও দার্শনিক ধ্যানধারণার অপরিহার্য অংশ। এইভাবে ভারতের ইতিহাসে এই গ্রন্থগুলি ইতিহাসের দুটি কালপর্বের মধ্যে জীবন্ত যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বৃহত্তর তাৎপর্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার প্রতীক। 'উপনিষৎ' শব্দের মূল ব্যুৎপত্তি কী, এর মীমাংসা এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি নিষ্পন্ন হয় নি। খুব সম্ভব শব্দটি ইঙ্গিত দিচ্ছে শাস্ত্রীয় পাঠ প্রচারের ধরনটির, অর্থাৎ গুরু তাঁর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট শিষ্যবর্গের কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করছেন (উপ-নি+সদ্—নিকটে উপবেশন) এই ব্যাপারটির। পরে অবশ্য 'উপনিষৎ' শব্দটির অর্থ করা হয় 'যাহা হইতে গূঢ়বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়'। উপনিষদসমূহের সাধারণভাবে স্বীকৃত মোট সংখ্যা হল ১০৮টি, তবে এদের মধ্যে মাত্র ১৩ খানি সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে গণ্য। এই ১৩ খানি গ্রন্থকেই মূল উপনিষদ বলা হয় এবং এগুলি খ্রীস্টপূর্ব সাত থেকে চার শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি গ্রন্থ 'বৃহদারণ্যক' ও 'ছান্দোগ্য' সবচেয়ে প্রাচীন দু'খানি উপনিষদও বটে। এই সমস্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার কথক সাধারণত কোনো-না-কোনো শ্রদ্ধাভাজন গুরু বা ঋষি (এবং এই গুরুরা খুব সম্ভবত বাস্তব ঐতিহাসিক নানা ব্যক্তি)। গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ উপদেশ ও আলোচনাসমূহের প্রধান বক্তব্য বিষয় হল বেদসমূহের সঠিক পাঠোদ্ধার। বেদসমূহের তাৎক্ষণিক অর্থ ইতিমধ্যেই অন্যদের কাছে পরিষ্কার এটা ধরে নিয়ে এবং বেদগ্রন্থগুলিকে রূপক-বর্ণনা কিংবা সত্যিকার 'গূঢ়' অর্থের পরোক্ষ উল্লেখমাত্র গণ্য করে উপনিষদের গ্রন্থের-পর-গ্রন্থে বৈদিক পাঠের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দেয়া হয়েছে।

মূলত উপনিষদসমূহ হল একটিমাত্র দার্শনিক মতের কাঠামোর মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে ব্যাখ্যা করার প্রথম এক প্রয়াস। উপনিষদগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট একটি ধারণার প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে উপনিষদকার ভিন্নভাবে ধারণাটিকে প্রকাশ করলেও ধারণাটি মূলত অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় সূত্রাকারে ধারণাটিকে প্রকাশ করা চলে মাত্র চারটি শব্দে: 'আত্মন্ই ব্রহ্মান, ব্রহ্মনই আত্মন্।' অনেকগুলি উপনিষদই এই সূত্রটির ব্যাখ্যায় নিয়োজিত। ব্যাখ্যা ও আলোচনার ধারাটি সাধারণত নিম্নরূপ: বিশ্বসৃষ্টি রয়েছে মূলত অব্যাহত পরিবর্তনের ধারার মধ্যে, আর এই পরিবর্তনের রূপ প্রকাশ পাচ্ছে কেবলমাত্র বাইরের স্থূল বস্তুনিচয়ের রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই নয়, 'আত্মিক জগৎ'এর ওপর সমপরিমাণে তার প্রভাববিস্তারের মধ্যে দিয়েও।

সুপ্রাচীন সর্বপ্রাণবাদের ধ্যানধারণা থেকে যাত্রা শুরু করে উপনিষদসমূহ তথাকথিত কর্মবাদের সূত্র উদ্ভাবন করেছে। এই কর্মবাদ পরে কেবলমাত্র নিষ্ঠাবান ধর্মমতগুলিকেই নয়, জৈন ও বৌদ্ধধর্মমতগুলিকেও প্রভাবিত করেছে, চারিয়ে গেছে তাদের মধ্যে। কর্মবাদ অনুসারে প্রতিটি বস্তুই নৈতিক নিয়মের অধীন, সবকিছুই

নৈতিক নিয়মে স্থিরীকৃত; প্রতিটি বস্তুরই আত্মা আছে, সেই আত্মার আবার জন্ম ও মৃত্যু আছে এবং মৃত্যুর পর সেই আত্মার পুনর্জন্ম ঘটে; মানুষ পূর্বজন্মে যে-কাজ করে সেই অনুসারে তার আত্মার পুনর্জন্ম নির্ধারিত হয়; যে-মানুষ নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে নিজেকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় করে তোলে, সে আবার জন্ম নেয় কোনো মানবেতর প্রাণী, গাছপালা বা পাথরের রূপ নিয়ে, তবে সৎ ও ন্যায় আচরণের মধ্যে দিয়ে সে ফের নিজেকে মানুষের স্তরে উন্নীত করতে পারে, এমন কি জীবাশ্মের স্তর থেকেও।

প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ছাড়াও এই মতবাদ (কিছুটা কষ্টকল্পনার সাহায্যেই) বেদবাদ থেকে জাত দেবতা ও দানবদের গোটা জগৎকেও আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে আত্মা নিজেকে দেবত্বের পর্যায়ে পর্যন্ত উন্নীত করতে পারে, স্বর্গের সুখভোগেরও অধিকারী হতে পারে সে, কিংবা নরকে নিজেকে অবনমিত করতে পারে। তবে আত্মার এই কোনো অবস্থাই চিরস্থায়ী নয় (এখানেই উপনিষদগুলি বৈদিক ঐতিহ্য থেকে লক্ষণীয়ভাবে সরে আসার প্রমাণ দিয়েছে)। এমন কি যে-সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের উপচার নিবেদন করা হয় সেইসব দেবতাও বিশেষ-বিশেষ আত্মার বিশেষ অবস্থা ও অবস্থানের নামমাত্র ছাড়া কিছু নন। এক্ষেত্রে কর্ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই কারক-শক্তি, যা মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বব্যাপারের গোটা বৈচিত্র্যকে বেঁধে ফেলছে সুনির্দিষ্ট একটি ঐক্যবিধায়ক নীতির সূত্রে।

উপনিষদগুলিতে কর্মবাদ সংগতি খুঁজে পেয়েছে চিরন্তন প্রবহমান জীবন বা সংসারের তত্ত্বের সঙ্গে। এই দুটি তত্ত্ব একত্রে পরে ভারতের বহু ধর্ম ও দার্শনিক মতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে এবং এই দুটি তত্ত্বকে সেখানে অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে বিশদ করা হয়েছে। তবে উপনিষদগুলি কেবল বিশ্বব্যাপারের অনন্ত প্রবহমানতা ও পরস্পর-সংযোগের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গ্রন্থগুলি এই সমস্ত তত্ত্বকথার ছককে তাদের মতাদর্শের কেন্দ্রীয় অংশে অগ্রগতির পথে খানিকটা প্রস্তাবনা হিসেবেই ব্যবহার করেছে যেন। আর ঔপনিষদিক এই কেন্দ্রীয় তত্ত্ব হল আত্মন্ বা প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তুর আন্তর সত্তার সঙ্গে ব্রহ্মন, বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নৈর্ব্যক্তিক, সর্বব্যাপী দৈবী অন্তঃসারের অভিন্নতাসাধন। তবে এই মতবাদ বিশ্বসৃষ্টির বহুবিচিত্র সকল রূপের মধ্যে এক ধরনের আদি কারণসম্ভূত ঐক্যবিধানের নিছক একটি প্রয়াসের চেয়ে আরও কিছু বেশি, এ হল আচার-আচরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশদীকৃত এক নিয়মাবলীর ভিত্তিস্বরূপ যায় প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে ধর্মীয় তাৎপর্য নিহিত।

এটা স্পষ্ট যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উপনিষদগুলি লক্ষণীয়ভাবে বৈদিক ধ্যানধারণা থেকে পৃথক মত পোষণ করেছে, কারণ উপনিষদের ঋষিরা বেদের ধ্যানধারণাকে ধর্মীয় বিচারে যথেষ্ট গভীর বলে মনে করতে পারেন নি। বৈদিক

ঐতিহ্যসিদ্ধ বহু ধারণাকে উপনিষদগুলিতে নতুন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অবতারণা করা হয়েছে নতুন যুক্তিতর্কের ভিত্তির। বৈদিক ভারতীয় যজ্ঞের পুজো-উপচার নিবেদনের বিনিময়ে সৌভাগ্যলাভের কারণে বহুতর পার্থিব দোষগুণের আকর ঐতিহ্যসিদ্ধ তাঁর দেবতাদের শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়েছেন। কিন্তু উপনিষদসমূহ উপস্থাপিত করেছে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতাদর্শ। তারা বলছে যে কোনো বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট দেবতা নেই, যেমন নেই স্থান কিংবা কালের গণ্ডিতে বাঁধা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। আসলে মানুষ অন্য সকল জীবের সমান, বিশ্বসৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন ও অশেষ চক্রের অংশবিশেষ সে, প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যার ধ্বংসাতীত সংহতি বিদ্যমান। জীবনের প্রবাহ চিরন্তন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল জীবই তার অংশভূত। মানুষই হল এই সমস্ত 'অণু-পরমাণু'র মধ্যে একমাত্র, যে এই জীব-প্রবাহের অন্তঃসারটি উপলব্ধি করতে সমর্থ এবং পরিশেষে জীবনের সকল বন্ধন থেকে আত্মিক মুক্তি অর্জনে সক্ষম। তবু, এই সবকিছু সত্ত্বেও, মানুষকে ফিরে-ফিরে আসতে হয় জড় অস্তিত্বের জগতে এবং ফের স্থান করে নিতে হয় অন্তহীন জন্মচক্রের নেমিতে।

উপনিষদসমূহের আদর্শ মানুষ হলেন সেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা যিনি জাগতিক কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না, সকল উত্থান-পতন ও আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে, এমন কি ধর্মের ব্যাপারেও, থাকেন নির্বিকার হয়ে। নিজেকে চারপাশের সবকিছুর অংশ বিবেচনা করে এবং বলতে গেলে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তোলার পর তাঁর পক্ষে আর বেশি কী কামনা করার থাকতে পারে? প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহ ও দেবতাদেরও ঊর্ধ্বস্তরে উঠে যান তিনি, একমাত্র তিনিই এমন এক অস্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন যা বিশ্বসৃষ্টির মতোই, কিংবা উপনিষদসমূহ যাকে বিশ্বসৃষ্টির নিয়ত-বর্তমান প্রতীক বলেছেন সেই ব্রহ্মন্ বা ব্রহ্মের মতোই, চিরন্তন ও অবিনাশী।

এই সমস্ত এবং আরও বহুতর মতাদর্শ ও ধ্যানধারণা মিলিয়ে গড়ে উঠেছে উপনিষদসমূহের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত দূরকল্পনামূলক দার্শনিক মতবাদ। অথচ ওই একই সঙ্গে উপনিষদসমূহে কেবল যে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা-ই নয়, বস্তুবাদী মতামতও মেলে সেখানে। শুধু তা-ই নয়, উপনিষদগুলিতে উপরোক্ত দুই ধ্যানধারণার জটিল সহাবস্থানের সাক্ষাৎ তো মেলেই, উপরন্তু তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধেরও দেখা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকসমূহে বা পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে কিন্তু এই বিরোধ উপরিতলের নিচে চাপা ছিল। উপনিষদসমূহে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে শাণ্ডিল্য, যাজ্ঞবল্ক ও উদ্দালক নামের তিন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষিকে। এঁদের প্রথম দুজনকে দেখানো হয়েছে মূল ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে, অর্থাৎ আত্মন্ ও ব্রহ্মনের সাযুজ্য-বিষয়ক তত্ত্বের সমর্থক বলে (এঁদের প্রচারিত মতাদর্শের সঙ্গে রক্ষণশীল

ঐতিহ্যকে যুক্ত করে বারবার যে উল্লেখ করা হয়েছে এটা অহেতুক নয়)। অন্যপক্ষে ঋষি উদ্দালক এমন সমস্ত বাস্তববাদী ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন যা বস্তুবাদী দর্শনের বিশেষ একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের খুব কাছাকাছি এসে পেঁছেছে। উদ্দালক সম্পূর্ণ নিজের মতো করে সাহসের সঙ্গে বেদসমূহের সৃষ্টিরহস্যমূলক সূক্তগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাপারে দেবতাদের বিশেষ ভূমিকাকে একেবারেই অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতিকেই সৃষ্টিশক্তির প্রধান উৎস বলে গণ্য করেছেন উদ্দালক; তাঁর মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে (আর এর অর্থ বাহ্য পদার্থ-জগৎ ও সচেতনা সহ মানসিক ক্রিয়াকলাপ উভয়ই) সে-সবই জড়পদার্থসমূহ থেকে উৎপন্ন। এমন কি আত্মনের ধারণাটিকেও তিনি অন্য দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তাঁর মতে আত্মন্ হল প্রাথমিক বস্তুগত মানবিক ভিত্তি।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং বড় রকমের সামাজিক পরিবর্তনের ফলে উপরোক্ত ওই সমস্ত ধ্যানধারণা দেখা দেবে।

সমগ্রভাবে বিচার করলে বলতে হয়, উপনিষদসমূহ থেকে উদ্ভূত মতাদর্শ ও ধ্যানধারণাগুলি ভারতের পরবর্তী সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশকে গভীর ও বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

উপনিষদগুলিতে যে-কর্মবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা পরবর্তী ভারতীয় ধর্মসমূহের অন্যতম মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া এই বিশেষ মতবাদটির সুনির্দিষ্ট সামাজিক তাৎপর্যও বড় কম নয়, কেননা মানুষের সকল দুঃখকষ্ট ও দুর্দশার পেছনে নিহিত কারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তর যুগিয়েছে এ। এই মতবাদ অনুসারে দেবতারা নন মানুষ নিজেই তার কাজকর্মের বিচারক এবং মানুষের দুঃখকষ্টও চিরন্তন নয়। উপনিষদগুলিতে বিধিবদ্ধ নীতিগুলি পরে বৌদ্ধ এবং জৈন-ধর্মসমূহেও নীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় (এ-সম্পর্কিত আলোচনা পরে দেখুন)। পরবর্তীকালে বস্তুবাদী দার্শনিক ধারা লোকায়তও উপনিষদসমূহের সামগ্রিক শিক্ষার মধ্যে 'বস্তুবাদী ভাবধারা' থেকে পুষ্ট হয়। উপনিষদসমূহে প্রাপ্তব্য বহু ধ্যানধারণা বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করে ভারতের মধ্য যুগের দার্শনিক পণ্ডিত ও লেখকদের ওপর এবং কেবলমাত্র ভারতের মধ্যেই নয় তার সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত তা প্রভাবিত করে আধুনিক ও সমকালীন ইতিহাসের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাগুলিকে।

মগধ ও মৌর্য-যুগে ভারত

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়টিকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পরবর্তী যুগের সূচনাকাল বলে ইতিহাসবেত্তারা সাধারণত গণ্য করে থাকেন। এটি হল মগধ ও মৌর্য-যুগের প্রারম্ভ, যে-যুগটি টিকে ছিল পরবর্তী প্রায় চার শতাব্দী ধরে (বিশাল মৌর্য-সাম্রাজ্য ও পরবর্তী শুঙ্গ ও কাহ্ন রাজবংশ-দুটির পতনের কাল পর্যন্ত)। মৌর্য-রাজবংশের নিজস্ব অস্তিত্বকাল ছাড়িয়ে আরও বহু দীর্ঘ সময় ব্যেপে এই যুগটির অধিষ্ঠান এবং ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের একটি এটি। মৌর্য-যুগ চিহ্নিত হয়ে আছে (ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম) ঐক্যবদ্ধ একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং লিখিত লিপির বিস্তারের মধ্যে দিয়ে। বৌদ্ধধর্মের সংহতি ও প্রসার এবং বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের উদ্ভবের কারণেও মৌর্য যুগ বিশিষ্ট হয়ে আছে। বর্তমান ভারতে এই যুগটিকে কেন-যে দেশের সংস্কৃতির অগ্রগতি ও প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-বিকাশের ক্ষেত্রে সন্ধিক্ষণ গণ্য করা হয় তা বোঝা শক্ত নয়।

এই যুগটি এর পূর্ববর্তী যুগের মতো নয়, এ-সময়কার তারিখ-সাল সমন্বিত বিবরণাদি পাওয়া যায়। যেমন, পাওয়া যায় পাথরে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ (মৌর্য-সম্রাট অশোকের প্রচারিত অনুশাসনসমূহ) এবং লিখিত গ্রন্থাদি (রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় নিযুক্ত সেলুকাস-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থেনিসের বিবরণ)। চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা কৌটিল্যের রচনা বলে পরিচিত কূটনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র বহু শতাব্দী ধরে মৌর্য যুগের গোড়ার আমলের রচনা বলে কথিত হয়ে আসছে। নতুন গবেষণার ফলে অবশ্য জানা গেছে যে বর্তমানে যে-চেহারায় অর্থশাস্ত্র বইখানিকে আমরা পেয়েছি তা লেখা হয়েছিল খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী কোনো সময়ে, তবে বইটির অনেক খুঁটিনাটি তথ্য যে আরও পূর্ববর্তী যুগের, বিশেষ করে মৌর্য যুগের রাষ্ট্র-কাঠামোর পরিচয় বহন করছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তথ্যাদির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ কৌতূহলপ্রদ।

এই যুগ নিয়ে গবেষণারত ইতিহাসবেত্তাদের উপকারে লেগেছে পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলি। এইসব শাস্ত্রগ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মমত ও নীতিশাস্ত্রের

ব্যাখ্যার পাশাপাশি আছে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়সূচক বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। অশোকের কিছু-কিছু শিলালিপিতে পালি ধর্মশাস্ত্রের বেশ কয়েকটি সূত্রের নাম উল্লিখিত আছে, তা থেকে বোঝা যায় যে ওই যুগে এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদরাও এযুগের বেশকিছু আগ্রহোদ্দীপক উপাদান আবিষ্কার করেছেন।

রাজনৈতিক বিকাশের নতুন স্তরসমূহ

মগধের উদ্ভব

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস চমকপ্রদ নানা ঘটনায় পূর্ণ। এটা হচ্ছে সেই যুগ যখন ভারতে প্রথম বড়-বড় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, শক্তি সংগ্রহ করেছে ও তারপর প্রাধান্যলাভের জন্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছে।

লিখিত বিবরণাদির নজির থেকে এটা স্পষ্ট যে ওই সময়ে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রচুর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামরিক সংঘর্ষ ঘটেছিল, রাজবংশগুলির মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বংশানুক্রমিক রাজ্য ও প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদের তো কথাই নেই।

প্রথম যুগের বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদির সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা বলা চলে যে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি উত্তর ভারতে ষোলটি বা ষোড়শ মহাজনপদ (বা 'বৃহৎ রাষ্ট্র')-এর অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য এগুলির মধ্যে উত্তর ভারতের তৎকালীন সকল রাষ্ট্রই অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত ওই অঞ্চলে তখন মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ষোল'র চেয়ে অনেক বেশি। ষোল সংখ্যাটি দিয়ে কেবল তাদের মধ্যে বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকেই বোঝানো হয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ওই ষোলটি 'বৃহৎ রাষ্ট্র'এর মধ্যে চোদ্দটি রাষ্ট্রকেই 'মধ্য দেশ'এর অন্তর্ভুক্ত করাটা ভারতে স্বীকৃত ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে গঙ্গা-উপত্যকায় অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারটি ভারতের ওই অঞ্চলে রাষ্ট্র-কাঠামোর অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশেরও সাক্ষ্য দেয়।

ওই সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রধান রাষ্ট্রশক্তি বা কেন্দ্র ছিল মগধ, যাকে ঘিরে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হয়েছিল। মগধ রাষ্ট্রের

নামটি প্রথম উল্লিখিত হয়েছে অথর্ববেদে, পরে এই নামটি প্রাচীন ভারতের অন্যান্য বহু বিচিত্র পুথিপত্রেও দেখা গেছে।

প্রাচীন রাষ্ট্র মগধ (বর্তমান মধ্য ও দক্ষিণ বিহার জুড়ে একদা যার অবস্থান ছিল) এমন এক অত্যন্ত সুবিধাজনক ভৌগোলিক স্থান দখল করে ছিল যার ফলে তার রণনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিকাশের সম্ভাবনা ঘটেছিল অফুরন্ত। লিখিত পুথিপত্রে মগধ-রাজ্যে জমির উর্বরতার কথা উল্লিখিত হয়েছে, স্পষ্টতই যা ছিল পরিশ্রমসাধ্য চাষবাসের ফল। এই রাষ্ট্র ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলের সঙ্গে ফলাও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত, এর জমি সমৃদ্ধ ছিল নানা ধাতু সহ বিচিত্র খনিজ সম্পদে। এর প্রাচীন রাজধানী অবস্থিত ছিল রাজগৃহে (পালিভাষায় 'রাজগৃহ' নামটি পরিণত হয়েছে 'রাজগেহ'এ। বর্তমানে এ-জায়গাটি রাজগির নামে পরিচিত)।

মগধের রাজবংশের ইতিহাস জানা যায় অল্পই। তবে হর্যঙ্ক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসার (৫৪৫/৫৪৪-৪৯৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) সম্বন্ধে কিছু-কিছু ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র অঙ্গ অধিকার করেছিলেন। এর ফলে মগধ-রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তার পরবর্তী রাজ্যবিস্তার-নীতির ভিত্তি রচিত হয়। মগধের সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগাযোগেরও নানা উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক নজিরগুলিতে।

বিম্বিসার তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন। রাষ্ট্রের কর্মচারিদের কাজকর্ম কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর (৪৯৩-৪৬১ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) আমলে গঙ্গা-উপত্যকার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির একটি কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ (পালি নাম-পসেনাদি)-এর বিরুদ্ধে মগধ প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করে। দীর্ঘদিন এই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার পর শেষপর্যন্ত বিজয়ী হয় মগধ।

মগধের সঙ্গে আরেকবার প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে মগধ-রাজ্যের উত্তরদিকস্থ প্রতিবেশী লিচ্ছবিদের প্রজাতন্ত্রীয় জোটবদ্ধ রাষ্ট্রের সঙ্গে। গঙ্গানদীর ওপর বিশেষ একটি বন্দর দখল করার জন্যে মগধ খুব উদগ্রীব ছিল, কিন্তু তার আগেই লিচ্ছবিরা ওই বন্দরটি দখল করে নেয়ায় এই সংঘর্ষ বাধে। লিচ্ছবিদের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতি ও অপেক্ষার সময় রাজা অজাতশত্রু পাটলিগ্রাম নামে বিশেষ একটি দুর্গ-নগর নির্মাণের আদেশ দেন। এছাড়া তিনি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে লিচ্ছবিদের রাজধানী বৈশালীতে তাঁর একজন রাজ-কর্মচারিকে দিলেন পাঠিয়ে আর সেই ব্যক্তি শত্রু-শিবিরে অনৈক্য সৃষ্টিতে সফল হল। একাধিক ঐতিহাসিক নজির অনুসারে মগধ এবং লিচ্ছবিদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল ষোল বছর ধরে এবং এবারও শেষপর্যন্ত বিজয়ী হল মগধ।

জৈন শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মতে রাজা অজাতশত্রুর এই সমস্ত সাফল্যের মূলে ছিল অবরোধ ভাঙবার জন্যে তাঁর সৈন্যদলের বড়-বড় বাঁটুলের মতো এক ধরনের অস্ত্র-ব্যবহার। এইসব বাঁটুল বা গুল্‌তি দিয়ে শত্রুসৈন্যের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করা হোত।

ওই সময়ে মগধের আরেক প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল পশ্চিম ভারতের এক শক্তিশালী রাষ্ট্র অবন্তী।

মগধের প্রধান প্রতিপক্ষসমূহ — কোশল, অবন্তী ও লিচ্ছবিদের মৈত্রীজোট — মগধের বিরুদ্ধে তখন সংগ্রাম চালাচ্ছিল কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের জন্যেই নয়, অর্থনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের জন্যেও। এ-কারণেই প্রয়োজনীয় বাণিজ্য-পথ হিসেবে গঙ্গা ও তার শাখানদীগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ-বিস্তারকে তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হোত।

মগধের রাষ্ট্রশক্তিকে আরও দৃঢ়মূল করে তোলার জন্যে অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ন (৪৬১-৪৪৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন। প্রাচীন ভারতে এই পাটলিপুত্র কালক্রমে হয়ে ওঠে প্রধান একটি ক্ষমতার কেন্দ্র। এরও পরবর্তী এক সময়ে অবন্তী রাজ্যের শক্তি হ্রাস পায়। তখন নতুন একটি রাজবংশ শিশুনাগ বংশের রাজা শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে আসীন। এই রাজবংশও পরে নন্দ-বংশকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নন্দ-বংশের অধীনে মগধের অধীনস্থ সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে। এই সমস্ত রাজবংশের ইতিহাস মোটেই সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না এবং ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতেরাও এই সময়কার যে-সমস্ত সন-তারিখ মেনে নিয়েছেন সেগুলিও আনুমানিক সময়চিহ্নমাত্র। এই যুগের গবেষক পণ্ডিতেরা প্রধানত নির্ভর করে থাকেন যে-সব তথ্য-প্রমাণের ওপর সেগুলি পাওয়া গেছে পরের যুগের সিংহলী ধারাবিবরণীগুলি (খ্রীস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত দীপবংশ ও খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত মহাবংশ নামের বিবরণীগুলি) এবং মধ্য যুগের সূচনাকালে সংকলিত পুরাণগুলি থেকে। এ-সবের মধ্যে নিচের তারিখগুলি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়: যথা, বিম্বিসার-প্রতিষ্ঠিত হর্যঙ্ক-রাজবংশ (৪৩৭-৪১৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), শিশুনাগ-রাজবংশ (৪১৩-৩৪৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) এবং নন্দ-রাজবংশ (৩৪৫-৩১৭/৩১৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)।

আকিমেনিড-সাম্রাজ্য ও মাসিডোনিয়ার আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ

এই যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিন্তু পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। গঙ্গা-উপত্যকার মতো সেখানে চারপাশের উপজাতি ও জনগোষ্ঠীগুলিকে ঐকাবদ্ধ করার

মতো শক্তিধর কোনো বড় রাষ্ট্র ছিল না। ওই এলাকায় বাস করত তখন বহুবিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতির বাহক বহুতর নৃকুলগোষ্ঠীর উপজাতিসমূহ। সেখানকার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল কম্বোজ ও গান্ধার, যাদের ষোড়শ 'বৃহৎ রাষ্ট্র'এর মধ্যে ধরা হোত।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু-কিছু অঞ্চল ছিল আকিমেনিড-সাম্রাজ্যের অংশ।

প্রখ্যাত আকিমেনিড-সম্রাট দারিয়ুস (৫২২-৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)-এর পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে গান্ধার এবং সিন্ধুনদ-অঞ্চলকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শেষোক্ত সিন্ধুনদ-অঞ্চল বলতে স্পষ্টতই বোঝানো হচ্ছে নদবিধৌত মধ্য ও দক্ষিণ এলাকাগুলিকে, তবে সম্ভবত এগুলির পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলকেও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। দারিয়ুসের নির্দেশে কারিয়ান্দার স্কিলাখ 'সিন্ধুনদ ঠিক কোন জায়গায় সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে' তা নির্ণয় করার জন্যে যে-অভিযান পরিচালনা করেন তার এক কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায় হেরোডোটাসের রচনা থেকে। এই অভিযানটি রণনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় বিচারেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে পারশিকরা ভারতীয় অঞ্চলসমূহের জাতিগোষ্ঠীগুলি ও তাদের আচার-ব্যবহার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।

যদিও উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অংশমাত্র আকিমেনিড-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তবু ওইসব ভূখণ্ড এবং দেশের আরও কিছু-কিছু অঞ্চল তখন আকিমেনিড-শাসনাধীন পারশ্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের অধীন হয়েছিল অল্পাধিক পরিমাণে।

উত্তর-পশ্চিমের এইসব ভূখণ্ড মারফত ভারত তখন নিকট-প্রাচ্য ও মধ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সংস্পর্শে এসেছিল, কারণ ওইসব অঞ্চলের কিছুটা অংশও ছিল তখন আকিমেনিড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই সাম্রাজ্যের দলিল-দস্তাবেজের সরকারি ভাষা ছিল আরামেইক। এই ভাষা পরেও দুনিয়ার ওই অংশে বেশ কিছুকাল ব্যবহৃত হয়েছে।

ভারতের যে-সমস্ত অঞ্চল আকিমেনিড-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য দেশে জানা ছিল, কিন্তু ওই যুগের ধ্রুপদী লেখকরা তৎকালীন পূর্ব ভারত সম্বন্ধে এবং গঙ্গা-উপত্যকায় তখন কী-যে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ঘটে চলেছিল সে-সম্বন্ধেও কার্যত কিছুই জানতেন না। হেরোডোটাসের মতে ভারতের ওই অংশ ছিল নিছক মরুভূমিমাত্র। পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের চেহারা (এবং এটি ভারতের পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য) বহুপরিমাণে বদলে যায় মাসিডোনিয়ার আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পর।

আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারত-ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন পূর্ববর্তী বড়-বড় সামরিক

বিজয়ের ফলে তাঁর খ্যাতি তখন তুঙ্গে। তাঁর প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ সাফল্যও সুনিশ্চিত মনে হচ্ছিল তখন। তদুপরি উত্তর-পশ্চিম ভারতও তখন বিভক্ত ছিল পরস্পর-শত্রুভাবাপন্ন উপজাতিক জোটগুলিতে; ছোট-ছোট রাষ্ট্রজোটের রাজাদের মধ্যেও ঐক্য ছিল না। আঞ্চলিক কিছু-কিছু ক্ষুদ্র রাজা (যেমন, তক্ষশিলার শাসক) গোড়াতেই আলেক্‌জাণ্ডারের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। এর বিনিময়ে আলেক্‌জাণ্ডার তাঁদের কিছু-পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে অঙ্গীকার করলেন এবং তাঁদের নিজ-নিজ রাজত্ব বজায় রাখারও অধিকার দিলেন। তবে ভারত-অভিযানের একেবারে সূচনা থেকেই আলেক্‌জাণ্ডারকে বহু উপজাতির কাছ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হল। এই অভিযানের বিবরণদাতারা আলেক্‌জাণ্ডারের বীরকীর্তি ও তাঁর সাফল্যের জয়গানে মুখর হলেও ভারতীয়দের বিস্ময়কর অধ্যবসায় নিয়ে বারংবার প্রতিরোধ, তাদের বীরত্ব ও মৃত্যুপণ সংগ্রামের তীব্র আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ না-করে পারেন নি। বহু ভারতীয় উপজাতি-গোষ্ঠী সরাসরি অস্বীকার করে গ্রীক ও মাসিডোনীয়দের কাছে বশ্যতাস্বীকার করতে এবং অসম যুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে আসে; বস্তুত বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তারা এমন কি জয়ী পর্যন্ত হয়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন পুরু। আলেক্‌জাণ্ডারের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত রাজা সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পুরু ছিলেন তাঁদের একজন। কয়েকদিনব্যাপী পুরু ও আলেক্‌জাণ্ডারের এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিডাস্পেস (ঝিলম বা বিতস্তা) নদীর তীরে। আরিআন- লিখিত আলেক্‌জাণ্ডারের আনাবাসিস (বা অভিযান)-সম্পর্কিত ইতিহাসে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি থেকে এই যুদ্ধের ব্যাপ্তি ও প্রচণ্ডতা অনুমান করা যায়। আরিআন জানাচ্ছেন যে শেষদিনের নির্ধারক যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তিরিশ হাজার পদাতিক ও চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ব্যবহৃত হয়েছিল তিন শো রথ ও দু'শো হাতি। কেবলমাত্র চাতুর্যপূর্ণ রণকৌশলের সাহায্যেই আলেক্‌জাণ্ডার পুরুর সৈন্য-সমাবেশ ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বল্প অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী সক্ষম হয়েছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কিন্তু ধীরগতি ভারতীয় সৈন্যদলকে ভয় পাইয়ে দিতে ও ছত্রভঙ্গ করতে। যদিও আলেক্‌জাণ্ডার এ-যুদ্ধে জয়ী হন, তবু গুরুতর আহত অবস্থাতেও রাজা পুরু যুদ্ধ চালিয়ে যান শেষপর্যন্ত। ভারতীয় রাজার এই দুর্জয় সাহসের পরিচয় পেয়ে আলেক্‌জাণ্ডারও বশীভূত হন। তিনি শুধু পুরুর জীবনই রক্ষা করলেন না, রাজ্যও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে।

আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাবাহিনী অতঃপর আরও পূর্বদিকে হিড্রোয়েটস (রাবী বা ইরাবতী) নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। হিফাসিস (আধুনিক বিয়াস বা বিপাশা) নদী পার হওয়ার জন্যে সৈন্য-সমাবেশ শুরু করলেন আলেক্‌জাণ্ডার।

তবে তার আগে তিনি ঠিক করলেন হিফাসিসের অপর পারের দেশটি সম্বন্ধে. সেখানকার রাজা ও তাঁর সৈন্যদলের শক্তি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সব খবরাখবর সংগ্রহ করবেন। স্থানীয় ছোট-ছোট ভূস্বামীরা আলেক্‌জাণ্ডারকে জানালেন ওই দেশটির ঐশ্বর্যের কথা এবং আগ্রাম্মেস নামে সেখানকার রাজার পরিচালনাধীন শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিবরণ। কিন্তু ওই সময়ে আলেক্‌জাণ্ডারের নিজ সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই দাবি করছিল এই ক্লান্তিকর যুদ্ধাভিযানের অবসান ঘটানোর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষপর্যন্ত আলেক্‌জাণ্ডারকে তাই রাজি হতে হল দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন পরিত্যাগ করে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দিতে। গ্রেকো-মাসিডোনীয় বাহিনীর এই পশ্চাদপসরণের সময়ে নতুন করে ফের একবার মাসিডোনীয়-বিরোধী অভ্যুত্থান ও সংঘর্ষের পালা চলল। এবার বিশেষ করে আলেক্‌জাণ্ডার-বাহিনীকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল সুসংগঠিত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী মল্ল-রাজাদের।

ভারত ছেড়ে যাবার সময় আলেক্‌জাণ্ডার পেছনে রেখে গেলেন অভিজ্ঞ সেনাপতিদের ও কয়েকজন স্থানীয় ভারতীয় রাজার পরিচালনাধীন বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত তাঁর বিজিত সাম্রাজ্য। তবে আলেক্‌জাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটা অংশমাত্র দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ভারতীয় আকর গ্রন্থগুলিতে তাঁর ভারত-অভিযান কিংবা তাঁর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না (ধ্রুপদী গ্রন্থকারদের কাছ থেকে এই সংবাদ পাচ্ছি আমরা)। তৎসত্ত্বেও ভারতের ইতিহাসের ওই যুগপর্যায়ের ঘটনাবলীর ওপর এই যুদ্ধাভিযানের প্রভাবকে তুচ্ছ বলে নাকচ করা চলে না।

আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-অভিযান থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাঁর হাতে ভারতীয়দের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ ঐক্যের অভাব, ভারতীয়দের মধ্যেকার বিরোধ-বিসংবাদ। একমাত্র বিদেশী আক্রমনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভারতীয় রাজন্যদের তখন বাধ্য হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছিল।

এই যুদ্ধাভিযান অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কও যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত ও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে। ভারত নিজেই অতঃপর গ্রীক ভাষা ও ভাবধারার জগতের ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

নন্দ-রাজবংশ ও রাষ্ট্র

আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় পাটলিপুত্রে রাজত্ব করছিল নন্দ-রাজবংশ। স্থানীয় ক্ষুদ্র রাজারা আলেক্‌জাণ্ডারকে এই নন্দ-রাজবংশেরই অধীন

সেনাবাহিনীর শক্তি-সামর্থ্য এবং রাজা আগ্রাম্মেসের জনপ্রিয়তার ঘাটতির কথা বলেছিলেন। এই তথ্য ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকদের রচনা থেকে পাওয়া গেলেও নন্দ-সাম্রাজ্য সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্যই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে প্রধানত স্থানীয় ভারতীয় আকর গ্রন্থগুলি থেকে।

ভারতীয় ইতিবৃত্ত অনুসারে নন্দ-রাজারা শূদ্র-বংশীয় বলে পরিচিত এবং সকল ক্ষত্রিয়কে নিধন করেই নাকি এই রাজবংশটি সিংহাসন অধিকার করেছিল বলে কথিত। শোনা যায়, প্রথম নন্দ-রাজ ছিলেন শূদ্রী মায়ের গর্ভে ও অজ্ঞাত পিতার ঔরসে জাত। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন ব্রাহ্মণদের লিখিত পুথিতে ও রাজবংশের ইতিকথায় (পুরাণসমূহে) নন্দ-রাজারা 'নীচকুল-জাত ও নীচ গুণসম্পন্ন মানুষ' বলে উল্লিখিত। ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকদের রচনাতেও নন্দ-রাজাদের এই বর্ণনা পাওয়া যায়। এ-থেকে অনুমিত হয় যে তাঁরা ভারতীয় পুথিপত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিছু-কিছু তথ্য-প্রমাণ থেকে এ-কথাও অনুমান করার কারণ ঘটেছে যে ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকরা প্রথম মৌর্য রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর মন্ত্রী চাণক্য সম্বন্ধে ভারতীয় উপাখ্যানগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই সমস্ত উপাখ্যানমালা থেকে উল্লেখ পাওয়া যায় মৌর্য-রাজবংশের পূর্ববর্তী নন্দ-বংশের রাজাদের সম্বন্ধেও।

নন্দ-রাজাদের প্রকাণ্ড সেনাবাহিনীর বর্ণনার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভারতীয় ও ধ্রুপদী ইউরোপীয় রচনাগুলির উল্লেখে প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ডিওডোরাস ও ক্যুইণ্টাস কার্টিয়াস রুফাস উভয়েই নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলির উল্লেখ করেছেন আগ্রাম্মেসের অধীনস্থ নন্দরাজ্যের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে। যথা, পদাতিক সৈন্য ২ লক্ষ, অশ্বারোহী সৈন্য ২০ হাজার, রথ ২ হাজার এবং তিন থেকে চার হাজার হাতি। কিছু-কিছু ভারতীয় ও সিংহলী পুথিতে প্রথম নন্দ-রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে উগ্রসেন বলে, অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তি যাঁর 'প্রকাণ্ড ও পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী' আছে।

নন্দ-রাজাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্যও ঐতিহ্যসূত্রে উল্লিখিত হয়ে আসছে, তা হল তাঁদের ধনসঞ্চয়ের স্পৃহা। সিংহলী পুথিগুলিতে প্রকাশ যে নন্দ-রাজারা চামড়া, কাঠ ও মূল্যবান খনিজ পাথর সহ সব ধরনের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিকেই রাজকীয় শুল্কদানের চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

তাঁদের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে ভালোরকম কাজে লাগিয়ে এবং শুল্কে আদায়ের নিয়মিত বিধিবদ্ধ রীতির প্রবর্তন করে নন্দ-রাজারা পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কিছু-কিছু আঞ্চলিক রাজবংশের শক্তি ও স্বাধীনতা বিনষ্ট করতে এবং দক্ষিণ ভারতের আরও দক্ষিণাঞ্চলে অনুপ্রবেশে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা। উৎকীর্ণ শিলালিপির সূত্র থেকে এটা স্পষ্টভাবে জানা

গেছে যে কলিঙ্গ-রাজ্য (বর্তমানে ওড়িষ্যা) কিংবা তার অংশবিশেষ নন্দ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নন্দ-রাজাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে যে-সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তা-ই পরবর্তী কালে হয়ে উঠেছিল মৌর্য-রাজবংশের অধীনস্থ ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্বরূপ।

মৌর্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার

মৌর্য-রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তবে এই ক্ষমতা ও অধিকার অর্জন করতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ-রাজবংশের বিরুদ্ধে এবং ভারতে আলেক্‌জাণ্ডারের রেখে-যাওয়া গ্রীক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও তুমুল সংগ্রাম চালাতে হয়। ক্ষমতালাভের জন্যে চন্দ্রগুপ্তকে এই-যে সংগ্রাম চালাতে হয় তার বিভিন্ন পর্যায়ের কৌতূহলোদ্দীপক নানা বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় ধ্রুপদী রচনাসমূহের সূত্র থেকে। তবে সংগ্রামের এই বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিবৃত্ত ও তার সত্যাসত্য নির্ণয় এখনও পর্যন্ত ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের বিষয়।

মৌর্য-রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধেও নানা মত প্রচারিত আছে। কিছু-কিছু মত অনুযায়ী নন্দ-রাজবংশ থেকেই মৌর্যদের উৎপত্তি এমন কথাও বলা হয়। বলা হয় যে চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং ছিলেন নাকি জনেক নন্দ-রাজার সন্তান। কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীন সূত্র অনুযায়ী (যেমন বৌদ্ধ ও জৈন পুঁথিপত্রে) মৌর্যদের মগধের একটি ক্ষত্রিয় বংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈন পুঁথিপত্রে বর্ণিত হয়েছে চন্দ্রগুপ্তের অল্প বয়সের কথা, তক্ষশিলায় তাঁর পাঠগ্রহণের বৃত্তান্ত এবং মনে করা হয়েছে যে সেখানেই তিনি তাঁর হিতৈষী ও ভবিষ্যৎ উপদেষ্টা কৌটিল্য (বা চাণক্য)-এর সাক্ষাৎ পান। তবে এই সমস্ত তথ্য কতদূর নির্ভরযোগ্য তা বলা শক্ত। প্রচলিত প্রাচীন মত অনুসারে চাণক্যের সঙ্গে মিলে চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশিলায় থাকতেই মগধের সিংহাসন দখলের এক পরিকল্পনা ফাঁদেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যুবক চন্দ্রগুপ্ত ও নন্দ-রাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দিয়েছেন রোমান লেখক জাস্টিনাসও (খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী)। তিনি এর বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন সম্রাট অগাস্টাসের আমলের জনৈক লেখক গ্নিউস পম্পেইয়াস ট্রোগাসের রচনা থেকে, আবার ট্রোগাস সম্ভবত এসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত-বিষয়ক ভারতীয় উপাখ্যানমালা থেকেই।

সিংহলী সূত্রের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মিলে সৈন্য-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, দেশের কয়েকটি অঞ্চল থেকে ভাড়াটে যোদ্ধা সংগ্রহ করা হয় এবং চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে শিগ্‌গিরই এক প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে।

গ্রীক লেখক প্লুটার্ক (৪৬-১২৬ খ্রীস্টাব্দ) এমন কি যুবক চন্দ্রগুপ্ত ও আলেক্‌জাণ্ডারের মধ্যেও এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন।

এই সাক্ষাৎকার যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে তা চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তৎকালীন নন্দ-বংশীয় রাজার প্রথমবারের সংঘর্ষের পরেই ঘটা সম্ভব। প্লুটার্কের মতে, নন্দ-রাজ আগ্রাম্মেস সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্তের ধারণা মোটেই ভালো ছিল না এবং আলেক্‌জাণ্ডারকে তিনি এই বলে প্ররোচিত করেছিলেন যে যদি আলেক্‌জাণ্ডার সর্বত্র-ঘৃণিত ওই ভারতীয় রাজার বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যদল পূর্বদিকে চালিত করেন তাহলে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে সমর্থন করবেন। তবে এখন আমরা জানি যে আলেক্‌জাণ্ডার এই পরামর্শ অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তর-প্রদেশে তাঁর অভিযান পরিচালনা করতে পারেন নি এবং যেদিক থেকে তিনি এসেছিলেন সেই পশ্চিম-অভিমুখে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

বৌদ্ধ এবং জৈন সূত্র থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের নন্দ-রাজবংশকে উৎখাত করার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়, কারণ সেবার তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ নিরাপদ করে তুলতে পারেন নি। ওই সময়ে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে স্বভাবতই সম্ভব ছিল না একই সঙ্গে গ্রীক ও মাসিডোনীয়দের প্রবল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো। আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ ভারত ত্যাগ করে যাবার পরই একমাত্র পরিস্থিতি চন্দ্রগুপ্তের অনুকূলে আসে।

আলেক্‌জাণ্ডার তাঁর অধিকৃত ভুখণ্ড কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যে বা প্রদেশে ভাগ করে দেন এবং এর একটা অংশ রেখে যান ভারতীয় রাজাদের অধীনেও। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন সামন্ত-রাজ্যে মাসিডোনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সামন্ত-রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যেই দেখা দেয় ক্ষমতার লড়াই। এই লড়াই আবার বিশেষরকম তীব্র হয়ে ওঠে ৩২৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে স্বয়ং আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পরে। এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন পঞ্জাবে, আগেকার শক্তি-সামর্থ্যের ছায়ামাত্রে পর্যবসিত অবশিষ্ট মাসিডোনীয় সৈন্যদলগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর জন্যে স্পষ্টতই প্রস্তুত হয়ে। ৩১৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে শেষ গ্রীক সামন্তরাজ ইউডেমস যখন ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত কার্যত হয়ে দাঁড়ালেন পঞ্জাবের অধীশ্বর। এই সময়ে আবার চন্দ্রগুপ্তের এক প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, আলেক্‌জাণ্ডারের দিয়ে-যাওয়া বিশাল এক ভূখণ্ডের অধিপতি, প্রবলপ্রতাপ ভারতীয় রাজা পুরুও নিহত হলেন। কাজেই এখন সর্বপ্রধান প্রতিপক্ষ মগধের সিংহাসন দখলের ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন চন্দ্রগুপ্ত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের

কয়েকটি প্রজাতন্ত্রীয় জোটবদ্ধ রাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি নন্দ-রাজের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করলেন।

অতএব গ্রেকো-মাসিডোনীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে চন্দ্রগুপ্তের চরম ক্ষমতা-দখলের সংগ্রামের, পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকারের যুদ্ধের একটি স্তর হিসেবে গণ্য করা চলে। বিদেশী সেনাবাহিনীসমূহের কবল থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডগুলিকে মুক্ত করা অবশ্যই ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তবু এমন কি প্রাচীন গ্রীস ও রোমের লেখকরাও আমাদের জানাচ্ছেন যে বিদেশী সেনাবাহিনী বিতাড়নের পর ভারতকে এক দাস-শিবিরে পরিণত করে চন্দ্রগুপ্ত নিজের মুক্তিদাতার ভূমিকা বরবাদ করে দিলেন। চরম ক্ষমতা দখলের পর যে-জনসাধারণকে তিনি একদা বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন তাদেরই তিনি পরিণত করলেন উৎপীড়ন-অত্যাচারের শিকারে (ম্নিউস পম্পেইয়াস ট্রোগাস থেকে জুনিয়ানাস জাস্টিনাসের উদ্ধৃতি-অনুসারে)।

নন্দ-রাজের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। নন্দ-রাজের ছিল বিশাল এক সেনাবাহিনী। বৌদ্ধশাস্ত্র 'মিলিন্দ-পহ্‌'এর বিবরণ অনুযায়ী এই চরম নির্ধারক যুদ্ধে নাকি নিহত হয়েছিল দশলক্ষ সৈন্য, দশ হাজার হাতি, একলক্ষ ঘোড়া ও পাঁচ হাজার রথারোহী যোদ্ধা (এই সংখ্যাগুলি অবশ্যই বেশ অতিরঞ্জন-দোষদুষ্ট, তবে যুদ্ধটি-যে প্রচণ্ড রকমের ও রক্তক্ষয়ী হয়েছিল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই)।

৩১৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এই তারিখটি মিলে যাচ্ছে ভারতীয় (বৌদ্ধ ও জৈন) এবং ধ্রুপদী ইউরোপীয় সূত্রে পাওয়া তথ্যাদির সঙ্গে, যদিও বহু ইতিহাসবেত্তা মৌর্য-রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সময় নির্দেশ করেছেন আরও পরের কালপর্যায় থেকে।

ধ্রুপদী ইউরোপীয় সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে আলেক্‌জাণ্ডারের বন্ধু, সহযোদ্ধা ও পরে সিরিয়ার রাজা সেল্যুকাস নিকাটরের যুদ্ধবিগ্রহের ও পরে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের কথা। তবে এই যুদ্ধবিগ্রহের কোনো কারণ ওইসব সূত্র থেকে জানা যায় না। আমরা বড়জোর অনুমান করতে পারি যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর নব-অর্জিত রাজশক্তি সংহত করে তোলার পর আলেক্‌জাণ্ডারের (diadochi) উত্তরাধিকারীবর্গের মধ্যে প্রাধান্য অর্জনের যে-সংগ্রাম তখন চলছিল তাকে নিজের স্বার্থসাধনের কাজে লাগান ও সেল্যুকাসকে আক্রমণ করেন। যে-সমস্ত এলাকা আলেক্‌জাণ্ডার দখল করেন ও তাঁর মৃত্যুর পর যা সেল্যুকাসের ভাগে পড়ে তা জয় করে নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। এ-উপলক্ষে কয়েকটি যুদ্ধের পর যে-সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় সে-অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত সেল্যুকাসকে পাঁচ শো হাতি উপহার দেন এবং মৌর্য-রাজা লাভ করেন পারোপামিসাস, আরাকোসিয়া ও গেড্রোসিয়া নামের তিনটি অঞ্চলের ওপর আধিপত্য।

সেল্যুকাস তাঁর দূত মেগাস্থেনিসকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠান। মেগাস্থেনিস এই বিদেশবাসের বিবরণ দেন তাঁর 'ইণ্ডিকা' নামের বিশেষ গ্রন্থটিতে (এই গ্রন্থের খণ্ডিত অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া গেছে)।

চব্বিশ বছর (সম্ভবত ৩১৭ থেকে ২৯৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) রাজত্ব করার পর চন্দ্রগুপ্ত মারা যান। অতঃপর মগধের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। গ্রীকদের কাছে ইনি আমিট্রোকেটিস (সংস্কৃতে শব্দটি হল 'অমিত্রঘাত', অর্থাৎ 'শত্রু নিধনকারী') নামে পরিচিত। মনে হয় এই উপাধিটি দেশের সে-সময়কার উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিরই পরিচয়বাহী। বেশ কয়েকটি এলাকায় তখন মাথাচাড়া দিয়েছিল বিদ্রোহ এবং কিছু-কিছু তথ্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী মনে হয় বিন্দুসারের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথের কিছু-কিছু ভূখণ্ড অধিকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের। তবে এ-যুগের নির্ভরযোগ্য কোনো শিলালিপি পাওয়া যায় নি।

পিতার মতো বিন্দুসারও গ্রীক-প্রভাবিত মিশর ও সেল্যুকাস-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কূটনীতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। স্ট্রাবো লিখছেন যে ডেইমাকোস নামে সেল্যুকাস-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের এক দূতকে পাঠানো হয় পাটলিপুত্রে। সেল্যুকাস-বংশীয় রাজা আণ্টিয়োকাস ও ভারতীয় রাজা বিন্দুসারের মধ্যে বার্তা-বিনিময় প্রসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন আথেনাইয়োস। তিনি লিখেছেন যে ভারতীয় রাজা আণ্টিয়োকাসকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁকে মিষ্টি মদ, শুকনো মেওয়া-ডুমুর ও একজন সফিস্ট দার্শনিক পাঠাতে। জবাবে বিন্দুসারকে জানানো হয় যে তাঁকে মদ ও ডুমুর অবশ্যই পাঠানো হবে, তবে আণ্টিয়োকাসের কোনো সফিস্ট দার্শনিককে বিক্রি করার অধিকার নেই বলে দার্শনিক পাঠানো সম্ভব হবে না।

পুরাণসমূহে উল্লিখিত তথ্যাদি বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে বিন্দুসার রাজত্ব করেছিলেন পঁচিশ বছর (২৯৩-২৬৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার দখল নিয়ে তাঁর ছেলেদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। অবশেষে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন অশোক।

অশোকের রাজ্যশাসনকালে মৌর্য-সাম্রাজ্যের অবস্থা

পিয়দর্শি-অশোক

অশোকের শাসনাধীনে মৌর্য-সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির তুঙ্গে ওঠে। সাম্রাজ্যের পরিধি এ-সময়ে আরও বিস্তৃত হয় এবং প্রাচীনকালের প্রাচ্যদেশে এটি

হয়ে দাঁড়ায় বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলির একটি। এর খ্যাতিও ভারত ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অশোক ও তাঁর ক্রিয়াকলাপকে জড়িয়ে গড়ে ওঠে বহুতর উপকথা-উপাখ্যান, তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তাঁর কীর্তিকাহিনী। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জড়িত এই উপাখ্যানগুলি ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ার দেশ-দেশান্তরেও।

অশোকের নির্দেশে প্রচারিত বহু অনুশাসন থেকে ওই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নানা সংবাদ, তাঁর সাম্রাজ্য-পরিচালনার পদ্ধতি ও মৌর্য রাজবংশের রাষ্ট্রনীতিসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুশাসনগুলিতে মৌর্য-রাজার উল্লেখ রয়েছে দেবানামপিয় পিয়দশি, অর্থাৎ 'দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী' বলে। কেবলমাত্র দুটি অনুশাসনে রাজার নাম অশোক বলে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালের কিছু-কিছু সূত্র থেকে জানা গেছে যে সিংহাসন দখল করার আগে বিন্দুসারের এই পুত্রের আসল নাম ছিল পিয়দশি বা প্রিয়দর্শী, পরে রাজা হওয়ার পর ইনি পরিচিত হন অশোক (অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে 'দুঃখবেদনামুক্ত') নামে।

কান্দাহারে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনের গ্রীক ভাষান্তরণে রাজাকে পিয়দশি বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। যখন তিনি যুবরাজমাত্র তখন পিয়দশিকে কীভাবে তাঁর পিতা রাজা বিন্দুসার পশ্চিম ভারত (অর্থাৎ অবন্তী প্রদেশ) শাসন করতে তাঁকে রাজধানী উজ্জয়িনীতে (বর্তমানে উজ্জয়িনে) পাঠালেন সে-কাহিনী বিবৃত হয়েছে সিংহলী ইতিবৃত্তগুলিতে। উত্তর ভারতীয় সূত্রগুলি থেকে জানা যায় যে রাজপুত্র একসময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিলা নগরে ছিলেন, বিন্দুসার তাঁকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন রাজ-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের এক বিদ্রোহ দমন করতে। এই সূত্রগুলি থেকে আরও জানা যায় যে ক্ষমতা দখলের জন্যে পিয়দশি তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। সিংহলী ইতিবৃত্তগুলিতে বলা হয়েছে যে অশোক মগধের সিংহাসন অধিকার করার পরও এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের নিরসন হয় নি। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন অশোক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার দীর্ঘ চার বছর পরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পাদিত হয়েছিল।

কলিঙ্গ-যুদ্ধ

রাজা অশোকের অনুশাসনগুলিতে একটিমাত্র যে-বড় রকমের রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলস্থ শক্তিশালী এক রাষ্ট্র কলিঙ্গের (বর্তমান ওড়িষ্যার) বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সংশ্লিষ্ট অনুশাসনটিতে রাজা অশোক ঘোষণা করছেন যে এই যুদ্ধে দেড়লক্ষ লোক মগধের হাতে বন্দী হয় ও

নিহত হয় একলক্ষেরও বেশি মানুষ। রণনৈতিক ও বাণিজ্যিক উভয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এই বিজয় ও কলিঙ্গ-রাজ্য দখল মগধ-সাম্রাজ্যকে দৃঢ়তর করে তুলতে সাহায্য করে।

অশোকের সেনাবাহিনীকে কলিঙ্গে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এরও আগে এই অঞ্চল ছিল নন্দ-সাম্রাজ্যের অংশ, তবে পরে কলিঙ্গ স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়। কলিঙ্গবিজয় উপলক্ষে উৎকীর্ণ এক বিশেষ অনুশাসনে রাজা অশোক নিজে স্বীকার করেছেন যে সাধারণ মানুষ ও অভিজাত সম্প্রদায় উভয়ের বিরুদ্ধেই কঠোর শাস্তিদান-ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে কলিঙ্গের অভিজাতরাও মৌর্যদের শাসন মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সামগ্রিক প্রতিরোধ এতই প্রবল হয়েছিল যে অশোক এমন কি বাধ্য হয়েছিলেন সদ্য-বিজিত এই ভূখণ্ডে উত্তেজনা হ্রাসের জন্যে বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে। ফলে কলিঙ্গকে অনেকখানি পরিমাণে স্বাধীনতা দেয়া হল এবং সম্রাট স্বয়ং কলিঙ্গে নিযুক্ত তাঁর কর্মচারিদের কাজকর্মের ওপর ব্যক্তিগত তদারকি কায়েম রাখলেন যাতে কলিঙ্গের নাগরিকদের উপযুক্ত কারণ ছাড়া বন্দী করা না-হয় এবং বিনা কারণে নির্যাতন করা না-হয়।

অনেক ইতিহাসবেত্তা মনে করেন যে কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে সম্রাট অশোক ঐক্যবদ্ধ এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত তাঁর ঐতিহ্যসিদ্ধ সক্রিয় পররাষ্ট্র-নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁদের মতে অশোক ইতিমধ্যেই স্বপ্নলোকবিহারী হয়ে উঠেছিলেন এবং পরিত্যাগ করেছিলেন নিজের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তারের ও তা সংহত করার সকল প্রয়াস। কিন্তু দেখা গেছে এই ধারণা আকর গ্রন্থ, ইত্যাদি উপাদানসমূহে প্রদত্ত তথ্যাদির সঙ্গে খাপ খায় না। আসলে অশোক তার সক্রিয় পররাষ্ট্র-নীতি মোটেই ত্যাগ করেন নি, তিনি শুধু এই নীতি প্রয়োগের পদ্ধতিতে কিছু-পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন এইমাত্র। নিজের ক্ষমতা-বিস্তারের কথা না-ভুলে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করেই পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে এই মৌর্য-রাজা প্রধানত প্রয়োগ করতে থাকেন তত্ত্বগত ও কূটনীতিক হাতিয়ার। বিশেষভাবে নিযুক্ত রাজ-কর্মচারি ও কূটনীতিক দূতদের ওপর নির্ভর করে তিনি তখনও-পর্যন্ত-অধিকৃত-নয় এমন সব ভূখণ্ডে নিজ প্রতিপত্তি সংহত করে তোলার ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সেই সব দেশের অধিবাসীদের তিনি জ্ঞাপন করেন সম্রাটের সম্ভাব্য স্নেহযত্ন, পিতৃসুলভ মমতা ও সর্বপ্রকার সমর্থনের কথা।

একটি অনুশাসনে অশোক তাঁর রাজ-কর্মচারিদের এইমর্মে নির্দেশ দেন: ‘অনধিকৃত দেশসমূহের জনসাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস জন্মানো চাই যে আমাদের চোখে রাজা হলেন পিতৃতুল্য। নিজের প্রতি তাঁর

যে-মনোভাব প্রজাদের প্রতিও তাঁর মনোভাব তেমনই, নিজ সন্তানের মতোই তারা তাঁর প্রিয়।'

বহু দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কূটনীতিক সম্পর্ক রাখতেন অশোক। তাঁর অনুশাসনগুলিতে এই সম্পর্কের উল্লেখ আছে সেল্যুকাস-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় আণ্টিয়োকাস থিওস (সেল্যুকাসের পৌত্র) মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেলফাস, মাসিডোনিয়ার রাজা আণ্টিগোনাস গোনেটাস, কাইরিনি (আফ্রিকা)-র রাজা মাগাস ও এপিরাসের রাজা আলেক্‌জাণ্ডারের সঙ্গে। মৌর্য-রাষ্ট্রদূতদের পাঠানো হোত বহু বিভিন্ন দেশে, আর সেখানে তাঁরা প্রচার করতেন তাঁদের পরাক্রান্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজা অশোকের কথা।

মগধের সঙ্গে তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সিংহলের। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে অশোক সেখানে পুত্র মহিন্দ (মহেন্দ্র)-এর নেতৃত্বে এক বিশেষ প্রচারক-দল পাঠান।

সিংহলের তৎকালীন রাজা তিস্‌স (তিষ্য) এর বিনিময়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অশোকের সম্মানে নিজেও দেবানাম্পিয় ('দেবগণের প্রিয়') উপাধি ধারণ করেন ও পাটলিপুত্রে এক রাষ্ট্রদূত পাঠান।

কাল-নিরূপণ

অশোকের রাজত্বকালের সন-তারিখ নিরূপণ নিয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে এখনও তুমুল বিতর্ক চলেছে। তবে তাঁর অনুশাসনগুলিতে এই প্রশ্নটির সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি এর মীমাংসার পথে সহায়ক হতে পারে। অশোকের রাজ্যাভিষেকের বারো বছর পরে পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ তাঁর তথাকথিত প্রধান-প্রধান অনুশাসনে সমকালীন পাঁচজন (ওপরে উল্লিখিত) গ্রীক ও গ্রীক-প্রভাবিত রাজার উল্লেখ আছে। এর অর্থ, যে-বছরে ওই অনুশাসন বা অনুশাসনগুলি পাথরে খোদাই করা হয়েছিল সে-বছর উপরোক্ত পাঁচজন রাজাই জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ বছরটি তাহলে সম্ভবত ২৫৬ কিংবা ২৫৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ বলে অনুমিত হচ্ছে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে অশোকের রাজত্ব শুরু হয়েছিল আনুমানিক ২৬৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে।

অশোকের নামের সঙ্গে জড়িত উপাখ্যানগুলিতে জ্যোতির্বিদ্যাগত যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা নিয়েও কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণা হয়েছে। বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলিতে আমরা এক সূর্যগ্রহণের উল্লেখ পাই যা বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ-দর্শন উপলক্ষে অশোকের দেশপরিব্রাজনের সমকালীন এক ঘটনা বলে অনুমিত হয়। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করেছেন যে অশোকের রাজত্বকালে ২৪৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সত্যিই একবার সূর্যগ্রহণ হয়। আবার অশোকের রাজত্বকালের বিংশতিতম বর্ষে প্রচারিত

এক অনুশাসনে পাওয়া যায় বুদ্ধের জন্মস্থান-দর্শনে ওই বছরে তাঁর যাত্রার উল্লেখ। এই সবকিছু একত্রে বিচার করলে আমাদের এমন অনুমান করার কারণ ঘটে যে অশোকের রাজত্বকাল শুরু হয় ওই ২৬৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দেই। অপর কিছু-কিছু আকর গ্রন্থের উপাদানেও এই তারিখটির সমর্থন মেলে। যথা, রাজবংশের কুলপঞ্জি পেশ করে পুরাণগুলিতে যেমন বলা হয়েছে সে-অনুযায়ী যদি ধরে নেয়া হয় যে বিন্দুসার পঁচিশ বছরই রাজত্ব করেছিলেন, তাহলে বলতে হয় অশোক সিংহাসনে বসেছিলেন ২৬৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দেই। অপরপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলিতে উল্লিখিত আছে যে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ বা মৃত্যুর ২১৮ বছর পরে, আর বহু পণ্ডিতই এ-ব্যাপারে একমত যে বুদ্ধের মৃত্যুর ওই বছরটি ৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ হওয়া খুবই সম্ভব। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ঐতিহ্য অনুযায়ীও আমরা অশোকের রাজত্বের সূচনাকাল হিসেবে ওই একই বছর, অর্থাৎ ২৬৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ, পেয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অপর কিছু পণ্ডিত আবার ভিন্ন সন-তারিখের সপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। অশোক যে রাজক্ষমতা দখলের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন নি, বরং তা হয়েছিলেন চার বছর পরে — সিংহলী ইতিবৃত্তসমূহের এই উল্লেখটির কথা এঁরা বলে থাকেন প্রায়ই। এরই ভিত্তিতে তাঁরা অশোকের সিংহাসনে বসার তারিখ নির্দেশ করেছেন ২৬৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। যাই হোক, মৌর্য-সাম্রাজ্যের এই সন-তারিখ নিরূপণের প্রশ্নটি ভারি জটিল থেকে গেছে।

মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সীমানা

মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল বিশাল এক ভূখণ্ড জুড়ে। এই একটিমাত্র রাষ্ট্র-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিল বহু বিভিন্ন নৃকুলের মানুষ ও নানা উপজাতি, যারা চর্চা করত বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির এবং অনুসরণ করত বিচিত্র রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের।

অশোকের উৎকীর্ণ লিপিসমূহ ও অর্থশাস্ত্র-এর সাক্ষ্য-অনুযায়ী বলতে হয় ওই সময়ের মধ্যেই 'হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক ভূখণ্ড-জোড়া কর্তৃত্বের অধিকারী' এক একচ্ছত্র রাজার অধীন প্রকাণ্ড এক রাষ্ট্রের ধারণা জনমনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক তত্ত্ববিদরাও ওই সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্যের বিস্তারের তারতম্য এবং কাছের ও দূরের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটি নিয়ে রীতিমতো একেকটি বিশদ তত্ত্বই গড়ে তুলেছিলেন।

মৌর্য-যুগে নতুন ধ্যানধারণার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায় মগধের এক পূর্ববর্তী

রাজা বিম্বিসার ও সম্রাট অশোকের স্বরূপবর্ণনার মধ্যে। প্রথমোক্ত রাজাকে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'প্রদেশ-রাজ', অর্থাৎ ছোট এক ভূখণ্ড বা প্রদেশের শাসক বলে, সেখানে অশোককে বলা হয়েছে 'জম্বুদ্বীপের' (বা সমগ্র ভারতের) 'সর্বশক্তিমান অধীশ্বর' বলে।

সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলিই মৌর্য সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তারের প্রধান সাক্ষী। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকদের রচনাগুলি থেকেও কিছু-কিছু খবরাখবর পাওয়া যায়। চীনা পরিব্রাজকদের লিখিত বিবরণ থেকে যে-তথ্যাদি পাওয়া যায় বিশেষ করে শিলালিপি-সংক্রান্ত ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের সমর্থন মিললে তাদেরও কিছুটা মূল্য আছে বলতে হয়।

অশোকের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত নির্ধারণের অনেকখানি সুবিধা হয়েছে প্রাচীন আরাকোসিয়ার প্রাণকেন্দ্র কান্দাহারে অশোকের অনুশাসনগুলি (গ্রীক ও গ্রেকো-আরামেইক হরফে লেখা) আবিষ্কৃত হওয়ায়। এগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে-সময়ে আরাকোসিয়া (আধুনিক আফগানিস্তানের একটি অংশ) ওই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অশোকের অনুশাসনগুলিতে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী যবন ও কাম্বোজ জাতিদুটির কথা কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে।

যবন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে গ্রীকদের বোঝাতে, আরাকোসিয়ায় তখন তাদের কয়েকটি বসতি ছিল। এই গ্রীক জনসাধারণের বোঝার সুবিধার জন্যে অশোকের অনুশাসনগুলি গ্রীকভাষায় তর্জমা করে প্রচার করা হয়েছিল। কিছু-কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে অশোকের আমলের এই যবনরা ছিলেন মাসিডোনিয়ার আলেক্‌জাণ্ডারের সময়কার যে-গ্রীক উপজাতি-গোষ্ঠীগুলি আরাকোসিয়ায় বসতিস্থাপন করে থেকে গিয়েছিল তাদেরই উত্তরপুরুষ।

আরাকোসিয়ায় বাস করতেন কাম্বোজরাও (ইরানীয় ভাষাভাষী এক উপজাতি-গোষ্ঠী)। প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যানগুলিতে এঁদের বর্ণনা করা হয়েছে তুখোড় ঘোড়সওয়ার এবং ঘোড়ার প্রজনক হিসেবে। কাম্বোজদের ভাষা কী ছিল তা সঠিক জানা যায় না, তবে কান্দাহারে অবস্থিত অশোকের অনুশাসনের আরামেইক ভাষ্যে যেহেতু বহু ইরানীয় শব্দ পাওয়া গেছে তাই একথা বিশ্বাস করা চলে যে এই ভাষ্যটি বিশেষ করে কাম্বোজদের জন্যেই রচিত হয়েছিল।

অশোকের একটি অনুশাসন পাওয়া গেছে লম্পকেও (আধুনিক জেলালাবাদের কাছে)। এ-থেকে এই ধারণার সমর্থন মেলে যে পারোপামিসাস রাজ্যটি বস্তুত মৌর্য-সাম্রাজ্যেরই অংশ ছিল (এর একমাত্র উল্লেখ ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছিল গ্রীক সূত্র থেকে। সেখানে বলা হয়েছিল যে চন্দ্রগুপ্ত ও সেল্যুকাসের মধ্যে এক সন্ধিচুক্তির ফলে এই রাজ্যটি চন্দ্রগুপ্ত লাভ করেছিলেন)।

কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত 'রাজতরঙ্গিনী'তে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে একথা বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে কাশ্মীরের একাংশও অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে প্রকাশ যে কাশ্মীরের প্রধান শহর শ্রীনগর অশোকের রাজত্বকালেই নির্মিত হয়েছিল। নেপালের কিছু অংশও সম্ভবত অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সাম্রাজ্যের। আবিষ্কৃত শিলালিপি ও লিখিত সূত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশও মগধ-সাম্রাজ্যের অংশভূত ছিল।

দক্ষিণ ভারতে অশোকের প্রচারিত অনুশাসনগুলি পাওয়া যাওয়ার ফলে মগধ-সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত নির্ধারণে সুবিধা হয়। ওই সীমান্ত ছিল আধুনিক চিতলদুর্গ জেলার আনুমানিক দক্ষিণ সীমানা-বরাবর। দক্ষিণে মগধ-সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী ছিল চোল, কেরলপুত্র ও সত্যপুত্রদের রাজ্যগুলি। অশোকের অনুশাসনসমূহে এগুলিকে তাঁর রাজ্যের বহির্ভূত ভূখণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মৌর্যরা এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতেন। এসব জায়গাতে বৌদ্ধস্তূপও নির্মিত হয়েছে, বৌদ্ধ প্রচারকও পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরও বহু দেশের সঙ্গেও কূটনীতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলত মগধ, ভারতের পশ্চিম সীমান্তের প্রান্তবর্তী গ্রীক ও গ্রীক-প্রভাবিক দেশসমূহ, শ্রীলঙ্কা, এবং মধ্য-এশিয়ার কিছু-কিছু অঞ্চল ছিল এই বন্ধুরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

মৌর্য-যুগে রাজশক্তি

মগধ-রাষ্ট্রের অস্তিত্বকালে এবং বিশেষ করে মৌর্য-রাজাদের অধীনে রাজার ক্ষমতা ক্রমশ দৃঢ় ও সংহত হয়ে ওঠে এবং উপজাতিক রীতি-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায় সম-পরিমাণে।

মৌর্য-সম্রাটদের আমলে রাজশক্তি বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। অশোকের অনুশাসন-লিপিগুলি ও অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য থেকে এটা স্পষ্ট। এ-সময়ে রাজাকে গণ্য করা হোত রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র ও রাজা সমার্থক'। এই বাক্যটিতে রাষ্ট্র সম্বন্ধে তৎকাল-প্রচলিত গোটা তত্ত্বের অন্তঃসারটি নিহিত।

বংশপরম্পরা-সূত্রে উত্তরাধিকারের নীতিকে মেনে চলা হোত অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে। রাজার মৃত্যুর আগেই তাঁর একটি ছেলেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হোত (প্রায়ই এই ছেলেটি হতেন রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র)। তবে কার্যক্ষেত্রে ক্ষমতা দখলের জন্যে রাজার ছেলেদের মধ্যে শুরু হয়ে যেত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

অতঃপর নতুন রাজার সিংহাসনে আরোহণের সময় এক বিশেষ পুজা ও অনুষ্ঠান ('অভিষেক' নামে পরিচিত) উদ্‌যাপিত হোত। ঢালাও ভোজ ছিল সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

মৌর্য-রাজাদের আমলে রাজচক্রবর্তিন্ (আক্ষরিক অর্থে — 'যিনি ক্ষমতার চক্র আবর্তিত করেন')-এর ধারণাটি পরিণত হয়ে ওঠে। রাজচক্রবর্তী হলেন সেই একচ্ছত্র রাজা যাঁর ক্ষমতা প্রসারিত পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্র, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এক বিশাল ভূখন্ড জুড়ে। এই ধারণাটিকে বিশেষভাবে বিশদ করা হয়েছে অর্থশাস্ত্রে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটি হল প্রকান্ড এক সাম্রাজ্যগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় রাষ্ট্রের বিকাশের এক নতুন স্তরে তার তাত্ত্বিক রূপ।

অশোকের শিলালিপিগুলির বিচারে বলতে হয় যে মৌর্য-রাজা রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্বে থাকতেন এবং আইন প্রণয়নের অধিকারী ছিলেন। অশোকের অনুশাসনগুলি প্রচারিত হয়েছিল রাজার নির্দেশে ও রাজার নামেই। রাজা স্বয়ং প্রধান-প্রধান রাজকর্মচারিকে নিযুক্ত করতেন, রাজস্ব-সংগ্রহ সম্বন্ধীয় বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং ছিলেন দেশের প্রধান বিচারকর্তা। অর্থশাস্ত্রে আমরা পাই রাজার বিবিধ ক্রিয়াকলাপের ও অবসর-বিনোদনের বিস্তারিত বর্ণনা। রাজার দেহরক্ষী-বাহিনী নিযুক্ত করার ব্যাপারে তখন বিশেষ নজর দেয়া হোত, কারণ রাজার বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল রাজসভার প্রায় নৈমিত্তিক এক ঘটনা। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় নিযুক্ত গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থেনিস এ-ব্যাপারটি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। নিজের বিবরণীতে তিনি লিখেছিলেন: 'দুষ্ট ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার ভয়ে রাজা দিনের বেলা ঘুমোন না, এমন কি রাত্রেও থেকে-থেকে বিশ্রাম-স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন তিনি। রাজা যখন শিকারে বেরোন তখন তিনি পরিবৃত থাকেন স্ত্রীলোক দিয়ে, আর এই স্ত্রী-সঙ্গিনীদের আবার ঘিরে থাকে বর্শাধারী দেহরক্ষীদের ব্যূহ। রাজার মৃগয়ার যাত্রাপথ ঘেরা থাকে দু'দিকে টানা দড়ির বেষ্টনী দিয়ে। একমাত্র পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকদেরই এই দড়ির বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে হাঁটার অধিকার আছে। অন্য কোনো হঠকারী ব্যক্তি এই বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়।'

মৌর্য-রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত রাজার প্রধান পুরোহিতের। প্রভাবশালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকেই এই পুরোহিত নিযুক্ত হতেন।

রাজা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে রাজকার্যের সাহায্যকারী নির্বাচন করতেন, তবে এই সাহায্যকারীদের ওপরেও গোপনে নজর রাখা হোত। অনুচরবৃন্দকেও বিশেষ-বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে ফেলতেন রাজা। এই পরীক্ষায় যারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে না-পারত, তাদের খনিতে কঠিন শ্রমসাধ্য

কাজে পাঠানোর সম্ভাবনা থাকত। এইভাবে নানাদিক থেকে দেশ জুড়ে গোয়েন্দাগিরির জালবিস্তারের ওপর আরোপ করা হোত প্রচণ্ড গুরুত্ব। কেবল যে রাজকর্মচারিদের গতিবিধিই তীক্ষ্নভাবে নজরে রাখা হোত তা-ই নয়, শহর ও গ্রামের সাধারণ অধিবাসীরাও এর কবল থেকে মুক্ত থাকতেন না। রাজপুত্রদের ওপর আবার বিশেষ করে দৃষ্টি রাখা হোত, কেননা অর্থশাস্ত্রের ভাষায় তারা 'পিতাকে ভক্ষণ করে বাগদা চিংড়ির মতো'।

রাত্রিবেলা রাজা সাক্ষাৎ করতেন তাঁর গোপন সংবাদবাহকদের সঙ্গে, আর দিনের বেলা — অর্থশাস্ত্র বইটি থেকে আমরা জেনেছি — তিনি ব্যস্ত থাকতেন রাষ্ট্রপরিচালন-সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে কিংবা নানা ধরনের আমোদপ্রমোদ উপভোগে। রাজাকেই গণ্য করা হোত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিসেবে। মেগাস্থেনিসের বিবরণ অনুযায়ী রাজার সৈন্যসংখ্যা ছিল তাক-লাগানোর মতো। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্য-শিবিরে মোট ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল।

পরিষদ ও সভা

রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল 'পরিষদ' নামে পরিচিত রাজার মন্ত্রিমণ্ডলীর ওপর। মৌর্য-রাজাদের আমলেই-যে এই সংগঠনটির প্রথম উদ্ভব ঘটে তা নয় (আরও আগে থেকেই অস্তিত্ব ছিল এর), তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে মৌর্য-আমলেই পরিষদ রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভার চরিত্র অর্জন করে। সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলিতে এই পরিষদের উল্লেখ আছে এবং বিস্তারিতভাবে এর কাজকর্মের বর্ণনা আছে অর্থশাস্ত্রে। সেখানে একে বলা হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ। এই পরিষদের কাজ ছিল গোটা শাসন-ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং রাজার নির্দেশ কার্যকর করা। পরিষদ ছাড়াও বিশেষভাবে রাজার বিশ্বাসভাজন এমন স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত অপর একটি ছোট্ট গোপন পরিষদও থাকত তখন। অত্যন্ত জরুরি কোনো ব্যাপারের মীমাংসার প্রয়োজন হলে এই উভয় পরিষদই একত্র মিলিত হোত বলে জানা যায়।

অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পরিষদের সদস্য-সংখ্যায় তারতম্য ঘটানো হোত রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে। অশোকের রাজত্বকালে পরিষদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হোত ধর্ম অনুযায়ী কর্তব্যাদি সম্পন্ন করার ব্যাপারটির ওপর তদারকি করার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে যে-সমস্ত রাজকর্মচারি কাজকর্মের খবরদারি করতেন পরিষদ তাঁদের দায়দায়িত্ব তখন বিধিবদ্ধ করে দিত। অশোকের একটি অনুশাসনে উল্লেখ আছে যে পরিষদ রাজার অনুপস্থিতিতেও সময়ে-সময়ে মিলিত হতে পারে, তবে অশোকের নির্দেশ ছিল যে জরুরি অবস্থায় এমন ধরনের

সভার অনুষ্ঠানের কথা অবশ্যই অবিলম্বে তাঁকে জানাতে হবে। পরিষদের নিজস্ব আলোচনা-সভায় প্রায়শই তুমুল বিতর্ক দেখা দিত, কখনও-কখনও স্বয়ং রাজাকেও হস্তক্ষেপ করতে হোত তাতে। কখনও-কখনও রাজা ও পরিষদের মধ্যেও মতপার্থক্য ঘটত। অশোকের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে রাজার বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় উপরোক্ত মতপার্থক্য তখন বিশেষভাবে তীব্র আকার ধারণ করে।

রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিষদের সদস্য হতেন শুধু যোদ্ধা ও যাজক-সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত অভিজাত ব্যক্তিরাই। তাঁরা যথাসাধ্য নিজেদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকার রক্ষা করে চলতেন এবং সীমাবদ্ধ করে রাখতেন রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা। এর পূর্ববর্তী আমলে, যেমন ধরা যাক বৈদিক যুগে, সমাজের আরও ব্যাপকতর সম্প্রদায়ের লোকজন পরিষদের সদস্য হতে পারতেন এবং ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে এটি ছিল তখন আরও বেশি গণতান্ত্রিক এক সংগঠন — রাজা ও তাঁর নীতিসমূহের ওপর আরও স্পষ্টতর প্রভাববিস্তারে সমর্থ। তবে ক্রমে-ক্রমে এই সংগঠনের সদস্য-সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকল এবং সদস্যপদ সীমাবদ্ধ হয়ে গেল অভিজাত-সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে। সেইসঙ্গে পরিষদের ভূমিকাও অল্প-অল্প করে সীমাবদ্ধ হতে-হতে শেষপর্যন্ত এটি পরিণত হয়ে গেল রাজার চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধীন নিছক এক উপদেষ্টা-পরিষদে। তৎসত্ত্বেও, এমন কি মৌর্য-যুগে যখন রাজার ক্ষমতা বিশেষরকম প্রবল তখনও, এই পরিষদের প্রভাব বড় কম ছিল না। এমন কি মৌর্য-রাজারাও এই সংগঠনের কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করার শক্তি রাখতেন না।

'সভা' নামের অপর একটি সংগঠনেরও বিবর্তন ঘটেছিল একই রকমভাবে। গোড়ার দিকে সভা ছিল অভিজাতদের ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের এক ব্যাপক সমাবেশ, যা নিষ্পন্ন করত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তব্যাদি। কিন্তু মৌর্য-যুগে পেঁছিতে-পেঁছিতে এই সভার সদস্যপদ সীমাবদ্ধ হয়ে গেল সমাজের সংকীর্ণ একটা অংশের মধ্যে এবং খোদ সভা বিবর্তিত হয়ে পরিণত হল রাজকেন্দ্রিক এক পরিষদে বা রাজসভায়। তবু পূর্বোক্ত পরিষদের থেকে তুলনায় রাজসভা তখনও আরও ব্যাপ্ত প্রতিনিধিমূলক এক সংগঠন হিসেবে থেকে গিয়েছিল। শহর ও গ্রামের জনসাধারণের কিছু-কিছু প্রতিনিধি তখনও সভার আলোচনায় যোগ দেয়ার অধিকার পাচ্ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাজা স্বয়ং বাধ্য হচ্ছেন সমর্থনলাভের জন্যে রাজসভার মুখাপেক্ষী হতে। যেমন, তৎকালীন একাধিক সূত্র থেকে জানা যায় যে রাজা অশোক স্বয়ং রাজসভার সদস্যদের উদ্দেশ করে ভাষণ দিচ্ছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের এক সভার উল্লেখ পাওয়া যায় পতঞ্জলির ব্যাকরণেও (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী)।

লিখিত আকর উপাদানগুলিতে মৌর্য-যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে পরিষদ ও রাজসভার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে-অনুচ্ছেদগুলিতে সেগুলি দারুণ আগ্রহোদ্দীপক। এগুলি থেকে দেখা যায় যে রাজার ক্ষমতা যখন বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল এমন কি সেইসব যুগেও রাজক্ষমতা কিছু-পরিমাণে খর্বকারী প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠনগত রীতি-প্রথা ও ঐতিহ্য টিকে গিয়েছিল।

রাজস্ব-সংগ্রহ

নানাবিধ রাজকর আদায় তখন রাজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলির অন্যতম বলে গণ্য হোতো এ-কারণে এই যুগের আকর উপাদানগুলিতে রাজকর-সংগ্রহ ব্যবস্থার সংগঠন ও তার অন্তর্নিহিত নীতিসমূহের বিশদ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনাগ্রন্থে বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে রাজকোষ হল রাজশক্তির ভিত্তিস্বরূপ এবং রাজার অবশ্যকর্তব্য হল রাজস্ব-আদায় সংক্রান্ত নানা ব্যাপারের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

দেশবাসীর আয়ের যে-অংশ কর হিসেবে আদায় করা হোত তার পরিমাণ ছিল খুবই বেশি। তবে উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে সর্বদাই বলা হয়েছে যে রাজা রাজস্ব আদায় করেন তাঁর প্রজাবর্গের রক্ষার্থেই এবং দেশের জনসাধারণের প্রতি তাঁর সদা-সতর্ক দৃষ্টির সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিস্বরূপ এই রাজকর রাজার প্রতি নিবেদিত সামান্য একটু উপহার ছাড়া কিছু নয়। মৌর্য-যুগ নাগাদ পূর্বতন রাজস্ব-আদায় ব্যবস্থায় ঘটে গিয়েছিল বিপুল পরিবর্তন। অতীতে প্রায়শই স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাজাকে যে-সমস্ত উপহার-উপচার নিবেদন করা হোত, তা এখন বাধ্যতামূলক দেয় বস্তুতে, কড়াকড়িভাবে সুনির্দিষ্ট রাজকরে পরিণত হল। রাজস্বের প্রধান ধরনটি ছিল যাকে বলা হয় 'ভাগ' (অর্থাৎ, রাজাকে দেয় অংশ) তা-ই, সাধারণত এই ভাগটি ছিল কৃষির উৎপাদসমূহের এক-ষষ্ঠাংশ। রাজা যদি চাইতেন তাহলে এইভাবে দেয় রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করতে কিংবা কারও-কারও ক্ষেত্রে একেবারেই এই কর মকুব করে দিতে পারতেন, তবে এমন ঘটনা ঘটত খুব কম এবং তা ঘটত শুধুমাত্র বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রেই। তখন রাজাকে কখনও-কখনও এমন কি 'ষড়্‌ভাগিন'ও (অর্থাৎ, এক-ষষ্ঠাংশ যাঁর প্রাপ্য তিনি) বলা হোত। যে-সমস্ত অঞ্চলে জমির উর্বরতা বেশি হোত ও বৃষ্টিপাত হোত প্রচুর সেখান থেকে অবশ্য এর চেয়ে আরও অনেক বেশি পরিমাণে রাজস্ব (ফসলের এক-চতুর্থাংশ কিংবা এমন কি এক-তৃতীয়াংশও) আদায় করা চলত। এছাড়া রাষ্ট্রে আর্থিক সংকট দেখা দিলেও রাজার প্রাপ্য রাজস্বের এই অংশ বাড়ানো চলত।

এ-প্রসঙ্গে পতঞ্জলির সেই কিছুটা অসাধারণ উক্তিটি উল্লেখ্য, যেখানে তিনি বলছেন যে মৌর্য-রাজারা 'স্বর্ণ-সংগ্রহের প্রয়াসে মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করতেন'। মনে হয় 'মূর্তি' বলতে এখানে দেবতাদের প্রতিমূর্তিই বোঝানো হচ্ছে। বিশেষ-বিশেষ মন্দিরে এইসব দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠার পর এগুলির উদ্দেশ্যে যে-সব মূল্যবান উপহার-উপচার নিবেদিত হোত সে-সমস্ত যথাকালে জমা পড়ত রাজকোষে। এমন কি এ-ও সম্ভব যে মৌর্য-রাজারা এই দেবমূর্তিগুলি অন্যান্য মন্দির থেকে সংগ্রহ করিয়ে আনাতেন। অর্থশাস্ত্রের ভাষ্য-অনুযায়ী, অর্থনৈতিক সংকটের সময় রাজা নিজ রাজকোষ পূর্তির জন্যে বিভিন্ন মন্দির থেকে মূল্যবান অলঙ্কার, ইত্যাদি নেবারও অধিকারী ছিলেন।

রাজস্বের সিংহভাগ যাঁদের দিতে হোত তাঁরা ছিলেন রাজার কৃষিজীবী প্রজাবৃন্দ — ছোট-ছোট জমির অধিকারী গ্রাম-সমাজের মুক্ত সদস্যরা। এছাড়া নানা ধরনের কারুশিল্পী, বণিক ও গৃহপালিত পশু-প্রজনকদেরও রাজাকে কর দিতে হোত।

আকর উপাদানগুলি থেকে জানা যায় যে জনসাধারণের কয়েকটি স্তরের মানুষ রাজকর দেয়া থেকে অব্যাহতি পেতেন। ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকরা ও প্রাচীন ভারতীয় 'সংহিতা' বা শাস্ত্রসমূহ থেকে জানা যায় যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলিতে বিশেষজ্ঞ এবং উচ্চতর বর্ণের প্রতিনিধি বলে রাজকর দেয়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণেরা। কিছু-কিছু রচনায় এমনও উল্লেখ আছে যে বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিত, আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী ও রাজার পুরোহিতবর্গের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করায় আদায়কারীরা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সূত্রগুলিতে এই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে এই বলে যে ব্রাহ্মণেরা ধর্মীয় যজন-যাজন মারফত রাজকোষে তাঁদের নিজস্ব বিশেষ অবদান রাখেন এবং দেশের উন্নতিবিধানে সাহায্য করে থাকেন।

রাজকর থেকে কারা-কারা অব্যাহতিলাভের যোগ্য তার তালিকা দিতে গিয়ে কিছু-কিছু পুথিতে 'রাজার অনুচরবৃন্দ', অর্থাৎ যাঁরা রাজার অধীনে চাকরি করছেন, তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ, রাজকরের বোঝাটা মূলত চেপেছিল তখন কৃষক ও কারুশিল্পীদের ওপর এবং এইভাবে তা পারস্পরিক অসঙ্গতি ও বিরোধকে প্রবল করে তুলেছিল বিভিন্ন শ্রেণী, ভূ-সম্পত্তির ছোট-বড় মালিক ও নানা ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর ভেতর।

অর্থশাস্ত্রে আমরা বিশদ বর্ণনা পাই রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারিদের কাজকর্মের এবং প্রধান কর-আদায়কারী কর্মচারির অধীনে পরিচালিত বিশেষ কর-সংগ্রাহক বিভাগের কাজের।

সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশগুলির শাসন-ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত করা হোত তখন যাতে প্রাচীনতর রীতি-প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলি মর্যাদা পায়। তবে মৌর্য-রাজারা তাঁদের সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার আগে এক্ষেত্রে-প্রচলিত ব্যবস্থাটিতে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন বেশকিছু, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন একে। আবার এর সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্র-পরিচালনার নতুন-নতুন রীতি ও ব্যবস্থাও তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল বিজিত (আক্ষরিক অর্থে — 'অধিকৃত') অঞ্চল, রাজার মূল শাসনাধীন এলাকা এবং কেন্দ্রীয় শাসনের বিশেষরকম কড়া নিয়ন্ত্রণের অধীন অন্য কিছু-কিছু অঞ্চল ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মৌর্য-সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল কয়েকটি বিভাগে, তার মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি বিভাগ ছিল বিশেষ মর্যাদার অধিকারী: উত্তর-পশ্চিম বিভাগ, যার রাজধানী ছিল তক্ষশিলা; রাজধানী উজ্জয়িনী সহ পশ্চিম বিভাগ; রাজধানী তোসালি সহ পূর্ব বিভাগ বা কলিঙ্গ এবং রাজধানী সুবর্ণগিরি সহ দক্ষিণ বিভাগ। এই চারটি বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন রাজপুত্রেরা। সাম্রাজ্যের মধ্যে এই চারটি ভূখণ্ডের বিশেষ অবস্থান এবং দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই এই বিভাগগুলি ছিল অতখানি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এগুলির মধ্যে আবার বিশেষ দক্ষিণ বিভাগ গঠনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় 'দক্ষিণদেশের সমস্যা'র গুরুত্ব রাজা বিন্দুসারের আমল থেকেই প্রবল আকার ধারণ করার মধ্যে। এ-কারণেই দেখা যায় তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী ও তোসালিতে নিযুক্ত শাসনকর্তা রাজপুত্রেরা যেখানে 'কুমার' (সাধারণ বা যে-কোনো রাজপুত্র) আখ্যা পাচ্ছেন, সেখানে যে-রাজপুত্র সুবর্ণগিরি শাসন করছেন অশোকের অনুশাসনে তাঁকে উল্লেখ করা হচ্ছে 'আযপুত' (সংস্কৃত আর্যপুত্র থেকে, অর্থাৎ স্পষ্টতই তিনি যুবরাজ বা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী) বলে। এই বিশেষ আখ্যাটি থেকেই এই শেষোক্ত রাজপুত্রের বিশেষ ও উচ্চতর পদমর্যাদা বোঝানো হয়েছে। একথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে অশোকের রাজত্বকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল সুবর্ণগিরিতেই।

এই প্রধান বিভাগগুলি তখন যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করত। এখানকার শাসনকর্তা রাজপুত্রেরা (একমাত্র কলিঙ্গে অধিষ্ঠিত রাজপুত্র ছাড়া) স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাজকর্মচারিদের কাজকর্ম তদারক করার জন্যে বিশেষ পরিদর্শক পাঠাতেন। কলিঙ্গের শাসক রাজপুত্রের অবশ্য এই অধিকার ছিল না, সম্রাট স্বয়ং এই ভূখণ্ড-এলাকায় পরিদর্শন উপলক্ষে পর্যটন সংগঠিত করতেন। কলিঙ্গের স্থানীয় রাজকর্মচারিদের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রাখতেন অশোক। এর

কারণ কলিঙ্গ তখন সবেমাত্র সাম্রাজ্যের অধিকারে এসেছে এবং যদিও এই ভূখণ্ডটিকে প্রধান বিভাগের একটি মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, তবু এটিকে গণ্য করা হচ্ছিল অধিকৃত (বা বিজিত) ভূখণ্ড হিসেবে ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছিল বিভাগটিকে।

গোটা দেশকে চারটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা ছাড়াও, প্রত্যেকটি বিভাগকে আবার ভাগ করা হয়েছিল কয়েকটি করে 'জনপদ' (খণ্ড বিভাগ)-এ, 'প্রদেশ' (অঞ্চল)-এ ও 'আহালে' (জেলা)-তে। বিভাগীয় শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম ভিত্তি ছিল গ্রামগুলি। ক' নামে প্রধান রাজকর্মচারিরা শাসন করতেন জনপদসমূহ। রজ্জুক শব্দটির অর্থ হল 'রজ্জু বা দড়ি ধরে থাকে যে'। খুব সম্ভবত এই শব্দটির উৎস হল এইসব কর্মচারির পূর্বতন পেশা, অর্থাৎ দড়ি ধরে জমি জরিপ করা। মনে হয়, পরে এঁদের ভূমিকাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছিল এবং কাজকর্মের পরিধি বাড়িয়ে তা আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা হয়েছিল। এঁদের অধীনস্থ খণ্ড-বিভাগগুলিতে এঁদের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল সুনির্দিষ্ট বিচারবিভাগীয় কাজ, এবং এইভাবে প্রাক্তন গ্রামীণ কর্মচারিরা উন্নীত হয়েছিলেন খণ্ড-বিভাগীয় শাসনযন্ত্রের নেতৃপদে। অশোকের রাজত্বকালের রজ্জুকদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের আমলের গ্রামীণ রাজকর্মচারিদের (বা গ্রীক ভাষায়, 'আগারোনোমোই') বেশ মিল আছে বলেই মনে হয়। সেল্যুকাসের রাষ্ট্রদূত মেগাস্থেনিস এই শেষোক্ত কর্মচারিদের সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তবে এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে অশোকের রাজত্বকাল নাগাদ এই সমস্ত গ্রামীণ রাজকর্মচারির কর্তব্য ও দায়িত্বে পরিবর্তন ঘটেছিল কিছুটা। কেননা দেখা যাচ্ছে আহালের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্ররা রজ্জুকদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন।

জেলার প্রধান-প্রধান শহরে থাকত মন্ত্রণাগৃহ যেখানে রাজকর্মচারিরা নিয়মিতভাবে সমবেত হতেন সভার অনুষ্ঠানে। এই সমস্ত সভা থেকে যে-নির্দেশাবলী গৃহীত হোত তার অনুলিপি তৈরি করতেন লেখক বা লিপিকাররা, অতঃপর সেই অনুলিপিগুলি পাঠানো হোত জেলার সর্বত্র। এই যুগের লিপিকাররা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও গ্রীক প্রভৃতি লিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

অশোকের অনুশাসনগুলিতে সাম্রাজ্যের সীমান্ত-প্রহরার তদারকির কাজে নিযুক্ত বিশেষ রাজকর্মচারি বা 'অন্তমহামাত্র'দের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের লেখকও অবহিত ছিলেন এই কর্মচারিদের ব্যাপারে। এই কর্মচারিরা বেশ উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন বলেই মনে হয়, কারণ এঁরা খুব মোটা বেতন পেতেন। যদিও মৌর্য-রাজাদের নীতি ছিল শাসনব্যবস্থার কঠোর কেন্দ্রীকরণের, তবু বহু প্রাচীন রীতি-প্রথা ও ঐতিহ্যও একই সঙ্গে রক্ষা করতেন তাঁরা, সেগুলিকে মর্যাদা দিয়ে চলতেই তাঁরা বরং উদ্গ্রীব ছিলেন।

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতার নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়াস সত্ত্বেও মৌর্য-রাজারা কিছু-কিছু প্রজাতন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান বা গণকে সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রাখতে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে সেই সমস্ত অঞ্চলে যেখানে কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ চালু করা সবচেয়ে কঠিন, সেখানেই এই অধিকার মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা। মৌর্য-সাম্রাজ্যে এইরকম স্বায়ত্তশাসিত, স্বনির্ভর কিছু নগর-রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন মেগাস্থেনিস, যেগুলি ছিল প্রাচীন রাজনৈতিক ধরনধারণের বহুতর লক্ষণাক্রান্ত। তবে এই গণগুলি কিন্তু সাম্রাজ্যিক শাসনের সামগ্রিক ব্যবস্থারই অঙ্গীভূত ছিল।

নগর-শাসনব্যবস্থা

মৌর্য-যুগে নগর-শাসনব্যবস্থাতেও স্বশাসনের কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য টিকে গিয়েছিল। অশোকের শিলালিপিগুলিতে উল্লেখ পাওয়া যায় শহরগুলিকে অভ্যন্তর-অঞ্চলের, অর্থাৎ বিজিত এলাকার, অন্তর্ভুক্ত শহর ও বহির্দেশীয় শহরে ভাগ করে দেখার একটা পদ্ধতির। সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তখন পাটলিপুত্র। মেগাস্থেনিস বিশেষ ধরনের নগর-কর্মচারিদের (বা গ্রীক ভাষায়, 'অস্টিনোমোই'দের) কথা বলেছেন যাঁরা প্রতিটি শহরে ছ'টি করে ছোট-ছোট পরিষদ গঠন করতেন। এইরকম প্রতিটি পরিষদের সদস্যসংখ্যা হোত পাঁচজন করে। প্রতিটি পরিষদ তত্ত্বাবধান করত নাগরিক জীবনের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলির। যথা, বিভিন্ন কারুশিল্প, আগন্তুক বিদেশী, জন্ম ও মৃত্যুর হিসাবনিকাশ, বাণিজ্যসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ, কারুশিল্পীদের তৈরি জিনিসপত্রে বিক্রির আগে সিলমোহর দেয়ার ব্যবস্থা, এবং জিনিসপত্র বিক্রি বাবদ কেনা-দামের এক-দশমাংশ কর হিসেবে আদায়ের ব্যবস্থা। মেগাস্থেনিসের এই বিবরণ থেকে দেখা যায় নগর-শাসনব্যবস্থার কোন-কোন দিক সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ চালু করার অপেক্ষা রাখত। সেকালে শহরে-শহরে এইধরনের যৌথ শাসন-পরিষদসমূহের অস্তিত্বই ছিল একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। প্রতিটি শহরে নগর-পরিষদই ছিল কার্যত প্রধান শাসন-কর্তৃপক্ষ, যদিও এটা স্পষ্ট যে এই পরিষদের সদস্যরা পূর্ববর্তী বৈদিক যুগের মতো পরিষদে নির্বাচিত হতেন না, কেন্দ্রীয় কিংবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তি হতেন মাত্র।

কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ অবশ্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন নগর-পরিষদগুলির স্বাধীনতাহরণে, তবু এই পরিষদগুলি কিছু পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কিছু-কিছু শহরের নিজস্ব সিলমোহর ও নিজস্ব প্রতীকচিহ্ন ছিল এবং নগর-পরিষদগুলি সরাসরি কারুশিল্পী-সমবায়গুলির সঙ্গে কাজ-কারবার চালাত।

বর্ণ ও পেশা অনুযায়ী জনসংখ্যার প্রতিটি অংশ বাস করত শহরের সুনির্দিষ্ট একেকটি মহল্লায়। সম্ভবত এই অভ্যাসটি ছিল উপজাতিক সংগঠনের অত্যন্ত প্রাচীন একটি ঐতিহ্যেরই জের। নগর-পরিষদের কর্মচারিরা সরকারি ভবনগুলি, শহরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাভাবিক অবস্থার সংরক্ষণ এবং তীর্থস্থান ও মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। শহরগুলিতে তখন বেশির ভাগ বাড়িই ছিল কাঠের তৈরি, ফলে অগ্নিকাণ্ড থেকে বাড়িগুলি রক্ষা করার ব্যাপারটা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে বাড়ির ভেতর আগুন জ্বালার অনুমতি ছিল না কারও এবং এই আইন ভঙ্গ করলে অপরাধীকে শাস্তিস্বরূপ মোটারকম অর্থদণ্ড দিতে হোত। এছাড়া সকল বাড়ির মালিককে অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থাদিও মজুত রাখতে হোত। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে গৃহবাসীদের সর্বদা হাতের কাছে রাখতে হোত অনেকগুলি জলভরা পাত্র। রাস্তার ধারেও মজুত রাখা হোত বহু জলভরা বালতি, ইত্যাদি। অর্থশাস্ত্রে লিখিত সাক্ষ্য অনুযায়ী বলতে হয়, শহরগুলিতে মানুষের জীবন ছিল কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত। সন্ধেবেলায় বিশেষ এক সংকেতজ্ঞাপনের পর রাস্তায় বেরনো নিষিদ্ধ ছিল, সাহস করে শহরবাসীদের কেউ যদি তখন রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে পথ চলতেন তাহলে তাঁর শাস্তি হোত গ্রেপ্তার ও জরিমানা।

অশোকের ধর্মনীতি

ভারতে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচারের জন্যে মৌর্য-যুগ চিহ্নিত হয়ে আছে। মৌর্য-রাজত্বের কয়েক শতাব্দী আগে পরিব্রাজক ভিক্ষুদের ছোট একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম হিসেবে যে-বৌদ্ধধর্মের সূচনা হয় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তা রূপ নেয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজের আত্মিক জীবনে অন্যতম সর্ববৃহৎ একটি ধর্মান্দোলনের। ওই সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠে সংগঠিত বৌদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতীক 'সংঘ' এবং শেষ হয় প্রধান-প্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সংকলনের কাজ। ঠিক ওই যুগেই-যে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং মৌর্য-রাজাদের অনেকের সমর্থন লাভ করে এটা কোনো আপতিক ঘটনা নয়। প্রবল শক্তিশালী এক রাষ্ট্রের শীর্ষে স্বৈরতন্ত্রী একচ্ছত্র এক রাজা বা রাজচক্রবর্তিন-এর আদর্শ সহ বৌদ্ধধর্ম ওই সময়ে ঐক্যবদ্ধ এক সাম্রাজ্যগঠনের তত্ত্বগত ভিত্তির যোগান দেয়।

প্রাপ্তিযোগ্য নানা ধরনের সূত্র অনুযায়ী বলতে হয় অশোক একদিনে বা রাতারাতি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন নি। পিতার আমলে রাজসভাতেই তিনি দেখা পেয়েছিলেন রক্ষণশীল ও তথাকথিত প্রচলিত ধর্মবিরোধী নানা মত ও পথের দার্শনিক পণ্ডিতদের। পরে অবশ্য অশোক একটি বৌদ্ধ সংঘ পরিদর্শন করেন, বুদ্ধের মূল শিক্ষাসমূহ অধ্যয়ন করেন গভীরভাবে এবং উপাসক বা মঠবহির্ভূত

বৌদ্ধ হন। নিজের অনুশাসনগুলিতেই তাঁর ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তনের কথা বলছেন অশোক। রাজত্বের গোড়ার দিকে সম্রাট বৌদ্ধ ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নি, কিন্তু পরে রাজধানীর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার পরই সক্রিয়ভাবে বৌদ্ধদের সমর্থন করতে ও তাঁদের ধর্মমতকে সাহায্য দিতে শুরু করেন তিনি। কলিঙ্গ-যুদ্ধের পরই বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ ও বৌদ্ধ নীতিবোধ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বিশেষ রকম জাগ্রত ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ধর্মবিজয় (বা, আচরণের অর্থাৎ ধর্মের মূলনীতির নিয়মগুলি প্রচারণা)-এর নীতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে তাঁর কার্যকলাপে। তবে প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে কলিঙ্গ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু অশোক বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়েছিলেন।

নিজে সক্রিয় বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও অশোক তাঁর গোটা রাজত্বকালে কখনও কিন্তু মঠবাসী ভিক্ষু হন নি কিংবা রাজ্যের শাসনভার অপর কারও হাতেও অর্পণ করেন নি। কিছু-কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে অশোক ছিলেন রাজসন্ন্যাসী এবং শেষদিকে তিনি রাজ্য ছেড়ে বৌদ্ধ মঠে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও-পর্যন্ত-টিকে-থাকা কোনো সূত্র থেকে এ-মতের সমর্থন মেলে না। অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম পরিণত হয়েছিল রাষ্ট্রের সরকারি ধর্মমতে -- এই তত্ত্বটিও একইরকম ভিত্তিহীন।

যদিও অশোক বৌদ্ধ ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তবু বৌদ্ধধর্মকে সরকারি ধর্মমতে পরিণত করেন নি তিনি। তাঁর ধর্ম-সংক্রান্ত নীতির প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পরমতসহিষ্ণুতা এবং প্রায় পুরো রাজত্বকাল ধরেই তিনি এই সহিষ্ণুতা বজায় রেখে চলেছিলেন।

অনুশাসনগুলিতে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঐক্যের সপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন অশোক, তবে বলেছেন এই ঐক্য অর্জন করতে হবে জোর-জবরদস্তির মধ্যে দিয়ে নয়, প্রত্যেকটি ধর্মমতের মূলনীতিসমূহের বিকাশসাধনের মধ্যে দিয়ে। এইসব অনুশাসন থেকে জানা যায় অশোক ওই সময়কার বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ এবং জনসাধারণের মধ্যে রীতিমতো প্রভাবশালী অজীবিকদের কয়েকটি গুহা দান করেন। এছাড়া অনুশাসনগুলি থেকে আরও জানা যায় যে সম্রাট তাঁর প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনার জন্যে পাঠাতেন জৈন ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলির কাছেও। একথা মনে করার কারণ আছে যে অশোক এই পরমতসহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন কিছুটা বাধ্য হয়েই, কারণ (বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও) রক্ষণশীল ও তার বিরোধী সংস্কারবাদী ধর্মমত তাঁর সমকালে এতখানি প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল যে এছাড়া অন্য কোনো পন্থা ছিল না তাঁর পক্ষে। তাঁর এই পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি ও সেইসঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার ওপর রাষ্ট্রের সুকৌশল নিয়ন্ত্রণই সঠিকভাবে বলতে গেলে ব্রাহ্মণ, অজীবিক ও জৈনদের শক্তিশালী স্তরগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে

এবং সেইসঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে অতটা কার্যকরভাবে প্রচার করার ব্যাপারে অশোকের সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু পরে তাঁর রাজত্বকালের শেষ বছরগুলিতে যখন অশোক এই পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি ত্যাগ করে খোলাখুলি বৌদ্ধধর্মের সপক্ষে নীতির পরিচালনা শুরু করলেন, অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তখন দেখা দিল প্রবল বিরোধিতা এবং এই ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল রাজা ও তাঁর শাসনব্যবস্থার পক্ষে গুরুতর ফলাফলের কারণস্বরূপ।

রাজত্বকালের একেবারে শেষদিকে অশোক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং আগেকার সহিষ্ণুতার নীতি বিসর্জন দিয়ে অজীবিক ও জৈনদের ওপর এমন কি পীড়ন পর্যন্ত শুরু করেন।

এর ফলে বৌদ্ধদের সঙ্গে ওই সময়কার অন্যান্য ধর্মমতের প্রতিনিধিদের সম্পর্ক গুরুতররকমে জটিল হয়ে ওঠে। এমন কি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও কিছু-কিছু বিরোধের লক্ষণ প্রকাশ পায় এ-সময়ে। তখনকার কোনো-কোনো সূত্র থেকে বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রতিনিধিদের মধ্যেও বিসংবাদের খবর মেলে। এ-কারণে সম্রাট অশোক চেষ্টা করেন বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে। সঙ্ঘের ঐক্যকে যাঁরা ক্ষুণ্ণ করছিলেন ভিন্নমতাবলম্বী সেই সমস্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার বিষয়টি নিয়ে বিশেষ একখানি অনুশাসন প্রচার করেন অশোক। এই অনুশাসনে বিদ্রোহীদের সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কারের কথা বলা হয়। সেইসঙ্গে অশোক সুপারিশ করেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উচিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সযত্নে অধ্যয়ন করা। প্রসঙ্গত তিনি সঙ্ঘে শৃঙ্খলারক্ষার বিষয়ে লিখিত বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মবিধি-সংক্রান্ত গ্রন্থের তালিকাও পেশ করেন।[৮]

বৌদ্ধ পুথির ভাষ্য অনুযায়ী অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রেই বৌদ্ধদের তৃতীয় মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অশোকের ধর্ম-সংক্রান্ত নীতির একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি-যে শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরই সমর্থনলাভের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা-ই নয়, সবচেয়ে বেশি করে চেষ্টা করেছিলেন তিনি বুদ্ধের ব্যাপক উপাসক বা ভক্তবৃন্দের সমর্থনলাভের।

এদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে অশোকই ছিলেন ভারতের সেই প্রথম রাজা যিনি সাম্রাজ্যের সংহতিসাধনে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন ও তার প্রচারে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ অনুশাসনই উপাসকদের উদ্দেশে রচিত, ভিক্ষুদের নয়; কারণ, যতদূর মনে হয়, ওই উপাসকরা বৌদ্ধধর্মের মূল নীতিগুলি ও ওই ধর্মমতের দার্শনিক স্তরবিন্যাসগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন এইসব শিলালিপিতে নির্বাণ, মহৎ চতুঃসত্য, অষ্টধা পথ, ইত্যাদি বিষয়গুলির কোনো উল্লেখ নেই। এইসব শিলালিপির বাস্তব

জীবনানুগ তাৎপর্যই হল এগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, তাই সম্রাট নিজেই এগুলিকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ধর্ম' (আচার-আচরণগত) শাসন বলে। নৈতিক এই সমস্ত বিধিনিষেধ অ-বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়গুলি সহ বৌদ্ধ উপাসকদের কাছে তখন ভালোরকম পরিচিত হয়ে উঠেছিল এবং জনসংখ্যার এক বিপুল অংশের ও সামাজিক নানা গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট ছিল তা।

অশোকের ধর্মশাসন

'ধর্ম' বলতে সাধারণত বোঝায় মানুষের আচার-আচরণের ও নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপনের নিয়মকানুনকে। তবে বৌদ্ধ শাস্ত্রাদিতে যেভাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে এ দিয়ে বিশেষ একটি তত্ত্বজ্ঞানও বোঝানো হয়ে থাকে।

অশোকের অনুশাসনগুলিতে উপরোক্ত ওই উভয়বিধ অর্থেই ধর্ম শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। বেশির ভাগ শিলালিপিতে অবশ্য ধর্ম শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে নৈতিক নিয়মকানুনের এক সমষ্টিকে, তবে বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম-শাসিত অনুশাসনগুলিতে এই শব্দটি বুঝিয়েছে বুদ্ধের উপদেশাবলীকে। অনুশাসনে উল্লিখিত উপরোক্ত নৈতিক নিয়মকানুনের অন্তর্গত ছিল বাবা-মায়ের বশ্য-বাধ্য হওয়া, গুরুজনকে শ্রদ্ধা-নিবেদন, জীবে দয়া, জীবিত প্রাণী হত্যা করতে অস্বীকৃত হওয়া, ইত্যাদি। অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে এই নীতিগুলি মানুষের এমন সমস্ত আচার-আচরণের সঙ্গে জড়িত যা বিশেষভাবে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য কিংবা অপর কোনো ধর্মমতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। জাতিগত উৎস কিংবা ধর্মীয় আনুগত্য-নিরপেক্ষভাবে জনসমাজের বিভিন্ন স্তরের পক্ষে সহজে বোধগম্য ঐতিহ্যসিদ্ধ নৈতিক নিয়মকানুন ছিল এগুলি। কিছু-কিছু পণ্ডিত ভ্রান্ত ধারণাবশে মনে করেন যে এই নীতিগুলি বুঝি কড়াকড়িভাবে বৌদ্ধ ধর্মীয় নীতিশাস্ত্রেরই অন্তর্গত। অবশ্য এটা ঠিক যে অশোকের অনুশাসনগুলিতে প্রাপ্তব্য ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল যথেষ্ট পরিমাণেই। প্রসঙ্গত এটা লক্ষণীয় যে অশোকের অনুশাসনগুলির গ্রীক ভাষান্তরণে ধর্ম শব্দটি বোঝানো হয়েছে যে-গ্রীক শব্দ 'ইউসেবিয়া' দিয়ে, সেটিতে আসলে ন্যায়পরায়ণতা বোঝায়, ধর্মবিশ্বাস নয়। ধর্মের নীতিসমূহ অবিচলভাবে অনুসরণ করে চললে কোন শুভফল মানুষ অর্জন করে সেই প্রশ্নটিও অশোক তাঁর অনুশাসনগুলিতে উপস্থাপন করেছেন একই রকম সহজ ও সাধারণভাবে। তিনি বলেছেন যে-মানুষ ধর্মপালন করে দৃঢ়তার সঙ্গে ও আন্তরিকভাবে তার প্রাপ্য হয় রাজার অনুগ্রহ, সম্পদ-সমৃদ্ধি ও স্বর্গলাভ। এই শেষোক্ত ফলটিও জনসাধারণের ব্যাপক অংশের কাছে খুবই বোধগম্য ছিল। বৈদিক যুগেই এই পুণ্যফলটির কথা

সাধারণ্যে প্রচারিত ছিল, পরে বৌদ্ধরাও উত্তরাধিকারসূত্রে এই ধারণাটির অংশীদার হয়েছিলেন। এছাড়া অনুশাসনগুলিতে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় কিংবা দার্শনিক নীতিসমূহের স্পষ্ট কোনো উল্লেখ থাকত না, কারণ, আগেই বলেছি, অনুশাসনগুলির লক্ষ্য ছিল বহুবিধ মত-পথের ব্যাপক জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া। তদুপরি অশোকের ধর্ম ওই যুগের অন্যান্য প্রধান ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত মৌল নৈতিক নিয়মকানুনের বিরোধীও ছিল না। তাঁর প্রচারিত নীতিগুলি বহুবিধ ধর্ম-সম্প্রদায় ও মতাদর্শের কাছে গ্রাহ্য ধর্মশিক্ষার অন্তঃসার বলে প্রচার করতেন সম্রাট। অনুশাসনগুলিতে মানুষের কাছে ধর্মশিক্ষা গ্রহণের জন্যে আবেদনের পাশাপাশি পাওয়া যায় সকল প্রকার ধর্মের অন্তর্গত উপদেশাবলী গ্রহণের ও তা মেনে নেয়ার একটা মনোভাব।

অশোকের অনুশাসনগুলিতে ধর্মের যে-নীতিসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় তা রচিত হয়েছিল গোটা সাম্রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যাকে একটি সর্বগ্রাহ্য নৈতিক ভিত্তি যুগিয়ে দেয়ার জন্যে এবং যেন বর্ণ ও সম্প্রদায়সমূহ এবং বহুবিধ সামাজিক গোষ্ঠীর ধর্মাচরণেব পাশাপাশি অধিকতর মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে।

ধর্মের নীতিসমূহ প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত রাষ্ট্রনীতি বা 'ধর্মবিজয়' (আক্ষরিক অর্থে, ন্যায়নিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে জয়লাভ) ছিল অশোকের সামগ্রিক রাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ধর্মের এই নিয়মাবলী যথাযথভাবে যাতে পালিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্যে অশোক বিশেষ রাজকর্মচারি বা ধর্ম-মহামাত্র পর্যন্ত নিয়োগ করেছিলেন।

এই কর্মচারিদের পাঠানো হোত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষজনের ওপর নজর রাখতে। অনুশাসনগুলিতে সম্রাট সরাসরি একথা জানাতে কুণ্ঠিত হন নি যে ধর্ম-মহামাত্রদের কাজ হল বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন ও অজীবিকরা ধর্মকে কীভাবে বাস্তবে রূপায়িত কবছেন তা দেখা।

জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন মত-পথাবলম্বী গোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাবকে দমন করা এই রাষ্ট্রনীতি অনুসরণের ফলে সম্ভব হয়ে ওঠে।৮

অশোকের ক্ষমতাচ্যুতি ও সাম্রাজ্যের পতন

মৌর্য-সাম্রাজ্যের শেষ যুগের ইতিহাস অনুধাবনের পক্ষে রাজা অশোক সম্বন্ধে বৌদ্ধ উপকথাগুলি অত্যন্ত সহায়ক ও কৌতূহলপ্রদ, কেননা খুব কম করেও বলতে গেলে ওই সময়কার সাক্ষীস্বরূপ শিলালিপির সূত্রগুলি অত্যন্ত খণ্ডিত।

এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল রাজত্বের শেষ বছরগুলিতে অশোক কীভাবে কার্যত ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন তার এক অসামান্য বিবরণ। দীর্ঘ এক সময় ধরে সংকলিত বেশ কয়েকটি নানা ধরনের গ্রন্থে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এ-থেকে আমরা জানতে পারি যে রাজত্বের শেষদিকে বৌদ্ধ সংঘগুলিতে মুক্তহস্তে অর্থদান করার ফলে অশোক তাঁর রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেলেন। এই দান তিনি করছিলেন বুদ্ধের বাণী প্রচারের সাহায্যকল্পে। ওই সময়ে অশোকের পৌত্র সম্পাদি (বা সম্প্রতি) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিলেন। রাজার উচ্চপদস্থ অমাত্যরা তখন সম্পাদিকে জানালেন রাজার এই অতিরিক্ত অর্থ-অপচয় বা ভিক্ষুদের মাত্রাতিরিক্ত অর্থদানের কথা এবং দাবি জানালেন এইসব অর্থদানের রাজাদেশ নাকচ করার। অতঃপর সম্পাদির নির্দেশে বৌদ্ধ সংঘগুলিতে অশোকের অর্থদানের আদেশ পালিত হওয়া বন্ধ হল। আসলে রাজক্ষমতা ইতিমধ্যে চলে গিয়েছিল সম্পাদির হাতে। উপরোক্ত এইসব বৌদ্ধ সূত্র অনুসারে অশোক নাকি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর এই সত্যটি স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর আদেশ কাগজে-কলমেই থেকে যাচ্ছে মাত্র, তা পালিত হচ্ছে না এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তখনও রাজা থাকলেও আসলে তিনি রাজ্য ও ক্ষমতা দুই-ই হারিয়েছেন।

বৌদ্ধ এই সূত্রগুলি থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি একেবারেই স্বকপোলকল্পিত বলে ঠেকলেও আসলে কিন্তু সে-সবের মধ্যে দিয়ে কার্যত পাওয়া যাচ্ছে অশোকের রাজত্বের শেষদিকে দেশের তৎকালীন বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটি চিত্র। অশোকের বৌদ্ধপ্রীতির রাষ্ট্রনীতি তখন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জৈনধর্মের সমর্থকদের মধ্যে গুরুতর অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছিল। কয়েকটি আকর সূত্র অনুযায়ী সম্পাদি স্বয়ং নাকি জৈনধর্মালম্বী ছিলেন এবং রাজসভায় প্রভাবশালী রাজকর্মচারিদের সমর্থনপুষ্টও ছিলেন তিনি। ওই সময় নাগাদ দেশে অর্থনৈতিক অভাব-অসুবিধাও দেখা দিয়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান। তক্ষশিলায় ওই সময়ে যে-অভ্যুত্থান ঘটে তাতে বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় শাসনকর্তা। এখানকার এই বিদ্রোহ সে-যুগের পক্ষে অন্যতম সর্ববৃহৎ ছিল।

আকর উপাদানগুলি থেকে জানা যায় যে রানী তিষ্যরক্ষিতাও (তিনিও ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বিরোধী) রাজার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। অশোকের রাজত্বকালের শেষ অনুশাসনগুলির একটিতে রাজাদেশ প্রচারিত হয় আগের মতো রাজার নামে নয়, রানীর নামে। এই অনুশাসনখানি ছিল রাজার আনুকূল্য ও উপহারাদি বিতরণের ব্যাপারে, অর্থাৎ এটি ছিল সেই ব্যাপারটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থাদির সূত্র অনুযায়ী যে-প্রশ্নটি নিয়ে রাজা ও তাঁর পারিষদদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘর্ষ বেধে উঠেছিল। একথা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ

আছে যে শিলালিপিসমূহে উৎকীর্ণ তথ্যাদি ও বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলির মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য মোটেই আপতিক নয়। এই সাদৃশ্য আসলে অশোকের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বছরের বাস্তব অবস্থারই প্রতিফলন।

এ-সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এই তথ্যটিও জানা যাচ্ছে যে অশোকের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরা সাম্রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারেন নি। প্রাপ্তিযোগ্য সূত্রের সাক্ষ্য থেকে একথা মনে করার কারণ ঘটেছে যে মৌর্য-সাম্রাজ্য প্রথমে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়: পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চলে এবং তক্ষশিলাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমাঞ্চলে। প্রাপ্তিযোগ্য সূত্রগুলিতে অশোকের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে যে-সমস্ত উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলিতে বহু পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে, তবে একথাও বিশ্বাস করার কারণ আছে যে হয় পূর্বোক্ত সম্পাদি নয়তো পুরাণসমূহে যাঁকে অশোকের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে সেই দশরথ অশোকের পরে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেছিলেন। অশোকের মতো দশরথও 'দেবানামপিয়' উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং অজীবিকদের কয়েকটি গুহাদান-সম্পর্কিত তাঁর অনুশাসনগুলির বিচারে বলতে হয় অজীবিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। এর পরের কয়েকটি বছর মগধের সিংহাসনে কয়েকজন রাজার দ্রুত ও পরপর বসার ঘটনা দিয়ে চিহ্নিত। অবশেষে ১৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে মৌর্য-রাজবংশের শেষ উত্তরাধিকারী বৃহদ্রথ তাঁর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্রের নেতৃত্বে পরিচালিত অপর এক ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হলেন। অতঃপর যে-রাজবংশ সিংহাসনে আরূঢ় হল তার নাম শুঙ্গ-বংশ। কিন্তু মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রাক্তন গৌরবরক্ষায় শুঙ্গ-বংশও অসমর্থ হল। মনে হয় শুঙ্গরা যখন ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন ততদিনে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ মগধ সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

গ্রীক ইতিহাসবেত্তা পলিবিয়াসের রচনায় মৌর্য-সাম্রাজ্যের শেষদিকে মৌর্য-রাজাদের সঙ্গে সেলুক্যাস-বংশীয় রাজাদের পরস্পর-সম্পর্ক বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যাদি পাওয়া যায়। পলিবিয়াসের মতে, সেলুক্যাস-বংশীয় সুখ্যাত রাজা মহান আণ্টিয়োকাস (২২৩-১৮৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) প্রাচ্যদেশে অভিযান পরিচালনার পর হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন এবং ভারতীয় রাজা সোফাগাসেনাসের (স্পষ্টতই মৌর্য-রাজা সুভগসেনার) সঙ্গে তাঁর মৈত্রীবন্ধন ঝালিয়ে নেন। অতঃপর আরাকোসিয়া অভিমুখে অভিযান শুরু করার আগে ভারতে থাকতে আণ্টিয়োকাস কিছু হাতি উপহারস্বরূপ পান। এ-থেকে মনে হয়, সম্ভবত ২০৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ মৌর্য-রাজবংশ এতদূর হীনবল হয়ে পড়েছিল যে আণ্টিয়োকাসের আরাকোসিয়া অভিযান ঠেকানোর মতো ক্ষমতা ছিল না তার। তাছাড়া এ-সম্ভাবনাকেও নাকচ করা চলে না যে আরাকোসিয়া ওই সময়ে আর মৌর্য-সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত ছিল না। তৎসত্ত্বেও

আণ্টিয়োকাসের পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয় নি সুভগসেনাকে উপেক্ষা করা। আর তাই সেল্যুকাস-রাজবংশ ও মৌর্য-রাজবংশের মধ্যে যে-মৈত্রীসম্পর্ক ইতিপূর্বে স্থাপিত হয়েছিল আণ্টিয়োকাস তারই পুনঃপ্রবর্তনে বাধ্য হন।

শুঙ্গ-রাজবংশ ও ইন্দো-গ্রীক আক্রমণ

শুঙ্গ-বংশের রাজত্বকালে 'পশ্চিমের সমস্যা'টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। পতঞ্জলি-রচিত গ্রন্থ মহাভাষ্য অনুসারে যবনদের (ইন্দো-গ্রীকদের) সেনাবাহিনী সে-সময়ে ভারতীয় শহর সাকেত ও মাধ্যমিকা অবরোধ করে। 'যুগ-পুরাণ' নামের গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে যবনসেনা সাকেত হয়ে পাটলিপুত্র পর্যন্ত ধাওয়া করে, কিন্তু পরে ওই সেনাবাহিনীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে শুঙ্গদের রাজধানী থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয় তারা।

মনে হয় ইন্দো-গ্রীকদের আক্রমণ ঘটেছিল পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে, খ্রীস্টপূর্বাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ইন্দো-গ্রীকদের রাজা ছিলেন সে-সময়ে মেনাণ্ডার।

পুষ্যমিত্রের বংশধরদের আমলেও, বিশেষ করে তাঁর পৌত্র বসুমিত্রের রাজত্বকালে, শুঙ্গদের সঙ্গে ইন্দো-গ্রীকদের সংঘর্ষ ঘটে। বসুমিত্র অবশ্য এই যুদ্ধে বড় রকমের বিজয়লাভে সমর্থ হন, ফলে শুঙ্গদের সঙ্গে ইন্দো-গ্রীকদের সম্পর্কে অতঃপর স্থিতিশীলতা আসে। শিলালিপির সাক্ষ্যে দেখা যায় গ্রীক রাজা আণ্টিআল্‌সিডাস গোটা একটি দূতস্থান প্রেরণ করেন শুঙ্গ-রাজ ভগভদ্রের কাছে। এই দূতস্থান পাঠানো হয় বিদিশায়। এ থেকে মনে হয় শুঙ্গ-রাজারা নিশ্চয়ই তাঁদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন বিদিশা নগরে।

এক শো বছরেরও বেশি সময় ধরে শুঙ্গ-বংশ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। পরে সিংহাসন অধিগত হয় কাহ্নদের (৬৮-২২ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। এই কাহ্ন-রাজবংশের আমলে মগধ-সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া চলে ক্ষিপ্রগতিতে। সাম্রাজ্যের বহু অংশ ক্রমে-ক্রমে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নতুন-নতুন আঞ্চলিক বা স্থানীয় রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। শুঙ্গদের রাষ্ট্রনীতি বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিল এইমর্মে যে-সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তা কতদূর নির্ভরযোগ্য, বিশেষ করে পুষ্যমিত্রের আমলে বৌদ্ধ-বিরোধী নীতির সত্যতা কতদূর বিশ্বাস্য, সেকথা বলা কঠিন, তবে এ-ও ঠিক যে অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম যে-প্রবল রাজসমর্থন লাভ করেছিল পরবর্তী আমলে স্পষ্টতই তার অভাব ঘটেছিল। শুঙ্গ-রাজত্বের আমলে বিষ্ণুপূজা ও বৈষ্ণব

ধর্ম'ও-যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, শুঙ্গ-রাজাদের শিলালিপিগুলি থেকে সেটি স্পষ্ট। বিশেষ করে বাসুদেবের পুজো এ-সময়ে গুরুত্ব অর্জন করে।

পুরাণসমূহ থেকে দেখা যায় যে মৌর্য-রাজবংশ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৩৭ বছর। প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা অনুষ্ঠানের যুগ ছিল এটি, এটি ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশের কাল, যা প্রাচীন ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিবর্তনে গভীর প্রভাব রেখে গেছে। এই যুগে ঐক্যবদ্ধ এক ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ফলে বহু বিচিত্র জাতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও সংযোগ ঘটে, তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে ঘটে পরস্পর-নিষেক এবং সংকীর্ণ উপজাতিক স্তরগুলির মধ্যে তারতম্য অস্পষ্ট হয়ে আসে। আবার ওইসঙ্গে দেশ-বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক'ও বৃদ্ধি পায় ব্যাপকতর হারে। মৌর্য-যুগেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ও শ্রীলঙ্কায়। ওই যুগেই আবার বহু রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অঙ্কুরোদ্‌গম ও প্রতিষ্ঠা ঘটে, যা বিকশিত হয়ে ওঠে পরবর্তী কালে।

তবু তাঁদের পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী, শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্র ও বিপুল-বিস্তৃত শাসনব্যবস্থা, বহুবিচিত্র জাতি ও অঞ্চলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত তাঁদের ধর্মবিজয়ের রাষ্ট্রনীতি সত্ত্বেও মৌর্যরা এমন কি সেই নড়বড়ে ঐক্যটুকুও বজায় রাখতে পারেন নি। আসলে মৌর্য-সাম্রাজ্য ছিল বিকাশের বিভিন্ন স্তরবর্তী বহুবিভিন্ন উপজাতি ও জাতিগোষ্ঠীর একত্রবাসের এক রকমারি চিত্র।

মগধ ও মৌর্য-যুগে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আকর সূত্র ও মালমশলা যত পাওয়া যায় সেই তুলনায় দক্ষিণ ভারত ও সেখানকার রাষ্ট্রসমূহের এবং মহাদেশের ওই অংশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সাক্ষ্য-সমন্বিত আকর উপাদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বহুপরিমাণে কম। দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় ভাষাগুলিতে লিখিত আকর গ্রন্থগুলি দেখা দিয়েছিল মাত্র গোড়ার দিককার খ্রীস্টীয় শতাব্দীগুলিতে এবং এই কারণে খ্রীস্টপূর্বাব্দের ইতিহাসের প্রধান সাক্ষ্যসূত্র হল ওই অঞ্চলে-পাওয়া উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলিই (প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত)।

অশোকের অনুশাসনগুলিতে তাঁর সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দক্ষিণের দেশসমূহের যে-তালিকা পাওয়া যায় তার অন্তর্গত হল পাণ্ড্য, চোল, চের, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রদের রাজ্যগুলি। কিছুটা আগের যুগে লেখা মেগাস্থেনিসের বিবরণীতে পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে, তা থেকে মনে হয় অন্ততপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ

শতাব্দীর শেষাশেষি দক্ষিণ ভারতে ওই নামে একটি রাজ্য অবশ্যই ছিল। প্রসঙ্গত, এটি একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা যে মাসিডোনিয়ার আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন যে-ইতিবৃত্তকাররা তাঁরা দক্ষিণ ভারতের কথা, এমন কি শ্রীলংকার কথাও শুনেছিলেন। ওনেসিক্রিটাস নামে এঁদেরই একজন শ্রীলঙ্কা অভিমুখে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মগধের এবং মৌর্য-রাজাদের আমলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বিকশিত হয়ে ওঠে আরও দৃঢ় ও নিয়মিত ভিত্তিতে। বৈয়াকরণ কাত্যায়ন (আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) ও পরবর্তী কালের পতঞ্জলির গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের কিছু-কিছু অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে উত্তর ভারতের সংস্কৃতি ক্রমশ বিস্তারলাভ করছিল দক্ষিণদিকে, অর্থনৈতিক সম্পর্কও গড়ে উঠছিল ক্রমশ। দক্ষিণ ভারতের কিছু-কিছু অংশ মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঘটনার এই ধারা আরও দ্রুতগতি লাভ করে। অর্থশাস্ত্রে দক্ষিণ ভারতের মাটির তৈরি পণ্যদ্রব্যাদির বহু বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত বাণিজ্যপথগুলির বিবরণ।

মৌর্য-রাজাদের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার শুরু হয়। এর সাক্ষ্য মেলে দাক্ষিণাত্যের কিছু-কিছু অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সময়কার উৎকীর্ণ বৌদ্ধ শিলালিপিগুলি থেকে।

মৌর্য-শাসনের অবসানের পর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি অঞ্চল সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রাম শুরু করে। এ-সময়ে একমাত্র বাহুবলেই বিদর্ভকে দমন করতে সমর্থ হয় শুঙ্গ-রাজবংশ। তবে ওই রাজ্যের দক্ষিণ অংশ শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা-অর্জনে সমর্থ হয়।

মৌর্য-পরবর্তী যুগে দাক্ষিণাত্যের সবচেয়ে পরিচিত ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল সাতবাহনদের রাজ্য। তবে এই রাষ্ট্রের ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠাই রহস্যময় থেকে গেছে, যার সমাধান এখনও করে ওঠা সম্ভব হয় নি। পুরাণসমূহ থেকে যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাতে সাতবাহনদের আমরা অন্ধ্রদেশবাসী বলে সনাক্ত করতে পারি। উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুযায়ী এই সাতবাহনরা পরে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম সমুদ্র-তীরবর্তী ভূখণ্ড পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিল বলে মনে হয়। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক (বা পুরাণের সাক্ষ্য অনুযায়ী শিশুক), তবে সাতবাহন-বংশের ইতিহাসে গোড়ার পর্যায়ে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন সাতকানি (বা পুরাণ-অনুসারে শতকর্ণী)। রাজা শতকর্ণীর আমলে রাজ্যের সীমানা বহুগুণ প্রসারিত হয় এবং রাজা স্বয়ং সুখ্যাত হয়ে ওঠেন 'দক্ষিণ রাজ্যের প্রভু' হিসেবে। একসময় শতকর্ণীকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয় পূর্ব-সমুদ্রোপকূলের এক শক্তিশালী রাষ্ট্র কলিঙ্গের বিরুদ্ধে, কারণ কলিঙ্গ-রাজ খারবেল তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

ওই সময়ে কলিঙ্গ ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে। হাতিগুম্ফাতে (আধুনিক ভুবনেশ্বর শহরের সন্নিকটে) পাওয়া খারবেল-শিলালিপি অনুযায়ী কলিঙ্গ-বাহিনী পশ্চিমাঞ্চলের ভোজক ও রথিক নামের জাতিদুটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়। অতঃপর রাজা খারবেল তিনবার উত্তরাঞ্চল-অভিমুখে সৈন্যচালন করেন, অবরোধ করেন মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ এবং তারপর অগ্রসর হন গঙ্গাতীর-অভিমুখে। খারবেল-লিপি থেকে আরও জানা যায় যে মগধের রাজা বহসতিমিত কলিঙ্গ-রাজের কাছে বশ্যতাস্বীকার করেন। খারবেল দক্ষিণেও সামরিক অভিযান চালান এবং তাঁর সেনাবাহিনী গিয়ে পেঁছিয় এমন কি পাণ্ড্য-রাজ্য পর্যন্ত। খারবেলের রাজত্বের পর অবশ্য কলিঙ্গের সৌভাগ্যের দিনের অবসান হয়ে আসে এবং কলিঙ্গ সম্বন্ধে আকর সূত্রগুলিতে ক্রমশ কম-কম উল্লেখ পাওয়া যেতে থাকে।

অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমাজ-কাঠামো

কৃষি

প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে মগধ ও মৌর্য-যুগ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত। ওই সময়ে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যগুলি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং পরবর্তী কালে সেগুলিই হয়ে উঠেছিল আরও বিকশিত। সেইসঙ্গে এটিও লক্ষণীয় রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে দেশের ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলের বিকাশের স্তর ছিল সাংঘাতিক রকমের অসমান। অর্থনৈতিক দিক থেকে উত্তর ভারতের সবচেয়ে উন্নত এলাকাগুলির একটি ছিল গঙ্গা-উপত্যকা, এলাকাটি ছিল উর্বর পলিমাটির দেশ এবং খনিজ ধাতুর ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ।

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল লোহার খনির ব্যাপ্তি ও আধিক্য। কৃষি এবং কারুশিল্প উভয় ক্ষেত্রেই লোহা ব্যবহারের চল ছিল। লোহা দিয়ে কৃষির যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে লাঙলের ফলা, তৈরি করতে শুরু করেছিল মানুষ এবং এর ফলে কৃষিকাজের ও তার ফলাফলের প্রকৃতিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ পুথিগুলির মধ্যে একটি 'সুত্ত-নিপট'এর এক উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে এক ব্রাহ্মণ জমি চাষ করছিলেন লাঙল দিয়ে আর সেই লাঙলের ফলা (স্পষ্টতই লোহার তৈরি) এত গরম হয়ে উঠল যে তাঁকে জলে ডুবিয়ে তা ঠাণ্ডা করতে হল। উৎপাদনশীল শ্রমের প্রধান ধরনটাই তখন হয়ে দাঁড়াল কৃষিকাজ। যে-সমস্ত অঞ্চলের জমি বেশি উর্বর কৃষকরা সেখানে বছরে দু'বার, এমন কি তিনবার

পর্যন্ত ফসল ফলাতে সমর্থ হচ্ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণে তাই পাওয়া যায় বসন্তকালীন ও শরৎকালীন ফসলের ভিন্ন-ভিন্ন সংজ্ঞা। প্রাচীন ভারতীয়রা ছিলেন দক্ষ কৃষক, নানা ধরনের জমির প্রকৃতি ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ভালোরকম জানাশোনা ছিল তাঁদের। তখন ধান, গম ও যবই ছিল প্রধান শস্য। প্রত্নতত্ত্ববিদরা যখন উত্তর ও মধ্য-ভারতের প্রাচীন নগরবসতিগুলিতে খননকার্য চালান তখন মগধ ও মৌর্য-যুগগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ভূস্তরসমূহে চালের দানা পাওয়া যায়। মগধের অধিকৃত রাজ্যে ধানচাষের জন্যে বিশেষ করে বরাদ্দ করা হয় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড এলাকা। বৌদ্ধ পুঁথিগুলিতেও মগধে ধানের ভালো ফলনের উল্লেখ আছে বহুবার। পতঞ্জলিও তাঁর ব্যাকরণ-সংক্রান্ত রচনায় উল্লেখ করেছেন যে মগধ-রাজ্যে প্রধান ফসল ছিল ধান, আর পশ্চিম ভারতের অনুর্বর এলাকাগুলিতে যবই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ফসল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এবং লিখিত আকর সূত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে মহাদেশের পশ্চিম অংশে গম, সীম-বরবটি ও সেইসঙ্গে যবের চাষও হোত ব্যাপকভাবে। এছাড়া আরও দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখানে আবহাওয়া শুষ্কতর ও জমি আরও কম উর্বর, সেখানে জোয়ারের চাষই ছিল প্রধান।

মগধ এবং মৌর্য-যুগগুলিতে জমিতে সেচ-ব্যবস্থারও দ্রুত উন্নতি ঘটে। বহুতর আকর সূত্রেই বিশেষভাবে সেচের উদ্দেশ্যে খনন-করা বিশেষ-বিশেষ খাল ও জলাধারের উল্লেখ আছে এবং মগধে জমির সেচ-ব্যবস্থার একাধিক উল্লেখ আছে প্রত্যক্ষভাবেই। রাষ্ট্রের তরফ থেকে সেখানে সংগঠিত হয়েছিল বড় আকারের বহু সেচ-প্রকল্প, তদুপরি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করত যৌথভাবে গ্রামীণ সমাজগুলি ও ব্যক্তিগতভাবে কৃষকরাও। সৌরাষ্ট্রে-পাওয়া খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একখানি উৎকীর্ণ লিপিতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালের মতো অত প্রাচীনকালেই একটি জলাধার নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া গেছে। আর সম্রাট অশোকের আমলে বিস্তারিত সেচ-ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তার সঙ্গে যুক্ত হল বহুবিধ খাল। মেগাস্থেনিসও মৌর্য-সাম্রাজ্যের আমলে সেচ-ব্যবস্থার প্রচলনের কথা লিখে গেছেন (খুব সম্ভব এই ব্যবস্থাগুলি তিনি দেখেছিলেন রাজধানীর কাছাকাছি এলাকায়)। সেচের খালগুলি এবং খাল থেকে মাঠে জল সরবরাহের ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্যে রাজকর্মচারি নিয়োগের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

যদিও ওই যুগে কৃষিকাজই ছিল উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র, তবু গবাদি পশু পালন ও প্রজননও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। গবাদি পশু পালনের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হোত তখন, কেননা খেতের কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও মাল-বওয়া গাড়িটানার কাজেও তাদের ব্যবহার করা হোত। যুদ্ধের সময়ও গবাদি পশু খুব বেশি কাজে লাগত। বৌদ্ধ পুঁথিগুলিতে ধনী পশুপালকদের বহু উল্লেখ আছে; বলা হয়েছে জনেক ধনী পশুখামার-মালিকের নাকি সাতাশ হাজার দুগ্ধবতী গাভী

ছিল। এত বড় একটি খামারের গোরু-চরানোর জন্যে স্বভাবতই নিযুক্ত ছিল বিশেষ সমস্ত রাখাল এবং গোরুর তত্ত্বাবধানের জন্যে বেশকিছু কৃষাণ। মালিকানা নিয়ে গোলমাল এড়ানোর জন্যে নিয়ম হিসেবেই গবাদি পশুর গায়ে ছাপ মেরে দেয়া হোত।

শহরের বাড়বৃদ্ধি ও কারুশিল্পের উদ্ভব

মগধ ও মৌর্য-যুগগুলিতে জীবনযাত্রার একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল ওই সময়কার শহরগুলির বাড়বৃদ্ধি। শহরগুলি তখন হয়ে উঠছিল কারুশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের একেকটি কেন্দ্র। তবে তখনও জনসংখ্যার বেশ বড় একটি অংশ গ্রামেই বাস করত।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে শহরগুলির সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে। এটা হল সেই সময় যখন নগররক্ষার জন্যে প্রাকার ও পরিখা নির্মাণ এবং নগরনির্মাণ-পরিকল্পনা কার্যত দেখা দিতে থাকে। তবে তখনও পর্যন্ত একটি শহর থেকে অপর এক শহরের পার্থক্য ঘটত প্রচণ্ড। যেমন, পাটলিপুত্র শহরটি গড়া হয়েছিল সামান্তরিক ক্ষেত্রের আকারে, কৌশাম্বী অসমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ধরনে, শ্রাবস্তী ত্রিকোণ ক্ষেত্রের ধাঁচে আর বৈশালী আয়তক্ষেত্রের গড়নে। এদের মধ্যে আকারে সব থেকে বড় ও বৃহত্তম জনসংখ্যার শহর ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র। রাজধানীর এক সময়ের বাসিন্দা মেগাস্থেনিসের উদ্ধৃত তথ্য-অনুযায়ী মনে হয় পাটলিপুত্রের আয়তন পঁচিশ বর্গ-কিলোমিটারেরও বেশি ছিল। এই তথ্য যদি নির্ভরযোগ্য বলে ধরা হয় তাহলে বলতে হয় পাটলিপুত্র অবশ্যই প্রাচীন কালের শহরগুলির মধ্যে অন্যতম সর্ববৃহৎ ছিল। প্রাচীন আলেক্‌জান্দ্রিয়া ছিল উপরোক্ত আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এবং বৎসরাজ্যের রাজধানী সুখ্যাত ভারতীয় শহর কৌশাম্বী ছিল পাটলিপুত্রের চেয়ে এগারোগুণ ছোট। মেগাস্থেনিস আরও লিখেছেন যে মৌর্য-সাম্রাজ্যের রাজধানীকে ঘিরে ছিল ৫৭০টি দুর্গ-মিনার এবং শহরে প্রবেশ করতে হলে অতিক্রম করতে হোত ষাটটিরও বেশি তোরণদ্বার।

শহরের ঘরবাড়ি তৈরির প্রধান উপাদান অবশ্য তখনও পর্যন্ত কাঠই ছিল। খুবই কালেভদ্রে এ-কাজে পাথর ব্যবহৃত হোত। এমন কি খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে অশোকের রাজপ্রাসাদও তৈরি হয়েছিল কাঠ দিয়ে। কাঠকে তখন এমন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পোক্ত করে তোলা হোত যাতে বহু শতাব্দীতেও তা ক্ষয় পেত না। অশোকের রাজত্বের ছয় শতাব্দী পরে চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন যখন পাটলিপুত্রে আসেন তখন তিনি ওই প্রাসাদের চমৎকারিত্বে অভিভূত হন এবং লেখেন যে প্রাসাদটি নিশ্চয়ই দেবতাদের তৈরি, মানুষের হাতে-গড়া নয়। এমন কি এই শতাব্দীর সূচনায় যে-

সমস্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে প্রথম অনুসন্ধানকার্য শুরু করেন, তাঁরাও প্রাসাদটিতে কাঠের ভিত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার কলাকৌশল এবং গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি লক্ষ্য করে গভীর বিস্ময় বোধ করেন।

কারুশিল্পও ওই সময়ে অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, বিশেষ করে তাঁতশিল্প, ধাতুশিল্প ও মণিকারের কাজ। বারাণসী, মথুরা ও উজ্জয়িনীর তাঁতশিল্পীদের বোনা সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট বলে গণ্য হোত তখন। ভারতের সুতীবস্ত্র তখন রপ্তানি হোত পাশ্চাত্যে — বারিগাজা হয়ে। সে-সময়ে গান্ধার বিখ্যাত ছিল পশমি কাপড়ের জন্যে।

অর্থশাস্ত্র বইটিতে যেখানে নানাবিধ ধাতুর কাজ হোত এমন কিছু বিশেষ রাজ-কর্মশালার উল্লেখ আছে। এই কর্মশালাগুলির ওপর রাজকর্মচারিদের কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকত। রাজার নিজস্ব অস্ত্রনির্মাণশালা ছাড়াও ছিলেন অন্যান্য বহু ধাতু-কর্মকার ও তাঁদের কর্মশালা। এই কর্মকাররা নিজ-নিজ কাজ-কারবার চালাতেন এবং খরিদ্দারের ফরমায়েশ তামিল করতেন। প্রতিটি গ্রামেই কুমোর, ছুতোর ও কামারদের লোকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন।

কারুশিল্পীদের নিজস্ব সমবায়-সঙ্ঘ থাকত, সেগুলিকে বলা হোত 'শ্রেণী'। এই শ্রেণীগুলি কিছু-পরিমাণে স্বাধীন ছিল, তাদের নিজস্ব বিধি-বিধানও লিপিবদ্ধ থাকত। যে-কারুশিল্পীরা একটি বিশেষ সঙ্ঘের সদস্য হতেন, সেই সঙ্ঘের নির্দিষ্ট বিধি-বিধান মেনে চলতে হোত তাঁদের। দরকার পড়লে সঙ্ঘও তার সদস্যদেব সমর্থনে দাঁড়াত। রাষ্ট্রের তরফ থেকে চেষ্টা চলত এই সমস্ত সমবায়-সঙ্ঘের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার। সঙ্ঘগুলিকে বলা হোত রাষ্ট্রের কাছে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার এবং শাসন-কর্তৃপক্ষকে আগে না-জানিয়ে দেশের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে সঙ্ঘের কর্মস্থল স্থানান্তরণও নিষিদ্ধ ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য। মুদ্রার আবির্ভাব

বণিকদেরও একই ধরনের নিজস্ব সংগঠন ছিল। কারুশিল্পীদের মতো সেগুলিও ছিল বিশেষ পেশাভিত্তিক। দেশের একেকটি বিশেষ অঞ্চলের বণিককুল সুনির্দিষ্ট একেকটি ধরনের পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা করতেন। মগধের এবং মৌর্য-রাজাদের আমলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আগের চেয়ে আরও বিস্তৃত যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, নতুন-নতুন রাস্তা তৈরি হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীগুলির মধ্যে স্থাপিত হয় বিশেষ ধরনের বাণিজ্যপথ। এই বাণিজ্যপথগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিল উত্তরাভিমুখ ও দক্ষিণাভিমুখ রাজপথ-দুটি। মেগাস্থেনিস এমনই একটি

রাজপথের কথা লিখেছেন যে-রাজপথটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে সুদূর পাটলিপুত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আরও পূর্বদিকে চলে গিয়েছিল।

স্থলপথে বাণিজ্য ছাড়াও নদী ও সমুদ্রপথও বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল তখন। আকর সূত্রগুলি থেকে ভারতীয় বণিকদের এমন কি দীর্ঘ ছ'মাস পর্যন্ত স্থায়ী বিপজ্জনক নানা সমুদ্রযাত্রার কাহিনী জানা যায়। ভারতের উপকূল থেকে জাহাজগুলি তখন পাড়ি জমাত শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ আরবে। নানা ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হোত গ্রীক ও গ্রীকশাসিত দেশগুলিতে। এইসব পণ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকত মশলা, দামি পাথর, হাতির দাঁতের খোদাই-করা শৌখিন বস্তু এবং সেইসঙ্গে দুর্লভ নানাজাতীয় কাঠ।

প্রায় এই একই সময়ে মুদ্রার আবির্ভাব ঘটে এবং মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। প্রথমে ধাতুর টুকরো ব্যবহৃত হতে শুরু হয় মুদ্রা হিসেবে, তারপর ক্রমে-ক্রমে সেই টুকরোগুলো একেকটি সুনির্দিষ্ট আকার পায় এবং সেগুলির ওপর নানা ধরনের প্রতীক-চিহ্ন ও লিপি ইত্যাদি খোদাই করা বা তার ছাপ মারা চলতে থাকে।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে যন্ত্রের সাহায্যে ছাপ-দেয়া মুদ্রা দেখা দেয়। এই মুদ্রাগুলি বেশির ভাগই ছিল তামা কিংবা রুপোর তৈরি। যে-সমস্ত এলাকা তখন আকিমেনিড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেখানে চলন শুরু হয় পারশি সিগ্লোইয়ের, আর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বিনিময়ের একক হয়ে ওঠে গ্রীক টেট্রাড্রাক্মা।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা মৌর্য-যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূস্তর খুঁড়ে যে-সমস্ত ছাপ-দেয়া মুদ্রা পেয়েছেন সেগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুদ্রার ওপর বারে-বারে একই ধরনের কতগুলি প্রতীক-চিহ্নের ছাপ। সম্ভবত এগুলি মৌর্য-রাজাদেরই নিজস্ব প্রতীক-চিহ্ন। লিখিত গ্রন্থ ও উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে এই সমস্ত মুদ্রার বিভিন্ন নামকরণের উল্লেখ আছে। যেমন, 'কার্ষাপণ' (রুপোর ও তামার মুদ্রা), 'কাকনি' (তামার মুদ্রা), 'সুবর্ণ' (স্বর্ণমুদ্রা), ইত্যাদি।

যে-সমস্ত রাজকর্মচারিকে টাঁকশাল থেকে মুদ্রা তৈরির ও মুদ্রা প্রচলন-ব্যবস্থার তদারকি করতে হোত অর্থশাস্ত্রে তাঁদের করণীয় দায়িত্বগুলিও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার ওই পর্যায়েই ঋণদান, সুদ ও বন্ধকী কারবারের ধারণাগুলির সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ছিল।

ভূ-সম্পত্তির মালিকানা

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির মালিকানার আরও প্রসার ঘটে। জমির মালিকানা ও জমি চাষ-আবাদ করার মধ্যে পার্থক্যটি প্রাচীন ভারতীয়রা ভালোই বুঝেছিলেন এবং ভিন্ন-ভিন্ন সংজ্ঞাও দিয়েছিলেন এই

দুটি অবস্থার। মালিকানার ব্যাপারটিকে যুক্ত করেছিলেন তাঁরা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম 'স্ব'এর সঙ্গে এবং তার সঙ্গে ধাতু বা প্রকৃতিযোগে উৎপন্ন অন্যান্য তদ্ধিতান্ত শব্দের সঙ্গে। আর 'ভুজ্' (ভোগ করা অর্থে) ধাতু ও তা থেকে উৎপন্ন 'ভোগ', 'ভুক্তি', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হোত সাময়িক অধিকার বা দখল বোঝাতে। সূত্র এবং শাস্ত্রসমূহে এমন ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যেক্ষেত্রে লোকে যে-কোনো জিনিস কেনার পর কিংবা তা আবিষ্কার বা উদ্ধারের পর সম্পত্তির মালিক হয়েছে। তবে ওই একই সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছে যে একমাত্র আইনগত স্বীকৃতির পর এবং আইনসঙ্গত অধিকার-অর্জনের ভিত্তিতেই কোনো ব্যক্তিবিশেষ আগে-থেকে-ব্যবহৃত জিনিসের মালিক বলে গণ্য হতে পারে। উপরোক্ত এই সমস্ত নিয়মকানুন জমির মালিকানা ও জমি চাষ-আবাদ করা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ছিল। 'মানব-ধর্মশাস্ত্রে' বা 'মনুসংহিতা'য় (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত) আবাদী জমি প্রধান-প্রধান সম্পত্তির অন্যতম বলে গণ্য।

দেশের ভূ-সম্পত্তি তখন বিভক্ত ছিল তিনটি স্তরে — ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজার খাসদখল।

ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির মালিকদের মধ্যেও স্তরভেদ ছিল বিভিন্ন প্রকারের। ধনী ভূস্বামী ছাড়াও ছোট-ছোট টুকরো জমির দরিদ্র মালিকও ছিল অনেক। ধনী মালিকদের কিছু-কিছু ভূ-সম্পত্তি এতই প্রকাণ্ড ছিল যে তা চাষ করার জন্যে কয়েক শো লাঙলের দরকার হোত। এই ধরনের ভূ-সম্পত্তিতে চাষের কাজ চালানো হোত ক্রীতদাস এবং খেতমজুর দিয়ে।

বড়-বড় ভূ-সম্পত্তির আয়তন যেখানে ছিল এক হাজার করীষ (এক করীষ জমি প্রায় এক বিঘার সমান) পর্যন্ত, সেখানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র টুকরো জমিও বড় কম ছিল না। ছোট জমির মালিকরা নিজ-নিজ পরিবারের সাহায্যে চাষ-আবাদ করতেন। সম্পত্তির অধিকার অলঙ্ঘনীয় ও সুরক্ষিত ছিল। অন্যের মালিকানাধীন জমি বে-আইনীভাবে আত্মসাৎ করলে তার শাস্তি ছিল মোটা অর্থদণ্ড এবং এ-ধরনের আইনভঙ্গকারীদের জনসমক্ষে আখ্যা দেয়া হোত চোর বলে। শাস্ত্রের বিধি-অনুযায়ী জমি আত্মসাৎ করার দরুন অর্থদণ্ড চুরির অপরাধে অর্থদণ্ডের সমান ছিল। কোনো ভূস্বামীর নিজস্ব ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ ছিল আইনত নিষিদ্ধ। মনুসংহিতায় লেখা আছে, যে-লোকের নিজস্ব জমি নেই কিন্তু যার শস্যবীজ আছে, সে যদি সেই বীজ অন্যের জমিতে বোনে তাহলেও উৎপন্ন ফসলে তার কোনো অধিকার থাকবে না। একমাত্র জমির মালিকেরই অধিকার আছে তাঁর জমি সম্বন্ধে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার, প্রয়োজন বোধ করলে তিনি নিজের জমি বিক্রি করতে, দান করতে, বন্ধক রাখতে কিংবা ইজারা দিতে পারেন। এর নানা সাক্ষ্য মেলে ভারতীয় পুথিগুলিতে: যেমন এক ব্রাহ্মণের কাহিনী উল্লিখিত আছে যিনি তাঁর জমির একাংশ অন্যকে দান

করে দিচ্ছেন, আবার অন্যত্র বলা হয়েছে যে এক বণিক যুবরাজের কাছ থেকে কিনে নিচ্ছেন একটি ফলের বাগান, ইত্যাদি। অতএব, প্রাচীন ভারতে কোনো ব্যক্তিবিশেষ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না, ডিওডোরাসের এই উক্তি (যা সম্ভবত মেগাস্থেনিসের বিবরণী থেকে সংগৃহীত) স্থানীয় আকর সূত্রগুলির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না এবং ওই সময়কার বাস্তব পরিস্থিতিরও প্রতিফলন মেলে না এ-থেকে।

'নারদ-স্মৃতি'তে (খ্রীস্টীয় তৃতীয় আর চতুর্থ শতাব্দীর) একটি বিধান লিপিবদ্ধ আছে যাতে বলা হয়েছে যে স্বয়ং রাজারও অধিকার নেই ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিকে লঙ্ঘন করার, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব বাড়ি বা জমির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার। তবে রাজশক্তি সর্বদাই সম্পত্তির মালিকদের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করে থাকে। বস্তুত রাজা ব্যক্তিগত মালিকানার জমির ওপর কর ধার্য করতেন এবং স্বভাবতই জমির অবস্থার ওপর সতর্ক নজর রাখতেন তিনি। যদি কোনো জমির মালিক বীজ বোনার কিংবা ফসল কাটার সময় জমির দিকে নজর না-দিয়ে তা ফেলে রাখতেন, তাহলে রাজা সেই ভূস্বামীর কাছ থেকে অর্থদণ্ড আদায় করতে পারতেন। যে-সমস্ত ভূস্বামী রাজস্ব দেয়া বন্ধ করতেন রাষ্ট্রের তরফ থেকে তাঁদের ওপরও জরিমানা ধার্য হোত। এ-সবই অবশ্য গ্রাহ্য ছিল রাজ্যশাসনের কর্তব্যের আবশ্যিক অংশ হিসেবে। তবে, সবকিছু সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের অধিকার ছিল না ব্যক্তিগত মালিকদের কাছ থেকে জমি বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার। 'বৃহস্পতি-স্মৃতি'তে (খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর) এ-ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে রাজা যদি ব্যক্তি-মালিকানাধীন জমি এক ভূস্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তা অন্যকে দান করেন, তবে তিনি আইনবিরুদ্ধ কাজ করবেন। তবে জমি কেনাবেচার কাজটি আইনসম্মতভাবে হচ্ছে কিনা রাষ্ট্রকে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে, আর তা না-হলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড জারি করা চলবে।

রাষ্ট্রের মতো গ্রামীণ সমাজও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সীমাবদ্ধ রাখবার প্রয়াস পেত, বিশেষ করে সমাজ নজর রাখত তার সদস্য নয় এমন সব লোকের কাছে জমি বিক্রির ব্যাপারে। জমি বিক্রির সময় বিক্রেতার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের অগ্র-ক্রয়াধিকার দেয়া হোত। বিভিন্ন গ্রামের সীমানা ও বিশেষ জমির অবস্থান নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তখনও সর্বোপরি এই গ্রামীণ সমাজগুলির মতামত বিবেচনার মধ্যে ধরা হোত। সমাজ তার সদস্যদের মধ্যে ভূস্বামীদের অধিকারও রক্ষা করে চলত। এছাড়া সমাজ স্বয়ং দায়ী থাকত যৌথ মালিকানাধীন জমি-জায়গার জন্যে: যেমন, চারণভূমি, ঘরবাড়ি এবং যৌথ জমির ওপর দিয়ে প্রসারিত রাস্তা, ইত্যাদির জন্যে।

দেশের মোট জমি-জায়গার একটা অংশ ছিল রাষ্ট্রীয় জমি ও রাজার নিজস্ব বা খাস-দখলভুক্ত জমি। রাষ্ট্রীয় জমি বলতে বোঝাত জঙ্গলজোত, খনি ও পতিত

জমি। রাজার দখলভুক্ত মোট ভূখণ্ড (বা 'স্বভূমি')-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাঁর খাসদখলী আবাদ (বা 'সীতা')। বিশেষভাবে নিযুক্ত পরিদর্শকেরা এই খাসদখলী আবাদের চাষবাসের কাজ তদারক করতেন। এছাড়া বিভিন্ন গ্রামেও ছোট-ছোট জমিতে রাজার মালিকানা রাখার অধিকার ছিল। এই সমস্ত ছোট জমির যেমন-খুশি বিলি-বন্দোবস্ত করতে পারতেন রাজা। ইচ্ছে করলে তিনি জমি দান ও বিক্রি করতে কিংবা ইজারা দিতে পারতেন। চাইলে তিনি খাসদখলী আবাদ-জমিরও অনুরূপ বিলি-বন্দোবস্ত করার অধিকারী ছিলেন। খাসদখলী আবাদগুলিতে জমি চাষের কাজ করতেন ক্রীতদাস ও খেতমজুররা এবং নানা স্তরের ভাড়াটিয়া কৃষক-প্রজারা। এই শেষোক্তদের কিছু-কিছু বিনিময়ে পেতেন উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ, তবে বাকিরা ফসলের এক-চতুর্থাংশের বেশি পেতেন না। এছাড়া রাষ্ট্রীয় জমিতেও ভাড়াটিয়া প্রজা বসানো হোত, তাঁদের জমি দেয়া হোত সাময়িকভাবে চাষ-আবাদের জন্যে। রাষ্ট্রীয় জমির কৃষক-প্রজাদের অবস্থা রাজার খাসদখলী আবাদের অনুরূপ প্রজাদের চেয়ে ভালো ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ গণ্য হোত রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে, খনির মালিকানার ওপরও থাকত রাষ্ট্রের একাধিপত্য। এই প্রাচীন যুগের আকর সূত্রগুলিতে (বিশেষ করে অর্থশাস্ত্রে) রাজস্বের প্রকৃতি অনুযায়ী দু'ধরনের জমির মধ্যে স্পষ্ট একটা পার্থক্য টানা হয়েছে: রাজার নিজস্ব জমি থেকে যে-রাজস্ব আদায় করা হোত তাকেও বলা হোত সীতা, আর অন্যান্য ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি থেকে যে-কর আদায় করা হোত তাকে বলা হোত ভাগ।

মেগাস্থেনিস এই পার্থক্যটি ঠিক বোঝেন নি, তাই তিনি লিখেছেন যে ভারতে সকল ভূ-সম্পত্তিই ছিল রাজার অধিকারভুক্ত। স্পষ্টতই বোঝা যায় রাষ্ট্রদূত মেগাস্থেনিস রাজধানীতে বাস করায় রাজার খাসদখলী আবাদের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন, আর তাই ভ্রমবশত ওই খাসদখলের শাসন-ব্যবস্থাকেই গোটা ভারতের জমির ওপর কায়েম সাধারণ শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেছিলেন।

আগেই বলেছি, রাজা দেশের সমস্ত আবাদী জমির মালিক ছিলেন না। প্রাচীন ভারতীয় পুথি, উৎকীর্ণ লিপি, ইত্যাদিতে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে রাজা রাজস্ব আদায় করতেন দেশের একমাত্র ভূস্বামী হিসেবে নয়, রাজ্যের সর্বসাধারণের রক্ষাকর্তা রাষ্ট্রের সার্বভৌম প্রধান হিসেবে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, মানব-ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে রাজা যদি প্রজাবর্গের জীবনরক্ষায় মনোযোগী না-হয়ে শুধুই রাজস্ব সংগ্রহে মন দেন, তাহলে অনতিবিলম্বে তাঁর গতি হবে নরকে। একটি প্রাচীন মহাকাব্যেও এই ধরনের রাজা সম্বন্ধে উক্তি করা হয়েছে যে তিনি 'শস্যের ষড়্‌ভাগের অপহর্তা'।

সমাজ-সম্পর্কের জটিল চিত্র এবং বিভিন্ন ধরনের জমির মালিকানা সম্বন্ধে লিখিত সূত্রগুলিতে উল্লিখিত তথ্যাদি দেখে বোঝা যায় কেন প্রাচীন ভারতের জমির

মালিকানার প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পণ্ডিতেরা নানা ধরনের পূর্বানুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। কিছু-কিছু ইতিহাসবেত্তা মনে করেছেন যে প্রাচীন ভারতে জমিতে কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, রাজাই ছিলেন গোটা রাজ্যের একমাত্র ও পরম ভূস্বামী, অথবা ভেবেছেন যে গোটা দেশে একমাত্র সামাজিক বা যৌথ মালিকানারই চল ছিল। অথচ আকর সূত্রগুলি কিন্তু ইঙ্গিত দিচ্ছে যে প্রাচীন ভারতে সত্যিই নানা ধরনের জমির মালিকানা প্রচলিত ছিল, আবার কখনও-কখনও জমি ছিল কয়েকজন অংশীদার-মালিকের, বলতে গেলে, যৌথ সম্পত্তিই। তদুপরি, জমির মালিকানার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় এই প্রশ্নটির দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট উত্তর আশা করাটাও বোধহয় সমীচীন হবে না. কারণ মনে রাখতে হবে যে আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে মৌর্য-সাম্রাজ্যের মতো বিশাল এক ভূখণ্ডের ভূমি-ব্যবস্থা নিয়ে।

গঙ্গা-উপত্যকায় ও মগধে — রাজার ক্ষমতা যেখানে ছিল বিশেষরকম প্রবল — সেখানে যৌথ সামাজিক ভূ-সম্পত্তির চেয়ে রাজার খাসদখলী আবাদ ও বড়-বড় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূসম্পত্তির ভূমিকা ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তেমনই যৌথ সামাজিক মালিকানার ঐতিহ্য ছিল প্রবলতর।

প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ সমাজ

মগধ ও মৌর্য-যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক ছিল গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা। জনসংখ্যার বেশ একটি উল্লেখ্য অংশ ছিল এর অন্তর্ভুক্ত: এঁরা হলেন গ্রামীণ সমাজের মুক্ত বা অ-দাস সদস্য, অর্থাৎ কৃষিজীবীরা। দুঃখের বিষয় এই গ্রামীণ সমাজের চরিত্র, এর কাঠামো ও এর অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়গুলির সমাবেশ সম্বন্ধীয় সংশ্লিষ্ট আকর উল্লেখগুলির সংখ্যা যদিও যথেষ্ট নয়, তবু যতটুকু যা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে ওই যুগে সবচেয়ে ব্যাপক ধরনের যে-সমাজের অস্তিত্ব ছিল তা হল এই গ্রামীণ সমাজ। অবশ্য সাম্রাজ্যের পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিতে তখনও পর্যন্ত গোষ্ঠীভিত্তিক আদিম ধরনের গ্রামীণ সমাজেরও অস্তিত্ব রয়ে গিয়েছিল। আকর সূত্রগুলিতে এই গ্রামীণ সমাজকে উল্লেখ করা হয়েছে 'গ্রাম' বলে। তবে এই শব্দটির তৎকালীন তাৎপর্য ছিল বহুব্যাপক। কখনও-কখনও কোনো-কোনো গ্রামের বাসিন্দা তিরিশটি পরিবার বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এই বাসিন্দার সংখ্যা প্রায়শই ঊর্ধ্বপক্ষে এক হাজার হওয়া বিচিত্র ছিল না। প্রতিটি গ্রামীণ সমাজ বা গ্রামের সীমানা ছিল সুনির্দিষ্ট। গ্রামের আবাদী জমি বিভক্ত ছিল ছোট-ছোট টুকরো জমিতে, আর সেই সব জমির মালিক ছিলেন গ্রামীণ সমাজের অ-দাস সদস্য বা কৃষকরা। গ্রামীণ সমাজের সীমানার অন্তর্ভুক্ত টুকরো জমির মালিকরা

রাজাকে খাজনা দেয়া ছাড়াও স্পষ্টতই যৌথ মালিকানাধীন জমি বাবদেও যৌথ খাজনা গ্রামের ওপর ধার্য করা হোত।

সম্পত্তির মালিকানাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস ততদিনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। গ্রামীণ সমাজের সেইসব সদস্য যাঁরা নিজ-নিজ জমি চাষ করতেন তাঁরা ছাড়াও জমিতে চাষের জন্যে ক্রীতদাস কিংবা ঠিকা-মজুর নিযুক্ত করত গ্রামীণ সমাজের এমন এক অভিজাত সম্প্রদায়ও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া গ্রামীণ সমাজের অপর কিছু সদস্য দারিদ্র্যের কবলে পড়ে জমি ও চাষের সাজসরঞ্জাম হারিয়ে ঠিকা প্রজা হিসেবে অন্যের জমি চাষ করতেও বাধ্য হচ্ছেন তখন। গ্রামীণ সমাজের সর্বনিম্ন স্তর ছিল শোষিত মানুষজনকে নিয়ে গঠিত। এইসব মানুষ উৎপাদনের কোনো উপায়েরই মালিক ছিল না। গ্রাম্য কারুশিল্পীরাও ছিলেন কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। তাঁদের মধ্যে কিছু-কিছু নিজস্ব কর্মশালায় স্বাধীনভাবে কাজ করতেন, আবার অন্যেরা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতেন অন্য কারিগরের কাছে। একই গ্রামীণ সমাজের মধ্যে কারুশিল্প ও জমির চাষ-আবাদের সমন্বয়ের ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে পণ্য ও সেবা-বিনিময় প্রথা গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের এটি ছিল এক বৈশিষ্ট্য। আংশিকভাবে এটি ওই সমাজের আত্মকেন্দ্রিক, পিতৃশাসিত চরিত্র গড়ে ওঠারও কারণ।

ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ এখনও পর্যন্ত প্রাচীন কালের সম্মিলিত ঐতিহ্য সহ দৃঢ়বদ্ধ এক যৌথ-জীবনের কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে। বৌদ্ধ পুথিগুলিতে উল্লেখ আছে গ্রামের রাস্তা-পরিষ্কার ও জলাশয় খননে যৌথ শ্রমদানের কথার। গ্রামীণ সমাজের মুক্ত সদস্যরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহ তাঁদের সকল উৎসবই মিলিতভাবে উদ্‌যাপন করতেন। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে কেউ যদি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করেন তাহলে অর্থদণ্ড দিতে হবে তাঁকে। সম্মিলিতভাবে এই গ্রামীণ সমাজ অন্যান্য গ্রামীণ সমাজগুলির সঙ্গে কিংবা দেশের রাজার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারত। মুক্ত গ্রামবাসীদের অধিকারসমূহও রক্ষা করত গ্রামীণ সমাজ। '(রাষ্ট্রের মতো) গ্রামীণ সমাজ যেমন একদিকে ছিল এই সমস্ত মুক্ত ও সমস্তরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের পরস্পর-সম্পর্কের প্রতিরূপ, বহির্জগতের বিরুদ্ধে তাঁদের জোটস্বরূপ, তেমনই সেইসঙ্গে ছিল তা তাঁদের নিরাপত্তার সূচক।'*

নিজস্ব অভ্যন্তরীণ পরিচালনার ব্যাপারে কিছু পরিমাণে এই গ্রামীণ সমাজ ছিল স্বাধীন। সমাজের মুক্ত সদস্যরা শাসন-সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধানকল্পে প্রায়ই

* K. Marx, *Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, 1857-1858,* Moskau, 1939, S. 379.

একত্রিত হতেন, তবে গ্রামগুলির প্রধানরা তখনই ক্রমশ বেশি-বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেছিলেন। গোড়ার দিকে গ্রামীণ সমাজের এই প্রধান নির্বাচিত হতেন সমাজের সকল সদস্যের এক সভা থেকে, তারপর রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা তা অনুমোদন করতেন। এইভাবে গ্রাম-প্রধান হয়ে দাঁড়াতেন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। গ্রামীণ সমাজের একমাত্র মুক্ত সদস্যদেরই এই ভোটদানের অধিকার ছিল, অন্যদিকে ক্রীতদাস, গৃহভৃত্য ও দিনমজুররা সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রামীণ সমাজগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল, এগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বনির্ভর সব প্রতিষ্ঠান, তবে ক্রমশ এগুলি আগের চেয়ে কম স্বনির্ভর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

দাসপ্রথা ও তার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ

বৈদিক যুগে ক্রীতদাস-প্রথার সূচনা ও তার ধীর বিকাশের তুলনায় মগধ ও মৌর্য-যুগে প্রথাটি অনেক দ্রুত বিকশিত হয়ে ওঠে। যদিও ওই সময়কার আকর সূত্রসমূহে ক্রীতদাস ও দাস-শ্রমের নিয়োগ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, তবু প্রাচীন ভারতে দাস-মালিকানার ও সমাজ-কাঠামোর মধ্যে দাসপ্রথার ভূমিকা সম্বন্ধে সাধারণ একটি চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়। দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার এই ব্যাপারটির দিকে না পশ্চিম ইউরোপীয় না ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ কেউই যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। তবে সম্প্রতি এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কেননা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে বিশেষ ধরনের কিছু-কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (এক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান গবেষণা চালিয়েছেন সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিৎরা, বিশেষ করে গ. ফ. ইলিন)।

এমন কি প্রাচীন ভারতেতিহাসের এই সুনির্দিষ্ট যুগটিতে (অর্থাৎ, খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে) দাসপ্রথার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার সময়েও একথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে বিশালায়তন মগধ ও মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সমাজ-সম্পর্কের বিকাশের স্তর ছিল ভিন্ন-ভিন্ন, সামাজিক রীতি-প্রথা ও সংগঠনাদির জটিল জোড়াতালির জাল বিস্তৃত ছিল সাম্রাজ্য জুড়ে, অগ্রগতির হারও ছিল অসমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশির ভাগ আকর সূত্রে কেবলমাত্র গঙ্গা-উপত্যকা ও তার সংলগ্ন ভূখণ্ডগুলিতেই দাসপ্রথা ও ক্রীতদাসদের নিয়োগ-সম্পর্কিত খুঁটিনাটির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে যে-সব সিদ্ধান্তে পেঁছিনো যায় তা প্রধানত প্রযোজ্য মগধ ও অপর কিছু-কিছু অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলের ক্ষেত্রেই।

গোড়ার যুগের বৌদ্ধ পুঁথিগুলিতে ও অপর কিছু-কিছু গ্রন্থে ক্রীতদাসদের আখ্যা দেয়া হয়েছে সমাজের অপরাপর মানুষের ওপর নির্ভরশীল মানুষ হিসেবে।

ক্রীতদাসদের তখন দেখা হোত ব্যক্তি নয় বস্তু হিসেবে, কিংবা গৃহপালিত প্রাণীদেরই একটা রকমফের হিসেবে। গোড়ার দিককার মহাকাব্যগুলিতে ক্রীতদাসে পরিণত মানুষকে গোরু, ছাগল, ভেড়া কিংবা ঘোড়ার সঙ্গে এক নিশ্বাসে বলা হয়েছে খামারপালিত জন্তু। ধর্মসূত্রগুলিতে মৃতব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে ক্রীতদাসদেরও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করা আছে। গৃহপালিত জীবজন্তু ও মূল্যবান ধাতু, ইত্যাদির মতো ক্রীতদাসদেরও তখন বণ্টন করে দেয়া হোত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে।

জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ ছিল দাস-মালিক। রাজসভায়, ধনী নাগরিকদের গৃহে এবং গ্রামীণ সমাজে সর্বত্রই নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন এই ক্রীতদাসেরা। নিজের ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে ক্রীতদাসের কোনো বক্তব্য থাকা সম্ভব ছিল না; ইচ্ছেমতো দান ও বিক্রি করা যেত ক্রীতদাসকে, পাশা খেলায় তাঁকে বাজি রাখা ও খেলায় হেরে গেলে তাঁকে অনায়াসে অন্যের মালিকানাধীন করে দেয়া চলত। লিখিত বৌদ্ধ সূত্রগুলিতে প্রায়ই ক্রীতদাসদের তৎকালীন চলতি বাজার-দরের উল্লেখ পাই আমরা, এই বাজার-দর বিশেষ-বিশেষ ক্রীতদাসের স্বাস্থ্য ও কাজকর্মে যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিছু-কিছু পুথিতে আবার ক্রীতদাসদের চতুষ্পদ প্রাণীদের থেকে পৃথক করে দেখানোর জন্যে তাঁদের দ্বিপদ প্রাণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোটেই তখন সহজ ছিল না ক্রীতদাসের জীবন। বৌদ্ধ পুথিগুলিতে বলা হয়েছে কীভাবে সর্বদা শাস্তির ভয় দেখিয়ে ক্রীতদাসদের দিয়ে কাজ করানো হোত, লৌহ অঙ্কুশ দিয়ে, এমন কি কিছু-কিছু দাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেও, চালনা করা হোত তাঁদের। আর খাদ্য বলতে প্রায়ই তাঁদের কপালে যা জুটত তা পাতলা একটা লপ্‌সি ছাড়া কিছু নয়।

ক্রীতদাস সংগ্রহের পদ্ধতি অনুসারে তাঁদের ভাগ করা হোত বিভিন্ন স্তরে। এ-পর্যন্ত প্রথম এরকম যে-স্তরবিন্যাসটি পাওয়া গেছে তাতে তিন ধরনের ক্রীতদাস তালিকাভুক্ত হয়েছেন: গৃহদাসদের সন্তানসন্ততি, যাঁদের কেনা হয়েছে এবং যাঁদের আনা হয়েছে অন্যান্য দেশ থেকে (স্পষ্টতই এ'রা হলেন যুদ্ধবন্দী)। অতঃপর নতুন-নতুন ক্রীতদাসকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে এই তালিকার কলেবর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রীতদাসদের মুক্তি দেয়ার বিধিবিধানও ক্রমশ গড়ে ওঠে। যদিও কোনো ক্রীতদাসকে মুক্তি দেয়া হবে কিনা তা ছিল দাস-মালিকের ইচ্ছাধীন, তবু বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ পরিমাণ মুক্তিপণ দিতে পারলে ক্রীতদাসেরা (বিশেষ করে অস্থায়ী দাসেরা) স্বাধীনতা ক্রয় করতে পারতেন।

অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির রচয়িতা কৌটিল্য ক্রীতদাস-প্রথার ব্যাপারটি নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন। সারা জীবনব্যাপী ক্রীতদাস এবং অস্থায়ী বা সাময়িক ক্রীতদাসদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তিনি এবং নানা ধরনের ঘটনার উল্লেখ করে

দেখিয়েছেন স্বাধীন আর্যদের দাসদশায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায় কীভাবে। অর্থশাস্ত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, দাস-মালিক নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণ পাবার পরও অস্থায়ী ক্রীতদাসকে মুক্তি না দিলে তাঁকে এমন কি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করারও বিধি ছিল। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা অস্থায়ী ক্রীতদাসদের সন্তানসন্ততিকে ক্রীতদাস বলে গণ্য করেন নি। এটি কিন্তু এর পূর্ববর্তী পুথিগুলিতে লিপিবদ্ধ বিধানের চেয়ে পৃথক, কারণ সে-সব পুথিতে বলা হয়েছে যে-কোনো ক্রীতদাসীর সন্তানেরা আপনা থেকেই ক্রীতদাসের শ্রেণীভুক্ত হবে। উচ্চতর বর্ণের যে-সমস্ত মানুষ ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে ক্রীতদাসে পরিণত হতেন তাঁদের স্বার্থের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কৌটিল্য। অস্থায়ী দাসদের নীচ কাজে নিযুক্ত করার অনুমতি দেন নি তিনি। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ক্রীতদাসের নিজস্ব সম্পত্তি রাখার অধিকার আছে। কিন্তু পরবর্তী শাস্ত্রগুলির বিধান অনুযায়ী ক্রীতদাসের-যে কেবল নিজস্ব সম্পত্তি রাখাই নিষিদ্ধ ছিল তা নয়, তাঁর অর্জিত যথাসর্বস্ব প্রভুর হাতে তুলে দিতে পর্যন্ত বাধ্য ছিলেন তিনি।

অর্থশাস্ত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্রীতদাসদের পদমর্যাদা নিরূপণের ব্যাপারে কিছুটা শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের প্রয়াস এবং সে-সময়ে এই গোটা ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করায় এক্ষেত্রে কিছু-পরিমাণে যথাযথ ব্যবস্থাদি অবলম্বনের চেষ্টা।

সমাজের সমগ্র কাঠামোর মধ্যে ক্রীতদাসদের সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি ছিল তখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল ক্ষেত্রগুলিতে, দাস-শ্রমের বিশেষ ভূমিকাটি।

আকর সূত্রগুলি থেকে জানা যায় যে কৃষিকাজে তখন দাস-শ্রম ব্যবহৃত হোত। ক্রীতদাসদের তখন কাজে লাগানো হোত রাজকীয় খাসমহলগুলিতেও। অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এই খাসমহলগুলিতে বীজ বোনার কাজটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকত ক্রীতদাস কিংবা ঠিকা-মজুর এবং অর্থদণ্ডের টাকা 'গতরে খেটে উশুল করার জন্যে' নিযুক্ত লোকজনের জন্যে। এছাড়া ব্যক্তি-মালিকানাধীন বড়-বড় খামারের কাজের জন্যেও ক্রীতদাসদের নিযুক্ত করা হোত। এইসব খামারে জমিতে লাঙল দেয়া, বীজ বোনা ও ফসল কেটে ঘরে তোলার গোটা কাজটাই করতেন ক্রীতদাসেরা। জাতক-গ্রন্থগুলিতে সেইসব ক্রীতদাসের উল্লেখ আছে যাঁরা ঠিকা-মজুরদের সঙ্গে একত্রে গাছ কেটে বীজ বোনার জন্যে জমি-জায়গা সাফ করতেন। ছোট-ছোট জমির মালিকরাও কখনও-কখনও দাস-মালিক হতেন, তবে তাঁদের অধীন ক্রীতদাসের সংখ্যা অবশ্যই খুব বেশি হোত না। জাতক-গ্রন্থগুলিতে ঘনঘনই এমন সব পরিবারের উল্লেখ আছে যাদের একজন করে ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসী ছিল। ক্রীতদাসরা বৌদ্ধ

সম্প্রদায়ের সদস্যভুক্ত হতে পারতেন না, তবে সঙ্ঘের তরফ থেকে যে-সমস্ত শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ করা হোত তাঁদের পদমর্যাদা ছিল কার্যত ক্রীতদাসদেরই সমতুল্য। এই শ্রমিক-কর্মীরা মঠের অধীন ভূ-সম্পত্তিতে কাজ করতেন কিংবা নিযুক্ত হতেন অন্য নানা কাজে। কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও দাস-শ্রম নিয়োগের কথা জানা যায়, তবে এ-সম্পর্কিত উল্লেখ পাওয়া যায় খুবই কম।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথার যে-বিশিষ্ট লক্ষণগুলি দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে প্রমাণ হয় যে প্রথমত ও প্রধানত এই প্রথাটি ছিল অপরিণত রূপে ও পিতৃশাসিত চরিত্র নিয়ে বর্তমান। দাস-শ্রম মুক্ত ঠিকা-মজুরদের শ্রমের থেকে বড়-একটা আলাদা প্রকৃতির ছিল না। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, বহু আকর সূত্রেই দাস-শ্রমের উল্লেখপ্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে যে এই শ্রম ঠিকা-মজুরদের শ্রমের সমগোত্রীয়। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটিতে এমন কি ক্রীতদাস ও 'কর্মকার'দের (ঠিকা-মজুরদের) পদমর্যাদাকে একই স্তরভুক্ত পর্যন্ত করে দেখানো হয়েছে।

ভারতীয় দাসপ্রথার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল গৃহকর্মে ব্যাপকভাবে দাস-শ্রমের ব্যবহার। প্রাচীন ভারতীয়দের জীবনযাত্রায় এই ধরনের শ্রমের ব্যবহার বড় একটা জায়গা জুড়ে ছিল। লিখিত আকর সূত্রগুলিতে প্রায়ই গৃহের পরিচারক এই দাসদের বিশেষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, 'ঘরদাস', 'গৃহদাস', 'গেহদাস' বা 'দাসী', ইত্যাদি। বাড়িতে দাস-শ্রমকে কাজে লাগানোর ফলে প্রভু এবং দাসের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা পিতাপুত্র-জাতীয় আত্মীয়-সম্পর্কের ছোঁয়াচ লেগেছিল তখন, এবং এমন একটা ধারণার উদ্ভব হয়েছিল যেন সমগ্রভাবে দাসপ্রথাটা অত্যন্ত কোমল আর সহনীয় একটা ব্যাপার। সম্ভবত এরই ফলে মেগাস্থেনিস এই ভ্রান্ত উক্তি করেছিলেন যে 'সকল ভারতীয়ই সে-যুগে ছিল স্বাধীন এবং ক্রীতদাস বলতে কেউ ছিল না'।

সমগ্রভাবে বিচার করলে বলতে হয় যে যদিও প্রাচীন ভারতীয় পটভূমিতে দাসপ্রথার কতগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (যেমন, পিতৃশাসিত সমাজ-সম্পর্কের উপরি-প্রলেপ, দাস-শ্রমের সঙ্গে মুক্ত কৃষকের শ্রমের নিকট-সান্নিধ্য, অনুন্নত অর্থনৈতিক ধরনধারণের অস্তিত্ব) বর্তমান ছিল, তবু মগধ ও মৌর্য-যুগে সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। দেশের মধ্যে সে-সময়ে সবচেয়ে উন্নত অঞ্চল মগধে ছিল প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড রাজকীয় খাসমহল এবং বহুসংখ্যক বড়-বড় ব্যক্তি-মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি, আর তাই সেখানকার জটিল সমাজ-কাঠামোয় দাস-মালিকানাভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠন ছিল স্পষ্টতই প্রধান।

যদিও সেখানকার উৎপাদনের প্রধান-প্রধান ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের মুক্ত সদস্য, ভাড়াটে চাষীপ্রজা ও ঠিকা-মজুরদের শ্রম প্রধান এক ভূমিকা পালন করত, তবু আদিম সমাজের তুলনায় দাসপ্রথা ছিল সেখানে এক প্রগতিশীল ঘটনা এবং তা সমগ্রভাবে সমাজের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। দাসপ্রথা অবশ্য তখন

শোষণের একমাত্র উপায় ছিল না, তবু তা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক উপায়। আমরা যে-যুগের কথা আলোচনা করছি সে-যুগে এই দাসপ্রথা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল।

কর্মকারবৃন্দ

মগধের এবং মৌর্য-রাজাদের আমলে ঠিকা-মজুরের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। এইসব মজুর বা কর্মকারকে দেখা যেত উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—কৃষিকাজে (রাজকীয় ও ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তিতে এবং গ্রামীণ সমাজের যৌথ জমিতে), কারুশিল্পীদের কর্মশালায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে। যখন জমিতে বীজ বোনা কিংবা ফসল কাটার সময় আসত, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে যখন কাজের লোক দুর্লভ হয়ে উঠত, তখন খেতখামারে এই কর্মকারদের সংখ্যা যেত বেড়ে। গ্রামে এবং শহরে সর্বত্রই কাজ করতেন কর্মকারেরা। সাধারণভাবে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ থাকত না এঁদের এবং বাঁধা বেতনে কিংবা পেটখোরাকির বদলে ঠিকা-মজুর হিসেবে এঁরা কাজ করতেন।

কর্মকারেরা রাজার খাসমহলে এবং ধনী কৃষকের ব্যক্তিগত খামারে কাজ করতেন, জমিতে লাঙল দিতেন এবং গৃহপালিত পশুর তদারকির কাজ করতেন। গ্রামীণ সমাজগুলিরও প্রয়োজন ঘটত ঠিকা-মজুরদের সাহায্য নেয়ার। মজুররা কাজ করতেন আবাদে, জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতেন কিংবা গোরু-ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত জীবজন্তু চরাতেন। যে-সমস্ত কর্মকার রাজার খাসমহলগুলিতে কাজ করতেন বিশেষভাবে নিযুক্ত এক তত্ত্বাবধায়ক তাঁদের কৃষির যন্ত্রপাতি ও লাঙল টানার বলদ, ইত্যাদির যোগান দিতেন।

ঠিকা-মজুরদের অবস্থা এমনিতে ছিল খুবই সঙ্গিন, তবে যাঁরা রাজার খাসমহলগুলিতে কাজ করতেন তাঁদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো। অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত সাক্ষ্য অনুযায়ী বলতে হয় যে-সমস্ত কর্মকার জমি চাষ-আবাদ করতেন তাঁরা মজুরি হিসেবে পেতেন ফসলের এক-দশমাংশ, আর যাঁরা গোরু-ছাগল চরাতেন তাঁরা গোরুর দুধ ও তা থেকে তৈরি মাখনের এক-দশমাংশ পরিমাণ পেতেন। যদিও অর্থশাস্ত্রে কর্মকারদের কাজ সমাধা করা সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী বেঁধে দেয়া হয়েছিল, তবু কার্যত সবকিছু নির্ভর করত বিশেষ-বিশেষ নিয়োগকর্তা বা মালিকের মর্জির ওপর। কর্মকারেরা যে-খাবার খেতে পেতেন ক্রীতদাসদের খাবারের চেয়ে তা বিশেষ পৃথক ছিল না। তাঁদের কঠিন জীবনযাত্রা প্রায়ই তাঁদের বাধ্য করত বলতে গেলে যে-কোনো শর্তেই ঠিকা কাজের জন্যে রাজি হয়ে যেতে। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে জমির মালিকরা ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার পর

কীভাবে গ্রামীণ খেতমজুররা মাঠ থেকে ঝড়তিপড়তি ফসলের দানা সংগ্রহ করতেন।

সমাজে চতুর্বর্ণের ছকের মধ্যে ঠিকা-মজুররা সাধারণত স্থান পেতেন শূদ্রদের মধ্যে। তবে এটাও সম্ভব যে তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুক্ত গ্রামীণ কৃষক ও কারুশিল্পীদের দলভুক্তও ছিলেন, আর এই কৃষক ও কারুশিল্পীরা সে-সময়ে দরিদ্র বনে গেলেও তাঁরা আসলে ছিলেন বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক বিভাগ ও দ-প্রথা

মগধ এবং মৌর্য-যুগগুলিতে বর্ণ ও জাতিভেদ-প্রথার শুধু-যে উদ্ভব ঘটেছিল তা-ই নয়, সমাজ-কাঠামোর মধ্যে তা এক প্রধান ব্যাপার হয়েও দাঁড়িয়েছিল। সমাজে বর্ণভিত্তিক বিভাগের অস্তিত্ব ছিল তখন মৌল শ্রেণীগত বিভাগের পাশাপাশিই।

বৌদ্ধ ধর্মবিধির অংশবিশেষ 'মজ্‌ঝিম-নিকায়' গ্রন্থে ভারতকে তুলনা করা হয়েছে তার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে—যে-সব অঞ্চলে গ্রীকরা বসবাস করতেন এবং কাম্বোজদের বসতি-অঞ্চল আরাকোসীয় ভূখণ্ডও ছিল এই বিচারের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে যে শেষোক্ত ওই সমস্ত দেশে সমাজ বিভক্ত ছিল শুধুমাত্র মুক্ত অধিবাসী ও ক্রীতদাসদের মধ্যে, কিন্তু ভারতীয় সমাজে এর সঙ্গে ছিল চতুর্বর্ণ-ভেদও।

আকর সূত্রগুলিতে পাওয়া বহুতর তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে সমাজে কোনো মুক্ত ভারতীয়ের স্থান অনেকখানি পরিমাণেই নির্ধারিত হোত তখন সেই মানুষটি কোন বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তা-ই দিয়ে। তবে ওই সময়ে জন্মকৌলীন্যের চেয়ে বিষয়সম্পত্তি ও অর্থের মর্যাদা ক্রমশই বেশি-বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে চলেছিল। তখনই বলা হোত যে ঐশ্বর্য মানুষকে এনে দেয় খ্যাতি ও মর্যাদা।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের পুথিগুলিতে বর্ণ-বিভাগ ব্যবস্থার সামগ্রিক ছকটি ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে: ব্রাহ্মণদের পুথিগুলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন ব্রাহ্মণরা, ক্ষত্রিয়রা স্থান পেয়েছেন তার পরে, আর বৌদ্ধ পুথিগুলিতে ব্রাহ্মণরা পেয়েছেন দ্বিতীয় স্থান ক্ষত্রিয়দের পরে। অবশ্য এটাও সম্ভব যে বৌদ্ধ পুথিগুলিতে বর্ণ-বিভাগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বৌদ্ধদের দৃষ্টিভঙ্গিই শুধু নয়, সামাজিক বিভাগের গোটা ছকের মধ্যে ওই সময়ে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছিল প্রতিফলিত হয়েছে তা-ও।

মৌর্য-রাজাদের আমলে চতুর্বর্ণ-প্রথা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক এক বিবরণ পাওয়া যায় মেগাস্থেনিসের রচনায়। মেগাস্থেনিস নিজে এই সামাজিক প্রথা ও বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্কের ব্যাপারটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ভারতের গোটা জনসমষ্টিকে দেখিয়েছেন সাতটি

অংশে ভাগ করে: যথা, দার্শনিক পণ্ডিত, কৃষক, রাখাল ও শিকারী, কারুশিল্পী ও বণিক, সৈনিক, তত্ত্বাবধায়ক পরিদর্শক, পরামর্শদাতা পরিষদবর্গ ও খাজনা-নির্ধারক। মেগাস্থেনিসের এই স্তরবিভাগ অবশ্য পেশাভিত্তিক, তবে চতুর্বর্ণের সকল মানুষই তাঁর এই ছকের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর এই তালিকার শীর্ষে ব্রাহ্মণদের পুঁথিগুলির মতোই আছেন ব্রাহ্মণরা। এ-থেকে মনে হয় তিনি ব্রহ্মণ্য ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছেন।

মগধের ও মৌর্য-রাজাদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণরা ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানে। মতাদর্শের চর্চা ও ধর্মীয় পূজা-অর্চনার ব্যাপারে তাঁদের প্রভাব ছিল বিশেষরকম প্রবল। ব্রাহ্মণরাই ছিলেন রাজসভায় ও আইন-আদালতে প্রধান উপদেষ্টা। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ধনী ছিলেন, তাঁরা বড়-বড় ভূ-সম্পত্তির অধিকারীও ছিলেন। বিশেষ করে মগধে ও কোশলে ব্রাহ্মণরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত সবল-প্রবল, কারণ ওইসব অঞ্চলে বড়-বড় ভূস্বামী ছিলেন তাঁরা।

নতুন পরিস্থিতি সামাজিক স্তরবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে ব্রাহ্মণদের পদমর্যাদাকেও প্রভাবিত না-করে পারছিল না। ব্রাহ্মণরা বাধ্য হচ্ছিলেন তাঁদের ঐতিহ্যসিদ্ধ পেশার পরিবর্তন ঘটাতে, ফলত কোনো-কোনো সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে। ওই যুগের লিখিত সূত্রগুলিতে উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণ ভূস্বামী, বণিক, কারুশিল্পী ও ভৃত্যদের। এর পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্য সূত্রগুলিতে যেখানে বলা হয়েছে যে একমাত্র অত্যন্ত বিরল একেকটি ক্ষেত্রে মাত্র ব্রাহ্মণদের চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ নিতে অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে এ-সময়ে ব্রহ্মণ্য বিধানেই অনুমতি দেয়া হচ্ছে ওই বর্ণের মানুষদের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করার। বৌদ্ধ সূত্রগুলিতে এমন কি ব্রাহ্মণ ভৃত্য, কাঠুরিয়া, গো-পালক ও দরিদ্র চাষীর উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যাছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, এই সমস্ত লোক নিজেরাই যে-সব পেশাকে ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ত জ্ঞান করতেন কঠিন অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন এখন সেইসব পেশা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাজকর থেকে অব্যাহতিলাভের মতো তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগসুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন এই ব্রাহ্মণরা।

রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল তখন ক্ষত্রিয়দের হাতে, পরাক্রান্ত মৌর্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁদের প্রভাব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজারা নিয়ম করেই হতেন ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূত এবং সেনাবাহিনী থাকত তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশেষ করে প্রজাতন্ত্রী রাজ্যগুলিতে ক্ষত্রিয়দের শক্তি বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। মগধ এবং মৌর্য-যুগেও ক্ষত্রিয়রা প্রধান-প্রধান অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা লাভ করেন, বড়-বড় ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন তাঁদের অনেকেই। এর পূর্ববর্তী যুগে ব্রাহ্মণরা যেখানে মতাদর্শের ক্ষেত্রে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেখানে এখন ক্ষত্রিয়রাও স্বাধীন ভূমিকার দাবিদার হয়ে উঠলেন।

প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে

মৈত্রীবন্ধনের সপক্ষে মতপ্রকাশ করছিলেন। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা লিখলেন যে ক্ষত্রিয়দের শক্তি ব্রাহ্মণদের মন্ত্রণায় চালিত হলে তা অজেয় হয়ে উঠবে এবং চিরকাল অজেয় থেকে যাবে। তৎকালীন বহুবিধ লিখিত সূত্রে প্রতিতুলনায় উচ্চতর দুই বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে নিম্নতর দুই বর্ণের থেকে। নিম্নতর এই দুই বর্ণ, বৈশ্য ও শূদ্রকে, এক পর্যায়ভূক্ত করে দেখানো তখন বলতে গেলে একটা সাধারণ রীতি হয়েই দাঁড়িয়েছিল। আবার ওই একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ঐশ্বর্যশালী বৈশ্যদের সঙ্গে উচ্চতর বর্ণের মানুষের অনেক ব্যাপারেই মিল দেখা যাচ্ছিল আর দারিদ্র্যদশায় পতিত বৈশ্যরা কার্যত পরিণত হচ্ছিলেন শূদ্রে। বাণিজ্য ও কুটিরশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের নানা পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছিল। বৈশ্যদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ, কারুশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। রাজকরের বোঝা প্রধানত বহন করত এই সামাজিক গোষ্ঠীটিই, তবে ধনী বৈশ্যদের মধ্যে ছিলেন 'শ্রেষ্ঠী' নামে পরিচিত ক্ষমতাবান বণিকরা, সুদের কারবারি মহাজন ও ভূস্বামীরাও। মগধ ও মৌর্য-যুগগুলিতে বৈশ্যদের রাজনৈতিক ভূমিকার অধঃপতন শুরু হয়েছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র রাখবার অধিকার কার্যত হারিয়েছিলেন তাঁরা।

ওই সময়ে শূদ্রদের সামাজিক অবস্থা কার্যত অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজনই বাণিজ্য বা কারুশিল্প মারফত ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। এর ফলে সমাজে তাঁদের পদমর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীন ভারতের বংশানুক্রমিক রাজ্যগুলিতে সমাজ-কাঠামোর এমনই একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই। তবে ওই একই যুগের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সমাজ-সংগঠন অবশ্য কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। ('প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্ত্রসমূহ' অধ্যায়টি দেখুন।)

পরিবার ও বিবাহের বিভিন্ন রীতি

মগধ ও মৌর্য-যুগে পরিবারের প্রধান রূপটাই ছিল প্রকাণ্ড পিতৃশাসিত যৌথ পরিবারের। রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলে একবিবাহ-সম্পর্ক ছাড়াও আরও প্রাচীনতর নানা রীতির বিবাহ-সম্পর্কের প্রচলন ছিল। স্বামী হতেন পরিবারের কর্তা। স্ত্রীলোকদের পদমর্যাদায় ক্রমশ এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল যার ফলে কালক্রমে তাঁরা পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন স্বামী ও পুত্রদের ওপর। বিবাহ অনুষ্ঠানটি পরিণত হল সম্পত্তি হস্তান্তরের এক ধরনের চুক্তিতে। পুরুষ যেন স্ত্রী কিনতে লাগল ক্রয়মূল্য দিয়ে, আর বিবাহের পর স্ত্রী পরিণত হল

স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তিতে। আকর সূত্রগুলিতে স্বামীর স্ত্রী বিক্রির কিংবা জুয়াখেলায় বাজি ধরে স্ত্রী হারানোর নানা কাহিনী পাওয়া যায়।

সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শৈশবকালে নারীকে সম্পূর্ণত পিতার কর্তৃত্বাধীন বলে গণ্য করা হোত, যৌবনে তিনি হতেন স্বামীর অধীন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর হয়ে পড়তেন তিনি পুত্রদের অধীন। মনুসংহিতায় স্ত্রীলোকের এই-ই বিধিলিপি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীরা আমৃত্যু সহ্য করে যেতেন সবকিছু এবং কড়াকড়িভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়দায়িত্ব পালন করে যেতেন। মনুসংহিতায় এই বিধান দেয়া হয়েছে যে স্বামী সম্পূর্ণ গুণহীন হলেও তাঁকে দেবতা বলে গণ্য করতে হবে স্ত্রীকে। কেবল স্বামীদেরই অধিকার ছিল তখন স্ত্রীদের ত্যাগ করার। অথচ পরিবারকে পরিত্যাগ করার কোনো অধিকার স্ত্রীর ছিল না। যদি কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী তাঁকে বিক্রি করে দিতেন বা ত্যাগ করতেন তবুও তিনি ওই স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হতেন। স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হলে মৃত্যুদণ্ড সহ যত রকমের ভয়ঙ্কর শাস্তি আছে তা-ই তাঁর জন্যে বরাদ্দ হোত। অথচ পুরুষের একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি স্ত্রী থাকতে পারত এবং একে পাপকাজ বলেও গণ্য করা হোত না। প্রচলিত প্রথা অনুসারে স্ত্রীকে হতে হোত স্বামীর সমবর্ণভুক্ত। তবে বিরল কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পুরুষেরা নীচ কোনো বর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ ছিল নীচবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করা। শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণী স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহকে গণ্য করা হোত সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে। ছেলেমেয়ের ওপর বাপের কর্তৃত্ব ছিল একেবারে নির্ধারক ও চূড়ান্ত। ব্রহ্মণ্য 'বিধান'সমূহে সরাসরি বলা হয়েছে যে বাপ ইচ্ছে করলে নিজের ছেলেমেয়েদের বিলিয়ে পর্যন্ত দিতে পারেন।

শাস্ত্রসমূহে আট রকম বিবাহের কথা বলা হয়েছে, তবে কার্যত এই সবক'টি বিবাহের রীতির চল ছিল কিনা তা বলা কঠিন। বিবাহের এই আটটি ধরন হল এই রকম: কন্যা-সম্প্রদান ('ব্রহ্মবিবাহ'), পুরোহিতকে কন্যা-সম্প্রদান ('দৈববিবাহ'), গোরু কিংবা ষণ্ডের বিনিময়ে কন্যা-ক্রয় ('আর্ষবিবাহ'), সমচুক্তির ভিত্তিতে বিবাহ ('প্রজাপত্য-বিবাহ'), স্থিরীকৃত কন্যাপণ দিয়ে কন্যা-ক্রয় ('আসুরবিবাহ'), কন্যা-অপহরণের ভিত্তিতে বিবাহ ('রাক্ষসবিবাহ'), ঘুমন্ত কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ ('পৈশাচবিবাহ') এবং স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ ('গান্ধর্ববিবাহ')।

পরবর্তী যুগের আকর সূত্রগুলির সাক্ষ্য অনুযায়ী বলতে হয়, বহু-অতীত যুগ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া প্রাচীন প্রথাগুলি বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহু দীর্ঘ সময় ধরে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। যেমন, ব্রহ্মণ্য 'বিধান'সমূহ বা শাস্ত্রসমূহের মতে, সন্তানাদি না-রেখে যদি কোনো স্বামীর মৃত্যু

ঘটত তাহলে স্বামীর আত্মীয়স্বজন দাবি জানালে তাঁর স্ত্রী বাধ্য থাকতেন স্বামীর ভাই কিংবা অপর কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ঔরসে গর্ভে সন্তানধারণে।

এই ধরনের সামাজিক নিয়মকানুনের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় গোষ্ঠী-সম্পত্তি রক্ষার নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাচীন সামাজিক প্রথার মধ্যে। প্রত্যক্ষ রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের অব্যবহিত সাতপুরুষের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনও নিষিদ্ধ ছিল।

প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্ত্রসমূহ

গণ ও সঙ্ঘ

ভারতীয় আকর সূত্রে 'গণ' ও 'সঙ্ঘ' নামে পরিচিত প্রজাতন্ত্রীয় যুক্তরাষ্ট্রগুলি মগধ এবং মৌর্য-যুগগুলিতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এইসব যুক্তরাষ্ট্র রাজবংশ-শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে তখন প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছে এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লাভ করেছে উল্লেখ্য জয়সাফল্য। বৌদ্ধ আকর গ্রন্থগুলিতে এই ধরনের কিছু-কিছু প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রকে এমন কি 'বৃহৎ রাজ্য'এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'গণ' শব্দটির অর্থ বহুবিধ। বৈদিক যুগে 'গণ' বলতে বোঝানো হোত উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে; পরবর্তীকালে 'গণ' ও 'সঙ্ঘ' শব্দদুটির অর্থ দাঁড়িয়েছিল সমাজবিকাশের ভিন্ন একটি স্তরে রাজবংশ-শাসিত নয় এমন সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র। বৈয়াকরণ পাণিনি (খ্রীস্টপূর্বাব্দ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী) কয়েক ধরনের সঙ্ঘের কথা উল্লেখ করেছেন: যেমন, 'অস্ত্রবলে বলীয়ান সঙ্ঘ' বা সামরিক রাষ্ট্র-সংগঠন এবং এমন সব সঙ্ঘ যেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ অত্যন্ত অগ্রসর একটা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। নানাবিধ বৌদ্ধ পুঁথিতে আবার দু'ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে, যথা—একজনমাত্র রাজার অধীন রাজবংশ-শাসিত রাজ্য ও গণ-শাসিত কিছু-কিছু ভূখণ্ড। এই প্রথম ধরনের রাজ্যে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত একটিমাত্র মানুষের হাতে, অপরপক্ষে গণগুলিতে (উপরোক্ত পুঁথিসমূহের মধ্যে একটির বিবরণ অনুযায়ী) এমন কি দশজনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করে দেখত বিশজন, অর্থাৎ প্রতিটি সিদ্ধান্ত নির্ভর করত অধিকসংখ্যকের মতামতের ওপর। লক্ষণীয় যে প্রাচীন ভারতীয়েরা গণকে রাজার অবর্তমানে নিছক সাময়িকভাবে কাজ চালানোর জন্যে নিযুক্ত শাসন-কর্তৃপক্ষ বলে মোটেই গণ্য করতেন না। বরং তাঁরা রাজবংশ-শাসিত ও প্রজাতন্ত্রীয় এই দুই ধরনের রাজশক্তির মধ্যে তুলনামূলক বিচারের অবতারণা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে নিজ-নিজ শাসনাধীন

রাজ্যে রাজা এবং গণ সংগঠন উভয়েই চূড়ান্ত ক্ষমতার পরিচালক হিসেবে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-অভিযানের যাঁরা সঙ্গী ছিলেন ইউরোপীয় সেই সমস্ত ধ্রুপদী গ্রন্থকার এবং রাষ্ট্রদূত মেগাস্থেনিসও সে-যুগের ভারতে এমন সব যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব-বিষয়ে অবহিত ছিলেন যে-রাষ্ট্রগুলি বংশানুক্রমিক রাজার শাসিত রাজ্য ছিল না। ভারতীয় আকর সূত্রে যে-সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রকে গণ বা সঙ্ঘ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি যে স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন ছিল তা-ও বলা হয়েছে। এই সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে রাজা ছিল না, রাষ্ট্রনেতারা নির্বাচিত হতেন সেখানে।

ইউরোপীয় ধ্রুপদী ও ভারতীয় আকর সূত্রগুলিতে এই সমস্ত (রাজবংশ-শাসিত নয় এমন) যুক্তরাষ্ট্রকে সুপরিচালিত শাসনব্যবস্থা ও উন্নত মানের সংস্কৃতি সহ সমৃদ্ধ ভূ-খণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা

মৌর্য-যুগের সবচেয়ে উন্নতিশীল গণ ও সঙ্ঘগুলি ছিল এমন সব রাষ্ট্র যেগুলির কর্তৃত্বে ছিলেন না অখণ্ড ক্ষমতাশালী রাজারা, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে সেগুলি ছিল প্রজাতন্ত্র। তবে এইসব রাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার ধরনধারণ সর্বদাই-যে একরকম ছিল তা নয়। এই সমস্ত প্রজাতন্ত্রের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সেখানে অখণ্ড ক্ষমতার অধিকারী বংশানুক্রমিক রাজারা রাজত্ব করতেন না। রাষ্ট্রপ্রধান সেখানে সাধারণত নির্বাচন (কিংবা নিযুক্ত) করত গণগুলি, আবার দরকার পড়লে রাষ্ট্রপ্রধানের অপসারণও ঘটাত ওই গণ। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'চীবরবাস্তু'তে তৎকালীন উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রগুলির একটি লিচ্ছবিদের গণ সংগঠনের ভারি কৌতূহলোদ্দীপক এক বর্ণনা পাওয়া যায়। এটি হল রাষ্ট্রনেতার মৃত্যুর পর ফের গণ-প্রধান নির্বাচনের এক বিবরণ। নেতা-নির্বাচনের প্রধান শর্ত ছিল সেখানে যে নেতৃপদ-প্রার্থীকে বহুগুণসম্পন্ন মানুষ হতেই হবে। গণ সেখানে একজন প্রার্থীকে নেতৃপদে নিযুক্ত করল, তবে সেইসঙ্গে একথাও ঘোষণা করল যে নেতা যদি তাঁর কাজকর্মের জন্যে গণ-এর সম্মতিলাভে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁকে নেতৃপদ থেকে অপসারণের অধিকারও রইল গণ সংগঠনের। এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে গণ-প্রধানের থাকত প্রধানত কার্যনির্বাহী শাসনক্ষমতা, আর আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা থাকত সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হিসেবে গণ-এর এক্তিয়ারভুক্ত (কাজেই দেখা যাচ্ছে, গণ বলতে তখন একই সঙ্গে রাজবংশ-শাসিত নয় এমন রাজ্যপরিচালন-ব্যবস্থা সহ এক রাষ্ট্র ও সেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা উভয়কেই বোঝাত)।

রাজ্য-পরিচালনার প্রধান-প্রধান ব্যাপারে প্রস্তাবের আকারে গণগর্লি নানা সিদ্ধান্ত নিত, আর এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক ছিল দেশের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী নাগরিকবর্গ সহ সকল নাগরিকের পক্ষেই। যে-কেউ এইসব আইন ভেঙেছে বলে মনে করা হোত, তার ওপরই শাস্তি হিসেবে বরাদ্দ হোত কঠোর অর্থদণ্ড। প্রয়োজন বোধ করলে কখনও-কখনও অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হোত। গণ-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হোত তার নিজস্ব কর্মচারিদের এবং এই কর্মচারিরা গণ্য হতেন গণ-এর প্রতিনিধি হিসেবে।

কিছু-কিছু প্রজাতন্ত্রে আবার এই গণ ছিল পূর্ণ-অধিকারভোগী সকল মুক্ত নাগরিককে নিয়ে গঠিত এক ধরনের এক জন-সংগঠন। এই সংগঠন থেকে যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হোত তা স্থিরীকৃত হোত অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী। গণ-এর চরিত্র এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হিসেবে তার ভূমিকা অনেকখানি পরিমাণে এই সমস্ত প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে জন-সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা থাকত এবং সংগঠনটি গড়ে উঠত পূর্ণ-অধিকারভোগী নাগরিকদের নিয়ে সেখানে আলোচ্য প্রজাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক আখ্যা দেয়া চলতে পারত, তবে এমন কি এ-সমস্ত ক্ষেত্রেও যত দিন যাচ্ছিল ততই অভিজাত নাগরিকদের পরিষদ বেশি-বেশি গুরুত্ব লাভ করছিল। এই রকম কিছু-কিছু রাজনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র তখনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল গণতান্ত্রিক থেকে অভিজাত প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরের পথে মধ্যবর্তী এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা। আবার অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে জন-সংগঠনগুলি তত দিনে তাদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব হারিয়ে বসায় এবং আসল রাষ্ট্রক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের অভিজাত পরিষদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় প্রজাতন্ত্রগুলি তখনই পরিণত হয়েছিল অভিজাত প্রজাতন্ত্রে।

ক্ষত্রিয়দের রাষ্ট্রক্ষমতা ও সমাজ-কাঠামো

গণ এবং সঙ্ঘগুলিতে ক্ষত্রিয়রা জনসংখ্যার বাকি অংশ থেকে পৃথকভাবে সমাজের সর্বোচ্চ ও স্বতন্ত্র একটি স্তরে পর্যবসিত হয়েছিল। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন রাজবংশ-শাসিত নয় এমন বহু যুক্তরাষ্ট্রকে সেকালে 'ক্ষত্রিয়রাজ্য' বলা হোত। অভিজাত প্রজাতন্ত্রগুলিতে অপেক্ষাকৃত ধনী ও প্রভাবশালী ক্ষত্রিয়রা বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁরা ছিলেন 'রাজা'-উপাধিধারী। এই উপাধি অর্জন করতে হলে মানুষকে পবিত্র পুষ্করিণীর জলে অভিসিঞ্চন ও দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যেতে হোত, একে বলা হোত 'অভিষেক' অনুষ্ঠান। বে-আইনীভাবে কেউ এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করলে সে ক্ষত্রিয় হলেও তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোত।

যে-সব ক্ষত্রিয় 'রাজা'-উপাধিধারী ছিলেন তাঁরা মাঝে-মাঝে এক বিশেষ সভাগৃহে

বা ‘সান্ত্বনাগার’এ মিলিত হতেন এবং সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক প্রশ্নাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। অন্যান্য বর্ণের প্রতিনিধিদের, এমন কি ব্রাহ্মণদেরও, অনুমতি দেয়া হোত না এই সমস্ত সভায় উপস্থিত থাকার। কিছু-কিছু প্রজাতন্ত্রে খুব সম্ভবত নানা সমস্যা নিয়ে এই সমস্ত আলাপ-আলোচনা শুরু হোত জন-সংগঠনে, আর তারপর সে-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত রাজাদের পরিষদ। উপরোক্ত এই দুই সংগঠনের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করত সেই বিশেষ প্রজাতন্ত্রটিতে ক্ষমতা-বাঁটোয়ারার প্রকৃতির ওপর। বিশিষ্ট রাজকর্মচারিদের পদগুলিতেও—যেমন, সেনাধ্যক্ষ, বিচারক, ইত্যাদি পদেও—স্পষ্টতই নিযুক্ত হতেন ক্ষত্রিয়বর্ণের লোকজনেরা।

উপজাতি বা গোষ্ঠী-সম্পর্কের যুগ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া রীতিনীতি গণ ও সঙ্ঘগুলির, এমন কি তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর বা উন্নত প্রজাতন্ত্রগুলিরও, সমাজ-কাঠামোয় তখনও পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়মূল ছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ‘গোত্র’ (বা গোষ্ঠী)-র প্রভাব তখনও রীতিমতো অনুভূত হোত, যদিও তখন ‘কুল’ (বা পরিবার) আবির্ভূত হচ্ছিল প্রধান সামাজিক একক হিসেবে।

গণ এবং সঙ্ঘগুলির বড় রকমের স্বকীয় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলির মধ্যে বর্ণ এবং জাতিভেদের ছকটি। এদিক থেকে ক্ষত্রিয়রা জনসংখ্যার বাকি অংশ থেকে পৃথক ও বিশিষ্ট ছিলেন, এমন কি ব্রাহ্মণরাও তাঁদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারতেন অত্যন্ত বিরল কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র। রাজবংশ-শাসিত রাজ্যগুলিতে যেমন ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে বেশি করে বড়-বড় ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন, তেমনই প্রজাতন্ত্রগুলিতে ক্ষত্রিয়রা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী হিসেবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার সিংহভাগও প্রজাতন্ত্রগুলিতে ছিল ক্ষত্রিয়দের করায়ত্ত। রাজার শাসনাধীন রাজ্যগুলির মতো ব্রাহ্মণরা এক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রাধিকার কায়েম করার ব্যাপারে অসমর্থ হয়েছিলেন এবং প্রায়শই তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সুবিধাপ্রাপ্ত বৈশ্য সমাজের কাছাকাছি একটা স্তরে। বর্ণ-বিভাগের কাঠামোর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও কি প্রজাতন্ত্রগুলিতে ও কি রাজবংশ-শাসিত রাজ্যগুলিতে সবচেয়ে নিপীড়িত বর্ণ বলতে ছিল শূদ্ররা। এ-থেকেই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি সমাজ-কাঠামোর স্বরূপ নির্ণয় করত না।

গণ এবং সঙ্ঘগুলিতে রাজনৈতিক সংগঠনের যে-সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি তাদের রাজবংশ-শাসিত রাজ্যগুলি থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করেছিল তা হল এই যে প্রথমোক্ত রাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণের ব্যাপক স্তরসমূহ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত ছিল এবং এর ফলে সেগুলি গড়ে উঠেছিল সুদৃঢ় ও স্থায়ী যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতার মতে সঙ্ঘসমূহ তাদের দৃঢ় আসঞ্জনের কারণে

দুর্ভেদ্য ছিল। কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিকতা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রগুলিতে সমাজ-সম্পর্ক ছিল তীব্র শ্রেণী, মালিকানা ও সমাজগত বিরোধে দীর্ণ। লিখিত আকর সূত্রগুলিতে সমাজের প্রভাবশালী, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সদস্যদের সঙ্গে গণ ও সঙ্ঘগুলির সাধারণ সদস্যদের সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে বলা হয়েছে যে গণ ও সঙ্ঘসমূহের প্রধান শত্রু হল তাদের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে শাক্যদের প্রজাতন্ত্রে ক্রীতদাসদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যন্ত উল্লেখ আছে।

প্রাচীন ভারতীয় এই প্রজাতন্ত্রগুলি মৌর্য-যুগেও টিকে ছিল, এমন কি একেবারে গুপ্ত-যুগের সূত্রপাত পর্যন্ত অস্তিত্ব ছিল তাদের। অতঃপর ওই সময়ে তারা ক্রমে-ক্রমে তাদের স্বাধীনতা হারায় ও রাজবংশ-শাসিত রাজ্যগুলির অধীন হয়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনার ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় ধ্রুপদী যুগের ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলীয় দেশসমূহের ওই ব্যবস্থাদির প্রতিতুলনা উপস্থিত করা বা বৈষম্য-প্রদর্শন অবিবেচনার পরিচয়সূচক। কেননা, যেমন ভারতে তেমনই ধ্রুপদী সভ্যতাগুলির ক্ষেত্রেও শ্রেণীহীন সমাজ থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ধারায় সমাজ-বিকাশের একই রকম একটি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। আর এই বিকাশের পটভূমিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল বহুতর শর্তসাপেক্ষে যে-কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই তখন সম্ভব ছিল হয় রাজবংশ-শাসিত আর নয়তো প্রজাতন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

মৌর্য-যুগের সংস্কৃতি

হস্তলিপির প্রসার

মগধ এবং মৌর্য-রাজাদের যুগটি ছিল দ্রুত সাংস্কৃতিক বিকাশের কাল। ভারতের বহু অঞ্চল এবং এমন কি আধুনিক আফগানিস্তানের ভূখণ্ড থেকেও পাওয়া অশোকের শিলালিপিগুলির বিচারে বলতে হয় সেই সুদূর খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও হস্তলিপির প্রসার ছিল মোটের ওপর বহুবিস্তৃতই। অবশ্য হস্তলিপির অস্তিত্ব এরও কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই-যে ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। বহু বৌদ্ধ পুথিতে উল্লেখ আছে যে সেই প্রাচীন কালেও পত্র-বিনিময়, রাজকীয় ঘোষণার অনুলিখন, পেশাদার লিপিলেখকদের অস্তিত্ব এবং বিদ্যালয়গুলিতে গণিতশিক্ষার পাশাপাশি হস্তলিপি-শিল্প শিক্ষার প্রচলন ছিল।

পাণিনির ব্যাকরণে হস্তলিপি ও লেখক বোঝাতে বিশেষ সংজ্ঞার ব্যবহার আছে আর উল্লেখ আছে গ্রীক লিপির। অশোকের শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে ব্রাহ্মী লিপিতে, এছাড়া আরামেইক, গ্রীক ও ব্রাহ্মী লিপির প্রভাবে আরামেইক থেকে উদ্ভূত খরোষ্ঠী লিপিও ব্যবহৃত হয়েছে এই শিলালিপিতে। তবে বেশির ভাগ শিলালিপি অবশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে ব্রাহ্মী হরফে। নেয়ার্কুসের বিবরণীতে দেখা যায়, আলেক্‌জান্ডারের ভারত-অভিযানকালে প্রাচীন ভারতীয়রা সুতী কাপড়ের ওপর লিখতেন। তবে এটা সম্ভব যে লেখার জন্যে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে তখন ব্যবহৃত হোত তালপাতা, আর দেশের স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার দরুন সেইসব হাতে-লেখা পুথি শেষপর্যন্ত টিকে থাকে নি। তাই ওই যুগের লিপিলেখন-শিল্পের একমাত্র সাক্ষ্য আজ পর্যন্ত যা রয়ে গেছে তা হল পাহাড়, স্তম্ভ ও গুহাগাত্রে খোদাই-করা অশোকের অনুশাসন লিপিগুলি। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ ব্রাহ্মী দীর্ঘদিনের ইতিহাস-সমন্বিত একটি লিপিতে পরিণত হয়েছিল।

ব্রাহ্মী লিপির উৎস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা কোনো ঐকমত্যে পেঁছিতে পারেন নি। নানা জনে এই লিপিকে সংযুক্ত করে দেখিয়েছেন বহু বিচিত্র লিপির সঙ্গে, যেমন হরপ্পা সভ্যতার লিপি, সেমিটিক লিপি, দক্ষিণ আরবের লিপি, এমন কি গ্রীক লিপিও। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলি থেকে জানা যায় যে সে-যুগে ব্রাহ্মী লিপির বেশ কয়েকটি রকমফেরের প্রচলন ছিল। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের সূচনাকালের বৌদ্ধ রচনা ও বুদ্ধের জীবনকথা 'ললিতবিস্তার'এ উল্লিখিত আছে চৌষট্টি রকমের বিভিন্ন লিপির, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন স্থানীয় ভারতীয় লিপি ও বহু বিদেশী লিপি। অশোকের অনুশাসনগুলি কেবল-যে রাজকর্মচারিদের উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ হয়েছিল তা নয়, সাধারণ প্রজাবর্গের জন্যেও বটে। নানা সামাজিক গোষ্ঠীর লোকজন তাঁর অনুশাসনগুলি পড়ুক, এটাও ছিল অশোকের উদ্দেশ্য। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকের উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলির মধ্যে বেশকিছু ছিল উৎসর্গ-পত্র, বৌদ্ধ সঙ্ঘের নামে দান-করা উপহার-সামগ্রীর যেন তালিকা ছিল সেগুলি। বণিক, বৌদ্ধ-ভিক্ষু, কারুশিল্পী, ইত্যাদির পক্ষ থেকে খোদাই করা হয়েছিল এই শিলালিপিগুলি। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীর প্রাচীন ভারতীয়রা-যে বহু পরিমাণে লিখিত হস্তলিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন উপরোক্ত এই লিপিগুলি তার প্রমাণ। তবে এইসঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মৌখিক শিক্ষাদানের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে, ধর্মশাস্ত্রগুলি আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করার মধ্যে দিয়ে আর সেই মৌখিক শিক্ষা পুরুষানুক্রমে মুখস্থ করার মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত করিয়ে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষণীয় বিকাশের জন্যে মগধ ও মৌর্য-যুগ বিশিষ্ট। ওই সময়েই জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ব্যাকরণ-সংক্রান্ত বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচিত হয়, যদিও তা পুথিপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় পরবর্তী যুগগুলিতে। বৌদ্ধ এবং জৈনদের লেখা বহুসংখ্যক ধর্মগ্রন্থও রচিত হয় ওই যুগে। বিশদভাবে লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণের সংকলক প্রখ্যাত ভারতীয় বৈয়াকরণ পাণিনির জীবন ও রচনাকালও ওই খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে বলে মনে করেন আধুনিক পণ্ডিতেরা। পাণিনির রচিত ব্যাকরণের নাম ছিল 'অষ্টাধ্যায়ী' (অষ্ট অধ্যায়যুক্ত)। তাঁর ভাষা বিশ্লেষণের পদ্ধতি খুব উঁচুদরের ছিল। কিছু-কিছু পূর্বসূরীর রচনার ওপর ভিত্তি করে পাণিনি তাঁর এই ব্যাকরণখানি লেখেন, ওই পূর্বসূরীদের নামও তিনি উল্লেখ করেন তাঁর গ্রন্থে। পরবর্তী সংস্কৃত বৈয়াকরণদের কাজের বলতে গেলে মূল্য-নিরূপকই হয়ে দাঁড়ায় এই 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ। তাঁরা আগাগোড়াই এই গ্রন্থের আদ্যন্ত বিশ্লেষণ ও বিশদ টীকাভাষ্য রচনা করে গেছেন। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কাত্যায়ন 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থের একটি ভাষ্য রচনা করেন এবং খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এরই ভিত্তিতে পতঞ্জলি রচনা করেন নতুন একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ। এই শেষোক্ত দু'জন বৈয়াকরণ কেবল-যে সংস্কৃতই জানতেন তা নয়, স্থানীয় ও আঞ্চলিক বহু উপভাষার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন।

মগধের এবং মৌর্য-রাজাদের রাজত্বকালে প্রাকৃত ভাষাও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই প্রাকৃত ভাষাতেই অশোকের অনুশাসনগুলি রচিত হয় এবং অন্যান্য বহু শিলালিপিও উৎকীর্ণ হয়। তখনই ভারতে প্রচলিত হয়েছিল এমন বেশ কয়েকটি উপভাষা। এই রকম একটি উপভাষা পালিতে লেখা মূল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র করায়ত্ত হয়েছে আমাদের। প্রচলিত লোকপ্রবাদ অনুসারে এই গ্রন্থখানি লিখিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কা দ্বীপে ৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। পতঞ্জলি তাঁর রচিত ব্যাকরণে প্রাকৃত ভাষায় লেখা নানা গ্রন্থের নাম করেছেন। ওই সময়ে ভারতীয় সাহিত্যে যাকে কাব্য বলা হয় সেই ছন্দোবদ্ধ পদমালার অস্তিত্ব ছিল আর ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্র-সম্পর্কিত গ্রন্থাদি।

পাণিনি ও পতঞ্জলির রচনাবলীতে যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে এমন ধারণা করাটা অমূলক হবে না যে ওই সময়ে ভারতে নাটকও রচিত হয়েছিল। পতঞ্জলির ব্যাকরণে অভিনেতৃবর্গ, রঙ্গমঞ্চ, বাদ্যযন্ত্র, ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্প

মগধ এবং মৌর্য-যুগসমূহে অধিকাংশ ঘরবাড়িই ছিল কাঠের তৈরি, এ-কারণে এ-সবের কিছু টুকরোটাকরা ভগ্নাংশমাত্র এ-পর্যন্ত টিকে গেছে। তবে ওই সময়েই বাড়ি তৈরির কাজে পাথরের ব্যবহারও শুরু হয়েছে ক্রমে-ক্রমে। প্রাচীন পাটলিপুত্রের খননক্ষেত্রে খননকার্য চালানোর ফলে রাজপ্রাসাদের ও শত-স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ অট্টালিকাদি ছাড়াও ওই যুগের আবিষ্কৃত ধর্মমন্দিরগুলিও বিপুল আগ্রহের দ্যোতক, বিশেষ করে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত সাঁচি ও ভারহুতের বৌদ্ধ স্তূপগুলি।

মৌর্য-যুগে ভাস্কর্য-শিল্পের কিছু-কিছু স্থানীয় ধারার উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হল তক্ষশিলা-কেন্দ্রিক উত্তর-পশ্চিমের এবং তোসালি-কেন্দ্রিক পূর্বাঞ্চলীয় ধারাদুটি। অশোকের অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ আছে দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজধানীর যে-সমস্ত স্তম্ভের গায়ে সেগুলিতে উৎকীর্ণ শিল্পকাজে উঁচু মানের দক্ষতা লক্ষণীয়। মৌর্য-যুগের সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে সে-যুগের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সংস্কৃতিতে, আকিমেনিড সংস্কৃতির কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণভাবে বলা চলে যে ওই যুগের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল মূলগতভাবে জাতীয় ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল স্থানীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই।

রাজনৈতিক ধ্যানধারণা

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক সংগঠনাদি ও রাষ্ট্রশক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। এই পর্যায়টি গঙ্গা-উপত্যকায় প্রথম বড়-বড় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও পরে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। এই সময়ে শাসন-পরিচালনার নীতিসমূহ ও রাষ্ট্রশক্তি-সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির বিশদীকরণ ঘটে; শুরু হয় নানা রাজনৈতিক ধারার ও রাজনৈতিক গ্রন্থের প্রকাশ। এ-ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য হল অর্থশাস্ত্র নামের গ্রন্থটির প্রকাশ। এটি পরিচিত মৌর্য-রাজ চন্দ্রগুপ্তের অধীনে কর্মরত তাঁর প্রধান উপদেষ্টা কৌটিল্যের রচনা বলে। এই রাজনৈতিক গ্রন্থটির বেশির ভাগ অংশই অবশ্য খ্রীস্টজন্মের পরেকার শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলিতে সংকলিত বলে মনে হয়, তবে এতে আলোচিত রাষ্ট্রনীতি-সম্পর্কিত ধ্যানধারণা ও নীতিসমূহ মৌর্য-যুগের ভাবনাচিন্তারই প্রতিফলন।

মগধ এবং মৌর্য-যুগগুলিতে রাজবংশ-শাসিত রাজ্যগুলির পাশাপাশি অস্তিত্ব ছিল প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রসমূহের, তবে ওই সময়ে রাজবংশ-শাসিত রাজ্যই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক প্রচলিত রাজশক্তি। প্রাচীন ভারতীয়রা নিজেরাই বলেছেন যে চিরকাল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না, (ঈশ্বরের কৃপায়) রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল তখনই যখন মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীরা মাছের মতো ছোট মাছকে ভক্ষণ করতে শুরু করল আর প্রয়োজন হয়ে পড়ল এই মাৎস্যন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সমাজে আইন-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করা। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য মনে করতেন যে রাষ্ট্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল সামাজিক বৈষম্যকে, অর্থাৎ চতুর্বর্ণ-ভিত্তিক সামাজিক স্তরভেদকে, টিকিয়ে রাখা। রাজাকে তাঁর প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হোত, কাজেই দোষীর শাস্তিদান ছিল তাঁর রাজকার্যের অঙ্গ। বস্তুত, রাষ্ট্রশাসনের বিজ্ঞানই তখন পরিচিত ছিল শাস্তিদানের বিজ্ঞান হিসেবে। কৌটিল্য উল্লেখ করছেন প্রাচীনকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এইমর্মে একটি মত প্রচলিত ছিল যে মানুষকে পরিচালনার সর্বোত্তম উপায় হল শাস্তিদান।

সেকালের রাজনীতিবিদরা মনে করতেন যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ধরনের অশান্তি হল অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ এবং কৌটিল্যও সরাসরি রাজাকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন যে অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ বাইরে থেকে আবির্ভূত অশান্তির চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, কেননা এর ফলে এমন কি রাজসভায় ও রাজার অনুচরবৃন্দের মধ্যেও সাধারণভাবে একটা অবিশ্বাসের মনোভাব গড়ে ওঠে। গোয়েন্দা-বিভাগ গড়ে তোলা ও রাজনীতিতে গোপন কূটকৌশল প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হোত তখন। কৌটিল্য রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাজকর্মচারিদের ঘুষ দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করে রাজকর্মচারিদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করা দরকার। তদুপরি রাজার সমর্থক ও শত্রুদের কেবল খোলাখুলিই নয় গোপনেও শাস্তিদানের ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রয়োজন।

বাস্তব বৈষয়িক স্বার্থকেই কৌটিল্য সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। এই স্বার্থ রক্ষার খাতিরে শাস্ত্রসম্মত বিধিবিধান থেকে এক-আধটুকু বিচ্যুতিও মেনে নিতে প্রস্তুত থেকেছেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, যদি কোনো সরকারি নির্দেশ বিধিবদ্ধ আইনের সীমা লঙ্ঘন করে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই বে-আইনী সরকারি নির্দেশকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত হবে।

রাজা যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে সংকটের সম্মুখীন হতেন তখন কৌটিল্য তাঁকে পরামর্শ দিতেন মন্দিরগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই অর্থে রাজকোষ পূর্ণ করতে। এমন কি কৌটিল্য এ-ধরনের কিছু কৌশলও উদ্ভাবন করেছিলেন যেগুলিকে ব্যবহার করে রাজা তাঁর প্রজাবর্গের ধর্মীয় কুসংস্কারকে নিজের স্বার্থে

কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রজাদের মনে এই ধারণা জন্মাতে পারেন যে তাঁদের রাজা অলৌকিক শক্তির অধিকারী।

ওই যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের, যুদ্ধ-পরিচালনার ও শান্তি-স্থাপন সম্পর্কিত আলোচনার বহুবিধ পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়। রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল পররাষ্ট্র-নীতির বিষয়টি। অর্থশাস্ত্রে পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনার ছ'টি প্রধান পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। যেমন, শান্তি, যুদ্ধ, পর্যবেক্ষণ ও প্রতীক্ষা, আগ্রাসন, প্রতিরক্ষার উপায়াদি সন্ধান এবং দুমুখো রাষ্ট্রনীতি। গ্রন্থটিতে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রদূতদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এই রাষ্ট্রদূতদের কাজকর্মের পরিধি ছিল তখন অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রীয় চুক্তির শর্তাদি প্রতিপালন এবং নিজ রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষা করা ছাড়াও, কৌটিল্যের মতে রাষ্ট্রদূতের কাজ হল বন্ধু-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেয়া, গোপন ষড়যন্ত্র, ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা, মোতায়েন সৈন্যদলকে গোপনে স্থানান্তরিত করা, ইত্যাদি। অর্থাৎ, সম্ভবপর সকল রকম দুষ্কর্মই সাধন করা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে সাধারণত শত্রু হিসেবে গণ্য করা হোত বলে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতাসাধনের উপায়াদিও বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে গ্রন্থটিতে। প্রতিবেশীর অপর প্রতিবেশীকে অবশ্য গণ্য করা হোত বন্ধু বলে, তবে সেই বন্ধুর প্রতিবেশী-রাষ্ট্র আবার গণ্য হোত অপর এক শত্রু হিসেবে। অন্য রাজ্য আক্রমণ করার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে কৌটিল্য বলছেন যে সম্ভাব্য শত্রুদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সে-রাজ্যে রাজার সঙ্গে প্রজাবর্গের সম্পর্কের ব্যাপারগুলি হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। এ-ব্যাপারে কৌটিল্যের মত ছিল এই যে এমন এক দেশে প্রজারা যদি রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনে রত থাকেন তাহলে এমন কি আপাতদৃষ্টিতে সেই রাজাকে শক্তিশালী বলে মনে হলেও প্রজারা সেই রাজার পতন ঘটাতে পারেন। এ-কারণেই প্রজাবৃন্দ যে-রাজার শত্রু তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে কৌটিল্য মনে করতেন।

প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভাবনে বড়-বড় সাফল্যের মূলে ছিল প্রত্যক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রগতি।

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে জ্ঞানের চারটি প্রধান শাখা বলতে কৌটিল্য বুঝতেন দর্শনশাস্ত্র ('অন্বীক্ষিকী'), 'বেদপাঠ', অর্থনীতি-শাস্ত্র পাঠ ও রাষ্ট্রশাসন-সম্পর্কিত পাঠ ('দণ্ডনীতি') গ্রহণকে। প্রধান-প্রধান জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রকে যে তিনি প্রথম স্থান দিয়েছেন এটাও নিছক আকস্মিক ব্যাপার নয়। তিনটি দার্শনিক মতবাদের ধারার কথা উল্লেখ করেছেন কৌটিল্য। সেগুলি হল— লোকায়ত, সাংখ্য ও যোগ। কৌটিল্যের মতে দর্শনশাস্ত্রে অধিকার থাকলে রাষ্ট্র-পরিচালনার কাজেও সাফল্য আসে।

বহুব্যাপক ধ্যানধারণা নিয়ে অনুসন্ধান এবং সে-সমস্ত বিশ্লেষণের গভীরতা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং কৌটিল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পুরাযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিৎ অ্যারিস্টটলের সঙ্গে সমান আসনে।

মৌর্য-যুগের ধর্মমতসমূহ

প্রাচীন ভারতে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়টা ছিল ধর্মমত ও দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপারে অনুসন্ধান ও সংস্কারসাধনের কাল। ধর্মমত হিসেবে বেদবাদের প্রভাব তখন কিছু-পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বেদসমূহের পৌরাণিক ধ্যানধারণার আদিম প্রকৃতি, বেদের জটিল ও সেকেলে পুজাপার্বণের ধরনধারণ, পুরোহিতদের স্থূল বৈষয়িক দাবিদাওয়া (উন্নততর জ্ঞানের অধিকারী বলে পুরোহিতদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে লোকের যে-মোহ ছিল তা থেকে মুক্তির ফলে), ইত্যাদি কোনোকিছুই আর নতুন যুগের মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না, ফলে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল প্রতিবাদ। বিশ্বাসের এই সংকট অতিক্রমণের প্রথম চেষ্টায় এমন একটি ধর্মান্দোলন দেখা দিল যার প্রতিফলন মিলল উপনিষদসমূহে। সমগ্রভাবে বিচার করলে, এই ধর্মান্দোলন অবশ্য বেদবাদকে প্রত্যাখ্যান করল না, তবে প্রয়াস পেল নতুন ও তত্ত্বগতভাবে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় এক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বৈদিক মতবাদে নতুন জীবনের সঞ্চার ঘটাতে। প্রাচীন ঐতিহ্যসমূহের নিষ্ঠাবান ধারক-বাহকরা অবশ্য নতুনতর নীতিসমূহের প্রবক্তা সংস্কারসাধক ধর্মীয় প্রবণতা ও মতবাদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে দৃঢ়পণ কঠিন সংগ্রাম শুরু করলেন। রক্ষণশীলরা এই পরবর্তীদের আখ্যা দিলেন 'অ-সনাতনী' (অর্থাৎ, বেদসমূহের কর্তৃত্বে অবিশ্বাসী) বলে, এবং এঁদের অন্তর্ভুক্ত করলেন ওই সময়ে নব-উদ্ভূত দুটি ধর্মমত জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে ও ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ভাবধারাকে ভাষা দিচ্ছিল এমন অপর যে-সব দার্শনিক মতাদর্শ তাদের সবক'টিকেই। উপরোক্ত এইসব দার্শনিক মতাদর্শই তখন খোলাখুলিভাবে বৈদিক ধর্মমতের অপরিবর্তনীয়তার তাৎপর্যকে অস্বীকার করছিল।

গোড়ার দিককার উপনিষদসমূহ এবং ব্রহ্মণ্যবাদের অধীনতা থেকে মূলত মুক্ত নতুন ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদগুলির উদ্ভবের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এমন একটা সময় এসেছিল যা চিহ্নিত ছিল তীব্র আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান দিয়ে। এ-সময়ে বেশ বড় একদল সন্ন্যাসী সাধারণ গৃহীর দৈনন্দিন জীবন ও প্রাচীন ধর্মমতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্কের ছেদ ঘটিয়েছিলেন। এঁরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন উপরোক্ত ওইসব নতুন ভাবাদর্শের প্রবক্তা। এঁরা পরিচিত ছিলেন 'পরিব্রাজক' (আক্ষরিক

অর্থে ভ্রমণকারী বা তীর্থযাত্রী) ও 'শ্রমণ' নামে। (পরবর্তীকালে এই 'শ্রমণ' শব্দটি দিয়ে অ-রক্ষণশীল ধর্মান্দোলন বা ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের বোঝানো হোত।) গোড়ার দিকে এই শ্রমণরা তাঁদের নিজস্ব মঠ এবং সম্প্রদায় গড়ে তোলেন নি, কিন্তু পরে অপেক্ষাকৃত স্বনামধন্য ভ্রমণকারীদের ঘিরে অনুরক্ত অনুসারীরা একত্রিত হতে শুরু করলেন।

মতাদর্শগত আলোড়নের এই পর্যায়ে উদ্ভব ঘটল বহুতর মতবাদ ও মতাদর্শগত প্রবণতার, তবে এই সময়কার প্রধান-প্রধান সংস্কারসাধক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারা এইসব মতাদর্শের অনেক কিছুই পরে আত্মসাৎ করে সেগুলিকে আরও বিশদ করে তুললেন। গোড়ার দিককার সবক'টি শ্রমণ-সম্প্রদায় বেদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করল, বেদ-ভিত্তিক মতাদর্শগত ও সামাজিক নিয়মকানুনও মানতে রাজি হল না তারা। স্বভাবতই এর ফলে 'পরম জ্ঞান'এর একমাত্র অধিকারী হিসেবে ব্রাহ্মণদের দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হল, অথচ এর আগে পর্যন্ত ওই জ্ঞান সাধারণ মানুষের অধিকার-বহির্ভূত বলে গণ্য হয়ে আসছিল। ব্রাহ্মণদের জ্ঞানার্জনের এই বিশেষ অধিকার বৈদিক সমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসেবে তাঁদের গণ্য হওয়ার পক্ষেও একটা যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই, শ্রমণদের বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশ অন্যান্য বর্ণের প্রতিনিধি হওয়ায় তাঁরা-যে প্রচণ্ড দৃঢ়তা নিয়ে পুরোহিততন্ত্রের সামাজিক অধিকারের দাবিদাওয়া প্রত্যাখান করবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

শ্রমণদের উপস্থাপিত সবক'টি মতবাদের অপর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল নীতিগত প্রশ্নাদি সম্পর্কে সেগুলির দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা। বৈদিক সাহিত্যে প্রথম নির্দেশিত ও বিশদীকৃত বর্ণভেদ-ভিত্তিক ঐতিহ্যসিদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে সেগুলিকে তখন নতুন করে খুঁজতে হয়েছিল প্রকৃতিতে ও সামাজিক পরিবেশে মানুষের স্থান-সম্পর্কিত প্রশ্নটির সদুত্তর। এই লক্ষ্যসন্ধানে নিয়োজিত তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের তীব্রতায় অবশ্য মাত্রাভেদ ছিল সংস্কারসাধক বিভিন্ন এই ভাবধারার মধ্যে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের দ্বারা বিস্তারিতভাবে আলোচিত ও সমাধিত নৈতিক প্রশ্নাদি কেবলমাত্র এই দুটি ধর্মান্দোলনেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়, তা ওই যুগের সকল অ-রক্ষণশীল ধর্মশিক্ষার যা বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণের সেই নতুন মান-সন্ধানের প্রকাশও বটে।

শ্রমণ-সন্ন্যাসীদের ভাবধারাগুলির সামাজিক তাৎপর্য ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখ্য ব্যাপার। শ্রমণ ধর্মপ্রচারকরা নিজেরা কিন্তু কোনো বিশেষ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন নি, তবে তাঁদের অনেক ধ্যানধারণা এবং বিশেষ করে 'ব্রহ্মণ্য ভারত'এর বিরুদ্ধে তাঁদের আপসহীন মনোভাব ব্রহ্মণ্য ধর্মশিক্ষার সমর্থনপুত উপজাতি-ভিত্তিক অনৈক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত গোড়ার যুগের ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির শাসকদের তাঁদের সম্ভাব্য সহযোগী করে তোলে। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক

জীবনে কেন্দ্রীভবনের যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা মিলে গিয়েছিল ধর্মীয় ও আত্মিক জীবনে ঐক্যপ্রয়াসী প্রবণতাগুলির আবির্ভাবের সঙ্গে। মনে রাখা দরকার যে এটি কোনো আপতিক ঘটনা ছিল না, কেননা তখন বহুসংখ্যক পরস্পর-নিরপেক্ষ স্বাধীন ধর্মগুরুর জায়গায় ক্রমশ দেখা দিচ্ছিল গোটা ভারত জুড়ে স্বীকৃতিলাভে সমর্থ অল্প কয়েকটি ধর্মীয় মতাদর্শ।

এগুলির মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় মতাদর্শ অবশ্য গোটা দেশের পক্ষে তাৎপর্যবহ ছিল না, তবু এই সবক'টি মতাদর্শই সেই যুগে ও তার পরবর্তী যুগগুলিতে প্রাধান্য লাভ করে ছিল যে-সমস্ত ধ্যানধারণা ও ভাবনাচিন্তা সেগুলির বিকাশের ব্যাপারে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ পুথিগুলিতে এমন ছ'জন 'প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী' গুরুর নাম পাওয়া যায় যাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধ গুরুরা তুমুল বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সেকালের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাবধারা জৈন ও অজীবিকবাদের প্রতিষ্ঠাতারা।

জৈনধর্ম

ভারতের প্রাচীনতম অ-সনাতনী ধর্মগুলির একটি হল জৈনধর্ম। প্রাচীন লোকশ্রুতি থেকে এই ধর্মের উদ্ভবের কাল ও এর প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা গেছে। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিদেহ (বর্তমানে বিহার)-নিবাসী বর্ধমান নামে ক্ষত্রিয়-বর্ণোদ্ভূত এক ব্যক্তি। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইনি জীবিত ছিলেন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ইনি বনে চলে যান ও সেখানে সন্ন্যাস-জীবন বরণ করে ধ্যানে মগ্ন থাকেন (প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা দৈহিক বাসনা-কামনার অবদমন এবং এর মধ্যে দিয়ে একদিকে সাধারণ মানবিক স্পৃহা ও দুর্বলতার দূরীকরণ ও অন্যদিকে মানুষের মনঃসংযোগের শক্তিবৃদ্ধি ঘটানোর ব্যাপারটি ছিল স্বতঃসিদ্ধ)। বারো বছর এইভাবে সন্ন্যাস-জীবনযাপন ও তপস্যার মধ্যে দিয়ে বর্ধমানের মনে দানা বেঁধে উঠল নতুন এক ধর্মের নীতিসমূহ। অতঃপর ভারতের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি এই নতুন ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন এবং এইসূত্রে সংগ্রহ করলেন বৃহৎ এক শিষ্যমণ্ডলী। বর্ধমান জীবিত ছিলেন আশি বছরেরও বেশি। গোড়ার দিকে তাঁর প্রচারিত ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল শুধুমাত্র বিহারেই, সেখানে তিনি বহু প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর এই ধর্মের প্রচার-কেন্দ্র গড়ে ওঠে ভারতের অত্যন্ত প্রত্যন্ত বহু প্রদেশেও। অতঃপর এই নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পরিচিত হলেন 'মহাবীর' অথবা 'জিন' (বিজয়ী) নামে। সেকালে এই ধরনের সম্মানসূচক নানা উপাধি দেয়া হোত বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ধর্মগুরুদের (বস্তুত,

'জৈনধর্ম' নামটিই উদ্ভূত হয়েছিল উপরোক্ত ওই দ্বিতীয় উপাধি থেকে। অর্থাৎ, জিন-এর প্রচারিত ধর্মই জৈনধর্ম)। এই নতুন ধর্মের সন্ন্যাস-জীবন যাপনকারী বহু অনুসারী ছাড়াও অসংখ্য গৃহীও অল্পদিনের মধ্যে মহাবীরের শিষ্যদের দলে যোগ দিলেন। এই গৃহী শিষ্যরা বিষয়-সম্পত্তি বা পরিবার-পরিজন ত্যাগ করলেন না বটে, তবে জৈনধর্মে বিধিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান মেনে চললেন। পরবর্তী কালে জৈনধর্ম শুধু ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনেই নয়, দেশের সামাজিক জীবনেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয়।*

জিন-প্রচারিত (ও তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের দ্বারা বিশদীকৃত) ধর্মশিক্ষার অন্তঃসারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গোড়ার দিককার জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে। এইসব গ্রন্থে মানুষের বিশ্ববোধের ভিত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে লভ্য জগৎ সম্বন্ধে মানুষের তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে (ওই সময়ে আবির্ভূত অন্যান্য ধর্মশিক্ষাতেও এই একই কথা বলা হয়েছে)। বস্তুত, এই বিশেষ ধরনের বাস্তববাদ প্রাচীন কালে আবির্ভূত অধিকাংশ ধর্মশিক্ষারই অঙ্গীভূত (এবং এটি কেবল ভারতের ক্ষেত্রেই-যে সত্য তা নয়)। জৈন ধর্মশিক্ষায় বস্তুজগৎ ও আত্মিক জগৎকে দুই বিরুদ্ধ-শক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয় নি: বলা হয়েছে মানুষের অনুভব ও চিন্তার ক্ষমতা ঠিক সেই রকমই জীবনের এক স্বাভাবিক লক্ষণ, যে-লক্ষণ অনুক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে মানুষের চতুষ্পার্শ্বের প্রকৃতি-জগতে। প্রথম দৃষ্টিতে এই নীতিসূত্রটিকে আংশিকভাবে বস্তুবাদী চিন্তার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ বলে মনে হতে পারে, তবে তা শুধুমাত্র আংশিকভাবেই, কেননা জৈনধর্ম আলোচ্য এই নীতিসূত্রের মধ্যে যে-কোনোদিকে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত টানার অবকাশ রেখে সুনিয়মিতভাবে দুটি সম্ভাবনাকেই বিকশিত করে তুলেছে। এই তত্ত্ব কেবল-যে আত্মিক জগৎকে 'বস্তুভূত' করছে তা-ই নয়, বস্তুজগৎকেও তা করে তুলছে 'আত্মিক'। এতে আত্মা সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণাকে একেবারে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আত্মা সর্ববস্তুতে বিরাজমান; গাছপালা, এমন কি পাথরেরও আত্মা আছে। আত্মা অবিনাশী আর তা ঈশ্বরেরও সৃষ্ট নয়।

* জৈনদের (বর্ধমান বা জিন-এর শিষ্য-সম্প্রদায় নিজেদের এই নামেই অভিহিত করে থাকেন) নিজেদের বিশ্বাস তাঁদের ধর্মমত বহু পুরাকাল থেকেই প্রচলিত। এ-প্রসঙ্গে তাঁরা নাম করে থাকেন চব্বিশ জন ধর্মগুরু বা তথাকথিত 'তীর্থঙ্কর'এর (অস্তিত্বের স্রোতস্বিনী পদব্রজে পারাপারকারীর), যাঁদের মধ্যে বর্ধমান হলেন সর্বশেষ তীর্থঙ্কর। আসলে এই নতুন ধর্মবিশ্বাসটির সবক'টি প্রধান নীতিসূত্রের সঙ্গে বর্ধমানের নামই জড়িত (অথবা সেগুলি আরও পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত)। তীর্থঙ্করদের সম্বন্ধে উপরোক্ত এই সমস্ত কাহিনী পৌরাণিক অতিকথা, লোকপ্রবাদ এবং পূর্ববর্তী যুগে ধর্ম-সংস্কারের কিছু-কিছু প্রয়াসের স্মৃতির সমষ্টিমাত্র। — লেখক

তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য-সংগ্রহ ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়াও, বেদ ও উপনিষদে বিবৃত ধ্যানধারণার ভিত্তিতে গৃহীত নানা সিদ্ধান্তও সমান গ্রাহ্য বলে গণ্য হল জৈনদের কাছে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করলেন পুনর্জন্মবাদে এবং পুনর্জন্মের কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী নতুন জন্মলাভের যে-তত্ত্ব সেই কর্মবাদে।

প্রকৃতিজগতে সকল বস্তুরই প্রাণ আছে জৈনরা এই তত্ত্ব গ্রহণ করায় এর সঙ্গে তাঁদের উপরোক্ত পুনর্জন্মবাদের ধারণা চমৎকার খাপ খেয়ে গেল এবং এর ফলে নানাপ্রকার প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে বিভেদের সকল সীমানাই গেল ঘুচে। অর্থাৎ তাঁদের মতে, মানুষ পরজন্মে পাথরে পরিণত হতে পারে আবার পাথর জন্মান্তরে হতে পারে মানুষ। জৈনরা বললেন, কর্মবাদই আত্মার আধার কী হবে তা নির্ণয় করে এবং জন্মান্তরে আত্মা ইতর প্রাণী, মানুষ, দেবতা কিংবা দানবের দেহ ধারণ করতে সমর্থ।

বেশির ভাগ প্রাচীন ভারতীয় ধর্মমতের মতো জৈনধর্মেরও মূল লক্ষ্য ছিল নিছক পরম জ্ঞান অর্জনে মানুষকে সহায়তা দেয়া নয়, বরং এমন সমস্ত বিধি-বিধান নিয়মকানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া যা নাকি মানুষকে সাহায্য করবে বাস্তব জীবনে তার ধর্মীয় আদর্শ অর্জনে। যেমন উপনিষদসমূহে তেমনই জৈনধর্মেও এই আদর্শ হল 'পরমা মুক্তি', অর্থাৎ সকল বাসনা-কামনা ও পার্থিব বন্ধনের হাত এড়িয়ে এমন একটা অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যে-অবস্থায় ব্যক্তিসত্তা মিশে যাবে নৈর্ব্যক্তিক, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্রতায়। মানুষ যখন এই তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সে উত্তীর্ণ হয় অস্তিত্বের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের দাসত্বনিগড় ভেঙে এবং অতঃপর তার আর পুনর্জন্ম হয় না। 'সর্ববন্ধনমুক্ত' এই সত্তা জগতে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সবকিছু থেকে সে শ্রেষ্ঠ, এমন কি দেবতাদেরও সে অতিক্রম করে যায়—কারণ দেবতারাও কর্মবাদের অধীন। মানুষ এবং বিশেষ করে 'অর্হন্তরা' (অর্থাৎ, যে-সব জৈন সন্ন্যাসী পূর্ণ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন) দেবতাদের চেয়ে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত, কেননা দেবতারা 'অর্হন্তত্ব' লাভে অসমর্থ। পূর্ণ মুক্তি পেতে গেলে দেবতারও মানুষের ঘরে, মানুষের জগতে পুনর্জন্ম লাভ করা দরকার। 'মুক্তির পথ' প্রসারিত অসামান্য কঠিন তপশ্চর্যা, সর্বত্যাগ ও আত্মপীড়নের মধ্যে দিয়ে।

জৈনধর্মের ইতিহাসে একমাত্র গুরুতর অনৈক্যের কারণ সৃষ্টি হয়েছিল এই তপশ্চর্যার পদ্ধতি বিষয়ে মতান্তর নিয়েই। 'শ্বেতাম্বর' জৈন বা শ্বেতবসন-পরিহিত জৈন সম্প্রদায় তখন সমালোচিত হয়েছিল বেশভূষা সম্পূর্ণ পরিত্যাগকারী অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল অপর সম্প্রদায়টির দ্বারা। এই শেষোক্ত জৈন সম্প্রদায় পরিচিত ছিল 'দিগম্বর' জৈন বা দিকরূপ বস্ত্র-পরিহিত জৈন সম্প্রদায়

জৈনধর্ম অনুযায়ী, গৃহীর নয় একমাত্র সন্ন্যাসীর আত্মাই 'মুক্তি' পেতে পারে। অতএব এটা কোনো আপতিক ঘটনা নয় যে প্রাচীন ভারতে অন্যান্য সব ধর্মের অনুসারীদের চেয়ে জৈনরাই অনেক অধিক সংখ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে তপশ্চর্যায় মনোনিবেশ করতেন। এমন কি 'মহাবীর' বা 'জিন' অথবা বিজয়ী উপাধিটিও বহুবারের পুনর্জন্মে পার্থিব বাসনা-কামনাকে জয় করার সঙ্গে সংযুক্ত এবং সন্ন্যাস গ্রহণ ও তপশ্চর্যার দ্যোতক।

জৈন নীতিশাস্ত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ ও মূলনীতি হল 'অহিংসা' (জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করা)। জৈন সাধুরা কেবল-যে প্রাণীহত্যা থেকেই বিরত থাকতেন তা নয়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকামাকড়ও যাতে দৈবক্রমে পায়ে না মাড়িয়ে ফেলেন সেজন্যে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতেন। পরবর্তীকালে জৈন পুথিগুলিতে সাধুদের আচরণবিধি বিবৃত হয়েছে বিশদভাবে। এই রকম আটাশটি আচরণবিধি মেনে চলতে হোত তাঁদের, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল সত্যবাদিতা, সংযম, বৈরাগ্য, চুরির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি। তবে জৈনধর্মের গৃহী অনুসারীদের জন্যে এইসব বিধিনিষেধের কঠোরতার মাত্রা ও এদের সংখ্যা কম ছিল।

অল্পকালের মধ্যেই জৈনধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল দেশ জুড়ে, তবে বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্মের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারল না কোনোদিনই। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিকের শতাব্দীগুলিতে এই ধর্মের প্রভাব নিঃসন্দেহে হ্রাস পায়, তবে আজও পর্যন্ত ভারতে ছোট একটি দৃঢ়বদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এর অস্তিত্ব টিকে আছে। তবু এও অনস্বীকার্য যে প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে জৈনধর্মের প্রভাব পড়েছিল ব্যাপকভাবে। এই ধর্মের প্রেরণায় রচিত হয় বিপুল এক সাহিত্য এবং জৈন-দর্শনে নিহিত বাস্তববাদ বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে এই ধর্মের অনুসারীদের আগ্রহী করে তোলে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপের ক্ষেত্রে জৈনদের অবদান ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম যুগের বৌদ্ধধর্ম: বৌদ্ধ ধর্মনীতির সারকথা

অন্যান্য সংস্কার-ভিত্তিক ধর্মশিক্ষার মতো বৌদ্ধধর্মও সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল উত্তর ভারতে এবং বিশেষ করে মগধে। মগধ তখন গণ্য হোত ব্রহ্মণ্যধর্ম গ্রহণে সবচেয়ে অনিচ্ছুক একটি রাজ্য এবং অ-সনাতনী ধর্মপ্রচারের এক কেন্দ্র হিসেবে। অ-সনাতনী অথবা তথাকথিত প্রচলিত ধর্মদ্বেষী ধর্মমতগুলির মধ্যে অনেকগুলি ব্যাপারে সাধারণ একটা ঐক্য ছিল, তবে সেগুলির মধ্যে আবার মতভেদও ছিল প্রচুর। গোড়ার দিকে বৌদ্ধধর্মের তেমন কোনো প্রভাব ছিল না এবং এটি ছিল অ-সনাতনী ধর্মমতগুলির একটি—যা নাকি ব্যস্ত ছিল উপ-

মহাদেশের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির, বিশেষ করে মগধের রাজ্যশাসকদের, সমর্থন আদায়ের জন্যে।

কড়াকড়িভাবে কায়েম-করা জাতিভেদ-প্রথা প্রত্যাখ্যান করে উৎপত্তি বা জাতিপরিচয়-নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের সমানাধিকার সমর্থন করায় এই নতুন ধর্মমত সমাজের বণিক সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষরকম আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। এই বণিকরা ছিলেন বৈশ্যদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন, অথচ ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতায় সমাজ-কাঠামোয় এঁদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল বেশ নিচু স্থান। এছাড়া বৌদ্ধধর্ম ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ওই সময়ে ক্ষত্রিয়রা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে তুলছিলেন ক্রমশ বেশি-বেশি ক্ষমতা, অথচ সেইসঙ্গে এ-ও অবগত ছিলেন যে ব্রাহ্মণরা তাঁদের ওপর প্রবল মতাদর্শগত চাপ বজায় রেখেছেন এবং নিজেদের জাহির করছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পবিত্র বর্ণের প্রতিনিধি, এমন কি পার্থিব দেবতা হিসেবেও।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় বা 'সঙ্ঘ'এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার পেলেন সকল বর্ণের মুক্ত প্রতিনিধিরা এবং এর ফলে এই নতুন ধর্মের প্রভাবের পরিধি বিপুলভাবে বিস্তৃত হল। এমন কি যাঁরা সঙ্ঘে যোগ দিলেন না স্বর্গলাভের পথ তাঁদের জন্যেও উন্মুক্ত রইল—গৃহী ভক্তদের জন্যে এই আদর্শ প্রচার করলেন বুদ্ধদেব। প্রথম যুগে বৌদ্ধধর্মে নীতিগত দিকটিই ছিল প্রধান; গৃহীদের উদ্দেশে প্রচারিত তাঁর বাণীতে বুদ্ধদেব জটিল অধিবিদ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনায় মনোযোগী হন নি।

প্রাথমিক পর্যায়ে বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের মূলে অনেকখানি পরিমাণে ছিল এই ঘটনাটি যে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মশিক্ষায় সকল পুরনো ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানান নি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে ভারতের সেই প্রাচীন ও রক্ষণশীল সমাজে সেদিন সামাজিক ও বুদ্ধিচর্চার উভয় ক্ষেত্রেই এইসব ঐতিহ্য ও রীতিনীতির মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল। বুদ্ধদেব তাই চেষ্টা করেছিলেন নতুন এক ব্যাখ্যার অবতারণা করতে, প্রচলিত নানা আচারবিধির সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ব্যাখ্যা দিতে।

তবে প্রধানত বৌদ্ধধর্ম ছিল এক মৌল ধর্মমত। এটি অন্যান্য ভারতীয় ধর্মমতের থেকে এতখানি পৃথক ছিল যে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে এই ধর্মমতকে ভারতের সীমানার বাইরে অন্যান্য দেশে উদ্ভূত অন্যান্য ধর্মমতের, যেমন খ্রীস্টধর্মের, সঙ্গে এক করে দেখানোর। তবে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত বহুতর নতুন ধ্যানধারণাকে সাধারণ ঐতিহ্যসিদ্ধ ধ্যানধারণার কাঠামোর মধ্যে অত্যন্ত সতর্কভাবে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য একথাও সত্যি যে বৌদ্ধধর্ম কোনোদিন এই ঐতিহ্যসিদ্ধ ধ্যানধারণাগুলিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে নি।

পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ ধর্মমত ও উপনিষদসমূহের মধ্যে যে একটা যোগসূত্রের কথা বলেন সেটা নিছক অমূলক নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে বুদ্ধদেব উপনিষদসমূহে বিধৃত নীতিগুলি গ্রহণ করেছিলেন। বরং একথা বললেই অপেক্ষাকৃত সঠিক বলা হয় যে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে-সমস্ত নতুন ধ্যানধারণার উদ্ভব ঘটছিল তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল সমকালে-রচিত উপনিষদসমূহে।

বৌদ্ধধর্ম ও ব্রহ্মণ্যধর্মের মধ্যে বহুবিধ সাদৃশ্যের নানারকম কারণ নির্দেশ করা সম্ভব। প্রসঙ্গত, এটা কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম-সংস্কারমূলক মতবাদের আবির্ভাব সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী ধরে বংশ-পরম্পরাক্রমে আচরিত ভারতীয়দের ঐতিহ্যসিদ্ধ ধর্মমতে মৌল কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। জৈনধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও ব্রহ্মণ্যধর্মের প্রসাদপুষ্ট ঐতিহ্যসিদ্ধ ভারতীয় পূজাপার্বণ-পদ্ধতি গ্রহণ করে নেয়। এ-কারণেই বৈদিক ও ব্রহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীরা বৌদ্ধধর্মে নিন্দিত হন নি।

ঐতিহ্যসিদ্ধ ভারতীয় দেবদেবীদের বৌদ্ধধর্ম প্রত্যাখ্যান না-করলেও ওই ধর্মমতের আওতায় তাঁদের জন্যে এমন একটা অকিঞ্চিৎকর স্থান নির্দিষ্ট হয় যে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত হবার পর শেষপর্যন্ত বলতে গেলে তাঁরা লোপই পেয়ে যান। ব্রহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীদের বৌদ্ধধর্মে এইভাবে আত্মসাৎ করে নেয়ায় এই ধর্মমতটি নিঃসন্দেহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে ব্রহ্মণ্যধর্মের ধ্যানধারণাগুলি এইভাবে আত্মসাৎ করার ফলে বৌদ্ধধর্মের নিজেরই ব্রহ্মণ্যধর্মের কবলিত হয়ে পড়ার একটা আশঙ্কা-যে ছিল না এমন নয়। বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রাথমিক বিকাশের স্তরটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ওই স্তরে বৈদিক দেবদেবীদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন যে-নতুন ধর্মের কাঠামোর মধ্যে তার চর্চা করা হোত সেই ধর্মের বৈশিষ্ট্যসূচক অন্তঃসার কিংবা তার স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে নি। বৌদ্ধধর্মের (বস্তুত উপনিষদসমূহে বিধৃত মতাদর্শেরও) প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পূজাপার্বণের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলির প্রতিই অমনোযোগ প্রদর্শন।

উপনিষদসমূহের মতাদর্শের মতো বৌদ্ধধর্মেও 'পুনর্জন্মবাদ' ও 'কর্মবাদ' স্বীকৃত। আত্মা অবিনাশী এই তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে বৌদ্ধধর্ম খোলাখুলি ঘোষণা করেছে যে আসলে অবিনশ্বর হল আত্মিক শক্তি। এই শক্তির কোনো ধরনের প্রকাশই নিরর্থক হতে পারে না। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এরকম একেকটি প্রকাশ হল রূপান্তরগ্রহণের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারারই একেকটি মুহূর্তমাত্র। যা-কিছু আত্মিক গুণসম্পন্ন তার অন্তহীনতার এই ধারণা থেকে কর্মবাদের উৎপত্তি। যেহেতু কোনো কর্মই লোপ পায় না, সেইহেতু কোনোদিন-না-কোনোদিন অবশ্যম্ভাবী যত-সব

ফলাফল নিয়ে তা প্রকাশ পাবেই। আর যেহেতু কর্মটি প্রকৃতিগতভাবেই আত্মিক গুণসম্পন্ন, তাই দেহের জীবদ্দশার কাঠামোয় সে আবদ্ধ নয়। এইভাবে নতুন এক জন্ম পূর্বনির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে অতীতের কাজকর্ম দিয়ে, অথবা অন্ততপক্ষে অতীত কর্মের অতি-গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের অধীন হচ্ছে।

বৌদ্ধ ধর্মমত সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে অকাদমিশিয়ন শ্চের্‌বাত্‌স্কয় লিখছেন: 'সত্তা... হল মিনিটে-মিনিটে জন্ম ও অবলুপ্তির এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা। এই ধারা আবার কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিয়মের অধীন...। জগতে কেবল-যে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই তা-ই নয়, চিরস্থায়ী কোনো সত্তাও নেই কোথাও। অতএব আত্মিক বা বস্তুগত এমন কোনো পদার্থই নেই।'*

বুদ্ধদেব জগতের সবকিছুকেই গণ্য করতেন নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থায় আছে বলে। 'ধর্ম' (মানুষের ইন্দ্রিয়বোধের অতীত সূক্ষ্ম কণাসমূহ)—যা নানারূপ সংযোগ-নিয়োগের ফলে বস্তুগত ও আত্মিক পদার্থসমূহ গঠন করে—তা নিয়ত গতিশীল এবং এক অন্তহীন যোগ-বিয়োগের বিভিন্ন ছকমাত্র।

বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি অবশ্য 'চতুর্মহাসত্য' সম্বন্ধীয় শিক্ষা। লোকশ্রুতি অনুযায়ী এই চারটি 'সত্য' বিবৃত করেছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশে। এইসব 'সত্য'এর স্বরূপনির্ণয় করতে গিয়ে বুদ্ধদেব মানব-অস্তিত্বের স্বরূপ ও মানুষের দুঃখকষ্টের কারণসমূহ নিরূপণ করেছেন এবং পথনির্দেশ করেছেন মানবমুক্তির। সমগ্রভাবে বিচার করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বুদ্ধের এই প্রধান ধর্মোপদেশের অন্তঃসারই ছিল মানবমুক্তির পথ সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাটি। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, বুদ্ধদেব নাকি বলেছিলেন যে সমুদ্রের জলের স্বাদ যেমন নোনা, তেমনই তাঁর ধর্মশিক্ষায় 'মুক্তির স্বাদ' ছাড়া অন্যকিছু নেই। বুদ্ধদেব মানুষের জীবনকে বলেছেন দুঃখময়, পার্থিব অস্তিত্ব ও তার আনন্দ-সম্ভোগের প্রতি আকুল আগ্রহ থেকে যার উৎপত্তি। এ-কারণেই তিনি মানুষের কাছে আহ্বান জানান কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে এবং তাদের সামনে তুলে ধরেন মুক্তির পথের নিশানা। এই মুক্তিপথের সন্ধান জানলে মানুষ কর্মবাদ উপেক্ষা করতে পারে এবং সত্য কী তা না-জানার জন্যে সে পুনর্জন্মের যে-চক্রে আবর্তিত হতে থাকে তা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। বৌদ্ধ সঙ্ঘে যে যোগ দেবে সে 'নির্বাণ' লাভেও সমর্থ হবে, অবশ্য যদি সে জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে ও সকল প্রকার দুঃখকষ্ট ও কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, অবদমিত করতে পারে নিজের অহংকে এবং দেহ ও আত্মার দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়।

* ফ. ই. শ্চের্‌বাত্‌স্কয়॥ পরবর্তী যুগের বৌদ্ধদের ধর্মশিক্ষায় নিহিত জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যা (রুশ ভাষায় লিখিত) ॥ সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯০৯। দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা

বৌদ্ধ ধর্মমত অনুযায়ী, নির্বাণপ্রাপ্তির অবস্থায় নিয়ত পরিবর্তনশীল ধর্মগুলির গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, ফলে নতুন-নতুন সংযোগ-বিয়োগের স্রোতও যায় রুদ্ধ হয়ে। এর ফলে ঘটে 'সংসার'এর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, অর্থাৎ এক শরীরী সত্তা থেকে অপর সত্তায় সংক্রমণ যায় বন্ধ হয়ে এবং বস্তু-পদার্থের জগতের সঙ্গে ঘটে ছেদ। পরবর্তী পুনর্জন্ম-চক্রের শৃঙ্খল অবলোপের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্বাণপ্রাপ্তিকে বৌদ্ধধর্মে দেখানো হয়েছে ভক্তদের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত এক চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে। মানুষের আদর্শ হলেন 'অর্হন্ত্' বা সেই মহাপুরুষ, যিনি নিজ সৎ কর্ম ও আত্মিক সম্পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন।

অতএব বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষায় মানুষের নৈতিক দিকটির ওপর-যে অতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হবে এটি কোনো আপতিক ব্যাপার নয়। মানুষের আচার-আচরণের নৈতিক দিকটি এই শিক্ষায় স্বভাবতই বিশেষ একটি স্থান অধিকার করতে বাধ্য। বুদ্ধদেব মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'অষ্টমুখ মার্গ' অনুসরণ করতে, চর্চা করতে সঠিক মতামত, সঠিক আচরণ, সঠিক প্রয়াস, সঠিক বাক্য, সঠিক চিন্তার, ইত্যাদি। উপরোক্ত এই নীতিগুলিই ছিল বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতার অন্তঃসার। বুদ্ধদেবের শিক্ষা অনুযায়ী, মানুষ এই সঠিক পথের যথাযোগ্য অনুসরণকালে সম্পূর্ণভাবে নিজের ওপরই নির্ভর করবে, বাইরে থেকে নিরাপত্তা, সাহায্য ও মুক্তিলাভের প্রত্যাশী হবে না। 'ধম্মপদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মানুষ স্বেচ্ছায় অন্যায় করে, পাপকাজ করে, স্বেচ্ছায় নিজের অধঃপতন ঘটায় সে। আবার স্বেচ্ছায় মানুষ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে, নিজেকে শোধন করাও তার ইচ্ছাধীন। একজন মানুষ কখনোই অপরকে সংশোধন করতে পারে না।'

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যিনি নাকি মানুষ সহ জগতে সবকিছুর জন্মদাতা, মানুষের ভবিতব্য যাঁর ওপর নির্ভরশীল, সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপরিহার্য বলে মনে করতেন না বৌদ্ধরা। শোনা যায় বুদ্ধদেব নাকি বলতেন, যে-সমস্ত মানুষ এমন ধরনের দেবদেবীতে বিশ্বাসী তাঁদের জীবনে ইচ্ছা এবং প্রয়াস বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই, তাঁরা কোনোকিছু করার কিংবা কোনোকিছু করা থেকে বিরত থাকার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। অপরপক্ষে ব্রহ্মণ্যধর্ম অনুযায়ী, মানুষের জীবন ও তার ভবিতব্য সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় দেবদেবীদের ইচ্ছানুসারে, দেবতারাই মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন।

যদিও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছে যে জন্মকালে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘের গণতান্ত্রিক চরিত্রও এই মতের পরিপোষক, তবু কোনোদিক থেকেই বৌদ্ধধর্মকে আমূল সংস্কারকামী সামাজিক আন্দোলন বলা যায় না। বৌদ্ধধর্মের উপদেশাবলীতে সকল জাগতিক দুঃখকষ্টের বোঝা, পার্থিব জ্বালা-

যন্ত্রণা ও সামাজিক অন্যায়ের কারণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে মানুষের নিজস্ব ‘অন্ধতা’কে এবং পার্থিব বাসনা-কামনা নির্বাপণে মানুষের অসামর্থ্যকে। বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, জাগতিক দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করতে হয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং উল্টো, বহির্জগতের ব্যাপারে সকল প্রতিক্রিয়াকে নির্বাপিত করে, অহং সম্বন্ধে মানুষের সকল সচেতনাকে বিনষ্ট করে।

বুদ্ধ শব্দের অর্থ ‘প্রজ্ঞাবান’ বা ‘জ্ঞানী’ অথবা ‘যিনি সত্যকে উপলব্ধি করেছেন’। লোকশ্রুতি অনুসারে, গৌতম সিদ্ধার্থ গয়া শহরের কাছে এক অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে ধ্যানমগ্ন থেকে ‘প্রজ্ঞা অর্জন’এর পর বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। সিদ্ধার্থ ছিলেন শক্তিশালী শাক্য উপজাতির প্রধানের পুত্র, কিন্তু ধন-ঐশ্বর্য ও পার্থিব জীবন সম্ভোগের আনন্দ প্রত্যাখ্যান করে সন্ন্যাসী হয়ে যান তিনি। গোড়ার দিককার যে-সমস্ত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের পুথি এখনও পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে তাতে বৌদ্ধধর্মের এই প্রতিষ্ঠাতার জীবনকথার অনেক উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক উপাদান হল খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীতে পাথরে উৎকীর্ণ লিপিগুলি। এগুলিতে শুধু-যে বুদ্ধের নামোল্লেখ আছে তা-ই নয়, তাঁর জন্মস্থান (লুম্বিনী) পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে। ধর্মীয় পুথিপত্রে উল্লিখিত তথ্যের সঙ্গে এইসব তথ্য মিলে যায়।

বুদ্ধদেবের ইতিহাসসিদ্ধ তথ্যপ্রমাণ নিয়ে সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল বিতর্ক চলেছে। বুদ্ধদেবের নিজের প্রচারিত আদি ধর্মশিক্ষা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পর্যন্ত চলেছে। এ-সমস্ত সমস্যার সমাধান অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষ করে যদি আমরা মনে রাখি যে আজকের দিনে পণ্ডিতদের বিচারের জন্যে যে-সমস্ত ধর্মীয় পুথিপত্র পাওয়া যায় সেগুলি আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর, তার আগেকার নয় (লোকশ্রুতি অনুযায়ী, এগুলি পুথির আকারে লিখিত হয়েছে আরও পরে—৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে, শ্রীলঙ্কায়), অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতার প্রয়াণের কয়েক শো বছর পরে। বর্তমানে বুদ্ধদেবের প্রয়াণের সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য তারিখ হল খ্রীস্টপূর্বাব্দ ৪৮৩ সন (এবং তাঁর জন্মের তারিখ খ্রীস্টপূর্বাব্দ ৫৬৩ সন)।

অজীবিকদের ধর্মশিক্ষা

গোড়ার দিকে বৌদ্ধদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন অজীবিকরা। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে অজীবিকবাদের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় সর্বোপরি ব্রহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে গোসলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মের অবিচল ও মৌল সমালোচনা দিয়ে। ব্রাহ্মণদের রক্ষণাধীন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণের অসন্তোষ বহুব্যাপক সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে সংস্কার-ভিত্তিক

ধর্মান্দোলনের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে। সমাজে জাতিভেদের কাঠামো ও ব্রাহ্মণদের কর্মবাদ-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে গোসলা-প্রচারিত সমালোচনা কেবল-যে সমাজের নিচু স্তরগুলির মানুষজনকেই আকর্ষণ করল তা নয়, কারুশিল্পী ও বণিকদের যে-সমস্ত ছেলেপিলে দরিদ্র-ঘরে জন্ম নেয়া সত্ত্বেও পরে নিজ-নিজ চেষ্টায় অর্থসঞ্চয় করে নতুন বিত্তবান হয়ে উঠেছিলেন আকর্ষণ করল তাঁদেরও। একেবারে গোড়া থেকেই গোসলা তাঁর ধর্মপ্রচার কোনো সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না-রেখে বরং বেশি করে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গৃহী শিষ্যদের মধ্যে। গোসলার প্রচারিত আপাতদৃষ্টিতে সরল তাঁর ধর্মমত (সবকিছু ভাবনাচিন্তা ও ধ্যানধারণাকে শেষ পর্যন্ত সর্বব্যাপী ও পূর্বাহ্নে-স্থিরীকৃত নিয়তির এবং এই পূর্ব-নির্ধারণের উৎস অদৃষ্টবাদের অধীন করে ফেলা) বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলল এবং তাঁর গৃহী শিষ্যরা (অজীবিকদের ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করার পরেও) প্রাত্যহিক জীবনে আগের মতোই প্রচলিত পূজাপার্বণ মেনে ও জগৎ, ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐতিহ্যসিদ্ধ পুরনো বহু ধ্যানধারণা নিয়েই জীবনযাপন করতে লাগলেন। গোড়ার দিকে (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে) বৌদ্ধদের চেয়ে অজীবিকদের শিষ্য-সংখ্যা বেশি ছিল বলে মনে হয়। সম্ভবত এর সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে অজীবিকদের খোলাখুলি গুরুত্ব আরোপের ব্যাপারটি সম্পর্কিত। লোকশ্রুতি থেকে যা জানা যায় তাতে এটাও খুবই স্বাভাবিক ঠেকে যে অজীবিক-ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কেবল-যে ধনী বণিক-সম্প্রদায় ও কারুশিল্পীদের প্রতিনিধিরাই ছিলেন তা নয়, সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরগুলিতেও, বিশেষ করে কুম্ভকারদের মধ্যে, এই ধর্মমতটি রীতিমতো জনপ্রিয় ছিল। এই তথ্যটির সঙ্গে 'বায়ু-পুরাণ'এ (এই পুঁথিটি শেষপর্যন্ত সংকলিত হয় খ্রীস্টাব্দ তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীব মধ্যে কোনো সময়ে, যদিও এতে উল্লিখিত ঘটনা ও সামাজিক প্রথাসমূহ অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী কোনো এক যুগের) বিবৃত একটি তথ্যের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। তথ্যটি এই যে অজীবিক-ধর্মের অনুসারীরা ছিলেন শূদ্র ও বিভিন্ন নিচু জাতের লোক, এমন কি অস্পৃশ্যরাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। নতুন-নতুন শিষ্য সংগ্রহের জন্যে বৌদ্ধ ও অজীবিকরা নিজেদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতা চালাতেন। কাজেই বৌদ্ধ সূত্রসমূহে গোসলা ও তাঁর ধর্মমতকে-যে বিশেষরকম কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হবে এটা মোটেই বিস্ময়জনক নয়। তাঁদের মধ্যে তত্ত্বগত বিতর্ক কখনও-কখনও খোলাখুলি সংঘর্ষে পর্যন্ত পরিণত হোত। সুপরিচিত বৌদ্ধ গ্রন্থকার অশ্বঘোষ কোশল-রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীপুরের অধিবাসী মিগর নামে এক ধনী কুসীদজীবী সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটিতে বলা হয়েছে যে মিগর বহুদিন ধরে অজীবিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ওই সম্প্রদায়কে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়ে সাহায্য

করতেন। পরে মিগর যখন স্থির করলেন যে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করবেন তখন এককালে তাঁর সাহায্যপুষ্ট অজীবিকরা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই তার বাড়ি ঘেরাও করলেন। স্পষ্টতই, তাঁদের একজন সতীর্থকে হারাতে বসেছেন বলে যে তাঁরা অতটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, বরং বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে মিগর তাঁদের যে বৈষয়িক সাহায্য দিচ্ছিলেন তা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনাতেই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা।

পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে গোসলাকে একজন জেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যিনি নদীর মোহানায় জাল পেতে রেখে অসংখ্য মাছ ধরে চলেছেন (অর্থাৎ, সেই সমস্ত মানুষজনকে পাকড়াও করছেন যারা নাকি বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ীদের দল ভারি করতে পারত)। এই উক্তিটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে উপরোক্ত এই দুটি ধর্মমতের মধ্যে কেবল-যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তা-ই নয়, ওই সময়ে অজীবিক-ধর্মের জনপ্রিয়তাও ছিল প্রচুর।

যদিও খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অজীবিকরা যথেষ্ট, এমন কি বৌদ্ধ কিংবা জৈনদের চেয়েও বেশি জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন, তবু পরবর্তী কালে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণামে জয়লাভ ঘটে বৌদ্ধদের। এর একটা কারণ মনে হয় অজীবিকদের ধর্মমতে এক ধরনের একদেশদর্শিতার অস্তিত্ব। যদিও অজীবিকরা ঐতিহ্যসিদ্ধ ব্রহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবু বৌদ্ধধর্মের মতো ওই যুগের মানুষের সামনে ব্রহ্মণ্য মতাদর্শকে প্রতিহত করার উপযোগী জীবনযাপনের প্রধান-প্রধান সমস্যার কোনো অস্ত্যর্থক উত্তর তাঁরা উপস্থাপিত করতে পারেন নি। মনুষ্যজীবনের তাৎপর্য, জগতে ও সমাজে মানুষের সুনির্দিষ্ট স্থান, ব্যক্তিগত প্রয়াসের মূল্য এবং কোন নীতিসমূহ 'সঠিক আচরণের' ভিত্তি হওয়া উচিত তা নিয়ে গোসলার ধর্মশিক্ষায় সত্যিকার কোনো আলোচনা ছিল না, অথচ এই সমস্ত সমস্যা ও তাদের সমাধান বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছে ছিল প্রভূত আগ্রহের বিষয়। অজীবিক-ধর্মে প্রচারিত 'সর্বব্যাপী নিখিল পূর্ব-নির্ধারণ' বা 'নিয়তি'ই নীতিগতভাবে উপরোক্ত সমস্যাদির বিবেচনা অসম্ভব করে তুলেছিল।

ধর্মীয়-দার্শনিক ভাবধারাসমূহ ও মেগাস্থেনিসের বিবরণী

মগধ ও মৌর্য-রাজ্যগুলিতে ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান দিয়েছেন সেল্যুকস-বংশীয়দের রাজ্যের রাষ্ট্রদূত মেগাস্থেনিস। মেগাস্থেনিস ও তাঁর পরবর্তী ধ্রুপদী ইউরোপীয় ইতিবৃত্তকাররা ওই সময়কার রক্ষণশীল ও অ-রক্ষণশীল চিন্তাধারাগুলির মধ্যে যথাযোগ্য ফারাক টেনেছেন এবং প্রাচীন ভারতীয় 'দার্শনিকদের' ভাগ করেছেন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই দুই দলে।

স্ট্রাবো'র লেখা শ্রমণদের সম্বন্ধে বিবরণীর সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় পুথিপত্রের বিবরণীর ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষ্য করা যায়। মেগাস্থেনিসের মতো স্ট্রাবোও রাজাদের সঙ্গে শ্রমণদের সম্পর্কের ব্যাপারটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন যে চারপাশে যে-সমস্ত ব্যাপার ঘটছে তার অন্তর্নিহিত কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে রাজারা শ্রমণদের শরণ নিতেন (ভারতীয় বিবরণীগুলির সঙ্গে এ-ব্যাপারে স্ট্রাবো, ইত্যাদির বিবরণীর ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষণীয়)।

স্ট্রাবো বিশেষ ধরনের একদল শ্রমণের কথা লিখেছেন যাঁরা সেকালে জ্যোতিষী ও ঐন্দ্রজালিক হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন এবং তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে গ্রামে-গ্রামে ও শহরে-শহরে পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন (এই বর্ণনাটি অজীবিকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় জ্যোতিষী বলে কথিত ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী-দলগুলির উল্লেখ বলে মনে হয়)।

স্ট্রাবো'র লেখা অপর একটি বর্ণনাও শ্রমণদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। এটি হল 'প্রমনাই' সম্পর্কে (খুব সম্ভব এটি 'শ্রমণ'দেরই নামান্তর) তাঁর বিবরণী। স্ট্রাবো লিখছেন যে 'প্রমনাই'রা ব্রাহ্মণদের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের ছিলেন, বিতর্ক ও মতখণ্ডনের প্রবণতা সহ তাঁরা ছিলেন এক বিশেষ ধরনের দার্শনিক। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পর্যালোচনা-রত ব্রাহ্মণদের এই দার্শনিকরা ব্যঙ্গ করতেন অহঙ্কারী ও যুক্তির ধার ধারে না এমন মানুষ বলে। স্ট্রাবো'র এই কথাগুলি ওই সময়কার সামাজিক আবহাওয়ার চমৎকার যথাযথ এক প্রতিফলন। কেননা ওই সময়ে তথাকথিত শ্রমণ-মতবাদসমূহ সমাজে আবির্ভূত হচ্ছিল এবং সেগুলি ছিল ব্রাহ্মণদের ও তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে সন্দিহান ও জগৎ ও মানুষের অস্তিত্ব-সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন নিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নানাবিধ বিতর্কে সেগুলি সর্বদা জড়িত থাকত। শ্রমণ অথবা 'বিধর্মী'রা সত্যিই ব্রাহ্মণদের থেকে নিজেদের পৃথক করে তুলেছিলেন, ব্রাহ্মণদের তাঁরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করতেন এবং তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কিত তত্ত্বকে খণ্ডনে প্রবৃত্ত হতেন।

শ্রমণরা ব্রাহ্মণদের দাম্ভিক আচরণের প্রতিবাদ করতেন, গোটা সমাজকে উপদেশ দেবার এবং সকল মানুষকে সত্যের পথে পরিচালনার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের তথাকথিত অনন্য অধিকারের বিরোধিতা করতেন তাঁরা। বৌদ্ধ পুথিগুলিতে ব্রাহ্মণদের এই ধরনের দাবিদাওয়াকে প্রায়ই ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা, ইত্যাদি আখ্যা দেয়া হোত।

ইউরোপীয় ধ্রুপদী ইতিবৃত্তকারদের রচনাবলীতে খুব সম্ভবত মেগাস্থেনিসের বিবরণী-থেকে-পাওয়া এইমর্মে একটি বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে শ্রমণদের মধ্যে এমন কিছু-কিছু সন্ন্যাসী-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল যারা বস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল

(এই তথ্যটির সঙ্গে খুব সম্ভব 'দিগম্বর'-সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন যাঁরা উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের সম্পর্ক আছে মনে হয়)।

যথাযথভাবেই মেগাস্থেনিস তৎকালীন ভারতে মতাদর্শগত অবস্থার বিশেষ কিছু-কিছু দিকের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। যথা, রক্ষণশীল ও তার বিরোধী সংস্কারবাদী (বা শ্রমণ-) ধর্মশিক্ষার মতো মূল দুটি মতাদর্শগত ধারার অস্তিত্ব এবং এই শেষোক্ত ধারার অন্তর্ভুক্ত বহুবিধ সম্প্রদায়গত মতবাদের উপস্থিতি। অবশ্য এটা স্পষ্ট যে সেল্যুকস-বংশীয় রাজ্যের এই রাষ্ট্রদূত যখন ভারতে বাস করছিলেন তখনও পর্যন্ত ব্রহ্মণ্যধর্ম দেশে প্রবল প্রতাপশালী ছিল, অন্যদিকে এই ধর্মের বিরোধী শ্রমণ-সম্প্রদায়গুলি তখনও যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জনের মতো অবস্থায় আসে নি। বস্তুত সংস্কার-ভিত্তিক ধর্মীয় মতবাদগুলির মধ্যে একটিও তখনও পর্যন্ত বিকাশের এমন স্তরে পেঁছয় নি যে বিদেশীর চোখে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী বলে বিশেষভাবে প্রতিভাত হতে পারে। অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে মেগাস্থেনিসের বিবরণীর যে-সমস্ত খণ্ডাংশ আমাদের হাতে এসে পেঁছেছে তা থেকে মোটেই কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় এবং এ-ও সম্ভব যে মৌর্য-যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে ধর্মীয় জীবনযাত্রার বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল।

কুশান ও গুপ্ত-যুগে ভারত

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ভারত

মৌর্য-সাম্রাজ্যের আমলের শেষদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু অঞ্চল তখনই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনের আওতা থেকে কার্যত স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এইরকম কয়েকটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ভূখণ্ডে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেন কয়েকজন ছোটখাট ইন্দো-গ্রীক রাজা। এই সমস্ত রাজার শাসনকাল সম্বন্ধে কেবল টুকরোটাকরা কিছু বিবরণীমাত্র পাওয়া যায়।

উপরোক্ত এইসব ইন্দো-গ্রীক রাজাদের মধ্যে একজনের নাম সেকালেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ইনি হলেন মেনাণ্ডার। ভারতীয় ইতিবৃত্তে ইনি পরিচিত হন মিলিন্দ নামে। বৌদ্ধ পুথি 'মিলিন্দ-পহ্‌'তে (খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত) রাজা মিলিন্দ ও বৌদ্ধ দার্শনিক ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে এক বিতর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়! মেনাণ্ডারের রাজত্বকালের কিছু-কিছু মুদ্রায় চক্র বা বৌদ্ধ রাজশক্তির প্রতীক-চিহ্ন মুদ্রিত আছে, তা থেকে মনে হয় এই রাজা হয় নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আর নয়তো বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মেনাণ্ডারের রাজ্যের রাজধানী ছিল সাগালা (বা আধুনিক শিয়ালকোট)। গান্ধার, আরাকোসিয়া ও পঞ্জাবের কিছু-কিছু অংশ ছিল এ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আগেই বলা হয়েছে যে যতদূর অনুমিত হয় মেনাণ্ডারের রাজত্বকালে গ্রীক সেনাবাহিনী পূর্ব ভারতে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সে-সময়ে মগধের রাজশক্তিতে আসীন শুঙ্গ-রাজবংশের রাজধানী পাটলিপুত্রের দ্বারদেশে পেঁছয়।

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শক নামের ইরানীয় উপজাতি-গোষ্ঠীগুলি (চীনা আকর-সূত্রে সাই উপজাতি-গোষ্ঠীসমূহ নামে উল্লিখিত) মধ্য-এশিয়া থেকে অগ্রসর হতে-হতে শেষপর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে। গোড়ার দিকে শকরা ইন্দো-গ্রীক রাজ্যগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে আসার পর এই শেষোক্ত রাজ্যগুলির অধীনতা স্বীকার করে, কিন্তু পরে তারা প্রতিষ্ঠা করে নিজেদেরই বহুবিধ ইন্দো-শক রাষ্ট্র। এই সমস্ত ইন্দো-শক রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজাদের একজন রাজা মউয়েস খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে রাজত্ব করতেন বলে মনে হয়। ইনি নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন গান্ধারে, তবে এঁর রাজ্য সোয়াত উপত্যকা এবং সম্ভবত কাশ্মীরের অংশবিশেষ জুড়েও প্রসারিত ছিল। এঁর

উত্তরাধিকারী আজেস তাঁর রাজ্যের সীমানা আরও বাড়িয়ে তোলেন এবং নিজেই উপাধি গ্রহণ করেন 'মহারাজাধিরাজ'। আরাকোসিয়ার অংশবিশেষও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ওই অঞ্চলে ইন্দো-পার্থিয়ান রাষ্ট্রসমূহেরও আবির্ভাব ঘটে এবং এই রাজ্যগুলিকে ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-শক রাজাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালাতে হয় প্রাধান্যবিস্তারের জন্যে। অতঃপর ইন্দো-পার্থিয়ান রাজা গোন্ডোফারেস গান্ধার, আরাকোসিয়া এবং প্রায়শই যাকে 'শকস্তান' বা শকদের বাসভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই দ্রান্‌গিয়ানার (বা আধুনিক সেইস্তানের) অংশবিশেষের ওপর আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ হন।

কুশান-সাম্রাজ্যের পত্তন

কুশানদের শাসনাধীনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে খণ্ডবিখণ্ড ছোট-ছোট রাষ্ট্রের জায়গা নেয় প্রকাণ্ড এক সামাজ্য, যার অন্তর্ভুক্ত হয় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলগুলিই শুধু নয়, মধ্য-এশিয়ারও নানা অঞ্চল এবং বর্তমান পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ভূখণ্ডও।

গোড়ার দিকে মধ্য-এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ব্যাক্‌ট্রিয়ার অংশবিশেষও কুশান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীনা আকর সূত্রগুলি অনুযায়ী খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচ্যদেশ থেকে ইউয়েহ্‌-চি নামের উপজাতি-গোষ্ঠীগুলি ব্যাক্‌ট্রিয়া আক্রমণ ক'রে অধিকার করে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা করে পাঁচটি রাজ্য। পরে, চীনা ইতিবৃত্তে কুয়েই-শুয়াং নামে উল্লিখিত কুশানরা সেখানে অন্যদের ওপর আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ হয়। ইউরোপীয় ধ্রুপদী ইতিবৃত্তকাররাও প্রাচ্যদেশ থেকে আগত উপজাতিদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ব্যাক্‌ট্রিয়া জয় করে নেয়।

স্ট্রাবো বলেছেন, উপরোক্ত ওই সমস্ত উপজাতি ব্যাক্‌ট্রিয়া জয় করে নেয় গ্রীকদের কাছ থেকে। কুশান-উপজাতিরা যখন ব্যাক্‌ট্রিয়া আক্রমণ করে তখন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সু-উন্নত সংস্কৃতির ঐতিহ্য সহ ব্যাক্‌ট্রিয়া ছিল অত্যন্ত উন্নত একটি দেশ। ওখানকার লোকে তখন কথা বলত ব্যাক্‌ট্রীয় ভাষায় (সে-ভাষা ছিল ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত) এবং গ্রীক লিপি থেকে উদ্ভূত একটি লিপিও ছিল তাদের। সুস্থিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ব্যাক্‌ট্রীয়দের উপরোক্ত এই সমস্ত ঐতিহ্য গ্রহণ করে নিয়েছিল কুশানরা, তবে তখনও পর্যন্ত কুশান-সংস্কৃতির বিকাশে তাদের নিজেদের যাযাবর উপজাতিসুলভ ঐতিহ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান যুগিয়ে চলেছিল। এই কুশানদের উৎপত্তি-সম্পর্কিত প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে এবং এ-নিয়ে পণ্ডিত-মহলে তুমুল বিতর্কও চলেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এ-ব্যাপারে নানা ধরনের প্রমাণসাপেক্ষ মতের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন বলা হচ্ছে, ইউয়েহ্-চি'রা অভ্যন্তরীণ এশিয়ার 'তোখারি' নামের উপজাতিদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তারা ব্যাক্ট্রিয়া জয় করার পর তাদের নিজেদের ভাষা বর্জন করে। অপরপক্ষে এরকম মতও প্রকাশ করা হচ্ছে যে কুশান উপজাতির উৎপত্তি ঘটেছিল ব্যাক্ট্রিয়া থেকেই (এই মত অনুসারে, কুশানদের সঙ্গে ইউয়েহ্-চি'দের সম্পর্কের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে)। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষে জনেক কুশান-রাজা হেরায়ুস তাঁর প্রচলিত ওই যুগের কিছু-কিছু মুদ্রায় নিজেকে কুশান হেরায়ুস বলে আখ্যাত করেছেন।

কুশান-রাজ কুজুলা কাদ্ফিসেস'এর আমলে (চীনা ইতিবৃত্তে ইনি 'চ'ইউ-চিউ-চুচ' নামে উল্লিখিত) কুশান-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় আরাকোসিয়া, কাশ্মীরের একটা অংশ এবং পার্থিয়ার কিছু-কিছু অঞ্চল। কাদ্ফিসেসের রাজত্বকালের বহুসংখ্যক মুদ্রা কাবুলের চারপাশের অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। এ-থেকে বোঝা যায় এই এলাকাটিও সে-সময়ে কুশান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোড়ার দিকে কাদ্ফিসেসকে মেনে নিতে হয়েছিল তৎকালীন ইন্দো-গ্রীক রাজাদের কর্তৃত্ব: তাঁর আমলের কিছু-কিছু মুদ্রার একপিঠে ইন্দো-গ্রীক রাজা হের্মিউসের প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে আর মুদ্রার অপরপিঠে খোদাই করা আছে খরোষ্ঠী লিপিতে কাদ্ফিসেসের নাম। পরে অবশ্য কাদ্ফিসেস পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হন, ফলত তাঁর সেই সময়কার মুদ্রায় আছে কেবলমাত্র 'রাজাধিরাজ' কাদ্ফিসেসেরই নাম। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কাদ্ফিসেস বা ভীম কাদ্ফিসেসের রাজত্বকালে সিন্ধুনদের নিম্নাঞ্চলের কিছু-কিছু অংশবিশেষ তখনই কুশান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিল। এছাড়া কুশানরা ওই সময়ে আরও পূর্বাঞ্চলে অনুপ্রবেশেও সমর্থ হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁরা তখন পূর্ব ভারতের কিছু-কিছু ভুখণ্ডের ওপর, এমন কি বারাণসী পর্যন্তও আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভীম কাদ্ফিসেস এক গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা-সংস্কারও সাধন করেন। তিনি কুশান-সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে রোমান স্বর্ণমুদ্রা 'অ্যুরেই'-এর সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ঘটান। এই কাজটিকে সম্ভবত রোমান প্রভাবের ফল বলা যেতে পারে। পুরোপুরি ভারতীয় ভূখণ্ডসমূহ অধিকার করার ফলে কুশান-রাজাদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে স্থানীয় রীতি-প্রথাকে মান্য করে চলা, ফলত গোটা সাম্রাজ্য জুড়েই রাষ্ট্র-পরিচালনব্যবস্থায় ওইসব রীতি-প্রথার প্রভাব অনুভূত হয়। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন ভীম কাদ্ফিসেসের রাজত্বকালে তাঁর প্রচলিত কিছু-কিছু মুদ্রায় দেবতা শিবের প্রতিকৃতি (কখনও-কখনও শিবের অন্যতম প্রধান অনুচর ও তাঁর বাহন পবিত্র ষণ্ড নন্দিন্ সহ) মুদ্রিত আছে।

কনিষ্ক

কুশান-সাম্রাজ্য তার ক্ষমতার চূড়া স্পর্শ করে কনিষ্কের রাজত্বকালে। কনিষ্ক প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে শ্রুতকীর্তি রাজাদের একজন। তাঁর আমলের মুদ্রা এবং অল্প কিছু উৎকীর্ণ শিলালিপির সাক্ষ্য ছাড়া কনিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে সন-তারিখযুক্ত অথবা সমকালীন সংবাদের সূত্র পাওয়া যায় সামান্যই। তবে পরবর্তী কালের বৌদ্ধ উপকথা ও কাহিনীর অনেকগুলিতে রাজা কনিষ্ক ও তাঁর কীর্তিকলাপের নানা উল্লেখ অবশ্য দুর্লভ নয়। কনিষ্কের আমলেই কুশানদের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রসারিত হয় সুদূর বিহারের একাংশে এবং মধ্য-ভারতে নর্মদা নদীর তীর পর্যন্ত।

আবার ওই কনিষ্কের রাজত্বকালেই কুশানরা তাঁদের রাজ্যের বিস্তার ঘটান সৌরাষ্ট্র ও কাথিয়াওয়াড়ে, তবে পশ্চিমের ক্ষত্রপরা (পশ্চিম ভারতের প্রদেশগুলির শাসকরা) কুশানদের আধিপত্য পুরোপুরি মেনে নেন নি। চীনা ইতিবৃত্তসমূহে বিবৃত হয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তানের অংশবিশেষের দখল নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে কুশানদের যুদ্ধের কথা। কিছু-কিছু আকর সূত্রে এমন ইঙ্গিত আছে যা থেকে মনে হয় কুশানদের সেনাবাহিনী উপরোক্ত ওই সমস্ত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত অনুপ্রবেশে সমর্থ হয়েছিল, তবে কুশান-রাজারা কতদিন পর্যন্ত ওই অধিকৃত অঞ্চল শাসনাধীনে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন তা জানা যায় না। যাই হোক তবু একটা ব্যাপার পরিষ্কার। তা হল এই যে রাজা কনিষ্কের আমলে কুশান-সাম্রাজ্য প্রাচীন জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির একটি হয়ে ওঠে, তা সমকক্ষ হয়ে ওঠে চীন, রোম ও পার্থিয়ার সাম্রাজ্যের। ওই সময়ে কুশান-সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোমের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে ইউরোপীয় ধ্রুপদী ইতিবৃত্তে সম্রাট ট্রাজান (খ্রীস্টীয় ৯৯ অব্দে)-এর রাজত্বকালে রোমে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাস ছিল বলে যে-উল্লেখ পাওয়া যায় তার সঙ্গে কুশান-সাম্রাজ্য সম্পর্কিত।

চীনা ও ভারতীয় আকর সূত্রসমূহে কনিষ্ককে বৌদ্ধধর্মের যথার্থ অনুসারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কাশ্মীরে বৌদ্ধ মহাসম্মেলন (তথাকথিত 'চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন') আহ্বানের ব্যাপারটিকে। এটা খুবই সম্ভব যে কনিষ্ক সত্যিই হয়তো বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ছিলেন, তবে তাঁর আসল রাষ্ট্রনীতি ছিল সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা। এর প্রমাণ মেলে তাঁর রাজত্বকালের মুদ্রাগুলি থেকে, কেননা সেইসব মুদ্রায় ভারতীয়, হেলিনিক ও জরথুস্ত্র-প্রবর্তিত ধর্মের দেবদেবীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত। কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম এমন কি রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদাও লাভ করে নি এবং তাঁর রাজত্বকালে

প্রচারিত বহুবিধ মুদ্রার মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটিতেই বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়।

এই সময়েই ব্যাক্‌ট্রীয় ভাষা রাজকার্যে ক্রমশ বেশি-বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তা গৃহীত হয় গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে; ব্যাক্‌ট্রীয় লিপিও বিকশিত হয়ে ওঠে এই সময়ে (গ্রীক লিপির ভিত্তিতে)। এমন কি মুদ্রা থেকেও খরোষ্ঠী লিপিকে উৎখাত করে ব্যাক্‌ট্রীয় লিপি। কয়েক বছর আগে ব্যাক্‌ট্রীয় লিপিতে লেখা কনিষ্কের রাজত্বকালের একটি উৎকীর্ণ প্রকান্ড শিলালিপি উত্তর আফগানিস্তানের সুর্‌খ-কোটালে পাওয়া যায়। এই শিলালিপিতে একটি মঠ-নির্মাণের, সম্ভবত কুশান-রাজবংশের একটি সমাধিস্থান নির্মাণেরই উল্লেখ দেখা যায়।

কুশান-সাম্রাজ্যের সঙ্গে জড়িত সমস্যাদির মধ্যে সবচেয়ে জটিল একটি প্রশ্ন হল কনিষ্কের রাজত্বের সন-তারিখের হিসাব সহ এই গোটা রাজত্বকালেরই কালপরম্পরা নির্ণয়। পন্ডিতেরা কনিষ্কের ক্ষেত্রে বহুবিভিন্ন সনের উল্লেখ করেছেন: যেমন, খ্রীস্টাব্দ ৭৮, ১০৩, ১১০, ১৪৪, ২৪৮ ও এমন কি ২৭৮ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ বলতে গেলে এই আনুমানিক তারিখগুলি ছড়িয়ে আছে গোটা দু'শতাব্দীর কালপর্যায় জুড়ে। বর্তমানে 'কনিষ্ক-যুগ'এর কালনির্ণয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রচেষ্টা হল ওই যুগটিকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে নির্দিষ্ট করা।

কনিষ্কের উত্তরাধিকারীরা ও কুশান-সাম্রাজ্যের পতন

কনিষ্কের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন হুবিষ্ক ও বাসুদেব। তাঁদের রাজত্বকালে কুশানরা বিশেষ নজর দিয়েছিলেন গাঙ্গেয় উপত্যকার ভারতীয় ভূখন্ডগুলির দিকে। কেননা উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে দখল অক্ষুণ্ণ রাখা তাঁদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছিল। ওই পর্যায়ে কুশানদের মধ্যে গভীরভাবে ভারতীয় বনে যাওয়ার একটা যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল, ভারতীয় আচার-আচরণ আয়ত্ত করছিলেন তাঁরা এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলছিলেন। রাজা বাসুদেব ছিলেন শৈব সম্প্রদায়ের অনুসারী। বাসুদেবের আমলের বহুসংখ্যক শিলালিপি মথুরার আশেপাশে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ-থেকে বোঝা যায় এই সময়ে মথুরা কুশান-সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ এক ভূমিকা পালন করছিল।

বাসুদেবের রাজত্বকালেই সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রচন্ড সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল পারস্যের সাসানিদদের প্রবল শক্তিশালী রাজ্য ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাথা-তুলে-দাঁড়ানো স্থানীয় নানা

রাজ্যের বিরুদ্ধে। কুশানরা বাধ্য হলেন মথুরার রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নাগ-বংশ ও কৌশাম্বীর রাজাদের স্বাধীনতা মেনে নিতে। মধ্য-ভারতের যে-সমস্ত অঞ্চল একদা সাম্রাজ্যের অধীন ছিল সে-সব অঞ্চলও তাঁদের ছেড়ে দিতে হল। তবে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সবচেয়ে সাংঘাতিক লড়াই চালাতে হল কুশানদের পারস্যের সাসানিদদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধের পর কুশান-স পশ্চিম অঞ্চলগুলি প্রথম শাহ্পুর (খ্রীস্টাব্দ ২৪১-২৭২)-এর অধীনে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। প্রথম শাহ্পুরের আমলের (২৬২ খ্রীস্টাব্দের) একটি বিখ্যাত উৎকীর্ণ লিপি—যার মধ্য-পারসিক, পার্হিয়ান ও গ্রীক এই তিন ভাষার তিনটি ভাষ্য এখনও পর্যন্ত টিকে আছে—তাতে ওই বিশেষ রাজাকে বলা হয়েছে 'পারসিক ও অ-পারসিকদের রাজাধিরাজ' এবং জানানো হয়েছে যে ওই রাজা সুদূর পুরুষপুর (পেশোয়ার) পর্যন্ত এবং একেবারে কাশ (কাশগর), সগ্দিয়ানা ও শাশ (তাসখন্দ)-এর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল কুশান-ভূমিরও অধিপতি ছিলেন। তবে, যতদূর মনে হয়, ওই সময়ে এই কুশান-ভূমির কোনো সাসানীয় অধিপতি নিযুক্ত হন নি। এর বেশকিছু পরে, একমাত্র চতুর্থ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে, অধীনস্থ কুশান-ভূখণ্ডগুলির সাসানীয় রাজপ্রতিনিধি শাসকরা বিশেষ ধরনের কুশান-সাসানীয় মুদ্রা তৈরি ও তার প্রচলন শুরু করেন।

কুশান-যুগের শেষের দিকে কুশানদের অধীনস্থ ভূখণ্ড বলতে ছিল একমাত্র গান্ধারের বিভিন্ন অঞ্চল। পরে কুশানদের অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় সবটাই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কুশান-যুগের দেবদেবী ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

প্রাচীন জগতের বহু অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কুশান-যুগ তার বিশিষ্ট ছাপ রেখে যায়। বহুবিচিত্র জাতি ও মানুষ কুশানদের এক ঐক্যবদ্ধ, অখণ্ড সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে একত্রিত হয়েছিল, ওই কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সর্বগ্রাহ্য নানা রীতি-প্রথা এবং কেবল যে ওই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা-ই নয়, যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল রোম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ও দূর প্রাচ্যের সঙ্গেও। কুশান-সংস্কৃতি পরিণত হয়ে ওঠে বহুবিচিত্র রীতি-প্রথা ও সংস্কৃতির সংশ্লেষণের ফলে, তবে তার মধ্যে সংরক্ষিত হয় নানা স্থানিক ভাবধারা ও প্রবণতাও। এমন কি সবসেরা ইউরোপীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্যও যৌথ উত্তরাধিকার হিসেবে গৃহীত হয়।

মধ্য-এশিয়ার সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদদের সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে উদ্ঘাটিত হয়েছে স্থানীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পধারার আঞ্চলিক বিকাশ-সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ

নানা উপাদান। কুশান-শিল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এক ভূমিকা পালন করে ব্যাক্‌ট্রীয় শিল্পধারা এবং সমগ্রভাবে কুশান-শিল্পের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করে।

কুশান-সাম্রাজ্যে জনসাধারণের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে কুশানদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে। এই যুগের বিভিন্ন মুদ্রার দৌলতে এ-ব্যাপারটি আমাদের কাছে সুপরিচিত।

বিশেষ করে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেলে কনিষ্ক ও হুবিষ্কের রাজত্বকালের মুদ্রাগুলি থেকে। এগুলিতে তিন ধরনের দেবদেবীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত—ইরানীয়, হেলিনিক ও ভারতীয়। ইরানীয় দেবদেবীর মধ্যে আছেন মিত্র দেবতা, উর্বরতার দেবী আর্দক্ষ, চন্দ্র-দেবতা (মাও), রণদেবতা ভেরেথ্রগ্ন এবং পরম দেবতা আহুরামাজ্‌দা। হেলিনিক দেবদেবীর মধ্যে আছেন হিফায়েস্‌টাস, সেলিনে, হেলিওস ও হেরাক্লিস। ভারতীয় দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছেন শিব, মহাসেন ও স্কন্দকুমার।

বহুবিচিত্র দেবদেবীর এই সমন্বয় সমগ্র কুশান-সাম্রাজ্যের সর্বগ্রাহ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গড়নেরই প্রতিফলন এবং সেইসঙ্গে তা পরিচয় দিচ্ছে কুশান-রাজাদের ধর্মীয় সহনশীলতার নীতির। এমন কি সাম্রাজ্যটির পতনের পরও প্রাক্তন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই সমস্ত সর্বগ্রাহ্য ঐতিহ্য ও সংযোগ-সূত্রের অনেকগুলিই টিকে যায়। কুশান-যুগের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রাচ্যের বহু জাতির পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে রেখে গিয়েছিল অনপনেয় প্রভাবের স্পর্শ।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের উত্থান

কুশান-সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘ একটা কালপর্ব জুড়ে রাজনৈতিক ভাঙচুরের যুগ চলে। এই অবস্থাটা টিকে থাকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত। অতঃপর নতুন এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য, গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গড়নের কাল শুরু হয়।

ওই সময় পর্যন্ত পশ্চিম পঞ্জাবের ছোট-ছোট এলাকা ছিল কুশান-রাজবংশের শাসনাধীনে; গুজরাট, রাজস্থান ও মালবে ক্ষত্রপরা রাজত্ব করছিলেন এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় কয়েকটি প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্র সহ বেশকিছু ছোট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। মগধে পরপর ক'টি রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটলেও তখনও তা উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছিল।

যেমনটা একবার ঘটেছিল মৌর্য-যুগে তেমনই আরও একবার খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের সূচনায় মগধ পরাক্রান্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ভিত্তি হিসেবে নতুন এক রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্র হয়ে উঠল। গুপ্ত-রাজবংশের প্রথম দিককার

রাজাদের সম্বন্ধে জানা যায় খুব অল্পই। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'রাজা' ও 'মহারাজা' উপাধিধারী শ্রী গুপ্ত, তবে গুপ্ত-যুগের কিছু-কিছু উৎকীর্ণ লিপি থেকে যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় রাজবংশটির আসল ইতিহাস শুরু হয়েছিল শ্রী গুপ্তের পুত্র রাজা ঘটোৎকচের আমল থেকেই। দুঃখের বিষয়, গুপ্তদের আদি রাজ্য ও তার সীমানার কথা জানা যায় না। কিছু-কিছু ইতিহাসবেত্তা মনে করেন যে মগধ-রাজ্যের সীমানাই ছিল ওই রাজ্যের সীমানা, আবার অন্যেরা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষকেও ওই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে থাকেন। এ-সমস্যার সমাধানে উপরোক্ত এই অনিশ্চয়তা উৎকীর্ণ লিপিগত যথাযথ তথ্যের অভাবেরই ফল। এ-সম্বন্ধে চীনা পরিব্রাজক ই ত্সিঙ্-এর বিবরণী এখনও পর্যন্ত পাওয়া প্রধান আকর সূত্রগুলির একটি।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সংহত করার কাজ শুরু হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে। এই রাজা আরও জমকালো 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। এ'র পুত্র সমুদ্রগুপ্তের নির্দেশে রচিত বিখ্যাত এলাহাবাদ-লিপিতে বলা হয়েছে যে প্রথমোক্ত রাজা ছিলেন 'লিচ্ছবি-কন্যা'র পুত্র, অর্থাৎ, এ-থেকে জানা যাচ্ছে যে চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী ছিলেন লিচ্ছবি নামের ক্ষত্রিয়-জাতির কন্যা। ইতিপূর্বের সেই মগধ-যুগ থেকেই লিচ্ছবিরা ছিলেন প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক জীবনে অন্যতম প্রধান শক্তি। মনে হয় গোড়ার দিককার গুপ্ত-রাজাদের আমল পর্যন্তও এই প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্র-জোটটির প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই লিচ্ছবিদের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধন গুপ্ত-বংশীয় রাজশক্তির ক্ষমতা সংহত করে তোলার ব্যাপারে নিশ্চয়ই বেশকিছুটা কাজে এসেছিল। লিচ্ছবিদের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে মৈত্রী-বন্ধনের এই উল্লেখ কেবল-যে সমুদ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ লিপিতেই পাওয়া যায় তা নয়, চন্দ্রগুপ্তের আমলের স্বর্ণমুদ্রায়ও রাজার পাশাপাশি তাঁর লিচ্ছবি-বংশীয়া রানীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে দেখা যায়। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে লিচ্ছবি-বংশীয়া কুমারদেবীর এই বিবাহ-বন্ধন কিছু-পরিমাণে ভূখণ্ডগত লাভেরও সুযোগ করে দেয়: সম্ভবত উভয় রাষ্ট্র একত্র মিলে গিয়ে গুপ্ত-রাজাদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ এক সাম্রাজ্যগঠনে সহায়ক হয়।

বলা হয় ৩২০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ও সেইসঙ্গে গুপ্ত-যুগেরও সূচনা। কিছু-কিছু পণ্ডিত অবশ্য ওই বছরটিকে সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণের বছর বলে গণ্য করেন।

সমুদ্রগুপ্ত এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সংহতি

সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অবশ্য আরও বিস্তারিত খবরাখবর পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের চমকপ্রদ দিগ্বিজয়ের প্রশস্তিকল্পে সভাকবি হরিষেণের রচিত

এলাহাবাদ-লিপিতে ওই রাজার হাতে পরাজিত রাজন্যবর্গ ও দেশসমূহের নামের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের (গাঙ্গেয় উপত্যকার) নয়জন ও দক্ষিণ ভারতের একাংশ দক্ষিণাপথের বারোজন রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বশীভূত করেন। আর্যাবর্তের ওই পরাভূত রাজ্যসমূহের শাসনাধীন ভূখণ্ডগুলি গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপরোক্ত লিপিতে নাগ-রাজবংশের দুই রাজা বা অহিচ্ছত্রের দুই নৃপতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া লিপিতে উল্লিখিত অন্যান্য বিজিত ভূখণ্ডের অবস্থান-যে কোথায় তা আজ সঠিকভাবে নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন, পণ্ডিত-মহলেও এ-প্রশ্নটি এখনও বিতর্কের বিষয়। সমুদ্রগুপ্তের সামরিক অভিযানগুলি সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর সাম্রাজ্যেরই সন্নিহিত, বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকার দেশগুলিতে। আলোচ্য লিপিতে গুপ্ত-রাজার 'আরণ্য-রাজ্যসমূহ' অধিকারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয় এই রাজ্যগুলি নর্মদা ও মহানদীর উপত্যকায় অবস্থিত ও উপজাতি-অধ্যুষিত ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণদেশ অভিযানও একই রকম সফল হয়েছিল। প্রথমে তিনি দক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্রকে পরাজিত করেন, তারপর গোদাবরী নদীর নিকটবর্তী বর্তমান ওড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলের রাজাদের বশ্যতাস্বীকার করানোর পর পরাস্ত করেন পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপকে। বিষ্ণুগোপের রাজধানী ছিল কাঞ্চী-নগরে। লিপিতে উল্লিখিত অপরাপর এলাকাগুলি অবশ্য সনাক্ত করা এখনও সম্ভব হয় নি।

দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না, তবে বিজেতা রাজাকে এদের অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ কর দিতে হোত। তা থেকে মনে হয় এদের গণ্য করা হোত বিজিত করদ ভূখণ্ড হিসেবে। এছাড়া পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু-কিছু প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রজোটও ছিল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের করদ ভূখণ্ড: যেমন, যৌধেয়, মালব, মাদ্রাজ ও অর্জুনায়ন নামের রাজ্যগুলি।

রাজা সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপদের এবং তখনও পর্যন্ত পশ্চিম পঞ্জাব ও আফগানিস্তানের কিছু-কিছু অংশের শাসনকর্তা কুশান-রাজবংশের পরবর্তী রাজাদের সম্পর্ক ছিল বেশ জটিল। এলাহাবাদ-লিপিতে ক্ষত্রপ ও কুশানদের ওপর গুপ্ত-রাজবংশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। মনে হয় উপরোক্ত এই সমস্ত ভূখণ্ডের ওপর সমুদ্রগুপ্তের কোনো এক ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে ঠিক ওই পর্যায়ে ক্ষত্রপরা ও কুশান-রাজারা তাঁদের স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নি।

এ-রহস্যের একটা আগ্রহোদ্দীপক চাবিকাঠি পাওয়া যায় এই ঘটনাটি থেকে যে খ্রীস্টাব্দ ৩৩২ থেকে ৩৪৮ এবং খ্রীস্টাব্দ ৩৫১ থেকে ৩৬০-এর বছরগুলিতে ক্ষত্রপদের নামাঙ্কিত মুদ্রা একেবারেই পাওয়া যায় না—যা থেকে মনে হয় এমন ইঙ্গিত মেলে যে অন্ততপক্ষে ওই সময়টায় ক্ষত্রপরা সাময়িকভাবে গুপ্তদের অধীনতা

স্বীকার করেছিলেন। আসলে ওই সময়ে পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপদের ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল গুপ্ত-রাজাদের মুদ্রা। পরে অবশ্য পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের সর্বাধিনায়ক তৃতীয় রুদ্রসেন তাঁর রাজ্যের পূর্বক্ষমতার পুনরুদ্ধার করেন কিছুদিনের জন্যে এবং তাঁর পরবর্তী সিংহসেন এমন কি 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি পর্যন্ত ধারণ করেন।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। লোকশ্রুতি অনুযায়ী সিংহলের রাজা মেঘবরণ (খ্রীস্টাব্দ ৩৫২-৩৭৯) সমুদ্রগুপ্তের কাছে রাজদূত পাঠিয়ে ভারতে সিংহলী ভিক্ষুদের জন্যে একটি মঠ নির্মাণের অনুমতি চেয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত অনুমতি দিয়েছিলেন তবে তা গোপনে এবং এর ফলে গয়ায় পবিত্র বোধিবৃক্ষের কাছে একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রাচ্যের অন্যতম সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে। এ-সাম্রাজ্যের প্রভাবও ছড়িয়ে পড়ে দিকে-দিকে এবং অন্য বহু রাষ্ট্রের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অতএব দেখা যাচ্ছে সভাকবি হরিষেণ যে তাঁর রাজার পরাক্রম ও শক্তি-সামর্থ্যের প্রশস্তি গেয়েছিলেন তা বিনা কারণে নয়। এলাহাবাদ-লিপির ভাষায়, রাজা সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন ত্রিভুবনজয়ী। প্রাচীন কালের সভাকবির এই রাজ-প্রশস্তি আধুনিক কালের বহু পণ্ডিতকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করতে ছাড়ে নি। এই শেষোক্তরা সমুদ্রগুপ্তকে আদর্শ রাজা বানিয়েছেন এবং ভিনসেণ্ট এ. স্মিথের মতো পণ্ডিত তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 'ভারতীয় নেপোলিয়ন', অর্থাৎ চমকপ্রদ গুণাবলীর অধিকারী অসামান্য এক ব্যক্তি বলে।

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

শিলালিপি ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ তথ্যের বিচারে বলতে হয় সমুদ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন ৩৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। অতঃপর সিংহাসনের অধিকারী হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন ৪১৩ কিংবা ৪১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। বিশাখদত্ত-রচিত নাটক 'দেবিচন্দ্রগুপ্তম' (এ-নাটকের খণ্ডিত অংশবিশেষমাত্র রক্ষিত হয়েছে) অনুযায়ী, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ভাই রামগুপ্তের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তবেই সিংহাসন লাভ করেন। নাটকটিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই সাফল্যের মূলে ছিল পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ। এই তথ্যটি উৎকীর্ণ লিপি ও মুদ্রা, পদক, ইত্যাদির প্রমাণ থেকেও সমর্থিত হচ্ছে। উৎকীর্ণ লিপিতে অবশ্য ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিভিন্ন স্তরের বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে এক জায়গায় উল্লেখ করা আছে যে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও সেনাপতিরা কার্যোপলক্ষে মালবদেশে সফর করেছেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সূচনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের

প্রচলিত মুদ্রা প্রবেশলাভ করেছিল পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের ভূখণ্ডগুলিতেও। এই মুদ্রাগুলি দেখতে ছিল যেন প্রাক্তন ক্ষত্রপ-শাসকদের প্রচলিত মুদ্রার মতো। মনে হয় এটা গুপ্ত-রাজার পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের ভূখণ্ডগুলি অধিকার ও তা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করারই লক্ষণ। এছাড়া পশ্চিমদেশে অভিযানকালে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল সহ পশ্চিম ভারতের আরও কিছু-কিছু এলাকা জয় করে নেন। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু বাণিজ্য-কেন্দ্রও গুপ্ত-রাজাদের অধিগত হয় এবং তাঁদের সংযোগ প্রসারিত হয় পাশ্চাত্যের বহু দেশ সহ সমুদ্রপারের দেশগুলিতেও।

রাজা চন্দ্রের নির্দেশে দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিটিকে ভিত্তি করে কিছু-কিছু ইতিহাসবেত্তা এমনও অনুমান করেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (এঁরা চন্দ্র ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন) তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা নাকি সুদূর বাল্‌খ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। তবে এই অনুমানের সপক্ষে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট প্রমাণ মেলে নি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পশ্চিম দাক্ষিণাত্য ও মধ্য-ভারত-জোড়া এক পরাক্রান্ত রাজ্য ভকতকদের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। তাই সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তোলার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর মেয়ের সঙ্গে ভকতক-বংশীয় রাজার বিয়ে দিয়ে ভকতকদের সঙ্গে বৈবাহিক-সম্বন্ধ পাকা করে তোলেন। নাগ-বংশীয়দের রাজ্যও ওই সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ও স্বাধীনতা কিছু-পরিমাণে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল, যদিও তাঁর উৎকীর্ণ লিপির ভাষ্য অনুযায়ী রাজা সমুদ্রগুপ্ত ইতিপূর্বেই ওই রাজ্যের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নাগ-বংশের প্রতিনিধি কুবেরনাগের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।) বোঝা যায় যে এই যোগাযোগের সূত্রেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভকতক ও নাগদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করেছিলেন পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে।

ওই যুগের মুদ্রা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে মুদ্রা-সংস্কার সাধিত হয়েছিল। তাঁর পূর্বপুরুষরা কেবলমাত্র ব্যবস্থা করেছিলেন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের, আর এ-সময়ে প্রচলন ঘটে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রারও। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে টাঁকশালে তৈরি রৌপ্যমুদ্রার উল্‌টোপিঠে পবিত্র গরুড়-পাখির প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে। এই গরুড়ের প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায় ওই সময়কার তাম্রমুদ্রাতেও। এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বৈষ্ণবধর্মের সমর্থক। এর প্রমাণ আরও মেলে এই রাজার নামের সঙ্গে যুক্ত অপর একটি বিশেষণ—পরমভাগবত (অর্থাৎ দেব ভাগবতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত) থেকে।

ভারতের ইতিহাসে রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজাদের একজন

হিসেবে আদৃত। ইতিহাসে তাঁর দ্বিতীয় একটি নামকরণ হয়েছে বিক্রমাদিত্য (অর্থাৎ সূর্যতুল্য পরাক্রমশালী)। ঐতিহ্য অনুসারে বহু প্রখ্যাত লেখক, কবি ও পণ্ডিতের নাম তাঁর রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত। আজকের দিনে ভারতীয় বিদ্বজ্জনের রচনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালকে প্রায়শই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলে উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪১৫ থেকে ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দব্যাপী তাঁর রাজত্বকালে অসামান্য গুরুত্বের কোনো ঘটনা ঘটতে দেখা যায় নি। কুমারগুপ্ত ছিলেন শৈব-ধর্মাবলম্বী। তাঁর রাজত্বকালের স্বর্ণমুদ্রায় ময়ূরবাহন দেব কার্তিকেয় (শিবের পুত্র)-র প্রতিকৃতি মুদ্রিত। আর রৌপ্যমুদ্রায় গরুড়ের পরিবর্তে মুদ্রিত ময়ূর।

কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শান্তি ভঙ্গ হল তাঁর মৃত্যুর অল্প পরেই। তাঁর উত্তরাধিকারী স্কন্দগুপ্তকে ওই সময়ে ভারত-আক্রমণকারী হূন ও এফ্‌থ্যালাইট উপজাতিদের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হতে হল।

হূন ও এফ্‌থ্যালাইট উপজাতিসমূহ এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন

উপজাতিদের এই জোটটি আগে বাস করত অভ্যন্তরীণ ও মধ্য-এশিয়ায়। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে এরা সাসানিদ-শাসিত পারস্য ও কুশান-বংশের শেষ রাজাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। গোড়ার দিকে এফ্‌থ্যালাইটরা একদা-পরাক্রান্ত কুশান-সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভূখণ্ডগুলিতে অবস্থিত ছোট-ছোট রাজ্যকে পরাজিত করে, পরে সাসানিদ-পারস্যের রাজাদের পদানত করে চমকপ্রদ সব যুদ্ধের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। এরও পরে তারা আক্রমণ করে উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং গান্ধার জয় করে নেয়। ওই সময়টাতেই (আনুমানিক ৪৫৭-৪৬০ খ্রীস্টাব্দে) গুপ্ত-রাজার সঙ্গে হূন ও এফ্‌থ্যালাইটদের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। গুপ্ত-যুগের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায় হূনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের বিজয়লাভের। যদিও গুপ্ত-রাজার এই সমস্ত সাফল্য ছিল স্বল্পস্থায়ী, তবু এইসব যুদ্ধজয়ের তাৎপর্য ছিল যথেষ্ট—বিশেষ করে যদি আমরা মনে রাখি এফ্‌থ্যালাইট-সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণের সময় কী মারাত্মক ধ্বংসের চিহ্ন পেছনে রেখে গিয়েছিল তার কথা। অন্যদিকে হূনদের পশ্চিমী বাহিনীগুলো রোমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটার-পর-একটা যুদ্ধে জয়ী হয়ে চলেছিল এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে চলেছিল পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল। হূন ইত্যাদির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হওয়ায় গুপ্ত-সাম্রাজ্যে আর্থিক টানাটানি দেখা দিয়েছিল; গুপ্ত-রাজা বাধ্য হয়েছিলেন মুদ্রা-নির্মাণে নিয়োজিত সোনার পরিমাণ

কমিয়ে দিতে এবং প্রচলিত প্রতিটি ধরনের মুদ্রার রকমফেরের সংখ্যাও হ্রাস করতে।

এর পরবর্তী সময়ে স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের প্রবল একটা প্রবণতা দেখা যায় এবং কেন্দ্র থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে কেন্দ্রীয় শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। যেমন, রাজা বুদ্ধগুপ্তের রাজত্বকালে কাথিয়াওয়াড়ের শাসনকর্তা 'সেনাপতি' পদের পরিবর্তে (সে-সময়ে এমন কিছু উচ্চ পদ বলে গণ্য না-হলেও) 'মহারাজা' খেতাব গ্রহণ করেন এবং সরকারিভাবে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত-রাজা হওয়া সত্ত্বেও কার্যত তিনি স্বাধীন রাজা হয়ে দাঁড়ান। দক্ষিণ কোশল ও নর্মদা-তীরবর্তী অঞ্চলের রাজারাও ওই সময়ে নামেমাত্র সামন্ত-রাজা ছিলেন। বঙ্গদেশও স্বাধীনতা অর্জন করে ওই সময়ে। এই সমস্ত ঘটনা মিলেমিশে তখন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যাতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যকে আর কোনোমতেই ঐক্যবদ্ধ বলা চলছিল না।

এমন সময়ে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রবল এক আঘাত হানল হূন ও এফ্‌থ্যালাইটদের নতুন-নতুন সব আক্রমণ। এফ্‌থ্যালাইট-রাজ তোরমান (৪৯০-৫১৫ খ্রীস্টাব্দ)-র নেতৃত্বে হূনরা ভারতের গভীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে সিন্ধুদেশ এবং রাজস্থান ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নিল। তোরমানের উত্তরাধিকারী মিহিরকুল গোড়ায় গুপ্ত-রাজাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কিন্তু পরে রাজা নরসিংহগুপ্ত (বা বালাদিত্য) এক নির্ধারক যুদ্ধে হূন-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দিলেন এবং মিহিরকুল ফের একবার বাধ্য হলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চাদপসরণ করতে। একমাত্র গান্ধারের কিছু-কিছু অংশ এবং পঞ্জাবের বিশেষ কয়েকটি এলাকা তাঁর দখলে রয়ে গেল (তাঁর এই অধীনস্থ রাজ্যের রাজধানী হল তখন সাকালা বা আধুনিক শিয়ালকোট শহর)। ৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে মালবের রাজা যশোধর্মণ হূন ও এফ্‌থ্যালাইটদের শেষপর্যন্ত যুদ্ধে পরাস্ত করলেন বটে, তবে ততদিনে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের এই দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে যশোধর্মণ এবার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। মালবদেশ ছাড়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলও স্বাধীন হয়ে গেল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কনৌজে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন মৌখরি-রাজবংশ।

এর পরে আরও কিছুকাল গুপ্তরা তাঁদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন মগধে ও অন্যান্য কিছু-কিছু ভূখণ্ডে, তবে এ-সময়ে যা থেকে গিয়েছিল তা হল একদার মহৎ রাজা ও রাজবংশের দুর্বল কিছু বংশধর। এই শেষোক্ত রাজারা 'পরবর্তীকালের গুপ্ত-রাজা' নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। এইভাবে প্রাচীন জগতের অন্যতম সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন ঘটল।

পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপকুল ও সাতবাহন-সাম্রাজ্য

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে ও সমগ্রভাবে দক্ষিণ ভারতে শ্রেণী-বিভাগের প্রধান সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি কাজ করছিল এবং গড়ে উঠছিল বড়-বড় রাষ্ট্র। এই সময়ে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে যেমন যোগাযোগ বেড়ে চলেছিল এবং তেমনই একদিকে রোম ও অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রগুলির। তখনও সাতবাহন-সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে এক প্রধান ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল। কলিঙ্গ-রাজ্যের পতনের পর সাতবাহন-সাম্রাজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন ক্ষত্রপ-শাসকরা। যে-সমস্ত শক-উপজাতি সুদূর খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সিন্ধুনদের নিম্ন উপত্যকায় ও কাথিয়াওয়াড়ে বসতি স্থাপন করেছিল এই ক্ষত্রপরা ছিলেন তাদেরই উত্তরপুরুষ। ক্রমশ এই সমস্ত উপজাতিরা কিছু-কিছু স্বাধীন-প্রধান হয়ে ওঠে, যেমন খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিশেষ করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এদের মধ্যে ক্ষহরত ও কর্দমক উপজাতি-দুটি।

খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি উপরোক্ত ক্ষত্রপ-শাসকরা পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের কিছু-কিছু অঞ্চল যা আগে সাতবাহন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা দখল করে নিতে সমর্থ হন। পরে নহপনের শাসনকালে ক্ষত্রপ-শাসিত এলাকা আরও প্রসারিত হয়। নাসিক ও কার্লেতে প্রাপ্ত নহপন-লিপিগুলি দেখে মনে হয় তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সমস্ত অঞ্চল। শিলালিপি ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় যে ১১৯ থেকে ১২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ক্ষত্রপরা দক্ষিণ গুজরাট এবং ভারুকচ্ছ (বর্তমানে ব্রোচ) বন্দরের অধিপতি ছিলেন। ক্ষত্রপ এবং সাতবাহনদের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতার অবসান ঘটে শেষপর্যন্ত সাতবাহনদের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে। উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে শকদের বিরুদ্ধে সাতবাহন-রাজ গোতমীপুত (গোতমীপুত্র) সাতকানির একাধিক যুদ্ধজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বোঝা যায় এর ফলে রাজা সাতকানি পশ্চিম ভারতের কিছু-কিছু অঞ্চলেও প্রাধান্যবিস্তার করতে পেরেছিলেন।

একটি উৎকীর্ণ লিপিতে এই রাজার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তিনি ক্ষহরত-বংশের বিলোপসাধন ঘটিয়ে পুনরুদ্ধার করেছিলেন সাতবাহন-রাজবংশের পূর্বগৌরব। উপরোক্ত ওই সমস্ত লিপিতেই গোতমীপুত সাতকানির রাজত্বকালে সাতবাহন-রাজ্যের সীমানাও নির্দেশিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে তিনি নহপনের কাছ থেকে উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের অংশবিশেষ ও পশ্চিম ভারতের ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তদুপরি তাঁর শাসনাধীন হয়েছিল অশ্মক ও বিদর্ভের মতো

প্রতিবেশী রাজ্যগুলিও এবং পরে তিনি জয় করে নেন সাতবাহনদের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কিছু-কিছু ভূখণ্ডও।

তবে সাতবাহনদের এই বিজয়গৌরব অবশ্য স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। পরাক্রান্ত শক ক্ষত্রপ রুদ্রদমনের রাজত্বকালে (খ্রীস্টীয় ১৫০ অব্দে) সাতবাহনরা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের নতুন-অধিকৃত অনেক ভূখণ্ডই ছেড়ে দিতে। রুদ্রদমনের নির্দেশে রচিত উৎকীর্ণ লিপির একটিতে তাঁকে অবন্তী, সুরাষ্ট্র ও অপরন্তের অধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে, পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল করায়ত্ত হয় শকদের, আর সাতবাহনদের দখলে থেকে যায় কেবল পশ্চিমে নাসিক ও পুনার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি।

গোতমীপুত্রের বংশধরেরা অবশ্য ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যান। রাজা পুলুমাভি (১৩০-১৫৯ খ্রীস্টাব্দ)-র নেতৃত্বে সাতবাহনরা পশ্চিমের অঞ্চলগুলিতে চমকপ্রদ কোনো সাফল্যলাভে অসমর্থ হবার পর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন পূর্বাঞ্চলের দিকে। তবে কখনও-কখনও, যেমন রাজা শ্রী যজ্ঞ শতকর্ণীর রাজত্বকালে (এঁর আমলের উৎকীর্ণ কিছু-কিছু লিপি পাওয়া গেছে নাসিকে), সাতবাহনরা পশ্চিম ভারতের কিছু-কিছু অঞ্চল জয় করে নিতে সমর্থ হন, তবে সাম্রাজ্যের ঐক্য অটুট রাখার মতো ক্ষমতা তখন আর তাঁদের ছিল না। একমাত্র পূর্বাঞ্চলগুলিতেই তাঁদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন সাতবাহনরা।

ভকতক-রাজ্য

সাতবাহন-সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেকগুলি ছোট-ছোট রাজ্য প্রাধান্যলাভের জন্যে পরস্পরের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম শুরু করল। আর শেষপর্যন্ত তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হল ভকতক-বংশীয় রাজ্য। গোড়ায় এই রাজবংশের ভূখণ্ডগত শাসনকেন্দ্র ছিল বর্তমানে বেরার নামে পরিচিত অঞ্চলে। এঁদের এই রাজ্যের উত্থানের আনুমানিক একটি তারিখ পাওয়া যায়, তা হল ২৫৫ খ্রীস্টাব্দ। বলা হয়, এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা বিন্ধ্যশক্তি। পুরাণসমূহে উক্ত তথ্য অনুযায়ী রাজা বিন্ধ্যশক্তি শক ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে এবং সাতবাহন-সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের যে-সমস্ত স্থানীয় ছোট-ছোট রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রাজা বিন্ধ্যশক্তির উত্তরাধিকারী প্রথম প্রবরসেন (২৭৫-৩৩৫ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি সফল হয়েছিলেন। সগৌরবে 'সম্রাট' (একচ্ছত্র রাজা) উপাধি ধারণ করেছিলেন তিনি। তাঁর রাজত্বকালে ভকতক-রাজবংশের অধীন হয়েছিল বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ড। নর্মদা থেকে কৃষ্ণা নদীর

মধ্যবর্তী অঞ্চল তাঁর রাজ্যের একাংশ হিসেবে গণ্য ছিল। মধ্য-ভারতেও কিছুটা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় প্রবরসেন নাগ-রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন: নিজ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন জনেক নাগ-রাজার কন্যা ভবনাগের।

প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের যখন আবির্ভাব ঘটল রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে, ভকতকদের তখন রাজ্যের উত্তর সীমানা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে হল। দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রগুপ্তের বিজয়-অভিযান অনিবার্যভাবেই ভকতক ও গুপ্ত-রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক জটিল করে তুলল।

সুবিখ্যাত এলাহাবাদ-লিপিতে গুপ্ত-রাজার সামরিক জয়যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর অধিকৃত রাজ্যগুলির একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এই তালিকায় গুপ্ত-রাজার হাতে পরাজিত রাজাদের নামের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে আর্যাবর্তের রাজা রুদ্রদেবের নাম। বহু ইতিহাসবিদ পণ্ডিত মনে করেন এই রুদ্রদেব ভকতক-বংশের তৎকালীন রাজা ও প্রবরসেনের পৌত্র প্রথম রুদ্রসেন (৩৩৫-৩৬০ খ্রীস্টাব্দ) ছাড়া আর কেউ নন। তবে সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণদেশ অভিযানকালে অধিকৃত সকল অঞ্চলই গুপ্ত-রাজবংশ তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যদিও ওইসব অঞ্চলে গুপ্ত-রাজত্বের প্রভাব অতঃপর আগের চেয়ে বহুগুণ প্রবল হয়ে উঠেছিল। গুপ্ত ও ভকতক উভয় রাজ্যই অবশ্য পরস্পরের মধ্যে বন্ধু-সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল তখন। ভকতকদের সাহায্যে দক্ষিণ ভারতে নানা ধরনের চাপসৃষ্টির একটা পরিকল্পনা করেছিলেন গুপ্তরা, অথচ ভকতকদের তখন এমন অবস্থা ছিল না যে গুপ্তদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁরা এ-কাজে বড়রকমের কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করবেন। এই সময়ে গুপ্তরা পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই প্রধানত তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন আর তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত নিরাপদ করে তুলতে। এ-কারণেই গুপ্ত ও ভকতক-রাজ্যের মধ্যে বন্ধু-সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ ঘটে গিয়েছিল এবং ভকতক-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ও রাজা প্রথম রুদ্রসেনের পৌত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেন বিবাহ করলেন গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কন্যা প্রভাবতীগুপ্তকে।

ভকতক-রাজসভায় গুপ্ত-রাজবংশের প্রভাব বিশেষ করে অনুভূত হয় তখন যখন প্রভাবতীগুপ্ত রাজ-প্রতিনিধিরূপে রাজ্য-পরিচালনার ভার পেলেন। ওই সময়ে কেবল গুপ্ত-রাজ্যের রাষ্ট্রদূতরাই নন, রাজকর্মচারিরাও পাটলিপুত্র থেকে ভকতক-রাজ্যের রাজধানী নন্দিবর্ধনে (বর্তমান নাগপুরের কাছে) আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। তবে এর পরে অল্পদিনের মধ্যেই ঐক্যবদ্ধ ভকতক-রাজ্য ভেঙে দেখা দিল কিছু-কিছু স্থানীয় রাজ্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিপত্তি ছিল বৎসগুল্মের

(দক্ষিণ বেরার-এর) ভকতকদের। তবে ভকতকদের প্রধান ধারার এই সমস্ত শাখা-প্রশাখা বেশিদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে নি, অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলি পরাক্রান্ত চালুক্য-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়।

পল্লব-রাজবংশ ও সুদূর দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রসমূহ

সাতবাহন-সাম্রাজ্যের পতনের পর ভকতক-রাজ্যের পাশাপাশি পল্লব ও ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজ্যদুটিও দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে দুঃখের বিষয় আকর সূত্রগুলি থেকে খুব অল্পই সংবাদ পাওয়া যায় এই রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে। পল্লব-রাজ্যের রাজধানী ছিল কাঞ্চীপুরম নগরে এবং রাজ্যটির উত্তর সীমান্ত নিরূপিত ছিল কৃষ্ণানদীর গতিপথ-বরাবর। পল্লবরা একাধিকবার গুপ্তদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ওই সময়ে অন্ধ্রদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন ইক্ষ্বাকু-রাজবংশ এবং পল্লবদের বিরুদ্ধে এই রাজবংশ পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবু এইসব যুদ্ধবিগ্রহে শেষপর্যন্ত বিজয়ী হন পল্লবরাই।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে দেশের একেবারে দক্ষিণ অঞ্চলে তখনও পর্যন্ত চের, পাণ্ড্য ও চোল-রাজবংশের বড়-বড় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বজায় ছিল। এই রাজ্যগুলির অস্তিত্বের কথা উল্লিখিত আছে এমন কি বহু পূর্বের মৌর্য-সম্রাট অশোকের উৎকীর্ণ লিপিগুলিতেও। এই সমস্ত রাজ্য একদা রোমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, বিনিময়ে ভারতের এই প্রত্যন্ত দক্ষিণে রোমও স্থাপন করেছিল তার বাণিজ্য-কেন্দ্রসমূহ। দুঃখের বিষয়, যদিও খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে কিছু-কিছু তামিল আকর-গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটেছিল, তবু উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে 'তিরু কুরল' নামে তামিল সাহিত্যের এক অসামান্য পুথি লিখিত হয় এবং তার পরে-পরেই আবির্ভাব ঘটতে থাকে বহুতর কাব্য, ব্যাকরণ ও অন্যান্য রচনার।

এ-পর্যন্ত উৎকীর্ণ লিপি ইত্যাদি যে-উপাদান পাওয়া গেছে তা থেকে খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিকের শতাব্দীগুলিতে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রগুলির শাসন-ব্যবস্থার মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়।

সাতবাহন ও ভকতক-রাজবংশ সুসংগঠিত এক কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁদের সাম্রাজ্যগুলি বিভক্ত ছিল কয়েকটি করে প্রদেশে, প্রদেশগুলি আবার বিভক্ত ছিল বহুতর জেলায়। তাঁদের ছিল নানা ধরনের রাজকর্মচারির এক বৃহৎ সম্প্রদায়, যেমন, খাদ্য ও সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি, প্রধান-প্রধান লিপিকার, সেনাপতি, গ্রামাঞ্চলের পরিদর্শক, ইত্যাদি।

সাতবাহন, ভকতক ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় রাজবংশের অনুসৃত ধর্ম-সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধেও অল্প-বিস্তর উল্লেখ দুর্লভ নয়। সাতবাহনরা ছিলেন বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক। প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের রচনাদির সঙ্গে সাতবাহন-রাজসভার সম্পর্কের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাঙ্ লিখেছেন যে নাগার্জুন নাকি সাতবাহন-রাজসভার পারিষদ ছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্মও তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ ভারতে। ভকতক-লিপিগুলিতে উল্লিখিত আছে যে প্রথম রুদ্রসেন ছিলেন শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং দ্বিতীয় রুদ্রসেন বৈষ্ণব। প্রাচীন যুগে এবং মধ্যযুগের প্রারম্ভে ধর্মমতগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের এই প্রয়াস দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

অর্থনীতির বিকাশ ও সমাজ-কাঠামো

কৃষি

কুশান ও গুপ্ত-যুগদুটি কৃষির অধিকতর উন্নতির কারণে বিশিষ্ট হয়ে আছে। তখন নতুন-নতুন জমি উদ্ধার করা হচ্ছিল, জলাজমির জল নিষ্কাশন করা হচ্ছিল, এবং কৃষিকাজ ক্রমশই বেশি-বেশি গুরুত্ব অর্জন করছিল। রাষ্ট্রের তরফ থেকে কৃষকদের তখন উৎসাহিত করা হোত অনাবাদী ও জঙ্গল কেটে সাফ-করা জমিতে চাষ-আবাদ করতে। 'মিলিন্দ-পহ্ন' ও মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে যাঁরা জঙ্গল কেটে সাফ করে চাষের জন্যে জমি তৈরি করবেন তাঁদের ওইসব জমিতে মালিকানার অধিকার দেয়া হবে।

ভারতের যে-সব অঞ্চলে জলের প্রাচুর্য ছিল সেখানে ধানের চাষ হোত। বিশেষ করে ধানচাষ হোত বঙ্গ, বিহার, আসাম, ওড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র-তীরবর্তী এলাকাগুলিতে। তখনই বহুবিভিন্ন প্রকারের ধানের কথা জানা ছিল লোকের। 'অমরকোষ'এ ধানচাষ এবং গম, যব ও তিলের চাষের জন্যে কী-কী ধরনের মাটি উপযোগী বিবরণ আছে তার। এই অভিধানখানির রচয়িতা অমরসিংহ সীম ও মসুর ডালের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, শশা, পান, পেঁয়াজ, রসুন ও কুমড়োর কথা তো বাদই দেয়া গেল। আখের চাষও হোত তখন ব্যাপক আকারে।

দক্ষিণ ভারত তখনই সুপরিচিত ছিল গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলার জন্যে। ধ্রুপদী ইউরোপীয় আকর সূত্রগুলিতে ভারতের দক্ষিণাঞ্চল এমন কি গোলমরিচের দেশ বলেও উল্লিখিত হোত। ভারতের কৃষকরা তখন প্রতি বছর জমিতে দু'বার

কি তিনবার করে ফসল ফলাতেন। এমন কি বিদেশেও তখন চালান যেত নানা ধরনের দানাশস্য। 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই'তে (খ্রীস্ট্রীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত) ভারত থেকে চাল ও গম রপ্তানির উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালের ভারতীয় পুথিগুলিতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে যারা পতিত জমি চাষ করত ও জমিতে সেচের ব্যবস্থা করত তারা ওইসব জমিতে গোড়ায় যে-মূলধন বিনিয়োগ করত যতদিন-না তার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ লাভ হিসেবে উঠে আসত তাদের, ততদিন রাজকর দেয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেত তারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গুপ্তযুগের উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে প্রায়শই পতিত জমি কেনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হয় নিশ্চয়ই তখন এই ব্যাপারটা বিশেষ লাভজনক ছিল এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকেও উৎসাহ যোগানো হোত এ-ব্যাপারে।

ওই সময়ে বিদেশ থেকে আমদানি-করা নতুন-নতুন ফসলের চাষও দেখা দিয়েছিল ভারতে। চাষের যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটেছিল। চাষের জন্যে কৃষকদের ব্যবহারের প্রধান যন্ত্র ছিল লাঙল। 'বৃহস্পতি-স্মৃতি'তে বিশেষ একটি নির্দিষ্ট ওজনের লাঙলের ফলা তৈরি করার নির্দেশ আছে, তাছাড়া অমরসিংহ তাঁর অভিধানে লিপিবদ্ধ করেছেন লাঙলের বিভিন্ন অংশের বিস্তৃত বর্ণনা। লোহার তৈরি কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় তখন এবং নতুন-নতুন ধরনের কৃষি-যন্ত্রও দেখা দিতে থাকে। তক্ষশিলায় পাওয়া খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে আছে নতুন ও আরও উন্নত ধরনের কিছু কুঠার। এটা সম্ভব যে এ-ব্যাপারটি ছিল বিদেশী প্রভাবের ফল, কেননা এই একই ধরনের কুঠার সাধারণভাবে পাওয়া গেছে সেই সমস্ত দেশেও যে-সব দেশ একদা রোমান সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রভাবে এসেছিল। কুঠার ও কোদাল ছাড়াও তক্ষশিলায় পাওয়া অন্যান্য পুরাবস্তুর মধ্যে আছে নতুন আকারের কাস্তে ও নিড়ানি।

ভারতীয় আকর সূত্রগুলিতে চাষের কাজের বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেই কৃষককেই উপযুক্ত বলা হোত যিনি নাকি জমিতে বীজ বোনার আগে দু'তিন বার মাটি খুঁচিয়ে তোলাপাড়া করতেন। মাঠ থেকে ফসল কেটে আনার পর বিশেষ খামারবাড়িতে ফসল ঝাড়াই বা দানা থেকে খড়-বিচালি আলাদা করা হোত। অতঃপর ঢেঁকিতে ফেলে ওই দানা-ফসল ভানা হোত আর কুলোয় ঝেড়ে দানা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হোত তুষ বা খোসা। পরে ওই দানা-ফসল রৌদ্রে শুকিয়ে গোলাজাত করা হোত।

আমরা-যে-সময়ের কথা বলছি তখন উদ্যানপালন-বিদ্যারও অগ্রগতি ঘটেছিল যথেষ্ট। তখনই ভারতে দেখা দিয়েছিল নতুন-নতুন ধরনের শাকসব্জি এবং পীচ ও নাসপাতির মতো ফল। এছাড়া প্রাচীনকালের ভারতীয়রা আম, কমলালেবু, আঙুর ও কলার সঙ্গে তো পরিচিত ছিলেনই। সর্বত্র, বিশেষ করে সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে,

ডাব-নারকেলও ফলত যথেষ্ট। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের উৎকীর্ণ লিপিগুলির সাক্ষ্য অনুযায়ী, ওই সময়ে প্রথম সযত্ন-রক্ষিত নারকেল-বাগান গড়ে তোলা হয়। তখনকার আকর সূত্রগুলিতে কেমন করে ফলের গাছ রক্ষা করতে হয় ও লালন করতে হয় বিশেষ ধরনের তেল ও সার-জল দিয়ে সে-সম্বন্ধেও উপদেশ দেয়া হয়েছে। শাস্ত্রগুলিতে বিশদ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে মাটির গুণাগুণ, উদ্ভিদের নানা রোগ, ফলের বাগানে প্রত্যেক দুটি গাছের মধ্যে কতখানি করে জায়গা ছাড়তে হবে, ইত্যাদি নানা বিষয়ে।

জমিতে সেচের ব্যবস্থাও তখন দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল বলে মনে হয়। মৌর্য-সাম্রাজ্যের আমলে খনিত সুদর্শন হ্রদের বাঁধটি আরও সুদৃঢ় করে তোলেন রাজা রুদ্রদমন। জল সঞ্চয় করে রাখার জন্যে বিশেষ-বিশেষ জলাধারও নির্মিত হয় তখন। যেমন, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের একখানি লিপিতে উজ্জয়িনী থেকে বেশি দূরে নয় এমন একটি গ্রামে প্রকান্ড এক জলাধার নির্মাণের একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। হাতিগুম্ফায় স্থাপিত এক শিলালিপিতে কলিঙ্গের রাজা খারবেলও সগর্বে ঘোষণা করছেন যে তাঁর রাজ্যে বহুতর খাল ও জলাধার নির্মাণ করিয়েছেন তিনি।

গুপ্ত-যুগের বহু আকর সূত্রেই কৃষির গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কবি কালিদাস পর্যন্ত তাঁর নাটকে জমিতে চাষ-আবাদ ও পশুপালনকে ঐশ্বর্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে উল্লেখ করেছেন।

পশু-খামার গড়ে তোলা ছাড়াও মাছধরা ও অরণ্য-পালনও তখন প্রধান হয়ে ওঠে। বন-জঙ্গলের দেখাশোনা করার জন্যে রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিশেষ অরণ্য-পরিদর্শক পর্যন্ত নিযুক্ত হতেন।

জমির মালিকানা। ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির বিস্তার

খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্রসমূহে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয় ভূস্বামীদের অধিকারসমূহ ও তার সংরক্ষণের ব্যাপারে। অন্যের জমি-জায়গা বে-আইনীভাবে হস্তগত করার অপরাধের শাস্তি হিসেবে নির্দিষ্ট হয় অত্যন্ত মোটারকমের অর্থদন্ডের। বহু-বহু দশক ধরেই জমির মালিক জমিতে তাঁর অধিকার কায়েম রাখতে পারতেন তখন, তা সে তিনি নিজে জমি চাষ করুন কিংবা ঠিকা প্রজা দিয়ে চাষ করান, যা-ই হোক-না কেন। গুপ্ত-যুগে বিশেষ ধরনের রাজকীয় খতিয়ান বা হিসাবের বই চালু করা হয়, যাতে জমির কেনাবেচার খবর নথিভুক্ত করা হোত। গুপ্ত-যুগের উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে জমি বিক্রির বহু ঘটনার উল্লেখ

পাই আমরা, অথচ ক্ষত্রপ ও কুশান-যুগের লিপিতে এ-ধরনের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় নিতান্তই কদাচিৎ।

আগের মতোই রাষ্ট্রের তরফ থেকে তখনও চেষ্টা হোত ভূ-সম্পত্তি ও ভূমিগত সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার, আর গ্রামীণ সমাজগুলি চেষ্টা করত জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিস্তারে বাধাসৃষ্টি করতে। তবু ব্যক্তির মালিকানাধীনে ক্রমশ জমির কেন্দ্রীভবনের ধারাটি অব্যাহত থেকে যায় আগাগোড়াই।

উদাহরণস্বরূপ, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপদের রাজত্বকালের এক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যায় নাসিকে পাওয়া উৎকীর্ণ লিপিগুলির একটি থেকে। তাতে এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা নহপনের জামাতা উষাবদত্তকে প্রথমে এক ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে একখণ্ড জমি কিনতে হয় কোনো-এক বৌদ্ধ সঙ্ঘকে সে-জমি দান করার জন্যে। সম্ভবত এ-ঘটনাটি রাজার নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি ক্রমশ বিভিন্ন ব্যক্তির মালিকানাধীনে হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়ার যে-নতুন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গিয়েছিল তারই ইঙ্গিতবহ। মনে হয়, উষাবদত্তের হাতে কোনো মালিকহীন খালি জমি ছিল না, আর তাই তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অন্য এক ভূস্বামীর কাছ থেকে জমি কিনতে।

খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতকগুলিতে ব্যক্তিবিশেষকে ভূমিদানের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা হল এই ভূমিদানের প্রকৃতিও ক্রমশ বদলে যেতে শুরু করেছিল। এর পূর্বে ভূমিদান কেবল প্রযোজ্য ছিল জমির ব্যবহারের ক্ষেত্রেই, জমিতে কর্ষণরত কৃষকদের ওপর তার ফলে কোনো অধিকার জন্মাত না। তাছাড়া আগে অনেক ক্ষেত্রেই ভূমিদানের মেয়াদ ছিল সাময়িক, অর্থাৎ ভূমির গ্রহীতা যতদিন বিশেষ সরকারি কাজে লিপ্ত থাকতেন শুধুমাত্র ততদিনের জন্যেই, কিন্তু আলোচ্য সময়ে তা ক্রমশ বেশি-বেশি করে বংশানুক্রমিক হয়ে উঠতে শুরু করল।

এর ফলে ব্যক্তিগত মালিকদের অধিকার, ইত্যাদি পাকাপোক্ত ও কায়েম হয়ে উঠল এবং এই মালিকরা মোটামুটি স্বাধীন হয়ে উঠলেন কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে। কয়েক ধরনের ভূমিদান-ব্যবস্থা হয়ে উঠল প্রায় চিরস্থায়ীই, কেননা এইসব দানকর্মের পাট্টায় সুস্পষ্টভাবেই লেখা হতে লাগল যে জমি দান করা হল চিরকালের মতো, 'যতদিন চন্দ্রসূর্য ও নক্ষত্ররাজি মর্ত্যে আলোক বিতরণ করবে ততদিন'।

এই যুগে রাজা যখন সাময়িক ভোগদখলের জন্যে জমি বিলি করতেন, এমন কি তখনও ক্রমে-ক্রমে তিনি ভূস্বামীদের দিতে লাগলেন কিছু-কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, অর্থাৎ তথাকথিত দায়মুক্তি বা রেহাইয়ের অধিকার।

এক্ষেত্রে এর পরের পদক্ষেপ হল এই সমস্ত ভূস্বামীর অধীনস্থ জমি ও সেই

জমিতে কার্যত যাঁরা চাষবাস করতেন তাঁদের ওপর কিছু-কিছু শাসন-পরিচালনগত ক্ষমতা অর্জন করা। কিছু-কিছু আইন-সংক্রান্ত কাজও তাঁরা নিষ্পন্ন করতে শুরু করলেন; রাজা তাঁদের মুক্ত করে দিলেন তাঁদের জমিতে রাজকীয় কর্মচারিদের পরিদর্শন ও তদারকি মেনে নেয়ার পূর্বতন সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে। এই ধরনের অধিকারদানের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একখানি সাতবাহন-লিপিতে (এই রাজকীয় নির্দেশটি সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার উদ্ভবের এক নির্ভুল লক্ষণ—এবং তা শুধু উত্তর ভারতেই নয়, দাক্ষিণাত্যেও)। সাতবাহন-রাজ গোতমীপুত শতকর্নী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভূমিদান করেন এবং সেইসঙ্গে গ্রামীণ
তাদের জমিতে রাজার সেনাবাহিনীর উপস্থিতির ও রাজকর্মচারিদের
পের পূর্বতন বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দেন। এই রীতিটি বিশেষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের পর থেকে যখন থেকে রাজারা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি-সম্পর্কিত প্রায় সকল রাজকর, শাসন-পরিচালনা ও আইনগত দায়দায়িত্বগুলি ওইসব জমির মালিকদের হাতেই ছেড়ে দিতে থাকেন। এমন কি খনির মালিকানার অধিকারসমূহও হস্তান্তরিত করা হতে থাকে, যদিও এগুলিকে ইতিপূর্বে বরাবর ঐতিহ্যসিদ্ধ রাজকীয় একচেটিয়া অধিকার বলে গণ্য করা হয়ে আসছিল।

রাষ্ট্রের কিছু-কিছু সরকারি দায়দায়িত্ব ব্যক্তিবিশেষদের কাছে হস্তান্তরের এই সমস্ত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হোত এক বিশেষ ধরনের সনদ বা নির্দেশনামায় আর সনদগুলি তামার ফলকের ওপর খোদাই করে তা নতুন ভূস্বামীদের দেয়া হোত। এই রাষ্ট্রীয় রীতি অনুসরণের ফলে সাময়িক ভূস্বামীদের পদমর্যাদা বংশানুক্রমিক সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের পদমর্যাদার আরও সমীপবর্তী হয়ে উঠল এবং এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে কৃষকরা ক্রমশ ওই প্রথমোক্ত ভূস্বামীদের কর্তৃত্বের অধীন হয়ে পড়তে লাগলেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই প্রক্রিয়াটি রূপ নিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে ও ক্রমে-ক্রমে এবং এর পরেও বেশকিছু কাল ধরে গ্রামাঞ্চলে শাসন-পরিচালন সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের অনেকগুলিই ন্যস্ত ছিল খোদ রাষ্ট্রের ওপর।

গ্রামাঞ্চলে সমাজ-সম্পর্কেরও তখন পরিবর্তন ঘটতে থাকে ঠিকা প্রজার সাহায্যে চাষবাসের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। প্রায়শই উৎপাদনের উপায়, অর্থাৎ জমি ও চাষের সাজ-সরঞ্জাম হারিয়ে ঠিকা কৃষকরা সম্পূর্ণভাবে ভূস্বামীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকেন।

এই সময়কার প্রাচীন ভারতীয় আকর-সূত্রগুলিতে ক্রমশ বেশি-বেশি 'গ্রামদানের' উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অর্থ, রাজা এই সমস্ত গ্রাম থেকে রাজকর আদায়ের অধিকার হস্তান্তরিত করছেন। গ্রামের সমস্ত জমিজমা যে এর ফলে গ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল তা নয়, তবে যে-ব্যক্তিকে অতঃপর

কৃষকদের রাজকর দিতে হচ্ছিল তাঁর পদমর্যাদা-যে মোটেই আর আগের মতো থাকছিল না তা বলাই বাহুল্য। ফলত গ্রামীণ সমাজের মুক্ত সদস্যরাও ক্রমশ ব্যক্তি-মালিকদের অধীন হয়ে পড়তে লাগলেন, কেননা ব্যক্তি-মালিকরা মনোযোগী হয়ে পড়তে লাগলেন জমির ওপর তাঁদের অধিকার সম্প্রসারণে। উপরোক্ত এই সমস্ত 'গ্রামদান'-যে প্রকৃতিতে তখনই সামন্ততান্ত্রিক ছিল তা নয়, তবে তখনই টের পাওয়া যাচ্ছিল যে এর সুনির্দিষ্ট প্রবণতা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকেই। এর পূর্ববর্তী যুগের মতো এই সমস্ত 'দানকার্য' বেতনের পরিবর্তে নিষ্পন্ন করা হোত রাষ্ট্রীয় কর্মচারিদের মধ্যেও।

প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের অবস্থার পরিবর্তন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্কের উদ্ভব

উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মানুষদের—ক্রীতদাস, গ্রামীণ সমাজের অপরাপর মুক্ত সদস্য ও ঠিকা মজুরদের--সামাজিক অবস্থান ও অবস্থায় এই যুগে মৌল নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী শাস্ত্রসমূহে ক্রীতদাস-সম্পর্কিত নানা নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ আছে বিস্তারিতভাবে. ক্রীতদাসদের ভাগও করা হয়েছে নানাবিধ গোষ্ঠীতে। সাময়িক ক্রীতদাসদের আজীবন ক্রীতদাসে পরিণত করার বিরুদ্ধে লক্ষণীয় একটি প্রয়াস দেখা যায় এইসব গ্রন্থে, ক্রীতদাস-মালিকদের কর্তব্যগুলিও বিধিবদ্ধ করা আছে এবং এই বিধিনিষেধ অমান্য করলে দাস-প্রভুদের এমন কি অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। পরবর্তী শাস্ত্রসমূহে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ক্রীতদাসেরা কোন বর্ণসম্ভূত তার ওপর। গুপ্ত-যুগের আকর সূত্রগুলিতে এই বর্ণ-নির্ধারণের নীতি কড়াকড়িভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে সবচেয়ে বেশি করে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে ব্রাহ্মণদের, আর তারপর যাঁরা নাকি 'দ্বিজ', তাঁদের অধিকারসমূহ। কাত্যায়ন এমন কি সরাসরি ঘোষণাই করেছেন যে ক্রীতদাসত্ব ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, নিম্নতর কোনো বর্ণের মানুষকে ক্রীতদাস করা চলতে পারে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য বর্ণসম্ভূত মানুষকে ক্রীতদাস নিযুক্ত করতে পারেন এবং তা শাস্ত্রগ্রাহ্যও।

ওই যুগে ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেয়া উচিত কিংবা উচিত নয় এই প্রশ্নটি তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী শাস্ত্রসমূহ এই ব্যাপারটি নিয়ে-যে বিস্তারিত আলোচনা করেছে তা-ও আপতিক নয়। ক্রীতদাসদের, বিশেষ করে সাময়িক ক্রীতদাসদের, মুক্ত করার শর্তাবলী বহুপরিমাণে শিথিল করার বিধানও দেয়া হয়। ক্রীতদাসদের মুক্তিদানের এক অনুষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়

'নারদ-স্মৃতি'তে। সেখানে বলা হয়েছে যে দাস-প্রভু জলপূর্ণ একটি ভাণ্ড ভাঙলেন ও ক্রীতদাসের মাথায় সেই জল ছিটিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন সে এখন থেকে মুক্ত মানুষ। পরবর্তী শাস্ত্রসমূহে আরও বলা হয়েছে যে দারিদ্র্যের জ্বালায় (মুখের অন্ন সংগ্রহের উপায় হিসেবে) যে-সমস্ত ক্রীতদাস দাসত্ব বরণ করেছেন, অন্নগ্রহণে অস্বীকৃত হলে তাঁদের মুক্তি দিতে হবে। যদি কোনো লোক ঋণগ্রস্ত হয়ে দাসত্ব বরণ করেন, তাহলে প্রাপ্য সুদ সহ সেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে পারলে তাঁর পক্ষেও স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার যথেষ্ট যুক্তি থাকবে।

মুক্ত কৃষকদের পূর্ববর্তী অবস্থায় ওই সময়ে বহু পরিবর্তন ঘটে। প্রথম দিকে যেখানে শুধুমাত্র জমিই হস্তান্তরিত হোত এক মালিক থেকে আরেক মালিকের হাতে, পরে সেখানে জমি সহ জমিতে কৃষিকাজে নিরত মানুষজনও হয়ে যেতে লাগল পর-হস্তগত। এই ধরনের জমি-কেনাবেচার সবচেয়ে প্রাচীন একটি দলিল—খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের একটি পল্লব-লিপিতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের কাছে জমি হস্তান্তরের পর ওই জমিতে কর্মরত ভাগচাষীরাও জমির সঙ্গে আবদ্ধ থেকে হস্তান্তরিত হবে। ক্রমে-ক্রমে এই প্রথা আগে যাঁরা মুক্ত কৃষিজীবী ও গ্রামীণ সমাজের সদস্য ছিলেন এমন কি তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে লাগল, এর অর্থ তাঁরা পরিণত হতে লাগলেন প্রায় ভূমিদাসের পর্যায়ে, হয়তো-বা তার চেয়ে সামান্য একটু উন্নত পর্যায়েই। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের এক ভকতক-অনুশাসনে ঘোষণা করা হয়েছে যে স্থানীয় কৃষকদের (বা কর্ষকদের) চাষের জন্যে পৃথক করে-রাখা চারখানি খামার দান হিসেবে দিয়ে দেয়া হবে, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে ওইসব কৃষক যাঁরা ওই জমি চাষ করছিলেন জমির সঙ্গে তাঁদেরও হস্তান্তরিত করা হবে নতুন ভূস্বামীর কাছে। খ্রীস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ছকগুলি ভারতে রূপ-পরিগ্রহ করে এবং যতদিন-না গোটা একটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে ক্রমে-ক্রমে। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে বহুস্তরবিশিষ্ট ভারতীয় সমাজের কাঠামোর মধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্ক প্রধান হয়ে ওঠে।

কুটির-শিল্প ও কারুশিল্পী-সমিতি

খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতকগুলিতে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়ে ওঠে কারুশিল্পের মান। ভারতীয় ধাতু-কর্মী ও ঢালাইকররা তখনই তাঁদের দক্ষতার কারণে সুবিখ্যাত ছিলেন। এমন কি এখনও পর্যন্ত এটা একটা রহস্য যে কী করে সেই সুদূর খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে তাঁরা অমন একটি লৌহস্তম্ভ (সাত মিটারের চেয়েও বেশি উঁচু ও ওজনে ছ'টনের বেশি) নির্মাণ করতে

পেরেছিলেন, যাতে দেশের আর্দ্র আবহাওয়া সত্ত্বেও ক্ষয় কিংবা মরিচা ধরার লক্ষণ নেই। 'মিলিন্দ-পহ্‌'তে সোনা, লোহা, সীসা ও টিন-শিল্পকে অন্যান্য কারুশিল্প থেকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এইসব শিল্পের যাঁরা কারিগর তাঁরা অন্যদের থেকে ও একে অন্যের থেকেও পৃথকভাবে কাজ করতেন। রাজার নিজস্ব ধাতু-শিল্পী ও অস্ত্র-নির্মাতারা ছিলেন কারুশিল্পীদের এক বিশিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্গত। মনে হয়, এই গোষ্ঠীটির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল বিশেষরকম কড়া, কেননা রাজা গণ্য হতেন দেশের সকল খনিজ-পদার্থের মালিক বলে এবং খনি থেকে ধাতু উত্তোলন রাজকীয় বিশেষাধিকার হিসেবে গণ্য ছিল। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারটি কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের আরও দৃঢ় তদারকির অধীন ছিল।

বহু বিচিত্র ধরনের লোহার সামগ্রী তৈরি করা হোত তখন। অস্ত্রশস্ত্র তৈরির ব্যাপারে ওই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল একদিকে লক্ষণীয় গ্রেকো-রোমান প্রভাব, অন্যদিকে মধ্য-এশীয় প্রভাব (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, তক্ষশিলায় ও ভারতের অন্যান্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হোত শক নমুনা অনুযায়ী), তবে মোটের ওপর ধাতু-শিল্পীরা স্থানীয় ঐতিহ্যই অনুসরণ করতেন। লোহার ও ইস্পাতের তৈরি জিনিসপত্র হোত খুবই উঁচু মানের, বিদেশেও তা ব্যাপকভাবে রপ্তানি করা হোত। 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই'তে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় লোহা ও ইস্পাত চালান যেত আফ্রিকার বন্দরগুলিতে। ওই গ্রন্থেই ভারতীয় তামা রপ্তানিরও উল্লেখ আছে। ওই সময়কার ধাতু-শিল্পীরা সুপরিচিত ছিলেন তাঁদের শিল্পদক্ষতার জন্যে। এছাড়া ভারতীয় মণিকার বা জহুরিদের কাজও ভারতের সীমান্তের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত সুপরিচিত ও অত্যন্ত আদৃত ছিল। তক্ষশিলায় সে-সময়ে হেলিনিক শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত বিদেশী কিছু-কিছু মণিকার ও অন্যান্য কারুশিল্পীও ছিলেন বলে মনে হয়, কেননা ওই অঞ্চলে আবিষ্কৃত বহু রত্নালঙ্কারের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় তৎকালীন মিশর ও সিরিয়ায় তৈরি রত্নালঙ্কারের। তবে পূর্ব ভারতে এই ধরনের বিদেশী প্রভাব ছিল যৎসামান্যই।

ভারতীয় তাঁতশিল্পেরও ওই সময়ে দ্রুত অগ্রগতি ঘটছিল, বিশেষ করে সুতীকাপড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে। সুতী ও রেশমের বস্ত্র তখন পাশ্চাত্ত্যে রপ্তানি হোত, ওইসব দেশে তার কদরও ছিল খুব। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় নানা গ্রন্থে বিভিন্ন রঙে ছোপানো সুতীর কাপড় ও পোশাকের বহু উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকরা জানাচ্ছেন যে ভারতীয় সুতীবস্ত্র ছিল খুব হালকা রঙে ছোপানো ও সেগুলিতে সুতোর বুনটও ছিল অন্যান্য দেশে তৈরি কাপড়ের চেয়ে বিশুদ্ধতর। বারাণসীতে বোনা রেশম-বস্ত্রের খুবই কদর ছিল বিদেশে। 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই'তে উল্লেখ আছে যে বঙ্গদেশে তৈরি মিহি সুতীবস্ত্রও

একই রকম আদরণীয় ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পশমী কাপড়চোপড়ও তৈরি হোত। হেলিন বা গ্রীক-শাসিত দেশগুলিতে ও রোমে প্রচুর চাহিদা ছিল ভারতীয় মশলা, গন্ধদ্রব্য ও হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্রের। ভারতে কাচের উৎপাদনও তখন বেড়ে চলেছিল দ্রুত; কাচ ব্যবহৃত হোত খাওয়ার বাসনপত্র ও ঘর-সাজানোর তৈজসপত্র তৈরিতে।

কুশান ও গুপ্ত-যুগগুলিতে কারুশিল্পীদের সমবায়-সঙ্ঘ বা 'শ্রেণী'গুলি আরও জটিল ও বিকশিত হয়ে ওঠে। কারুশিল্পীদের এই সঙ্ঘগুলি ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল তখন, আর রাষ্ট্রের তরফ থেকে চেষ্টা চলছিল তাদের কাজকর্ম নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার। তবে শাস্ত্রসমূহ রাজার কাছে দাবি জানাচ্ছিলেন যে তাঁকে শ্রেণীর নিয়মকানুনকে মর্যাদা দিতে হবে ও তার সম্পত্তিগত অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। শ্রেণীগুলির স্বাধীনতা সে-সময়ে এত বেশি ছিল যে সমকালীন উৎকীর্ণ লিপিগুলি দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় তারা ব্যক্তিবিশেষদের সঙ্গে লেনদেনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারত, এমন কি কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও ব্যবসায়িক চুক্তি করত তারা। শ্রেণীগুলি যে-সমস্ত ব্যক্তি তাদের কাজের ফরমায়েশ দিতেন তাঁদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে পারত, পরে অবশ্য সেই টাকা শোধ দিতে হোত সুদ সহ। কিছু-কিছু শ্রেণী আবার অত্যন্ত ধনী ছিল, এগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অত্যন্ত দামি-দামি উপহার দিত, এমন কি গোটা বাড়ি পর্যন্ত দান করত। শ্রেণীগুলির নিজস্ব পঞ্জা এবং প্রতীক-চিহ্ন পর্যন্ত ছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর বসতিগুলিতে খননকার্য চালাবার সময় উৎকীর্ণ লিপি সহ এই রকম কয়েকটি পঞ্জা পেয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা।

ব্যবসা-বাণিজ্য

আলোচ্য যুগ-পর্যায়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য বেড়ে উঠেছিল লক্ষণীয় মাত্রায়। ইতিমধ্যে প্রাক্তন জনবসতিশূন্য এলাকার মধ্যে অনেকগুলিতে বসতি গড়ে উঠেছিল, যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাও হয়ে উঠেছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত, উন্নত হয়ে উঠেছিল বাণিজ্য-পথগুলিও। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এই সময়ে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে ও অংশে অর্থনৈতিক বিশেষীকরণের ব্যাপারটি পরিণত হয়ে ওঠায় সেগুলির মধ্যে পণ্য-বিনিময় স্থায়ী করে তোলাটাও হয়ে দাঁড়িয়েছিল অপরিহার্য। মুদ্রার প্রচলনও এই সময়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। গুপ্ত-রাজাদের আমলে রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয় রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে।

তব্ৎ এই সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ও বিনিময়-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পক্ষে রাস্তাঘাট সর্বদা ও সর্বত্র তেমন অনুকূল ছিল না এবং বণিকদের বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হোত।

স্থলপথ ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে নদীপথও এই সময়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। বিশেষ করে এই ব্যবসা-বাণিজ্য চলে গঙ্গা ও সিন্ধুনদ-বরাবর।

পণ্যদ্রব্যের এই চলাচল ও বিক্রির ব্যাপারটি রাষ্ট্র তদারক করত। কিছু-কিছু পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ছিল রাষ্ট্রের কড়া নিয়ন্ত্রণে এবং কোনো-কোনো পণ্যের বাণিজ্য ছিল স্বয়ং রাজার একচেটিয়া অধিকারভুক্ত। মনুসংহিতায় লেখা আছে যে কোনো বণিককে রাজকীয় একচেটিয়া অধিকারভুক্ত পণ্যদ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য করতে কিংবা ওই পণ্য অন্যত্র রপ্তানি করতে দেখলে রাজা এই বণিকের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বণিকদের মধ্যে এবং বণিক-সঙ্ঘগুলির মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলত।

শহরগুলিতে থাকত বিশেষ-বিশেষ ব্যবসায়ী মহল্লা, দোকানপাট সীমাবদ্ধ থাকত এইসব মহল্লাতেই। 'মিলিন্দ-পহ্ন'এ রাজা মেনাণ্ডারের রাজধানী ও সমৃদ্ধ শহর সাগালা (বা শাকালা)-র একটি বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে যে শহরে বারাণসীর রেশম-বস্ত্র, রত্নালঙ্কার, গন্ধদ্রব্য, ইত্যাদি বিক্রির জন্যে বিশেষ-বিশেষ দোকান ছিল।

গাঙ্গেয় উপত্যকাই ছিল তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অঞ্চল। সেখান থেকে বিভিন্ন বাণিজ্য-পথ ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের দিক-দিগন্তরে। ওই এলাকার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি অবস্থিত ছিল পশ্চিমে ভারুকচ্ছে (গ্রীকদের কাছে বারিগাজা নামে পরিচিত), সিন্ধুনদের বদ্বীপে পাটলে (গ্রীক গ্রন্থাদিতে পাটালিন নামে কথিত), উত্তর-পশ্চিমে পুষ্কলাবতীতে এবং পূর্বে তাম্রলিপ্তিতে (বর্তমান তমলুকে)। 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই' গ্রন্থে পুষ্কলাবতী থেকে দক্ষিণাভিমুখ বাণিজ্য-পথগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব ভারতে উঁচু দরের নানা পণ্যদ্রব্যের জন্যে বারাণসী, কৌশাম্বী ও পাটলিপুত্র এবং পশ্চিম ভারতে উজ্জয়িনী বিখ্যাত ছিল।

'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই'তে উল্লিখিত আছে যে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরে জাহাজ চলাচল করত দক্ষিণদিকে আর 'মিলিন্দ-পহ্ন'এ বলা হয়েছে যে জাহাজের মালিকরা যাতায়াত করতেন সিন্ধুদেশ, বঙ্গদেশ ও করমণ্ডলের উপকূলে। এইসব বাণিজ্য-পথে পশমী কাপড়চোপড় আনা হোত উত্তরাঞ্চল থেকে, মূল্যবান রত্নাদি ও মশলা আসত দক্ষিণ থেকে, ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি আর রেশম আনা হোত

পূর্বাঞ্চল থেকে এবং কাপড়চোপড় ও ঘোড়া পশ্চিম থেকে। সিন্ধুদেশ ও আরাকোসিয়া ছিল তখন ঘোড়ার জন্যে বিখ্যাত।

কুশান এবং গুপ্ত-রাজাদের আমল চিহ্নিত হয়েছিল বহির্বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশের কারণে। প্রথমে কুশান-রাজারা ও পরে গুপ্ত-রাজারা বিদেশের বহু রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখায় এটা সম্ভব হয়েছিল। সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রসারিত হয়েছিল ওই সময়ে। প্রাচীনকালের ভারতীয়রা ছিলেন দক্ষ নাবিক এবং মনে হয় সমুদ্রে মৌসুমী বায়ুকে নিজেদের কাজে লাগানোর ব্যাপারটা তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি গ্রীক জাহাজী ক্যাপ্টেন হিপ্পলাস তা আবিষ্কার করার বহু আগেই (কিছু-কিছু আকর সূত্রে অবশ্য ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে গ্রীকরাও আরও আগে থেকে মৌসুমী বায়ুর চলাচলের খবর জানতেন)। ভারতীয়রা তখন বাণিজ্য করতেন আরবদেশ ও ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলীয় দেশগুলির সঙ্গে এবং তাঁদের জাহাজ সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত যাতায়াত করত। এরও বহু আগে থেকে ভারত ও ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলীয় দেশসমূহের মধ্যে যে সংযোগ বর্তমান ছিল কুশান ও গুপ্ত-যুগের এইসব সমুদ্রযাত্রা ছিল তারই অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণের প্রমাণ। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও জোর ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তখন। সাতবাহন-রাজত্বের বেশকিছু মুদ্রায় জাহাজের ছবি খোদাই করা আছে দেখা যায়। এ-থেকে বোঝা যায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য ক্রমশ বেশি-বেশি গুরুত্ব অর্জন করছিল।

'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই'এর লেখক মালাবার-সমুদ্রতীর বরাবর বড়-বড় ভারতীয় জাহাজ চলাচল করতে দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন এই জাহাজগুলি পরিচিত ছিল 'সাঙ্গারা' নামে। প্রাচীনতম ভারতীয় পুথির একটিতেও এইসব বড় জাহাজকে অভিহিত করা হয়েছে প্রায় একই 'সাঙ্গদ' নামে। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতকগুলিতে মিশরীয় বণিকরা তাঁদের জাহাজ পাঠাতেন ভারতে, আর 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই'এর বয়ান অনুযায়ী ভারতীয় বণিকরা ডাইওস্কোরাইডিস দ্বীপে (সোকোত্রা দ্বীপে) স্থায়ী বাস গড়ে তোলেন।

প্রাচীন জগতের সমুদ্র-অভিযানের ইতিহাসে এক আগ্রহোদ্দীপক কাহিনী হল চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েনের ভারত থেকে চীনে সমুদ্রযাত্রা। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে চেপে প্রথমে তিনি যান শ্রীলঙ্কায়, পরে শেষপর্যন্ত চীনে ফেরার আগে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে যান জাভায়।

ওই যুগে এই প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল রোমের। রোমানরা ভারত থেকে বহু পণ্যদ্রব্যের আমদানি করতেন এবং সেইসঙ্গে ভারতে তাঁদের নিজস্ব কিছু ব্যবসা-কেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। এইসব কেন্দ্রের মধ্যে বিশেষ করে প্রসিদ্ধ ছিল আরিকামেদু-র কেন্দ্রটি (আধুনিক পণ্ডিচেরির কাছে)।

এখানে পাওয়া গেছে রোমান মুদ্রা, অ্যাম্ফোরা বা দুই হাতলওয়ালা ভৃঙ্গার এবং রোমান পানপাত্র। দক্ষিণ ভারত থেকে নানা পণ্যদ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য করা তখন রোমের পক্ষে খুবই লাভজনক ছিল, তাই ভারতের ঠিক ওই অংশেই প্রচুর পরিমাণে রোমান মুদ্রা পাওয়াটা নেহাত আপতিক ঘটনা নয়। রোমান সম্রাট অগাস্টাস ও সম্রাট ট্রাজানের রাজ-দরবারে ভারত থেকে যে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূতকে পাঠানো হয়েছিল নথিভুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে তারও। এছাড়া সম্রাট অগাস্টাসের কাছে রাজা পাণ্ডিয়ানের উপহারসামগ্রী প্রেরণেরও তথ্য পাওয়া গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শেষোক্ত এই রাজা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য-রাজ্যের শাসক।

ভারতীয় মশলা, বিশেষ করে গোলমরিচ এবং সেইসঙ্গে নানা গন্ধদ্রব্য, বিরল ধরনের নানারকম কাঠ, কাপড়চোপড় ও নতুন-নতুন ধরনের পশুপাখি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল পাশ্চাত্ত্যে।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের গোড়ায় ভিজিগথদের রাজা আলারিক রোম অবরোধ করেছিলেন, তখন অবরোধ তুলে নেয়ার শর্ত হিসেবে তিনি দাবি করেছিলেন প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ এবং তা পেয়েও ছিলেন। ধ্রুপদী ইউরোপীয় লেখকরা রোমে প্রদর্শনীর জন্যে পাঠানো ভারতীয় সিংহের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্রাট ক্ল্যডিয়াসের কাছে পাঠানো হয়েছিল কয়েকটি ভারতীয় বাঘ। ভারতীয় কাকাতুয়া রোমে বিশেষরকম জনপ্রিয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

এছাড়া ভারত বিদেশে রপ্তানি করত হাতির দাঁতের নানা জিনিসপত্র, রেশমী কাপড়, মূল্যবান নানা রত্ন ও পাথর, শাঁখ ও শাঁখের তৈরি জিনিসপত্র, কস্তুরী, লোহা ও ইস্পাত। 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই'তে একাধিক উল্লেখ আছে যে নৃত্যগীতে পারদর্শিনী ভারতীয় ক্রীতদাসী মেয়েদেরও রপ্তানি করা হোত বিদেশে। ইতালির পম্পেই শহরে পাওয়া গেছে ভারতীয় দেবী লক্ষ্মীর একটি ছোট হাতির দাঁতের প্রতিমূর্তি। এছাড়া কুশান-আমলের তৈরি হাতির দাঁতের বহু জিনিস আফগানিস্তানের বেগ্রমে পাওয়া গেছে।

কিছু-কিছু পণ্যদ্রব্য আমদানিও করত ভারত। এর উল্লেখ পাওয়া যায় ধ্রুপদী ইউরোপীয় লেখকদের রচনায়, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাওয়া নিদর্শনগুলি থেকে এবং বিশেষ করে 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই' গ্রন্থে। পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলি থেকে এই সমস্ত পণ্য আমদানি করা হোত বারিগাজা বন্দর মারফত। ভারত আমদানি করত মদ্য, প্যাপিরস, ধূপ, কোনো-কোনো ধাতু, দানাশস্য (যেমন, তিল), নানা ধরনের তেল এবং মধু। এই বিশেষ কালপর্যায়ে সুবিখ্যাত রেশম শড়ক পণ্য-সরবরাহের পথ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পথটি যুক্ত করেছিল দূর প্রাচ্যকে পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে এবং পথটি ভারত ঘুরে গিয়েছিল।

ভারতীয় কারুশিল্পীদের মতো বণিকদেরও সঙ্ঘ ছিল তখন এবং সেগুলিকেও বলা হোত 'শ্রেণী'।

গোড়ার দিককার খ্রীস্টীয় শতকগুলিতে বর্ণ ও জাতি

খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতকগুলিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কাঠামোয় পূর্ববর্তী যুগপর্যায়ে সূচিত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলিরই জের চলেছিল। অর্থাৎ, সমাজে মানুষের যথার্থ অবস্থান, তার সম্পত্তি-ভিত্তিক পদমর্যাদাই প্রবল হয়ে উঠছিল ক্রমে-ক্রমে। সেইসঙ্গে তার বংশমর্যাদার আর আগের মতো নির্ধারক তাৎপর্য থাকছিল না। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সমাজে ক্রমশ প্রাধান্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় পূজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদির একমাত্র বা প্রধান অনুষ্ঠাতা হিসেবে ব্রাহ্মণদের ভূমিকার গুরুত্ব যাচ্ছিল কমে।

ফলে বহু ব্রাহ্মণ-পরিবার দরিদ্র হয়ে পড়ছিল এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা বাধ্য হচ্ছিলেন ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য পেশা গ্রহণ করতে। মতাদর্শ ও তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের ভূমিকার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছিল তখন, যদিও পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের নতুন করে পুনরভ্যুত্থান ঘটায় ব্রাহ্মণদের প্রভাব ফের বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অন্যান্য দিকেও নতুন-নতুন এমন সব ব্যাপার ঘটছিল যার ফলে ক্ষুন্ন হচ্ছিল ক্ষত্রিয় বর্ণেরও প্রভাব। প্রজাতন্ত্রগুলি, যাতে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিলেন ক্ষত্রিয়রা, তাদের প্রাধান্যও ক্রমশ কমে আসছিল। সেনাবাহিনীতে যদৃচ্ছ ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগের প্রথা পেশাদার যোদ্ধা ক্ষত্রিয়দের সামাজিক পদমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছিল স্বভাবতই। ফলে ব্রাহ্মণ-পরিবারগুলির মতো ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূতরাও দরিদ্র হয়ে পড়ছিলেন ক্রমাগত। অপরদিকে অন্যান্য বর্ণের লোকজন ক্রমশ বেশি-বেশি করে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত নানা পদে নিযুক্ত হয়ে চলেছিলেন– যা ইতিপূর্বে প্রায় অচিন্তনীয়ই ছিল বলা চলে।

ভারতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাঙ্ এ-প্রসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক একটি ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে যখন তিনি ভারতে ছিলেন তখন গোটা ভারতে বিভিন্ন বর্ণের রাজবংশের সংখ্যা ছিল এই রকম: পাঁচটি ক্ষত্রিয় রাজবংশ, চারটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ, দুটি বৈশ্য ও দুটি শূদ্র রাজবংশ।

বৈশ্য বর্ণের কাঠামোর মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছিল এর আগেই, গুপ্তরাজাদের আমলে সেই ভাঙন আরও এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে। এ-সময়ে দরিদ্র বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে পার্থক্য দাঁড়িয়েছিল যৎসামান্যই; বরং কৃষির দ্রুত অগ্রগতি ও কারুশিল্পের উন্নতির ফলেই স্পষ্টত শূদ্রদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল।

এই যুগের আকর-উপাদানগুলিতে ক্রমশ বেশি-বেশি উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষিকাজে শূদ্র শ্রমিক নিয়োগের। 'পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের বিবরণী' গ্রন্থে হিউয়েন চাঙ শূদ্রদের চাষবাসের কাজে নিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন, অপরদিকে গুপ্ত-যুগের শাস্ত্রসমূহে শূদ্র এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে তখনই টানা হয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্যের সীমারেখা। এইভাবে ঐতিহ্যসিদ্ধ বর্ণবৈষম্য ক্রমে-ক্রমে তার প্রাক্তন তাৎপর্য হারাচ্ছিল। এ-সময়ে বরং বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল জাতিভেদ-প্রথা। বর্ণের মতো জাতিও ছিল বংশগত এবং সুনির্দিষ্ট এককেটি পেশার সঙ্গে যুক্ত। তবে এইসব জাতি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কখনও-কখনও এগুলি পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থে আবদ্ধ ছোট-ছোট গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছু ছিল না। কালক্রমে জাতির এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জাতি-গঠনের এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে আরও দীর্ঘদিন ধরে। শ্রমবিভাগ ও শ্রমের বিশেষীকরণের ফলে শহরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের ও স্তরের কারুশিল্পীদের মধ্যে জাতির সংখ্যা বিশেষ লক্ষণীয়রকমে বেড়ে ওঠে। জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় গ্রামাঞ্চলেও। বর্ণভেদ ছাড়াও একটি স্বতন্ত্র সামাজিক সংগঠন হিসেবে জাতিও টিকে থাকে। আবার সেইসঙ্গে বর্ণভেদের রীতিও কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয়। তবে পরবর্তী যুগে যেমনটি দেখা দিয়েছিল গুপ্ত-যুগে কিন্তু জাতিভেদের নিয়মকানুন ততটা কড়া ছিল না। তখনও পর্যন্ত কিছু-কিছু ক্ষেত্রে জাতিগুলি তাদের ঐতিহ্যগত পেশা বদলাতে পারত।

যেমন, ওই যুগের কিছু-কিছু উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা গেছে যে পশ্চিম-ভারতের রেশম-তন্তুবায় সমিতির সদস্যরা উৎপাদনগত নানা সমস্যার কারণে একদা স্থানান্তরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে অন্য নানা পেশা অবলম্বন করেন এই তাঁতিরা: তাঁদের কেউ-কেউ নেন সৈনিকের পেশা, কেউ-কেউ বা ধনুর্দ্ধর সৈনিকের আবার কেউ-বা চারণ কবির। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ, বর্ণগত স্তরবিভাগের বিচারে তাঁরা উন্নীত হয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে।

ব্রাহ্মণেরা এই জাতির উদ্ভবের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন বর্ণসমূহের মধ্যে পরস্পর-মিশ্রণের যুক্তি দেখিয়ে। বর্ণসমূহের মধ্যে পরস্পর-সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা সম্বন্ধে কড়া নিয়মকানুন ক্রমশ বেশি-বেশি লঙ্ঘিত হতে থাকায় ব্রাহ্মণ্য-বিধানে পারদর্শী পণ্ডিতেরা বর্ণসমূহের 'বিশুদ্ধতা' সংরক্ষণের ব্যাপারে তখন মনোযোগ দিচ্ছিলেন। কেবলমাত্র একই বর্ণসম্ভূত বাপ-মায়ের সন্তানদেরই গণ্য করা হচ্ছিল বিশুদ্ধ ও বৈধ বলে। এমন কি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনকেও বর্ণ-বিভাগের শাস্ত্রীয় 'বিধান' থেকে বিচ্যুতি বলে মনে করা হচ্ছিল। অসবর্ণ-বিবাহসম্ভূত সন্তানদের তাদের বাপ-মা থেকে পৃথক অপর একটি স্তরের বা নির্দিষ্ট একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল। এইভাবেই ব্রাহ্মণেরা চেষ্টা করছিলেন সামাজিক

বিকাশ, বিশেষ করে শ্রম-বিভাগের ফলে উদ্ভূত নতুন-নতুন সামাজিক স্তর-সংগঠন বা জাতির উৎপত্তির কারণ দর্শাতে। ক্রমে-ক্রমে সমাজে অস্পৃশ্য নানা সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব ঘটল। তাদের স্থান নির্দিষ্ট হল চতুর্বর্ণ-ভিত্তিক সমাজের বাইরে এবং সমাজের সবচেয়ে নিচু ধাপে।

এই সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষ বাধ্য হলেন সবচেয়ে হীন ধরনের কাজকর্ম (যথা, আবর্জনা পরিষ্কার, শ্মশান সাফ করা, কসাইয়ের কাজ, ইত্যাদি) করতে। এই অস্পৃশ্যদের সঙ্গে কোনোরকম সংযোগ স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল উচ্চতর জাতিগুলির পক্ষে। কখনও-কখনও দেহে বিশেষ ধরনের উল্‌কি-চিহ্ন এঁকে এঁদের নিচু সামাজিক পদমর্যাদা বুঝিয়ে দেয়া হোত। অস্পৃশ্যদের কোনোরকম রাজনৈতিক অধিকারও ছিল না।

গোড়ার দিককার খ্রীস্টীয় শতাব্দীগুলিতে প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদসমূহ

মহাযান বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার যুগ থেকেই ওই ধর্মের অনুসারকদের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন নানা চিন্তাধারার ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এমন কি একেবারে গোড়ার দিককার ধর্ম-সম্মেলনগুলিতেই বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত বহু মতবাদের ভিন্ন-ভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের অবতারণা ঘটতে দেখা যায়। মৌর্য-যুগ নাগাদ উদ্ভব ঘটে দুটি প্রধান ধারার: 'স্থবিরবাদিন্' (অর্থাৎ যাঁরা ছিলেন প্রবীণ ধর্মপ্রচারকদের শিক্ষার অনুসারী) এবং 'মহাসাঙ্ঘিক' (অর্থাৎ যাঁরা ছিলেন বড়-বড় ভক্ত-সম্প্রদায় বা সঙ্ঘ গড়ার এবং অপেক্ষাকৃত উদার নিয়মকানুন প্রচলনের পক্ষপাতী)।

স্পষ্টত বোঝা যায় যে এই শেষোক্ত চিন্তাধারাই ছিল 'মহাযান' (মহৎ বাহন বা পথ) ধর্মমতের প্রধান ভিত্তি। এই ধর্মমতের অনুসারীরা তখন থেকেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে শুরু করেন 'হীনযান' (লঘুতর বাহন বা অপকৃষ্ট পথ) ধর্মমত থেকে। হীনযান আখ্যাটি অবশ্য বৌদ্ধ রচনাবলীতে খুব বেশি-যে পাওয়া যায় তা নয়। একে সাধারণত বলা হয়েছে তথাকথিত রক্ষণশীল বৌদ্ধদের গৃহীত ধর্মমত। ভারতে এই দুই ধর্মমত-অনুসারীদের মধ্যে খোলাখুলি কোনো সংঘর্ষ হয় নি। গোড়ার দিকে মহাযান-মতাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। হিউয়েন চাঙের মত অনুযায়ী মহাযান-পন্থীরাও তখন 'বিনয়'এর হীনযানী নীতিগুলি মেনে চলতেন। এমন কি খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের চীনা পরিব্রাজক ই ত্‌সিঙ উল্লেখ

করছেন যে উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে একই বৌদ্ধমঠে তখন হীনযান ও মহাযান-মতাবলম্বীরা পাশাপাশি বাস করতেন। তিনি লিখছেন যে ওই উভয় মতাবলম্বীরা একই 'বিনয়'-বিধিগুলি মেনে চলতেন এবং স্বীকার করতেন বৌদ্ধধর্মের চতুঃমহাসত্যকে। অবশ্য যাঁরা শ্রদ্ধানিবেদন করতেন বোধিসত্ত্বদের এবং মহাযান-সূত্রগুলি অধ্যয়ন করতেন তাঁরাই গণ্য হতেন মহাযান-পন্থী হিসেবে, এছাড়া বাকিরা ছিলেন হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ।

মনে হয় প্রাচীনতম মহাযানী পুথিগুলি লেখা হয়েছিল সেই সুদূর খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, তবে এই মতবাদের অনুসারী অধিকাংশ পুথিই অবশ্য রচিত হয় খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে। এইসব পুথির মধ্যে প্রাচীনতম কয়েকটি হল 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র'সমূহ। এই শেষোক্ত সূত্রগুলির চীনা অনুবাদ খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষদিকে প্রকাশিত হয়। মহাযান-বৌদ্ধমতের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহ হল 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্র', 'লঙ্কাবতরসূত্র' এবং 'সুবর্ণপ্রভাসসূত্র'।

মহাযান-পন্থীরা অবশ্য হীনযান-পন্থাকে তাঁদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের ক্ষতিকারক প্রতিপক্ষ কিংবা ভ্রান্ত মতবাদ বলে মনে করতেন না। তাঁরা শুধু মনে করতেন যে এই শেষোক্ত মতবাদটি বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচারের পক্ষে যথোপযুক্ত নয় এবং বড় বেশি ব্যক্তিতাবাদী। যোগাচার-বিষয়ক মহাযানী চিন্তাধারার অন্যতম প্রবক্তা আসঙ্গ হীনযানী চিন্তাধারার সীমাবদ্ধ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেননা হীনযান-মতবাদ অনুযায়ী, মানুষের শুধুমাত্র নিজের মুক্তির জন্যেই চেষ্টিত হওয়া উচিত, মনোযোগী হওয়া দরকার ব্যক্তি হিসেবে নিজ বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্যেই। অপরপক্ষে মহাযান-পন্থা গুরুত্ব আরোপ করেছে জীবে দয়া ও সাহায্যদানের ওপর, বলেছে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে সকল জীবন্ত প্রাণীর দিকে করুণা ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করার কথা। মহাযান-পন্থীরা মনে করতেন যে তাঁদের ধর্মমতই হল বুদ্ধদেবের সত্যিকার যা শিক্ষা তারই পুনরভ্যুদয়স্বরূপ এবং জোর দিয়ে বলতেন যে হীনযান-পন্থীরা ('বিভাজবাদিন্' ও 'স্থবিরবাদিন্'রা) নিজেদের অহংবাদ ও ব্যক্তিতাবাদের বশে বুদ্ধদেবের সেই আসল শিক্ষাকেই বিকৃত ও শ্বাসরুদ্ধ করে তুলেছেন। এই কারণেই তাঁরা নিজেদের অনুসৃত মতবাদের নাম দেন 'মহৎ পথ' এবং মানবমুক্তির ধারণাটিকে তাঁরা যে কত উদারভাবে ব্যাখ্যা করছেন ও বুদ্ধের শিক্ষার সপক্ষে অনুসারকদের বৃহৎ এক সংখ্যাকে-যে টেনে আনছেন এইভাবে তা-ই বোঝাতে চান।

মহাযান-মতবাদের অন্তর্গত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের একটি হল 'বোধিসত্ত্ব'-সম্পর্কিত। বোধিসত্ত্বের এই ধারণাটি অবশ্য হীনযান-মতবাদেও পাওয়া যায়, বিশেষ করে পরবর্তী কালের 'সর্বাস্তিবাদিন্'-চিন্তাধারার অনুসারকদের মধ্যে (এঁদের মতে,

বোধি অর্থাৎ বুদ্ধত্বলাভের আগে গৌতম শাক্যমুনি নিজেই ছিলেন এক বোধিসত্ত্ব)। এই বোধিসত্ত্ববাদ মহাযান-পন্থীদের কাছে বহুগুণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মহাযানীরা বোধিসত্ত্ব বলতে বুঝেছেন এমন এক মহাশক্তিধরকে যিনি বুদ্ধত্ব অর্জনের যোগ্যতা রাখেন এবং নির্বাণলাভেরও সমীপবর্তী হয়েছেন, কিন্তু অন্যান্য জীবকুল ও গোটা জগতের প্রতি পরম করুণাবশে নির্বাণলাভ পরিহার করে চলেছেন। হীনযানীদের আদর্শ অর্হন্তত্ব অর্জনের পরিবর্তে বোধিসত্ত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মহাযানীরা।

মহাযানীরা মনে করতেন যে হীনযান-পন্থার প্রধান একটি দুর্বলতা হল এই মতবাদের লক্ষ্যের সংকীর্ণতা, অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজের জন্যেই মুক্তির সন্ধান। এমন কি তাঁদের মতে অর্হন্ত্ও (বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষও) তাঁর আন্তর সত্তার বন্ধন থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেন না, কেননা অন্যেরা যে সংসারের ফাঁদে, জন্মমৃত্যুর বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে আছে সে-কথা চিন্তা না করে তিনি শুধু নিজেই নির্বাণলাভের চেষ্টা করেন। মহাযানীরা বোঝালেন যে অর্হন্ত্ নিজের ও অন্যদের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্যের পূর্ণ নিরাকরণে অসমর্থ, আর তাই অসমর্থ নিজের 'অস্তিত্বহীনতা' বা তুরীয় অবস্থা অর্জনেও। এ থেকেই বোঝা যায় যে মানুষের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ পথ হল নিজের মুক্তির জন্যে সংহতমনোযোগ অর্হন্তের আদর্শ অনুকরণ করা নয়, বোধিসত্ত্বের আদর্শই অনুসরণ করা, কেননা বোধিসত্ত্ব অন্যদের— প্রাত্যহিক জীবনবন্ধনে আবদ্ধ মানুষের—সাহায্যকল্পেই নিজে জাগতিক সুখদুঃখের জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

মহাযান-সম্প্রদায়ের সদস্যরা হীনযানী ধর্মবিশ্বাসের সংকীর্ণতা পছন্দ করতেন না। হীনযান-ধর্মমত অনুযায়ী কেবলমাত্র ভিক্ষু সন্ন্যাসীরাই ঐহিক জীবনযাত্রা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয়ার পরই নির্বাণলাভ করতে পারতেন, অথচ মহাযান-সম্প্রদায় বিশ্বাস করতেন যে গৃহী ভক্তদের পক্ষেও পরম নির্বাণলাভ সম্ভব। মহাযান-ধর্মমতের পুথিগুলিতে বারবারই জোর দিয়ে একথা বলা হয়েছে যে বোধিসত্ত্বরা কেবল নিজেদের জন্যেই নির্বাণের প্রত্যাশী ছিলেন না, সমগ্র জগৎ-সংসারের সুখ অর্জনের, সকল জীবের নির্বাণলাভের প্রয়াসী ছিলেন তাঁরা। বোধিসত্ত্ব যিনি অন্যদের সাহায্যকল্পেই তিনি স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্ট বরণ করে নিতেন এবং যতদিন-না অন্য সবাই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেন ততদিন তিনি নিজেও মুক্তি চাইতেন না। এই দিক থেকে বুদ্ধের সকল ভক্তই এক ও অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা হিসেবে গণ্য হতেন। মহাযান-বৌদ্ধধর্মের এই সমস্ত তত্ত্বকথা গৃহী ভক্তদের কাছে এই মতবাদটিকে অত্যন্ত প্রিয় করে তোলে, কেননা এই মত করুণাপরবশ বোধিসত্ত্বদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সহ প্রশস্ত করে তুলেছিল তাঁদেরও 'মুক্তির পথ'।

তবে মহাযান-ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধের এবং 'বুদ্ধ' কথাটির আসল ভাবমূর্তির ব্যাখ্যা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। হীনযান-সম্প্রদায় সত্যিকার ঐতিহাসিক এক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই দেখতেন বুদ্ধদেবকে, যিনি নাকি ভক্তদের 'মুক্তি'র পথ ও উপায় নির্দেশ করে গেছেন, কিন্তু মহাযান-সম্প্রদায় বুদ্ধকে মনে করতেন 'পরম স্বয়ম্ভূ' এক সত্তা, সমগ্র অণুবিশ্বের ভিত্তিস্বরূপ বলে এবং এইভাবে তাঁকে মণ্ডিত করেছিলেন সুনির্দিষ্ট এক অধিবিদ্যাগত ও ধর্মীয় তাৎপর্যে। তাঁদের মতে, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীই বুদ্ধে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ও যোগ্যতা নিয়ে জন্মেছে, কারণ তার অন্তরে সুগুপ্ত আছে বুদ্ধত্বের একটি করে কণা। এই বুদ্ধত্ব আবার অস্তিত্বময় জগতের সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং নিজেকে প্রকাশ করছে একই বুদ্ধের ত্রিরূপ বা 'তিনটি কায়া'র মধ্যে দিয়ে। যথা, 'ধর্মকায়' বা ধর্মের দেহ, অর্থাৎ মহাজাগতিক প্রকাশ, 'সম্ভোগকায়' বা উপভোগের দেহ, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত প্রাণীদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রকাশ, এবং 'নির্মাণকায়' বা সৃষ্ট দেহ (এটি 'রূপকায়' বা প্রতিরূপের দেহ নামেও পরিচিত), অর্থাৎ মানুষের মূর্তিতে বুদ্ধের প্রকাশ। মহাযানীরা একাধিক বুদ্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন অন্যতম। তাঁরা মনে করতেন 'তিনটি কায়া'র মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ মারফত বুদ্ধ মহাজাগতিক, দিব্য ও পার্থিব জগতের সকল প্রাণীর মুক্তিবিধান করেন।

মহাযান-ধর্মমত অনুযায়ী বুদ্ধগণ ও বোধিসত্ত্বগণ ভজন-আরাধনার পাত্র। ফলে মহাযানীদের মধ্যে পূজার আনুষ্ঠানিক ও আচারগত দিকগুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব অর্জন করে। বৌদ্ধ শিল্পকলাতেও বুদ্ধ পরম সত্তা হিসেবে চিত্রিত হতে থাকেন।

বোধিসত্ত্বদের সাহায্যে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব, একথা মহাযান-মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করতেন বলে মূল্যবান উপহার ইত্যাদি ভেট দিয়ে তাঁরা বোধিসত্ত্বদের কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করতেন। এইভাবে খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতকগুলিতে বৌদ্ধমঠগুলি বহুবিধ মূল্যবান সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। রাজারাজড়া ও বুদ্ধের অন্যান্য ধনী ভক্তরা মঠগুলিকে দান করতেন জমি-জায়গা, প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও অন্য নানা মূল্যবান সামগ্রী।

নির্বাণ সম্বন্ধে মহাযান-ধর্মমত কতগুলি অস্বাভাবিক বিশিষ্ট-লক্ষণে চিহ্নিত ছিল, আবার মহাযান-মতের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারা নির্বাণের ধারণাটিকে উপস্থাপিত করত ভিন্ন-ভিন্ন ধরনে। তবে হীনযান মতের মতো মহাযান-ধর্মমত নির্বাণকে বাস্তব জগতের নির্বাপণ বা পরিত্যাগ বলে গণ্য করত না, গণ্য করত বাস্তবতা হিসেবেই। মহাযান-সম্প্রদায় 'পারমিতা'সমূহের (অর্জিত পূর্ণতাসমূহের) তত্ত্বকে আরও বিকশিত করে তোলে এবং প্রচার করে যে এগুলির চর্চার মধ্যে

দিয়ে ভক্তজন পূর্ণাঙ্গ নৈতিক বিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারেন। এই পারমিতা ছিল ছয় প্রকারের: বদান্যতা, ধার্মিক আচরণ, সহনশীলতা, আত্মিক শক্তি, ধ্যান ও স্বজ্ঞা। বলা হয় যে এগুলির চর্চা মানুষকে পরম চৈতন্যের ধারণা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। প্রতিটি পারমিতাকে দেখা হয় ‘পরম জ্ঞান’ বা প্রজ্ঞা অর্জনের পথে একেকটি পদক্ষেপ হিসেবে। অতএব দেখা যাচ্ছে হীনযান ও মহাযান-সম্প্রদায়দুটির গৃহীত ধর্মমতের মৌল সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের থেকে ব্যাপকভাবে পৃথক ছিল। বস্তুত বৌদ্ধ ধর্মমতে বিশেষজ্ঞ কিছু-কিছু পণ্ডিত এমন কি এই দুটি ধর্মমতকে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি মতবাদ হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তবে অন্যেরা মনে করেন যে মহাযান-ধর্মমত হীনযানী ধ্যানধারণারই সম্প্রসারণ ও বিশদীকরণমাত্র।

এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের যথেষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যার ব্যাপারে উভয়েই কতগুলি একইরকম মূল ধ্যানধারণার অধিকারী ছিল। উভয় সম্প্রদায়ই ‘মানব-মুক্তি’ ও তা অর্জনের উপায় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করত ভক্তদের, মনে করত যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে তা-ই পরিবর্তনশীল ও অচিরস্থায়ী. উভয়েই কর্মবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং মনে করত ভিন্ন-ভিন্ন পথে হলেও নির্বাণলাভ মানুষের সাধ্যের মধ্যে।

মহাযান-দর্শনের বিভিন্ন ধারা

খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে উপরোক্ত এইসব মহাযান-দর্শনের ধারার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিল ‘মাধ্যমিক’ এবং ‘যোগাচার’ নামের মতবাদ-দুটি। অসামান্য দুই দর্শনশাস্ত্রী নাগার্জুন ও আর্যদেবকে (উভয়েই সম্ভবত খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মানুষ) প্রথমোক্ত মাধ্যমিক ধারার প্রবক্তা মনে করা যেতে পারে। তবে মহাযান ধর্মমত সংক্রান্ত পুথি এই দুই দর্শনশাস্ত্রীর আমলেও প্রচলিত ছিল এবং নাগার্জুন তাঁর গ্রন্থে সেইসব পুথির কথা উল্লেখও করেছেন।

মাধ্যমিক দর্শনের মূল ভিত্তি হল ‘শূন্যতা’র তত্ত্ব এবং এ-কারণে এই চিন্তাধারাটিকে প্রায়শই চিহ্নিত করা হয়েছে ‘শূন্যবাদ’ বলে। নাগার্জুনের মতে, নিখিল বিশ্বে ঐহিক বা আত্মিক যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে তা-ই অবাস্তব। আবার সেই সঙ্গে তাঁর মতে শূন্য হল অনস্তিত্বের নেতি, দ্বৈতভাবের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। অতএব শূন্য নেতিবাচক নয়, অস্ত্যর্থক তাৎপর্যের দ্যোতক। এ থেকে মাধ্যমিক-পন্থীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে নির্বাণ এবং সংসার দুই পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার নয়। তাঁদের শিক্ষা অনুযায়ী, সবক'টি পারমিতার চর্চার ফলে এবং নৈতিক

শুদ্ধতার চরম স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয়ে যায়, ভেদ লুপ্ত হয় নির্বাণ ও জগৎ-সংসার, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে। বুদ্ধের শিক্ষা ও তাঁর ধর্মকে মাধ্যমিক-পন্থীরা বললেন 'শূন্য'। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার নাগার্জুনের এই মতবাদ মহাযান-ধর্মমতের বিকাশের ক্ষেত্রে এবং প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সূচনায় ভারতের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যদিকে আসঙ্গ ও বসুবন্ধু (খ্রীস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতক) এই দুই দর্শনশাস্ত্রীকে বলা হয় 'যোগাচার' ধারার প্রতিষ্ঠাতা। এই দার্শনিক ধারার অনুসারীরা কেবলমাত্র মানুষের চেতনা বা মনকেই বাস্তব বলে মনে করতেন এবং গোটা ঐহিক জগৎকে বলতেন 'অবাস্তব মায়ামাত্র'। এর ফলে যোগাচারীরা তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন মানুষের চেতনা ও মানুষের ধ্যানে মনোনিয়োগের শক্তিকে নিখুঁত করে তোলার পদ্ধতিগুলির দিকে।

মহাযান-ধর্মমত (বিশেষ করে এই মতবাদের মাধ্যমিক ধারাটি) এশিয়ার বহু দেশে এবং বিশেষ করে দূর প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সে-সব দেশে স্থানীয় ধর্মমতগুলির সঙ্গে এটি সহজে মিশ খেয়ে যায় ও স্থানীয় আচারবিধি আত্মসাৎ করে নেয় এই ধর্মমত। তবে খোদ ভারতেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়রকমে হ্রাস পায় গুপ্ত-রাজাদের আমলে।

বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও হিন্দুধর্ম

খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে মহাযানী ধ্যানধারণার প্রসার এবং হীনযান ও মহাযান-দর্শনের অগ্রগতি সত্ত্বেও গুপ্ত-যুগে ও বিশেষ করে তার অব্যবহিত পরে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেল। যে-দেশে একদা তার উদ্ভব হয়েছিল সেই দেশেই বৌদ্ধধর্ম তখন হয়ে পড়ল পশ্চাদপসরণে রত। ওই সময়ে ভারতে আগত চীনা পরিব্রাজকরা অনেক সময় জনপরিত্যক্ত বৌদ্ধমঠ দেখতে পেয়েছেন, তাছাড়া গুপ্ত-যুগের বিভিন্ন রচনায় দেখা গেছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি আক্রমণ চালাতে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করলে বলতে হয় যে গুপ্ত-রাজারা বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা করতেন। তবে সেইসঙ্গে এ-ও স্পষ্ট যে ওই রাজারা অনুসরণ করতেন ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি। কালক্রমে উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীর হয়ে দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র, তবে ইতিমধ্যে বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে গাঙ্গেয় উপত্যকায়।

বৌদ্ধধর্মের এই অবক্ষয় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমকালীন—তা হল হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান। তবে বাস্তবক্ষেত্রে

অবশ্য এই শেষোক্ত ধর্মের বহুবিধ দিক ও সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার-বিচার দেশ থেকে কখনোই একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। যে-আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে হিন্দু-ঐতিহ্য বিভিন্ন স্থানীয় ধর্মের আচারবিধিকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, কার্যত পরস্পর-নিরপেক্ষ বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার আকারে একই কালে বহুবিধ ব্যাখ্যার অস্তিত্ব যেভাবে মেনে নিয়েছিল হিন্দু-দর্শন, ঐতিহ্যসিদ্ধ সামাজিক নানা প্রথা যেভাবে সংরক্ষিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছিল এই ধর্মের আওতায় (এটি সবচেয়ে বেশি করে বর্ণবৈষম্য প্রথার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)—তাতে এই অসামান্য ধর্মীয় সংশ্লেষণের ফলে হিন্দুধর্ম ভারতের বহুবিচিত্র সামাজিক স্তরগুলির কাছে অন্যান্য সংস্কারবাদী ধর্মমতের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। মধ্য-যুগের সূচনা নাগাদ হীনযান বৌদ্ধধর্ম প্রথমে শ্রীলঙ্কায় ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রধান এক ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর কার্যত লুপ্তই হয়ে যায় ভারত থেকে। বৌদ্ধধর্মের 'উত্তরাঞ্চলীয়' সংস্করণ (বা মহাযান-ধর্মমত) এর পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে কিছু-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে ছিল বটে, তবে ক্রমশ পুরাণ-রচনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে তা হিন্দুধর্মের সদৃশ হয়ে পড়ে। হিন্দুধর্মও সে-সময়ে বৌদ্ধধর্মের ওপর ক্রমশ বেশি-বেশি প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং বৌদ্ধ মঠগুলিতেও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যেতে থাকে। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ্য যে বুদ্ধ তখন গণ্য হন হিন্দুদের দেবতা বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম বলে। খ্রীস্টীয় অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুধর্ম ক্রমে বিশুদ্ধ ভারতীয় মহাযান-ধর্মমতের সবক'টি ধারাকেই চিরকালের মতো গ্রাস করে নেয়।

গুপ্ত-যুগ নাগাদ রক্ষণশীল ব্রহ্মণ্যধর্মেও পরিবর্তন ঘটে যথেষ্ট। প্রাচীন দেবদেবীদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যায় ততদিনে এবং বেদ ও ব্রাহ্মণসমূহে লিপিবদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে তখন মনে হতে থাকে নিতান্তই অকেজো আর সেকেলে আর অযথা-জটিল নানা পদ্ধতি বলে। তৎসত্ত্বেও উপনিষদসমূহ ও ভগবদ্‌গীতার অন্তর্গত নানা ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্বকথা যে-কোনো স্থানীয় ধর্ম-সম্প্রদায় ও ধর্ম-বিশ্বাসকে শতাব্দী-বন্দিত ব্রহ্মণ্য ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত করে তুলতে সাহায্য করে।

যে-ধর্মমত হিন্দুধর্ম (অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, হিন্দুদেশী ধর্ম বা ভারতীয় নিয়মকানুন ও আচারবিচার) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে বেশ কয়েক শতাব্দী পরে (যখন ভারতে আরব-আগ্রাসনের ফলে দেশের বহুবিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে সামগ্রিক কোনো একটি সংজ্ঞায় অভিহিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে) তার উত্থান শুরু হয় গুপ্ত-যুগেরও বহু পূর্বে এবং তা সংযুক্ত ব্রহ্মণ্যবাদের পুরাণকথাকে দেশজ উপজাতিগুলির (এবং সেগুলি অধিকাংশই ছিল দ্রাবিড়) স্থানীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে।

বৈষ্ণবধর্ম

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রধান দুটি ধর্মমতের প্রথমটির, অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মের, উদ্ভব ঘটে সেই সুদূর মৌর্য-যুগে, তবে বৈষ্ণবধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে একমাত্র গুপ্ত-রাজবংশের আমলেই। এই ধর্মের প্রধান দেবতা বিষ্ণু প্রাচীনতম ভারতীয় পুথিগুলিতে নারায়ণ নামে আখ্যাত এবং সে-সময়ে এই দেবতাটি উত্তর ভারতের দেশজ উপজাতিগুলির পূজিত ছিলেন বলেই মনে হয়। ব্রাহ্মণসমূহে ইনি উল্লিখিত হয়েছেন মহা-পরাক্রান্ত এক দেবতা হিসেবে এবং কখনও-কখনও স্থান পেয়েছেন এমন কি পরবর্তী বৈদিক যুগের দেবতা ও 'ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিকারী' প্রজাপতির চেয়েও উচ্চ পদমর্যাদায়।

পরবর্তীকালে নারায়ণ হয়ে দাঁড়াল সূর্য-দেবতারই অন্যতম বৈদিক যুগীয় রূপান্তর বিষ্ণুর অপর একটি নাম। যতদূর মনে হয় বিষ্ণু নামটির উদ্ভব ঘটেছিল স্থানীয়ভাবে। পরে অবশ্য এই দেবতাটিকে শুধুমাত্র বিষ্ণু নামেই অভিহিত করা হতে থাকে এবং যে-ধর্মান্দোলন এঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে ঘোষণা করে তা পরিচিত হয় বৈষ্ণবধর্ম নামে।

ভারতে এই বিশেষ ধর্মের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ অনেকখানি পরিমাণে ব্যাখ্যা করা যায় নানাবিধ স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস ও পূজা-অনুষ্ঠানকে আত্মস্থ করে নেয়ার ব্যাপারে হিন্দুধর্মের এই শাখাটির সত্যিকার অনন্য সামর্থ্য দিয়ে। এটা সম্ভব হয়েছিল এই ধর্মের অন্তর্গত বিশদ বিযূহ ও অবতারবাদের দৌলতে। 'বিযূহ'-তত্ত্বের মূলকথা হল এই যে সর্বশক্তিমান দেবতা নারায়ণ-বিষ্ণু অনবরত আত্মপ্রকাশ করে থাকেন চারটি ভিন্ন-ভিন্ন মূর্তিতে। ফলে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় স্থানীয় দেবতাকে বিষ্ণুর ধ্যানমূর্তির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া সম্ভব হল। এই সমস্ত স্থানীয় দেবতার মধ্যে ছিলেন আবার বাসুদেব, যিনি পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন কি স্বয়ং নারায়ণের চেয়েও যেন বেশি প্রধান হয়ে ওঠেন। মধ্যযুগে বিষ্ণুর বহু কল্পিত গুণাবলী বাসুদেবে আরোপ করতে দেখা যায়, অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতো স্বর্গের পক্ষিরাজ গরুড়কেও যুক্ত করে দেখা হয় বাসুদেবের সঙ্গে। বাসুদেবের পূজা, এবং পরে বিষ্ণুপূজাও, কৃষিজীবী উপজাতিসমূহের উপাস্য দেবতা সঙ্কর্ষণের পূজাকেও নিজের অঙ্গীভূত করে নেয়।

বিষ্ণুর আরাধনায় ক্রমে অপর এক দেবতা কৃষ্ণও যুক্ত হয়ে পড়েন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতাদের একজন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেবতা কৃষ্ণকে বর্ণনা করা হয়েছে গোপীদের সঙ্গে প্রণয়লীলায় মত্ত চপলমতি এক যুবক হিসেবে। একমাত্র বিযূহ-তত্ত্বের বলেই বাসুদেব ও কৃষ্ণকে বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

এর চেয়ে আরও বেশি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের দ্যোতক হল অবতারবাদের সঙ্গে যুক্ত বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয়-প্রবণতা। 'অবতার' শব্দটি 'অবতরণ' থেকে উদ্ভূত, অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এর অর্থ, 'মানুষের স্বার্থরক্ষাকল্পে দেবতার মর্ত্যভূমিতে জন্ম-পরিগ্রহ'। গোড়ার দিককার বৈষ্ণব সাহিত্যে নারায়ণ-বিষ্ণুর চার অবতারের উল্লেখ আছে, তবে পরবর্তী কালে এই অবতারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ঊনত্রিশে। বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসকে একটিমাত্র ধর্মের অঙ্গীভূত করার এই নীতি গ্রহণের ফলে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে বহুবিচিত্র ধর্মের উপাস্য বিপুল সংখ্যক দেবতাকেও গ্রহণ করা সম্ভব হয়। স্থানাভাবে এখানে শুধু সবচেয়ে বিখ্যাত কয়েকটি অবতারের নাম করা চলতে পারে। যেমন, যে-সমস্ত মূর্তি ধরে বিষ্ণু মর্ত্যে অবতীর্ণ হন তাদের মধ্যে তিনটিই হচ্ছে মনুষ্যেতর প্রাণীর: প্রকাণ্ড এক বন্য বরাহ-মূর্তিতে তিনি মানুষকে উদ্ধার করেন প্রলয়পয়োধিজল থেকে; প্রলয়ের সময় মীনমূর্তি ধরে ভারতীয় জাহাজকে নিরাপদ তীরে পৌঁছে দেন তিনি এবং মর্ত্যের অধিপতি মনুকেও উদ্ধার করেন সেইসঙ্গে এবং কূর্মরূপে সমুদ্রমন্থনে তিনি অংশ নেন। এছাড়া বীর রামাবতার রূপে পত্নী সীতাকে (কৃষির দেবী) রাক্ষসরাজ রাবণের কবল থেকে উদ্ধার করেন ও জয় করেন লঙ্কাদ্বীপ। রামসীতার এই শেষোক্ত কাহিনীটিই পরে বাল্মীকির বিখ্যাত রামায়ণ মহাকাব্যের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

বৈষ্ণবধর্মের আদিপর্বের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে সাহিত্যগত সূত্র এবং ওই যুগের উৎকীর্ণ শিলা, তাম্র, ইত্যাদি লিপিসমূহ থেকে সংগৃহীত তথ্যের তুলনামূলক বিচার খুবই আকর্ষণীয় একটি ব্যাপার।

পাণিনির সংকলিত ব্যাকরণে (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম কি চতুর্থ শতক) বাসুদেব-উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকশ্রুতি অনুসারে, বাসুদেব ছিলেন ক্ষত্রিয়-বীর, বৃষ্ণিদের ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীর নায়ক (এই গোষ্ঠীতে বাসুদেব-পরিবার বিশেষরকম সুবিধাভোগী ছিলেন)। পতঞ্জলি (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তাঁর রচনায় বাসুদেবের এই দুই বৈশিষ্ট্যকেই কাজে লাগান: সেখানে বাসুদেবের অবতারণা করা হয়েছে ক্ষত্রিয় হিসেবে এবং উপাসনার পাত্র হিসেবে। ভগবদ্‌গীতায় বাসুদেবের এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে বিশেষরকম সবিস্তারে, সেখানে বাসুদেব পরম দেবতা ভগবতের অন্যতম মর্ত্যরূপে আবির্ভূত।

মেগাস্থেনিসের বিবরণীতে এই 'ভারতীয় হেরাক্লিস'এর বেশকিছু উল্লেখ প্রমাণ দেয় যে মৌর্য-যুগের গোড়ার দিকেই বাসুদেব-উপাসনা এদেশে বহুল প্রচলিত ছিল। সেল্যুকস-বংশীয়দের রাজ্যের এই রাষ্ট্রদূত বাসুদেবের বর্ণনা দিয়েছেন বীর যোদ্ধা ও দৈত্যদমনকারী হিসেবে। ভারতীয় আকর সূত্রগুলি অনুযায়ী বাসুদেব-পূজা বিশেষ করে জনপ্রিয় ছিল মথুরায়। মেগাস্থেনিসও বাসুদেব ও

হেরাক্লিসের মধ্যে তুলনা-প্রসঙ্গে এই তথ্যটি উল্লেখ করেছেন। একথা মনে করা যেতে পারে যে এই গ্রীক বিবরণীকার বৈষ্ণবধর্মের গোড়ার দিকের সেই যুগটির বর্ণনা দিয়েছেন যখন বাসুদেব দেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন বটে তবে কৃষ্ণের ভাবকল্পনার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যান নি।

বেস্‌নাগার-এ পাওয়া বিখ্যাত হিলিওডোরাস-লিপিতে (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) 'পরমেশ্বর' বাসুদেবের উপাসনার উল্লেখ আছে। এই লিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচার করতে হলে বলতে হয়, বাসুদেব-উপাসনা তখন-যে কেবলমাত্র ভারতীয়দের মধ্যেই বহুপ্রচলিত ছিল তা-ই নয়, উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী গ্রীকদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তা।

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষদিকের অন্যান্য উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা চলে যে মোটামুটি ওই সময়ে বিষ্ণু, নারায়ণ ও বাসুদেবের উপাসনা মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিকের শতাব্দীগুলিতে বৈষ্ণবধর্মের উপাস্য দেবতাদের (বিষ্ণু, বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের) নামে তখনই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল, পরে এই পদ্ধতিটিই দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের এক বৈশিষ্ট্য হিসেবে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে দেবতা সঙ্কর্ষণের নামে বহুতর মন্দির প্রতিষ্ঠার।

যে-বৈশিষ্ট্যের কারণে হিন্দুধর্ম শুধু ব্রহ্মণ্যধর্ম থেকেই নয় অন্যান্য অধিকাংশ ধর্ম থেকেও স্পষ্টভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়ে আছে তা হল, এই ধর্মের প্রধান উপাস্য দেবতা একজন নন, তিনজন, এবং তাঁরা সকলেই সমান পদমর্যাদার অধিকারী। 'ত্রি-ঈশ্বর'এর এই বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্করণ 'ত্রিমূর্তি' নামে পরিচিত। এই ত্রিমূর্তি হলেন ব্রহ্মা ('সৃষ্টিকর্তা'), বিষ্ণু ('রক্ষাকর্তা') ও শিব ('ধ্বংসকর্তা')—এই তিন দেবতা। এঁদের মধ্যে প্রথম জন ব্রহ্মা বৈদিক দেবদেবীর তালিকারও অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী কালের ধর্মসাধনায় ইনি সৃষ্টিকর্মের বিশেষ ধারণাটিরই মূর্ত রূপ বলে গণ্য হয়েছেন, নিজ অধিকারবলে স্বতন্ত্র এক দেবতা হিসেবে ততটা নয়। তাই দেখা যায় বিষ্ণু এবং শিবের নামে (এবং পরবর্তীকালে হিন্দু-দেবদেবীর মধ্যে যিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী হয়েছেন সেই স্ত্রী-দেবতা শক্তির নামেও) বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অথচ ব্রহ্মার নামে কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কিনা সন্দেহ—যদিও ধর্মীয় পুথিগুলিতে ব্রহ্মার নাম উল্লিখিত হয়েছে প্রায়শই। আবার সেইসঙ্গে এই তিন দেবতার প্রত্যেকেই কল্পিত হয়েছেন সমগ্রভাবে এই জগতের প্রতীক হিসেবে। যেমন, বিষ্ণুর উপাসকরা তাঁকে শুধু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্তা বলেই গণ্য করতেন না, তার সৃষ্টি ও ধ্বংসকর্তা বলেও মনে করতেন। তেমনই শিবকেও মনে করা হোত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওই তিন মূল রহস্যের নিয়ন্তা

বলে। হিন্দুধর্মের এই বৈশিষ্ট্যটি অবশ্যম্ভাবী রূপেই ছিল ধর্মীয় সহনশীলতার উৎস এবং এর ফলেই এই ধর্মের পরিধির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার সহ-অবস্থান সম্ভব হয়েছিল।

শৈবধর্ম

বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি শৈব ও শাক্ত মতবাদও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ব্রহ্মণ্য-ধর্মসাহিত্যে শিব বর্ণিত হয়েছেন বৈদিক দেবতা রুদ্রের সগোত্র হিসেবে। এই রুদ্র হলেন মানুষের প্রতি শত্রু-মনোভাবাপন্ন নিষ্ঠুর একদল ভুতপ্রেতে পরিবেষ্টিত ঝঞ্ঝাবজ্র ও প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের দেবতা। তবে শিব ও রুদ্রকে এইভাবে এক করে দেখাটা বহু পরবর্তী এক পর্যায়ে ঘটেছিল। বস্তুত এটা ছিল ব্রহ্মণ্যধর্মের মধ্যে স্থানীয়ভাবে উপাস্য এক দেবতাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার ব্যাপার এবং এই দেবতাটির পুজো ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণাংশের জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। নারায়ণ-বিষ্ণুর উপাসনা যেমন ছিল দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন, এটিও ছিল ঠিক তেমনই ব্যাপার।

শিবের উপাসনা উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত। শিব নৃত্য করছেন শ্মশানে, শবদাহের চিতাভস্মে তাঁর দেহ আবৃত এবং তাঁর গলায় দুলছে ফুলমালার পরিবর্তে নরকরোটির মালা। নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর বেশ ধরে যখন তিনি মর্ত্যে আবির্ভূত হন, তখন মানুষের মাথার খুলি হয় তাঁর ভিক্ষাপাত্র। তাঁর অন্যান্য সাজসজ্জার মধ্যেও প্রচণ্ড শক্তি ও পরাক্রমের প্রকাশ ঘটেছে: পরনে তাঁর বাঘছাল, হাতে তাঁর শস্ত্র ত্রিশূল, ধনুক আর কুঠার। তবে ধ্বংসলীলা হল তাঁর দ্বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অন্যতম। শিব যেমন সন্ন্যাস ও পশুবলির দেবতা, তেমনই দৈনন্দিন জীবনেও তিনি মানুষের রক্ষাকর্তা।

পাণিনি, পতঞ্জলি ও মেগাস্থেনিসের রচনাবলীতে মগধ, মৌর্য ও শুঙ্গ-রাজাদের আমলে উত্তর ভারতে শৈবধর্মের প্রসারের কথা জানা যায়। পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে শিব-উপাসকদের কথা লিখেছেন, পতঞ্জলি লিখেছেন শিবলিঙ্গ স্থাপনের কথা। মেগাস্থেনিস যে-'ভারতীয় ডাইওনিসিয়াস'এর কথা উল্লেখ করেছেন, স্পষ্টতই তিনি শিব ছাড়া আর কেউ নন। শিবকে বলা হয়েছে পাহাড়-অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে জনপ্রিয় দেবতা (ভারতীয় পুরাকাহিনীর 'পর্বতাধিপতি দেবতা'র সঙ্গে তুলনীয়), ঢাক বাজিয়ে ও পশুবলি দিয়ে যাঁর পুজোর বিশেষ অনুষ্ঠান করতেন পাহাড়ি মানুষেরা (শিবপুজোর সঙ্গে এর হুবহু মিল লক্ষণীয়)।

কুশান-আমলের মুদ্রায় শিবের মুদ্রিত প্রতিমূর্তি প্রায়ই পাওয়া যায়। গণেশ

এবং স্কন্দকে দেখা যায় তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে, অথচ এই শেষোক্ত দুই দেবতা ইতিপূর্বে নিজ অধিকারেই স্বাধীন দুই দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে মনে হয়। ওই সময়ে গণেশকে দেখা যায় হস্তিমুণ্ড ও নরদেহবিশিষ্ট দেবতা হিসেবে আর তাঁর পদতলে পাওয়া যায় প্রকাণ্ড এক ইঁদুর। গণেশ তখন দৈত্যদের জগৎ ও পাতাল-রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শৈবধর্মের দেবতামণ্ডলীর মধ্যে গণেশের এই অন্তর্ভুক্তি ছিল একটা কৃত্রিম আপসের ব্যাপার এবং অনেক পরে এই ব্যাপারটি ঘটে।

শিবের অনুরক্ত পুত্র স্কন্দ হচ্ছেন প্রেমের ছলাকলায় অনভিজ্ঞ নির্মলচরিত্র এক যুবক এবং অযোনিসম্ভূত (শাস্ত্রীয় উপাখ্যান অনুযায়ী সরাসরি শিব থেকে তিনি জন্মলাভ করে)। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত যোদ্ধৃদলের অধিপতি এবং তাঁর জীবনকথা-সম্পর্কিত উপাখ্যানাদিতে শত্রুস্থানীয় দৈত্যদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান অধিকার করে আছে। হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রে স্কন্দ সবচেয়ে জটিল চরিত্রগুলির একটি।

নারায়ণ-বিষ্ণু ও শিবের মতো পৌরাণিক দেবতাদের আত্মস্থ করার পর ব্রহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করে নেয় পরমা ঈশ্বরী শক্তির পূজা। নানা রূপে ও বিভিন্ন ধরনে শক্তিপূজা তখন বিপুলভাবে প্রচলিত ছিল সারা ভারত জুড়ে। মূলত এই প্রক্রিয়ার অবশ্য সূত্রপাত ঘটে হিন্দুধর্মে গৃহীত পুরুষ দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গিনী স্ত্রী-দেবতাদেরও পুজা-পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে। যেমন, লক্ষ্মী (বিষ্ণুর পত্নী) এবং উমা বা পার্বতী (শিবের পত্নী)-র আরাধনা।

হিন্দু পুজা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান কিছু-কিছু মূলগত ব্যাপারে প্রাচীন ব্রহ্মণ্য-পদ্ধতি থেকে পৃথক ছিল। মধ্যযুগের সূচনায় নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই প্রথমোক্ত পুজা-পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে এবং একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রায় কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই এর চর্চা অব্যাহত রয়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুধর্ম প্রাচীন দেবতাদের বদলে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত এক ধর্মের নতুন দেবদেবীদের গ্রহণ করে নিয়েছে। এইভাবে প্রজাপতি এক হয়ে গেছেন ব্রহ্মার সঙ্গে এবং কিছু-পরিমাণে নারায়ণের সঙ্গেও।

আবার সেইসঙ্গে কিছু-কিছু মৌল উপাদানেরও আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাচীন ধর্মে পুজা-অনুষ্ঠানের জন্যে পৃথক পুজাগৃহ বা মন্দিরের প্রয়োজন হোত না, দেবতাদের নানা ধরনের পার্থিব মূর্তিনির্মাণও ছিল তখন অজানা। মধ্য-যুগের প্রারম্ভে এই নতুন পর্যায়ে হিন্দুধর্মের প্রকাশ ঘটল সবচেয়ে বেশি করে ভিন্ন ধরনের পুজা-পদ্ধতির প্রচলনের মধ্যে দিয়ে। যেমন, মন্দিরগুলিই তখন গণ্য হল 'দেবতাদের গৃহ' হিসেবে, পুরোহিতদের প্রায় একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল তাঁদের 'পৃষ্ঠপোষক'দের মঙ্গলকামনায় নিরন্তর পুজা-প্রার্থনায় নিরত থাকা এবং দেবমূর্তি

বিশেষ-বিশেষ দেবতার ব্যক্তিগত উপস্থিতির দ্যোতক হয়ে উঠল। দেবমূর্তিকে তখন থেকে প্রতিদিন ভোরবেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো ও সুগন্ধি জলবর্ষণে স্নিগ্ধ করা হতে লাগল, দেবতা যাতে তাঁর ভক্তবৃন্দকে স্বচক্ষে দেখে খুশি হতে পারেন তার জন্যে তাঁকে পরিভ্রমণ করানো হতে লাগল শহরের রাস্তায়-রাস্তায় আর তারপর সন্ধেবেলায় মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করা হতে লাগল গীতবাদ্যে এবং পেশাদার নর্তকীদের অনুষ্ঠিত বিশদ জটিল নৃত্যকলার মধ্যে দিয়ে।

এই মধ্যযুগের সূচনা থেকে হিন্দু স্থাপত্যকলাও দ্রুত বিকশিত হয়ে চলেছিল। মধ্য-যুগে নির্মিত ভারতের দেবমন্দিরগুলি ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কীর্তির পরিচয়বাহী।

ভগবদ্‌গীতা

মহাভারতের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবতের গীত যদিও ছোট্ট একটি অংশমাত্র, তবু ভারতের ধর্মীয় জীবনযাত্রায় এটি বিপুল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। হিন্দুধর্মের ব্যাপারে যাঁরাই বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন যুগে-যুগে তাঁরাই গীতা সম্বন্ধে তাঁদের টীকা-ভাষ্য সংকলন করা অথবা গীতায় বিধৃত ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অন্ততপক্ষে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করা বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করেছেন। ইউরোপেও ভারতবিদ্যা যখন সবে রূপপরিগ্রহ করতে শুরু করেছে তখনই গীতা আবিষ্কার করেন ইউরোপীয়রা এবং এ-বিষয়ে লিখিত তাঁদের বিপুল সংখ্যক গবেষণা-গ্রন্থগুলি ভারতে প্রচলিত গীতার টীকা-ভাষ্যের গ্রন্থসমুদ্রে যুক্ত হয়।

অনন্য ধর্মগ্রন্থ গীতার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসারটি নিম্নরূপ।

মহাকাব্য মহাভারতে বর্ণিত কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে জ্ঞাতি-শত্রুতার পরিণতিতে কুরুক্ষেত্রে যে-মহাসমর বেধে ওঠে তারই সমকালীন ছোট্ট একটি ঘটনা হল এই যে পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই অর্জুন ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনামুহূর্তে রণক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সমবেত হতে দেখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার করলেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর গুরু কৃষ্ণের কাছে সে-ব্যাপারে সুপরামর্শ চাইলেন। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ তাঁকে ক্ষাত্রধর্মোচিত এই কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ন্যায়যুদ্ধ এড়িয়ে চলা অসম্ভব ও অনুচিত। অতঃপর অর্জুন কৃষ্ণের এই বিচার সঠিক বলে গ্রহণ করলেন এবং যোগ দিলেন যুদ্ধে। তবে মহাভারতে বর্ণিত প্রধান বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত এই ঘটনাটি গীতায় কেবলমাত্র প্রথম কয়েকটি অধ্যায়েই উল্লিখিত হয়েছে। প্রধানত এই কাব্যের বিষয় হল মানুষের ভবিতব্য, নৈতিকতার

অন্তঃসার এবং পার্থিব ও স্বর্গীয় জীবনের মধ্যে পরস্পর-সম্পৃক্ত কথোপকথন বা প্রশ্নোত্তর-মালা। মহাভারত মহাকাব্যের বীর-চরিত্রগুলির অন্যতম কৃষ্ণ এখানে সর্বশক্তিমান দেব ভাগবতের পার্থিব রূপ-পরিগ্রাহী বা অবতার হিসেবে আবির্ভূত। যুদ্ধটি ন্যায্য না অন্যায্য এই প্রশ্নের নিছক উত্তরদানেই কৃষ্ণের এই পরমর্শ সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর ভাষণ এখানে এক সমৃদ্ধ দার্শনিক আলোচনার নামান্তর, এক সামগ্রিক ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্ববিশেষ। এই কাব্য তুঙ্গ স্পর্শ করেছে অর্জুনের 'অন্তর্দৃষ্টি'র মধ্যে দিয়ে; তিনি তখন অনুভব করেছেন যে শুধুমাত্র জনেক যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়-বীর ও কৌরবদের প্রতিপক্ষই নন তিনি, অবতার কৃষ্ণের মূর্তিতে দেব ভাগবত স্বয়ং তাঁকে যে-নতুন ধর্মমতে দীক্ষিত করেছেন তিনি তার একজন একনিষ্ঠ অনুসারীও বটে।

এই কাব্যে যে-ধর্মীয় মতবাদ প্রচারিত তা রূপ পরিগ্রহ করে এমন একটি যুগে যখন পাশাপাশি অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল উপনিষদসমূহের অনুসারী ব্রহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও অজীবিকবাদের মতো ব্যাপকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্মীয় ও ধর্মীয়-দার্শনিক চিন্তাধারাগুলি এবং যখন সাংখ্য ও যোগ-দর্শনের ধারাগুলির উদ্ভব ঘটছিল। উপরোক্ত এই সমস্ত মতবাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে এবং এদের কিছু-কিছু তত্ত্ব আত্মস্থ করেও গীতা সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর এবং বহুদিক থেকেই মৌল এক ভাবনাসমষ্টির আকর হিসেবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। রক্ষণশীল ঐতিহ্যের কাঠামোর মধ্যে থেকে ব্রহ্মণ্যবাদের ধ্যানধারণাকে সংস্কারের এটি যেন এক প্রয়াস, আর এই প্রয়াসের লক্ষ্য গুরুতর সামাজিক ও আত্মিক পরিবর্তনের এক যুগে উপরোক্ত সেই ঐতিহ্যকে সংহত করা। একারণে গীতায় বিধৃত দার্শনিক ধ্যানধারণার প্রকৃত চরিত্র উপলব্ধি করা যেতে পারে তখনই, যখন এই ধ্যানধারণাগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায় উপনিষদসমূহে আলোচিত ও সংস্কারভিত্তিক নানা ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রচারিত বহুতর ধ্যানধারণার।

রচনার মূল পাঠগত বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে যে গীতা রচিত হয়েছিল গোড়ার দিককার উপনিষদগুলি রচিত হওয়ার (অর্থাৎ, খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম শতাব্দীর) পরবর্তীকালে। এবং এই গ্রন্থ আনুমানিকভাবে তথাকথিত মধ্যবর্তী উপনিষদসমূহ রচনার (অর্থাৎ, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর) সমকালবর্তী। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গীতার রচয়িতাদের পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত ব্যাপার বলে মনে হয়। কেননা এর প্রতিফলন মেলে কেবলমাত্র মূল মতবাদের অন্তর্গত বহুতর নীতির ঐক্যসম্বন্ধ ও হুবহু এক নানা সংজ্ঞা ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই নয়, বহুক্ষেত্রে সরাসরি, প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে মিলের মধ্যে দিয়েও।

গীতার রচয়িতারা সাংখ্য এবং যোগ-দর্শনের প্রাথমিক পর্যায়গুলির সঙ্গে তাঁদের পরিচিতির কথাও গোপন রাখেন নি (উপরোক্ত এই দুটি দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব সম্পর্কে অমূল্য নানা তথ্য পাওয়া যায় গীতা থেকে)। এমন কি গীতায় ও গোড়ার যুগের বৌদ্ধ পুথিগুলিতে উল্লিখিত পারিভাষিক শব্দাবলী ও দার্শনিক প্রস্তাবাদির মধ্যে হুবহু মিলেরও বহুতর উদাহরণ পাওয়া যায়, যদিও এই দুটি দার্শনিক চিন্তাধারার সামগ্রিক চরিত্রের মধ্যে ফারাক স্পষ্টতই অত্যন্ত বেশি। গীতায় বিধৃত ধর্মীয় ও দার্শনিক নীতিগুলি রূপ পরিগ্রহ করেছিল ঐতিহ্যসিদ্ধ ব্রহ্মণ্য ধর্মমতকে তদানীন্তন নতুন যুগের নানা দাবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারে পুরোহিততন্ত্রের প্রয়াসের ফলে, আবার সেইসঙ্গে তা অন্যান্য ধর্ম-সংক্রান্ত ও দার্শনিক চিন্তাধারার অর্জিত নবতর সাফল্যগুলিও বিবেচনার মধ্যে ধরেছিল।

অন্যান্য ভারতীয় ধর্মমতের মতো গীতায় বিধৃত মতবাদও সেইসব পথের সন্ধান ও তার বর্ণনাকেই তার প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করেছে যা নাকি তার অনুসারকদের 'পরম ধর্মীয় লক্ষ্য', অর্থাৎ 'মুক্তি', অথবা 'মোক্ষ'লাভের পথে সঠিকভাবে চালনা করতে পারে। তবে গীতার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তা (যেমন, ধরা যাক, উপনিষদগুলির মতো) কেবলমাত্র 'মোক্ষলাভের নানাবিধ পথ' (বা মার্গ)কেই অঙ্গীকার করে নি, 'জ্ঞানের পথ' (বা জ্ঞানমার্গ), 'কর্মের পথ' (বা কর্মমার্গ) এবং 'ধর্মীয় (বা ঐশ্বরিক) প্রেম'এর পথ (বা ভক্তিমার্গ) মোক্ষের এই তিনটি পথের ধারণাকেও বিশদে ব্যাখ্যা করেছে। অবশ্য এই তিনটি পথের মধ্যে কোনটি-যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গীতায় তার কোনো দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ ঘটে নি। তবে যে-ক্রমিক ধারাবাহিকতায় এই পথগুলি বিবৃত হয়েছে তা থেকে মনে হয় 'ঐশ্বরিক প্রেম' তত্ত্বের ব্যাখ্যায় কাব্যটিতে ওতপ্রোত ধর্মভিত্তিক করুণ রস তার চূড়া স্পর্শ করেছে। এইসঙ্গে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ হল ভক্তিমার্গের ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ভাগবত-কৃষ্ণের পূজাকে, এই দেব-চরিত্রের সঙ্গে আবেগভিত্তিক সংযুক্তির ধারণাটিকে দৃঢ়মূল করে তোলার ব্যাপারে গীতার রচয়িতাদের অক্লান্ত প্রয়াস।

গীতায় জ্ঞানমার্গের ধারণাটির উপস্থাপনার সঙ্গে উপনিষদসমূহের শিক্ষার ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষ্য করা গেলেও এতে কর্মমার্গের তত্ত্বটি কিন্তু সম্পূর্ণ মৌল একটি ধারণার সামিল। সঠিকভাবে বলতে গেলে, 'নিষ্কাম কর্মের পথ'-সম্পর্কিত এই তত্ত্বটি গীতার মূল আলোচ্য বিষয়ের একটি এবং 'মুক্তি' (মোক্ষ অথবা নির্বাণ)-ই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য এই তত্ত্বের প্রবক্তা অন্যান্য ভারতীয় ধর্মমত ও দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে এটিই গীতাকে স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিষ্কাম কর্মের এই তত্ত্ব প্রাচীনতর ভারতীয় পুথিগুলিতে পাওয়া যায়

না, একমাত্র পরবর্তী কালের হিন্দুরাই এই তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন এবং একে গণ্য করেছেন ভারতের অধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে গীতার অবদান হিসেবে।

মানুষ সাংসারিক জগতে বসবাস করবে নাকি তা বর্জন করবে—সন্ন্যাস-ধর্মাশ্রিত এই নীতির ভিত্তিতে প্রচারিত নানাবিধ ধর্মশিক্ষায় যে-ঐতিহ্যসিদ্ধ সংশয়ের সন্ধান মেলে তার পরিবর্তে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সমস্যাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তা হল এই যে 'ধর্মীয় আদর্শ'-অর্জনে অঙ্গীকৃত মানুষ কী ধরনের ক্রিয়াকলাপে নিরত থাকবে তার সমস্যা। গীতায় এ-সমস্যার মীমাংসা করা হয়েছে অত্যন্ত সরলভাবে: বলা হয়েছে যে কর্ম মানুষের পক্ষে আর বন্ধন হয়ে ওঠে না যখন সে কর্মে নিয়োজিত হয় স্বার্থশূন্য বা নিষ্কামভাবে, অর্থাৎ যখন সে কর্মকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসেবে দেখে কিন্তু তার সঙ্গে আবেগগতভাবে জড়িত হয় না বা কর্ম সম্বন্ধে নির্বিকার থাকে। মানুষ যখন এইভাবে 'নিষ্কাম কর্ম'এ রত হয় তখন তার স্বার্থের প্রণোদনাগুলি নির্বাপিত হয় এবং কর্মের মধ্যে কোনোকিছু উপার্জনের বাসনা তার থাকে না। তদুপরি নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করার সময় এমন এক ব্যক্তি কোনোরকমেই নিজেকে জাহির করতে চায় না, সে মুক্ত থাকে 'আত্মসচেতনা' (বা অহঙ্কার) থেকে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, উপনিষদসমূহে ঘোষিত মর্ত্যের জীবন ও অহঙ্কারের নাগপাশ থেকে ব্যক্তির 'মুক্তি'র আদর্শটি বিশদ করতে গিয়ে গীতা ওই আদর্শের সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি ধারণা ব্যক্ত করেছেন। গোটা কাব্যটিই মূলত এই কেন্দ্রীয় ধারণার ব্যাখ্যায় নিয়োজিত।

গীতায় 'ঈশ্বরপ্রেমের পথ' (বা ভক্তিমার্গ) একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। নির্দিষ্ট অর্থে বলতে গেলে, ভক্তিপথের এই বর্ণনাই কাব্যটির চূড়া স্পর্শ করেছে: উপনিষদসমূহে ব্যক্তির মধ্যে উভয়বলতা ও আত্মসচেতনা বর্জনের যে-আদর্শের রূপরেখা ছকে দেয়া আছে তা-ই এখানে রূপ নিয়েছে কৃষ্ণ-ভাগবতের পূজার, আর এই কৃষ্ণ-ভাগবত উপস্থাপিত হয়েছেন একই সঙ্গে অবতাররূপী দেবতা ও সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্মনের সদৃশ হিসেবে।

গীতার কাব্যবস্তুর সামাজিক দিক এতে বিধৃত ও বিশদীকৃত ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদেরই অংশবিশেষ। একদিকে যেমন এতে বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ও 'পরম সত্য'এ উপনীত হওয়ার উপায়াদি-সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যায় অ-সনাতনী ধর্মমতগুলির বেশকিছু ধ্যানধারণার প্রভাব এবং উপনিষদসমূহে বিধৃত ব্রহ্মণ্যধর্মের যুগোপযোগী সংস্কৃত রূপ লক্ষ্য করা যায়, তেমনই অপর দিকে এ-কাব্যে উপস্থাপিত বর্ণভিত্তিক সমাজ-সংগঠনের নমুনা খাপ খেয়ে যায় বৈদিক যুগের অচলিত ধারণাগুলির সঙ্গে। এই শেষোক্ত ব্যাপারে গীতার শিক্ষা এমন কি আরও বেশি রক্ষণশীল, কেননা এতে আরও বেশি কঠোর ও দৃঢ়বদ্ধ এমন

এক বর্ণবিভাগ-প্রথার উল্লেখ আছে যা পরবর্তী যুগের হিন্দুধর্মের সমর্থনপুষ্ট 'ধ্রুপদী' জাতিভেদ-প্রথার প্রকৃতিটি সরাসরি নির্ধারিত করে দেয়।

তবে গীতার কাব্যবস্তুর অন্তর্গত এই 'কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত সামাজিক দিক'টি অনেক দিক থেকেই ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের কাছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক বলে ঠেকে নি। পরবর্তীকালে গীতাকে ভারতীয়রা সংস্কৃত ব্রহ্মণ্যধর্মের মতবাদের সংহত প্রকাশ বলে গণ্য করেছেন, আরও পরে এটি গণ্য হয়েছে সাধারণভাবে হিন্দুধর্মেরই সংহত মতবাদ হিসেবে। বিশিষ্ট চিন্তাবিৎরা তাঁদের নিজস্ব, একান্ত মৌল ধ্যানধারণার উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন গীতার এবং তা করতে গিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই এর কাব্যবস্তুর অমুক বা তমুক বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সম্প্রতিকালে গীতার অন্তর্ভুক্ত নানা ধ্যানধারণা বহু বিচিত্র নানা তত্ত্বের অঙ্গীভূত হতে দেখা গেছে, আর এ-ও দেখা গেছে যে সেইসব তত্ত্বের অনেকগুলিই পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। বিংশ শতাব্দীতে বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী ও অরবিন্দ ঘোষের (অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক নয়, রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই এখানে অরবিন্দ ঘোষের কথা বলা হচ্ছে) মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গীতার ধ্যানধারণার পরোক্ষ নজির টেনেছেন। জওহরলাল নেহরু গুরুত্ব আরোপ করেছেন গীতার মতাদর্শ অনুধাবনের ওপর। এইভাবে ভাগবতের গীত গোটা ভারতীয় সংস্কৃতির এক অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে, ওই ঐতিহ্যের আদিতম মূলগুলির সঙ্গে পরবর্তী বহু শতাব্দীর জীবনজিজ্ঞাসাকে যুক্ত করে পরিণত হয়েছে তার ধারাবাহিকতার মৃত্যুহীন এক প্রতীকে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের প্রধান-প্রধান শাখা

প্রাচীন ভারতে দার্শনিক জ্ঞান অর্জনের ওপরে অতীব গুরুত্ব আরোপ করা হোত। কৌটিল্য দর্শনশাস্ত্রকে বলেছেন সকল জ্ঞানের দীপবর্তিকা, সকল বিধি-বিধানের স্তম্ভস্বরূপ।

উপনিষদসমূহেই আমরা দেখতে পাই প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার কাঠামোর অভ্যন্তরে দুটি প্রধান ধারা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রথম লক্ষণসমূহের প্রকাশ। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীগুলিতে যখন বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে এই সংঘর্ষও তখন বিশেষ স্পষ্ট চেহারা নেয়। বস্তুবাদী দার্শনিক ধারায় (লোকায়ত, চার্বাক, ইত্যাদি) বিধৃত হয় তার ধ্যানধারণার সুসঙ্গত ও বিস্তৃত বিশদীকরণ। ওই বিশেষ যুগে দর্শনশাস্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বড়-বড় সাফল্য অর্জিত

হওয়ার ফলে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অর্জিত এক নতুন স্তর এর পথ প্রশস্ত করে দেয়।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে ওই সময়কার ভারতীয় চিন্তাবিৎরা ইউরোপীয় ধ্রুপদী দার্শনিকদের মতো একই জাতীয় সমস্যাদির উত্থাপনে রত। শুধু তা-ই নয়, একে অপরের থেকে নিরপেক্ষভাবে তাঁরা ওই সমস্যাদির একই সমাধানেও উপনীত হচ্ছেন। এবং কিছু-কিছু ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্রীরা এই সমাধানে উপনীত হচ্ছেন আগেই।

প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী দর্শন ও তার শাখাসমূহ

ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসে বস্তুবাদ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে ও এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী ধারা সবচেয়ে মূলগত সংস্কারকামীর রূপ নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে। এমন কি সেই আদিযুগেও ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল অন্ধ ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও ধর্মীয় উন্মাদনার জীর্ণ কু-সংস্কারের হাত থেকে চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে।

লিখিত আকর সূত্রসমূহে বস্তুবাদী দর্শনের কয়েকটি শাখার নাম আজও টিকে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল 'লোকায়ত' নামের শাখাটি। এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে দর্শনের এই শাখাটির এ-ধরনের নামের অর্থ 'পার্থিব জগতের সঙ্গে সংযুক্ত' অথবা 'জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত' বা 'জনসাধারণের মধ্যে প্রাপ্তব্য'। এ-থেকেই বোঝা যায় যে দর্শনের এই শাখাটির চরিত্র ছিল ভাববাদ-বিরোধী এবং প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদীদের এইসব ধ্যানধারণা ওই যুগের সমাজের বহুবিভিন্ন স্তরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'লোকায়ত' ধারার উদ্ভবের ফলে (পরবর্তীকালে বস্তুবাদীরা বেশির ভাগই চার্বাক নামে পরিচিত হন, তবে এই পরিভাষাগত পার্থক্য মতবাদের ক্ষেত্রে কোনো মূলগত পার্থক্যের দ্যোতক ছিল না) বস্তুবাদী ধ্যানধারণার বিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটি স্তর দেখা দিল। এই স্তরটি আদিবেদ যুগের দার্শনিক ধ্যানধারণার উদ্ভবের ফলে যথাযথভাবে গড়ে ওঠে। এই লোকায়ত চিন্তাধারার উদ্ভবের প্রশ্নটি এখনও পর্যন্ত বিতর্কমূলক: কখনও-কখনও এর সম্পর্ক দেখানো হয় স্থানীয় জনসাধারণের আদিম ধ্যানধারণার সঙ্গে। এই মতটি মানলে লোকায়ত চিন্তাধারার সঙ্গে রক্ষণশীল ব্রহ্মণ্য ঐতিহ্যের বিরোধের ব্যাপারটি অবশ্য ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুত এই চিন্তাধারার কিছু-কিছু দিক অনুধাবন করলে এরকম একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব বলে মনে হতে পারে বটে, তবে এই দার্শনিক চিন্তাধারার সামগ্রিক স্বরূপ কিন্তু

উ'চু স্তরের দার্শনিক মননের পরিচায়ক এবং এর মৌল প্রস্তাবনাগুলিকে কোনোমতেই আদিম জনগোষ্ঠীর জীবন-বিশ্বাসের সঙ্গে এক করে দেখা চলে না।

স্পষ্টতই, লোকায়ত চিন্তাধারা বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং দেশের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই ছিলেন এই মতবাদের অনুসারীরা। এর প্রমাণ মেলে লোকায়ত চিন্তাধারার সঙ্গে বহু ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ মিল আছে উপনিষদসমূহের অন্তর্ভুক্ত এমন বস্তুবাদী চিন্তাধারার মধ্যে এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্রসমূহে লোকায়ত দর্শনের উল্লেখ থেকে। কৌটিল্য লোকায়তের উল্লেখ করেছেন তিনটি প্রধান দার্শনিক মতবাদের অন্যতম বলে। তাঁর মতে, এই তিনটি দার্শনিক মতবাদ ছিল স্বকীয় মূল্যের অধিকারী। এছাড়া লোকায়ত ধারার প্রতিনিধিদের উল্লেখ অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় পুথিতে, মহাকাব্যগুলিতে, পতঞ্জলির ব্যাকরণে, হর্ষচরিতে ও অন্যান্য রচনায় পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনশাস্ত্রীদের নিজস্ব রচনা অবশ্য রক্ষিত হয় নি, স্পষ্টতই তাঁদের দার্শনিক প্রতিপক্ষীয়রা সেগুলি নষ্ট করে ফেলেছিলেন। তবে তাঁদের রচনাসমূহের নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (বিস্তারিত, যদিও উদ্দেশ্যমূলক) পাওয়া যায় প্রখ্যাত বৈদান্তিক দর্শনশাস্ত্রী শঙ্করাচার্যের রচনাবলীতে এবং মাধবাচার্য, জয়ন্তভট্ট ও জৈন টীকাকার হরিভদ্রের রচনাবলীর সংক্ষিপ্তসারে। মধ্যযুগের শেষাংশে রচিত তামিল পুথিগুলিতে ভারতের বস্তুবাদী দার্শনিক ধারার মূল তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান বিবরণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত এই পুথিগুলি দিয়ে বিচার করতে হলে বলতে হয়, ওই যুগে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রধান প্রতিপক্ষই ছিল বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তাধারা।

কাজেই বলতে হয়, নানা সময়ে নানান পণ্ডিত যেমনটি বলার চেষ্টা করেছেন ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়, ভারত-সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাসে বস্তুবাদের উদ্ভব মোটেই কোনো আপতিক ঘটনা নয়। এই চিন্তাধারার বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে প্রায় দু'হাজার বছরের এক দীর্ঘ সময়কাল ধরে এবং বস্তুবাদী দর্শন ও ধর্মীয় পক্ষপাতদুষ্ট অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে নিয়ত প্রবহমান তর্কবিতর্ক প্রমাণ দিচ্ছে যে কি প্রাচীন যুগে ও কি মধ্যযুগে বস্তুবাদী ও ভাববাদী এই দুই প্রধান দার্শনিক ধারার মধ্যে কী তীব্র সংগ্রামই না চলেছিল।

লোকায়ত চিন্তাধারার অন্তর্গত ধ্যানধারণার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় উপনিষদসমূহে। এই লোকায়ত ধারার কল্পকাহিনী-খ্যাত প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ পাওয়া যায় দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত ঋষি বৃহস্পতির নাম, যদিও মহাকাব্যসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঋষি প্রায়ই এমন সব ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকতেন যার সঙ্গে রক্ষণশীল ঐতিহ্যসম্মত বিধি-বিধানের সঙ্গতি থাকত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উপনিষদসমূহে বলা হয়েছে অসুরদের সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে তাদের

ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই বৃহস্পতি নাকি এক মিথ্যা জীবনদর্শনের প্রচারণা করেন। এই জীবনদর্শন প্রাচীন বস্তুবাদী দার্শনিক পাঠেরই এক রকমফের মাত্র এবং পরবর্তী কালে এই পুথির সম্পাদকেরা এটিকে বিতর্কমূলক করে তোলেন। এতে অসুরদের বোঝানো হয় যে সকল জীবন্ত প্রাণীর জীবনের একমাত্র অন্তঃসার হল তাদের দেহ এবং আত্মার ধারণা মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়।

বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তার অপেক্ষাকৃত বিশদ উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে। এক্ষেত্রে কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে এইসব চিন্তাভাবনার প্রবক্তা হলেন ব্রহ্মণ্য ঐতিহ্যে স্বীকৃত সর্বপূজিত ঋষিরা। মোক্ষধর্ম নামের (মহাকাব্যটির দ্বাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) অধ্যায়ে অন্যান্য বহু আলোচনার মধ্যে 'গুরু ভরদ্বাজ'এর মতামত লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ভরদ্বাজ হলেন লোকায়ত ধারার দার্শনিকদের অব্যবহিত পূর্বসূরী। ঘোরতর নাস্তিকের ভঙ্গিতে তিনি সেখানে উল্লেখ করছেন মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বের ধারণাটির কথা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির উদ্‌যাপন ও পুরোহিতকে দ্রব্যসামগ্রী নিবেদনের মধ্যে দিয়ে নাকি 'অনুকূল নবজন্মলাভ' নিশ্চিত করা যায় তার কথা। ব্রাহ্মণকে নিজের গোরুটি দান করার পর যে-ধর্মবিশ্বাসী তার বিনিময়ে পরজন্মে নানা সুখ-সুবিধা লাভের স্বপ্ন দেখে তাকেও সেখানে বিদ্রূপ করেছেন ভরদ্বাজ ঋষি।

দেহ থেকে দেহান্তরে আত্মার অনুপ্রবেশের ধর্মীয় ধারণাটির সঙ্গে ভরদ্বাজ প্রতিতুলনা করলেন প্রকৃতির মধ্যে কার্যরত বিধান অনুযায়ী এক ধরনের জীবন অন্য ধরনের জীবনে স্বাভাবিক ভাবে সংক্রমণ-সংক্রান্ত বস্তুবাদী ধারণাটির।

যুক্তিবাদী এবং বস্তুবাদী ধ্যানধারণার পথে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রসর পদক্ষেপ সেকালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের, বিশেষ করে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে, তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ভিন্ন কল্পনা করাও অসম্ভব।

মৌল পদার্থসমূহ এবং চেতনাকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা-সম্পর্কিত বোধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শেষোক্ত এইসব জ্ঞানই প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। ভারতীয় বস্তুবাদীরাও বারে বারে জোর দিয়ে বলেছেন যে তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয় হল ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে উপলব্ধ যে-জগৎ তাই-ই এবং একমাত্র বিশ্লেষণসাধ্য বস্তুই বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ-সূত্রের অর্থবহ বিষয় বলে গণ্য হতে পারে। অতি-প্রাকৃত ঘটনাবলীকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করে জানালেন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদের সম্পর্কে কোনো প্রমাণাদির উপস্থাপনা সম্ভব নয় বলেই সেগুলি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

'ইন্দ্রিয়ানুভূতি' (বা প্রত্যক্ষ)-ই 'জগৎ' (বা প্রমাণ) সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান আহরণের একমাত্র উৎস—এই তত্ত্বই লোকায়ত দর্শনের ভিত্তি। এই দর্শন

অনুযায়ী কর্তৃস্থানীয় পন্ডিতদের দৃঢ়ব্যক্ত মতামত, তাঁদের প্রচারিত দৈব প্রত্যাদেশ কিংবা ধর্মশাস্ত্র এসব কিছুই প্রত্যক্ষের মধ্যে দিয়ে আহৃত ধারণাকে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ নয়।

লোকায়ত চিন্তাধারার অনুসারীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চিরস্থায়ী বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন মৌল উপাদানে গঠিত সকল বস্তুতে যা-কিছু পরিবর্তন ঘটছে তা নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই নানা বিধান। তাঁরা অবশ্য জীবনের ও চেতনার উৎপত্তি-সম্পর্কিত প্রশ্নটির জটিল প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং উন্নততর জীবনের রূপকে নিম্নতর জীবনের রূপ হিসেবে দেখানোর প্রয়াস পান নি। বারে বারেই বলেছেন তাঁরা যে চেতনা হল মৌল উপাদানসমূহের অস্বাভাবিক রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশের ফল।

ভারতীয় ভাববাদী চিন্তাবিদ্‌দের কাছে সর্বগ্রাহ্য 'কর্মযোগের তত্ত্ব'কে লোকায়ত দর্শনশাস্ত্রীরা যে-যুক্তি দেখিয়ে খন্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন তা দারুণ কৌতূহলবহ। এ-প্রসঙ্গে পাল্‌টা প্রশ্ন করে তাঁরা জানতে চেয়েছেন যে আত্মা যদি দেহ থেকে দেহান্তরে নিজেকে স্থানান্তর করার ক্ষমতা রাখে তাহলে মানুষ তার বহুবিধ পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে না কেন? কিংবা কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর যদি আবার নতুন দেহ নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করে তাহলে পূর্বজন্মের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদের প্রতি ভালোবাসাবশত কেন সে তার পুরনো আকার-প্রকার ফিরে পেতে চেষ্টা করে না?

কর্মযোগের তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে লোকায়ত-পন্থীরা কেবল যে রক্ষণশীল ঐতিহ্যেরই বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন তাই নয়, অন্য সকল দার্শনিক ও ধর্মীয়-দার্শনিক আন্দোলনেরও প্রতিপক্ষে দাঁড়ালেন তাঁরা। এ-কারণে তাঁদের এই অবস্থান প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের চিন্তাধারার ইতিহাসে অনন্য হয়ে আছে। লোকায়ত-পন্থীদের মূল তত্ত্বগুলির উদ্ভব ঘটেছিল অতি প্রাচীন যুগে, এ-কারণে তাঁদের প্রচারিত ধ্যানধারণাগুলির দুঃসাহসিকতা আরও বেশি লক্ষণীয় বলে ঠেকে।

বস্তুবাদী দর্শনশাস্ত্রীদের নীতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি তাঁদের প্রতিপক্ষীয়দের কাছে ওই দর্শনের দুর্বলতম অংশ বলে মনে হয়েছিল। লোকায়ত-পন্থীদের তাঁরা অভিযুক্ত করতেন অত্যধিক সুখসম্ভোগের স্পৃহা, ঐহিক জীবনের 'আনন্দ-উপভোগের বাসনা' (আনন্দবাদ)-র জন্যে। ওই যুগের এমন কি বহু আধুনিক ব্যাখ্যাতার রচনাতেও এই একই দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ মেলে। আসলে লোকায়ত-পন্থীদের নৈতিক আদর্শ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। লোকায়ত জীবনদর্শনের নীতিগুলি আলোচিত হয়েছে যে-সমস্ত পুথিতে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন অথবা বল্গাহীন আচার-আচরণের কোনো চিহ্ন নেই (মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত পুথি লোকায়ত জীবনদর্শনের বিরোধীদেরই

লেখা)। লোকায়ত-পন্থীদের জীবনদর্শনের মূল কথা হল ধর্মীয় নৈতিক আদর্শ এবং জীবনযাপনে ঐহিক সুখসম্ভোগের ব্যাপারে তার আনুষঙ্গিক নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে চলা।

প্রসঙ্গত একথাটা জোর দিয়ে বলা আবশ্যক যে লোকায়ত ও চার্বাক-পন্থীরা মানুষের চারিপাশের বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে স্বার্থপরের মনোভঙ্গিকে কখনও সমর্থন করেন নি। বরং উলটো। তাঁরা মনে করেছেন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব হয় একমাত্র তখনই, যখন সে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করে। সংযমকে তাঁরা মানুষের প্রধান ধর্ম বলে মনে করেছেন, স্বাভাবিক জ্ঞান করেছেন ব্যক্তিবিশেষের 'সুখসম্ভোগের স্বাভাবিক বাসনা'কে সংযত করে কিংবা ওই ধর্মের বশে নিয়ন্ত্রিত করে রাখাকে। ইউরোপীয় ধ্রুপদী দর্শনের বিভিন্ন ধারায়—বিশেষ করে এপিকিউরসের ভোগবাদী দর্শনের মধ্যে—এই একই দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত থাকতে দেখা যায়।

দুঃখের কথা, চার্বাক-পন্থীদের সামাজিক মতামতের কথা অতি অল্পই জানা যায়। এ-কারণেই ঋষি ভরদ্বাজের উক্তিগুলি বিশেষভাবে মূল্যবান মনে হয়। তিনি স্পষ্টভাবেই বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন এবং একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে লোকায়ত-পন্থীরা কেবল-যে তাঁদের দার্শনিক মতামতের ক্ষেত্রেই যুক্তিবাদী মৌল সংস্কারের নীতিসমূহের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন তা-ই নয়, সামাজিক সমস্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁদের মনোভঙ্গি অনুরূপ ছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বস্তুবাদী ও ভাববাদী এই দুই দার্শনিক ঐতিহ্যের মূল নীতিসমূহের মধ্যে পার্থক্যগুলি এতই মৌল ধরনের ছিল যে কোনো এক পক্ষ বিরুদ্ধপক্ষের নীতিগুলিকে গোপন করে রাখার চেষ্টা করেন নি, বরং সেগুলিকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়ে সেগুলি গ্রহণের পক্ষে যে কত অযোগ্য স্বপক্ষীয়দের কাছে তা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। বস্তুবাদী দর্শনশাস্ত্রীরা কেবল যে বেদসমূহের শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তা-ই নয়, ধর্মীয় (আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, 'অতীন্দ্রিয়বাদী') মোক্ষলাভের আদর্শ, আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে চলাচলের ধারণা এবং কর্মযোগের বিধি-বিধান পর্যন্ত বর্জন করেছেন সবকিছুই। এই দৃষ্টিভঙ্গির দুঃসাহসিকতা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যখন আমরা দেখি যে কি জৈন কি বৌদ্ধ কোনো ধর্মের অনুসারীরাই ব্রহ্মণ্য মতাদর্শ সম্বন্ধে তাঁদের নেতিবাচক মতামত সত্ত্বেও উপরোক্ত ওই তত্ত্বগুলির কোনোটির সম্বন্ধেই সন্দেহপ্রকাশে ভরসা পান না। বস্তুবাদী দর্শনশাস্ত্রীদের রক্ষণশীল ঐতিহ্যের উপরোক্ত ওই প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী ধাপ ছিল সকল প্রকারের পুজো-অনুষ্ঠান ও দেব-আরাধনা (আর এঁরা শুধু বৈদিক দেবদেবীই নন) বর্জন করা। আর শুধু এই-ই নয়, ধর্মানুষ্ঠানের এই সমস্ত বাহ্য ধরনকে তাঁরা ধর্মগত সত্যের

অপেক্ষাকৃত বেশি বিশ্লেষণধর্মী আলাপ-আলোচনার তুলনায় ‘আদিমতর’ বলে সমালোচনা করেই ক্ষান্ত মানেন নি, এই সবকিছু আচার-অনুষ্ঠানকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে তবেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় বস্তুবাদীরা তাঁদের মৌল সংস্কারপন্থার ব্যাপারে এবং কি দার্শনিক ও কি সামাজিক ক্ষেত্রে যে-কোনো কাল-প্রচলিত অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের একনিষ্ঠতায় অবিচল ছিলেন। শক্তিমান প্রতিপক্ষীয়দের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও (রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা কেবল যে ‘পুথি-সংরক্ষণের’ অধিকারকেই একচেটিয়া করে রেখেছিলেন তা-ই নয়, সামাজিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের ‘যন্ত্রগুলি’কেও নিজেদের করায়ত্ত করে রাখার জন্যে রীতিমতো সচেষ্ট থাকতেন তাঁরা। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে-দেশে হাতে-লেখা পুথি অনুলিখিত না-হলে আবহাওয়ার কারণে সহজেই নষ্ট হয়ে যেত তেমন একটি দেশে ব্রাহ্মণদের প্রথমোক্ত অধিকার সংরক্ষণের গুরুত্ব কতখানি!) বস্তুবাদী চিন্তাধারার ঐতিহ্য ভারতে প্রবহমান ছিল দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে। ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ধারার প্রভাব পড়েছিল বহুব্যাপক হয়ে। প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তাধারা সারা বিশ্বের দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে: এই চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন-ভিন্ন মতবাদ, এর বক্তব্যসমূহের দুঃসাহস ও গভীরতা শুধু যে ইউরোপীয় ধ্রুপদী দর্শনশাস্ত্রীদের অর্জিত কীর্তির সমকক্ষই ছিল তা নয়, প্রায়ই তা সে-কীর্তিকে অতিক্রম করেও গিয়েছিল।

ষড়্‌দর্শন। সাংখ্য

হিন্দুধর্মের সাঙ্গ সংযুক্ত দর্শনশাস্ত্রকে কাল-প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে ভাগ করা হয় ছ'টি দর্শনে বা দার্শনিক ধারায়। এই ছ'টি দর্শনের মধ্যে ঐক্যসূত্র হল এগুলির মধ্যেকার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা দিয়ে হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদের সংযুক্তিও নিরূপিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে, ছ'টি দার্শনিক ধারাই স্বীকার করে নিয়েছে বেদসমূহের প্রতি ও কর্মযোগের বিধিবিধানের প্রতি তাদের আনুগত্য এবং আস্থা জানিয়েছে মানব-অস্তিত্বের পরম লক্ষ্য হিসেবে ‘চরম’ (অর্থাৎ, অতীন্দ্রিয়বাদী) ‘মোক্ষলাভ’এ। তবে এছাড়া এই ছ'টি দার্শনিক ধারার মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট: এগুলির অন্তর্গত বহু দার্শনিক ধ্যানধারণাই ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের, বস্তুত প্রায়ই সেগুলি পরস্পরের বিরোধীও।

সাংখ্য-দর্শনের উৎপত্তি ও তার প্রকৃতি-নিরূপণ এক জটিল ব্যাপার। এই দার্শনিক ধারাটির সত্যিকার প্রকৃতি-নিরূপণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে আজ প্রায় দেড় শো বছর ধরে এবং এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মতামতও প্রকাশ করা

হয়েছে: কেউ-কেউ বলেছেন সাংখ্য হচ্ছে এক ধর্মীয়, অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন, আবার অন্যেরা একে বস্তুবাদী দর্শন বলতেও কসুর করেন নি! মতের এই বৈপরীত্য অবশ্য প্রথমত ও প্রধানত ব্যাখ্যা করা চলে এই তথ্যের ভিত্তিতে যে সাংখ্য-দর্শনের ধ্রুপদী রূপ হল দার্শনিক দ্বৈতবাদেরই এক প্রকাশ। বস্তুবাদী ও ভাববাদী উভয়ধরনের ধারণাসমূহ এই মতবাদের গভীরে নিহিত ছিল।

অত্যন্ত প্রাচীন যুগেই সাংখ্যের উদ্ভব ঘটে। মাত্র কয়েকখানি উপনিষদ এর পূর্ববর্তী এবং এর মধ্যে পূর্ণতর প্রকাশ ঘটেছে সেই সুদূর যুগের স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদের। কৌটিল্যও মাত্র 'ত্রি-দর্শন'এর উল্লেখ করেছেন — সাংখ্য, যোগ (বা পাতঞ্জল) এবং লোকায়ত। বদরায়ন-রচিত 'ব্রহ্মসূত্র' (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত প্রাচীনতর একখানি বেদান্ত-গ্রন্থ)-এ সাংখ্যের কিছু-কিছু দার্শনিক ধ্যানধারণাকে আক্রমণ করা হয়েছে। মৌর্য-যুগেই সাংখ্য সম্ভবত এক স্বনির্ভর দার্শনিক ধারায় পরিণত হয়েছিল এবং প্রাচীন ভারতের বুদ্ধিজীবীদের জীবনে তখনই এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছিল।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী, সাংখ্য-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয় ঋষি কপিলকে। 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ' (পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় খন্ড)-এ এ-প্রসঙ্গে জনেক 'রক্তবর্ণ ঋষি'র (কপিল শব্দের অর্থ 'রক্তাভ হলুদবর্ণ') উল্লেখ আছে, তবে ইনিই এই দার্শনিক ধারার সত্যিকার প্রবক্তা কি না তা মোটেই সুনিশ্চিত নয়। বর্তমানে পন্ডিত-মহলে এ-সমস্যার নিম্নোক্ত আপস-মীমাংসাটিই সবচেয়ে সাধারণগ্রাহ্য হয়ে আছে: তা হল এই যে যে-সমস্ত ঋষি এই বিশেষ দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবক্তা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যিই প্রথম কিংবা অন্যতম প্রথম ছিলেন কপিল নামে এক ঋষি। তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে-কপিল ঋষির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইনিই সেই কপিল কিনা তা নির্ণয় করা অসম্ভব। এঁর এবং এঁর দুই শিষ্য অসুর ও পঞ্চশিখের রচনাবলীর এখন আর অস্তিত্ব নেই, তবে এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে এই তিনজন গ্রন্থকার কাল্পনিক নয়, বাস্তবে এঁদের অস্তিত্ব ছিল। ভারতীয় মহাকাব্যগুলিতে ঋষি অসুরের নাম বেশ কয়েকবার পাওয়া যায় এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় পাওয়া যায় কারিকা-রচয়িতার পূর্বসূরী হিসেবে পঞ্চশিখের নাম।

ঈশ্বরকৃষ্ণের এই পুথিখানি খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে রচিত বলে মনে হয়। এতে সাংখ্য-দর্শনের আদি রূপের পুনর্নির্মাণ সাধিত হয়েছে। এই শেষোক্ত বক্তব্যের সমর্থন মেলে উপরোক্ত কারিকার পাঠের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী পুথিসমূহে (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, বদরায়নের পুথিতে) উল্লিখিত সাংখ্য-দর্শন সম্পর্কিত মন্তব্য ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলে। এ-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ পুথিগুলিতে উল্লিখিত মন্তব্যাদিরও তুলনা করা চলে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ভারতের এমন দার্শনিক পুথিপত্রের এক বিপুল

সংখ্যাধিক্যের তুলনায় একমাত্র সাংখ্যকারিকাই চীনা ভাষায় অনূদিত ও মহাযানী বৌদ্ধদের কাছে পরিচিত হয়েছিল।

সাংখ্য-দর্শনের আদি রূপের সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে সহায়ক চাবিকাঠি হল বদরায়নের ব্রহ্মসূত্র। আদি সাংখ্য-দর্শনের প্রতিপক্ষ হিসেবে বদরায়ন এই দর্শনের যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যসূচক ধ্যানধারণা উপনিষদের ভাববাদী ধ্যানধারণাসমূহের ব্যাখ্যাতা বৈদান্তিক ধারা ও ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার অন্তর্গত ভাবনা-ধারণার বিরোধী সেগুলির এক নিয়মিত ও সুসঙ্গত বিবরণ দিয়েছেন। ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা সাংখ্য-দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন তাকে 'প্রধান-করণবাদ' (প্রকৃতিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস এই মতবাদ) অথবা 'অচেতন-করণবাদ' (অচেতন কোনো কিছু, অর্থাৎ বস্তুপদার্থ বা প্রকৃতি, বিশ্বের ভিত্তিস্বরূপ এই মতবাদ) আখ্যা দিয়ে। বদরায়ন জোর দিয়ে বলেছেন যে উপরোক্ত এই উভয় মতবাদই বৈদান্তিকদের পক্ষে সম্পূর্ণ অ-গ্রহণীয়, কেননা তাঁদের কাছে ব্রহ্মন্ অথবা 'বিশুদ্ধ চৈতন্য'ই বিশ্বসৃষ্টির আদি নিদান।

সাংখ্য-দর্শনকে বদরায়ন বেদান্তের প্রধান প্রতিপক্ষ বলে মনে করেছিলেন। সম্ভবত তৎকালীন সমাজে এই দর্শনের প্রভাব এবং তাঁর নিজের দার্শনিক বিশ্বাসের সঙ্গে এর মতাদর্শগত বৈসাদৃশ্যই ছিল এর কারণ। তিনি মনে করেছিলেন যে সাংখ্যের প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলিকে যদি খারিজ করা যায় তাহলে বিনা ব্যতিক্রমে অপর সকল বস্তুবাদী তত্ত্বের ভিত্তিভূমিও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এ-ব্যাপারে শঙ্করাচার্যও তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের যে-সমস্ত অধ্যায়ে সাংখ্য-দর্শন নিয়ে আলোচনা আছে সেই অধ্যায়গুলি সম্পর্কে শঙ্কর-রচিত বিশদ টীকা-ভাষ্যে তিনিও জোর দিয়ে বলেছেন যে বৈদান্তিকদের পক্ষে এই বিশেষ দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে জয়লাভ অপর সকল বিরোধী মতের বিরুদ্ধে জয়লাভের সামিল। প্রধানই (বস্তুপদার্থ বা প্রকৃতি) বিশ্বের আদি নিদান এই তত্ত্ব শঙ্করাচার্যের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল যে-কোনো ধরনের পরমাণু-সংক্রান্ত ধারণার বিশ্বজনীন একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে। (রক্ষণশীল ব্রহ্মণ্য মতাদর্শের সমর্থক ধ্যানধারণার প্রাধান্য আছে এমন) তৎকালীন বহু পুথিতেই সাংখ্য-দর্শনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে সাংখ্য ও লোকায়ত এই উভয় দর্শনের উল্লেখের ব্যাপারে সে-সবের সুস্পষ্ট অনিচ্ছা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই বলে যে ওইসব পুথির রচয়িতারা এই দুই দর্শনকে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-সম্পর্কিত জ্ঞান করতেন। সাংখ্য-দর্শনের প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তিটি হল এই যে বিশ্বের আদি বস্তু-নিদান — প্রকৃতি বা প্রধান — অনাদি কাল থেকে বিরাজিত এবং নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া অপর কোনো বাহ্য কারণে তা প্রভাবিত হয় না। ইংরেজি 'নেচার' (বা নিসর্গ) শব্দটি দিয়েও প্রকৃতির অর্থ বোঝায় বলে সাংখ্যের পুথিগুলির অনুবাদে প্রকৃতি শব্দটি সাধারণত 'নেচার' হিসেবে অনূদিত হয়ে এসেছে। তবে

পরে কয়েকজন পণ্ডিত বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃতির আরও সঠিক অনুবাদ হল 'ম্যাটার' (বা বস্তুপদার্থ), কেননা সাংখ্যের পুথিতে 'মূল-প্রকৃতি' (বা আদি প্রকৃতি) প্রকৃতি শব্দের তুল্যমূল্যভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর ফলে অস্তিত্বের সকল রূপেরই আদি উৎস হিসেবে প্রকৃতির বিশ্বজনীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রকৃতিকে পাওয়া যায় দুই রূপে: 'ব্যক্ত' (স্বপ্রকাশ) ও 'অব্যক্ত' (অপ্রকাশ)। উপনিষদসমূহ থেকে এই ধারণাদুটি গৃহীত হলেও সাংখ্যে তা ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপনিষদসমূহে ব্যক্ত, অর্থাৎ সেই জগৎ যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির গোচর এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে যা অপ্রকৃত, তাকে প্রতিতুলনা করা হয়েছে অব্যক্ত, অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়গোচর নয় অথচ যা একমাত্র প্রকৃত বা সত্য বা পরব্রহ্মের দ্যোতক, তার সঙ্গে। অপরপক্ষে সাংখ্য-দর্শনে ওই দুটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে বস্তুপদার্থের দুই সমানভাবে সত্য অস্তিত্বের রূপ। সেখানে ব্যক্ত (প্রকৃতি) উপস্থাপিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুনিচয়ের মূর্ত সামগ্রিকতা হিসেবে, আর অব্যক্তকে দেখা হয়েছে বিশ্বের বস্তুসত্তার নীতিটিরই প্রতিফলন হিসেবে সমান মাত্রায় সর্ববস্তুতে বিরাজমান হিসেবে। এই অব্যক্ত হচ্ছে সকল প্রকার সম্ভাব্য রূপের সম্ভাব্য আধার। বিশ্বের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বলতে গেলে মূর্ত হয়ে ওঠে এই 'আদি অখণ্ড'এর ভাঙনে, অবস্তু ও বস্তুরূপে খণ্ড-খণ্ড হয়ে — আর এই খণ্ডাংশগুলি আদি নিদান থেকে ঠিক ততখানিই পৃথক হয়ে থাকে যতখানি পৃথক হয় মৃন্ময় পাত্রগুলি তাদের আদি নিদান মৃত্তিকা থেকে।

তাহলে এই বিশ্বের গঠন ও তার পরবর্তী পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলি সম্ভব হয় কী করে? সাংখ্য-দর্শন এ-প্রশ্নের যে-উত্তর দিচ্ছেন তা বুঝতে হলে এই ধারার দর্শনশাস্ত্রীরা কার্য-কারণ সম্বন্ধের যে-তত্ত্বটি (বা হেতুবাদ) বিশদ করেছেন তা নিয়ে আমাদের আলোচনা করা দরকার। এই তত্ত্ব 'সৎকার্যবাদ' (কারণের মধ্যে কার্যের উপস্থিতি ও সে-কারণে কার্যের উদ্ভব-সম্পর্কিত তত্ত্ব) নামে পরিচিত হয়ে আসছে। উপরোক্ত দর্শনশাস্ত্রীদের মতে, কার্য যদি কারণের মধ্যে উপ্ত না থাকে, তাহলে বলতে হয় শূন্য থেকেই উদ্ভব ঘটে তার, অর্থাৎ তাহলে প্রতিটি নতুন ঘটনা সংঘটনের জন্যে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির হস্তক্ষেপের দরকার করে। বস্তুত, কোনো বিশেষ কার্য একমাত্র সুনির্দিষ্ট কোনো প্রাথমিক কারণ থেকেই উদ্ভূত হতে সমর্থ। যেমন, দই উৎপন্ন হয় দুধ থেকে, সুতো থেকে কাপড়, ইত্যাদি। তদুপরি, এইভাবে তৈরি প্রতিটি জিনিস যে-কারণ তাকে আকার দিয়েছে তার সঙ্গে কোনো-না-কোনো দিক থেকে সংযুক্ত থাকে: যেমন, একখানি চৌকির ওজন সেই চৌকিটি বানাতে যত কাঠ লেগেছে সেই কাঠের ওজনের সমান হয়, একটি মৃৎপাত্রের ওজন পাত্রটি বানাতে যত মাটি লেগেছে সেই মাটির তালের সমান হয়। অবশ্য কারণের মধ্যে কার্যের উপস্থিতির

নিছক সরল স্বীকৃতির অর্থ হল বিশ্বজগৎকে পরিবর্তনসাধনে অসমর্থ, অনড় ও জড়-অবস্থাপ্রাপ্ত বলে মনে করা। অর্থাৎ, এর অর্থ হল সকল কার্যকেই কারণের মধ্যে দ্রুত এবং একই সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠতে হবে। এ-কারণে সাংখ্য-দর্শনের প্রবক্তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কার্য কারণের মধ্যে গুপ্তভাবে, সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে উপস্থিত থাকে এবং তাকে মূর্ত হয়ে উঠতে গেলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শর্তপূরণের প্রয়োজন পড়ে। কারণ থেকে কার্যে উপনীত হওয়ার পথে কোনোকিছুকে বাস্তবে সহায়তা করে থাকে বহুতর গৌণ ঘটনাদি এবং একমাত্র সেগুলিই কারণের মধ্যে নিহিত বহুতর সম্ভাবনাকে প্রস্ফুট করে তুলতে সমর্থ।

মধ্যযুগে মাধব-রচিত বহুবিভিন্ন দার্শনিক ধারার রচনাদির সার-সংগ্রহ 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' নামের গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় কার্য-কারণ সম্বন্ধ-সম্পর্কিত দুটি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের একটি হল 'পরিণামবাদ' (কারণের কার্যে রূপান্তরের বাস্তবতা-সম্পর্কিত তত্ত্ব) এবং অপরটি 'বিবর্তবাদ' (কার্যের মায়াময় বা অলীক প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব)।

উপরোক্ত প্রথম তত্ত্বটি সাংখ্য-দর্শনের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়টি বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। এই তত্ত্বদুটিকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হয় কার্য ও কারণের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্কের প্রকৃতি-বিষয়ক প্রশ্নটির দুটি বিভিন্ন উত্তর হিসেবে। এখানেও ফের একবার সাংখ্য-দর্শনশাস্ত্রীরা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন, একগুচ্ছ ব্যাপারের অপর একগুচ্ছ ব্যাপারে রূপান্তরকে দেখেছেন বস্তুভিত্তিক প্রকৃত, সত্য প্রক্রিয়া হিসেবে। অপরপক্ষে বৈদান্তিকেরা প্রশ্নটিকে ভাববাদী দৃষ্টিতে দেখেছেন, কারণ একমাত্র পরব্রহ্মকেই তাঁরা গণ্য করেছেন সত্যিকার অস্তিত্বশীল সত্তা বলে এবং বস্তুনিচয় ও তার পরিবর্তনকে মায়া বা ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছু ভাবেন নি।

সাংখ্য-দর্শনের অপর একটি ভিত্তিপ্রস্তর হল তার বিবর্তনের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বস্তুপদার্থ হল এমন-কিছু আদিতে যার অস্তিত্ব ছিল এক সংহত অব্যক্ত রূপে। আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুনিচয় ও সত্তার এক জগতে এই অব্যক্ত রূপের রূপান্তর সংঘটিত হচ্ছে তিনটি গুণ বা তিনটি 'প্রকৃতি'এর সাহায্যে — যাদের নানাবিধ যোগফলের সাহায্যে আবার নির্ধারিত হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি ও বিকাশ। এই তিনটি গুণের নামেই তাদের স্বরূপ প্রতিফলিত: যথা, 'তমস্' (অন্ধকার), 'রজস্' (প্রচণ্ড আবেগ) এবং 'সত্ত্ব' (অন্তঃসার, সত্য)। এই তিনটি গুণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রজস্ তেজ, শক্তি ও সক্রিয়তার দ্যোতক। অপরদিকে তমস্ জড়ত্ব বা নিষ্ক্রিয়তা এবং সত্ত্ব সচেতনা, সমভাব ও প্রশান্তির পরিচায়ক। এই তিনটি প্রকৃত অথবা 'অস্তিত্বের গুণ'এর উল্লেখ এমন কি প্রাচীন কালের উপনিষদগুলিতেও পাওয়া যায়। তবে সাংখ্য-দর্শনে এই তিনটি গুণ একেবারে মূলগতভাবে নতুন তাৎপর্যের দ্যোতক হয়ে দেখা দিয়েছে। সেখানে এই প্রকৃতগুলি যুক্ত হয়েছে ওই দর্শনের মূল

তাত্ত্বিক ভিত্তি বা বিশ্বসৃষ্টির আদি নিদানের বস্তুভিত্তিক চরিত্রের সঙ্গে। গুণকে সেখানে দেখা হয়েছে 'সূত্র' অথবা 'রজ্জু' হিসেবে, 'গুণ' অথবা 'ধর্ম' হিসেবে। ফলে একই শব্দে দুটি বিভিন্ন ধারণাকে (যথা, 'রজ্জু' এবং 'ধর্ম'কে) অঙ্গীভূত করায় সৃষ্টি হয়েছে রূপক অলঙ্কারের, আর সাংখ্য-দর্শনের প্রবক্তারা এইসব অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন ইতিপূর্বেই সুপরিচিত 'গুণসমূহের তত্ত্ব'এর ব্যাখ্যায়। প্রকৃতিকে তাঁরা তুলনা করেছেন তিনটি সুতোয় বোনা একটি রজ্জুর সঙ্গে। তাঁরা বলেছেন, যে-কোনো বস্তুর মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে একই সঙ্গে ওই তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটেছে, তবে বস্তুপদার্থ যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে সেই অনুযায়ী তারতম্য ঘটবে ওই তিন গুণের হারের।

'আদি' ও পরবর্তী 'ধ্রুপদী' সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী ও কতখানি তা আজ কেবলমাত্র অনুমানের ব্যাপার হয়ে আছে, তবে প্রাপ্ত পুথিপত্রের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে প্রাথমিক পর্যায়ে এই দর্শনে বস্তুবাদী তত্ত্বচিন্তার দিকটি বিশেষভাবে বিকশিত ছিল। অবশ্য তাই বলে সাংখ্য-দর্শনকে পুরোপুরি বস্তুবাদী বলাটা আবার স্থূল বিকৃতিসাধন ছাড়া কিছু নয়। এই দর্শনের মধ্যে যে দ্বৈতভাব নিহিত ছিল তা বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায়।

এই দর্শনে আমরা সমভাবে মুখোমুখি হই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও গঠননিয়ন্তা প্রকৃতির এবং এই প্রকৃতি-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সচেতনা বা পুরুষের। একথা বিশ্বাস করার হেতু আছে যে সাংখ্যে পুরুষকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে পূর্ববর্তী উপনিষদসমূহে।

পুরুষ এই ধারণাটি সক্রিয়তার দ্যোতক নয়, এর অন্তঃসার হল মনন বা ধ্যান। সকল বস্তুতেই এর অস্তিত্ব আছে, বস্তুনিচয়ের অস্তিত্ব সম্ভবই হয় সে-সবের মধ্যে পুরুষের অস্তিত্ব থাকে বলে। পুরুষ যে কী বস্তু তা ধরাছোঁয়া যায় না, তাকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করাও অসম্ভব, তবু যে-কোনো — এমন কি একেবারে নগণ্য — বস্তুপদার্থেও অস্তিত্ব আছে তার। পুরুষ এবং প্রকৃতি (প্রাণ এবং নিসর্গ) মিলিত হলে তবেই সৃষ্ট হয় পঁচিশটি মূল পদার্থ, অর্থাৎ অস্তিত্বের পঁচিশটি আদি রূপ। আর সাংখ্যের মতে, এর মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ প্রাণীন অন্তঃসার (যেমন, প্রজ্ঞা) আছে, তেমনই আছে সেইসব যা নাকি একেবারেই বস্তুসর্বস্ব (যেমন, অপ, ক্ষিতি, মরুৎ, ইত্যাদি)। সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে দ্বৈতভাব এছাড়াও প্রকট হয়ে ওঠে যখন তা প্রয়াস পায় 'প্রকৃতির স্বাধীন গতিবিধি'-সংক্রান্ত প্রায় একটি বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে (অবশ্য প্রকৃতির প্রতিটি মূর্তরূপ প্রকাশের সঙ্গে পুরুষের অস্তিত্বের ধারণাটিও ওতপ্রোত) উপনিষদসমূহের রক্ষণশীল ঐতিহ্যের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় এমন এক ধর্মীয় মোক্ষের ধারণাকে মেলাতে। সাংখ্য ঘোষণা করেছেন যে একমাত্র বস্তুনিচয়ের স্বাভাবিক গতিবিধি অনুধাবন করার পরেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে পরিবর্তনশীল ও

অস্থিতিশীল বস্তুভিত্তিক প্রকৃতির ওপর স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় প্রাণের সীমাহীন আধিপত্য। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই সাংখ্য আবেদন জানিয়েছেন আত্মশোধণে ও ধ্যানে মনোনিবেশের।

প্রকৃতি এবং পুরুষের পাশাপাশি অস্তিত্বের ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে ঈশ্বরকৃষ্ণ নিচের রূপকটির আশ্রয় নিলেন। তিনি বললেন, প্রকৃতি হল এক অন্ধ মানুষ যে নাকি নড়েচড়ে বেড়াতে পারে, আর পুরুষ হল গিয়ে অপর এক মানুষ যার দৃষ্টিশক্তি আছে কিন্তু চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই। এইভাবে 'ধ্রুপদী' সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তারা প্রয়াস পেলেন প্রকৃতির অস্তিত্ব-বিষয়ক পূর্বতন বস্তুবাদী ধারণাকে প্রকৃতির পাশাপাশি অস্তিত্বশীল এক ধরনের আত্মিক পদার্থের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে।

সাংখ্য-দর্শনের উল্লেখ যে অর্থশাস্ত্রে, ব্রহ্মসূত্রে, মহাকাব্যসমূহে, চরক-রচিত চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং মানব-ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় এ-থেকেই প্রমাণ হয় যে এই দার্শনিক মতবাদ খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়াকার শতাব্দীগুলিতে বেশ বহুল-প্রচারিত ছিল।

সাংখ্য-দর্শন ধর্ম-নিরপেক্ষ সাংস্কৃতি ও নানা ধরনের ধর্মীয় আন্দোলন উভয়ের ওপরই বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। যদিও বস্তুবাদী চিন্তাভাবনাগুলিকে ক্রমশ এই দর্শনের আওতা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, তবু এই দার্শনিক ধারার কেন্দ্রীয় ভাবাদর্শটি সবকিছু সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আছে। আর তা হল, যে-কোনো রূপেই হোক-না কেন পরব্রহ্মের ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করা এবং নরত্ব-আরোপিত দেবতার ব্যক্তিস্বরূপের ধারণাটিকেও বর্জন করা অবিচলিত চিত্তে।

সাংখ্য-দর্শনেই প্রথম প্রচারিত নিয়মিতভাবে আত্মবিকাশে সমর্থ 'আদি নিসর্গ' (বা প্রকৃতি)-র ধারণাটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারত জুড়ে বস্তুবাদী চিন্তা-ঐতিহ্যের উদ্ভবের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি প্রধান অবদান।

যোগ বা পাতঞ্জল

দর্শনসমূহের মধ্যে যোগ বা পাতঞ্জল-দর্শনের জন্যে একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট। সাধারণভাবে 'যোগ' শব্দটিতে মানুষকে খানিকটা সমাধির মতো অবস্থায় উপনীত করার জন্যে পর্যায়ক্রমিক একসারি ব্যায়াম বোঝায়। কিংবা বোঝায় — মানুষের দেহে সুপ্ত শারীরিক শক্তি-প্রকাশের নানা সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তোলা ও মানসিক অবস্থার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিছকই এক ধরনের ব্যায়ামের প্রক্রিয়া (উনিশ শতকে ইউরোপে এই শেষোক্ত অর্থেই 'যোগ' শব্দটি গৃহীত হয়েছিল)। তবে আসলে যোগ হল নিজস্ব অতিমাত্রায় মৌল নানা বৈশিষ্ট্য সহ সু-পরিণত একটি দার্শনিক চিন্তাধারা।

ধ্রুপদী যোগ-দর্শনের সূত্রপাত বলে ধরা হয় ঋষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' নামের পুথিটিকে।

এই পুথিতে যোগ-দর্শনের সবক'টি মূল প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে। পরে অবশ্য ওই তত্ত্বগুলিকে আরও বিকশিত ও পরিণত করে তোলা হয়েছে বহুবিধ পরবর্তী রচনায়। এগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য 'যোগসূত্র' সম্বন্ধে ব্যাসের ব্যাখ্যা-সমন্বিত 'ব্যাসভাষ্য' (খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) এবং বাচস্পতির 'তত্ত্ববৈশারদী' (নবম শতাব্দী) গ্রন্থদুটি। এ-দুটিতে যোগ-দর্শনের পারিভাষিক শব্দাবলীর বিশদ টীকা-ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং পতঞ্জলির যোগসূত্রের কিছু-কিছু অংশ অনুধাবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে।

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে সাংখ্য এবং যোগ-দর্শনের ধারাদুটিকে পরস্পর-পরিপূরক দুই ধারা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বস্তুত, সাংখ্য-দর্শনের বহু ধ্যানধারণাই (যেমন দ্বৈতবাদ, পঁচিশটি মূল উপাদান-সম্পর্কিত ধারণা, ইত্যাদি) যোগ-দর্শনে গৃহীত হয়েছে। তবে যোগ-দর্শনশাস্ত্রীরা এই সমস্ত প্রভাবকে তাঁদের মতাদর্শের ক্ষেত্রে গৌণ ব্যাপার বলে গণ্য করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তাঁরা বরং মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন মনস্তত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব এবং দেহের ওপর মনের নিয়ন্ত্রণ অর্জনের উপযোগী ব্যবহারিক প্রক্রিয়াগুলির দিকে। এছাড়া যোগ-দর্শনশাস্ত্রীরা ঘোষণা করেছেন যে তাঁদের দর্শন হল আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন, সাংখ্য-দর্শনে কিন্তু এরকম কোনো ঘোষণা নেই।

মনস্তাত্ত্বিক মৌল ধারণাগুলোর ব্যাখ্যাকেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে যোগ-দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে গণ্য করা হয়। এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক মৌল ধারণার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল 'চিত্ত' (অর্থাৎ মন, কিংবা বলা যায়, মানুষের মননক্রিয়ার সকল সম্ভাব্য ধরনের এক কেন্দ্রীভূত রূপ)। পতঞ্জলির মতে, 'চিত্ত' হল এক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপার, যদিও এ-বস্তু ব্যক্তিবিশেষের সুনির্দিষ্ট অবস্থার সরল প্রতিরূপ উৎপাদন ছাড়া আরও বেশি কিছু প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয়েছে যে চিত্তের আন্তর স্বরূপ অপরিবর্তিতই থেকে যায় এবং ব্যক্তিবিশেষের মনোভাবের সকল ধরনের প্রকাশই চিত্তের ঈষৎ পরিবর্তনের চিহ্ন ছাড়া বেশি কিছু নয়। বস্তুজগতের অস্তিত্বের প্রকৃত নিয়মগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চিত্ত ক্রিয়াশীল হয় ও জীবিত থাকে। তবে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অধীন মানুষের নানা অবস্থান্তরকে গণ্য করা হয় চিত্তের বিকৃত বিকাশ হিসেবে, ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব আদি অন্তঃসার থেকে বিচ্যুতি হিসেবে। বাস্তবে প্রকাশিত মানসিক অবস্থাগুলিকে বলা হয়েছে নানাবিধ 'ক্লেশ' (বিপত্তি বা কষ্ট), ধরে নেয়া হয়েছে যে চিত্তের আদি ও অনির্দেশ্য অস্তিত্বের অবস্থা এই সমস্ত 'ক্লেশ' থেকে মুক্ত অবস্থা।

পতঞ্জলি পাঁচ রকম ক্লেশের কথা বলেছেন। তাঁর এই তালিকার প্রকৃতি ও

ক্লেশের বিন্যাসের ক্রম লক্ষ্য করলে এই পদ্ধতিটির পেছনে নিহিত সামগ্রিক ধ্যানধারণা সম্বন্ধে মোটামুটি পরিষ্কার একটি চিত্র পাওয়া যায়। 'তালিকাটি' শুরু হচ্ছে 'অবিদ্যা' (অজ্ঞতা) দিয়ে; অস্থায়ীকে স্থায়ী এবং সাময়িককে চিরকালীন বলে গণ্য করার ব্যাপারে মানুষের মজ্জাগত ধারণার মধ্যে এই অবিদ্যার প্রকাশ ঘটে। দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে উপনিষদসমূহের অন্তর্গত ভাববাদী ধারার মূল নীতিটিকে আরোপ করা হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, দৃশ্যমান বহুর সমাবেশ এবং বাহ্য বস্তুসমূহের বস্তুভিত্তিক প্রকৃতি মায়াময়, একমাত্র তা-ই প্রকৃত বা সত্য যা অখন্ড, ঐক্যবদ্ধ ও ধরাছোঁয়ার বাইরে। এছাড়া দ্বিতীয় ক্লেশ হল অস্মিতা: অহংবোধের সঙ্গে মানুষের দেহ ও তার ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক ধরনধারণের সমীকরণ এটি। এটিও এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন যার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে উপনিষদসমূহে। অর্থাৎ, এ হল 'বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিখিল আত্মা' (আত্মন্ ব্রহ্মন)-র সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের সুনির্দিষ্ট অহং-এর প্রতিতুলনা। তৃতীয় ক্লেশ — রাগ হল দৈহিক সুখ, আনন্দসম্ভোগ ও জীবনে সাফল্যলাভের বাসনা। এর প্রতিপক্ষে আছে আবার দ্বেষ — সুখসম্ভোগের পথে যা-কিছু বাধা তার সম্পর্কে তীব্র ঘৃণাবোধ। এই ক্লেশের তালিকার সবশেষে আছে অভিনিবেশ, অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে সহজপ্রবৃত্তিগত এক ভালোবাসা ও তাকে হারানোর ভয়।

পতঞ্জলির গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বও কয়েকটি মৌল ধারণার কারণে বিশিষ্ট। বহির্জগতের সংস্পর্শে আসার পর (যোগসূত্রের মতে বিষয়মুখ বাস্তবতার অস্তিত্ব মানুষের মনের বাইরেও আছে — অর্থাৎ, এমন মনে করা যেতে পারে যে এক্ষেত্রে যোগ-দর্শনের ওপর সাংখ্যের প্রভাব পড়েছে; কেবল যোগ-দর্শনে 'মোক্ষ' শব্দটির অর্থ একই সঙ্গে অস্তিত্ব, প্রকৃতি এবং বিষয়মুখ বাস্তবতা অনুধাবন করে যে-অহং তার বিনষ্টি) চিত্ত ওই জগৎ উপলব্ধির নিজস্ব উপায় উদ্ভাবন করে। যোগ-দর্শনশাস্ত্রীরা বস্তু ও ঘটনাসমূহের মধ্যে ঐক্য ও পার্থক্যনিরূপণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ নীতি বিশদভাবে নির্ধারণ করেন। মানব-চেতনার যুক্তিসিদ্ধ ক্রিয়া গোড়ায় প্রাথমিক সাদৃশ্য-নিরূপণ ও পরে ঐহিক ব্যাপারস্যাপারের বিকাশের অপেক্ষাকৃত জটিল সব ছক-নির্ধারণ সম্ভব করে তোলে।

পতঞ্জলি ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার ছিল ধর্মে মতি আছে এমন ব্যক্তিবিশেষকে মনস্তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা অর্জনের নিয়মকানুন — অর্থাৎ যোগের তথাকথিত অষ্ট মার্গ — শিক্ষা দেয়া। এই সমস্ত 'উন্নতির সোপান' আরোহণ আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে নানা কলাকৌশলের বর্ণনা যোগ-দর্শনের সকল পুঁথির অধিকাংশ স্থান অধিকার করে রেখেছে।

যোগের দার্শনিক মতাদর্শের পরিণতি ঘটেছে জগতের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী 'পরম সত্তা'র (ঈশ্বরের) বর্ণনায়। ঈশ্বর সকল 'পূর্ণতা'র অধিকারী এবং ভক্তকে

'চরম লক্ষ্য'-অর্জনে সাহায্য করে থাকেন তিনি। তবে এ-প্রসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হল এই যে পতঞ্জলির নিজের রচনায় ঈশ্বরের উল্লেখ আছে যৎসামান্যই এবং এই উল্লেখ-সমন্বিত তাঁর রচনার অনুচ্ছেদগুলি গ্রন্থটির অচ্ছেদ্য অংশ না হয়ে যেন খানিকটা প্রক্ষিপ্ত অংশ হয়ে আছে। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থক প্রথম যুগের যোগ-দর্শনে কার্যত ব্যক্তিত্ব-আরোপিত দেবতার ক্রিয়াকলাপ বর্ণনার বিশেষ স্থান-সংকুলান হয় নি। বস্তুত কয়েকটি অনুচ্ছেদে সেখানে এমন কথাও বলা হয়েছে যে ঈশ্বর ধর্মীয় আবেগানুভূতি নিবেদনের পাত্র ছাড়া কিছু নন এবং অধ্যাত্মিক তত্ত্বগত কোনো তাৎপর্যও তাঁর নেই। তবে এ-প্রসঙ্গে এটাও বলা দরকার যে এই দার্শনিক ধারার অনুগামীরা ব্যক্তিত্ব-আরোপিত দেবতার আরাধনায় রত থাকতেন এবং এর ফলে তাঁদের মতামত রক্ষণশীল ধর্মীয় ঐতিহ্যের ও হিন্দু পূজাপদ্ধতির প্রায়োগিক দিকগুলির অনেক বেশি সদৃশ হয়ে ওঠে।

মোটের ওপর, এই মৌল দার্শনিক ধারার পর্যালোচনা প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রবণতার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল বিকাশটি অপেক্ষাকৃত কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। সেইসঙ্গে এর ফলে স্পষ্ট হয় দর্শনশাস্ত্র এবং কোনো-কোনো বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাফল্যের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটিও। বলা বাহুল্য, মনুষ্যদেহ-বিষয়ক শারীরস্থান (অ্যানাটমি), শারীরবৃত্ত (ফিজিওলজি) এবং মনোবিদ্যার ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রগতি না-ঘটে থাকলে 'যোগের অষ্ট মার্গ' রচনা সম্ভব হোত না।

ন্যায় এবং বৈশেষিক-দর্শন

এই দুটি দার্শনিক ধারার উদ্ভব ঘটে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এবং গুপ্ত-যুগ নাগাদ সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে ধারাদু'টি। এই ধারাদু'টি ছিল ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এটা নেহাত আপতিক ব্যাপার ছিল না। দুটি ধারাই ছিল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যার অভিমুখী, যদিও উপরোক্ত প্রথম ধারাটি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিল অধ্যাত্মিক জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যাদির দিকে এবং ব্যস্ত ছিল অবধারণার মাধ্যম হিসেবে যুক্তিবিদ্যার বিকাশ নিয়ে (পরে এই ন্যায় শব্দটি যুক্তি বা তর্কবিদ্যা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে)। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ধারাটি শরীরী সত্তা এবং যে-অন্তঃসারগুলির সমবায়ে সত্তা গঠিত সে-সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি নিয়ে ভাবিত ছিল। এই দুটি ধারার দর্শনশাস্ত্রীরা কখনও পরস্পরের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নি; বরং নৈয়ায়িকরা বৈশেষিক ধারার অধিবিদ্যাকে মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করতেন অধিবিদ্যা হল তাঁদের নিজেদের জ্ঞানতত্ত্বেরই স্বাভাবিক সম্প্রসারণের ফল।

বৈশেষিক-দর্শনশাস্ত্রীরা গোড়ার যুগে যে-দার্শনিক চিন্তা প্রচার করেন তা ছিল ভারতের যুক্তিবাদী চিন্তা-ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য এক অংশ। তবে লোকায়ত-দর্শন থেকে এ-দর্শনের পার্থক্য ছিল এইখানে যে পরবর্তী কালে বৈশেষিক-দর্শন ভাববাদ ও আস্তিক্যবাদের কাছে অনেকগুলি বিশেষীকৃত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নতিস্বীকার করে।

'বৈশেষিক' শব্দটি সংস্কৃত বিশেষ (নির্দিষ্টরূপে স্বতন্ত্র) শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন। এর ফলে এই দার্শনিক ধারার নামটি এর মতবাদের অন্তঃসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খেয়ে গেছে। এই মতাদর্শের মূল কথা হল যা সাধারণ ও যা বিশেষ তাদের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক নির্ণয়। এ-মতের অনুসারীরা সাধারণ ও সুনির্দিষ্টকে সত্তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে এক অখণ্ড ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান হিসেবে দেখেছেন। আবার সেইসঙ্গে বিশেষকে বুঝেছেন তাঁরা তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনোকিছু হিসেবে আর সাধারণকে দেখেছেন মানুষের যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে প্রণালীবদ্ধ প্রথমোক্ত ওই বিশেষ-সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্যাদির যোগফল হিসেবে। এর অর্থ, এই ধারার দর্শনশাস্ত্রীদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল কীভাবে বিশেষের সঙ্গে বহু-উপাদানবিশিষ্টকে মেলানো যায়, কীভাবে একটি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে উত্তরণ করা যায় সাধারণীকৃত বহুবিধ মৌল ধারণাগুলোয় — যার ফলে সত্তাকে অখণ্ড একটি সমগ্র হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। এ-ব্যাপারে বৈশেষিক-দর্শন যে-সমস্ত সমাধান লিপিবদ্ধ করেছেন তা যে সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক বিচারে অকাট্য তা নয়, তবে এইসব অনুসন্ধানের বস্তুবাদী সূচনাসূত্রটির বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেই সুদূর অতীতেও কোনোরকম সন্দেহ বা তর্কের অবকাশ সৃষ্টি করে নি।

বৈশেষিক-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কণাদ (খ্রীস্টীয় জন্মের পরবর্তী গোড়ার দিকের কোনো এক প্রথম শতাব্দী)-এর মতে বস্তুবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এমন সমস্ত পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে-পরমাণুগুলি কারও সৃষ্ট নয়, যেগুলি চিরস্থায়ী ও বিনষ্টির অতীত। এই কেন্দ্রীয় তত্ত্বটির অস্তিত্ব বৈশেষিক-দর্শনকে আস্তিক্যবাদী দর্শন হিসেবে গণ্য করা অসম্ভব করে তুলেছে। অবশ্য পরবর্তী যুগে কণাদের রচনাবলীর ভাষ্যকাররা চেষ্টা করেছেন সে-রচনায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে নিয়মিতভাবে ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াগুলিতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ-বিষয়ক স্বীকারোক্তি খুঁজে বের করতে। কণাদ পরমাণুসমূহকে চারটি মূল উপাদানের গুণবিশিষ্ট চারটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন কীভাবে বহুবিচিত্র ধরনে পরমাণুসমূহ পরস্পর-সংযুক্ত হয়ে সকল প্রকার জড় পদার্থ ও জীবন্ত প্রাণীর জন্ম দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'ধর্ম' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন, তবে তা নৈতিক বা ধর্মীয় তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত প্রচলিত অর্থে নয়, বরং প্রাকৃতিক বিকাশ ও কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিয়মাবলীর অত্যন্ত সাধারণ এক সংজ্ঞা হিসেবে।

কণাদ ঐতিহ্যসিদ্ধ 'চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান সৃষ্টির উৎপত্তি-রহস্য' থেকে শুরু করেছেন বটে (এই তত্ত্বটি হল নিম্নরূপ: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, তা ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং তারপর তা ধ্বংস হয়ে যায় 'বিশ্বজনীন প্রলয়ে'; অতঃপর এই পুরো প্রক্রিয়াটি ফের শুরু হয় গোড়া থেকে), তবে এ-তত্ত্বকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন এমনভাবে যাতে প্রায় প্রাকৃতিক দর্শনের কথা মনে পড়ে যায়। অর্থাৎ, বিশ্বজনীন প্রলয়ের মুহূর্তে পরমাণুসমূহ বিলুপ্ত হয় না, ওই মুহূর্তে যা ঘটে তা হল পরমাণুসমূহের মধ্যেকার সেই পারস্পরিক যোগসূত্রগুলি যায় ছিন্ন হয়ে যে-সমস্ত যোগসূত্রের ফলে মানুষের বোধগম্য ঘটনা ও ব্যাপারসমূহের উদ্ভব ঘটে। তদুপরি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুনর্জন্ম সংঘটিত হয় পরমাণুসমূহের উপর্যুপরি সংযোগসাধনের ফলে এবং এই প্রক্রিয়াটি ঘটে কোনো দেবতার অলৌকিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

সনাতনী ধর্মীয়-দার্শনিক নানা চিন্তাধারার প্রবক্তাদের দাবির প্রতিপক্ষে কণাদ ঘোষণা করছেন যে প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে 'অতিপ্রাকৃত' সত্তাদের ক্রিয়াকলাপ কোনো দিক থেকেই যুক্ত নয়। অবশ্য এও ঠিক যে কোনো সময়েই তিনি ঈশ্বরের ধারণাটিকে সরাসরি নাকচ করেন নি, তবে এমন কি ভাববাদী চিন্তাধারার অনুসারী পণ্ডিতরাও একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কণাদের এই স্বীকৃতিকে ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর 'বাহ্য' আপসের ফল হিসেবে গণ্য করা দরকার। তবু, এই আপস সত্ত্বেও, বাস্তবে এই অসামান্য চিন্তাবিদের প্রচারিত দার্শনিক মতবাদটির আন্তর যুক্তি-পরম্পরা আসলে নাস্তিক্যবুদ্ধি-প্রসূতই (অন্তত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে তো বটেই)।

কণাদ-প্রচারিত মতবাদের অন্যতম প্রধান একটি তত্ত্ব হল 'বস্তুপদার্থ' (বা দ্রব্য)-সম্পর্কিত। পরমাণুসমূহের প্রাথমিক পরস্পর-সংযোগকে ভিত্তির সূচনা হিসেবে ধরে প্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ফল হিসেবে উদ্ভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের অমুক বা তমুক দিকের ব্যাখ্যা-প্রকাশই এই তত্ত্বের মূলকথা। সেই সুদূর প্রাচীন যুগে, এমন কি পরবর্তী মধ্যযুগেও, এই অভিনব দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ছিল, কেননা এর মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার সমাধান খোঁজার যে-প্রক্রিয়াসমূহের সাহায্যে সরল বস্তু অপেক্ষাকৃত জটিল বস্তুতে পরিণত হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্বজগতের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল পদ্ধতিসমূহ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দ্রব্য হল অন্য সবকিছু-নিরপেক্ষ এক বিষয়মুখ বস্তু, যা অন্যান্য দ্রব্য ও ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর (অর্থাৎ, বিশেষ একটি দ্রব্য থেকে উৎপন্ন গৌণ ফলাফলের কিংবা কয়েকটি দ্রব্যের সংযোগসাধনের ফলে উৎপন্ন বস্তুর) ওপর ক্রিয়াশীল এবং যা অবিনাশী। এ-প্রসঙ্গে কণাদ লিখছেন: 'কার্য বা কারণের দ্বারা এটি বিনষ্ট হয় না। দ্রব্যের সংজ্ঞা দেয়া চলে এইভাবে — এটি ক্রিয়াশীল হতে সমর্থ, এবং বিভিন্ন গুণের আকর। এটি কারণেরই অন্তর্নিহিত।' অতঃপর তিনি আরও বলছেন: 'দ্রব্য হল

বস্তুসমূহের, গুণাবলীর ও ক্রিয়াকলাপের সাধারণ কারণ।' অর্থাৎ, দ্রব্যের নিজের বাইরে (কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, যে-সমস্ত পরমাণু দিয়ে দ্রব্যটি গঠিত তাদের নিজস্ব সংযোগ-বিয়োগ ছাড়া) দ্রব্যের উৎপত্তি ঘটে না; নিজের ইচ্ছামতো তা গতিশীল হতে পারে, আর তাই উৎপত্তি ঘটাতে পারে কার্যের; এইরকম বহুতর দ্রব্যের ক্রিয়াকলাপের ফলে উদ্ভূত তাদের সামগ্রিক যোগফলেই গঠিত এই বিশ্বজগৎ।

গোড়ার দিককার বৈশেষিক দর্শন-বিষয়ক রচনাবলীতে 'বিশ্বজনীন আত্মা' (বা পরমাত্মা)-র ধারণাটি উপেক্ষিত হয়েছে, সেখানে স্বীকৃতি পেয়েছে কেবলমাত্র 'ব্যক্তিগত আত্মিক বস্তু' (বা আত্মা)। পরবর্তী যুগের বৈশেষিকী রচনাবলীতে অবশ্য বেদান্ত-দর্শন থেকে গৃহীত পরমাত্মার ধারণাটি সমগ্রভাবে এই দর্শনের অঙ্গীভূত হয়েছে। তবে এই মতাদর্শের আদি অন্তঃসারের এই সমস্ত বিকৃতিসাধন বৈশেষিক ধারার বস্তুবাদী প্রবণতাকে ও ন্যায়-দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বকে মূলত প্রভাবিত করে নি।

ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে এই দুটি দার্শনিক ধারার তাৎপর্য প্রধানত নিহিত যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়দুটির ওপর বিরল মাত্রায় গুরুত্ব আরোপে। আজ পর্যন্ত এই বিশেষ ক্ষেত্রের জ্ঞানের সুসংবদ্ধ পরিচয়ের নমুনাস্বরূপ যে-সর্বপ্রাচীন পুঁথিখানি পাওয়া গেছে ঋষি গৌতমের সেই ন্যায়সূত্রে যুক্তিবিদ্যার নানা মৌল ধারণার বিশদীকরণের অত্যন্ত উঁচু এক মানের পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌতম তাঁর তত্ত্বের বিশদীকরণের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন বহির্জগতের বাস্তবতা, তার বিষয়ী-নিরপেক্ষতা এবং মানুষের মনে যা যুক্তিবদ্ধ সংশ্লেষণের রূপ নেয় ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলগত অবধারণযোগ্যতা। ন্যায়-দর্শনে কেন্দ্রীয় চিন্তাটি প্রকাশ পেয়েছে 'স্বচ্ছ চিন্তা'র নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে। স্মৃতিতে যে-ছবিগুলি ফুটে ওঠে, একক পর্যবেক্ষণ ও অনুমানগুলি, বিষয়সমূহের সম্যক ধারণা গড়ে তোলার পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। বিষয়সমূহের প্রামাণিকতার সত্যিকার নিরিখ হতে পারে একমাত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে সেগুলির মানানসই হওয়াটাই। একমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ সেইসব খবরাখবর যা নাকি যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণের 'প্রহরা পেরিয়ে' আসতে পারে সেগুলিই প্রকাশ করতে সমর্থ হয় বস্তু ও ঘটনাসমূহের খাঁটি অন্তঃসারটুকু।

অবধারণার পদ্ধতি ও উপায়সমূহ-সম্পর্কিত ন্যায়শাস্ত্র, বিশেষত যে-সমস্ত পদ্ধতি ও উপায় যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে জড়িত সেগুলি-সম্পর্কিত ন্যায়শাস্ত্র, একেবারে খুঁটিনাটি সহ বিশদাকারে লিপিবদ্ধ।

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গে একদা পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবিদ্যার মূল ভিত্তি যুগিয়েছে অ্যারিস্টটলের যে-ত্রিমুখ যুক্তিবিন্যাস তাদের মধ্যে অবস্থাভিত্তিক তুলনা টানতে গিয়ে ফ. ই. শেরবাত্‌স্কয় গ্রীস ও ভারতের যুক্তিবিদ্যার নানা সংজ্ঞা, ইত্যাদির বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে-বহুবিধ সমান্তরাল অবস্থান লক্ষ্য করা

যায় সেগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শেচরবাতস্কয় আরও দেখেছেন যে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিবিন্যাসের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য যুক্তিবিদ্যার উপরোক্ত সংজ্ঞা, ইত্যাদির উদ্ভব ও সুনির্দিষ্ট রূপদানের পেছনে নিহিত সাধারণ নিয়মসমূহের দিকনির্দেশক হিসেবে বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক।

জ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি ক্ষেত্র হিসেবে যুক্তিবিদ্যার সৃষ্টি ও তার বিশদীকরণের ব্যাপারে ভারতীয় ন্যায়-দর্শনের অবদান অপরিসীম। সমগ্রভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রভাব যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই ফলপ্রসূ। বিশেষ করে এই দর্শনের পরবর্তী বিকাশের যুগে এই প্রভাবের ব্যাপারটি বিশেষ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। ন্যায়-দর্শনের বিশিষ্ট সাফল্যসমূহ ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের গোড়ায় দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির মতো সুবিখ্যাত নৈয়ায়িকদের নিজস্ব মতবাদ বিকাশের পক্ষে ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

কণাদের পরমাণু-তত্ত্বের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য দেখা যায় গ্রীকদের, বিশেষ করে এম্‌পিডোক্লিসের, প্রচারিত পরমাণু-তত্ত্বের। এম্‌পিডোক্লিসও চারটি মৌল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন (আবার এই মৌল পদার্থগুলিও ছিল উভয় ক্ষেত্রে এক: যথা, মাটি, জল, আগুন ও বাতাস বা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ) এবং এই সমস্ত 'চিরস্থায়ী অন্তঃসার'এর যোগ-বিয়োগের ফলই বস্তুবিশ্বের বৈচিত্র্যের কারণ বলে মনে করতেন। বস্তুপদার্থের রূপপরিগ্রহকে এম্‌পিডোক্লিস ব্যাখ্যা করেছিলেন আদি অণুকণাগুলির যান্ত্রিক পরস্পর-সংযুক্তি ও বিযুক্তি দিয়ে এবং দুই বিরোধী শক্তির, ভালোবাসা ও ঘৃণার শক্তির, মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন শর্তসাপেক্ষভাবে। যে-কোনো বস্তু যে মাঝে-মাঝে তার মৌল উপাদানগুলিতে ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেই মৌল পদার্থগুলির পরস্পর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় ফের পুনর্গঠিত হয় — একে এম্‌পিডোক্লিস ব্যাখ্যা করেছেন উপরোক্ত দুটি তথাকথিত 'নীতি'র কোনো একটির প্রাধান্যবিস্তারের ওপর নির্ভরতার কারণ দেখিয়ে। এই তত্ত্বটির সঙ্গে সহজেই তুলনা করা চলে বৈশেষিক-পন্থীদের প্রকৃতির চক্রবৎ পরিবর্তনশীল স্বভাব-বিষয়ক তত্ত্বটির, তবে তফাত এই যে গ্রীক দর্শনশাস্ত্রী বস্তুপদার্থের সাময়িক বিলোপ ও তার পুনর্নবায়ন-সম্পর্কিত তাঁর তত্ত্বটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গোটা জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নি।

বৈশেষিক-দর্শন ও ডিমোক্রিটসের দর্শনের মধ্যেও কিছু-পরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ডিমোক্রিটসও বস্তুপদার্থের নানাবিধ প্রক্রিয়াকে অদৃশ্য কণা বা পরমাণুসমূহের গতি ও পরস্পর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল বলে গণ্য করেছেন। তবে ডিমোক্রিটসের ধ্যানধারণার সঙ্গে বৈশেষিক-দর্শনের পার্থক্য ছিল এইখানে যে প্রথমোক্ত দর্শনশাস্ত্রী পরমাণুসমূহকে পুরোপুরি একরকমের বলে মনে করতেন, তিনি বলতেন যে পরমাণুসমূহের বিবিধ সংযুক্তির রূপের মধ্যে যে-পার্থক্য দেখা

যায় তা গুণগত নয়, একেবারে বিশুদ্ধ পরিমাণগত পার্থক্য। বৈশেষিক-দর্শন ও গ্রীক বস্তুবাদী দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির মতবাদের মধ্যে এই সাদৃশ্যটি বিপুল তাৎপর্যের দ্যোতক। অবশ্য এর ফলে গ্রীকদের ওপর ভারতীয় দর্শনের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বোঝাচ্ছে না, বরং বোঝাচ্ছে এই দুই সভ্যতার অন্তর্গত দার্শনিক চিন্তাধারাসমূহের বিকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের সমান্তরাল ভাবনাচিন্তার প্রকাশ।

মীমাংসা

ভারতীয় ষড়্দর্শনের ঐতিহ্যসিদ্ধ তালিকার শেষে সর্বদাই স্থান পেয়ে এসেছে 'মীমাংসা' ও 'বেদান্ত' নামের দার্শনিক ধারাদুটি। এই ধারাদুটি এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-সম্পর্কিত যে কখনও-কখনও বেদান্তকে আখ্যাত করা হয়েছে 'উত্তর-মীমাংসা' (অর্থাৎ, 'উচ্চতর' কিংবা 'পরবর্তী' মীমাংসা) নামে, আর খোদ মীমাংসা-দর্শনকে প্রায়ই বলা হয়েছে পূর্ব-বা আদি মীমাংসা। তবে আসলে কিন্তু এই দুই দার্শনিক ধারার মধ্যে তাৎপর্যবহ নানা পার্থক্য বর্তমান — তা তাদের মৌল নীতিসমূহ ও তাদের মতাদর্শদুটির সাধারণ মর্মবাণী উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। এই দু'টি দার্শনিক ধারার মধ্যে প্রথম যে কোনটির আর্বিভাব ঘটেছিল আজ তা নিরূপণ করা অসম্ভব, তবে একটি ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে মতপ্রকাশ করা আজ সম্ভব — তা হল, এই দুটি ধারার সংমিশ্রণে এক অখণ্ড দার্শনিক ধারার উদ্ভব ঘটেছিল মধ্যযুগের শেষার্ধে এবং ততদিনে বেদান্তের মতই প্রাধান্যবিস্তার করেছিল।

মীমাংসা-দর্শন আগাগোড়াই বেদসমূহকে প্রামাণ্য হিসেবে উল্লেখ করে গেছেন এবং এই প্রয়াসে এই দার্শনিক শাখা এমন কি রক্ষণশীল হিন্দু ঈশ্বরতত্ত্বের চেয়েও বেশি করে কোনোরকম আপসমূলক সমাধানগ্রহণে অনিচ্ছা জানিয়ে এসেছেন। বেদসমূহের মূল পাঠ বা সংহিতাগুলিকে এই দর্শন গ্রহণ করেছেন যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে। আরও বহু ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক ধারার মতো মীমাংসা-দর্শনও গভীরভাবে ব্যবহারিক, তবে এক্ষেত্রে প্রায়োগিক দিকের ওপর এই গুরুত্ব অর্পণের ধরনটি একটু বিশেষ রকমের। এই দার্শনিক ধারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বস্তু হচ্ছে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নীতি ও ধরনধারণ এবং পূজা-অর্চনার সঠিক পদ্ধতি-সম্পর্কিত। তবে এই সমস্ত আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির বিশদীকরণের ব্যাপারে মীমাংসা-দর্শনের বক্তব্য বৈদিক ঐতিহ্যের খাঁটি মর্মবাণীটি থেকে মূলগতভাবে বিচ্যুত হয়েছে। যেমন, বেদসমূহে বলা হয়েছে যে বলিদান নিবেদিত হবে দেবতাদের উদ্দেশ্যে, অথচ মীমাংসা-দর্শনের মতে বলিদান গ্রহণেই দেবতাদের অস্তিত্ব নিহিত। দেবতারা এখানে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ও মানবজীবনের চলাচলে হস্তক্ষেপকারী প্রকৃতির বহুতর অধীশ্বর নন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ছকে এক অপরিহার্য যোগসূত্র

ব্যতীত অন্যকিছুই নন তাঁরা, কারণ তাঁদের অস্তিত্ব না-থাকলে আবার বলিদান অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এটা তাই খুবই স্বাভাবিক যে মীমাংসা-দর্শনের পুথিগুলিতে বেদ এবং ব্রাহ্মণসমূহে বর্ণিত কিছু-কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক আচারের বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রায়শই সেগুলির ব্যাপারে বিবেকঘটিত কর্তব্যাকর্তব্য বিচার প্রধান স্থান অধিকার করবে।

ধর্মীয় সমস্যাদি নিয়ে প্রধানত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মীমাংসা-দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর জ্ঞানতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা। মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত জৈমিনি ‘স্বচ্ছ জ্ঞান’ (বা প্রমাণ)-এর ছ’টি উৎসের মধ্যে অবশ্য প্রামাণ্য (শব্দ) বা বৈদিক পাঠসমূহের সাক্ষ্যকে অন্যতম বলে গণ্য করেছেন, তবে তাঁর ‘মীমাংসাসূত্র’ গ্রন্থে উল্লিখিত অপর চারটি উৎস কিন্তু এই দর্শনের সামগ্রিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই শেষোক্ত চারটি উৎস হল, ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে দিয়ে লব্ধ ধারণা, যুক্তিবিদ্যাসম্মত কার্য-কারণ সম্বন্ধনির্ণয়, প্রতিতুলনা ও প্রস্তাবনা।

সাধারণভাবে ন্যায়-দর্শন যেখানে বস্তুসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য বা অনুরূপতা বিচারের প্রশ্নে যুক্তিবিদ্যার অবরোহী (কার্য-কারণ সম্বন্ধনির্ণয়) পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন, সেখানে মীমাংসা-দর্শন প্রয়োগ করেন যুক্তিবিদ্যার আরোহী পদ্ধতি। মতাদর্শের বিচারে রক্ষণশীল মীমাংসা-দর্শন এবং বহু দিক থেকে ‘প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী’ ন্যায়-দর্শন বহুতর এক ও অভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে বিচারের সময় পরস্পরের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মতবিরোধের ক্ষেত্রে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়ার এই মজ্জাগত অভ্যাস ইতিপূর্বে-আলোচিত অন্যান্য ধর্মীয় ও দার্শনিক মতাদর্শগুলির মতো মীমাংসা-দর্শনেও কম প্রকট নয়। মীমাংসা-দর্শনের গ্রন্থগুলি এই দর্শনের প্রতিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে সমালোচনার উচ্চ কোলাহলে পূর্ণ।

মীমাংসকরা (মীমাংসা ধারার দর্শনশাস্ত্রীরা) ‘প্রস্তাবনা’ কিংবা আরও সঠিক-ভাবে বলতে গেলে ‘স্বতঃসিদ্ধের স্বীকৃতি’র ধারণাটির প্রবর্তন করেছেন। এই ধারণাটির তাৎপর্য হল, যদি কোনো ঘটনা বা অন্য কোনো ব্যাপার আমাদের কাছে অকারণ বলে মনে হয় তাহলে আমরা বাধ্য হই ব্যাপারটির পরোক্ষ একটা ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে এবং নেতি-নেতি করতে-করতে (অর্থাৎ এটা নয় সেটাও নয় করে একের-পর-এক নানা সম্ভাবনা বাদ দিতে-দিতে) ব্যাপারটির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে শেষপর্যন্ত আমরা গিয়ে পৌঁছতে সমর্থ হই ব্যাপারটির যথার্থ কারণে। ফলে ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই প্রথম অবধারণা অর্জনের প্রক্রিয়ায় অনুমানভিত্তিক প্রকল্পের ধারণাটি দানা বাঁধে। অবশ্য এটা ঠিক যে স্বতঃসিদ্ধের স্বীকৃতি (অর্থাপত্তি) কোনোমতেই পুরোপুরি ‘অনুমানভিত্তিক প্রকল্প’ নয়, বিশেষ করে মীমাংসা-দর্শনে ‘স্বতঃসিদ্ধের স্বীকৃতি’ বলতে মোটেই অনুমান বোঝায় না, বোঝায় তর্কাতীত সিদ্ধান্তই।

প্রসঙ্গত এটিও লক্ষণীয় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শনের সাধারণ বাস্তববাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত। এই দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়মুখ অস্তিত্ব এবং তার অবধারণযোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহপোষণ করা হয় নি, যদিও জৈমিনি শুধু বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধেই নয় সাংখ্য-দর্শনের বিরুদ্ধেও সক্রিয়ভাবে কলম ধরেছিলেন।

মীমাংসা-দর্শনের অঙ্গীভূত উপরোক্ত ওই বাস্তববাদ বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য এই কারণে যে এই দার্শনিক ধারাটি এ-অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আলোচিত অন্যান্য দার্শনিক ধারার মতো নয় মোটেই, বরং এই ধারা ছিল বেদসমূহের পূজা-অনুষ্ঠানের নীতি ও রীতির নিঃশর্ত অনুগামী। সে-কারণেই এটি উল্লেখ্য যে ঐতিহ্যসিদ্ধ ধ্যানধারণাগুলির সত্যতা যাচাই করার এবং সেগুলিকে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের অধীন করার যে-প্রয়াস তৎকালীন যুগে এক সাধারণ প্রবণতাস্বরূপ ছিল তা এমন কি মীমাংসা-দর্শনের মতো ঘোর রক্ষণশীল একটি মতাদর্শকেও প্রভাবিত না-করে পারে নি।

বেদান্ত

মধ্যযুগে বেদান্ত-দর্শনের প্রভাব প্রাধান্যবিস্তার করেছিল, অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে দর্শনের এই ধারাটি অন্যান্য দর্শনের উদ্ভবের পরে উদ্ভূত হয়েছিল। ঋষি বদরায়নের রচনা বলে কথিত প্রথম বিশুদ্ধ বেদান্ত-গ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র' খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই রচিত বলে জানা যায়। বৈদান্তিকেরা অবশ্য প্রমাণ করতে চান যে তাঁদের এই দার্শনিক মতাদর্শটির সূচনা উপনিষদসমূহ থেকে, উপনিষদসমূহের পুঁথিগুলিকেই তাঁদের সকল দার্শনিক রচনার আদি উৎস বলে তাঁরা জ্ঞান করেন। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্যপূর্ণতা অবশ্য স্বতই স্পষ্ট। তদুপরি, সংক্ষিপ্ত এবং সর্বত্র বোধগম্য নয় এমন উক্তিসমূহের সমাহার বদরায়নের উপরোক্ত পুঁথিখানিতে এই দর্শনের সুনির্দিষ্ট চরিত্রের চেয়ে বরং এর প্রধান বক্তব্যগুলিই মাত্র প্রচারিত। তবে বদরায়ন এই গ্রন্থে বেদান্ত-দর্শনের মূল নীতিগুলি বিবৃত করেছেন, যদিও তা প্রকাশ করেছেন প্রধানত নেতিবাচক উক্তির সাহায্যে। যেমন তিনি বলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনোমতেই বস্তুপদার্থের শক্তিসমূহ থেকে উদ্ভূত হয় নি, একমাত্র বাস্তব সত্য হল 'ব্রহ্মন্' (এখানে বোঝানো হচ্ছে, আত্মিক অন্তঃসার) এবং যা-কিছু বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন তা বহুবিচিত্র রূপে এই ব্রহ্মন্ থেকেই উদ্ভূত। এই চরম ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা যে তাঁর সমকালীন বস্তুবাদী ভাবধারার প্রতিক্রিয়ায় সেগুলির বিরোধিতা করবেন এ তো স্বাভাবিক। এ-কারণেই

তাঁর রচনায় সাংখ্য ও লোকায়ত মতের বিরুদ্ধে আলোচনাকালে তীব্র বিতর্কের প্রাচুর্য ঘটতে দেখা যায়।

বদরায়নের অসম্ভব সংক্ষিপ্ত, সূত্রাকার রচনা স্বভাবতই দেশে ভাষ্য-রচনার ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটায়। মধ্যযুগের একেবারে সূচনায় গৌড়পাদ এই দার্শনিক মতবাদের প্রথম যে-ভাষ্যখানি লেখেন তা আজও পর্যন্ত টিকে আছে। পরবর্তীকালে বেদান্ত-দর্শনের এই ধারাটি ভেঙে ভিন্ন-ভিন্ন প্রচারকের নামানুসারে বিভিন্ন উপধারার রূপ নেয়। এই উপধারাগুলি শঙ্কর, রামানুজ, মাধব, বল্লভ ও নিম্বার্কের নামাঙ্কিত। এই দর্শনশাস্ত্রীদের প্রত্যেকেই তাঁদের মূলগ্রন্থ রচনা করেন বদরায়নের ব্রহ্মসূত্রের নিজস্ব ভাষ্যের আকারে। তবে এগুলির মধ্যে মাত্র দু'খানি -- শঙ্কর ও রামানুজের রচিত ভাষ্যদুটিই — পরে বেদান্ত-দর্শনের বিকাশে কার্যত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয়।

শঙ্কর (খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী) ও রামানুজের (দ্বাদশ শতাব্দী) বহুসংখ্যক দার্শনিক রচনাই আজও পর্যন্ত টিকে আছে। শঙ্করের মতবাদ অনুসারে পরব্রহ্ম থেকে জাত এই বিশ্বসংসার মায়া বা ইন্দ্রজালমাত্র, বস্তুভিত্তিক প্রকৃতি প্রায়োগিক 'অহম্'এর মতোই অবাস্তব। কেবলমাত্র আত্মন্, পরম বা ব্রহ্মনের যেন-বা অভিক্ষেপ হিসেবেই, প্রভাবিত করে থাকে সেই কাল্পনিক মানসিকতার সমষ্টিকে যাকে নাকি প্রতিদিনের ভাষায় বলা হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব। বেদান্ত-ধারার অন্তর্গত দুই প্রধান প্রবণতার মধ্যে কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিতর্কের বস্তু হয়ে ছিল কার্যত ধর্মীয় আচার-আচরণ ও অতীন্দ্রিয়বাদ-বিষয়ক প্রশ্নগুলি। শঙ্করাচার্য কেবলমাত্র 'জ্ঞানমার্গ'কেই (অর্থাৎ, ব্রহ্মনের বিশ্বজনীন ও সর্বব্যাপী বাস্তবতার পটভূমিতে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার মায়াময় বা অলীক প্রকৃতি সম্বন্ধে চেতনাকেই) সঠিক ও সত্য বলে মনে করেছেন এবং ফলত ঘোষণা করেছেন যে 'অহম্' ও 'আত্মন্-ব্রহ্মন্' সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। অপরপক্ষে 'ধর্মীয় প্রেমমার্গ'এর প্রবক্তা রামানুজ ব্যক্তিসত্তার দেবসত্তার সঙ্গে একাত্মতাসাধনকেই পরম লক্ষ্য হিসেবে দেখেছেন, তবে তাঁর প্রার্থিত এই একাত্মতা সাধনের ফলে ভক্ত তার উপাস্য দেবতার সংস্পর্শে এলেও দেবতার সমকক্ষ হয়ে ওঠে না।

শঙ্কর প্রচার করলেন এক সর্বব্যাপী ভাববাদী অদ্বৈতবাদ এবং বহির্বিশ্বের বহুবিচিত্র ব্যাপারসমূহকে 'মহাজাগতিক পরম' বা ব্রহ্মনের আত্মপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। ক্রমে শঙ্করের দার্শনিক মত সমগ্রভাবে বেদান্তের মত বলেই পরিচিত হল। রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম এই দর্শনশাস্ত্রীর মতবাদকে গ্রহণ করে নিল নিজস্ব আনুষ্ঠানিক মতাদর্শ হিসেবে।

যদিও বিশেষ একটি যুগে এই বেদান্ত-দর্শন প্রধান একটি দার্শনিক ধারা হিসেবে দেখা দিল, তবু ঐতিহ্যসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে এটি যে অন্যতম একটি

ধারামাত্র এই সত্যটি কিন্তু তাই বলে বিলুপ্ত হল না। বস্তুত, ওই একই সময়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর অপরাপর নানা দার্শনিক ধারা নতুন-নতুন ভাবধারার প্রচারে নিরত ছিল। বাইরের দিক থেকে বেদান্ত-দর্শনের প্রাধান্য অব্যাহত থাকলেও অন্যান্য চিন্তাধারার, বিশেষ করে বৈশেষিক ও সাংখ্য-দর্শনের, ব্যাপক প্রভাব জনসমাজে অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

কুশান এবং গুপ্ত-যুগের সংস্কৃতি

নাটক ও সাহিত্য

দুঃখের বিষয় কুশান-যুগে রচিত সাহিত্যের সামান্য একটু ভগ্নাংশমাত্র আজ পর্যন্ত টিকে আছে। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মূলত গুপ্ত-যুগের সাহিত্যরচনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। অবশ্য লোকশ্রুতি অনুযায়ী, অসামান্য লেখক ও নাট্যকার, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান একজন দার্শনিক পণ্ডিত অশ্বঘোষের রচনাবলী কনিষ্কের রাজত্বকালের (খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের সূচনা) সঙ্গেই সংযুক্ত। অশ্বঘোষের বহু গ্রন্থই আজও অলভ্য থেকে গেছে, কেবল টিকে আছে সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর নিচের কাব্যগুলির খণ্ডাংশ। এগুলি হল, 'বুদ্ধচরিত' (বুদ্ধদেবের জীবনকথা; এ-গ্রন্থের পুরো অংশটিই রক্ষিত আছে এর চীনা ও তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদে), 'সৌন্দরানন্দ' (সুন্দরী ও নন্দ) এবং 'শারিপুত্রপ্রকরণ' নামের নাটকখানি (শারিপুত্রের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক)। প্রাচীন ভারতে অশ্বঘোষের এই সমস্ত গ্রন্থ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ভারত-পরিভ্রমণকারী চীনা পরিব্রাজক ই. ত্সিঙ্ লিখেছেন যে 'কাব্য'খানি পাঠকের হৃদয় এমনই আনন্দে আপ্লুত করে তুলত যে পাঠক বারে বারে তা পাঠ করেও ক্লান্তিবোধ করতেন না।

বুদ্ধচরিত ও শারিপুত্রপ্রকরণে যদিও বৌদ্ধ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং প্রচারিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা, তবু কাব্যদুটিতে কাব্যিক ও শিল্পগত গুণও আছে যথেষ্ট। কাব্যরচনায় অশ্বঘোষ ভিত্তি করেছেন মহাকাব্যীয় ঐতিহ্যকে এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির জীবন পরিপূর্ণ হয়ে আছে নাটকীয়তায় ও আবেগ-সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায়।

অশ্বঘোষ তাঁর নাটকগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশিল্পের যে-ভিত্তি রচনা করেন তা পরে বিকশিত ও পূর্ণ পরিণত হয়ে ওঠে ভাস, কালিদাস, শূদ্রক প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারদের রচনায়। মোট তেরোখানি নাটক ভাসের রচনা বলে চিহ্নিত করা হয়, তবে এই সমস্ত নাটকের মধ্যে বস্তুত কতগুলি যে এই অসামান্য নাট্যকারের রচনা

তা এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে আছে। ভাসও মহাকাব্যীয় ঐতিহ্যের সদ্ব্যবহার করেছেন, তবে তাঁর নাটকগুলি কড়াকড়িভাবে ধ্রুপদী নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে রচিত। কিছু-কিছু আধুনিক পণ্ডিত বলেন এবং এঁদের একথা বলার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও আছে যে ভাসের রচিত নাটক বলে যেগুলির উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে কয়েকখানি ভারতীয় বিয়োগান্ত নাটকের সবচেয়ে প্রাচীন কয়েকটি নমুনা। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই উপরোক্ত নাটকগুলি ভাসের পক্ষে দুঃসাহসিক নব উদ্ভাবনাস্বরূপ ছিল, এইভাবে তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত শিল্পরীতি লঙ্ঘন করেছিলেন ভাস। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার এই বিশেষ ধারাটি আরও বিকশিত করে তোলেন 'মৃচ্ছকটিক' (মৃৎ শকটিক, বা মাটির তৈরি ছোট্ট যান) নাটকের রচয়িতা শূদ্রক। এ-নাটকে দরিদ্র অবস্থায় পতিত এক বণিকের এক গণিকার প্রেমে মুগ্ধ হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন হল কবি ও নাট্যকার কালিদাসের (খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ও পঞ্চম শতকের প্রথমাংশ) রচনাবলী। বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসেও কালিদাসের রচনাবলী এক গৌরবময় অধ্যায়। গত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কালিদাসের রচনাবলীর ইউরোপীয় ভাষার অনুবাদ পাশ্চাত্ত্যে প্রবেশলাভ করে এবং প্রথম থেকেই তা মহা সমাদরে গৃহীত হয়। রুশদেশে ১৭৯২-১৭৯৩ সালে নিকলাই কারামজিন কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের একটি অংশ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় কারামজিন লেখেন যে নাটকটিতে অসামান্য সুন্দর সব কাব্যাংশ আছে এবং নাটকটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির এক নমুনা।

মনে হয় লেখক হিসেবে কালিদাস ছিলেন বহুপ্রসূ, তবে পণ্ডিতেরা এখনও পর্যন্ত তাঁর মাত্র তিনখানি নাটক—'শকুন্তলা', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'বিক্রমোর্বশী', 'মেঘদূত' নামের কাব্য এবং দুটি দীর্ঘতর কাব্য — 'কুমারসম্ভব' (কুমার বা কার্তিকেয়র জন্মকথা) এবং 'রঘুবংশ'এর সন্ধান পেয়েছেন।

কালিদাসের সকল কাব্য ও নাটকের মূলকেন্দ্রে আছে মানুষ ও তার আবেগ-অনুভূতি, তার পার্থিব জীবনের ভাবনাচিন্তা ও আনন্দবেদনার অভিব্যক্তি। বুদ্ধের আদর্শ জীবন ও তাঁর ভক্ত শিষ্যদের প্রশস্তিরচনাকার অশ্বঘোষের কাব্য-নাটকের তুলনায় কালিদাসের কাব্য তাৎপর্যপূর্ণ এক অগ্র-পদক্ষেপের পরিচয়বাহী। কালিদাসের কাব্য ও নাটকের বহু নায়কচরিত্রই রাজা এবং কবি শুধু যে তাঁদের বীরকীর্তির জয়গান গেয়েছেন তা-ই নয়, তাঁদের নীচতারও নিন্দা করেছেন। কালিদাসের কিছু-কিছু রচনা ভারতে মহাকাব্যের বিকাশের সাক্ষ্য বহন করছে। নাটক এবং কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে কালিদাস অত্যন্ত নাটকীয় নানা বিষয় বেছেছেন, আবার সেখানেই প্রকৃতির ও মানুষের আবেগ-অনুভূতির বর্ণনায় নীতিকাব্যের

সৌকুমার্যে ও মানবিকতার গুণে বিশিষ্ট হয়ে আছেন। পূর্বতন কাব্যের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না-হয়েও নানা দিক থেকে নতুন কাব্যভাবনার উদ্ভাবক হিসেবে তিনি স্বীকৃত। কী করে যে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে তাঁর রচনা ভারতের অসংখ্য মানুষের হৃদয়-মন অধিকার করে আছে এ-থেকেই তার ব্যাখ্যা মেলে।

প্রাচীন ভারতে নাট্যশিল্পের প্রভূত অগ্রগতি ঘটে। গুপ্ত-যুগ থেকেই নাট্যশিল্প সম্বন্ধে বহুবিধ বিশেষ গ্রন্থের প্রকাশ ঘটতে শুরু করে, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ও নাট্যকলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, নাটকের বহুবিচিত্র রীতিপদ্ধতি, ইত্যাদি ওইসব গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এইরকম একখানি গ্রন্থ টিকে গেছে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই গ্রন্থখানির নাম 'নাট্যশাস্ত্র' ও ভরতের রচনা বলে এটি প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতেরা মনে করেন খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে রচিত হয় গ্রন্থখানি। যথাযথভাবেই এই গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশিল্পের বিশ্বকোষ নামে কথিত হয়ে আসছে। নাট্যশিল্পের নানাবিধ সমস্যা -- যথা, রঙ্গালয়ের স্থাপত্য, অভিনয়, বিভিন্ন জাতীয় নাটক, নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীত, মঞ্চ-উপস্থাপনা, ইত্যাদি — আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রাচীন ভারতীয় নাটকগুলি যখন ইউরোপে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করে তখন বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত এইমর্মে মতপ্রকাশ করেন যে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের মূল খুঁজে পাওয়া যাবে প্রাচীন গ্রীসের নাট্যশালায়। কিন্তু অতঃপর নিঃসন্দেহে এটা জানা গেছে যে ভারতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই নাট্যশিল্পের উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া আরও প্রমাণ মিলেছে যে ভারতীয় নাট্যশিল্প ও ন্যাট্যাভিনয়ের ঐতিহ্য প্রাচীন গ্রীসের চেয়েও পূর্ববর্তী এবং বিশেষ করে নাট্যবিষয়ক তত্ত্বের ব্যাপারে গ্রীক নাট্যতত্ত্বের চেয়ে তা বহুগুণে সমৃদ্ধতর।

এই গুপ্ত-যুগেই সর্বপ্রাচীন পুরাণগুলি প্রথম সংকলিত হয়। প্রাচীন কালের ভারতীয়দের পৌরাণিক ও সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক ধ্যানধারণার পরিচয়বাহী, ভারতীয় দেবদেবী, রাজারাজড়া ও বীরপুরুষদের লোকবিশ্রুত উপকথার এই সমস্ত সংগ্রহ-গ্রন্থ যুগের-পর-যুগ, বহু দীর্ঘ দিন ধরে সংগৃহীত ও লিখিত হয় এবং বারে বারে ব্যাপকভাবে সম্পাদনা ও সংশোধন করা হয় এগুলির।

'যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা' (খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) কিংবা 'নারদ-সংহিতা'র (খ্রীস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী) মতো কিছু-কিছু ধর্মশাস্ত্রও খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার শতাব্দীগুলিতে রচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির মধ্যেও বিশেষ উল্লেখ্য হল 'পঞ্চতন্ত্র' (খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী) নামের গ্রন্থটি। ছোট-ছোট গল্পকথা ও নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীর এই সংগ্রহ-গ্রন্থটি আজও পর্যন্ত ভারতে ও অন্যান্য দেশেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। মধ্যযুগের

সূচনায় এই গ্রন্থটির অনুবাদ-কর্ম প্রকাশিত হয় পহ্লবী, সিরীয় ও আরবী ভাষায়। মধ্যপ্রাচ্যে এই অনূদিত গ্রন্থটির নামকরণ হয় ‘কালিলা ও দিম্‌না’। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটি ইউরোপেও পরিচিত হয়ে ওঠে। মোটের ওপর, সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

এই গুপ্ত-যুগেই তামিল ভাষায় লেখা দক্ষিণ ভারতের প্রথম সাহিত্য-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। তামিল ভাষার গোড়ার দিককার এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত একখানি বই হল ‘কুরাল’। নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীর এই সংগ্রহ-গ্রন্থটির লোকশ্রুতি-খ্যাত সংকলন-কর্তা হলেন কৃষক-কুলের জনেক প্রতিনিধি, নাম তিরুভাল্লুভার। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে লোক-কাহিনী থেকে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতেই কুরাল রচিত হয়েছিল এবং সেই প্রাচীন কালেই অর্জন করেছিল বিপুল জনপ্রিয়তা। খ্রীস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে তামিল ভাষায় লিখিত নীতিকবিতার নানা সংগ্রহ-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চলের সাহিত্য অবশ্য আবির্ভূত হয় পরে — মধ্যযুগের গোড়ার দিকে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীগুলি বড়-বড় বৈজ্ঞানিক কীর্তির জন্যে চিহ্নিত। এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বিশেষ করে সত্যি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজ ও রসায়ন-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখায় নানাবিধ গ্রন্থও প্রকাশিত হয় এ-সময়ে। গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতির ব্যাপারে দেশের অর্থনীতির নানাবিধ চাহিদা বড় রকমের একটা ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় পূজাস্থান ও অন্যান্য অট্টালিকার নির্মাণকার্যে গণিত ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজ্ঞান।

প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগের প্রারম্ভে ভারতে জীবিত ছিলেন আর্যভট্ট (খ্রীস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনা), বরাহমিহির (ষষ্ঠ শতাব্দী) এবং ব্রহ্মগুপ্তের (ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর সূচনা) মতো অসামান্য সব গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। এঁদের নানা আবিষ্কারে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা সাফল্যের পূর্বাভাস সূচিত।

π চিহ্ন-যে ৩·১৪১৬-এর তুল্যমূল্য এটা আর্যভট্ট জানতেন। পিথ্যাগোরাস থিয়োরেম নামে আমাদের পরিচিত জ্যামিতিক উপপাদ্যটিও জানা ছিল সে-সময়ে। আর্যভট্ট দুই অজ্ঞাত রাশিবিশিষ্ট একঘাত সমীকরণের অখণ্ড সংখ্যার এমন এক মৌল সমাধান উদ্ভাবন করেছিলেন যার সঙ্গে আধুনিক কালের সমাধানগুলির ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতীয়রা শূন্য সংখ্যা ব্যবহার করে আঙ্কিক গণনার এমন এক পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটান যা পরে আরবদেশীয়রা তাঁদের গণনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে নেন

(এটাই তথাকথিত আরবী সংখ্যাচিহ্ন নামে পরিচিত) এবং আরও পরে তাঁদের কাছ থেকে এই সংখ্যাচিহ্নগুলি গ্রহণ করেন অন্যান্য দেশের মানুষ।

আর্যভট্টের মতাবলম্বীরা সেকালে ত্রিকোণমিতির 'সাইন' ও 'কোসাইন' চিহ্নের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন।

আর্যভট্টের অনুসারক ব্রহ্মগুপ্ত গোটা একসারি সমীকরণেরই সমাধান নির্দেশ করেন।

ওই যুগের ভারতের বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ নানা সাফল্যের অধিকারী হন। সেকালের জ্যোতির্বিদ্যার কিছু-কিছু গ্রন্থ এখনও রক্ষিত আছে এবং এই সিদ্ধান্তগুলি প্রাচীন কালের ভারতীয়দের জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক উচ্চস্তরের জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে আছে।

গুপ্ত-যুগের পণ্ডিতেরা পরিচিত ছিলেন গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচলের সঙ্গে. সূর্য এবং চন্দ্র-গ্রহণের কারণও জানতেন তাঁরা। নিজ অক্ষদণ্ডের ভিত্তিতে পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্বন্ধে চমৎকার একটি তত্ত্ব প্রচার করেন আর্যভট্ট।

ব্রহ্মগুপ্ত ইঙ্গিত দেন (এবং তা নিউটনের বহু শতাব্দী আগেই) যে বস্তুসমূহ পার্থিব অভিকর্ষের টানেই মাটিতে পড়ে।

বরাহমিহিরের গ্রন্থ 'বৃহৎ সংহিতা'য় পাওয়া যায় জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও মণিকবিদ্যা-সংক্রান্ত নানা আগ্রহোদ্দীপক তথ্য।

ধাতুবিদ্যায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ওই সময়ে রসায়নশাস্ত্রের নিয়মকানুন আয়ত্ত করাটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয়রা তখনই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন ইস্পাত গালাই. পাকা রঙ্ তৈরি, কাপড় বোনা, চামড়ার কাজ এবং নানাবিধ ভেষজ তৈরিতে তাঁদের দক্ষতার কারণে। ওই সময়কার বেশ কয়েকখানি গ্রন্থে পারদ ব্যবহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রসায়ন ও অপরসায়ন-শাস্ত্র বিষয়ে প্রথম বেশ কয়েকখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। লোকশ্রুতি অনুযায়ী. এগুলির মধ্যে কয়েকখানির রচয়িতা বলে অসামান্য দার্শনিক পণ্ডিত নাগার্জুন খ্যাত।

চিকিৎসা-শাস্ত্রও ওই যুগে দ্রুত বিকশিত হয়ে ওঠে এবং বিশেষ করে উন্নতি ঘটে শারীরস্থান বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যার। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে মানুষের শরীরের বিশদ বর্ণনা আছে এবং শব-ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতি ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইসব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে মানুষের দেহ পাঁচটি প্রধান উপাদান বা 'পঞ্চভূত'এ গঠিত, যথা মাটি-জল-আগুন-বাতাস ও ইথর (ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম)। প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করতেন যে মানবদেহের সকল অসুখই এই পঞ্চভূতের আপেক্ষিক অনুপাতের তারতম্যের ফল। নানারকম শাস্ত্রের সাহায্যে শরীরের শল্য-

চিকিৎসাও এ-সময়ে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা, যেমন শিশুরোগ, স্নায়বিক রোগ, কর্ণ ও স্বরযন্ত্র-প্রদাহের চিকিৎসা এবং ঔষধপ্রস্তুত-বিজ্ঞান, এতটা বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে এগুলি পরিচিত হচ্ছিল পৃথক-পৃথক চিকিৎসা-বিজ্ঞান হিসেবে। বিভিন্ন রোগ-নির্ণয় ও সেগুলির চিকিৎসার ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হচ্ছিল। বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছিল জল-চিকিৎসার এবং ভেষজ গুণসম্পন্ন লতাপাতার রস ও উপযুক্ত পথ্যের নির্দেশ মারফত রোগ-চিকিৎসার ওপর।

চরক (খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং সুশ্রুতের (খ্রীস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী) লেখা চিকিৎসা-সংক্রান্ত পুথিগুলি এখনও টিকে আছে। এইসব পুথিতে করোটির অস্ত্রোপচার, হাত ও পায়ের ব্যবচ্ছেদ এবং চোখের ছানি কাটার মতো জটিল ধরনের শল্য-চিকিৎসারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

স্থাপত্য-শিল্প

কুশান এবং গুপ্ত-যুগ বিশিষ্ট হয়ে আছে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও ধর্মস্থান-সম্পর্কিত উভয় ধরনের স্থাপত্য-শিল্পের নতুন ধরনের বিকাশের কারণে। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১৫০ সালে (বোম্বাইয়ের কাছে) কার্লেতে চমৎকার একসার গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। এই গুহাগুলির মধ্যে প্রধান মন্দির বা চৈত্যটি ভারতের বৃহত্তম গুহা-মন্দির। এটি আনুমানিক ৩৮ মিটার লম্বা, ১৪ মিটারের ওপর চওড়া এবং উচ্চতায় প্রায় ১৪ মিটার। এই প্রশস্ত গুহাগৃহটিতে দু'সার স্তম্ভ আছে, আর আছে একটি স্তূপ এবং পাথরে-গড়া বহুবিভিন্ন ভাস্কর্য-মূর্তি। আড়কাঠ সহ বিশেষভাবে তৈরি ফোকরের মধ্যে দিয়ে ঘরটিতে আলো আসার ব্যবস্থা আছে। গুহার বাইরের দেয়ালের গায়ে রিলিফখোদাই-করা মূর্তি আছে বহু। বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও এগুলির মধ্যে আছে যে-সমস্ত ব্যক্তি মন্দিরনির্মাণে অর্থসাহায্য করেছিলেন তাঁদের মূর্তিও। গোটা গুহা-সমাহারটি পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছিল, গুহাগুলির গঠনও যেমন সুন্দর তেমনই জমকালো। গুপ্ত-যুগে এই ধরনের গুহা-মন্দিরের স্থাপত্য আরও বিকশিত হয়ে ওঠে: এর একটি বিশেষ উল্লেখ্য উদাহরণ হল অজন্তার গুহা-মন্দিরগুলি। এই যুগের মন্দিরের ভিত্তিগাত্রগুলি সাধারণত খোদাই-করা ভাস্কর্য-মূর্তি দিয়ে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত।

তবে এ-যুগের বেশির ভাগ উল্লেখ্য ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ অট্টালিকাগুলি তৈরি করা হয়েছিল কাঠ দিয়ে। বর্তমানে এ-সবের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট না-থাকার এটাই কারণ। অবশ্য গুপ্ত-যুগের যে-সমস্ত পাথরে-তৈরি অট্টালিকা টিকে আছে সেগুলি সাক্ষ্য দিচ্ছে অতি উন্নত মানের স্থাপত্য-শিল্পের। মাটির ওপর খোলা

জায়গায় অন্যতম সর্বপ্রাচীন ভারতীয় ধর্মমন্দিরের নিদর্শন হল সাঁচী স্তূপ। এটি খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত। স্তূপটির প্রবেশপথের সামনে তোরণের দুই ধারে স্তম্ভের মাথাগুলি সিংহের মূর্তিশোভিত, অশোক-স্তম্ভের বিখ্যাত সিংহচূড়ার সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। সাঁচী স্তূপ ভারতীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নির্মিত।

এরও আগেকার ভারতীয় মন্দিরের নিদর্শন হল নালন্দার ছোট্ট বৌদ্ধ মন্দিরটি (খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত)। এই মন্দিরের ভিত্তিটি মাত্র আজ পর্যন্ত টিকে আছে। এই নালন্দায় একদা প্রকাণ্ড এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-সমাহার গড়ে উঠেছিল, যার বাসিন্দা ছাত্রের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। এছাড়া সেখানে উপাসনা ও সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্যে আরও বহু হর্ম্য ছিল।

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বুদ্ধ গয়ায় প্রকাণ্ড একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এই মন্দিরটির প্রধান চূড়ার উচ্চতা ছিল ৫৫ মিটার, এর ফলে গোটা এশিয়ার মধ্যে এটি সবচেয়ে উঁচু বৌদ্ধ মন্দিরগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া ওই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বড়-বড় কয়েকটি বৌদ্ধ মঠও গড়ে ওঠে। এমন কি সুদূর খ্রীস্টীয় শতাব্দীতেই তক্ষশিলায় ধর্মরাজিকা মঠ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মঠের বহু বড়-বড় ঘর ও সংলগ্ন অন্যান্য ক্ষুদ্রতর অট্টালিকা নির্মাণের কাজ যায় শেষ হয়ে।

প্রাচীন জনবসতিগুলিতে খননকার্য চালাবার সময় সেগুলিতে যে-বহুতর পুরাতাত্ত্বিক স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় তাতে খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে নির্মিত ধর্ম-নিরপেক্ষ ঘরবাড়ি ও বাসভবনের বহু ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। সাঁচী ও অমরাবতীর স্তূপগুলির গায়ে-ভাস্কর্যশিল্পের যে-নিদর্শনাদি পাওয়া গেছে তা থেকে উপরোক্ত ওই ঘরবাড়ির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের কিছুটা আভাস মেলে। বোঝা যায় যে বাড়িগুলি ছিল কয়েক তলাবিশিষ্ট এবং রাজপ্রাসাদগুলি ছিল জমকালো ও আড়ম্বরবহুল।

চারুশিল্প

কুশান-যুগে চারুশিল্পের জগতে, বিশেষ করে ভাস্কর্য-শিল্পের ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন রীতির উদ্ভব ঘটে।

মধ্য-এশিয়ায় তখন বিকশিত হয়ে ওঠে স্থানীয় ব্যাকট্রীয় ধারাটি। এই ধারার শিল্পকর্মে লক্ষণীয় ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রবণতা দেখা যায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে ওঠে গান্ধার রীতি, গঙ্গা-উপত্যকায় মথুরা শিল্পরীতি এবং দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রদেশে অমরাবতী শিল্পকলা।

গান্ধার ভাস্কর্য-রীতিতে গ্রীক, রোমান ও মধ্য-এশীয় প্রভৃতি বিদেশী শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় আর দেখা যায় বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব। কিছু-কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে গান্ধার-রীতির ভাস্কর্যগুলি হেলিনিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ভারতীয়দের কাজ, আবার অন্য কেউ-কেউ এমনও বলেন যে সেগুলি নাকি রোমান শিল্পীদের শিল্পকর্ম। তবে এই শিল্পরীতিতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সত্যিসত্যিই স্পষ্ট হলেও গান্ধার শিল্পের ভাস্করদের শিল্প-প্রেরণার প্রধান উৎস ছিল স্থানীয় ঐতিহ্যই। বুদ্ধকে মানুষ গণ্য করে তাঁর মূর্তিগঠন গান্ধার-ভাস্কর্যের একেবারে গোড়ার দিকেই দেখা গেছে। ইতিপূর্বে শিল্পক্ষেত্রে বুদ্ধের ভাবরূপ কল্পনা করা হয়েছে চক্র, সিংহাসন, বোধিবৃক্ষ, ইত্যাদি নানা ধরনের প্রতীকের সাহায্যে। সম্ভবত রূপ-কল্পনার এই পরিবর্তন ছিল মহাযানী ধ্যানধারণার ফল।

এই রীতির বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের কয়েকটি মূর্তিতে পণ্ডিতেরা বেলভিডিয়ারের অ্যাপোলো-মূর্তির অকাট্য প্রভাব দেখতে পেয়েছেন বলে মনে করেছেন, তবু এই রীতিতে তৈরি বুদ্ধমূর্তির বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গই একেবারে বিশুদ্ধ স্থানীয় ঐতিহ্য-অনুযায়ী যে গড়া হয়েছে সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। তবে মূর্তি গড়ার উপাদান এবং মূর্তিগুলিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যও এক্ষেত্রে ছিল ভিন্ন। একেবারে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ীই ভারতে ভাস্কর্যগুলি ছিল বিশেষ-বিশেষ অট্টালিকা বা মন্দির, ইত্যাদির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এক্ষেত্রে মূর্তিনির্মাণের বিষয় ভারতীয় হলেও শিল্পের বহু কৃৎকৌশলই যে অনুপ্রেরণার দিক থেকে গ্রীক ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিছু-কিছু শিল্প-ইতিহাসবেত্তার ভাষায়, গান্ধার-রীতির ভাস্করের হৃদয় ছিল ভারতীয় আর হাত দু'খানি গ্রীক। ভাস্কর্য-শিল্পের ইতিহাসে গান্ধার-রীতির ঐতিহ্য মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের বহু দেশের চারুশিল্পের ওপর প্রধান একটি প্রভাব হিসেবে কাজ করেছিল।

মথুরা-রীতির ভাস্কর্য-শিল্প ছিল খুবই মৌল ধরনের। বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রিত ভাস্কর্যগুলি ছাড়াও বেশ একটা বড় সংখ্যায় কাজ ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়বস্তু অবলম্বনে। এই শেষোক্ত নানা কাজের মধ্যে কুশান-রাজাদের মূর্তি এবং মন্দির ও মঠগুলির ধনী পৃষ্ঠপোষকদের মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিগুলি প্রতিকৃতির রীতিমতো এক প্রদর্শনীবিশেষ। মথুরা-রীতিতে সবচেয়ে প্রধান প্রভাব লক্ষ্য করা যায় প্রাচীন জৈন ও মৌর্য ভাস্কর্যরীতির। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ব্যাপার এই যে মথুরা-রীতিতে বুদ্ধের নরত্ব-আরোপিত মূর্তি নির্মাণ করতে দেখা যায় (মনে হয়, গান্ধার-রীতিনিরপেক্ষ ভাবেই এটি সম্ভব হয়), সম্ভবত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে এ-ব্যাপারটি ঘটবার কিছুটা আগে থেকেই তা দেখা যায়। মথুরা-রীতিতে তৈরি বুদ্ধের মূর্তি এই ধর্ম-প্রচারকের পার্থিব প্রতিকৃতি নির্মাণ করলেও ওই পর্যায়ের

মূর্তিগুলির মধ্যে কিছু-পরিমাণে কিন্তু নিস্পৃহা ও দূরত্বের ভাব তখনই অনুভবযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

অমরাবতীর শিল্পরীতিতে ভাস্কর্য যেন খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত বৌদ্ধ স্তূপগুলির পূরক অংশ হিসেবে রয়ে গেছে। প্রধানত বুদ্ধের জীবনকথার ঘটনাবলী অবলম্বনে নির্মিত এই ভাস্কর্য-দৃশ্যাবলী, তবু এইসব ভাস্কর্যের সুরটি কড়াকড়িভাবে স্থানীয়ই থেকে গেছে, এগুলি প্রকাশ করছে এই বিশেষ রীতির শিল্পগত অনুশাসনের অন্তর্নিহিত সুনির্দিষ্ট নীতিগুলিকে। উত্তরাঞ্চলের শিল্প-ঐতিহ্যের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় এই ভাস্কর্য-রীতিতে।

গুপ্ত-যুগে কিন্তু এই বিভিন্ন শিল্পরীতির সুনির্দিষ্ট, বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পৃথক করে চিনে নেয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাস্কর্য-শিল্পের ক্ষেত্রে ওই সময়ে শুরু হয়েছিল অপেক্ষাকৃত সমপ্রকৃতির একটি ঐতিহ্য গড়ে ওঠার পালা এবং এই নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি ছিল প্রধানত উত্তর ভারতীয় মথুরা-শিল্পরীতি। এ-যুগে বুদ্ধমূর্তির বৌদ্ধ ধর্মীয় ব্যাখ্যা আরও বিশদে বিস্তারিত হয়ে উঠেছিল এবং এই ধর্মগুরু ও প্রচারকের মূর্তি-কল্পনার মানবিক দিকটির ক্ষেত্রে এক ধরনের বিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বুদ্ধকে কল্পনা করা হচ্ছিল তখন দেবত্ব-আরোপিত এক পরম সত্তা হিসেবে।

গুপ্ত-যুগের শেষের দিকে বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রিত ভাস্কর্য-শিল্পের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আসে খোদ বৌদ্ধধর্মেরই অবক্ষয় শুরু হওয়ার ফলে। অতঃপর বুদ্ধমূর্তিগুলি একই ধরনের ধর্মলক্ষণযুক্ত ও শিল্প-আঙ্গিকের অধিকারী হয়ে ওঠে এবং দেশের বিভিন্ন অংশ-থেকে-পাওয়া এই সময়কার ভাস্কর্য-প্রতিকৃতি দেখতে অনেকটা একরকম লাগে। এই সময়কার ভাস্কর্যের ভালো দুটি নিদর্শন হল সুলতানগঞ্জ (বিহার) ও সারনাথে (বারাণসীর কাছে)-পাওয়া পঞ্চম শতাব্দীর বুদ্ধমূর্তি দুটি। সুলতানগঞ্জে-পাওয়া মূর্তিটি পিতলের তৈরি এবং রীতিমতো প্রকাণ্ডই বলা চলে — উচ্চতায় দু'মিটারেরও বেশি ও ওজন প্রায় এক টন। বুদ্ধকে এই মূর্তিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে দৈবশক্তির মূর্তরূপ হিসেবে। মূর্তিটির দেহ প্রশস্ত, কটিদেশ ক্ষীণ এবং দেহে মাংসপেশীর অস্তিত্ব প্রায়শই স্পষ্ট নয়। গোটা মূর্তিটিই বিশেষ একটি ভঙ্গিতে গঠিত: মাথাটি সামনের দিকে অল্প-একটু আনত এবং ডান হাতখানি কনুইয়ের কাছ থেকে 'অভয়-মুদ্রা'র ভঙ্গিতে বাঁকানো। এখানে এই ধর্ম-প্রচারকের মূর্তিটিকে স্পষ্টতই আদর্শ রূপ দেয়া হয়েছে: বুদ্ধের ভাবভঙ্গি এখানে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ, যেন আন্তর ধ্যাননিমগ্নতার দ্যোতক, এবং মুখে প্রসন্ন হাসির আভাস।

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানও ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে বৈষ্ণব ও শৈব-ধর্মাশ্রিত দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি বহুল প্রচলিত হতে দেখা

যায় এই সময়ে। গুপ্ত-যুগের বেশির ভাগ হিন্দু-ধর্মাশ্রিত ভাস্কর্য হল শিবমূর্তি। এটা খুবই সম্ভব যে বুদ্ধকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত করার রীতিটি (খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রিত ভাস্কর্য-শিল্পের যেটি ছিল বৈশিষ্ট্য) তৎকালীন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগঠন-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল।

তবে হিন্দুরা তাঁদের দেবদেবীর মূর্তিকে এমন কি মানুষের আকার দিলেও মূর্তিগুলিকে তাঁরা গণ্য করতেন প্রতীক হিসেবে, আর তাই মূর্তিগুলিতে তাঁরা আরোপ করতেন চারটি বা ততোধিক হাত (চতুর্ভুজ, দশভুজা, ইত্যাদি)। এইভাবে বিভিন্ন রকমের জোড়া-হাতের সংখ্যা ছিল বিশেষ-বিশেষ নির্দিষ্ট দেবতার অথবা ওই দেবতার বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপের প্রতীক-চিহ্ন।

গুপ্ত-যুগে কড়াকড়িভাবে ধর্মাশ্রিত ভাস্কর্য-শিল্প ছাড়াও তথাকথিত আধা-ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাস্কর্য-শিল্পেরও সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি ঘটে।

এই যুগটি ছিল প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পেরও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। অজন্তার (বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের)* বিশ্বখ্যাত জলরঙে-আঁকা ভিত্তিচিত্রগুলি ভারতীয় ও বিশ্ব শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যিকার সেরা সব নিদর্শন। চিত্রাঙ্কনের আঙ্গিকগত বিচারে এই ছবিগুলিকে অবশ্য কড়াকড়িভাবে 'ফ্রেস্কো' জাতীয় ভিত্তিচিত্র বলা চলে না, কারণ ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল দেয়াল ও ছাদের শুষ্ক প্রলেপের ওপর। যাই হোক, অজন্তার ঊনত্রিশটি গুহার দেয়াল ও ছাদ এই ছবিগুলি দিয়ে পূর্ণ। ছবির বিষয়ও যেমন ব্যাপক তেমনই বিচিত্র। বুদ্ধ-জীবনের নানা দৃশ্য, জাতকদের জীবনকথা, বুদ্ধদেবের নানা প্রতিকৃতি, যক্ষিণীদের মূর্তি, নানা অলংকরণ নকশা, ইত্যাদি এইসব ছবির বিষয়। এছাড়া নিসর্গের নানা দৃশ্যও চমৎকারভাবে আঁকা হয়েছে আর আঁকা হয়েছে দৈনন্দিনের দৃশ্যাবলী এবং রাজসভার কিছু দৃশ্য। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অজন্তার গুহাগুলি দেখে হিউয়েন চাঙ্ লিখেছিলেন যে মন্দিরটির ভিত্তিগাত্রগুলিতে অঙ্কিত হয়েছে 'যা-কিছু মহৎ ও যা-কিছু ক্ষুদ্র' সবই। ছবিগুলিতে ব্যবহৃত নানা রঙও ভারি চমৎকার, সম্ভবপর প্রায় সবরকম রঙেরই আভাস মেলে তাতে।

অজন্তার ভিত্তিচিত্রগুলির কাজ শুরু হয় গুপ্ত-যুগেরও আগে থেকে এবং সবক'টি গুহার ছবি আঁকার কাজ শেষ হতে সময় লাগে কয়েক শতাব্দী। শুধুমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিই নয়, প্রাচ্যদেশীয় অপর কয়েকটি দেশের সংস্কৃতির ওপরও এই গুহাচিত্রগুলির প্রভাব অসামান্য হয়ে দেখা দেয়।

* অজন্তা-অঞ্চলটি সেকালে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত শিলালিপি, ইত্যাদির সাক্ষ্য অনুযায়ী অনুমিত হয় যে এই অঞ্চলটি ছিল ভকতক-রাজ্যের অংশবিশেষ।

প্রাচীন ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

ঐতিহাসিক যুগের এমন কি একেবারে গোড়ার দিক থেকেই ভারত অন্যান্য বহু দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এইসব সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল বিকশিত ও দৃঢ়মূল। ভারতীয় সংস্কৃতি সে-সময়ে অনুপ্রবেশ করেছিল অন্যান্য নৃকুল-সংস্কৃতির এলাকায় এবং সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক সমৃদ্ধিসাধনের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই সাংস্কৃতিক পরস্পর-সম্পর্কগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন ও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলি ছিল ভারত ও ইরানের মধ্যে। সেই সুদূর নবপ্রস্তর-যুগ থেকেই এই সম্পর্কের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় ও প্রাচীন ইরানীয়রা নৃকুল এবং ভাষার বিচারে ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ ইন্দো-ইরানীয় সম্পর্কের যুগ শুরু হয় আকিমেনিড সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর, উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু-কিছু অঞ্চল ওই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় থেকে। মৌর্য-যুগে আকিমেনিড সংস্কৃতিও (স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ইত্যাদি) ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হয়। অপরপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে ভারত থেকে ইরানে এবং ভারতের বহু বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপ ও শিল্পকর্ম ইরানে পরিচিত হয়ে ওঠে।

মধ্য-এশিয়ায় সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদদের সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে এমন কি সেই সুদূর হরপ্পা-সভ্যতার যুগেও মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলগুলি ও ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ নানা যোগসূত্র ছিল, তবে এই যোগসূত্রগুলি বিশেষরকম নিবিড় হয়ে ওঠে কুশান-রাজত্বের যুগেই। কুশান এবং শকদের ভারতে অনুপ্রবেশের পরেই মধ্য-এশিয়ার নানা ধরনের প্রভাব অনুভূত হয় ভারতে, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতের নানা সাংস্কৃতিক সাফল্য-সম্পর্কিত ধ্যানধারণা মধ্য-এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে।

মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত বহুবিধ উৎকীর্ণ লিপি অনুযায়ী বিচার করলে বলতে হয় যে কুশান এবং গুপ্ত-যুগে ভারতীয়রা ওই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বসতি স্থাপন করেছিলেন ও বড়-বড় কয়েকটি মঠ গড়ে তুলেছিলেন। এর সবচেয়ে লক্ষণীয় প্রমাণ হল কারা-তেপেহ্ (তের্‌মেজের কাছে, খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার কোনো শতাব্দীতে) এবং অজিন-তেপেহ্‌তে (দক্ষিণ তাজিকিস্তানে, খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মঠদুটি। ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ নানা সম্পর্কের লিখিত প্রমাণও পাওয়া গেছে মধ্য-এশিয়ায় -- এগুলি হল বার্চগাছের বাকলে ও তালপাতায় হাতে-লেখা কিছু বৌদ্ধ পুথি।

খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ দ্রুত বেড়ে ওঠে; এই বাণিজ্যিক লেনদেন চলে বিখ্যাত রেশম-পরিবহণ পথ ও সমুদ্রপথ মারফত। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও বৌদ্ধ পরিব্রাজক দলগুলিকে

তখন চীনে পাঠানো হয়। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ চীনে বড়-বড় বৌদ্ধ মঠ গড়ে উঠতে দেখা যায় এবং চীনা ভাষায় বৌদ্ধ পুথিপত্রের অনুবাদও শুরু হয় তখন।

ওই একই সময়ে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় বসতিগুলিও গড়ে ওঠে। এর পর্যাপ্ত প্রমাণ মেলে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা ও এখনও পর্যন্ত টিকে-থাকা পুথিপত্রে।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লঙ্কাদ্বীপে প্রথম ইন্দো-আর্য বসতকারীরা আসার অব্যবহিত পর থেকেই ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতঃপর মৌর্য-রাজাদের আমলে দ্বীপটিতে বৌদ্ধধর্ম প্রথম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে এই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রবলভাবে প্রভাবিত করে সিংহলের সাহিত্য, স্থাপত্য-শিল্প ও ধর্মকে। এছাড়া অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে এবং পরে এই শেষোক্ত দেশগুলির কোনো-কোনোটিতে ভারতীয় বসতিও গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই বসতকারীরা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বহু অবদান। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে ইন্দোনেশিয়াতেও ভারতীয় জনবসতি গড়ে ওঠে।

হরপ্পা-সভ্যতার আমলেই সুমেরীয়দের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর পরে ভারতীয়দের লিপ্ত থাকতে দেখা যায় আরব ও আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার ব্যাপারে এবং এইভাবে তাঁরা মিশর সহ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ সংহত করে তোলেন।

ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর নানা সম্পর্কের নতুন একটি যুগের সূচনা ঘটে দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের বিজয়-অভিযানের পর থেকে। গ্রীকরা ওই সময়ে সরাসরি ভারত-দেশটির সঙ্গে, তার জাতিসমূহ ও ঐতিহ্য, ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হন। অতঃপর কুশান-যুগে ভারতের সঙ্গে রোমের নানা সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়ে ওঠে: মূল্যবান উপহার-সামগ্রী সহ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের তখন পাঠানো হয় রোমে এবং রোমানরা দক্ষিণ ভারতে তাঁদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি খোলেন।

প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের প্রভাব ভারতে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ইন্দো-গ্রীক রাজ্যগুলি গড়ে ওঠে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং পরে যখন কুশান-যুগের পত্তন ঘটে। এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সে-যুগের ভারতীয় শিল্পকলায় (গান্ধার-ভাস্কর্যে), বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং দর্শনশাস্ত্রে। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে রচিত কিছু-কিছু ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ভারতীয় পণ্ডিতেরা আলেক্‌জান্দ্রিয়ান জ্যোতির্বিদদের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এমন কি ওই সময়কার একটি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ (জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ) তো পরিচিতই হয়ে ওঠে 'রোমক-সিদ্ধান্ত' নামে।

খুব বেশিদিনের কথা নয়, 'যবন-জাতক' (গ্রীক গল্পকাহিনী) নামে জ্যোতির্বিদ্যা-ভিত্তিক একখানি কাব্যের হাতে-লেখা পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। জানা গেছে যে মূল গ্রীক থেকে অনূদিত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অপর একখানি ভারতীয় পুঁথির ভিত্তিতে গত খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আলোচ্য এই পুঁথিখানি সংকলিত হয়। এই আবিষ্কার স্পষ্টতই প্রমাণ দিচ্ছে যে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা ধ্রুপদী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

তবে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সঙ্গে ভারতের এই সমস্ত সম্পর্ক সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে পূর্বোক্ত ওই দুই সংস্কৃতির প্রভাব তেমন ব্যাপক হতে পারে নি। এই প্রভাব সাধারণত সীমাবদ্ধ থেকেছে সমাজের উচ্চতর স্তরগুলিতে (তার নিচে আর প্রসারিত হয় নি) এবং শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পশ্চিম উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। আবার সেইসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও অনুভূত হতে শুরু করে ওই সময়কার পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

যেমন, উদাহরণস্বরূপ, একথা সকলেই জানেন যে ধ্রুপদী পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতীয় ওষুধপত্র ব্যবহার করা হোত। এছাড়া কিছু-কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে পিথাগোরাসের ও তাঁর অনুসারীদের রচনাবলীতে উপনিষদসমূহের ভাব-ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাঁরা এমন কথাও বলেন যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নব-প্লেটোবাদীদের রচনাতেও।

তবে এ-প্রসঙ্গে ব্যাপারটির অপর এক দিকের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। তা হল, প্রাচীন সভ্যতার উপরোক্ত ওই উভয় কেন্দ্রেই দার্শনিক চিন্তার সমান্তরাল বা অনুরূপ বিকাশের ব্যাপারটি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মানুষ ও প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বহু মূল প্রশ্নই ভারতীয় ও ধ্রুপদী ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা একই ধরনে উত্থাপন ও সে-সবের সমাধান করেছেন। এই ব্যাপারটি আসলে প্রাচীন যুগে উভয় অঞ্চলে ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় রূপ পরিগ্রহ করছিল যে-সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাগুলি তাদের অন্তর্নিহিত একই ধরনের ছকের ইঙ্গিত দিচ্ছে মাত্র। যাই হোক, মোটকথা হল এই যে বহু শতাব্দী ধরে বহুবিচিত্র নানা দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করা ও তাকে দৃঢ়তর করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ভারত তার নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিপ্রথা, ইত্যাদিকেও চোখের মণির মতো রক্ষা করে এসেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য, ইত্যাদি প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে ভারতীয় সমাজ ও সমগ্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির পরবর্তী বিকাশের স্তরগুলিকে। বিশ্ব-সভ্যতার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান সত্যিই অপরিমেয়।

মধ্যযুগীয় ভারত

কোকা আন্তোনভা

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র

অধিকাংশ সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসকে সামন্ততন্ত্র-প্রভাবিত যুগ বলে গণ্য করে থাকেন। তবে অপর কিছু ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত এই ধারণাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন এই কারণে যে মধ্যযুগীয় ইউরোপের যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এককালে অভিহিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্র নামে তার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল অনেক। ভারতে শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের কাঠামো ছিল দুর্বল, এমন কি কোনো-কোনো পর্যায়ে তা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। ভূস্বামীরা কখনোই তাদের জমিদারির শাসক ছিলেন না। বিনা পারিশ্রমিকের জবরদস্তি শ্রম (বা 'বেগার') অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাটানো হোত কেবলমাত্র দুর্গ, সেচ-ব্যবস্থা, ইত্যাদি নির্মাণের কাজে। এবং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা সাধারণত আদায় করা হোত সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর হিসেবে।

দেশের শাসকরা তাঁদের প্রজাদের জমিতে মালিকানা-স্বত্ব দিতেন শর্তসাপেক্ষভাবে, অর্থাৎ শেষোক্তদের মালিকানা থাকত জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে, খোদ জমির ওপরে নয়। এর বিনিময়ে শাসকরা আশা করতেন রাষ্ট্রীয় করের সুনির্দিষ্ট একটা অংশ পাবার। এইরকম শর্তাধীন মালিকানার ভিত্তিতে যাঁরা জমি পেতেন তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে রাজকরের সঙ্গে খাজনাও আদায় করতেন, তবে সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের একটা দলও পোষণ করতে বাধ্য হতেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের এইসব সৈন্যদলই একত্রে রাজার সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হোত। সাধারণত এইসব প্রদত্ত জমি কিংবা খেতাব কিছুই উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হোত না। এছাড়া ভারতে ভূমিদাস-প্রথাও চালু ছিল না, অর্থাৎ কৃষকেরা আইন-সংক্রান্ত বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে নির্ভরশীল ছিলেন না সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের ওপর। ভূস্বামীদের আইনগত বিচার ও শাস্তিদানের অধিকার ছিল কেবলমাত্র রাজকর আদায়ের ব্যাপারে। সামাজিক পদমর্যাদাগত বৈষম্যের বদলে ছিল জাতিগত বৈষম্য। ভারতের ইতিহাসের কিছু-কিছু পর্যায়ে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া জমিদারি, খেতাব ও দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক পদমর্যাদার অনুপস্থিতির ফলে দরিদ্র অবস্থার যোগ্য

লোকের পক্ষে ফৌজের সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নিজের পদমর্যাদার উন্নতি ঘটানো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ইউরোপীয় ধাঁচের সামন্ততন্ত্রের প্রভেদের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ ছিল এই যে ভারতে ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমির আধিক্য।

তবু ওই একইসঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আবার গুরুত্বপূর্ণ কিছু-কিছু সাদৃশ্যও ছিল। উভয় মহাদেশেরই অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল ছোট কৃষক ও কারুশিল্পীদের কায়িক শ্রমের ওপর ভিত্তি করে। এইসব কৃষক ও কারুশিল্পী ছিলেন তাঁদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতির মালিক এবং কোনোক্রমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মতো উৎপাদন করে এঁরা জীবিকানির্বাহ করতেন। সমাজের ভিত্তি ছিল খাজনা (কিংবা রাজকর সমেত খাজনা) আদায়ের মাধ্যমে, এবং তা-ও আবার অর্থনৈতিক বিচারে যথেষ্ট বিচক্ষণ নয় এমন জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে খাজনা আদায় করে, উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলিকে শোষণের ওপর। এই কারণেই 'সামন্ততন্ত্র' এই পরিভাষাটি ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে সেইসঙ্গে একথাও জোর দিয়ে বলা দরকার যে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় ধাঁচের সামন্ততন্ত্রের থেকে রীতিমতো পৃথক।

সোভিয়েত ইতিহাসবেত্তারা ভারত-ইতিহাসের যে-প্রশ্নগুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে একটি হল জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যাপার। জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার এই ব্যাপারটিকে আইন-সংক্রান্ত ভারতীয় কোনো আকর গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয় নি, কেবল এটুকু জানা গেছে যে জমিবাবদ আদায়ীকৃত খাজনাকে বলা হোত রাষ্ট্রীয় কর বা রাজস্ব। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগীয় ভারতে জমি বা 'ভূমি' শব্দটিতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস বোঝাত। কৃষকের কাছে এই শব্দটির অর্থ ছিল যেখানে তিনি কাজ করতেন সেই নির্দিষ্ট একখানি খেত। এই জমি তিনি এমন কি দীর্ঘকাল কাজে না-লাগালেও এর ওপর তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকত। যতক্ষণ কৃষক গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যসিদ্ধ কিছু-কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতেন ততক্ষণ এই জমি বংশধরদের দিয়ে যেতে কিংবা দান-হস্তান্তর করতে পারতেন। জমির জন্যে তিনি বাধ্য থাকতেন রাষ্ট্রকে কিংবা রাজা রাজস্ব আদায়ের অধিকার যে-ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করতেন তাঁকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজকর সমেত খাজনা দিতে।

অপরপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী কিংবা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে 'ভূমি' বলতে বোঝাত সেই ভূখন্ড যার অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হোত প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট বেঁধে-দেয়া রাজস্ব। রাজা স্বয়ং রাজ্যের কিছু-কিছু ভূখণ্ডমাত্র শর্তাধীনে দান করতেন, যেগুলি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব রাজাকে আদায় করে দিতে হোত। পরবর্তী কালে রাজার কর্মচারিরাই স্থির করতেন রাজ্যের

কোন অঞ্চল বা কোন-কোন অঞ্চল এই ভূমিদানের প্রক্রিয়ারভুক্ত হবে। পরবর্তী বিকশিত সামন্ততন্ত্রের যুগে এই সমস্ত তালুকের বিপুল অংশই ছিল শর্তাধীন: অপেক্ষাকৃত কম ধনী ভূস্বামীদের কাছে এই তালুকগুলি দান, হস্তান্তর কিংবা ভাড়া দেয়া চলত না। কৃষকরা কীভাবে তাঁদের জমিগুলি চাষ-আবাদ করবেন সে-ব্যাপারে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা হস্তক্ষেপ করতেন না। তবে যেহেতু কেবলমাত্র আবাদী জমির ওপরই রাজস্ব ধার্য করা হোত তাই এই ভূস্বামীরা আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তাঁরা নিয়ম করে দিতেন যে কৃষকেরা বেশ কয়েক বছর ধরে রাজস্বগত নানা সুখসুবিধা ভোগ করবেন যদি তাঁরা পতিত বা অকর্ষিত জমি চাষের অধীনে আনেন। আবার যে-সমস্ত কৃষক নিবিড় ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের চাষ করতেন তাঁদের পুরস্কৃতও করতেন ভূস্বামীরা।

জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অর্থ ছিল এই যে সেই সমস্ত জমিতে রাষ্ট্রের তরফ থেকে রাজস্বের পরিমাণ ও তা আদায়ের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হোত। জমির ওপর এই রাজস্বের পরিমাণ ও প্রকৃতি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের নির্দিষ্ট খাজনার মতোই হোত। এই রাজস্ব আদায় করতেন হয় ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মচারিরা আর নয়তো এই অধিকার দেয়া হোত সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদেরই। এর ফলে মধ্যযুগীয় ভারতে নানা সামাজিক স্তরের মধ্যে জমি সম্পর্কে ও ভূ-সম্পত্তিগত অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন-ভিন্ন ও বিশিষ্ট নানা ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছিল। এ-প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে তৎকালীন ভারতে জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ধরনটি প্রধান হলেও দেশের ভূসম্পত্তির অপর একটি ক্ষুদ্রতর অংশ ছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বাধীন অথবা সামন্ত-ভূস্বামীদের অধীন (মোগল-সম্রাটদের আমলে এই ধরনের ভূস্বামীরাই 'জমিদার' নামে পরিচিত হন)। এই ধরনের ভূস্বামীরা নিজেরাই নির্দিষ্ট করে দিতেন কী পরিমাণ খাজনা তাঁরা কৃষকদের কাছে দাবি করবেন এবং সময়ে-সময়ে তাঁরা নিজেদের খামারের তত্ত্বাবধান করতেন তাঁদের অধীন অন্যান্য কৃষক কিংবা খামারের ভৃত্যদের সাহায্যে।

কৃষিক্ষেত্রে শ্রম-বাহিনীর মূল ইউনিট ছিল পরিবার। গ্রামীণ সমাজ ও সেই সমাজের সবচেয়ে বিশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে গঠিত গ্রাম-পরিষদের অস্তিত্বের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায় বিভিন্ন আকর সূত্রে। মনে হয়, উত্তর ভারতে একটি কিংবা কয়েকটি গ্রাম এইসব গ্রামীণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকত, এবং ওই গ্রামগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকত আলোচ্য বসতির প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে অথবা আলোচ্য এলাকায় বসতি-স্থাপনকারী বিজেতা উপজাতিটির সঙ্গে কিছু-না-কিছু পরিমাণে যৌথ আত্মীয়তা-সূত্রে। দক্ষিণ ভারতে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রামীণ সমাজগুলির আকার ছিল বিরাট, এগুলি গঠিত হোত কয়েক কুড়ি, কয়েক শো, এমন কি কয়েক হাজার পর্যন্ত গ্রাম নিয়ে। এবং যদিও সেই সুদূর নবম কিংবা দশম

শতাব্দী থেকেই এই ধরনের প্রকাণ্ড গ্রামীণ সমাজগুলির সংহত অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে আর অস্তিত্ব ছিল না, তবু এগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হিসেবে থেকে গিয়েছিল। এরকম কিছু-কিছু সমাজে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জমি পুনর্বণ্টন করে দেয়া হোত, আবার অন্য কোথাও-কোথাও চাষের অধীন জমি চিরস্থায়ী ভিত্তিতে পরিবারগুলির মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোত। মনে হয়, এই সমস্ত গ্রামীণ সমাজ সমষ্টিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করত অধীনস্থ সমস্ত পতিত জমি, ব্যক্তিগত সদস্যদের জমির রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিত এবং সম্ভবত পোষণ করত কিছু-সংখ্যক ভৃত্য ও কারুশিল্পীকে। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের এই গ্রামীণ সমাজগুলি দেশের উত্তরাঞ্চলের সমাজগুলির চেয়ে বেশি অর্থবান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। অন্ততপক্ষে এটা ঠিক যে প্রথমোক্ত সমাজগুলির নানা সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অপেক্ষাকৃত ঘনঘন পাথরের গায়ে খোদাই করা হোত কিংবা অন্যান্য টেকসই উপাদানে খোদাই করে কিংবা লিখে রাখা হয়েছিল। সমস্ত ভারতীয় গ্রামীণ সমাজেই অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা (সাধারণত সমাজের মোড়ল ও লিপিকার) অধিকার করে থাকতেন বিশেষ সুবিধাভোগী নানা পদ। মনে হয়, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রাম-পরিষদের অধিবেশন থেকে নেয়া হোত, তবে ক্রমশ বেশি-বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠতে থাকে সমাজের অধীনস্থ গ্রামের মোড়ল ও লিপিকারদের হাতে। গ্রামীণ সমাজের উচ্চ স্তরগুলির মানুষেরা প্রায়শই কার্যত খুদে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুতে পরিণত হয়ে যেতেন এবং তাঁদের জমি তাঁদের ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা চাষ-আবাদ করতেন।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের সূচনাকাল

ভারতের প্রাচীন কালেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের কিছু-কিছু ধরন ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে বেশির ভাগ জমিই যেমন চাষ করতেন মুচলেকাবদ্ধ মজুররা, ক্রীতদাসেরা নন, তেমনই অপরদিকে 'রাষ্ট্রের সেবা'র বিনিময়ে ভূমিদানও করা হোত অন্যদের। ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে এই ধরনের ভূমিদানের পাট্টা হিসেবে ব্যবহৃত ছোট-ছোট তাম্রফলকের সংখ্যা লক্ষণীয় রকমে বৃদ্ধি পায়। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশের ধারা অনুধাবনে এই ফলকগুলি ইতিহাসবেত্তার কাজে লাগে। এগুলিতে জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়-করা বিভিন্ন রাজকরের ক্রমবর্ধমান রকমফেরের সংখ্যা ও তালিকা পাওয়া যায়: এই তাম্রফলকগুলির প্রাপকরা হয় এইসব রাজকর দেয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন, আর নয়তো অনুমতি পেতেন করগুলি আদায় করে নিজেদের কাজে লাগানোর। ক্রমশ বেশি-বেশি আর ঘনঘন নিরাপত্তাদানের ছকবাঁধা আশ্বাসও দেখা যায় এই তাম্রফলকগুলিতে — যেখানে 'চট' ও 'ভট'কে (স্পষ্টতই মনে হয়, রাজকর্মচারি ও সেনাবাহিনীকে) এই সমস্ত প্রদত্ত

জমিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা ক্রমে প্রজাদের ন্যায়-অন্যায় বিচার করার অধিকার পেলেন, এবং কৃষকরা ক্রমশ বেশি করে হয়ে পড়তে লাগলেন তাঁদের প্রভুদের ওপর নির্ভরশীল। প্রায়শই বড়-বড় সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী (যাঁদের খেতাব দেখে মনে হয় যে তাঁরা রাজার স্থানীয় প্রতিনিধি ও শাসক হিসেবে কাজ করতেন) তাঁদের তালুকের একেকটা অংশ রাজার অনুমতির অপেক্ষা না-রেখেই 'রাজসেবার পুরস্কার' হিসেবে অন্যদের দান করে দিতেন। কখনও-কখনও অবশ্য ভূমিদান করা হোত রাজার নামেই, তবে তা করা হোত অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাশালী সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীর 'অনুরোধ'এ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করলে বলতে হয়, রোম-সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে যেমন বড়রকমের সব ওলটপালট কান্ড ঘটেছিল ভারতে মধ্যযুগের সূচনায় তেমন কিছু ব্যাপার ঘটে নি। ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলীয় দেশগুলির সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ অবশ্য হ্রাস পেয়েছিল ক্রমশ, তবে তখনও মিশর থেকে চীন পর্যন্ত প্রাচ্য দেশগুলিতে বিপুল হারে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি হয়ে চলেছিল। ভারত থেকে তখন প্রধানত রপ্তানি হোত সুতী কাপড় ও ভারতীয় কারুশিল্পীদের তৈরি নানারকম হাতের কাজ এবং সেইসঙ্গে মশলা, হাতির দাঁত, দামি জহরত ও কিছু-কিছু ধরনের দামি কাঠ। ভারতে আমদানি-করা পণ্যাদির মধ্যে থাকত রেশম, সোনা, বিলাস-দ্রব্য, ভারতীয় কাপড়ের থেকে রঙ্ ও নকশার বিচারে আলাদা কিছু-কিছু ধরনের কাপড় এবং প্রচুর সংখ্যায় ঘোড়া। ভারতীয় জলবায়ু এবং দানা-ফসল ঘোড়া প্রজননের পক্ষে উপযোগী ছিল না বলে ঘোড়া আমদানি করা হোত।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে দক্ষিণ প্রাচ্যের বহু দেশেই, বিশেষ করে এখন যে-দেশগুলিকে মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন বলা হয় সেখানে, ভারতীয় বণিকদের বসতি গড়ে উঠতে থাকে। ভারতের গোটা সমুদ্রতীর জুড়েই ছিল সে-সময়ে বহুতর বন্দর-নগরী: যেমন, ভারুকচ্ছ (আধুনিক ব্রোচ), সুরথ (আধুনিক সুরাট), শূর্পরক (আধুনিক সোপর), উরায়ুর, মাদুরাই, কাঞ্চিপুরম, ইত্যাদি। এছাড়া ছিল প্রধান-প্রধান সার্থবাহ-পথের ওপর বেশকিছু বড় শহর: যেমন, পঞ্জাবে — তক্ষশিলা, শাকাল (শিয়ালকোট) ও পুরুষপুর (পেশওয়ার); উত্তর ভারতে — কান্যকুব্জ (কনৌজ) ও স্থানেশ্বর (থানেশ্বর); মধ্য-ভারতে — উজ্জয়িনী (উজ্জয়িন) এবং দক্ষিণ ভারতে এরকম বহু শহরের মধ্যে তিনটি — বাতাপি, তাগারা ও পৈথান। এই সমস্ত শহর ছিল বড়-বড় বাণিজ্য ও উৎপাদন-কেন্দ্র, যদিও শহরগুলির বহু অধিবাসীই কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকতেন; শহরের সীমানার মধ্যেই তাঁরা গৃহপালিত পশুপাল রাখতেন এবং খেতে কাজ করতেন, ইত্যাদি। বণিকরা সংগঠিত করতেন প্রভাবশালী নানা সমবায়-সঙ্ঘ, এই সঙ্ঘগুলি দেশের অর্থনৈতিক জীবনে,

এবং অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় রাজনৈতিক জীবনেও, বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করত। যে-সমস্ত আকর উপাদান এখনও পাওয়া যায় তা থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে বণিকরা কারুশিল্পীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধনবান ও প্রভাবশালী ছিলেন. প্রায়ই জমি-জায়গা কিনতেন তাঁরা এবং মন্দিরগুলিতে মোটা-মোটা অর্থ দান করতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মধ্যযুগের সূত্রপাতে নাগরিক জীবনে অবক্ষয় শুরু হয় নি তখনও।

ওই যুগে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও ভাঁটা পড়ে নি। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক বাণিজ্য-পথ ছিল গঙ্গা নদী ও তার শাখা-প্রশাখাগুলি। বঙ্গদেশ থেকে দক্ষিণ ভারতে পণ্যসম্ভার নিয়ে যাওয়া হোত সমুদ্রোপকূল ধরে চলাচলকারী বাণিজ্য-জাহাজগুলিতে ও সার্থবাহ-পথে।

দক্ষিণাপথের অভ্যন্তরেও নানা বাণিজ্য-পথ ছিল এবং এগুলির প্রায় সবক'টিই ছিল বড়-বড় নদী-বরাবর। এর ফলে বড়-বড় বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসম্ভার বহন করে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে হোত। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ এই বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের মতো অত উন্নত ছিল না।

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস

অবিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং বন্দরগুলি বিকশিত হয়ে ওঠার কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল মধ্যযুগের সূচনায় ইউরোপে যেমনটি ছিল তেমন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। ওই যুগে ভারতে ইউরোপের মতো অতখানি সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ও ঘটে নি। তবে ভারতেও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের দৃঢ়ীকরণের ফলে বড়-বড় রাষ্ট্রজোটের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এর পরিবর্তে ছোট-ছোট সামন্ততান্ত্রিক রাজার মধ্যে রেষারেষি ও প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তার পরিণতিতে রাজনৈতিক ভাঙচুরই হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেশের চলতি দৃশ্যপট। এই পরিস্থিতির কারণেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য পরে 'ভারতের স্বর্ণযুগ' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে এবং হূন-উপজাতিদের বারংবার আক্রমণে শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, তবে খোদ মগধে গুপ্ত-রাজবংশ ক্ষমতায় আসীন থাকে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। এমন কি ৫১০ খ্রীস্টাব্দে হূনরাজ তোরমান পরাজিত হন রাজা ভানুগুপ্তের কাছে; ভানুগুপ্ত হলেন সেই শেষ গুপ্ত-রাজা যাঁর সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়। তবে এ-ও জানা যায় যে ৫৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রাজা মিহিরকুলের অধীনস্থ হূনরা কেবল-যে উত্তর-পশ্চিম ভারতেই রাজত্ব করছিলেন

তা নয়, মালব দেশে এবং গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় আজকের দিনের গোয়ালিয়র পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন তাঁরা। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয় রাজা মিহিরকুল অত্যন্ত নৃশংস আগ্রাসক ছিলেন। উত্তর ভারতের রাজন্যকুল তাঁর বিরুদ্ধে পরস্পর মিলিত হতে ও শক্তি সংহত করতে সমর্থ হন এবং ৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে বিপুলভাবে পরাস্ত করেন।

হূন-আগ্রাসনের সময় যে-সমস্ত উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে ইতস্তত বসতি স্থাপন করে ভারতের ইতিহাসে তারা গভীর ছাপ রেখে যায়। এই সমস্ত উপজাতিরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মিশে যায়। এই উপজাতিদের সঙ্গে আসেন গুর্জররা, এঁরা বসতি গড়ে তোলেন পঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে ও রাজপুতানায়। পরবর্তী কালে এঁদের একটা অংশ মালবে এবং দেশের যে-অঞ্চল পরে এঁদেরই নামে পরিচিত হয় সেই গুজরাটে অনুপ্রবেশ করে। হূন ও গুর্জরদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও বিবাহ-সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে যে-জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তাঁরাই পরে পরিচিত হন রাজপুত নামে ('রাজপুত' শব্দটির একাধিক অর্থ আছে; এ দিয়ে একাধারে একটি জাতিগোষ্ঠী, বেশ কয়েকটি উপজাতি এবং একটি বংশানুক্রমিক জাতকেও বোঝানো হয়)।

সেই সুদূর সপ্তম শতাব্দীতেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে দেশের এই অঞ্চলে। অষ্টম শতাব্দীতে রাজপুতরা গঙ্গা-উপত্যকার সমৃদ্ধ এলাকায় ও মধ্য-ভারতে অনুপ্রবেশ করেন। ভারত-ইতিহাসের বহু শতাব্দী ধরেই রাজপুতরা টিকে থাকেন দৃঢ়বদ্ধ একটি নৃকুল-গোষ্ঠী হিসেবে। রাজপুত-অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলিতে দানা বেঁধে ওঠে যে-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্ক তার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সমাজ-সম্পর্কের প্রভেদ দেখা যায় কিছু-কিছু দিক থেকে। রাজপুত-সমাজে সামন্ততান্ত্রিক স্তরগুলির ক্রমবিন্যাস যেমন জটিলতর তেমনই সেখানকার সামন্ত ভূস্বামী-সংক্রান্ত ঐতিহ্য ইত্যাদিও অপেক্ষাকৃত বেশি গভীরমূল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে উত্তর ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্র বলতে ছিল গৌড় (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা), রাজধানী কনৌজ সহ মৌখরি-রাজ্য (দোয়াব বা গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ ভূভাগ এবং গঙ্গা-নদীতীরবর্তী মধ্য এলাকা) এবং রাজধানী স্থানেশ্বর সহ পুষ্যভূতি-রাজ্য (উত্তর দোয়াব, বর্তমান দিল্লীর চারপাশের অঞ্চল এবং সিরহিন্দ)। এই তিনটি রাজ্য অনবরত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। গৌড়ের রাজা প্রথম শশাঙ্ক (ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন) মগধ এবং প্রয়াগ পর্যন্ত পশ্চিমের সমগ্র ভূভাগ জয় করে নেন, পূর্বদিকে তিনি অধিকার করেন মহেন্দ্রগিরি নামের পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত

অঞ্চলগুলি (এগুলিই এখন আধুনিক ওড়িষ্যা রাজ্য বলে পরিচিত)। মৌখরিদের বিরুদ্ধে শশাঙ্ক মালবের রাজার সঙ্গেও মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। অপরদিকে মৌখরিরা পুষ্যভূতিদের রাজার সমর্থন লাভ করেন, কিন্তু যুদ্ধে বিজিত হন তাঁরা। পরে পুষ্যভূতিরাজের ছোটভাই হর্ষবর্ধন বা হর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

লোকশ্রুতি অনুসারে হর্ষবর্ধন বিশ হাজার অশ্বারোহী, পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার হাতির এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। অতঃপর ছয় বছরের মধ্যে — যখন জীবনীকার বাণের মতে 'হস্তিপৃষ্ঠের হাওদা ও সৈন্যদের শিরোস্ত্রাণ একবারের জন্যেও খোলা হয় নি' — হর্ষ কার্যত জয় করে নিতে সমর্থ হন সমগ্র উত্তর ভারত। তবে যতদূর মনে হয় তাঁর দাক্ষিণাত্য-অভিযানের পরিণতি ঘটে নর্মদা-তীরে পশ্চিম চালুক্য-রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। অতঃপর পুলকেশী কিন্তু আর উত্তরদিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন নি। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধ ও বঙ্গদেশও জয় করে নেন। জীবনের পরবর্তী বছরগুলি তিনি ব্যয় করেন অধিকৃত ভূখন্ডগুলির শাসন-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উন্নতিসাধনে।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনার আগে হর্ষবর্ধনের রাজ্যই ছিল সেই শেষ সাম্রাজ্য ভারত উপমহাদেশের এক প্রধান অংশ ছিল যার অন্তর্ভুক্ত। তবে এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আমলের চেয়ে দুর্বলতর ছিল। সাম্রাজ্যের অল্প একটু অংশই ছিল মাত্র কেন্দ্রের সরাসরি শাসনাধীন, আর বাদবাকি অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করতেন সামন্ত-রাজপুরুষেরা। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিচালনার ব্যাপারে এই সামন্ত-রাজাদের ক্ষমতা ছিল প্রভূত। তদুপরি, হর্ষের সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তর-ভারত ছাড়িয়ে আর বিস্তৃত হয় নি এবং মালব ও রাজপুতানার অংশবিশেষ স্বাধীন রয়ে গিয়েছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয় ও শাসন-পরিচালনার কীর্তিকাহিনী ভবিষ্যৎ পুরুষদের জন্যে সংরক্ষিত হয়ে আছে বাণ-লিখিত প্রশস্তিমূলক ইতিকথা 'হর্ষচরিত' ও চীনদেশের বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন চাঙের বিবরণীর দৌলতে। হর্ষের রাজত্বকালেই হিউয়েন চাঙ ভারত পরিভ্রমণ করেন। বাণের বিবরণ অনুযায়ী, হর্ষের সাম্রাজ্যে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ। এছাড়া অপর কয়েক ধরনের অভ্যন্তরীণ শুল্ক ও বাজার থেকে আদায়ী খাজনা দিয়ে রাজকোষ ভরে তোলা হোত।

হর্ষের পূর্বপুরুষেরা শৈব-ধর্মাবলম্বী হলেও হর্ষ নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বহুতর বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণে প্রচুর সময়, সামর্থ্য ও অর্থসম্পদ ব্যয় করেন তিনি। তাঁর রাজত্বকালে নালন্দার (আধুনিক পাটনা শহরের কাছে) প্রকান্ড বৌদ্ধ-বিহার

ও বিশ্ববিদ্যালয়টির খ্যাতি-প্রতিপত্তি ভারতের সীমানার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। হাজার-হাজার ভিক্ষু ছাত্র তখন বাস করতেন ও শিক্ষা নিতেন সেখানে। নালন্দার বৌদ্ধ-বিদ্যালয়ের দালানগুলি ছিল বহুতল বিশিষ্ট। এই বিদ্যালয় আর বাসগৃহগুলি এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ছিল। তবে তখনই কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্পষ্টত ক্ষয় পেতে শুরু করেছিল এবং বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন শিব, বিষ্ণু ও সূর্য-দেবতার মতো ব্রহ্মাণ্যধর্মের দেবতারা।

হর্ষের সাম্রাজ্য টিকে ছিল প্রায় তিরিশ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় এবং অতঃপর কয়েক শতাব্দী ধরে ভারত জুড়ে টিকে থাকে বহুসংখ্যক ছোট-ছোট রাষ্ট্র মাত্র। এইসব রাষ্ট্রের মধ্যে কয়েকটি মোটামুটি বড়ই ছিল বটে, তবে কোনোটিই মৌর্য ও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের মতো ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়ে ছিল না। এইসব রাষ্ট্র সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত, আবার কখনও-কখনও নতুন করে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগে সাময়িক ও স্বল্পকালীন সন্ধিচুক্তিও করত। এই যুগের বিচিত্র ঘটনাবলী ও বিচিত্রদৃক, নিয়ত-পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের বর্ণনা দেয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই আমরা সবচেয়ে পরিচিত নানা নাম ও ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকব।

দক্ষিণ ভারতে এ-সময়ে যে-প্রধান রাষ্ট্রগুলি সর্বদা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত তারা হল চালুক্য-রাজ্য (এ-রাজ্যের রাজধানী ছিল বাতাপি; রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত করার পর এই চালুক্যরা পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন), পল্লব-রাজ্য ও পাণ্ড্য-রাজ্য। পুলকেশী স্বয়ং সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন এবং গুজরাট ও পূর্ব-দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের অধিপতি তাঁর দুই ভাই পুলকেশীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পল্লব (রাজধানী — কাঞ্চিপুরম) ও পাণ্ড্য-রাজ্য (রাজধানী — মাদুরা) চালুক্য-রাজ্য আক্রমণ করে। পাণ্ড্যরা ক্রমশ এক প্রকাণ্ড রণপোত-বাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং এর ফলে কখনও-কখনও তাঁরা সমর্থ হন গোটা সিংহল দ্বীপের ওপর পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়। ৬৪০ খ্রীস্টাব্দে পল্লবরা চালুক্যদের যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত করেন এবং রাজধানী অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী নিহত হন। তবে পুলকেশীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরা তাঁর রাজ্যের বৃহত্তর একটি অংশের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন এবং বারকয়েক দক্ষিণ দিকে সৈন্য-পরিচালনা করে নতুন-নতুন ভূখণ্ড পর্যন্ত অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিকে রীতিমতো প্রভাবিত করেছেন পল্লবরা। সমুদ্র-তীরবর্তী মহাবলীপুরমে পাহাড় কেটে বেশ কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা।

সেখানকার মন্দির-সমাহারের প্রায় সমগ্র ভিত্তি জুড়ে পুঞ্জ-পুঞ্জ ভাস্কর্য-মূর্তি ও ব্যাস-রিলিফের খোদাই সহ যে-স্থাপত্যশৈলী প্রয়োগ করা হয়েছে তার প্রভাব পরে সারা দাক্ষিণাত্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পল্লবদের রাষ্ট্র ব্যাপক হারে সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকায় এই স্থাপত্যশৈলী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের শিল্পশৈলীর ওপরও ছাপ রেখে যায়। এখন যে-দেশগুলিকে ইন্দোনেশিয়া ও কাম্পুচিয়া বলা হয় সেইসব দেশে ওই সময়ে দক্ষিণ-ভারতীয় বণিকদের বড়-বড় বসতি গড়ে ওঠে। পশ্চিম চালুক্য-রাজ্য অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখে; ওই সময়ে চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ পরাজিত হন মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূটদের হাতে। অতঃপর প্রায় দুই শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রকূট-বংশ দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বজায় রাখে। এই বংশের শাসনকালের স্থায়ী এক কীর্তিস্তম্ভ থেকে গেছে ইলোরায় (আধুনিক আওরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী) পাহাড়-কেটে-তৈরি কৈলাস মন্দিরটির নির্মাণে।

রাজ্যের পূর্ণ সমৃদ্ধির সময়ে রাষ্ট্রকূটরা উত্তর ভারতেও বারকয়েক অভিযান পরিচালনা করেন। এই সমস্ত অভিযানে তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দেন বিহার ও বঙ্গদেশের পাল-বংশ এবং যাঁদের রাজধানী ছিল কনৌজে সেই গুর্জর-প্রতিহাররা। এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রধান উপলক্ষ ছিল গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর দোয়াব উপত্যকার ওপর অধিকার বিস্তার। ওই সময়ে ভারতের উত্তর-অঞ্চলে কয়েকটি ছোট সামন্ত-রাজ্য ছিল — যেমন, বিশ্বখ্যাত খাজুরাহোর মন্দির-সমাহারের প্রতিষ্ঠাতা চান্দেল্লা-রাজবংশ এবং ধিল্লীকায় (আধুনিক দিল্লীতে) রাজধানী স্থাপন করেন যাঁরা সেই তোমর-রাজবংশের শাসিত রাজ্য দুটি, ইত্যাদি।

খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের তিনটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি — রাষ্ট্রকূট, পাল ও গুর্জর-প্রতীহারদের রাজ্যই — অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এদের অধীনস্থ অপেক্ষাকৃত ছোট সামন্ত-রাজ্যগুলির শক্তি-সামর্থ্য বেড়ে চলেছিল তখন, তারা তখন রাজ্যবিস্তার করে ভূতপূর্ব শাসক-রাজ্যগুলিকে ক্রমশ হীনবল ও উচ্ছেদ করে চলেছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, গুর্জর-প্রতীহারদের অধিকৃত ভূখণ্ডে তখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল পারমার, চান্দেল্লা, গুহিল, চৌহান (চাহামন) এবং চালুক্য (সোলাঙ্কি)-রাজবংশশাসিত রাজ্যগুলি। তেমনই পালবংশ-শাসিত ভূখণ্ডও কয়েকটি ছোট-ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে সামন্ত সেন-রাজবংশ। চৌহান-রাজবংশ (বা চাহামনরা) রাজত্ব করতেন পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলীয় রাজস্থানে এবং গুজরাটের অংশবিশেষে। পারমার-রাজবংশ রাজস্থান, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে বারকয়েক অভিযান চালালেও তাঁদের মূল ভিত্তি ছিল মালবদেশে। তবে একাদশ শতকের মাঝামাঝি পারমার-রাজ্য দুর্বল

হয়ে পড়ে। চান্দেল্লা-রাজ্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় তখন বুন্দেলখণ্ড, তবে চান্দেল্লাদের অধিকারভুক্ত ছিল তখনও দোয়াবের একটি অংশ, বারাণসী এবং বিহারের অল্প-একটু অংশও। মধ্য-ভারতে সামন্ত কালচুরি (হৈহয়)-রাজ্য আগে ছিল রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের অধীন সামন্তশাসিত প্রদেশমাত্র, সে-রাজ্যও আলোচ্য সময়ে স্বাধীন হয়ে ওঠে এবং ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। অপরদিকে চালুক্য (সোলাঙ্কি)-রাজবংশ দৃঢ়ভাবে উত্তর গুজরাটে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে।

পল্লব এবং পান্ড্য-রাজ্য দুটির মধ্যে অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ উভয় রাজ্যেরই ক্ষমতা-হ্রাস ঘটায়। ফলে উরায়ুরের আশপাশের ছোট একটি অঞ্চলের শাসক চোলদের তামিল-রাজবংশ ক্রমে প্রধান হয়ে ওঠে। ৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধে চোলরা পল্লবদের চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করেন; অতঃপর ৯১৫ খ্রীস্টাব্দে পান্ড্য-রাজবংশকেও বিধ্বস্ত করে দেয়ার পর বর্তমানে তামিলনাড়ু নামে পরিচিত অঞ্চলটি প্রায় পুরোপুরিই নিজেদের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। একদিকে চোলদের বিরুদ্ধে বারেবারে যুদ্ধ করতে হওয়ায় এবং অপরদিকে উত্তর-ভারতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার নিয়ত চেষ্টায় রাষ্ট্রকূট-রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদের রাজ্যচ্যুত করে রাজা দ্বিতীয় তৈল স্থাপন করেন পরবর্তী চালুক্য-রাজ্য। প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের পতন ঘটায় চোলরা পরবর্তী দু'শো বছর গোটা দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হন। একাদশ শতকেও দেখা যায় যে চোল-রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৫ খ্রীস্টাব্দ) এবং প্রথম রাজেন্দ্রের (১০১৫-১০৪৪ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্বকালে চোলরা ভেঙ্গি-নিবাসী পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য-রাজাদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং পরিশেষে চালুক্যদের সামন্ত-রাজশক্তিতে পরিণতও করেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুতেই তাঁদের পুরোপুরি পদানত করতে পারেন না। তবে অন্যদিকে চোলরা সিংহল দ্বীপ দখল করেন এবং সেখানে তাঁরা সমর্থ হন দৃঢ়ভাবে ও দীর্ঘকালের জন্যে শাসক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে। বস্তুত এরই ফলে শ্রীলঙ্কার বর্তমান জনসংখ্যার একটি অংশ তামিল রয়ে গেছে। চোলরা এমন কি শ্রীবিজয়-রাজাদের রাজ্যের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই শেষোক্ত রাজাদের প্রধান রাজ্যপাট ছিল সুমাত্রা দ্বীপে, তবে আংশিকভাবে জাভা দ্বীপ ও মলাক্কা উপদ্বীপও তাঁদের অধীন ছিল। ১০২৫ খ্রীস্টাব্দে চোলরা শ্রীবিজয়দের রাজ্যের একাংশও দখল করেন, তবে পরে সেখান থেকে বিতাড়িত হন। ভারতেও তখন চোলদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমানের মহীশূর (কর্ণাটক) ও কেরল রাজ্য দুটি। কল্যাণী-স্থিত চালুক্যদের কয়েকবার যুদ্ধে পরাজিত করেন চোলরা এবং ওড়িষ্যা ও বঙ্গদেশেও দীর্ঘকাল ধরে অভিযান চালান। লোকশ্রুতি অনুযায়ী,

এই অভিযান পরিচালনার সময় তাঁরা নাকি সুদূর গঙ্গাতীর পর্যন্ত অনুপ্রবেশে সমর্থ হয়েছিলেন।

চোল-রাজাদের অধীনে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও সুসজ্জিত রণতরী-বাহিনী থাকায় এবং শ্রীবিজয়-রাজ্য ও আরব সাগরের তীরবর্তী দেশসমূহের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্য-সম্পর্কের দৌলতে চোলদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটে ও তাঁরা অসম্ভব ধনী হয়ে ওঠেন। তাঁরা অপূর্ব চমৎকার সব মন্দির নির্মাণ করান (যেমন, চিদম্বরমের মন্দির), খোদাই করান দেবদেবীদের বহুসংখ্যক ব্রোঞ্জমূর্তি। ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে চোল-রাজবংশ ও ভেঙ্গির পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য-রাজবংশ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী দুটির দক্ষিণস্থ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত চোল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পূর্বদিকে এই রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয় সুদূর গোদাবরী নদী পর্যন্ত। তবে সামন্ততন্ত্রের অগ্রগতির প্রক্রিয়া অবশেষে চোল-সাম্রাজ্যের ভাঙন ডেকে আনে। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় ক্রমে মাথা তোলে স্বাধীন যতসব সামন্ত-রাজ্য। সরকারিভাবে তখনও চোল-রাজ্যের অধীন হলেও কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই পরস্পরের মধ্যে ইচ্ছামতো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধিস্থাপন ইত্যাদির কাজ চালিয়ে যেতে থাকে তারা। ক্রমে-ক্রমে দক্ষিণ-ভারতে স্বাধীন-প্রধান হয়ে ওঠে দ্বারসমুদ্রের হোয়সল, দেবগিরির যাদব ও ওয়ারঙ্গলের কাকতীয়-রাজবংশ এবং বর্তমান তামিলনাড়ুর দক্ষিণ অংশে ক্ষমতা-দখলকারী পাণ্ড্য-রাজবংশও। এইভাবে দ্বাদশ শতকের শেষদিকে চোলরা শেষপর্যন্ত তাঞ্জোর-এলাকায় নগণ্য একটি সামন্ত-রাজ্যের মাত্র অধিপতি হয়ে দাঁড়ান।

যাদব-রাজবংশ তাঁদের ক্ষমতা-গৌরবের তুঙ্গ স্পর্শ করেন রাজা সিংহনের রাজত্বকালে (১২০০-১২৪৭ খ্রীস্টাব্দে)। তাঁদের রাজ্য তখন প্রসারিত হয় কৃষ্ণা ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র দাক্ষিণাত্য জুড়ে।

উত্তর-ভারতে এই সময়ে রাজ্য-ভাঙাভাঙির পালা আরও তীব্রবেগে চলে। সেখানে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে চৌহান (যাঁদের রাজ্যের রাজধানী ছিল আজমীরে ও সময়ে-সময়ে দিল্লীতে) ও গহদাবাহন-রাজবংশের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও বিহার যাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) রাজ্য দুটির মধ্যে। অবশ্য পরবর্তী কালে এই রাজ্য দুটি খোরাসানের বিদেশী আগ্রাসক বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতে কেবল একটিমাত্রই মোটামুটি বড় আকারের রাজ্য থেকে যায়, তা হল বঙ্গদেশের সেন-বংশের রাজ্য।

একাদশ শতক থেকেই ভারতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মুসলিম আগ্রাসন শুরু হয়ে যায়। দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষ থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের বড়-বড় অংশ মুসলমানরা দখল করে নিতে শুরু করেন। এর ফলে ভারতে সম্পূর্ণ এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্কের বিকাশ

একদিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বহুবিচিত্র নানা রাজ্য ও রাজার আবির্ভাব ঘটছিল এবং যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে চলেছিল পুরোদমে, তেমনই অপরদিকে ভারতীয় সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে সামন্ততন্ত্রীভবনের একটি দীর্ঘ ও ক্রমিক প্রক্রিয়া চলেছিল কাজ করে। এই প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছিল সমাজের দুটি স্তরে। একদিকে যত বেশি পরিমাণে জমি ক্রমশ খাজনার অধীন করা হতে লাগল তত সেগুলি বিলি করা হতে লাগল ভূমিদান হিসেবে। আর এইসব দান-করা জমির গ্রহীতারা কেন্দ্রীয় সরকার ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল কৃষক-প্রজাবৃন্দ উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি-বেশি অধিকার ভোগের সুযোগ-সুবিধা পেতে লাগলেন। অপরদিকে গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই গ্রাম-সংগঠনের কর্মচারিরা, বিশেষ করে মোড়লরা, প্রায়ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীদের ওপর অধিকতর ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকারী হয়ে উঠলেন। নিজ-নিজ গ্রামের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের বাঁটোয়ারার ব্যাপারে তাঁদের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল ক্রমশ। এর অর্থ, ইতিপূর্বে এইসব গ্রামকর্তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল সমগ্রভাবে গ্রামীণ সমাজের স্বার্থ রক্ষা করে চলা, কিন্তু অতঃপর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্বাধীন গ্রামীণ শাসন-ব্যবস্থার পরিচালক হিসেবে তাঁদের ভূমিকাই। গ্রামীণ সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ও গ্রামের অধীন অনাবাদী জমি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এই গ্রামকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এবং নিজেদের প্রয়োজনে জমি দখল ও অন্যান্য গ্রামবাসীর বেগার খাটুনিকে ইচ্ছেমতো কাজে লাগানোর মধ্যে দিয়ে এইরকম কিছু-কিছু গ্রাম্য মোড়লও কার্যত ছোটখাট সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী হয়ে দাঁড়ালেন। আর কার্যত তাঁরা এই-যে পদমর্যাদার অধিকারী হলেন তা পরে রাজকীয় সনদবলে আইনসঙ্গত হয়ে দাঁড়াল। তবে ঐতিহাসিক দলিলগুলিতে অবশ্য কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে এইভাবে নতুন সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের উদ্ভবের ইঙ্গিত আছে খুবই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায়।

আলোচ্য এই যুগের (অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে) অধিকাংশ খোদাই-করা লিপিতে রাজার ধর্মপ্রবণতা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের বর্ণনাই পাওয়া যায়। এই সমস্ত ভূমিদানের উল্লেখ করা হয়েছে 'চিরস্থায়ী' আখ্যা দিয়ে এবং এগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে টেকসই উপাদানের ওপর, সাধারণত তাম্রফলকের গায়ে। অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষভাবে অপর কিছু-কিছু মানুষকেও ভূমিদান করা হোত তখন আর তা লিপিবদ্ধ করা হোত সহজে নষ্ট হয় এমন তালপাতায় নয় (দক্ষিণ ভারতে এই তালপাতাই ছিল এ-ধরনের লিপি-রচনার পক্ষে

প্রচলিত উপাদান), ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত তাম্রফলকের মতো তামার পাতেই। তবে এটাও সম্ভব যে রাজকার্য নির্বাহ করার সময়কালের জন্যেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যদের এ-ধরনের কিছু-কিছু ভূমিদান করা হোত।

বিনা ব্যতিক্রমে এবং বিশেষ করে বঙ্গদেশে এই ধরনের ভূমিদানের অধিকারী ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক রাজারা। তবে উত্তর ভারতে, গুর্জর-প্রতিহারদের সাম্রাজ্যে, এ-ধরনের ভূমিদান প্রায়ই করতে দেখা যেত সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমানায় যাঁদের শাসনাধীন ভূখণ্ডের অবস্থান ছিল এমন সব সামন্ত-ভূস্বামীকে। এঁরা কখনও-কখনও কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুযায়ী আবার কখনও-বা তাঁদের অজ্ঞাতসারে পর্যন্ত এই সমস্ত ভূমি দান করতেন। খ্রীস্টীয় দশম শতকে বড়-বড় রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্তির দিনে এই ধরনের ভূমিদানের রেওয়াজ বিশেষভাবে চালু হয়।

খোদাই-করা লিপিগুলিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যক্তির — যেমন, সার্বভৌম রাজা, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জেলা-শাসক, ইত্যাদির — খেতাব, পদমর্যাদা, ইত্যাদির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, এক বিকশিত সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। উত্তর ভারতে অবশ্য এই ধরনের শাসন-পরিচালকের পদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। মনে হয় সামন্ত-ভূস্বামীরা সেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করতেন।

ওই সময়ে ভারতে যাঁরা জমি-জায়গা দান হিসেবে বা অন্যভাবে পেতেন তাঁরা ক্রমশ শাসনতান্ত্রিক ও বিধানতান্ত্রিক দায়দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবার অধিকারী হয়ে উঠলেন। ওই সময়কার বিচারালয়সমূহের স্বীকৃত 'দশটি অপরাধ'-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের তালুকে বসতকারী ব্যক্তিদের বিচার করবার অধিকার পর্যন্ত পেলেন। প্রায়শ রাজকর্মচারিদের পর্যন্ত এই সমস্ত তালুকের ভূখণ্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এর অর্থ, কৃষকরা ক্রমশ এই সমস্ত ভূমিদানের ফলে জমির স্বত্বভোগীদের ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। রাষ্ট্রের সাধারণত অধিকার রইল একমাত্র গুরুতর অপরাধের বিচার করবার এবং প্রাণদণ্ড দেবার। কখনও-কখনও, এবং বিশেষ করে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী আমলে, সামন্ততান্ত্রিক তালুকের মালিকরা নিজেরাই হয়ে দাঁড়ালেন গ্রামীণ সমাজের অধীনস্থ খাজনাবিলি জমির বাঁটোয়ারার কর্তা।

আলোচ্য সময়ের উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে এমন সমস্ত রাজস্বেরও উল্লেখ আছে ভূমিদানের ফলে জমির স্বত্বভোগীরা যা থেকে রেহাই পেতেন। ক্রমে-ক্রমে নানা ধরনের রাজস্বের তালিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে, বিশেষ করে এটা ঘটে খ্রীস্টীয় দশম শতকে। এই সমস্ত রাজস্বের মধ্যে ছিল বিবাহ, নিঃসন্তান অবস্থা, উৎসব-উদ্‌যাপন কিংবা ভূস্বামীর গৃহে পারিবারিক উৎসব-উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেয় রাজকর। এছাড়া উল্লিখিত আছে রাজকীয় সনদ প্রদান উপলক্ষে দেয় অর্থের কিংবা গ্রামে

পরিদর্শনকারী রাজকর্মচারিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার, বিচারালয়ের নির্ধারিত জরিমানা দেয়ার, বাণিজ্যশুল্ক দেয়ার, ইত্যাদি। বহুবার অবশ্য চেষ্টা হয়েছে এই জটিল বিধি-ব্যবস্থাকে 'নিয়মবদ্ধ' করার, অর্থাৎ এই বহুবিধ আদায়-উশুলকে একটি মূল রাজস্বে একত্রিত করার। কিন্তু তারপরই দেখতে-দেখতে আরও নতুন-নতুন রাজকরের প্রবর্তন ঘটায় অবস্থা শেষপর্যন্ত যথাপূর্ব রয়ে গেছে। এই গোটা ব্যাপারটাই হল গিয়ে জনসাধারণের ওপর আর্থিক উৎপীড়নবৃদ্ধির এবং গ্রামবাসীদের ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরশীলতার প্রতিফলন। ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত দাবিদাওয়ার পরিমাণ ক্রমশ গুরুভার হয়ে ওঠায় দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ সমাজের সদস্যরা কার্যত তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাতে লাগলেন।

একদিকে রাজকরের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে বৃদ্ধি পেতে লাগল বাধ্যতামূলক শ্রমের নানা ধরন। এই বাধ্যতামূলক শ্রম বা বেগার খাটা ছিল ইউরোপীয় 'ক্যরভে'রই একটা রকমফের। এ-সময়ে কৃষকদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল রাস্তাঘাট ও সেতুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি-কাজের, গ্রামে পরিদর্শনরত রাজকর্মচারিদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর এবং নানা ধরনের নির্মাণকর্মে যোগ দেয়ার। তবে তাঁদের দানস্বত্বের জমিতে মালিকের হয়ে চাষবাসের কাজ করতে হোত কিনা তা জানা যায় না। সমকালীন উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে কেবলমাত্র উল্লেখ আছে যে এ-ধরনের জমির দানস্বত্বভোগীর অধিকার আছে এই 'জমি চাষ করার কিংবা চাষ করিয়ে নেয়ার'। তবে এ দিয়ে বাধ্যতামূলক বেগার খাটানো বোঝানো হচ্ছে, না ভাগচাষের কথা বলা হচ্ছে তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গ্রামবাসীদের বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটানোর রেওয়াজ তখন বহুল-প্রচলিত ছিল।

তখন সবচেয়ে ধনী সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী (অবশ্য আসল রাজাদের বাদ দিয়েই) ছিল অবশ্যই 'যৌথ ভূস্বামীরা', অর্থাৎ হিন্দু মন্দির ও মঠগুলি। ওই যুগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভূমিদান এবং পুরোহিত ও সাধু-সন্ন্যাসীদের ভূমিদানের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। তখন জমি, গ্রাম কিংবা গ্রামসমূহের অংশবিশেষ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা গোষ্ঠীগতভাবে ব্রাহ্মণদের দান করা যেত। ওই ব্রাহ্মণরা তখন জমির খাজনার ভাগ নির্দিষ্ট করে নিতেন নিজেদের মধ্যে। ব্রাহ্মণদের দেয়া এই ধরনের গ্রামগুলির প্রশাসন-সম্পর্কিত সকল সমস্যারই সমাধান করতেন ব্রাহ্মণদের পরিষদ বা 'সভা'। এই 'সভা'ই খাজনার হার (এবং তা সাধারণত একবারের মতোই) নির্দিষ্ট করা-সম্পর্কিত সমস্যাদিরও সমাধান করতেন।

ব্রাহ্মণ-'সভা'র সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের পার্থক্য ছিল এইখানে যে 'সভা' ছিল কেবলমাত্র ভূস্বামী নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ, যদিও মাঝে-মাঝে এমনও দেখা যেত যে ব্রাহ্মণদের দান-করা জমি তাঁদের বংশধরদের মধ্যে টুকরো-টুকরো হয়ে এমনভাবে

ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যেত যে একেক টুকরো এমন জমির সঙ্গে অন্যান্য গ্রামবাসীর জমির আয়তনের প্রভেদ করা যেত না। মন্দিরগুলির ভূসম্পত্তি অবশ্য ভাগ হোত না, বরং ভক্ত রাজরাজড়া, সামন্ত-ভূস্বামী ও গ্রামীণ সমাজের কাছ থেকে নানা ধরনের ভূমিদান ইত্যাদি উপহার হিসেবে লাভ করে এবং জমি কেনা ও বন্ধক দেয়া ইত্যাদির মারফত জমির পরিমাণ বৃদ্ধিই পেত তাদের। মন্দিরগুলিকে দান-করা জমি সচরাচর নিষ্কর হোত এবং তা নানারকমের দায়মুক্তির সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করত।

এখনও পর্যন্ত টিকে-যাওয়া উৎকীর্ণ লিপিগুলির বিচারে বলতে হয় যে গোড়ার দিকে কেবলমাত্র অনাবাদী জমিই দান করা হোত। কোনো মন্দিরকে ভূমিদান করতে হলে রাজা অথবা সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী বাধ্য হতেন প্রথমে সেই জমি কিনতে, কেননা মন্দিরের অধীনস্থ জমি ভূমি-রাজস্বের সকল দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে এটাই ছিল রীতি। মধ্যযুগীয় ভারতে জমি, বিশেষ করে যা তখনও পর্যন্ত অনাবাদী রয়ে গেছে তা, প্রায়ই কেনাবেচা চলত, তবে এমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হোত জমি যার মালিকানাধীন সেই গ্রামীণ সমাজ অথবা অন্য কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর পূর্ব-অনুমোদন নেয়ার। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর পরে জমির বেচাকেনা-সম্পর্কিত বিধিনিষেধের কড়াকড়ি আরও বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত, দান হিসেবে পাওয়া পতিত জমিতে মন্দিরগুলির তরফ থেকে তখন নিজস্ব আবাদ গড়ে তোলা হোত. চাষের কাজে নিয়োগ করা হোত মঠবাসী সাধু-সন্ন্যাসীদের এবং তাছাড়া ক্রীতদাস, ভাগচাষী ও ঠিকা শ্রমিকদেরও। ষষ্ঠ-অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে মন্দিরগুলির তরফ থেকে একটা সাধারণ প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একেকটি গোটা গ্রামের শ্রমদান ভক্তের উপচার হিসেবে গ্রহণ করা, এই সমস্ত গ্রামের অধিবাসীরা তখন পুরোহিত বা সাধুদের হয়ে জমিতে চাষ-আবাদ করতেন। ঘটনা হিসেবে এ-ও জানা যায় যে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মন্দিরগুলির তরফ থেকে টাকার বদলে জিনিসপত্রে খাজনা নেয়া হোত। জমিতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের অংশ ছাড়াও কৃষকরা তখন বাধ্য হতেন মন্দিরগুলিকে পূজা ও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের উপযোগী অপরিহার্য সকল উপচার যোগাতে, যেমন তাঁরা যোগান দিতেন তেল, ধূপধুনা, ফুলের মালা, উৎসব উপলক্ষে পরিধানযোগ্য পোশাকের কাপড়, ইত্যাদির।

মন্দিরের অধীনস্থ তালুকের দেখাশোনা করতেন সাধারণত ব্রাহ্মণদের ও অন্যান্য কৃষক বা বণিকদের ও কারুশিল্পীদের জাতি বা সম্প্রদায়ের মোড়ল নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ। মন্দির-পরিচালনার কর্মীদের সংখ্যা হোত বিপুল, তাঁদের মধ্যে থাকতেন পুঁথি-লেখক, কারুশিল্পী, গায়ক-গায়িকা, বাদক, নর্তক-নর্তকী, ইত্যাদি। দক্ষিণ-ভারতের এই ধরনের মন্দির-কর্মীদের সংখ্যা ও তাঁদের কাজের ধরন ছিল বিশেষরকম ব্যাপক এবং সমগ্র ব্যবস্থাটি ছিল সু-সংগঠিত।

যদিও মন্দিরগুলিকে তখন ভূমিদান করা হোত 'যতদিন চন্দ্রসূর্যের অস্তিত্ব আছে ততদিন'-এর জন্যে এবং উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে মন্দিরের জমিতে সম্ভাব্য হস্তক্ষেপকারীর বিরুদ্ধে অভিশাপ-বাণী লিপিবদ্ধ থাকত, তবু ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদি থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে প্রায়শই, বিশেষ করে রাষ্ট্রিক উপপ্লবের সময়ে, যখন এক রাজ্যের পতন ও অপর এক রাজ্যের উত্থান ঘটত কিংবা যখন বিদেশী আগ্রাসকের অভিযানের ফলে স্থানীয় জনসাধারণ পরাধীন হয়ে পড়ত তখন কেবলমাত্র সামন্ত-ভূস্বামীদের তালুকই নয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের ও মন্দিরের অধীন জমিজমাও রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নিত। এ-থেকেই বোঝা যায় কীভাবে ওই যুগে রাষ্ট্রের অধীনস্থ জমি ও সামন্ত-ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির আপেক্ষিক পরিমাণের মধ্যে অনবরত রদবদল ঘটত।

তবে এই সবকিছু সত্ত্বেও ভারতে গ্রামীণ সমাজের সদস্যরা তাঁদের বহুবিধ অধিকার রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং তা কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতারক্ষার ব্যাপারেই নয়, অন্য কিছু-কিছু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার ব্যাপারেও। সে-যুগে ভূমিদান (এবং এটা বিশেষ করে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল) করা হোত সমগ্রভাবে স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে, এমন কি সমাজের সবচেয়ে নিচু সম্প্রদায়গুলির সমক্ষেই। ভূমিদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে অবশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হোত 'মহত্তর', অর্থাৎ সমাজের 'সম্মানীয় সদস্য'দের কথা। মনে হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান বা মোড়ল এবং পুথি-লেখকরা ছিলেন এই 'মহত্তর'দের অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষিণ মহারাষ্ট্র থেকে পাওয়া ভূমিদানের এইরকম একটি পাট্টায় উল্লেখ আছে যে নিষ্কর একটুকরো জমির মালিক ছিলেন কোনো এক গ্রামের মোড়ল। মধ্যযুগে লেখা সাহিত্যের পুথিগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে গ্রামের এইসব মোড়ল উৎকোচ আদায়ের জন্যে প্রায়শই নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, অন্যান্য গ্রামবাসীর কাছ থেকে মান-মর্যাদা ও উপহার-সামগ্রী দাবি করতেন তাঁরা। গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য সদস্যের চেয়ে তাঁরা ছিলেন বহুগুণে ধনী এবং তাঁদের প্রভাব প্রায়শই গ্রাম্য পরিবেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ত। নাম দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, রাষ্ট্রকূট নামে রাজবংশটির উদ্ভব ঘটেছিল গ্রামবাসীদের ঠিক এই স্তরটি থেকেই। ক্ষমতায় আসীন হবার পর রাষ্ট্রকূট-বংশ গ্রামীণ সমাজে তাঁদের সম্প্রদায়ের অবস্থানের ভিত্তিতে তাঁদের উপাধিটিকে ('গ্রামশ্রেষ্ঠ') পুরোদস্তুর রাজবংশের নামে পরিণত করেন এবং নিজেদের গ্রামীণ উৎপত্তির কারণে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না।

মধ্যযুগে ভারতে গ্রামীণ সমাজ ছিল এক শক্তিশালী সমাজ-সংগঠন এবং তা যে শুধু উল্লেখ্য সামাজিক-অর্থনৈতিক ভূমিকাই পালন করত তা-ই নয়, বিশেষ এক রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল তার। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এটি ছিল লক্ষণীয়।

উত্তর ভারতে গ্রামীণ সমাজগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম প্রভাবশালী ছিল বলে মনে হয়, তবু সেখানেও প্রায়ই বেশ কয়েকটি 'গ্রাম' কিংবা অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিট (যেমন, 'কোণ', 'পট্টক', প্রভৃতি) এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হোত। প্রতিটি গ্রামীণ সমাজে 'বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ'কে নিয়ে একটি করে পরিষদ গঠিত হোত। এই পরিষদ সমাজের অধীনস্থ সমস্ত জমির ভারপ্রাপ্ত থাকত এবং সমস্ত স্থানীয় বিবাদ-বিসংবাদ ও মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ঘটাত। দক্ষিণ ভারতে গ্রামীণ সমাজের এক্তিয়ার গোটা একটা জেলা (বা 'নাড়ু')-র ভূখণ্ড জুড়ে পর্যন্ত বিস্তৃত হোত। কর্ণাটকে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের পেছনে একটি করে সংখ্যা যুক্ত হোত এবং তা দিয়ে বড়-বড় গ্রামীণ সমাজকে বোঝানো হোত — যেমন, বেল্‌ভোলা ৩০০ কিংবা চিরাপি ১২। এই সমস্ত সংখ্যা দিয়ে সঠিক কী-যে বোঝানো হোত সে-ব্যাপারে পণ্ডিতেরা এখনও অবশ্য একমত নন, তবে খুব সম্ভব এই সংখ্যাগুলি দিয়ে বোঝানো হোত একটি বিশেষ গ্রামীণ সমাজের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত খামারের সংখ্যা, কিংবা স্থানীয় গ্রাম-পরিষদের সংখ্যা।

এই সমস্ত গ্রামীণ সমাজ তাদের নিজস্ব প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠিত করত, কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করত, জমিতে সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তুলত এবং স্থানীয় সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে তাতে যোগ দিত। সমাজের ঘোষণাপত্রগুলি উৎকীর্ণ করা হোত পাথরের ফলকে এবং প্রায়ই সেগুলিকে প্রোথিত করে রাখা হোত মন্দিরাদির ভিত্তিগাত্রে। এইসব কাজের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা হোত সমাজের প্রাপ্য চাঁদার আকারে, কখনও-কখনও এই চাঁদা বা দেয় অর্থের পরিমাণ ভূমি-রাজস্বের চেয়ে কম হোত না। ক্রমশ, সামন্ততন্ত্রীকরণ-প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ঘটতে লাগল যত, ততই এইসব বড়-বড় গ্রামীণ সমাজ তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হারাতে এবং সাধারণ প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত হতে লাগল, আর এগুলি ক্রমশ আসতে লাগল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কর্মচারিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে। মনে হয়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ এইসব বড়-বড় গ্রামীণ সমাজে চরম ভাঙন সংঘটিত হল এবং এগুলি পরিণত হল বড়জোর একটি কি দুটি গ্রামের ভিত্তিতে গঠিত ছোট-ছোট নানা সংগঠনে।

মধ্যযুগের ভারতে এই সমস্ত গ্রামীণ সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন আবাদী জমি কৃষকদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেয়া হোত। দক্ষিণ ভারত সম্পর্কিত আকর উপাদানগুলিতে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ও তার পরবর্তী সময়ে কৃষকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ন্যায্যভাবে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উর্বর জমি ও অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ভূ-পরিবেশে অবস্থিত জমি, বণ্টনের জন্যে মোট জমির পুনর্বিভাগের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য জমির এই পুনর্বিভাগ কোনোক্রমেই তখন সাধারণ নিয়মের অঙ্গীভূত ছিল না এবং এর ফলে গ্রামীণ সমাজের জমিতে কৃষকের ন্যায্য অংশে

(যা তিনি দান-হস্তান্তর ইত্যাদি করতে পারতেন) তাঁর মালিকানার অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয় নি। গ্রামীণ সমাজের প্রতিটি সদস্যই ছিলেন জমির মালিক এবং ইচ্ছে করলে জমি দান-হস্তান্তর করতে পারতেন তিনি। তিনি যেমন জমি দান কিংবা হস্তান্তর করতে পারতেন, তেমনই জমি বিক্রি করতে বা কিনতেও পারতেন। তবে জমি একেবারে গ্রামীণ সমাজের বাইরে হস্তান্তর করতে গেলে একমাত্র সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীনেই তা করা সম্ভব ছিল। পতিত জমি সমগ্রভাবে তখন সমাজের অধীনে থাকত এবং সে-ধরনের জমির জন্যে ভূমি-রাজস্ব দিতে হোত না। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে গ্রাম্য কারুশিল্পীদের গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে পৃথক বলে গণ্য করা হোত এবং গ্রামীণ সমাজ তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিত। ওই সময়ের আগে পর্যন্ত আকর দলিলপত্রে গ্রামীণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়গুলির কোনো উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না। যেহেতু গ্রামীণ সমাজগুলির কোনোরকম অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে ভূমি-রাজস্বদাতা ভূখণ্ড হিসেবে তাদের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, তাই সামন্ত-ভূস্বামীরা গ্রামীণ জীবন ও তার ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করতেন না।

মধ্যযুগীয় ভারতে ছিল, বলতে গেলে, তিনটি বিভিন্ন জগৎ ও তার তিন ধরনের বিচিত্র জীবনযাত্রা-প্রণালীর অস্তিত্ব: প্রথম, সামন্ত-প্রভু বা মন্দির ও তার অনুগামী ও সংশ্লিষ্ট জগৎ; দ্বিতীয়, গ্রামীণ সমাজ, এবং তৃতীয় — শহর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যন্ত, এমন কি চতুর্দশ শতাব্দীতেও, শহরগুলি, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র-বন্দরবর্তী শহরগুলি, ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। এই সমস্ত শহরের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত নগর-পরিষদগুলি এবং এগুলির সদস্যদের মধ্যে থাকতেন অপেক্ষাকৃত ধনী ও অধিক প্রভাবশালী জাতি বা সম্প্রদায়গুলির প্রধানরা। সাধারণত বণিকদের প্রতিনিধিরা এগুলির মধ্যে থাকতেন এবং কখনও-কখনও থাকতেন কারুশিল্পীরাও (যেমন, তামা-কারিগর ও তৈলকার বা কলু)। নগর-পরিষদ কেবল-যে শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে মাথা ঘামাত ও মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করত তা-ই নয়, কারুশিল্পীদের কাছ থেকে তা বাণিজ্য-সংক্রান্ত শুল্ক ও অন্যান্য করও আদায় করত নিজ উপভোগার্থে এবং স্বাধীনভাবেই নির্দিষ্ট করে দিত এইসব শুল্ক ও করের পরিমাণও। নগর-প্রশাসন নিজেদেরই উদ্যোগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে মন্দিরগুলিকে অর্থদান করত, সাধারণভাবে পরোপকারের উদ্দেশ্যেও অর্থদান করত তা। তাছাড়া বাণিজ্য-সংক্রান্ত শুল্ক কিংবা কারুশিল্পীদের বাসস্থান বাবদ কর আদায়ের দৌলতে ওই প্রতিষ্ঠানের যে-আয় হোত তা থেকে কেবল অর্থই দান করত না তা, শহরের এক্তিয়ারভুক্ত সেই

সমস্ত জমিও দান করত যে-সব জমি — তৎকালীন উৎকীর্ণ লিপিগুলির ভাষায় — 'গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত' হোত না। এই নগর-পরিষদগুলি ছিল বহু সম্প্রদায়ের মিলিত সংগঠন। বহু পরিমাণেই এগুলি ছিল স্ব-শাসিত।

ওই একইসঙ্গে একেকটি গোটা বাণিজ্য-এলাকা জুড়ে কর্তৃত্ব করত একেকটি বণিক-সঙ্ঘ। এইরকম একটি সঙ্ঘের উদাহরণ হল আইহোলের বণিক-সঙ্ঘ, যার প্রভাব একদা ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ ভারতের বহু এলাকায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের বিভিন্ন বাণিজ্য-কেন্দ্রে। তবে এই সঙ্ঘটির হৃৎকেন্দ্র— পাঁচ শো 'স্বামী' নিয়ে গঠিত এর পরিষদটি — অবস্থিত ছিল দক্ষিণ ভারতের আইহোল শহরে। এইরকম আরও একটি সংগঠন ছিল 'মণিগ্রামম', এর কেন্দ্র ছিল বর্তমান দিনের কেরলে। 'মণিগ্রামম'-এর প্রভাব কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বিস্তৃত ছিল মিশর, আরব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। পেনুকোণ্ডাকে কেন্দ্র করে 'কোমতি' নামে যে বণিক-সঙ্ঘটি গড়ে উঠেছিল তার সদস্যরা আঠারোটি বিভিন্ন নগর-পরিষদের অধিকাংশ সদস্য-পদ দখল করে ছিলেন। এইরকম আরও বেশকিছু বণিক-সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল সে-সময়ে।

তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে ওই যুগের ভারতীয় শহরগুলি নতুন পুঁজিতন্ত্রী সম্পর্কের ভ্রূণাবস্থায় ছিল। তৎকালীন শহরগুলিতে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা কেবলমাত্র এই সত্যটিরই ইঙ্গিত দেয় যে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা তখনও পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি ও সমাজ-জীবনের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন নি। এমন উল্লেখও পাওয়া অসম্ভব নয় যে কিছু-কিছু শহরে তখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও থাকতেন এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল, শহরগুলি তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হারাতে লাগল ততই। ক্রমশ রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন রাজকর্মচারিরা, রাজস্বের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দিতে লাগলেন তাঁরাই। শহরগুলির সমৃদ্ধির সময়ে তাদের ওপর ভূস্বামীদের ক্ষমতা কায়েম হল। শহরের ছোট-ছোট দোকান ও কারুশিল্পীদের মহল্লাগুলি থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব তুলে দেয়া হতে লাগল সমন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের হাতে। নগর-পরিষদগুলির অস্তিত্বের অবসান ঘটল, বণিক-সঙ্ঘগুলি রাজনৈতিক প্রভাব হারিয়ে বসল। ফলে অবশেষে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পর থেকে, রাজারা একেকবারে একটি বা কয়েকটি গোটা শহরই দান করে দিতে লাগলেন সামন্ত-ভূস্বামীদের। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে শহরগুলির স্ব-প্রশাসন ব্যবস্থার কার্যত আর অস্তিত্বই রইল না। সামন্ত-ভূস্বামীরা ঠিক যতখানি গ্রামে ততখানিই শহরে প্রবর্তন করলেন স্বৈর-শাসনের। এর পর থেকে বণিকরা ধনসম্পদ সত্ত্বেও সামন্ত-ভূস্বামীদের খেয়ালখুশির শিকার হয়ে উঠলেন: রাজা বা সামন্ত-রাজার প্রয়োজনমতো মোটা-

মোটা অর্থের যোগান না-দিলে তাঁদের উৎপীড়ন করা, এমন কি কখনও-কখনও কারারুদ্ধ করাও, হতে লাগল।

ওই সময়ে ভারতীয় সমাজের সমাজ-সংগঠনের ভিত্তি ছিল জাতিভেদ-প্রথা। চারটি 'বর্ণ'এ (বা সামাজিক সম্প্রদায়ে) গোটা সমাজের স্তরবিন্যাসের রীতি চলে আসছিল প্রাচীন কাল থেকেই। আবার প্রতিটি 'বর্ণ' বিভক্ত হয়ে ছিল বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতিতে। বণিক এবং কারুশিল্পীদের জাতিগুলির অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল শ্রমবিভাগের ফলে, এছাড়া আরও কোনো-কোনো জাতি গড়ে ওঠে — বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ নতুন-নতুন এলাকায় এসে বসতিস্থাপন করার পর রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্যের কারণে স্থানীয় জনসাধারণের অধিকাংশের থেকে তারা পৃথক হয়ে থাকার ফলে। আবার অপর কয়েকটি জাতি গড়ে উঠেছিল মূলত স্বতন্ত্র উপজাতি-গোষ্ঠীকে নিয়ে — ঐতিহ্যসিদ্ধ পেশা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে এইসব উপজাতি-গোষ্ঠী কালক্রমে জাতি-প্রথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। এইরকম প্রতিটি জাতিকেই দেখা হোত সুনির্দিষ্ট মাত্রার 'বিশুদ্ধতা' ও 'অবিশুদ্ধতা'র অধিকারী হিসেবে এবং জটিল সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে-বাঁধা এক সুনির্দিষ্ট অবস্থানে চিহ্নিত হিসেবে।

বিভিন্ন 'বর্ণের' সংজ্ঞায় অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলিও ইতিমধ্যে বদলে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা এখন আর শুধু পুরোহিতই ছিলেন না, ক্রমশ বেশি-বেশি সংখ্যায় তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন ভূস্বামী, রাজকর্মচারি ও সেনাধ্যক্ষ। উত্তর ভারতে রাজপুতেরা এখন নিজেদের 'ক্ষত্রিয়' বলে জাহির করতে লাগলেন। এই সময়ে তাঁদের ঐতিহ্যসিদ্ধ পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু যুদ্ধ করাই নয় চাষ-আবাদ করাও, তবে হাতে লাঙল ধরাকে ইতিমধ্যেই রাজপুতের অযোগ্য কাজ বলে গণ্য করা হচ্ছিল এবং বলা হচ্ছিল যে জমি চাষ-আবাদের কাজ তাঁদের ভৃত্য ও আশ্রিতদের ওপর ন্যস্ত করা উচিত। দক্ষিণ ভারতে জাতি হিসেবে 'ক্ষত্রিয়'-এর কার্যত উদ্ভবই ঘটে নি। যোদ্ধা এবং কৃষিজীবী জাতির মানুষদের সেখানে গণ্য করা হোত 'শূদ্র' হিসেবে। তবে এই বিশেষ 'বর্ণ'টির বাস্তব পদমর্যাদার সেখানে উন্নতি ঘটে: 'শূদ্র'রা হয়ে ওঠেন গ্রামীণ সমাজগুলির পুরোদস্তুর সদস্য এবং খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে কারুশিল্পীদের কিছু-কিছু অংশের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি ঘটতে দেখা যায়। তবে বণিকরা ও বিত্তবান কারুশিল্পীরা নিজেদের 'বৈশ্য' বলে দাবি করতে থাকেন।

জাতিভেদ-প্রথা সাধারণভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল সমাজের শ্রেণী-বৈষম্যের সঙ্গে এবং এই বৈষম্যকে তা ধর্মীয় আবরণ দিয়েছিল। প্রভাবশালী ও ধনী জনগোষ্ঠীগুলি জাতি-বিন্যাসের উচ্চতম স্তরগুলিতে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে জনসাধারণের নিম্নতম সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলির স্থান মিলেছিল নিচের

দিককার জাতিগুলির স্তরে। আবার ওই একইসঙ্গে যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো পরিবার উচ্চতর সামাজিক পদ অর্জন করতেন -- অর্থাৎ, যদি তাঁরা হতেন বড় ভূস্বামী, কীর্তিমান সেনাধ্যক্ষ কিংবা এমন কি রাজা বা রাজ-পরিবার — তাহলে তাঁদের ওপর, কিংবা অন্ততপক্ষে তাঁদের বংশধরদের ওপর, আরোপ করা হোত 'ক্ষত্রিয়'-এর অথবা একই রকমের উচ্চ কোনো জাতির মর্যাদা। ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত 'শূদ্র'দের গোষ্ঠীর-পর-গোষ্ঠী এইভাবে অর্জন করতেন 'বৈশ্য'-এর পদমর্যাদা। এমন কি অস্পৃশ্যরাও কখনও-কখনও নিজেদের 'শূদ্র'-এর স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হতেন, কিংবা অন্ততপক্ষে উচ্চতর জাতিস্তরে উন্নয়নের দাবি জানাতে পারতেন। আবার ওই একইসঙ্গে জাতির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামাও সম্ভব ছিল।

এর অর্থ, জাতিভেদ-প্রথা ছিল সবার ওপরে তৎকাল-প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার একটি উপায়, তবে পরিবর্তনের সময়ে নিজেকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেও সমর্থ ছিল তা। ওই সময়েও জাতিভেদের স্তরবিন্যাস পরে যেমনটি হয়েছিল তেমন জড়ীভূত অচলায়তনে পরিণত হয় নি।

ষষ্ঠ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির অবস্থা

মধ্যযুগে মানুষের বিশ্ববীক্ষার প্রকাশ ঘটত তার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে। ভারতে এই ধর্ম এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের আলোচ্য এই যুগটি চিহ্নিত ছিল বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্যের সূচনা দিয়ে। এই ব্যাপারটির মূলে যে কী-কী কারণ বর্তমান, পণ্ডিতেরা তা নিয়ে একমত হতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ মনে করেন যে ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার যুক্ত ছিল বড়-বড় সাম্রাজ্যের শীর্ষে অবস্থিত ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্যের সঙ্গে। আবার অন্যেরা বলেন যে অসংখ্য মঠ ও তীর্থযাত্রীদের ব্যাপক শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট এক ব্যবস্থা সহ বৌদ্ধধর্মের পক্ষে সম্ভব হয় নি আদি মধ্যযুগের অপেক্ষাকৃত অধিক অবরুদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া। সে যাই হোক, মহাযান-ধর্মমতের আকারে বৌদ্ধধর্মের শেষ উজ্জীবন ঘটে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে, যখন বিভিন্ন বৌদ্ধ-মতাবলম্বী দেশ থেকে হাজার-হাজার ছাত্রকে আকর্ষণ করে আনে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গদেশের পাল-রাজবংশও বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ছিলেন। এমন কি গত দ্বাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গদেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ ছিল বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য সুদূর অষ্টম শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবলম্বিত ধর্মমতের এই পরিবর্তনে জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে কিন্তু পরিবর্তন ঘটে নি। হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে বহুসংখ্যক ধর্ম-সম্প্রদায় ও ধর্মমত, এদের মধ্যে পার্থক্য শুধু ভক্তের উপাস্য হিন্দু দেবদেবীদের ব্যাপক সমাবেশের মধ্যে থেকে মনোমতো দেবতা নির্বাচনে এবং সেইসঙ্গে ধর্মীয় আচার-আচরণ ও রীতিনীতি পালনের বিভিন্নতায়। তবে কিছু-কিছু রীতিনীতি ও ধ্যানধারণা সকল হিন্দুর পক্ষেই এক। হিন্দুরা অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন কর্তব্যপালন (বা 'ধর্ম')-এর ধারণাটির ওপর, এটি হল দৃঢ়ভাবে ও অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে জাতিগত নানা দায়দায়িত্ব পালন। যেমন, উচ্চতর জাতিগুলির পক্ষে 'ধর্ম'পালনের অর্থ হল শুধুই প্রশাসন পরিচালনা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরোচিত আচরণ, এবং নিম্নতর জাতিগুলির পক্ষে তা হল তাদের ঐতিহ্যসিদ্ধ পেশাগুলিকে সবিবেক কার্যকর করে চলা এবং উচ্চতর জাতির মানুষজনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন। হিন্দুধর্ম তার অনুসারীদের মনে এই ধারণার সঞ্চার করে থাকে যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমাজের এই স্তরবিভাগ এক পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার, সকল জাতির অস্তিত্বই অপরিহার্য এবং জাতিভেদের কাঠামোয় প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থান বর্তমান জন্মের অব্যবহিত পূর্বজন্মের জীবনে তার আচরণের দ্বারা স্থিরীকৃত ও পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে। মানুষের আত্মার মৃত্যু নেই, তবে দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা সে-দেহ ত্যাগ করে অপর জীবদেহে সঞ্চারিত হয়। যদি কোনো মানুষ সুনীতিসম্পন্ন, ধর্মময় জীবন যাপন করে থাকে, তাহলে পুনর্জন্মে তার জাতি-মর্যাদার উন্নয়ন ঘটবে। আর যদি সে নষ্ট, পঙ্কিল জীবন যাপন করে থাকে, তাহলে তার অস্পৃশ্য জাতির মানুষ হিসেবে, এমন কি ঘৃণ্য কোনো জন্তুর দেহ ধরেও হয়তো বা পুনর্জন্মলাভের সম্ভাবনা। অতএব সংসারে যা-কিছু ঘটছে সবই ন্যায্য, কেননা কোনো সৎ মানুষকেও যদি জীবনে অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায় তাহলেও বুঝতে হবে অতীত জীবনে কোনো অন্যায় কর্মের ফলেই সে এমন শাস্তি পাচ্ছে।

'অহিংসা'র ধারণাটি সকল হিন্দুর পক্ষেই গ্রাহ্য। এই ধারণা অনুযায়ী, মানুষের কর্তব্য হল যে-কোনো জীবন্ত প্রাণীর সর্বপ্রকার ক্ষতিসাধন এড়িয়ে চলা এবং বেশ কয়েকটি গৃহপালিত প্রাণীর সেবা করা — বিশেষ করে গোরুর, যা নাকি সকল হিন্দুর পক্ষে পূজার্হ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সারা জীবনে বিশেষ-বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় আচার পালন করাও ছিল সে-যুগে সকল হিন্দুর মিলিত ঐতিহ্যের অঙ্গ, যদিও এই সমস্ত পূজা-অনুষ্ঠানের বিশদ পদ্ধতিতে বহু তারতম্য ছিল। সকল হিন্দুকেই পূজার উপচার দেবতাকে নিবেদন করতে হোত — কেউ-কেউ তা করতেন পশুবলির মধ্যে দিয়ে, তবে বেশির ভাগই পূজা দিতেন ফুল ও ধূপধুনার সাহায্যে। সকলেই বাধ্য ছিলেন ব্রাহ্মণদের কাছে ও মন্দিরগুলিতে নিজ-নিজ সাধ্য-অনুযায়ী পূজা দিতে এবং সকলেই নানা ধরনের

সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী-তপস্বী, ভ্রাম্যমাণ ধর্মপ্রচারক, ইত্যাদিকে পবিত্র মানুষজ্ঞানে পূজা করতেন। বিশেষ-বিশেষ জাতিগত পূজা-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন এবং জাতিগত বিধিনিষেধ মেনে চলাও সকল হিন্দু বাধ্যতামূলক বলে মনে করতেন, বস্তুত এই সমস্ত পূজা-অনুষ্ঠান ও আচার-পালনকে দেবতার আরাধনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হোত না।

সে-সময়ে হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপাস্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু ও শিব। শিবের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর পত্নীর উপাসনাও। এই শিবপত্নী দেশের সর্বত্র পরিচিত ছিলেন ভিন্ন-ভিন্ন নামে, যথা — কালী, উমা, পার্বতী, শক্তি, ইত্যাদি। কালী হলেন এক ভয়ংকরী দেবী, ভক্তের কাছে যাঁর নির্দেশ রক্তাক্ত বলিদান দেয়ার, অপরপক্ষে উমা ও পার্বতী হলেন স্নিগ্ধ মাতৃস্বরূপা। এটা স্পষ্ট যে এই দেবী-কল্পনার মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে বহু বিভিন্ন ধর্মমত ও উপাসনার ঐতিহ্য।

ওই যুগে শক্তি-উপাসনার বিকাশ ঘটে। শক্তিকেও কল্পনা করা হয়েছিল শিবের পরাক্রমের নির্গলিত সার হিসেবে এবং শক্তিপূজা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল তান্ত্রিক মতবাদের সঙ্গে। তন্ত্রবাদ হল হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত একটি ধর্মান্দোলন, যা নাকি অন্যান্য ধর্মান্দোলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই আন্দোলনের নিজস্ব পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থগুলি 'তন্ত্র' নামে পরিচিত এবং এর দেব (প্রধানত দেবী)-আরাধনার নিজস্ব কিছু পদ্ধতিও আছে। তন্ত্রবাদের প্রধান ঝোঁক হল অতীন্দ্রিয়বাদ ও ইন্দ্রজালের কোনো-কোনো দিকের চর্চার ওপর এবং হিন্দুধর্মে যা নিষিদ্ধ (যেমন, গুপ্ত ধর্মানুষ্ঠান, স্ব-জাতির মধ্যে বিবাহের রীতি ভঙ্গ করা, ইত্যাদি) তেমন সব আচার ও রীতিনীতি পালনা করা। আলোচ্য ওই যুগে তন্ত্রবাদ প্রচার করতেন প্রধানত নিচু জাতির মানুষেরা এবং অনার্য উপজাতি ও গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরা।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ ভারতে 'ভক্তি'বাদ বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই মতবাদের তাৎপর্য হল দেবতার প্রতি ভক্তের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসা নিবেদন, যার কাছে পূজা-অনুষ্ঠান, যোগ-তপস্যা, এবং ব্রহ্মণ্যধর্মের রক্ষণশীলতা নিতান্তই ম্লান ও অর্থহীন। দ্বাদশ শতাব্দীতে লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের (যাঁরা বিশেষ করে শিবের প্রতীক হিসেবে লিঙ্গমূর্তির পূজা করতেন) প্রতিষ্ঠাতা বাসব 'ভক্তি'বাদকে তন্ত্রবাদের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং জাতিভেদ-প্রথার মতো হিন্দুধর্মের একটি অপরিহার্য নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিশেষ করে জোর দেন পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের ওপর ততটা নয়, যতটা শিব-দেবতাকে ভালোবাসার প্রয়োজনের ওপর, আবার ওই একইসঙ্গে মেনে নেন কঠোর তপস্যাব্রতের শ্রেষ্ঠত্বও। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাসবের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় খোলাখুলি আনুষ্ঠানিক হিন্দু ও জৈনধর্মের বিরোধিতা করেন।

সপ্তম এবং নবম শতাব্দীর মধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও এই নতুন ধর্মতত্ত্বের প্রভাবে আসে এবং পরে এই ধর্মমত প্রচার করেন বঙ্গদেশের ভক্তকুল। ভক্তকুলের ('ভক্তি'বাদের অনুসারীদের) পক্ষ থেকে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের দিকটি এবং ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটি প্রত্যাখ্যানের ফলে 'ভক্তি'বাদের প্রচারের মধ্যে সামাজিক প্রতিবাদের একটি সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্দরগুলিতে, জৈনধর্মই ব্যাপক জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হয়। ভারতের সকল জৈন-মন্দিরের মধ্যে তখন সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত আইহোলের (বা আইভাল্লের) জৈন-মন্দিরটি। মধ্যযুগে আরও বহুসংখ্যক জৈন-মন্দির ও মূর্তি নির্মিত হয়। জৈনদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল তামিল জনসাধারণের মধ্যে। তবে ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে জৈনধর্মের বিরুদ্ধে 'ভক্তি'বাদীরা এক প্রবল মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করেন এবং জৈনধর্ম পশ্চাদপসরণ শুরু করে হিন্দুধর্মের কাছে। পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ দেখা যায় যে জৈনধর্ম গুজরাটে কিছুটা প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, যদিও তখনও ভারতের বহু শহরে বিশেষ করে বণিক ও কুসীদজীবী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ছোট-ছোট জৈন-ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী রয়ে গিয়েছিল।

ভারতে দার্শনিক চিন্তাধারা ধর্মীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে তখনও পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও, মধ্যযুগে প্রথম দার্শনিক চিন্তাধারা নিজ অধিকারেই জ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি শাখা হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠতে শুরু করে।

ইতিপূর্বে আমরা ভারতীয় দর্শনের যে-ছ'টি ধ্রুপদী ধারা নিয়ে আলোচনা করেছি, আলোচ্য এই যুগেই সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে সেই ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শনের ধারাগুলি। 'বেদ'সমূহের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ায় এই ধারাগুলিকে তখন রক্ষণশীল বলে গণ্য করা হলেও এবং এদের ধ্যানধারণাগুলিকে ধর্মের ও অতীন্দ্রিয়বাদের খোলসে মুড়ে উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও, উপরোক্ত এই প্রতিটি দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার বিধিবিধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিশিষ্ট অবদান রাখে। এই সমস্ত আনুষ্ঠানিক দার্শনিক ধারা ছাড়াও দেশে তখন প্রচলিত ছিল 'মাধ্যমিক' ও 'বিজ্ঞানবাদ' নামে দুটি বৌদ্ধ দার্শনিক ধারা। এই দুটি ধারা জগৎ-সংসারের ও জ্ঞানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করত এবং ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করত না। মাধ্যমিক ধারাটি প্রচার করত যে 'ঈশ্বরের যদি কোনো সূচনা না থেকে থাকে, তাহলে বলতে হয় তাঁর নিজেরই কোনো অস্তিত্ব নেই'। এই ধারা দুটি প্রকৃত বা বাস্তব বলে গ্রহণ করত একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যকে, যা তাদের মতে ছিল মহাজাগতিক অন্তঃসারবিশেষ। অপরপক্ষে চার্বাক-সম্প্রদায় বস্তুবাদী ধ্যানধারণার প্রচারক ছিল এবং দেহের বাইরে

আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব বলে আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করত তারা। ওই একই কারণে চার্বাক-পন্থীরা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও প্রত্যাখ্যান করতেন।

অষ্টম শতাব্দীর শেষ ও নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগে শঙ্করাচার্যের (৭৮৮ থেকে ৮২০ খ্রীস্টাব্দ) প্রবর্তিত অদ্বৈত-বেদান্ত দার্শনিক ধারাটি ক্রমশ বেশি-বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই দার্শনিক ধারাটি 'উপনিষদ'সমূহের প্রাচীন শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের সপক্ষে প্রচার চালায় এবং ঘোষণা করে যে ঈশ্বরই একমাত্র বাস্তব সত্য এবং জগৎ-সংসার মায়া বা মরীচিকা বা ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছু নয় ও একমাত্র নির্জ্ঞান মানুষই জগতের বাস্তবতায় বিশ্বাসী। অতএব 'জ্ঞানী' মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেদের এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা ও ব্রহ্মাণের (বা ঈশ্বরের) সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। শঙ্কর কেবল দার্শনিকই ছিলেন না, ছিলেন ধর্ম-সংস্কারকও; হিন্দুধর্মের আদি বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী তার পরবর্তী আমলের সংযোজনগুলি থেকে ধর্মকে মুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। তিনি দেশ জুড়ে চারটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় কিছু-কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'নির্বাচিত মুষ্টিমেয়'এর পক্ষে বোধগম্য শঙ্করাচার্যের মতবাদ তার জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। রামানুজ (একাদশ শতাব্দীতে) বেদান্ত-ধারার ধ্যানধারণাগুলিকে সরলতর করে তুলে সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য করেন ব্যাপক জনসমাজের কাছে। রামানুজের মতে, ঈশ্বর তাঁর থেকে পৃথক তিনটি বস্তু -- পদার্থ, কাল ও আত্মার সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে শাস্ত্র-বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন নেই, বরং এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, কেননা একমাত্র ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই মানুষের পক্ষে সত্যিকার ঈশ্বর-উপলব্ধি সম্ভব। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-নিবেদন ভক্তের জাতি-বিচারের ওপর নির্ভরশীল নয়। রামানুজের শিক্ষা অনুযায়ী, ঈশ্বর জগতের নির্বিকার স্রষ্টামাত্র নন; প্রতিটি জীবের ভবিতব্যের ব্যাপারে আগ্রহী স্রষ্টা তিনি; মানুষের প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন এবং মানুষের ভাগ্য-পরিবর্তনেও তিনি সমর্থ। রামানুজের এই দর্শন ছিল বহু বেদান্ত-বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মৌল মতাদর্শ।

মধ্যযুগীয় ভারতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বড়রকমের নানা অগ্রগতি ঘটে। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্র কৃষি, নির্মাণ-কর্ম ও রোগ-চিকিৎসার সঙ্গে সংযুক্ত মানুষজনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে নানাদিকে বিপুল সাফল্য অর্জন করে।

ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। এ-ব্যাপার ঘটে বহু কবি 'দেবভাষা' সংস্কৃতে তখনও পর্যন্ত সাহিত্যরচনা করা সত্ত্বেও। সংস্কৃত সাহিত্য তখন ক্রমশ হয়ে উঠছিল কষ্টকল্পিত ও আয়াসসাধ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পাঠক ছিল রাজ-দরবারগুলি। এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হল বঙ্গদেশের রাজা রামপালের (১০৭৭ থেকে ১১১৯ খ্রীস্টাব্দ) রাজসভার কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রচিত 'রামচরিত' কাব্যটি। এই কাব্যের প্রতিটি পংক্তি ছিল দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ও তা রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্র অথবা রাজা রামপাল যে-কোনো একজনের চরিতকথা বলে গ্রহণ করা যেতে পারত। এইভাবে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার কীর্তিকথাকে রামায়ণের রামচন্দ্রের কীর্তির সঙ্গে একাসনে বসিয়েছিলেন। বিশেষ করে মধ্যযুগে জনপ্রিয় হয়েছিল দ্বাদশ শতকের বাঙালি কবি জয়দেবের রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যটি। এই কাব্যে ভগবানের প্রতি ভক্তের আত্মার আকুতির প্রতীকে বর্ণিত হয়েছে রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম। বিশেষ করে সংস্কৃতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও সে-সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার অতি নিকটবর্তী হওয়ায় এই কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং কাব্যটিতে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা ও প্রাণবন্ত চিত্রকল্পের প্রাচুর্য থাকায় তা প্রায় সকল নতুন ভারতীয় ভাষায় কবিতার বিকাশকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এ-কাব্যে যৌন আকর্ষণের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যার ধরনটি পরে 'ভক্তি'বাদী কাব্যধারাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

স্থানীয় ভাষাগুলিতে সাহিত্যের বিকাশ এ-যুগে কেবলমাত্র সংস্কৃত থেকে মহাকাব্যগুলির ভাষান্তরণেই (যেমন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বুদ্ধ রেড্ডির তেলেগু ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ) সীমাবদ্ধ ছিল না, মৌল সাহিত্যরচনাও গড়ে উঠছিল সঙ্গে সঙ্গে।

যদিও মধ্যযুগে প্রধানত কাব্য-সাহিত্যেরই তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটছিল, তবু গদ্য-সাহিত্যও নিতান্ত অবহেলিত ছিল না। ওই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় একসূত্রে গ্রথিত গল্প-সমষ্টি ইত্যাদি গদ্যগ্রন্থও রচিত হচ্ছিল। এর একটি উদাহরণ হল বাণ-রচিত 'কাদম্বরী' গ্রন্থ, যাতে এক প্রেমিকযুগলের দু'বার দুই বিভিন্ন রূপে পৃথিবীতে বসবাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; আর অপরটি হল দণ্ডীর ব্যঙ্গাত্মক 'দশকুমার-কাহিনী', যাতে নির্বিচারে রাজারাজড়া, অভিজাত রাজকর্মচারি, সাধু-সন্ন্যাসী ও এমন কি দেবতাদের নিয়ে পর্যন্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এই ধরনের গদ্যরচনার অপর একটি নিদর্শন হল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে প্রাকৃত ভাষায় রচিত হরিভদ্রের ঠক-জুয়াচোরদের কাহিনী।

দক্ষিণ ভারতে তখন সবচেয়ে উন্নত সাহিত্য ছিল তামিল ভাষার রচনাবলী। এই ভাষায় প্রথম সাহিত্যরচনাদি প্রকাশিত হয় খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে, তবে প্রধান সাহিত্যকর্মগুলি — যেমন, তিরুভাল্লুভার-রচিত 'কুরাল'

(দ্বিপদীসমূহ) এবং দুটি মহাকাব্য 'শিলাপ্পাডিগারাম' (মণিখচিত কঙ্কন) ও 'মণিমেখলাই' — দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে যে-কোনো সময়ে রচিত বলে বহু পণ্ডিত মনে করেন। অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে 'ভক্তি'বাদী কবিতা প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে। এই শেষোক্ত কাব্যে জনেক তরুণ-তরুণীর প্রেমকাহিনীর রূপকে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অতীন্দ্রিয় মিলন বর্ণিত হয়েছে। আল্‌ভার ও নয়নার-সম্প্রদায় দুটির ('ভক্তি' মার্গের যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শৈব অনুসারীদের) রচিত 'ভক্তি'গীতিগুলি তাদের গভীর গীতলতার গুণে লোকগীতি হিসেবে ব্যাপক সমাদর লাভ করে।

উত্তর ভারতে স্থানীয় ভাষায় বীরগাথার একটি নতুন ধরন ওই যুগে বিকাশলাভ করতে থাকে। এই সাহিত্যরীতির একটি উদাহরণ হল চাঁদ বর্দাই (১১২৬ থেকে ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দ) রচিত হিন্দি কাব্য 'পৃথ্বিরাজরস'। স্তুতিকাব্যের ধাঁচে রচিত এই গাথাকাব্যটিতে মুসলমান আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে পৃথ্বিরাজ চৌহানের যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য এই যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পই ছিল শিল্পকলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত। ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে প্রধানত নির্মিত হয়েছিল গুহা-মন্দিরগুলি (ইলোরায়, এলিফ্যান্টায় ও তার কিছুকাল পরে অজন্তায়), কিংবা মহাবলীপুরমের মতো পাহাড়-কেটে-বানানো মন্দিরাদি, অথবা কোনারকের 'রথ'-মন্দির (বা রথের আকারে নির্মিত মন্দির)। এর জন্যে বস্তুত জটিল কারিগরি-বিদ্যা প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না, কেননা পাহাড় কুঁদে দালান-কোঠা বানানো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল পাহাড় থেকে পাথরের টুকরো কেটে বহুদূরের পথ সেগুলিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর তা দিয়ে বড়-বড় ও টেকসই অট্টালিকা নির্মাণের চেয়ে। অজন্তায় গুহা-মন্দিরগুলি বানিয়েছিলেন বৌদ্ধরা, কিন্তু ইলোরায় বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরের পাশাপাশি হিন্দু ও জৈন-মন্দিরও পাওয়া গেছে। এই সমস্ত গুহা-মন্দির অলংকৃত করা হয়েছে ব্যাস-রিলিফ, ভাস্কর্য-মূর্তি ও ফ্রেস্কো-পদ্ধতিতে ভিত্তিচিত্র দিয়ে। এইসব শিল্পকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল মহাবলীপুরমের বহুবিধ মূর্তি-সমন্বিত 'গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ' (সপ্তম শতাব্দী) ও ইলোরার পর্বত-শৃঙ্গে সমাসীন শিব-পার্বতীর মূর্তি সহ 'রাবণের কৈলাস পর্বত আন্দোলন' শীর্ষক দু'খানি প্রকাণ্ড ব্যাস-রিলিফ চিত্র।

নবম শতাব্দীতে কুঁপিয়ে-কাটা পাথর দিয়ে মন্দিরনির্মাণ শুরু হল। উত্তর ভারতে মন্দিরগুলির আকৃতি ছিল অধিবৃত্তের মতো আর মন্দিরগুলির ছাদ হোত শতদল পদ্মের আকারের, আর দক্ষিণ ভারতে মন্দিরগুলির আকার ছিল সমকোণী চতুর্ভুজ পিরামিড ধরনের। মন্দিরের ভেতরকার ঘরগুলি ছিল নিচু ছাদবিশিষ্ট ও অন্ধকার; সেগুলি ছিল পূজা-অর্চনার স্থল ও মন্দিরবাসীদের নিভৃত আবাস,

যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। ভক্তদের প্রধান অংশটি সেকালে এইসব মন্দিরের বাইরে থেকে মন্দিরটিকে প্রদক্ষিণ করতেন মাত্র। এইসব মন্দিরের প্রাঙ্গণগুলিতে ও মন্দিরগুলির ভিত্তিগাত্রে থাকত বহুতর ভাস্কর্য-চিত্র, যাতে প্রদর্শিত হোত মহাকাব্যগুলির নানা দৃশ্য কিংবা মন্দিরগুলি যে-সমস্ত দেবতার নামে উৎসর্গ করা হোত সেই সমস্ত বিশেষ-বিশেষ দেবতার পূজা-উপাসনার প্রতীকী নানা চিত্র। পরবর্তী কালে এবং বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে মন্দির-গাত্রে ভাস্কর্য-চিত্রের এই বিশদ বাহুল্য এত বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে মন্দিরগুলিই প্রায় হয়ে দাঁড়ায় ভাস্কর্য-নিদর্শনগুলির পাদপীঠবিশেষ, কেননা একেবারে মাথা পর্যন্ত মন্দিরগুলির সবক'টি দেয়াল চাপা পড়ে যায় বহুবিধ ভাস্কর্য-মূর্তি, উঁচু-রিলিফ ও ব্যাস-রিলিফ চিত্রে। এই অতি-প্রাচুর্যের কারণে মানুষের চোখে আর আলাদা করে ধরা পড়ে না পৃথক-পৃথক দৃশ্য বা ভাস্কর্য-মূর্তিগুলি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এমনই অবস্থা দাঁড়িয়েছে খাজুরাহোর মন্দিরগুলির (আনুমানিক ৯৫৪ থেকে ১০৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত)। খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে প্রধানত যৌন-সম্বন্ধীয় ব্যাস-রিলিফগুলি ভারতীয় কামশাস্ত্র বা 'কামসূত্র'-এর নানা বর্ণনার চিত্ররূপ। ওড়িষ্যার কোনারকে (বা কোণার্কে) (১২৩৪ থেকে ১২৬৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত) মন্দিরের ভিত্তিগাত্র নিচে থেকে ছাদ পর্যন্ত এমন সূক্ষ্ম ও জটিল ভাস্কর্য-শিল্পের অলংকারে মণ্ডিত যে মন্দিরগাত্রের প্রতিটি পাথর একেক টুকরো রত্নালংকারের মতো অপূর্ব কারুকার্যময়। পরবর্তী কালে অবশ্য এই ধরনের বৃহদাকার ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মানের অবনতি লক্ষ্য করা যায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে পাওয়া যায় কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন, অনড় ও অনুশাসন-মানা ভাস্কর্য-মূর্তি। পূর্ববর্তী যুগের প্রাণৈশ্বর্য ও বৈচিত্র্য তখন লোপ পেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তামিল অঞ্চলগুলিতে ব্রোঞ্জের-তৈরি ছোট-ছোট মূর্তির ঢালাই-শিল্প অত্যন্ত বিকশিত হয়ে ওঠে এবং এই মূর্তিগুলিতে জীবন্ত ভাবভঙ্গি ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকে। এই ধরনের ছোট মূর্তির চমৎকার একটি নিদর্শন হল 'শিব নটরাজ' (নৃত্যরত শিব)। পরবর্তী কালে সামান্য কিছু অদলবদল সহ এই মূর্তিটির বহুসংখ্যক প্রতিরূপ গোটা দক্ষিণ-ভারত জুড়েই নির্মিত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে।

অজন্তার গুহা-মন্দিরগুলিতে যেমন পাওয়া যায় তেমন ফ্রেস্কো-পদ্ধতির দেয়ালচিত্রের নিদর্শন অষ্টম শতাব্দীর পরে ভারতে আর পাওয়া যায় নি। বস্তুত ওই যুগের আর কোনো অঙ্কিত চিত্রই পরে টেকসই হয় নি। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে ধ্রুপদী ভারতীয় নৃত্যশিল্প সংরক্ষিত হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে সঙ্গে।

দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে ভারত
(ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল)

দিল্লীর সুলতানশাহীর রাজনৈতিক ইতিহাস

সুলতান-বংশের সূচনা

অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় উত্তর দিক থেকে যে-আরব আগ্রাসকরা ভারত আক্রমণ করেন তাঁরা সিন্ধুদেশ জয় করে সেখানে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে সিন্ধুদেশ ভারতের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বটে, তবে তাতে ভারতের ওই অংশের নানাবিধ বিকাশ ব্যাহত হয় না। তবে একাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ভারত বারেবারে তুর্কি বংশোদ্ভূত মুসলমান আগ্রাসকদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এই সমস্ত অভিযান পরিচালনা করেন তাঁরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার নামে। ভারতীয় রাজ্যগুলি তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল, তাই তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল এই সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা। ফলে কালক্রমে ভারতের উত্তরাঞ্চলে মুসলমান বিজেতাদের শাসনাধীনে বড় একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। এই রাজ্যই পরিচিত হল দিল্লীর সুলতানশাহী নামে। এই রাজ্য, যা পরে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছিল, তার উদ্ভব ভারতের সমগ্র ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। এইভাবে ভারতও একদিন এসে গেল তথাকথিত মুসলিম জগতের আধিপত্যের আওতায়।

ভারতে তুর্কি আগ্রাসকদের প্রথম আক্রমণ ঘটে ১০০১ খ্রীস্টাব্দে। পরে গজনির মাহ্‌মুদের (৯৯৮ থেকে ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ) সৈন্যদল পঞ্জাব আক্রমণ করে। মাহ্‌মুদ ছিলেন আফগানিস্তানের অন্তর্গত তৎকাল-পরিচিত খোরাসান অঞ্চলের এক রাজ্যের শাসক। তাঁর রাজধানী ছিল গজনিতে। ভারতীয় রাজা জয়পাল মাহ্‌মুদের অগ্রগতি ঠেকাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পেশওয়ারের কাছে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। এরপর মাহ্‌মুদ ১০২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রতি বছর শীতকালে ভারত আক্রমণ ও সেদেশে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন। এইসব অভিযানের সময়ে মাহ্‌মুদ নিয়মিতভাবে হিন্দু মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন করেন এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যের রাজারা বংশ-পরম্পরায় যে-সমস্ত ঐশ্বর্যে মন্দিরগুলিকে ভূষিত করেছিলেন সেই বিপুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করেন। এছাড়া স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকেও খেসারত আদায় করে ও লুণ্ঠিত সমুদয় ঐশ্বর্য উটের পিঠে বোঝাই করে উটের সারি নিয়ে ফিরে যেতেন তিনি। উত্তর-ভারতে মাহ্‌মুদের এই আগ্রাসনের এলাকা ছিল বহুবিস্তৃত — পশ্চিমে সোমনাথ (কাথিয়াওয়াড়) থেকে পূর্বে গঙ্গা-

উপত্যকার কনৌজ পর্যন্ত। তবে একমাত্র ভারতের যে-অঞ্চলটি তিনি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন ও যেখানে প্রত্যক্ষ শাসনের প্রবর্তন করেন তা হল পঞ্জাব।

মাহ্‌মুদের বংশধরদের রাজত্বকালে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলতে থাকায় এবং অনবরত মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ার সেল্‌জুক রাজাদের আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হওয়ায় গজনভী-রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পঞ্জাবের লাহোরে। দ্বাদশ শতকের সত্তরের দশকে আগ্রাসক শাসকদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ নিয়ে ঘুরের ছোট্ট সামন্ত-রাজ্যের শাসকরা ১১৭৩ খ্রীস্টাব্দে গজনি দখল করে বসেন এবং তারপর ১১৮৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁদের প্রাক্তন প্রভুদের তৎকালীন রাজধানী লাহোরও দখল করে নেন। ঘুরের তৎকালীন শাসকের ভাই মহম্মদ ঘুরী প্রথমে পঞ্জাব দখল করেন, পরে ভারতের অভ্যন্তরে আরও অগ্রসর হতে থাকেন। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের রাজপুত রাজা পৃথিবরাজের কাছে তিনি পরাস্ত হন, কিন্তু পরের বছর ওই একই যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথিবরাজের নেতৃত্বে রাজপুত সামন্ত-রাজাদের মিলিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন তিনি এবং এইভাবে গঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হবার পথ মুক্ত করে নেন। এরপর শিগ্‌গিরই তাঁর অধিকারে এসে যায় সমগ্র গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা-অঞ্চল।

মহম্মদ ঘুরী নিহত হবার পর তাঁর এক তুর্কি ক্রীতদাস এবং রক্ষী-বাহিনীর সেনানায়ক ও উত্তর-ভারতে মহম্মদের শাসক-প্রতিনিধি কুত্‌ব্‌উদ্দিন আইবক (১২০৬ থেকে ১২১০ খ্রীস্টাব্দ) নিজেকে ভারতে ঘুরী-শাসিত রাজ্যের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন ও দিল্লীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে দিল্লীতে জন্ম হয় সুলতানশাহীর। আইবকের মৃত্যুর (পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে) পর অপর একজন শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর নাম শাম্‌স্‌উদ্দিন ইল্‌তুত্‌মিশ, তিনি ছিলেন গোলাম (রাজকীয় রক্ষী-বাহিনীতে কর্মরত ক্রীতদাস) বা দাস-বংশীয়। যেহেতু তাঁর সিংহাসনের কিছু-কিছু উত্তরাধিকারীও ছিলেন রক্ষী-বাহিনীতে কর্মরত সাধারণ ক্রীতদাস, তাই ইল্‌তুত্‌মিশের রাজবংশ গোলাম বা দাস-রাজবংশ নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

গোলাম বা দাস-রাজবংশ

ইল্‌তুত্‌মিশ যখন তাঁর রাজ্যকে সংহত করে তুলছেন ও রাজ্যের সীমানা বিস্তার করে চলেছেন তখন ভারতে এসে দেখা দিল মোঙ্গল আগ্রাসকরা। তাদের হাতে পরাজিত খিবার শাহের পুত্র জালালউদ্দিনের পিছু পিছু ভারতে এল তারা। ওই সময়ে মোঙ্গলরা মাঞ্চুরিয়া থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত সমগ্র মধ্য-এশিয়া জয় করে নিয়েছিল, আর সেই বিজয়-অভিযানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল অসংখ্য মানুষকে।

চেঙ্গিজ খাঁ'র নাম শ্নলে তখন মান্ষ ভয়ে হিম হয়ে যেত। ইল্তুত্মিশ জালালউদ্দিনকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। তখন জালালউদ্দিন পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধ্দেশ ও উত্তর গ্জরাট ল্ণ্ঠন করে ও বিধ্বস্ত করে দিয়ে অবশেষে ভারত ত্যাগ করলেন। অবশ্য এর পরে আরও বহ্দিন পর্যন্ত ভারতে মোঙ্গল-আক্রমণের ভয় থেকে গিয়েছিল এবং তা সাহায্য করেছিল ম্সলমান অভিজাত-বংশীয়দের দিল্লীর সিংহাসনরক্ষায় তার চারিপাশে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হতে।

ইল্তুত্মিশের রাজত্বকালে ম্সলিম সেনানায়করা উত্তর ভারতে তাঁদের আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হন। দিল্লীতে স্উচ্চ ও স্দর্শন কুত্বমিনারটি নির্মিত হয়েছিল ইল্তুত্মিশেরই স্মৃতিরক্ষার্থে। এই মিনার নির্মাণের কাজ অবশ্য শ্রু হয় কুত্ব্উদ্দিনের রাজত্বকালেই, কিন্তু এর নির্মাণকার্য শেষ হয় ইল্তুত্মিশের আমলে। এই মিনারের কাছে ইল্তুত্মিশের কবরও আছে।

ওই সময়ে ম্সলিম যোদ্ধ্-অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত ছিল প্রধানত মধ্য-এশিয়া থেকে আগত তুর্কিদের নিয়ে। এই তুর্কি সেনানায়করা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন 'চাল্লিশ' নামে একটি শক্তিশালী সংগঠনে (কারণ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চাল্লিশ জন সেনানায়ক)। ওই সময়ে রাজকর্মচারি ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন খোরাসানী (অর্থাৎ, তাজিক কিংবা পারসিক)। রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল স্ন্নি-মতাবলম্বী ইসলামধর্ম। হিন্দ্দের স্ন্নিরা গণ্য করতেন বিধর্মী ('জিম্মিস') হিসেবে। ফার্সি ছিল তখন রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা। রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল স্বৈর-শাসন।

যদিও দিল্লীর প্রথম দ্ই স্লতান ম্সলিম সেনানায়কদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন, ইল্তুত্মিশ কিন্তু চাইলেন স্লতানশাহীকে বংশান্ক্রমিক করতে। তিনি নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করলেন মেয়ে রাজিয়াকে, মেয়েকে তিনি নিজের ছেলেদের চেয়েও 'যোগ্যতর প্র্ষ' জ্ঞান করেছিলেন। স্লতানা রাজিয়া অবশ্য সাহসিকা ও ব্দ্ধিমতী রমণী ছিলেন, কিন্তু ম্সলিম-ধর্মীয় অন্ধ সংস্কারবশত যোদ্ধ্-নেতৃবৃন্দ স্ত্রীলোকের অধীনস্থ হয়ে থাকাটা অসম্মানজনক বলে মনে করলেন। রাজিয়া চার বছর রাজত্ব করেন, পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর পরে একটা সময় কাটে রাজনৈতিক অশান্তি ও বারেবারে প্রাসাদ-বিদ্রোহ অন্ষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ওই সময়ে মোঙ্গলরাও বারেবারে ভারত আক্রমণ করে এবং ১২৪১ খ্রীস্টাব্দে লাহোর অধিকার করতে সমর্থ হয় তারা।

অবশেষে ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দে ইল্তুত্মিশের কনিষ্ঠ প্ত্র নাসিরউদ্দিনকে সিংহাসনে বসানো হল। তবে সত্যিকার রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত রইল তাঁর যোগ্য অভিভাবক গিয়াসউদ্দিন বল্বনের হাতে। ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দে নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন নিজেই সিংহাসনে বসলেন। ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাইশ বছর রাজত্ব করেন তিনি। সিংহাসনে বসার পর গিয়াসউদ্দিন বল্বন মোঙ্গলদের দেশ

থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন এবং দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর প্রতিরক্ষা-ব্যূহের সীমানা-বরাবর একসারি দুর্গও নির্মাণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল রাষ্ট্রশক্তি সংহত করার ব্যাপারে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাওয়ার সময়। বিদ্রোহদমনে বল্‌বন ছিলেন নির্মম নিষ্ঠুর (দোয়াবের অধিবাসীদের তিনি এইভাবে শায়েস্তা করেন), বন্দী বিদ্রোহীদের তিনি হুকুম দেন হাতির পায়ের নিচে পিষে মারবার কিংবা জীবন্ত তাঁদের ছাল ছাড়িয়ে নেবার। 'চল্লিশ' নামের দলটির শক্তি চূর্ণ করতে সমর্থ হন তিনি এবং ১২৮০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার মুসলিম সেনানায়কদের বিদ্রোহ দমন করেন নিষ্ঠুর ব্যবস্থাদি অবলম্বনের মারফত। বিদ্রোহের নেতৃবর্গকে শাস্তি দিয়েছিলেন তিনি জনসমক্ষে তাঁদের শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। বৃদ্ধ বয়সে গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যু হলে সামন্ত-ভূস্বামীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ফের একবার ক্ষমতার লড়াই শুরু হল। অতঃপর যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল তাতে খিল্‌জি-বংশীয় তুর্কি উপজাতির যোদ্ধৃ-নেতৃবর্গ শেষপর্যন্ত জয়ী হলেন এবং সিংহাসনে বসলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ জালালউদ্দিন ফিরুজ। জালালউদ্দিন রাজত্ব করেন ১২৯০ থেকে ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

খিল্‌জি-রাজত্ব

খিল্‌জি-বংশের প্রথম সুলতানের রাজত্বকালে মোঙ্গল-সেনাবাহিনী ফের একবার ভারত আক্রমণ করে, কিন্তু জালালউদ্দিন তাদের একাংশকে পর্যুদস্ত করতে ও অপর অংশকে উৎকোচে বশীভূত করতে সমর্থ হন।

জালালউদ্দিন ফিরুজের রাজত্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল তাঁর জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্য-অভিযান। দেবগিরির যাদব-রাজবংশের রাজা রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করার পর আলাউদ্দিন দিল্লীতে ফিরলেন। রাজধানীর কাছে এক জায়গায় শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে শ্বশুরকে হত্যা করলেন এবং নিজে দিল্লীর নতুন সুলতান হয়ে বসলেন (ইনি দিল্লীতে রাজত্ব করেন ১২৯৬ থেকে ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত)।

এই নিষ্ঠুর ও স্থিরসংকল্প নতুন সুলতান ছিলেন দক্ষ সেনানায়ক ও প্রতিভাবান প্রশাসক। ওই সময়ে মোঙ্গলদের ভারত-আক্রমণের পালা চলছিল আরও ঘনঘন এবং আলাউদ্দিন এই শত্রুকে উৎখাত করার জন্যে তাঁর সমগ্র সেনাবাহিনীকে সমবেত করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের নিষ্ঠুরতার দিকটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে এই ঘটনা থেকে যে একবার বিদ্রোহ ঘটতে পারে এই সন্দেহ করে তিনি হুকুম দেন, জালালউদ্দিনের রাজত্বকালে মোঙ্গল-উপজাতির যে-সমস্ত লোক দিল্লীর আশেপাশে বসতি স্থাপন

করেছিলেন এবং যাঁরা জালালউদ্দিনের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে লড়াই পর্যন্ত করেছিলেন তাঁদের সবাইকে এক রাত্রের মধ্যে ঘেরাও ও বন্দী করে হত্যা করতে। এই মোঙ্গলদের মোট সংখ্যা পনেরো থেকে তিরিশ হাজারের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই হুকুমের নড়চড় হয় না। পুরোহিত, মোল্লা ও ধনী গোষ্ঠীপতিদের নিষ্কর জমি হয় বাজেয়াপ্ত করেন নয় তো তার ওপর কর ধার্য করেন আলাউদ্দিন। ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট করার জন্যে তিনি সবরকম ভোজ, খানাপিনা ও জমায়েত নিষিদ্ধ করে দেন এবং গোটা দেশ ছেয়ে ফেলেন গুপ্তচর দিয়ে।

দেশের ভূমি-সম্পদ নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন তখনও-পর্যন্ত প্রচলিত ভূমিদানের প্রথার পরিবর্তে ইক্তাদারদের স্বল্পপরিমাণ অর্থদানের প্রবর্তন করেন। জিনিসপত্রের বিনিময়-প্রথা যে-দেশের প্রধান প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল সেখানে রাজধানীতে খাদ্যদ্রব্যের দাম কমানোর উদ্দেশ্যে তিনি চরম ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন এবং এইভাবে তাঁর অনিয়মিত বেতনভুক সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য-সরবরাহ নিশ্চিত করেন। এইমর্মে আদেশ জারি করা হয় যে দোয়াব-অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি থেকে প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করা হবে ফসলে এবং এর ফলে বণিকরা বাধ্য হলেন দিল্লীতে বিশেষভাবে নির্মিত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শস্যগোলায় ফসলের যোগান দিতে। রাজধানীর এবং দোয়াব-অঞ্চলের বাজারগুলিতে ফসলের দাম কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হল এবং রাষ্ট্রের নিয়মকানুন প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে নিযুক্ত হলেন বিশেষ একদল রাজকর্মচারি। বাজারে ক্রেতাদের ঠকানো হলে কিংবা ওজনে কম দেয়া হলে তার জন্যে নিষ্ঠুর নানা শাস্তি দেয়া হতে লাগল। আবাদী জমির খাজনা বাড়িয়ে তা উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ থেকে অর্ধেক করা হল। হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ হল অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখা, দামি পোশাক-আশাক পরা কিংবা ঘোড়ায় চড়া। মুসলমানদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জেহাদী-মনোবৃত্তির লোকজনকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হল। তবে সৈন্যদের অপেক্ষাকৃত বেশি বেতন দেয়া হতে লাগল।

গোড়ার দিকে এই সমস্ত কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সুলতানের পক্ষে সম্ভব হল ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের বিপুল ও কর্মক্ষম এক বাহিনী গড়ে তোলা এবং এর সাহায্যে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করা। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে মোঙ্গলরা শেষবার হানা দেয় ১৩০৬ খ্রীস্টাব্দে এবং ইরাবতী নদীর তীরে এক যুদ্ধে সুলতানের সেনাবাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়।

তবে এমন প্রকাণ্ড এক সৈন্যবাহিনীর পোষণ করে যাওয়ার মতো যথেষ্ট অর্থের সাশ্রয় আলাউদ্দিনের ছিল না, তাই তিনি স্থির করলেন ফের একবার দাক্ষিণাত্যের নতুন-নতুন এলাকা ও শহরগুলি লুণ্ঠন করে রাজকোষ পূর্ণ করবেন। সেনাধ্যক্ষ মালিক কাফুরকে তিনি এই অভিযানের নেতৃত্ব দিলেন এবং ১৩০৭ খ্রীস্টাব্দে

মালিক কাফুর ফের একবার দেবগিরি ও পরে কাকতীয়-বংশের রাজধানী ওয়ারঙ্গল (বর্তমানে তেলেঙ্গানা নামে পরিচিত অঞ্চল) দখল করলেন। অতঃপর ১৩১১ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয়বার অভিযান চালিয়ে কাফুর দখল করলেন হোয়সল-রাজ্যের রাজধানী দ্বারসমুদ্র এবং পাণ্ড্য-রাজ্যের কেন্দ্র মাদুরা। এর পরবর্তী দু-তিন বছরে মালিক কাফুর এইরকম আরও কয়েকটি অভিযান চালান এবং ভারতের সর্বদক্ষিণ উপকূল কুমারিকা অন্তরীপে পেঁছে যান। এই সমস্ত সামরিক অভিযান থেকে ফেরার সময় আলাউদ্দিনের সেনাবাহিনী সোনা, মণিমুক্তো ও ঘোড়ার পাল সহ অপরিমিত ঐশ্বর্যসম্ভার লুট করে এনেছিল। দক্ষিণ ভারতের ভূখণ্ডগুলির পরাজিত রাজারা দিল্লীর সুলতানশাহীর আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বাধ্য হয়েছিলেন দিল্লীকে বাৎসরিক কর যোগাতে।

আলাউদ্দিনের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য দৃঢ়বদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত কোনো রাষ্ট্র ছিল না। তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলিতে গুজরাটে তাঁর নিযুক্ত শাসক-প্রতিনিধিরা বিদ্রোহ করেন তাঁর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে রাজপুতরাও অনবদমিত থেকে যান; রাজপুত গাথাকাব্যগুলিতে মুসলিম থানাদার বাহিনীগুলির বিরুদ্ধে তাঁদের অনবরত সংঘর্ষ ও সংগ্রামের বিবরণ আছে। বঙ্গদেশও তখন বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন স্বাধীন মুসলমান শাসকদের রাজ্যে। হোয়সল ও পাণ্ড্য-রাজারাও দিল্লীকে বাৎসরিক কর দেয়া বাদে কার্যত স্বাধীনই ছিলেন। ওদিকে সিন্ধুনদের পরপারের উত্তরাঞ্চলগুলিতে তখনও বসত করত নানা স্বাধীন উপজাতি।

সফল যুদ্ধাভিযান পরিচালনার পরে রাজধানীতে-আনা লুণ্ঠিত দ্রব্য সুলতান যদিও উদার হাতে বিতরণ করতেন, তবু তাঁর সন্দেহবাতিক, জমি, ইত্যাদি বাজেয়াপ্তকরণের অভ্যাস, হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন এবং সেইসঙ্গে অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ফলে চারিদিকে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হল। সর্বত্র ফেটে পড়তে লাগল বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর (১৩১৬ খ্রীস্টাব্দে শোথরোগে ভুগে মারা যান তিনি) সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হল এবং ক্ষমতাদখলের চেষ্টা করতে গিয়ে মালিক কাফুর নিহত হলেন। কয়েক মাস পরে আলাউদ্দিনের এক ছেলে কুত্‌ব্‌উদ্দিন মুবারক শাহ্‌ (১৩১৬ থেকে ১৩২০ খ্রীস্টাব্দ) নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। পিতার জারি-করা সকল অর্থনৈতিক সংস্কার বাতিল করে দিলেন তিনি, তবে রাজ্যজয় ও পররাজ্য-দখলের নীতি ত্যাগ করলেন না এবং খসরু খাঁ'র নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন দাক্ষিণাত্যে। এই সেনাধ্যক্ষটি মাদুরা ও তেলেঙ্গানা জয় করে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে এলেন বটে, তবে ফিরেই মুবারক শাহ্‌কে হত্যা করলেন নিজেই দিল্লীর সুলতান হয়ে বসার আশায়। কিন্তু অপর এক গোষ্ঠীর তুর্কি অভিজাতরা শিগ্‌গিরই এই পথের কণ্টকটিকে নির্মূল করলেন। অতঃপর দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন পঞ্জাবের জনেক

শাসক-ফৌজদার মালিক গাজী। ইনি সুলতান হলেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০ থেকে ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দ) নাম নিয়ে এবং প্রবর্তন করলেন নতুন এক সুলতান-বংশের।

তুঘলক-বংশ

আলাউদ্দিনের নানা সংস্কারসাধনের ফলে নানাদিকে যে-সমস্ত-ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল তার অবসানকল্পে নতুন সুলতান কয়েকটি নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটালেন। ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ কমিয়ে উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ করা হল এবং রাষ্ট্রের খরচে জমিতে সেচের উপযোগী খাল খনন করানো শুরু হল। গিয়াসউদ্দিন নিজের জন্যে দিল্লীতে গোলাপিরঙের গ্রানিট-পাথরে তৈরি গোটা একটা শহর নির্মাণ করালেন এবং প্রবল শক্তিশালী বুরুজ-যুক্ত একটি প্রাকারে গোটা শহর ঘিরে দিয়ে তার নামকরণ করলেন তুঘলকাবাদ (শহরটি এখন দু'একটি সমাধিসৌধ ছাড়া পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত)। শহরটির পাশেই তিনি নিজের জন্যে লাল ও শাদা পাথরে তৈরি একটি জাঁকালো সমাধিসৌধ নির্মাণ করান। প্রাচীরে-ঘেরা এই দালানগুলিও দেখতে অনেকটা দুর্গের মতো (এগুলিই এখনও পর্যন্ত টিকে আছে)। কৃত্রিম একটি হ্রদের মধ্যে এই শহরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন সুলতান, তবে হ্রদটি বর্তমানে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে।

পূর্ববর্তী সুলতানদের মতো গিয়াসউদ্দিনও এক সক্রিয় পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করেন। দিল্লীর রাজকোষ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ফের একবার সামরিক অভিযানের তোড়জোড় করা হল এবং পুত্র জৌনা খাঁর সেনাপতিত্বে সুলতান দাক্ষিণাত্যে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। জৌনা খাঁ কাকতীয়দের রাজধানী ওয়ারঙ্গল দখল করে তার নামকরণ করলেন সুলতানপুর। গিয়াসউদ্দিন নিজে পূর্ববঙ্গকে বশ্যতাস্বীকার করালেন এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসককে বাধ্য করলেন দিল্লীর সুলতানশাহীর সামন্ত করদ ভূস্বামীর পদ মেনে নিতে (১৩২৪ খ্রীস্টাব্দ)। বঙ্গদেশ থেকে ফিরে যাওয়ার পর গিয়াসউদ্দিনের জন্যে পুত্র জৌনা খাঁ দিল্লীতে এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। কিন্তু হস্তিবাহিনীর শোভাযাত্রাটি যাওয়ার সময়ে উৎসবক্ষেত্রে একটি কাঠের-তৈরি শামিয়ানা ও মঞ্চ ভেঙে পড়ে এবং তার নিচে চাপা পড়ে গিয়াসউদ্দিন মারা যান। আরবী পর্যটক ইব্‌ন-বতুতার ভাষ্য অনুযায়ী, এই 'আকস্মিক দুর্ঘটনা'টির পরিকল্পনা করেছিলেন জৌনা খাঁ-ই, সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি রেখে। বস্তুত, এরপর শিগ্‌গিরই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫ থেকে ১৩৫১ খ্রীস্টাব্দ) নাম নিয়ে।

মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন যোগ্য সেনাধ্যক্ষ ও সুশিক্ষিত মানুষ। আবার ওই একইসঙ্গে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর অত্যাচারীও এবং চিন্তাহীন যদৃচ্ছ কাজকর্মের ফলে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। দিল্লী তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে বহুদূর — এটা চিন্তা করে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন দেবগিরিতে এবং তার নতুন নামকরণ করলেন দৌলতাবাদ। এর ফলে কেবল-যে তাঁর দরবারই স্থানান্তরিত হল তা-ই নয়, সুলতান-পরিবারের সব লোকজনই বাধ্য হলেন দিল্লী ছেড়ে দেবগিরিতে আসতে। অল্প কয়েক বছর পরে মুহম্মদ বিন তুঘলক ফের সব পাট উঠিয়ে ফিরে এলেন দিল্লীতে, কিন্তু রাজধানীর ক্ষতিগ্রস্ত প্রাক্তন অর্থনৈতিক জীবনের পুনরুদ্ধার বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

এমন প্রকাণ্ড একটি সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্যে বিপুল এক সৈন্যবাহিনী পোষণ ও সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বহু শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এক প্রশাসন-ব্যবস্থা চালু রাখা অপরিহার্য হওয়ায় রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ল, একান্ত দরকার পড়ল নতুন করে সম্পদ সংগ্রহের। ফলে মুহম্মদ বিন তুঘলক প্রবর্তন করলেন কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায়ের (আবওয়াবের) এক ব্যবস্থার। এই অতিরিক্ত আদায়ের পরিমাণ এত বেশি হয়ে দাঁড়াল যে সর্বস্বহারানো, নিঃস্ব-হয়ে-যাওয়া কৃষকরা জমিজমা ফেলে রেখে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে বিভিন্ন অঞ্চল আরও দরিদ্র হয়ে পড়ল এবং রাজকোষে অর্থের সরবরাহ একেবারে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। এই সময়ে আরও এক অতিরিক্ত বিপদ দেখা দিল, তা হল বহু এলাকা জুড়ে গুরুতর অনাবৃষ্টি। এদিকে সুলতান তাম্রমুদ্রার প্রচলন শুরু করলেন, ইতিপূর্বে প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার এগুলি তুল্যমূল্য বলে প্রচার করলেন তিনি। এর ফলে দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা ও দেশের অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। নতুন মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে অস্বীকার করে বসলেন ব্যবসায়ীরা। শেষপর্যন্ত সুলতান বাধ্য হলেন রৌপ্য ও স্বর্ণের বিনিময়ে এই নিদর্শনমুদ্রা নিজে কিনে নিতে। এর ফলে রাজকোষ একেবারে শূন্য হয়ে পড়ল। এর ওপর আবার হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চল কোয়ারাজালে মুহম্মদ বিন তুঘলকের যুদ্ধাভিযানের পরিণতি ঘটল সাংঘাতিক ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ে। এটা ঠিক যে প্রথমে তিনি স্থানীয় রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁকে কর দিতে বাধ্য করিয়েছিলেন, কিন্তু দেশে ফেরার পথে তাঁর একলক্ষ সৈন্যের বাহিনী ক্ষুধায়, বৃষ্টিতে ও উপযুক্ত চলাচল-ব্যবস্থার অভাবে কেবল-যে সাংঘাতিক দুর্দশায় পতিত হল তা-ই নয়, তদুপরি পার্বত্য অধিবাসীদের অনবরত আকস্মিক চোরাগোপ্তা আক্রমণের ফলে প্রায় সম্পূর্ণতই ধ্বংস হয়ে গেল।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ পনেরো বছর কেটেছিল তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র হঠাৎ-হঠাৎ ঘনিয়ে-ওঠা বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান দমনের নিষ্ফল চেষ্টায়

এবং প্রায়ই যা প্রচলিত ধর্মবিরোধী আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল এমন সব গণ-আন্দোলনের মোকাবিলা করার প্রয়াসে। তাঁর উৎপীড়নমূলক শাসন-ব্যবস্থাদির অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতার কারণে মুহম্মদ বিন তুঘলকের নাম দিয়েছিল লোকে 'খুনী' বা রক্তপিপাসু। ১৩৫১ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহী আমিরদের পেছনে তাড়া করে তিনি থাট্টু শহরে (সিন্ধুদেশে) গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানেই জ্বরে ভুগে মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে ওই সিন্ধুদেশেই অভিজাত ওমরাহ্‌রা মৃত সুলতানের এক চাচাত ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকের এই ভাই হলেন ফিরুজ তুঘলক (১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দ)।

মুহম্মদের রাজ্য-শাসনের বিপর্যয়কর নানা পরিণতি এড়াতে ফিরুজ বাধ্য হন বহুবিধ দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। যেমন, তিনি নতুন আদায় (বা আবওয়াব)-সংগ্রহ বন্ধ করে দিলেন, ভূমি-রাজস্ব হ্রাস করলেন, চাষের উন্নতি ঘটাতে দোয়াব-অঞ্চলে খনন করিয়ে দিলেন পাঁচটি নতুন জলসেচের খাল, বাজারের কর তোলার হার কমিয়ে দিলেন, সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে দান করলেন 'গ্রাম ও শহর' এবং একটি ফরমান জারি করে শারীরিক উৎপীড়নের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলেন। এছাড়া মুসলিম সেনাধ্যক্ষদের দেয়া হল বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা, অবশ্য তাতে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবেরই ইন্ধন জুটল।

অথচ ওই একই সঙ্গে ফিরুজ অন্য সকল ধর্মের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমনপীড়ন শুরু করে দিলেন, উৎপীড়ন করতে লাগলেন হিন্দুদের ও শিয়া-মতাবলম্বী মুসলমানদের। হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার সময়ে (বিশেষ করে কাটেহ্‌র-এর বিরুদ্ধে) তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে ক্রীতদাসে পরিণত করতেন এবং রাষ্ট্রের খাসতালুকে তাঁদের দিয়ে কাজ করাতেন। সুলতানের এই 'আদর্শ' অনুসরণ করে তাঁর কর্মচারিরাও মেতে উঠলেন ক্রীতদাস-সংগ্রহে। ইতিহাসবেত্তা বারানির মতে, ওই সময়ে দেশে ক্রীতদাসের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজারের মতো।

ফিরুজের সাম্রাজ্য অটুট রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাত্য সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং সিন্ধুদেশ ও ওড়িষ্যায় ফিরুজের সামরিক অভিযানগুলিও পর্যবসিত হয়েছিল ব্যর্থতায়। বৃদ্ধ সুলতান ফিরুজ যখন মারা গেলেন সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তখন শুরু হয়ে গেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিটি গোষ্ঠীই সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে তাঁদের নিজ-নিজ প্রার্থীকে সমর্থন করতে লাগলেন।

১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে সমরখন্দের শাসক তৈমুর লঙ্-এর সেনাবাহিনী তুঘলক-বংশের টলায়মান সাম্রাজ্যের ওপর চরম আঘাত হানল। তৈমুর চরম নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখিয়ে ভারতবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তোলার প্রয়াস পেলেন। বিপুল সংখ্যায়

জনসাধারণকে হত্যা করে তাদের মাথার খুলি দিয়ে মিনার বানাতে চাইলেন তিনি। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি যে-একলক্ষ যুদ্ধবন্দীকে আটক করেন তাদের ঠান্ডা মাথায় দিল্লীর বাইরে এক জায়গায় হত্যা করার আদেশ দেন, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ কোনোদিন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস না-পায়। দিল্লীর সুলতান সে-সময়ে পালিয়ে যান গুজরাটে। এদিকে তৈমুরের সৈন্যদল দিল্লীতে প্রবেশ করে বেশ কয়েকদিন ধরে সমানে লুটপাট ও হত্যালীলা চালিয়ে যায়। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য ক্যারাভানে বোঝাই করে ও কয়েক হাজার বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে তৈমুর অতঃপর ফিরে যান সমরখন্দে। আর ভারতে এই আগ্রাসনের পিছু-পিছু হানা দেয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী; সামন্ত-রাজ্যগুলির শাসকরা স্বাধীন হয়ে ওঠেন এবং ধসে পড়ে তুঘলক-সাম্রাজ্য।

সৈয়দ-বংশ

তুঘলক-বংশের শেষ সুলতান মারা যান ১৪১৩ খ্রীস্টাব্দে, সিংহাসনের জন্যে কোনো উত্তরাধিকারী না-রেখে। ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দে মুলতানের প্রাক্তন শাসক-প্রতিনিধি খিজ্র খাঁ সৈয়দ দিল্লী দখল করে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের করায়ত্ত করলেন। ইনি ইতিপূর্বে তৈমুরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন এবং তৈমুর এঁকে মনোনীত করেছিলেন মুলতান ও পঞ্জাব উভয় অঞ্চলেরই শাসক-প্রতিনিধি হিসেবে। যাই হোক, ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দটি সৈয়দ সুলতান-বংশের শাসনের সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত।

১৪২১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত খিজ্র খাঁ নামেমাত্র তৈমুর-রাজ্যের শাসক-প্রতিনিধি হিসেবে শাসন চালিয়ে যান। তাঁর রাজত্বকালে দেশ তখনও ছিল নিঃস্ব অবস্থায় এবং রাজস্ব সংগ্রহ করতে হচ্ছিল জবরদস্তি করে একমাত্র সৈন্যদলের সাহায্যে ও রাজকোষ পূর্ণ রাখতে হচ্ছিল প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে নিয়ম করে বাৎসরিক যুদ্ধাভিযান চালিয়ে লুণ্ঠিত অর্থসম্পদের সাহায্যে। খিজ্র খাঁ'র রাজ্য বিস্তৃত ছিল কেবলমাত্র দিল্লী, পঞ্জাব ও দোয়াবে। তাঁর পুত্র ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী মুবারক শাহ্ (১৪২১ থেকে ১৪৩৪ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে তৈমুর-বংশীয় রাজার ফরমানসমূহ মেনে চলতে অস্বীকার করেন ও নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন শুরু করে দেন। এ-সমস্ত কাজকে গণ্য করা হয় অবাধ্যতার নিদর্শন হিসেবে। মুবারক শাহ্ দোয়াবের ও দিল্লীর কাছাকাছি অপর কয়েকটি এলাকার সামন্ত-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বারকয়েক সামরিক অভিযানও পরিচালনা করেন। তাছাড়া তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন মালবের শাসকের বিরুদ্ধে, পঞ্জাবে আধিপত্য রক্ষার জন্যে গাক্কারদের বিরুদ্ধে এবং কাবুলের তৈমুর-বংশীয় রাজার

বিরুদ্ধেও। শেষপর্যন্ত মুবারক শাহ্ নিহত হন দরবারের ওমরাহ্দেরই একাংশের ষড়্যন্ত্রের ফলে।

অতঃপর সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন মুবারকের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ্ (১৪৩৪ থেকে ১৪৪৫ খ্রীস্টাব্দ)। লাহোর ও সির্হিন্দের শাসক-প্রতিনিধি আফগান লোদী উপজাতির বাহ্লুল খাঁ মালবের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুহম্মদ শাহ্কে সাহায্য দেন। ফলে বাহ্লুল খাঁ মুহম্মদের রাজদরবারে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি একবার ক্ষমতা-দখলেরও চেষ্টা করেন, কিন্তু অসফল হন। মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর সৈয়দ-বংশের শেষ সুলতান আলম শাহ্ (১৪৪৫ থেকে ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক নানা অভিজাত-গোষ্ঠীর মধ্যে অনবরত রেষারেষি ও সংঘর্ষ চলতে থাকায় এবং তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণে ওই সময়ে দিল্লীর সুলতানরা পুতুলরাজার চেয়ে বড়-একটা বেশিকিছু ছিলেন না ও নামেমাত্রই শাসক ছিলেন তাঁরা। ওই সময়ে লোকে এমন কি ছড়া কেটে এমন কথাও বলত যে 'শাসন করেন শাহ্ আলম (আক্ষরিক অর্থে, জগতের অধিপতি) দিল্লী থেকে মাত্র পালাম' (পালাম হল দিল্লীর কাছের একটি ছোট জনবসতি। বর্তমানে এখানে দিল্লীর বিমান-বন্দরটি অবস্থিত)।

লোদী-বংশ

বাহ্লুল অতঃপর দ্বিতীয়বার ক্ষমতা-দখলের চেষ্টা করলেন। এবার তিনি সফল হলেন আলম শাহ্কে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করতে। ১৪৫১ থেকে ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী বাহ্লুল খাঁ'র রাজত্বকালে তিনি লোদী উপজাতির লোকজনকে রাজ্যের সবচেয়ে সুবিধাভোগী অভিজাত সম্প্রদায়ে পরিণত করেন এবং আফগান উপজাতিদের বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীকে তাঁর সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তাঁর প্রায় চল্লিশ বছরের রাজত্বকাল পূর্ণ ছিল সুলতানশাহীর সীমানা প্রসারণের লক্ষ্যে নিয়োজিত অনবরত, অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহে। তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের মধ্যে সবচেয়ে সবল-প্রবল ছিল জৌনপুর রাজ্য, শেষপর্যন্ত ১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দে এই রাজ্যটিকেও বাহ্লুল বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হন। অন্যান্য বেশকিছু ছোটখাট রাজ্য ও রাজাকেও তিনি বাধ্য করেছিলেন তাঁর পদানত হতে।

বাহ্লুলের পুত্র সিকন্দর শাহ্ (১৪৮৯ থেকে ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর অধীনস্থ সামন্ত-রাজা ও শাসক-প্রতিনিধিদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নিয়োজিত করেন জটিল শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট গুপ্তচরদের এক সংগঠন। সিকন্দর ছিলেন গোঁড়া সুন্নি-মতাবলম্বী, যদিও তাঁর মা ছিলেন হিন্দু-পরিবারের মেয়ে। হিন্দু জনসাধারণকে নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জরিত করেন তিনি, তাদের মঠ-

মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করে দেন। ১৫04 খ্রীস্টাব্দে যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় একটি ছোট দুর্গ নির্মাণ করিয়ে তিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন। দোয়াবের সামন্ত-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনার পক্ষে এটি ছিল অপেক্ষাকৃত এক সুবিধাজনক স্থান।

সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহীম (১৫১৭ থেকে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ) অধীনস্থ সামন্ত-ভূস্বামীদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রেখে সুলতানের ক্ষমতাবৃদ্ধির দিকে মন দিলেন। আফগান সেনাধ্যক্ষদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন বন্ধ করে দিলেন তিনি, ঘোষণা করলেন সুলতানের কোনো আত্মীয়স্বজন অথবা এক উপজাতি-গোষ্ঠীর লোক থাকতে পারে না, থাকতে পারে শুধু প্রজাবর্গ আর অধীনস্থ সামন্ত-শাসক। এই সুলতানের সবচেয়ে বড় যুদ্ধাভিযান ছিল মালব ও গোয়ালিয়র রাজ্য দুটির বিরুদ্ধে তাঁর সফল যুদ্ধযাত্রা। তবে সাধারণভাবে তাঁর স্বৈর-শাসন এবং আফগান সেনাধ্যক্ষদের ক্ষমতা চূর্ণ করার ব্যাপারে তাঁর প্রয়াসের ফলে অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দিল। সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে পরস্পর রেষারেষি ও অসন্তোষের পালা চলল সমানে। পরিশেষে একদল ওমরাহ্ তৈমুর-বংশীয় কাবুলের শাসক বাবরের দ্বারস্থ হলেন, তাঁকে তাঁরা অনুরোধ জানালেন সুলতানের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি দিতে। বাবর অবশ্য তাঁদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্যে খুবই আগ্রহী ছিলেন। বস্তুত ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ হিন্দুস্তান দখলের জন্যে তিনি ইতিপূর্বেই মনে-মনে ফন্দি আঁটছিলেন। অতঃপর ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে বাবর পরাস্ত করলেন ইব্রাহিম লোদীকে এবং এইভাবে স্থাপন করলেন ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের* ভিত্তি — যা পরের দু'শো বছর ধরে দিকনির্দেশ করেছিল ভারতের ইতিহাসের।

দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারতের মুসলমান বিজেতারা পূর্ববর্তী হিন্দু রাজাদের জমিজায়গা দখল করে নেন এবং সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। কিন্তু তুর্কি সেনাধ্যক্ষরা বহু-বহু শতাব্দী ধরে বিবর্তিত ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা ও ব্যবসা-

* খোরাসানে, আফগান-উপজাতিদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলিতে এবং উত্তর ভারতেও কেবলমাত্র মোঙ্গলরাই নয়, যে-সমস্ত মুসলমান রাজা আগেকার মোঙ্গলদের অধিকৃত ভূখণ্ডগুলিতে রাজত্ব করতেন ও মোঙ্গলদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরাও মোগল নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। মধ্য-এশিয়ার এই গোটা অঞ্চল এবং আফগানদের ভূখণ্ডগুলি মোগলিস্তান নামে পরিচিত। বাবর ওই অঞ্চল থেকেই ভারতে এসেছিলেন এবং এ-কারণে তিনি ও তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা-যাঁরা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা সবাই মোগল নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। ইউরোপীয়রা এই মোগলের অধিপতিকে 'মহান মোগল' আখ্যা দিয়ে আসছেন।

বাণিজ্যের পদ্ধতিতে মৌল কোনো পরিবর্তন ঘটাতে অসমর্থ হন। সবকিছু সত্ত্বেও মোটের ওপর কৃষক ও সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের মধ্যে সম্পর্ক থেকে যায় আগের মতোই, যদিও সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার ধরনে কিছু-কিছু পরিবর্তন ঘটে। জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা অতঃপর আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ-বাবদে প্রচুর অর্থাগমের ফলে বিদেশী বিজেতারা তাঁদের বিপুল ও প্রবল সৈন্যবাহিনীকে পোষণ করতে ও তার সাহায্যে পরদেশী জনসাধারণকে শাসনে রাখতে সমর্থ হন। বস্তুত এই পর্বে রাষ্ট্র যে-ভূসম্পত্তির মালিক হয় তা আগে ছিল তৎকালে নির্বাসিত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী-পরিবারগুলিরই সম্পত্তি।

এই সময়ে দু'ধরনের রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল—'ইক্‌তা' ও 'খালিসা' (বা রাজকীয় জমি)। রাজস্ব-আদায়ের কর্মচারিরা রাজকীয় জমি থেকে প্রাপ্য খাজনা আদায় করতেন। ভূমি-রাজস্ব সাধারণত নির্ধারিত হোত আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী: যথাযথ কোনো মাপজোক করা হোত না এবং খাজনা আদায় করা হোত সরাসরি গ্রামীণ সমাজের কাছ থেকে। এই ধরনের জমি থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব দিয়ে চলত রাজদরবারের খরচখরচা ও সেই সমস্ত রাজকর্মচারি ও যোদ্ধাদের পোষণ যাঁরা তাঁদের বেতন পেতেন দ্রব্যসামগ্রীতে অথবা টাকায়। কিছু-কিছু বন ও চারণক্ষেত্রও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে গণ্য হোত। দিল্লীর সুলতানশাহীর কোনো-কোনো বিশেষ আমলে (যেমন, বিশেষ করে ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকালে) রাষ্ট্রীয় তালুকে কিছু-কিছু রাজার খাস-খামারও স্থাপন করা হয়েছিল। এই সমস্ত খামারে চাষবাসের কাজে লাগানো হোত ক্রীতদাসদের। তবে এই ধরনের খাস-খামারের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

রাষ্ট্রীয় তালুকের অধিকাংশই তখন সুলতানের হয়ে নানাধরনের কাজ করার, অর্থাৎ রাজসেবার, বিনিময়ে শর্তাধীনে দান হিসেবে বিলি করা হোত। এই প্রথাকে বলা হোত 'ইক্‌তা'-ব্যবস্থা। ছোট-ছোট টুকরো জমির নাম দেয়া হয়েছিল 'ইক্‌তা', আর এইসব জমির মালিককে বলা হোত 'ইক্‌তাদার' বা 'ওয়াজদার' (অর্থাৎ ভূমিদানের প্রাপক)। এছাড়া অপেক্ষাকৃত বড় ভূসম্পত্তিও দান করা হোত আর এদের প্রাপকদের বলা হোত 'মুক্‌তা'। 'ওয়াজদার'রা সাধারণত নিজেরাই কিংবা তাঁদের খাজনা-আদায়কারীদের মারফত গ্রামগুলি কিংবা গ্রামের অংশগুলি থেকে খাজনা আদায় করতেন। সচরাচর পরিবার-পরিজন নিয়ে এই সমস্ত গ্রামেই বাস করতেন তাঁরা। এইরকম প্রতিটি পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর জন্যে একজন করে সৈন্যের যোগান দিতে হোত। যখন গিয়াসউদ্দিন বল্‌বন চেষ্টা করলেন এই ধরনের যে-সমস্ত পরিবারে অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পুরুষ সদস্য নেই তাদের দান-করা জমি কেড়ে নিতে, তখন এমন ব্যাপক আলোড়ন দেখা দিল যে সুলতান তাঁর মতলব ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে 'ইক্‌তাদার'দের জমি

শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তিতে পরিণত হল। এই জমিগুলি পরিচিত হল 'মুল্‌ক' বা 'ইনাম' নামে। এছাড়া 'মুক্‌তা'রা জমি থেকে যে-খাজনা আদায় করতেন তার বড় একটা অংশ জমা দিতে হোত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। কী পরিমাণে ও কোন ধরনে (অর্থাৎ ফসলে কিংবা টাকায়) এ'রা জমির খাজনা আদায় করবেন তা নির্ধারণ করে দেয়া হোত রাষ্ট্রের তরফ থেকে। এই রাজস্বের নির্দিষ্ট একটা অংশ 'মুক্‌তা' ও তাঁর ভাড়াটে যোদ্ধ্‌-বাহিনীর ভরণপোষণের জন্যে ব্যয় করা হোত। জমির ভোগদখলের অধিকার ছিল শর্তাধীন, অর্থাৎ রাজসেবার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেত না তা।

দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে অবশ্য একশ্রেণীর ব্যক্তিগত জমির মালিকেরও অস্তিত্ব ছিল, যে-জমির মালিকরা অবাধে জমির হস্তান্তর করতে পারতেন এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সে-সময়কার প্রচলিত রীতি-অনুযায়ী সংগ্রহ করতে পারতেন জমির খাজনা। তবে এই ধরনের ভূস্বামীর সংখ্যা বেশি ছিল না। এই সমস্ত ভূস্বামীর মধ্যে প্রথমত ও প্রধানত ছিল মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলি (এদের মালিকানাধীন জমিকে বলা হোত 'ওয়াকফ' জমি) ও 'পবিত্র স্থান'সমূহ বা সাধারণত শেখদের কবরগুলির রক্ষকেরা এবং অতঃপর ছিলেন 'উলেমা'রা (মুসলিম ধর্মগুরুরা), কবিরা, উচ্চপদস্থ কিছু-কিছু অমাত্য ও আমলা এবং এই ধরনের অল্পকিছু জমি (সাধারণত যাকে 'মুল্‌ক' বলা হোত) কিনে নিয়ে মালিক বনতেন যাঁরা এমন অল্পসংখ্যক কিছু বণিক। প্রায়ই এই ধরনের জমির ব্যক্তিগত মালিক বনে যেতেন তাঁরাও, যাঁরা জঙ্গল সাফ করে জমি উদ্ধার করতেন কিংবা অহল্যাভূমি চাষ করতেন। তবে এইসব জমিতে বংশ-পরম্পরায় অধিকার বজায় রাখা সম্ভব হোত তখনই, যখন সাধারণত কোনো সামন্ত-ভূস্বামী জঙ্গল সাফ করে নতুন বসত বসাতেন এবং রাজকোষের দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে সমর্থ হতেন।

সুলতানশাহীর গোটা আমলে সাধারণ হিন্দুদের জমিজায়গা, বিশেষ করে রাজপুতদের জমিজায়গা, অটুট ছিল। এমন কি তাঁদের অধীনস্থ ভূখণ্ড মুসলিম বিজেতারা জয় করে নেবার আগে থেকেই এই জাতিগোষ্ঠীটির উত্তরাধিকারসূত্রে-পাওয়া পৈতৃক ভূসম্পত্তিগুলি টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। ভারতের এই অঞ্চলে রাজসেবার পুরস্কারস্বরূপ ভূমিদানের প্রথা হয়ে উঠেছিল বহুব্যাপক। রাজপুতানায় মুসলিমদের যুদ্ধাভিযানের ফলে জমির খণ্ডীকরণের এই প্রক্রিয়া আরও দ্রুতগতি হয়ে উঠেছিল এই দিক থেকে যে কিছু রাজপুত ভূস্বামী যেমন এর ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেলেন, তেমনই অন্যেরা সুলতানের বশ্যতাস্বীকার করে তাঁদের ভূসম্পত্তি ফিরে পেলেন বটে, তবে তা পেলেন শর্তাধীন দান (বা 'ইক্‌তা'-জমি)

হিসেবে। এই সমস্ত 'ইক্তাদার'রা বাধ্য ছিলেন সুলতানের সৈন্যবাহিনীর নানা যুদ্ধে নিজ-নিজ সেনাবাহিনী সহ যোগ দিতে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বাৎসরিক কর দিতে। তবে এঁদের জমি অবশ্য বংশপরম্পরা-ক্রমে পরিবারের মালিকানাধীন থাকত।

আলাউদ্দিন খিল্জির নানা সংস্কারসাধন—যেমন, জনসাধারণের ওপর অতিরিক্ত উচ্চহারে কর চাপানো এবং হিন্দু সামন্ত-ভূস্বামীদের ওপর বাড়তি কর ধার্য করা ও সকল যোদ্ধাকে জমিদানের বদলে অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা, ইত্যাদি—প্রাক্তন নিয়মকানুনকে মূলগতভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। তাই তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ওই সংস্কারগুলি বর্জিত হয়। একই রকমভাবে মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর জারি-করা অতিরিক্ত ও বেশিমাত্রার কর বা 'আবওয়াব'গুলি পরিত্যক্ত হয়। ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার তরফে আগাগোড়াই চেষ্টা চলেছে এমন একটা মাত্রায় রাজকর নির্ধারণ করার, যাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে মোটা রাজস্ব জমা পড়ে অথচ করদ ভূস্বামীরা যেন তার ফলে নিঃস্ব হয়ে না-পড়েন।

পরবর্তী কালে 'খালিসা'-জমির পরিমাণ হ্রাস করা হয় গুরুতরভাবে এবং শর্তাধীনে জমিদানের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ 'ইক্তা'-জমি ক্রমশ 'ইনাম' বা রাজসেবার পরিবর্তে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির সমতুল্য হয়ে পড়তে থাকে। লোদী-বংশের রাজত্বকালে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে 'ইক্তাদার'দের কিছু দিতে হোত না, যদিও আগের মতোই ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নীতিগতভাবে নির্দিষ্ট করে দিত রাষ্ট্রই। বাস্তবে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করে নিতেন এবং এর ফলে গ্রামাঞ্চলে খাজনার বোঝা উঠত বেড়ে। স্থানীয় ভূস্বামীদের পক্ষে এটা করা সম্ভব হোত কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তরফ থেকে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ায়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-ব্যবস্থার ক্রমিক অবক্ষয় ও ভাঙন এবং সামন্ত-ভূস্বামীদের খেয়ালখুশি-মাফিক আচরণের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় গ্রামের জনসাধারণের অবস্থার লক্ষণীয়রকম অবনতি ঘটে। প্রসঙ্গত এটা মনে রাখা দরকার যে দেশের কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক এক অংশ ছিলেন হিন্দু এবং মুসলমান শাসকরা হিন্দু-জনসাধারণের ওপর মাথাপিছু যে-কর বা মাথট চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক প্রাণান্তকর বোঝা।

জমির সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার ধরনগুলিতে তখন যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছিল সম্ভবত কৃষক-জীবনে তার প্রভাব পড়েছিল সামান্যই। গ্রামীণ সমাজগুলি অটুট থেকে গিয়েছিল; মুসলিম ইতিবৃত্তকাররা এগুলির উল্লেখ করেছেন আরবী 'জামিয়াত' শব্দটি দিয়ে। দিল্লীর সুলতানদের কাছে এই সমাজগুলি ছিল রাজস্ব-

আদায়ের সুবিধাজনক ইউনিটস্বরূপ। গ্রামের প্রধান বা মোড়লরা ক্রমশ বেশি-বেশি করে গণ্য হতে লাগলেন রাষ্ট্রীয় কর্মচারি হিসেবে এবং তাঁদের রাষ্ট্রীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ছোট-ছোট নিষ্কর জমি তাঁদের জন্যে আলাদা করে নির্দিষ্ট হতে লাগল। গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই সম্পত্তিগত পার্থক্য অনুভূত হতে লাগল আগের চেয়ে আরও প্রবলভাবে। তবে এই পার্থক্য অবশ্যই এতখানি বিরাট ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না যে এর ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে কিংবা রাজস্বপূরণের দাবি অতিরিক্ত বেড়ে গেলে গ্রামীণ সমাজের কোনো সদস্য সর্বস্বান্ত হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ এড়িয়ে যেতে পারতেন।

তবে সেইসঙ্গে এটাও বলা দরকার যে দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলটি ছিল ধীরগতিতে হলেও উৎপাদনী শক্তিসমূহের নিয়মিত বিকাশের কাল। এর ইঙ্গিত মেলে জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে এবং আগে যা ছিল অরণ্য-অঞ্চল সেইসব জমিতে চাষবাসের মধ্যে দিয়ে। এই যুগে নতুন-নতুন জনবসতি গড়ে ওঠে এবং জমি চাষের জন্যে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পদ্ধতিসমূহ গৃহীত হয়। এর আগে পর্যন্ত অধিকাংশ আবাদী জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল না এবং ফসলের ফলন নির্ভরশীল ছিল মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর। এছাড়া ই'দারা থেকে কাঠের কপিকলের সাহায্যে জল তুলেও সেচের কাজে ব্যবহার করা হোত, তবে এইসব ই'দারায় জলের মাত্রাও নির্ভর করত বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর। সেচযুক্ত চাষের জমির এলাকাবৃদ্ধির জন্যে দিল্লীর সরকার এই যুগে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, দিল্লীর চারপাশে হৌজ-ই-শাম্‌সি ও হৌজ-ই-খাস'এ বড়-বড় দুটি জলাধার নির্মিত হয়। ফিরুজ শাহ্‌ তুঘলক শতদ্রু ও যমুনা নদী দুটি থেকে মোট ১৮০ থেকে ২০০ মাইল লম্বা কয়েকটি সেচের খাল খনন করান এবং এইভাবে ব্যবস্থা করেন বিপুল একটা এলাকা জুড়ে জমিতে জল সরবরাহের। এই সমস্ত খাল কাটার কাজে বাধ্যতামূলক শ্রমদানে নিযুক্ত হয় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক।

ভারতের অনুকূল জলবায়ুর কল্যাণে তখন বছরে দুটি করে ফসল তোলা সম্ভব হোত—একটি হেমন্তের ফসল ('খারিফ') ও অপরটি বসন্তের ফসল ('রবি')। এছাড়া যেখানে-যেখানে সেচের ব্যবস্থা ছিল সেখানে এমন কি তৃতীয় আরেকটি ফসলও তোলা ছিল সম্ভব। প্রধান-প্রধান দানাশস্য ছিল তখন জোয়ার ও ধান। একুশটি বিভিন্ন জাতের ধান হোত বলে জানা যায় তখন। এই দুটি প্রধান শস্য ছাড়াও দেশে তখন গম, যব, নানারকমের ডাল, বহু ধরনের শাকসব্‌জি ও ফলমূল, আখ এবং তৈলবীজের চাষ হোত। আগের চেয়েও বেশি জমি তখন নীলচাষের জন্যে ছেড়ে রাখা হোত। নীলই ছিল তখন কাপড়ে রঙ্‌ করার সাধারণ প্রচলিত রঞ্জকদ্রব্য। এছাড়া রেশমগুটির চাষের জন্যে তুঁতগাছের আবাদও করা হোত।

পরোক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, দিল্লীর সুলতানশাহীর শাসনাধীনে নানা ধরনের কারিগর ও কারুশিল্পীর সংখ্যা বাড়ছিল। গ্রাম্য কারুশিল্পীরা তখন গৃহীত হচ্ছিলেন গ্রামীণ সমাজের সদস্য হিসেবে। গ্রামে ও শহরে গড়ে উঠছিল কারিগরদের, বিশেষ করে তন্তুবায় (তাঁতি)-সম্প্রদায়ের নানা বসতি; এছাড়া বন্দুক-নির্মাতা কর্মকার, তামা-কারিগর ও অন্যান্য পেশার কারিগরদের বসতিও গড়ে উঠছিল। কারিগররা নিজ-নিজ 'জাত-ব্যবসা' হিসেবে নানারকম পেশা অবলম্বন করতেন। শহরের কারুশিল্পীরা তাঁদের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতেন দোকানে বসে কিংবা স্থানীয় বাজারে। গৃহ-নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত নানারকম বিশেষ ধরনের পেশা, যেমন পাথরের গাঁথুনি ও ইটের গাঁথুনির কাজ-জানা রাজমিস্ত্রি, ইত্যাদিও, দেখা দিয়েছিল এই সময়ে।

দরবারের নানা প্রয়োজন মেটাতে দিল্লীর সুলতানেরা প্রায়ই বড়-বড় 'কারখানা' স্থাপন করতেন। আলাউদ্দিনের স্থাপিত এইরকম নানা 'কারখানায়' কাজ করতেন সতেরো হাজার কারিগর ও কারুশিল্পী (এঁদের মধ্যে সাত হাজারের মতো গৃহনির্মাতা কারিগরও ছিলেন); এঁদের বেতন দেয়া হোত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে 'কারখানা'গুলিতে কাজ করতেন অন্যান্যরা ছাড়াও চার হাজার তন্তুবায়-শিল্পী।

মধ্য-এশিয়ার উপজাতিগুলি ভারত জয় করার ফলে গোড়ার দিকে ভারত ও মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম জগতের মধ্যে উটের ক্যারাভানর্নিভর বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দিল্লীর সুলতানদের প্রতিকৃতি সহ গাদা-গাদা মুদ্রা পাওয়া গেছে কেবল যে পারস্যে ও মধ্য-এশিয়ায় তা নয়, এমন কি সুদূর ভোল্‌গানদীর তীরে পর্যন্ত। দিল্লীর সুলতানশাহীর সেনাবাহিনীর প্রাণকেন্দ্র ছিল অশ্বারোহী-বাহিনী, অথচ ভারতে উপযুক্ত চারণভূমির অভাবে ঘোড়ার প্রজনন কার্যত অসম্ভব ছিল বলে বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান আমদানির বস্তু ছিল ঘোড়া। কিন্তু পরে মোঙ্গলদের অনবরত সামরিক অভিযান ও তার ফলে ইরান ও মধ্য-এশিয়ার বেশকিছু শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় এই ক্যারাভানর্নিভর বাণিজ্যে কিছুপরিমাণে ভাঁটা পড়ে যায়।

এর ফলে দিল্লীর সুলতানের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলি হস্তগত করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। এই বন্দরগুলির ছিল সমুদ্রপথে ব্যাপক বহির্বাণিজ্যের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। সমুদ্রপথে ভারত রপ্তানি করত তুলো ও বঙ্গদেশী রেশম, অস্ত্রশস্ত্র, জহরত এবং সোনা, রুপো ও তামার তৈরি বাসনপত্র। ক্রীতদাস কেনাবেচার বাণিজ্য ছিল এক সাধারণ ব্যাপার। মধ্য-এশিয়া ও পারস্য বন্দীর দল এনে ভারতে বিক্রি করা হোত এবং ভারতের মধ্যে যে-সমস্ত হিন্দু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা হোত তাদের

অধিবাসীদেরও ধরে এনে ক্রীতদাসে পরিণত করা হোত। ক্রীতদাসদের প্রধানত কাজে লাগানো হোত গৃহভৃত্য হিসেবে।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশের জন্যেও দাক্ষিণাত্য দখল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লবণ এবং নারিকেল (নারিকেল থেকে তৈরি করা হোত তেল এবং তার ছোবড়া থেকে দড়ি) দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাগুলি থেকে আনা হোত। ধানচাষের ব্যাপারে সমৃদ্ধ বঙ্গদেশের উর্বর এলাকাগুলি রাজধানীতে যোগান দিত চালের, সুলতানদের প্রকাণ্ড সেনাবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্যে প্রয়োজন ছিল তার। কনৌজের বণিকরা সারা ভারত জুড়ে এবং বিশেষ করে দিল্লীতে চিনি বিক্রি করতেন। তবে প্রধানত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে বিনিময়ব্যবস্থাই ছিল অর্থনীতির প্রচলিত প্রথা। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা-পড়া খাদ্যদ্রব্য ও কারিগরি শিল্পের কাজ প্রধানতই কাজে লাগানো হোত সুলতান ও তাঁর পরিবারের, দরবারের আমীর-ওমরাহ্‌দের এবং সুলতানের বিশাল ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে।

নানাবিধ অতিরিক্ত শুল্ক আদায় ও বহু ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম দিল্লীর সুলতানশাহীতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারুশিল্পের বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সকল মুসলমানপ্রধান দেশে সাধারণত যা আদায় হোত সেই 'জাকাত' (অর্থাৎ বণিক, কারুশিল্পী ও কারিগরদের দেয় প্রতিটি পণ্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের দামের ২·৫ শতাংশ ও তা মুদ্রায় দেয়) ছাড়াও প্রাপ্ত আকর সূত্রগুলির উল্লেখ অনুযায়ী দিল্লীর সুলতানশাহীতে আদায় করা হোত 'কোত্‌ওয়ালি' (শহরের শাসক-প্রতিনিধির নির্দিষ্ট-করে-দেয়া শুল্ক), 'মুস্তাগাল' (বাড়ি ও ছোট-ছোট দোকানের নির্মাণক্ষেত্রের ওপর নির্দিষ্ট কর) এবং শহরগুলির প্রবেশদ্বারে ও নদীর ঘাটগুলিতে পারাপারের জন্যে নানাবিধ খাজনা, ইত্যাদি।

ইতিহাসের এই পর্বেই নতুন-নতুন শহরের নাম ইতিবৃত্তগুলিতে প্রকাশ পেতে দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে পাওয়া যায় পুরনো শহরগুলির প্রসারণ, সংহতিসাধন ও নবীকরণের ঘনঘন উল্লেখ। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এ-ব্যাপার ঘটত প্রশাসন-কেন্দ্র ও ফৌজী সদর-কেন্দ্রগুলির বেলায়, কারণ বণিক ও কারুশিল্পীদের প্রধানত ব্যস্ত থাকতে হোত সামন্ত-ভূস্বামী ও তাঁদের সৈন্যদলের চাহিদা মেটানোর কাজে। তথাকথিত 'ধর্মস্থান'গুলিতে, যেখানে তীর্থযাত্রীরা জমায়েত হতেন ও মেলা বসত, সেখানেও শহরের পত্তন করা হোত। ক্রমে-ক্রমে এই সমস্ত শহর-কেন্দ্রের জনসংখ্যা বেড়ে ওঠে। তবে তখনও পর্যন্তসামন্ত-ভূস্বামীরাই ছিলেন এই সমস্ত শহরের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত; প্রায়শ তাঁরাই হতেন এখানকার পান্থশালা ও কারুশিল্পীদের অস্থায়ী দোকানগুলির মালিক এবং তাঁরাই বাজারের দেয় শুল্ক নির্দিষ্ট করে দিতেন। একমাত্র হিন্দুর 'জাত-ব্যবসা'গুলির মধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের যা-কিছু লক্ষণ

দেখা যেত। সম্পত্তির ব্যাপারে শহরের জনসাধারণের স্বত্বস্বামিত্বের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। সামন্ত-ভূস্বামীরা খুশিমতো ঘরবাড়ির বা জমির খাজনা বাড়িয়ে দিতে পারতেন কিংবা বণিকদের বাধ্য করতে পারতেন তাঁদের ইচ্ছেমতো বেঁধে-দেয়া দরে জিনিসপত্র বিক্রি করতে। সামন্ত-ভূস্বামীদের এই কর্তৃত্ব বিশেষরকম স্বেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়নের রূপ নেয় আলাউদ্দিন ও মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে। কাজেই ওই সময়ে শহরের জনসাধারণের মধ্যে-যে অসন্তোষ ও আন্দোলন দেখা দেবে ও নানা ধরনের ধর্মবিরোধী মত-প্রচারের মধ্যে দিয়ে যে তা প্রকাশ পাবে এতে অবাক হবার কিছু নেই।

কৃষকদের ক্ষেত্রে অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ প্রায়শই রূপ নিত গ্রাম ছেড়ে পালানোয়। তৎকালীন ইতিবৃত্তগুলি সর্বত্রই লিখেছেন দরবারের ইতিহাসবেত্তারা, তাই তাতে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় 'দস্যু-উপজাতি'দের ও 'ডাকাত-দল'গুলির—যারা নাকি প্রায়ই পালিয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিত। এটা খুবই সম্ভব যে এই সমস্ত 'উপজাতি' বা 'দল'-এর লোকজন ছিলেন গ্রামত্যাগী কৃষক।

ওই যুগের একমাত্র যে কৃষক-বিদ্রোহ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা হল ১৪১৯ খ্রীস্টাব্দে পঞ্জাবে সারেঙ্ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে 'অজ্ঞ প্রজাবর্গ ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন লোকজন'এর বিদ্রোহ। পঞ্জাবের সামন্ত-ভূস্বামীরা সারেঙের বিরুদ্ধে তাঁদের সৈন্যদল প্রেরণ করেন। সির্‌হিন্দের কাছে এক যুদ্ধে সারেঙের দলবল পরাজিত হয় এবং সারেঙ্ পাহাড়-অঞ্চলে পালিয়ে যান। কিন্তু অসন্তুষ্ট কৃষককুল ফের একবার তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর নেতৃত্বে সমবেত হতে শুরু করেন। শেষপর্যন্ত একমাত্র তৎকালীন দিল্লীর সুলতান খিজ্‌র খাঁ'র সেনাবাহিনীই সারেঙ্ ও তাঁর বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। সারেঙ্ বন্দী হন ও তাঁকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত

বাহ্‌মনি-রাজ্য

দাক্ষিণাত্য অল্প কিছুকালের জন্যে দিল্লীর সুলতানশাহীর অংশ হয়ে ছিল। মুহম্মদ তুঘলক দক্ষিণ ভারত ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার বিদ্রোহী আমিররা তাঁদের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ আবুল মুজফ্‌ফর আলাউদ্দিন বাহ্‌মনকে (১৩৪৭ থেকে ১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দ) সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এই বাহ্‌মনই হলেন বাহ্‌মনি সুলতানবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাহ্‌মনি-বংশ যখন ক্ষমতার তুঙ্গে

তখন এই রাজ্যের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে ওড়িষ্যা পর্যন্ত। এ-রাজ্যের উত্তর সীমানা ছিল তাপ্তীনদী-বরাবর এবং দক্ষিণ সীমানা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রানদী-বরাবর। এ-রাজ্যের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিজয়নগর-রাজ্য। এই দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ উর্বর রাইচুর উপত্যকার দখল নিয়ে বাহ্‌মনি-রাজ্যের সেনাবাহিনী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালায়। বাহ্‌মনের দক্ষিণ-দেশাভিমুখ অভিযানগুলি সফল হয়। তিনি তাঁর গোটা রাজ্যকে চারটি প্রতিনিধি-শাসিত অঞ্চল (বা 'তরফ')-এ, যথা, গুল্‌বর্গা, দৌলতাবাদ, বিদর ও বেরার এ, বিভক্ত করেন এবং নতুন করে আহ্‌সানাবাদ নাম দিয়ে গুল্‌বর্গাকে তাঁর রাজধানী করেন (বাহ্‌মনের মৃত্যুর পর আহ্‌সানাবাদ নামটি খারিজ করে দিয়ে গুল্‌বর্গা নামটিই বহাল রাখা হয়)।

বাহ্‌মনি-রাজ্যের রাজনৈতিক জীবন নির্ধারিত হয় বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বহুবিধ যুদ্ধ এবং মুসলিম সামন্ত-ভূস্বামীদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে দিয়ে। ওই দুটি গোষ্ঠী পরিচিত ছিল 'দাক্ষিণী' (দাক্ষিণাত্যে যাঁরা তার আগে দীর্ঘকাল ধরে বাস করে আসছিলেন সেইসব মুসলমানদের বংশধররা) এবং 'পরদেশী' (অর্থাৎ পারস্য ও অন্যান্য দেশ থেকে যে-সব বিদেশী সম্প্রতিকালে এসেছিলেন) নামে। এই বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ধর্মীয় কারণেও, কেননা 'পরদেশী'রা ছিলেন প্রধানত শিয়া-মতাবলম্বী মুসলমান এবং 'দাক্ষিণীরা' অধিকাংশই ছিলেন সুন্নি-মতাবলম্বী। 'দাক্ষিণী'-গোষ্ঠীর দুর্দান্ত শাসক আহ্‌মদ শাহ্‌ বাহ্‌মনি (১৪২২ থেকে ১৪৩৫ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগর-রাজ্য লুণ্ঠন করে ছারখার করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন বিদরে।

বাহ্‌মনি-রাজ্যের সবচেয়ে বাড়বাড়ন্তের দিন আসে সেই পর্যায়ে যখন রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত হয় উজির মাহ্‌মুদ গাওয়ানের ওপর (১৪৪৬ থেকে ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি মালব-রাজ্য এবং কোঙ্কন-প্রদেশের বহু ছোটখাট হিন্দু রাজার রাজ্য জয় করেন, লুণ্ঠন করেন বিপুল দেবত্র সম্পত্তির জন্যে প্রসিদ্ধ কাঞ্চীর হিন্দু-মন্দির এবং জয় করে নেন গোয়া-অঞ্চল। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন 'পরদেশী', তাই 'দাক্ষিণী'রা তাঁর কুৎসা-রটনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং উপরোক্ত রাজ্যগুলি জয় করার অব্যবহিত পরেই মদ্যপানে প্রমত্ত অবস্থায় তৎকালীন সুলতানের কাছ থেকে হুকুম আদায় করে বৃদ্ধ উজিরকে হত্যা করা হয়। এই মাহ্‌মুদ গাওয়ানের শাসনকালেই রুশদেশের ত্ভের শহরের বণিক আফানাসি নিকিতিন বিদর সফর করেন। নিকিতিন বাহ্‌মনি-রাজ্যের প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী, অভিজাত আমির-ওমরাহ্‌দের বিলাসবহুল জীবন এবং বাদবাকি জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন : 'দেশে জনসংখ্যা প্রচুর, গ্রামের লোকে

অত্যন্ত স্বল্প ও জীর্ণ পোশাক পরে থাকে. অথচ আমির-ওমরাহ্‌রা যেমন প্রবল প্রতিপত্তির অধিকারী তেমনই অত্যন্ত ধনী।'

সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে কলহ-বিবাদ এবং তার ফলস্বরূপ গৃহযুদ্ধ রাজ্যটিকে দুর্বল করে ফেলে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাহ্‌মনি-রাজ্যের পতন ঘটে। ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুর স্বাধীনতা অর্জন করে এবং রাজ্যটি শাসন করতে থাকেন আদিলশাহী-রাজবংশ। এর কয়েক মাসের মধ্যেই বেরার ও আহ্‌মদনগরও স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এই অঞ্চলের শাসনক্ষমতা পান নিজামশাহী-বংশ। ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে গোলকোণ্ডা স্বাধীন হয়, সেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন কুৎব্‌শাহী-বংশ। ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দে সত্যিকার সবরকম ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত শেষ বাহ্‌মনি-সুলতান বিজাপুরে পালিয়ে যান। তাঁর পরামর্শদাতা কাসিম বারিদ তখন নিজেকে ঘোষণা করেন বিদরের শাসক হিসেবে।

বিজাপুর

বাহ্‌মনি-রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে-পাঁচটি রাজ্যের (বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহ্‌মদনগর, বিদর ও বেরার) উত্থান ঘটে তাদের মধ্যে বৃহত্তম ছিল বিজাপুর-রাজ্যটি। ওই যুগের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস এই রাজ্যগুলির সঙ্গে বিজয়নগরের এবং এই পাঁচটি রাজ্যের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনায় পূর্ণ। যদিও এই সমস্ত রাজ্যের শাসকরা ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান এবং বিজিত ভূখণ্ডগুলির হিন্দু জনসাধারণের ওপর উৎপীড়ন চালাতেন সমানভাবেই. তবু বিজয়নগরের বিরুদ্ধে ও রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত অনবরত এবং তা চলত রাজনৈতিক কারণেই, ধর্মীয় কারণে নয়। প্রায়ই তখন দাক্ষিণাত্যের অমুক বা তমুক রাজ্য বিজয়নগরের হিন্দু রাজার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হতেন তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম রাজ্যের বিরুদ্ধে। তবে সর্বদাই এই ধরনের মৈত্রীচুক্তি খুবই অস্থায়ী ধরনের হোত। তদুপরি মুসলিম রাজাদের শাসিত রাজ্যগুলিতে যোদ্ধারা ও রাজকর্মচারিরা প্রায়শই হতেন হিন্দু, আবার ওইসঙ্গে বিজয়নগর-রাজ্যে বহুসংখ্যক মুসলমান রাজকর্মচারি নিযুক্ত ছিলেন। বস্তুত এই সমস্ত ও অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যে তখন জনসংখ্যার বিপুল এক সংখ্যাধিক্য অংশই ছিলেন হিন্দু-ধর্মাবলম্বী। এ-কারণে স্মরণ রাখা দরকার যে ওই যুগের যে-সমস্ত রাজ্যকে মুসলিম নামে অভিহিত করা হয়েছে সেগুলিকে তা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় ধর্ম অনুযায়ীই, যা সেই সমস্ত রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও আমির-ওমরাহ্‌রা জবরদস্তি জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিতেন।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগিজরা গোয়াদ্বীপটি দখল করলে বিজাপুর-রাজ্য তা

নিবারণ করতে অসমর্থ হয়। এইভাবে গোয়া হয়ে দাঁড়ায় প্রাচী-পৃথিবীতে পোর্তুগিজ-অধিকৃত অঞ্চলের হৃৎকেন্দ্র। বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও তৎকালীন ইউরোপে প্রচলিত রীতি-অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্রে-সজ্জিত ছোট-ছোট পোর্তুগিজ-বাহিনী বারেবারে বিজাপুরের বিপুল বাহিনীর চেয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ হয়। বিজাপুরের শাসকরা এই সমস্ত পোর্তুগিজ-বাহিনীকে তাঁদের সৈন্যদলে কাজ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান এবং অতঃপর তাদের ব্যবহার করেন বিজয়নগরের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে।

১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের উপরোক্ত পাঁচটি রাজ্যই বিজয়নগরের বিরুদ্ধে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর কৃষ্ণানদীর তীরে তালিকোটায় যে-যুদ্ধ হয় তাতে বিজয়নগর পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপই পতন ঘটে বিজয়নগর-[illegible]। এর পাঁচ বছর পরে বিজাপুর অপর একটি মৈত্রীচুক্তি করে [illegible]নগর ও কালিকটের সঙ্গে, পোর্তুগিজদের বিরুদ্ধে। এবার প্রায় তিনলক্ষের এক ভারতীয় বাহিনী মাত্র কয়েক হাজার পোর্তুগিজ সৈন্যবিশিষ্ট গোয়া ও চৌল বন্দর দুটি অবরোধ করে, কিন্তু বন্দর দুটি জয় করতে অসমর্থ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে মোগল-বাহিনী দাক্ষিণাত্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে।

গোলকোণ্ডা

দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম সুলতানশাহীর অস্তিত্ব ছিল কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী দুটির মধ্যে পূর্বতীরের গোলকোণ্ডায়। গোলকোণ্ডা ছিল এক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সমুদ্রপথে তার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল বিপুল। এখানকার নানা কারুশিল্প, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্প, ছিল সুউন্নত এবং বহুশাখাবিষ্ট সেচখালের এক বিকশিত ব্যবস্থার দৌলতে কৃষি থেকেও প্রচুর ফলন পাওয়া যেত। এছাড়া গোলকোণ্ডায় ছিল সুবিখ্যাত হীরক-খনি। গোলকোণ্ডার তাঁতি ও কর্মকাররা প্রসিদ্ধ ছিলেন বিশেষ ধরনের কাপড় বোনা ও চমৎকার ইস্পাত-গালাইয়ের জন্যে। তরোয়াল, তীরের ফলা ও অন্যান্য ধরনের ইস্পাতের-তৈরি অস্ত্রশস্ত্র গোলকোণ্ডা থেকে বিদেশে রপ্তানি হোত। কুত্‌ব্‌শাহী-রাজবংশের সুলতানরা একটি পাহাড়ের চুড়োয় গোলকোণ্ডার জবরদস্ত দুর্গটি নির্মাণ করান। এই পাহাড়ের পাদদেশে ছিল গোলকোণ্ডা শহর। এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ছিল 'পরদেশী'দের দখলে; হিন্দু বণিক ও কুসীদজীবীরাও এখানে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। গোলকোণ্ডা-রাজ্যে যে-হিন্দুদের বাস ছিল তাঁরা সচরাচর দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলিম-রাজ্যগুলির হিন্দু প্রজাদের মতো অমন উৎপীড়িত হতেন না।

ভারতের পশ্চিমে অপর একটি ম্নসলিম-রাজবংশশাসিত সম্নদ্ধ রাজ্য ছিল, তা হল গ্নজরাট। গ্নজরাটকে অবশ্য দাক্ষিণাত্যের অংশ বলে গণ্য করা হোত না। দিল্লীর স্নলতানশাহীর নিয্নক্ত গ্নজরাটের শাসক-প্রতিনিধি তৈম্নর লঙের হাতে দিল্লী বিধ্বস্ত হওয়ার পরেপরেই নিজেকে ঘোষণা করেন স্বাধীন স্নলতান বলে। এই স্নলতানের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ টঙ্ক বা আহ্‌মদশাহী নামে পরিচিত হয় এবং মোগলরা গ্নজরাট জয় করার আগে পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্নজরাট ছিল ভারতের সবথেকে উন্নত অঞ্চলগ্নলির একটি। কৃষকরা চাষ করতেন আখ ও নীলের; গ্নজরাটের শাদা ও ছাপা রেশম ও স্নতীবস্ত্র, মখমল ও তাফতা বা চেলিবস্ত্র ভারতের বাইরেও বহ্নলপরিচিত ছিল। গ্নজরাটের সম্নদ্ধির প্রধান উৎস ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক্যাম্বে ছিল প্রধান বন্দর। ক্যাম্বে থেকে বাণিজ্য-জাহাজগ্নলি পাড়ি দিত আরব ও লোহিত সাগর এবং পারস্য-উপসাগরের বন্দরগ্নলিতে। দক্ষিণ-প্নর্ব এশিয়ার দেশগ্নলির ও এমন কি চীনের পণ্যসামগ্রীও কেনা যেত ওই বন্দরটি থেকে। যদিও চীনের সঙ্গে গ্নজরাটের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, তব্ন কেমন করে যেন এটা সম্ভব হোত। গ্নজরাটে কালক্রমে আরবদেশী বণিকদের একটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং পারস্য-থেকে-আসা পারসিকরা সেখানে বসতি গড়ে তোলেন খ্নীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। গ্নজরাটের বন্দরগ্নলিতে, বিশেষ করে ক্যাম্বেতে, হিন্দ্ন ও ম্নসলমান বণিকদের বেশ বড় একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

গ্নজরাটের স্নলতানদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন প্রথম আহ্‌মদ শাহ্‌ (১৪১১ থেকে ১৪৪২ খ্নীস্টাব্দ) এবং প্রথম মাহ্‌ম্নদ বেগার্হা (১৪৫৮ থেকে ১৫১১ খ্নীস্টাব্দ)। আহ্‌মদ শাহ্‌ রাজ্যকে শক্তিশালী করে তোলেন এবং তাঁর রাজপ্নত প্রতিবেশী-রাজ্যগ্নলির বির্নদ্ধে সফলভাবে য্নদ্ধ চালান। যে-সমস্ত রাজপ্নত সামন্ত-ভূস্বামী কয়েক প্নর্নষ ধরে গ্নজরাটের অন্তর্গত ভূখণ্ডে বসবাস করছিলেন তাঁরাও আহ্‌মদ শাহের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হন। এই সমস্ত ভূস্বামীর অধীনে যে-পৈতৃক জমিজমা ছিল তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে রাখার অধিকার পান তাঁরা আর বাকি তিন-চতুর্থাংশ জমি স্নলতান শর্তাধীন দান হিসেবে গণ্য করেন ও রাজস্বদানের শর্ত আরোপ করেন। এইসব জমির প্রাক্তন মালিকদের অতঃপর সরকারের ফৌজে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আহ্‌মদ শাহ্‌ আহ্‌মদাবাদ শহরটিও নির্মাণ করেন ও রাজধানী স্থানান্তরিত করেন সেখানে। প্রশাসন-পরিচালন ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটান তিনি।

মাহ্‌ম্নদ বেগার্হা তাঁর আমলে রাজ্যের সীমানা আরও প্রসারিত করেন। কচ্ছ

ও কাথিয়াওয়াড়ের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন তিনি, চম্পানের রাজ্যটি জয় করেন এবং দুর্ভেদ্য বলে তৎকালে খ্যাত রাজপুতদের গির্ণার-দুর্গটি দখল করে নেন। সেনাধ্যক্ষদের যে-সমস্ত জমি দান করেন তিনি, তা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে বংশ-পরম্পরাগত ভূখণ্ড হিসেবে হস্তান্তরিত কবা হয়। তাঁর রাজত্বকালে পোর্তুগিজরা ভারতের বহু অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেন এবং আরব সাগরের জলপথের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা শুরু করে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্যদেশের বণিকদের জাহাজগুলির ওপর জলদস্যুতা চালাতে থাকেন। স্বভাবতই গুজরাট-রাজ্য এর বিরোধিতা করে। মাহ্‌মুদ বেগার্হা পোর্তুগিজদেব বিরুদ্ধে মিশরের সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি করেন। গোড়ার দিকে পরিস্থিতি মাহ্‌মুদ বেগার্হার অনুকূলেই যাচ্ছিল, কিন্তু ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগিজ রাজপ্রতিনিধি আল্‌মেইদা দিউয়ের কাছে এক নৌযুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে পর্যুদস্ত করেন মিত্রশক্তির মিলিত নৌ-বাহিনীকে। ফলে মাহ্‌মুদকে বাধ্য হতে হয় পোর্তুগিজদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে এবং ক্যাম্বে-উপসাগরের প্রবেশপথে তাঁদের একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র খুলতে দিতে। পোর্তুগিজদের নিরন্তর দস্যুবৃত্তির ফলে ক্যাম্বের বাণিজ্য-শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রাজ্য হিসেবে গুজরাটও দুর্বল হয়ে পড়ে।

বাহাদুর শাহের রাজত্বের (১৫২৬ থেকে ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দ) গোটা সময়টাই অতিবাহিত হয় নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে। ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর শাহ্‌ মালব-রাজ্য দখল করেন এবং ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে অধিকার করেন রাজপুতদের সুদৃঢ় দুর্গ চিতোর। এই যুদ্ধে রাজপুত দুর্গরক্ষী সৈন্যদলকে অসমসাহসেব সঙ্গে নেতৃত্ব দেন চিতোরের তৎকালীন নাবালক রাণার মা—রাজমাতা জওহরবাঈ। রণক্ষেত্রে তিনি নিহত হলে বালক রাণাকে কৌশলে দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর দুর্গস্থ সকল পুরুষ উৎসবের গেরুয়া বসন পরে দুর্গের বাইরে শত্রুর সঙ্গে প্রাণান্ত সংগ্রামে যোগ দেন এবং প্রত্যেকেই জীবন বিসর্জন দেন। ওদিকে দুর্গে তখনও যাঁরা রয়ে গিয়েছিলেন সেই কয়েক হাজার স্ত্রীলোক প্রাসাদের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জেবলে তাতে ঝাঁপ দিয়ে রাজপুত জওহর-ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

ইতিমধ্যে গুজরাটের ওপব পোর্তুগিজদের চাপ বৃদ্ধি পেল। ১৫৩৫ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর শাহ্‌ বাধ্য হলেন দিউতে পোর্তুগিজদের দুর্গনির্মাণের অনুমতি দিতে, বিনিময়ে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পোর্তুগিজরা তাঁকে সাহায্য করবেন এই আশ্বাস চাইলেন তিনি। কিন্তু মোগল-সেনাবাহিনী যখন গুজরাট আক্রমণ করল তখন পোর্তুগিজদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দেখা গেল না। পোর্তুগিজদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আরও আলোচনা চালাবার জন্যে বাহাদুর শাহ্‌ পোর্তুগিজ রাজপ্রতিনিধির নিজস্ব রণতরীতে গেলেন, কিন্তু সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে

তাঁকে হত্যা করা হল। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সামন্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেল গুজরাটে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে গুজরাট মোগলদের হাতে সহজেই পরাভূত হল এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল মোগল-সাম্রাজ্যের।

ভারতে পোর্তুগিজ-আমল

বহুবছর ধরেই পোর্তুগিজরা অভিযানের-পর-অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন ভারতে পেঁছনোর সমুদ্রপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য অবশেষে সফল হল যখন ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা'র জাহাজ এসে ভিড়ল ভারতের মালাবার-উপকূলের একটি ছোট রাজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র-বন্দর কালিকটে। পোর্তুগিজরা যখন আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলগুলি ধরে জাহাজ নিয়ে চলাচল করতেন তখন নানারকম কাপড়ের টুকরো, মদ, পুঁতির মালা ও এই ধরনের বেলোয়ারি নানা তুচ্ছ বস্তুর বিনিময়ে আফ্রিকার উপজাতিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন তাঁরা সোনা ও হাতির দাঁত। কিন্তু ভারতে পেঁছে পোর্তুগিজরা তাজ্জব বনে গিয়ে দেখলেন যে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্যগুলি ভারতীয়দের চোখে মোটাদাগের স্থূল হাতের কাজ বলে গণ্য হচ্ছে এবং অসম্ভব ধনী ভারতীয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের কাছে তা মোটেই ক্রয়যোগ্য বলে ঠেকছে না। পোর্তুগিজরা বুঝলেন যে ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনোকিছু পণ্যই তাঁরা বাণিজ্য করার জন্যে আনতে পারেন নি।

অপরদিকে পোর্তুগিজদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে উন্নত ধরনের, বিশেষ করে মালাবারের অনবরত যুদ্ধরত ছোট-ছোট রাজ্যগুলির যুদ্ধ-সরঞ্জামের চেয়ে তো বটেই। গোটা আফ্রিকা-মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে পোর্তুগিজদের যে-জাহাজগুলি চলাচল করত সেগুলি আয়তনে ও চলার গতির বিচারে প্রধানত উপকূলবর্তী নৌ-বাহনের উপযোগী ছোট-ছোট ভারতীয় জাহাজের চেয়ে বহুগুণে উন্নত ছিল। জাহাজী কামান, পাদানির ওপর রেখে ছোড়ার উপযোগী সেকেলে বন্দুক ও পরবর্তী কালে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের গাদা বন্দুকে সজ্জিত সুশৃঙ্খল পোর্তুগিজ বাহিনীগুলির পক্ষে কোনোই অসুবিধে হয় নি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ভারতীয় বাহিনীকে পরাস্ত করতে, কেননা ভারতীয়দের অস্ত্র বলতে ছিল একমাত্র 'ছোট-ছোট তরোয়াল ও গোলাকার ঢাল' কিংবা 'ছোট-ছোট বর্শা' (১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে আল্মেইদার নৌবহরের সঙ্গে ভারত-সফররত জনেক জার্মান বণিকের বিবরণ অনুযায়ী)। এর অর্থ, পোর্তুগিজরা যদিও বাণিজ্যের জন্যে ভারতীয়দের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রণ্যদ্রব্য আনতে পারেন নি, তবু গায়ের জোরে ভারতীয় পণ্য কেড়ে নেবার মতো ক্ষমতা ছিল তাঁদের। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের সমুদ্রগুলিতে আধিপত্যবিস্তার করা, তাই এই উদ্দেশ্যসাধনে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের

নির্মমভাবে উৎখাত করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না তাঁরা। প্রতিযোগী প্রাচ্যদেশীয় বণিকদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি এবং ভারত, আরব ও আফ্রিকার বন্দরগুলিতে যেখানেই ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা চলত সেই সমস্ত জায়গাই ছিল তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য। মালাবারের রাজ্যগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার অভাবের সুযোগে পোর্তুগিজরা তাঁদের অবস্থানকে দৃঢ় করে তোলেন—বিভিন্ন রাজ্যকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূখণ্ডের সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে পরস্পর-রেষারেষি বাড়িয়ে তুলে। যখনই চেষ্টা হয়েছে তাঁদের বাধা দেয়ার তখনই পোর্তুগিজরা তার জবাব দিয়েছেন সমুদ্র-বন্দর ও উপকূলবর্তী গ্রামগুলির ওপর জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করে, আর তারপর তীরে সৈন্য নামিয়ে বেপরোয়া লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নরহত্যা করে, তাল ও নারিকেল বাগানগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে ও যা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না-পেরেছেন তা ধ্বংস করে দিয়ে।

ভারতে তাঁর প্রথমবার আগমনের সময় ভাস্‌কো-ডা-গামা নিজেই ভারতীয় বন্দরগুলির ওপর গোলাবর্ষণ করে যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেন। এর পরবর্তী পোর্তুগিজ ফৌজী অভিযানগুলি কাব্রাল (১৫০০ খ্রীস্টাব্দে), ভাস্‌কো-ডা-গামা (১৫০২ খ্রীস্টাব্দে) ও দ্য আল্‌বুকোয়ের্কের (১৫১০ থেকে ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে) নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং তা পোর্তুগিজদের পক্ষে সম্ভব করে তোলে ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী কয়েকটি মৌল গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বিজাপুর-রাজ্যের অধীনস্থ গোয়াদ্বীপটি দখল করা। এই গোয়াই পরে প্রাচ্যদেশে পোর্তুগিজ-দখলীকৃত অঞ্চলগুলির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। পোর্তুগিজদের দুর্গগুলি তখন মালার মতো ছড়িয়ে ছিল ওর্‌মুজ থেকে পারস্য-উপসাগরের তীর-বরাবর, তারপর আরবদেশ ও আফ্রিকার সমুদ্রতীর-বরাবর, ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব-উপকূল ধরে, সিংহলে, মলাক্কা-প্রণালীতে, মলুক্কার দ্বীপগুলিতে, এখন যাকে থাইল্যান্ড বলা হয় সেই অঞ্চলে এবং এমন কি সুদূর চীন পর্যন্ত। এই দুর্গগুলি ছিল পোর্তুগিজ জাহাজগুলির পক্ষে মেরামতির জায়গা, প্রতি বছর পোর্তুগালে যা পাঠানো হোত সেই নানাবিধ পণ্যের (বিশেষ করে মশলা ও সুতী কাপড়ের) সুনির্ভরযোগ্য ও সুরক্ষিত ভাণ্ডার এবং পোর্তুগিজ সৈন্যদলের সুরক্ষিত ঘাঁটি। পোর্তুগিজ সৈন্যবাহিনী অবশ্য ভারতের অভ্যন্তর-অঞ্চলে বিশেষ অনুপ্রবেশে সমর্থ হয় নি। তাঁদের অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলগুলিতে পোর্তুগিজরা স্থানীয় জনসাধারণকে শোষণ করতেন নিষ্ঠুরভাবে, যদিও গোয়ার কাছাকাছি দখলীকৃত গ্রামগুলিতে তাঁরা গ্রামীণ সমাজগুলিকে টিকিয়ে রাখারই চেষ্টা করতেন। ধর্মের ব্যাপারে পোর্তুগিজদের অসহিষ্ণুতা (তাঁরা স্থানীয় হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করে ফেলেন এবং ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে গোয়ার যে-ধর্মীয় বিচারসভা স্থাপন করেন তা

ধর্মদ্বেষীদের বিচারের নামে নিষ্ঠুর উৎপীড়ন শুরু করে দেয়) স্থানীয় অধিবাসীদের অনেককেই খেপিয়ে তোলে।

ভারতের নিকটবর্তী সমুদ্রগুলিতে পোর্তুগিজদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সু-প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক যোগাযোগের গুরুতর ক্ষতিসাধন করে এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলির সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এইভাবে ভারতের বিকাশেই বাধা দেয় পোর্তুগিজ আধিপত্য। মালাবারের উপকূল-বরাবর অনবরত বিধ্বংসী যুদ্ধ-বিগ্রহ, বন্দরগুলির ধ্বংসসাধন ও স্থানীয় জনসংখ্যাকে বিনষ্ট করে দেয়ার ফলে পরবর্তী দীর্ঘকালের মতো এই অঞ্চলটির বিকাশ বহুগুণে শ্লথ হয়ে পড়ে এবং এর ফলে বহুদিন ধরে অঞ্চলটিতে টিকে থাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের আদিম রূপ। উপরোক্ত এইসব কারণে গুজরাট-রাজ্যটিও রীতিমতো দুর্বল হয়ে পড়ে।

পোর্তুগিজ এবং স্থানীয় ভারতীয় সেনাবাহিনীগুলির মধ্যে উপরোক্ত এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ও পোর্তুগিজদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রের দৌলতে তাঁরা-যে কেবল তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি রক্ষা করতেই সমর্থ হলেন তা নয়, তারা আরও কিছু-কিছু বিস্তৃতিসাধনেও সমর্থ হলেন। কিন্তু যখন ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে ওলন্দাজ জাহাজগুলির আবির্ভাব ঘটায় সমুদ্রপথে পোর্তুগিজদের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটল, তখন আর পোর্তুগিজরা স্থানীয় ভারতীয় রাজাদের সৈন্যদলগুলির বিরুদ্ধে এ'টে উঠতে সমর্থ হলেন না। ভারতীয় সেনাদল তখন একের-পর-এক ফিরে-ফিরতি জয় করে নিতে লাগল পোর্তুগিজদের দখলীকৃত এলাকাগুলি।

বিজয়নগর

একদিকে বাহ্মনি-রাজ্য যখন প্রবল হয়ে উঠছিল তখন অপরদিকে রাজ্যটির দক্ষিণে বিশিষ্ট চেহারা নিচ্ছিল অপর কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যও। এদের মধ্যে দুটি রাজ্যের নাম করতে হলে বলতে হয় মাদুরার সুলতানশাহী ও রেড্ডি-বংশীয় রাজ্যের কথা। এর অল্পদিনের মধ্যে কাম্পিলি শাসনের জন্যে মুহম্মদ বিন তুঘলকের নিযুক্ত দুই শাসক-প্রতিনিধি ও সঙ্গম-রাজবংশের দুই ভাই হরিহর ও বুক্ক ছোট্ট একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেন। তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে তাঁরা শক্তিশালী বিজয়নগর দুর্গটি নির্মাণ করলেন এবং ক্রমে-ক্রমে মন দিলেন তাঁদের অধীনস্থ ভূখণ্ডের বিস্তারসাধনে। ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হোয়সল-রাজ্য তাঁদের হস্তগত হয়ে গেল এবং পরের বছর হস্তগত হল বনবাসীর কদম্ব-বংশের শাসিত রাজ্যটিও। অতঃপর ১৩৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তাঁদের অধীন হল উত্তর তামিলনাড়ুর

শম্বুভার্য-রাজ্যটি এবং পরবর্তী সত্তরের দশকে মাদুরার সুলতানশাহীও। এরপর রেড্ডি-বংশীয় রাজারা তাঁদের ভূখণ্ডের একাংশ বিজয়নগরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন এবং পরে, ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে, পুরোপুরিই ধ্বংস হয়ে গেল ওই রাজ্যটি। এইভাবে ১৩৭০'এর দশক নাগাদ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হল। পরে অবশ্য বিজয়নগরকে বাহ্‌মনি-সুলতানশাহীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল এবং ওই সুলতানশাহীর অবক্ষয় ও পতনের পর যুদ্ধ করে যেতে হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গেও। তবে প্রায় দু'শো বছর ধরে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বিজয়নগর-রাজ্যের সীমানা কিন্তু আগে যেখানে ছিল কার্যত সেখানেই থেকে গিয়েছিল।

১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে সামন্ত-ভূস্বামীদের বিদ্রোহ এবং বিজয়নগরের ভূখণ্ডে বাহ্‌মনি-রাজ্যের ও ওড়িষ্যার শাসকের সৈন্যদলের বিজয়-অভিযানের পরে-পরেই বিজয়নগরের এক সেনাপতি সঙ্গম-রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। রাজ্যাভিষেকের সময় নরসিম্‌হ সলুভা উপাধি নিয়ে অতঃপর এই সেনাপতি সিংহাসনে বসলেন। বিজয়নগরের হস্তচ্যুত ভূভাগের বড় একটি অংশই ফিরেফিরতি জয় করে নিতে সক্ষম হন তিনি। তবে নরসিম্‌হর ছেলেদের রাজত্বকালে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, কারণ ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে সেনাপতি বীর নরসিম্‌হ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হন ও তুলুভ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

বীর নরসিম্‌হের ভাই কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে (১৫০৯ থেকে ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগর-সাম্রাজ্য শক্তি ও সমৃদ্ধির তুঙ্গে ওঠে। কৃষ্ণদেব রায় রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগগুলিতে অদলবদল ঘটিয়ে তার উন্নতিবিধান করেন এবং উন্নতি ঘটান অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রশাসন পরিচালনার। রাজকার্যের পুরস্কার হিসেবে প্রদত্ত জমির রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ধার্য করেন নতুন উচ্চতর করের হার। পোর্তুগিজদের সঙ্গে বন্ধু-সম্পর্ক স্থাপনের পর কৃষ্ণদেব রায় তাঁদের সাহায্যে পারস্য ও আরব থেকে ঘোড়া আমদানি করতে শুরু করেন, অপরদিকে পোর্তুগিজ-কর্তৃপক্ষ দাক্ষিণাত্যের সুলতানশাহীগুলিতে এই ঘোড়া আমদানির ব্যাপারে আরোপ করেন নানা বিধিনিষেধ। এর ফলে বিজয়নগর একটার-পর-একটা যুদ্ধে জয়লাভ করতে থাকে, এটা বিশেষ করে ঘটে ওই সময়ে অশ্বারোহী-বাহিনীগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনীগুলির মেরুদণ্ডস্বরূপ হয়ে ওঠায়। ইতিপূর্বে ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ইসলাম-ধর্মাবলম্বী অন্যান্য বন্ধুদেশ — যেমন আরব ও পারস্য — থেকে ঘোড়া আমদানির পথে কোনোই অসুবিধে ছিল না। কিন্তু তখন ভারত মহাসাগর ও পারস্য-উপসাগরে পোর্তুগিজ নৌ-শক্তির আবির্ভাবের ফলে বদলে গিয়েছিল সবকিছু, অতঃপর পোর্তুগিজদের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছিল

ভারতের কোন-কোন রাজ্যকে সমুদ্রপার থেকে ঘোড়া আমদানি করতে দেয়া হবে।

বেশ কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও বিজয়নগর-সাম্রাজ্য দক্ষিণ-ভারতের পূর্ববর্তী রাজ্যগুলির চেয়ে ছিল অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন। সাম্রাজ্যের অধিপতি 'মহারাজা' নামে পরিচিত হলেও প্রায়শই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত রাজ্যের মন্ত্রী বা 'মহাপ্রধান'এর হাতে। 'মহারাজা'র অধীনে থাকত প্রকাণ্ড এক রাষ্ট্র-পরিষদ, তাতে সভাসদরা ছাড়াও সদস্য হিসেবে থাকতেন প্রধান-প্রধান সামন্ত-ভূস্বামী ও বণিক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সরাসরি দায়ী থাকতেন 'মহাপ্রধান'এর কাছে। এই শাসনকর্তাদের সাধারণত দুই বা তিন বছর পরপর বদলানো হোত, রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়াকলাপের বিপদ এড়ানোর জন্যে করা হোত এটা। এই শাসনকর্তাদের কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় তালুকগুলি থেকে খাজনা আদায় করে তা রাজকোষে জমা দেয়া এবং সামন্ততান্ত্রিক 'অমরনায়ক' ভূস্বামী ও সামন্ত-রাজন্যবর্গের কাছ থেকে রাজকর আদায় করা। আদায়ীকৃত ভূমি-রাজস্বের অল্প-একটু অংশ তাঁদেরও প্রাপ্য হোত। রাজ্যের প্রদেশগুলিকে তখন ভাগ করা হয়েছিল একেকজন রাজকর্মচারির শাসনাধীনে কয়েকটি করে জেলায়।

কিছু-কিছু শর্তাধীনে রাষ্ট্রীয় জমি দান করা হোত যোদ্ধাদের, তাঁদের রাজসেবার বিনিময়ে পুরস্কারস্বরূপ। 'অমরনায়ক'দের সঙ্গে 'ইক্‌তাদার'দের প্রভেদ ছিল এইখানে যে 'অমরনায়ক'রা নিজেরাই কৃষকদের ওপর ধার্য রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিতে পারতেন, এছাড়া জমি হস্তান্তরকরণেরও অধিকার ছিল তাঁদের। 'অমরনায়ক'রা নিজেরা যে-রাজকর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন তার সঙ্গে কৃষকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের রাজকরের পরিমাণ নির্ভর করত রাজসভায় তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাবের ওপর। সচরাচর 'অমরনায়ক'রা তাঁদের তালুক থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ রাজকোষে জমা দিতেন, সৈন্যবাহিনী পোষণের যাবতীয় খরচখরচা তা থেকে বাদ দেয়ার পরেই। তবে 'অমরনায়ক'রা এ-বাবদেও খরচ কমাতেন এবং ক্রমশ তাঁরা অনেক কম সংখ্যায় পদাতিক ও অশ্বারোহী-সৈন্য নিযুক্ত করতে শুরু করেন। নীতিগতভাবে 'অমরনায়ক'রা তাঁদের ভূসম্পত্তি বংশ-পরম্পরায় ভোগ দখল করার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিজয়নগরের গোটা ইতিহাস জুড়ে এই সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রায়শই একেকটি ভূস্বামী-পরিবারের দখলে আগাগোড়া থেকে যেতে দেখা গিয়েছিল। 'অমরনায়ক'দের সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ছোট-ছোট সৈন্যদলের অধিনায়করাও হয় 'অমরনায়ক'দের কাছ থেকে আর নয়তো খোদ রাজার কাছ থেকে দান হিসেবে জমি পেতেন। এই সমস্ত জমি সর্বদাই পিতার কাছ থেকে পুত্রে অর্শাত।

প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির মালিকদের মধ্যে ওই সময়ে মন্দিরগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণত সেগুলি হয়ে দাঁড়াত আশপাশের বিশাল একেকটা এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক একেকটি কেন্দ্র। আনুষ্ঠানিক পুজা-পার্বণ উপলক্ষে তীর্থযাত্রীরা ভিড় করে আসতেন মন্দিরগুলিতে, তখন মন্দিরের আশেপাশে মেলাও বসে যেত। কারুশিল্পী ও বণিকরা মন্দিরের কাছাকাছি বাস করতেন এবং মন্দিরগুলিও কখনও-কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে ও মহাজনী কারবারে নেমে পড়ত। কিছু-কিছু কারুশিল্পী সরাসরি মন্দির-সংক্রান্ত নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রীতে বেতন পেতেন তাঁরা, উপরন্তু মন্দিরের দেবত্র জমিরও একেক টুকরো লভ্য হোত তাঁদের। কার্যক্ষেত্রে এইসব জমি বংশানুক্রমে ভোগদখল করা চলত, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সেবার কাজটিও হোত বংশানুক্রমিক। মন্দিরগুলি ছিল শাসকশ্রেণীর ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের একটি অংশ: সেগুলি ঊর্ধ্বতন সামন্ত-ভূস্বামীকে কর দিত, আবার সেগুলিরও ছিল নিজ-নিজ অনুগত ভূস্বামী—যাঁরা বাধ্য থাকতেন বিদেশী সেনাবাহিনী বা দস্যুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লোকবল যুগিয়ে মন্দির রক্ষা করতে।

গ্রামগুলির একটা প্রধান অংশই ছিল ব্রাহ্মণ-'সভা'গুলির কর্তৃত্বাধীন। প্রায়শই এই ব্রাহ্মণরা কর্তৃত্ব করতেন খুবই ছোট-ছোট জমির ওপর, কেননা একেকটি গ্রাম এমন কি এক শো জন পর্যন্ত ব্রাহ্মণের এক্তিয়ারভূক্ত হতে পারত। তা সত্ত্বেও এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী, কেননা এঁদের হয়ে জমি চাষ করে দিতেন ভাড়াটিয়া প্রজা কিংবা অস্পৃশ্য জাতির লোকজন। এই খেত-মজুরদের ব্রাহ্মণেরা ভূমিদাসের চেয়ে বেশিকিছু মনে করতেন না।

পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক বড়-বড় গ্রামীণ সমাজ ইতিমধ্যে ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সাধারণভাবে এখন সেগুলি একেকটি গ্রামের জমিজায়গার ভিত্তিতেই গঠিত ছিল। আবাদী জমিগুলি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল, পতিত জমিগুলিই ছিল কেবল গ্রামীণ সমাজের যৌথ সম্পত্তি এবং নিষ্কর। তামিলনাড়ুতে জলসেচের ব্যবস্থাযুক্ত প্রচুর জমি ছিল এবং প্রায়শই সেগুলিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হোত সুরতি বা লটারির সাহায্যে, কেননা অপেক্ষাকৃত খরার বছরে উঁচু ডাঙাজমিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে জল পেত না।

'অমরনায়ক'রা তাঁদের আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণবৃদ্ধির চেষ্টা করতেন, ফলে খাজনার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিদ্ধান্ত করা হয় যে দেয় সকল আদায় দিতে হবে মুদ্রায়। এর ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত উৎকীর্ণ লিপিগুলি দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, কিছু-কিছু গ্রামীণ সমাজ তখন গ্রামের জমির একাংশ বিক্রি করে দিতে কিংবা সরাসরি বাস উঠিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ওই

সময়ে সমাজের সদস্যরাও তাঁদের পূর্ব-অধিকার হারাতে শুরু করেছিলেন। 'অমরনায়ক'রা গ্রামের মোড়ল ও পুঁথি-লেখক নিযুক্ত করতেন। গ্রামীণ সমাজের সদস্যের ('কন্যাচি'র) সম্পত্তিতে সত্যিকার অধিকার ক্রমশ বেশি-বেশি করে এই তথ্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল যে এমন কি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও জমিতে তাঁর অধিকার তিনি ফিরে পেতে পারেন। গ্রামীণ সমাজের বিপুলসংখ্যক সদস্য অল্পকালের মধ্যেই পরিণত হলেন মালিকের ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়া প্রজায় ('পায়াকারি'তে) যাঁরা ফসলের একটা অংশের বিনিময়ে জমিচাষ করতেন। এই 'পায়াকারি'রা প্রায়ই ভূস্বামীর কাছে ঋণে আবদ্ধ থাকতেন এবং যে-জমিতে তাঁরা চাষ-আবাদ করতেন তা যখন হস্তান্তরিত হয়ে যেত তখন ভূমিদাসদের মতো তাঁরাও নতুন ভূস্বামীর প্রজায় পরিণত হতেন। অবস্থার এই অবনতির ফলে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিত সময়ে-সময়ে। কৃষকদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁদের এই প্রতিবাদ প্রকাশ পেত সাধারণত, তবে ১৩৭৯, ১৫০৬ ও ১৫৫১ খ্রীস্টাব্দে বড়-বড় কৃষক-বিদ্রোহ দমনের উল্লেখও পাওয়া যায়।

সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের ক্ষমতা নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরগুলিতেও। শহরগুলির প্রশাসন এখন পরিচালনা করতেন কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত-করা শাসনকর্তারা (ইতিপূর্বে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতির লোকজনকে নিয়ে গঠিত নগর-পরিষদগুলির পরিবর্তে) এবং সমুদ্র-বন্দর ও বাজারগুলির দেয় শুল্ক নির্ধারণ ও তা আদায়ের ভার নিয়েছিলেন সামন্ত-ভূস্বামী ও কুসীদজীবী মহাজনরা। বিজয়নগর-রাজ্যে এই সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ ধনী হয়ে ওঠেন তাঁরা। রাজ্যের রাজধানী তখন বহিরাগত পর্যটকদের তাক লাগিয়ে দিত তার বিপুল আয়তন, শহরের চারিপাশে সাতটি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দুর্গপ্রাকার, তার বিশাল জনসংখ্যা, বাজার ও মণিকারদের মহল্লাগুলির ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং আমোদপ্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা দিয়ে। অন্যদিকে, পোর্তুগিজ ইতিহাসবেত্তা নুনিশের ভাষায়, কৃষকরা বাধ্য হচ্ছিলেন তাঁদের উৎপন্ন ফসলের নয়-দশমাংশ 'অমরনায়ক'দের দিতে আর 'অমরনায়ক'রা রাজাকে দিচ্ছিলেন তাঁদের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক। মনে হয়, নুনিশ এখানে কৃষক বলতে 'পায়াকারি'দেরই বুঝিয়েছেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর ফের একবার সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠল। তবে এবার সংঘর্ষ বাধল কৃষ্ণদেব রায়ের ভাই রাজা অচ্যুত (১৫৩০ থেকে ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দ) এবং মন্ত্রী রাম রায়ের মধ্যে এবং দেখতে-দেখতে তা রূপ নিল দুটি সামন্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে মারাত্মক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। অচ্যুতের মৃত্যুর পর রাম রায় অচ্যুতের ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিবকে সিংহাসনে বসালেন বটে, তবে কার্যত তিনি

নিজেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বসলেন। অতঃপর বিজয়নগর-রাজ্য একের-পর-এক দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে লাগল এবং অনবরত অপর প্রতিপক্ষীয় রাজ্যগুলিতে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে যেতে লাগল। এর প্রতিক্রিয়ায় দাক্ষিণাত্যের সুলতানশাহীগুলি বিজয়নগরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে নামল এবং ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে রাম রায়ের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করল। রাজধানী বিজয়নগরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল শত্রু-বাহিনীগুলি।

তালিকোটার যুদ্ধের পর বিজয়নগর-রাজ্যের পতন শুরু হল দ্রুতগতিতে। সপ্তদশ শতকের সূচনা নাগাদ এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিণত হল ছোট্ট একটি রাজ্যে, যার রাজধানী ছিল পেনুকোণ্ডায়। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন সামন্ত-রাজ্যগুলি— যেমন, মাদুরা, তাঞ্জোর, জিঞ্জি, ইক্কেরি (বা বেদনোর), ইত্যাদি ইতিমধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এই সময়ে নতুন একটি রাজ্যও গড়ে উঠল, তার নাম মহীশূর।

রাম রায়ের ভাই তিরুমল অতঃপর নিজেকে বিজয়নগরের রাজা বলে ঘোষণা করেন। ইনিই বিজয়নগরের শেষ রাজবংশ অরবিদু-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশের সবচেয়ে উল্লেখ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ভেঙ্কট (১৫৮৬ থেকে ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দ)। ইনি প্রায় পূর্ববর্তী আকারে সাম্রাজ্যেব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। তবে এঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন দাবিদারের মধ্যে এক দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, যাতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিও যোগ দেয়। ফলে সম্প্রতি পুনরর্জিত ভূখণ্ডগুলি ফের একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে সমর্থ হয়। দীর্ঘ সংঘর্ষের পর সিংহাসন অধিকার করেন দ্বিতীয় রাম (১৬১৪ থেকে ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁকে রাজা হিসেবে গোটা জীবনটাই ব্যয় করতে হয় মাদুরা-রাজ্যের বিরুদ্ধে বহুবার সংগ্রামে এবং তাঁর অধীনস্থ সামন্ত-রাজ্যগুলির বিদ্রোহদমনের কাজে। রাজা দ্বিতীয় শ্রীরঙ্গমের রাজত্বকালে (১৬৪২ থেকে ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দ) একদার বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড বিভক্ত হয়ে যায় বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা-রাজ্যে। আর সাম্রাজ্যের প্রাক্তন নৃপতি পালা করে তাঁর জীবন কাটিয়ে দেন এই দুই প্রাক্তন সামন্ত-রাজ্যের রাজসভায়, অপদার্থ পরোপজীবী হিসেবে।

ত্রয়োদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক অবস্থা

ধর্ম

দিল্লীতে সুলতানশাহী প্রতিষ্ঠার পর ভারত তথাকথিত মুসলিম জগতের সাংস্কৃতিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। সিন্ধুদেশে ইসলাম-ধর্মের ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ শুরু হয় সপ্তম শতাব্দীতে আর উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে তা শুরু

হয় নবম শতাব্দীতে। তবে দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর তা চাপিয়ে দেয়া হয় গায়ের জোরে। হিন্দু অধিবাসীদের বিভিন্ন অংশ এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়, তার মধ্যে ছোট একটি অংশ বলপ্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে আর অন্যেরা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবার আশায়—কেননা একমাত্র মুসলিম-ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেই সম্ভব ছিল তখন রাজসরকারে উচ্চপদ পাওয়া। এছাড়া তৃতীয় একটি অংশ এই পথ অবলম্বন করে অ-মুসলমানদের ওপর মাথাপিছু-ধার্য কর ('মাথট') বা 'জিজিয়া' এড়িয়ে যাওয়ার উপায় হিসেবে এবং চতুর্থত নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরকরণ মেনে নেন হিন্দুসমাজে তাদের সামাজিক অবস্থানের অসুবিধাগুলি এড়িয়ে যাওয়ার আশায়।

নতুন ভারত-বিজেতারা একাই সেদেশে আসেন নি। শিগ্‌গিরই তাদের পিছুপিছু ভারতে এসে উপস্থিত হলেন তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও স্ব-উপজাতির লোকজন। অন্যান্য দেশ থেকে মুসলিম ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও কবিরাও এসে সমবেত হলেন ভারতীয় সুলতানদের দরবারগুলিতে। এর ফলে ভারতে মুসলিম-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেল এবং দেশের কিছু-কিছু অঞ্চলে (যেমন, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের পরে বহুসংখ্যক প্রাক্তন বৌদ্ধ এই নতুন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন) মুসলমানরাই পরিণত হলেন জনসংখ্যার অধিকাংশয়। তবে অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য এইখানে যে ভারতে মুসলিম-ধর্ম আগাগোড়া দুটি প্রধান ধর্মের একটি হয়ে থেকেছে, দেশের একমাত্র ধর্ম হয়ে ওঠে নি কখনোই। দিল্লীর সুলতানশাহী-আমলের শেষদিকে মুসলমানরা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই শাসক-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন। দিল্লীর সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্য ছিলেন মুসলমান, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও শহরের প্রশাসকদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ছিল তা-ই। অপরদিকে হিন্দুরা তখনও পর্যন্ত ছিলেন খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হয়ে এবং তাঁরাই ছিলেন বণিক ও কুসীদজীবী মহাজনদের প্রধান অংশ। সাধারণভাবে কৃষককুলের প্রায় সকলেই থেকে গিয়েছিলেন হিন্দু।

দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বারেবারে মারাত্মক সংঘর্ষ বেধে ওঠা সত্ত্বেও একই দেশের মাটিতে দীর্ঘ কয়েক শো বছরের সহ-অবস্থানের ফলে দুটি সম্প্রদায়ের ওপর পারস্পরিক প্রভাববিস্তার এবং ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সংমিশ্রণও ঘটে। ভারতীয় মুসলমানরা জাতিভেদ-প্রথাকে গ্রহণ করে নেন ও লৌকিক দেবদেবীকে মানতে শুরু করেন, ফলত শেষপর্যন্ত তাঁরা এমন সব দেবদেবীর পুজো শুরু করেন যাঁদের মুসলমানরা আগে কখনও মান্য করতেন না। তাঁরা যোগ-দর্শনেরও কিছু-কিছু দিক গ্রহণ করে নেন, হিন্দুদের উৎসবগুলিতে

যোগ দিতে শুরু করেন, ফলে ভারতীয় পটভূমিতে ইসলাম-ধর্ম এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে। অপরপক্ষে হিন্দুরা প্রভাবিত হন মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের ধ্যানধারণায়, 'সুফী'-সম্প্রদায়গুলির জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির পক্ষে বহুবিধ পথের অস্তিত্ব-সম্পর্কিত 'সুফী'-মতবাদও প্রভাবিত করে তাঁদের। এমন কি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দেখা যাচ্ছে মুসলিম ধর্মনায়করা জনসাধারণের মধ্যে বিষ্ণুর 'অবতার' রামের সঙ্গে রহিমকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এক বিশেষণ—পরম করুণাময়কে) গুলিয়ে ফেলার ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছেন। ইসলাম-ধর্ম কেন-যে ভারতে 'সুফী'-মতবাদের আবরণে জনমনে শিকড় গেড়েছিল তা বোঝা শক্ত নয়, কেননা এই অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যানধারণা সত্যিকার রক্ষণশীল মুসলিম ধ্যানধারণার সঙ্গে খাপ খায় না এমন সব চিন্তাধারাকে ইসলাম-ধর্মে অন্তর্ভুক্তির পথ পরিষ্কার করেছিল।

গোটা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী জুড়ে 'উলেমা'দের সঙ্গে 'সুফী'দের ধর্ম নিয়ে বিরোধ চলেছিল। 'উলেমা'রা ছিলেন ইসলামের কোরানসম্মত আপসবিরোধী ধ্যানধারণার বাহক মুসলিম ধর্মগুরু, আর 'সুফী'দের অধিকাংশই কোরানের পণ্ডিতী ব্যাখ্যার চেয়ে প্রাধান্য দিতেন 'সুফী'-সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মিক গুরুর পদে উন্নীত শেখদের দিব্য-উপলব্ধি-কেই। 'সুফী'দের মধ্যেই কিছু-কিছু সম্প্রদায় (যেমন, চিস্তিয়া ও ফিরদৌসী-সম্প্রদায় দুটি) এমন সমস্ত ধ্যানধারণা ও আচার-পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন যেগুলি ছিল হিন্দুধর্মের ধ্যানধারণা ও আচার-বিচারের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী, আবার অন্যেরা (এদের মধ্যে ছিল শাত্তারিয়া ও সোহ্‌রাবর্দী-সম্প্রদায় দুটি) ভারতীয় ইসলাম-ধর্মে সংযোজিত 'নতুন উদ্ভাবনাগুলি'র ছিলেন ঘোরতর বিরোধী।

অন্যান্য ইসলামী দেশের মুসলিম ধর্মগুরুরা মতাদর্শগত যে-সমস্ত কলহে লিপ্ত ছিলেন ভারতীয় মুসলিম সমাজকেও তা প্রভাবিত করেছিল। ওই যুগপর্বের সবচেয়ে প্রখ্যাত 'সুফী' শেখদের মধ্যে ছিলেন: নিজামউদ্দিন আউলিয়া (মৃত্যু—১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে)—হিন্দুদের প্রতি সহনশীলতা ও অনুসারীদের কাছ থেকে উচ্চ নৈতিক আদর্শের অবলম্বন দাবি করার জন্যে পরিচিত ছিলেন যিনি; আলাউদ্দৌলা সিম্‌নানি (১২৬১ থেকে ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দ)—যিনি অপরপক্ষে সুন্নি-মতের ধ্যানধারণাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে থাকার জন্যে 'সুফী'দের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন; শরাফউদ্দিন আহ্‌মদ মানেরি—চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত ধর্ম-সংক্রান্ত চিঠিপত্রের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন যিনি। এইসব চিঠিতে মুসলিম সমাজে তৎকালে-অনুপ্রবিষ্ট হিন্দু-রীতিনীতি সম্পর্কে সহনশীলতার পরিচয় দেন তিনি এবং শেখদের ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করেন যে অধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুদের প্রথমত ও প্রধানত

পার্থিব ভোগসুখ বর্জন করতে হবে; ফরিদউদ্দিন গঞ্জ-ই-শাকার (১১৭৫ থেকে ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দ)—যিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত 'সুফী'দের অনুসৃত অতীন্দ্রিয় অনুশাসন-বাক্যগুলি অনুবাদ করেন হিন্দি ভাষায়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত 'সুফী'রা ধর্মীয় সঙ্গীত গান করা ও নাচের মধ্যে দিয়ে ভাবসমাধির অবস্থায় পেঁছতেন। ফরিদউদ্দিন বিখ্যাত ছিলেন তাঁর মৃদুস্বভাব ও মানবিকতার জন্যে (তিনি বলতেন: 'ছুরির চেয়ে ছুঁচ ভালো, কেননা ছুঁচ সবকিছু সেলাই করে জোড়া দেয়, আর ছুরি টুকরো-টুকরো করে দেয় সবকিছু কেটে।'), তবে 'আদি গ্রন্থ' নামে শেখদের পূত রচনাবলীর সংকলন-গ্রন্থে যে-বয়েতগুলি ফরিদউদ্দিনের রচিত বলে পরিচিত তা অনেক পরে রচিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। এই একই রকম সন্দেহের কারণ ঘটায় সেইস্তান থেকে ভারতে আগত মৈনউদ্দিন চিস্তির (১১৪১ থেকে ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দ) লিপিবদ্ধ জীবনী ও শিক্ষাবলী।

হিন্দু ও ইসলামী ভাবধারার পরস্পরের সমীপবর্তী হওয়ার এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে অনুভব করা যায় 'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের শেষের দিককার পর্যায়গুলিতে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নিপীড়িত স্তরগুলির (বিশেষ করে শহরাঞ্চলের বণিক ও কারিগর সম্প্রদায়গুলির) এই আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অসন্তোষ প্রকাশের ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয় এক মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম ও ইসলাম-ধর্মের মধ্যেকার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যিয়ানার পরিবর্তে 'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা প্রচার করেন এক ও অদ্বিতীয় এক ঈশ্বরের ধারণা এবং বলেন যে এই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা নিবেদন করা ধর্মীয় আচার-বিচারের চেয়ে বহুগুণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও যে-কোনো জাতি, বর্ণ বা ধর্মবিশ্বাসের প্রতিটি মানুষের পক্ষে এই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব। ঈশ্বরের সমীপে সকল মানুষই তুল্যমূল্য 'ভক্তি'বাদের প্রচারিত এই নীতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সামাজিক সাম্যের আদর্শ, ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মমতের ধ্বজাধারীদের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের সুবিধাভোগী আধিপত্য ও হিন্দুদের জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তির প্রতিফলন। স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন হিন্দুরা। তবে আন্দোলনটির কিছু-কিছু বিশিষ্ট প্রবক্তা এসেছিলেন মুসলিম সমাজ থেকেও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে 'ভক্তি'বাদের অধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুরা কেবলমাত্র হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই নয় মুসলমানদের উদ্দেশ্যেও শিক্ষাপ্রচার করেছিলেন । তাঁরা শিক্ষাপ্রচার করেছিলেন বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গানের মধ্যে দিয়ে। এই গানগুলি গাওয়া হোত শ্রোতৃবৃন্দের পরিচিত নানা জনপ্রিয় সুরে। এই রকম বোধগম্য ধরনে প্রচারিত হওয়ায়

'ভক্তি'বাদের ধ্যানধারণাগুলি জনসাধারণের ব্যাপক ও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং গানগুলি প্রায়ই লোকগীতিতে পরিণত হয়। এটা সম্ভব হয় বিশেষ করে আরও এই কারণে যে 'ভক্তি'বাদী প্রচারকেরা তাঁদের ধর্মীয় তত্ত্বকথাগুলি ব্যাখ্যা করতেন প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনের ঘটনা থেকে নেয়া নীতিগর্ভ রূপক-কাহিনীর ঢঙে এবং মানুষের ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধনাকে বর্ণনা করতেন প্রেমিকার জন্যে প্রেমিকের মিলনাকাঙ্ক্ষার রূপকল্পে। 'ভক্তি'বাদী আন্দোলন ক্রমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তবে এ-আন্দোলনের কোনো একটি সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কেন্দ্র ছিল না।

'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তার করেন কবীর (আনুমানিক ১৩৮০ থেকে ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দ)। কবীর ছিলেন মুসলমান তাঁতি বা জোলা। তিনি তাঁর গানগুলি লিখেছেন ব্রজবুলিতে (একটি আঞ্চলিক কথ্য ভাষা, যা পরে আধুনিক হিন্দি ভাষার অন্যতম ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়)। কবীর প্রচার করতেন যে ঈশ্বর রামও নন আল্লাহ্‌ও নন, তিনি আছেন প্রতিটি মানুষের অন্তরে এবং তিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ চান না, চান মানুষে-মানুষে মৈত্রী। পঞ্চদশ শতকে মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুর শহরটি 'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ওই শহরে এক হিন্দু দর্জির ছেলে নামদেব জাতিভেদ-প্রথার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ষোড়শ শতকের সূচনায় 'সৎপন্থ্' (বা সঠিক পথ) নামে এক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে, এই সম্প্রদায়টি ব্যাপক জনসমর্থন ও অনুসারী লাভ করে গুজরাটে, সিন্ধু ও পঞ্জাবে। এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা ঐশ্বর্য-বিলাসের নিন্দা করতেন এবং প্রচার করতেন পরিশ্রম ও সততার মূল্য। সামাজিক পদমর্যাদা-নির্বিশেষে সকল মানুষকে এঁরা সম্প্রদায়ভুক্ত হতে সাদর আহ্বান জানাতেন। ইতিমধ্যে পঞ্জাবে উদ্ভব ঘটল শিখ (বা শিষ্য)-সম্প্রদায়ের। শিখ-ধর্মান্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নানক (১৪৬৯ থেকে ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ) নামে জনেক হিন্দু ও লাহোরের এক শস্যবিক্রেতা বণিক। তাঁর শিষ্যদের দলভুক্ত হলেন বণিক ও কারুশিল্পী ছাড়াও জাট-জাতির কৃষকেরা। জাতিভেদ-প্রথার ফলে সৃষ্ট অসাম্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানালেন গুরু নানক এবং নির্দেশ দিলেন যে জাতিগত পার্থক্য-নির্বিচারে তাঁর শিষ্যদের একসঙ্গে বসে খাদ্যগ্রহণ করতে হবে ('গুরুকা লঙ্গর')। সন্ন্যাসীর জীবনযাপন ও কৃচ্ছ্রসাধনার ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করে নানক তাঁর শিষ্যদের বললেন তাঁদের দেশবাসীর উন্নতিবিধানের জন্যে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। অধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতার কাছে শিষ্যদের সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'সুফী'-সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক কাঠামোটি গ্রহণ করলেন তিনি এবং শিখদের উপাস্য দশজন গুরুর (অধ্যাত্মিক উপদেষ্টা বা নেতার) মধ্যে প্রথম বলে গণ্য হলেন। অতঃপর বঙ্গদেশে জন্ম নিলেন শ্রীচৈতন্য

(১৪৮৬ থেকে ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দ) নামে অপর এক ধর্মপ্রচারক, যিনি 'ভক্তি'বাদের নীতিগুলি কৃষ্ণ-উপাসক বৈষ্ণব-ধর্মমতের অঙ্গীভূত করে নতুন এক ধর্মমত করলেন। শিষ্য হিসেবে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো জাতির মানুষকে ও মুসলমানদেরও গ্রহণ করলেন তিনি। শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেমের সঙ্গে এক করে দেখালেন এবং আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা ও প্রেমসঙ্গীত বা 'কীর্তন' গানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ও ভক্তদের ভাবসমাধির স্তরে উত্তীর্ণ করতে লাগলেন। তাঁর শিক্ষা-অনুযায়ী, এই ভাবসমাধির স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারলে ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালোবাসার চরম বিকাশ ঘটে এবং দিব্যদর্শন সম্ভব হয়।

নানা ধরনের এই সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলন ও নতুন-উদ্ভূত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি জাতিভেদ-প্রথার বিরোধিতা করলেও নিজেরাই ক্রমশ পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতিতে পরিণত হয়ে পড়ল। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলির অনুসারী ভক্তরা ক্রমশ নিয়মিত রীতি-অনুযায়ী তাঁদের আর্থিক আয়ের একটা অংশ দান করতে লাগলেন সম্প্রদায়গুলির নেতাদের এবং নেতারাও কালক্রমে এই আর্থিক দানকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্কের রীতি-অনুযায়ী তাদের ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে গণ্য করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ, এই সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ক্রমে আবির্ভূত হলেন ছোটখাট বহু সামন্ত-ভূস্বামী হিসেবে। যেমন, বিশেষ করে, এই ব্যাপারটা ঘটে 'সৎপন্থ্' ও শিখ-দেনগুলির ক্ষেত্রে।

সাহিত্য

দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে পার্সি (বা ফার্সি) ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাওয়ায় সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা, অতঃপর রচিত হতে লাগল এই ভাষায়। উত্তর-ভারতে একটি নতুন ভাষা উর্দুর (সেনাবাহিনীর শিবিরের ভাষা) উদ্ভবের ক্ষেত্রেও ফার্সি ভাষার প্রভাব ছিল প্রচন্ড। নতুন-উদ্ভূত এই উর্দু ভাষার ব্যাকরণ ছিল ভারতীয় পদ্ধতি-অনুযায়ী, কিন্তু এর শব্দসম্ভার ছিল প্রধানত ফার্সি ও আরবী শব্দ থেকে সংগৃহীত। সুলতানশাহীর আমলের প্রধান কবি ছিলেন আমির খসরু (১২৫৩ থেকে ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দ)। কেবল ফার্সি ভাষাতেই নয় উর্দুতেও খসরু কবিতা লিখেছেন, এই নতুন ভাষাটিকে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন 'হিন্দাবী' বলে। ওই সময়ে ভারতের নতুন আঞ্চলিক ভাষাগুলিতেও কবিতা রচিত হয়ে চলেছিল: গুজরাটি, মরাঠি ও পঞ্জাবি ভাষায় তা রূপ নিয়েছিল মহাকাব্যের ছন্দে লিখিত গাথা-কবিতার, হিন্দি (যেমন, পঞ্চদশ শতকে কবীরের 'দোহা'), মরাঠি (পঞ্চদশ শতকে নামদেবের গীত) ও পঞ্জাবিতে (পঞ্চদশ শতকের

শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে নানকের গীত) 'ভক্তি'বাদী ধর্মান্দোলনের ভাবাশ্রয়ী কবিতা ও গানের, বাংলায় (পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে) রামায়ণ ও মহাভাবতের বঙ্গানুবাদ, পদ্মা-মনসা-চণ্ডী-ধর্ম (লৌকিক দেবদেবী), ইত্যাদির মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী-কাব্য ও বৈষ্ণব গীতি-কবিতার, ইত্যাদি। এই সমস্ত 'ভক্তি'বাদী ও অন্যান্য কবিতায় লোক-কাহিনীর বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই যুগের ফার্সি গদ্য-সাহিত্য রূপ নেয় ইতিবৃত্ত-রচনার।

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কবি কহ্লন-রচিত কাশ্মীরের রাজবংশের কাব্যিক ইতিবৃত্ত 'রাজতরঙ্গিনী' (বা রাজবংশের নদী) গ্রন্থখানির কথা বাদ দিলে বলতে হয় ভারতে মুসলিম-বিজয়ের আগে কোনো ইতিহাসই লেখা হয় না। খোয়ারেজ্মের আবু রায়হান বিরুনি বা আল্ বিরুনি (৯৭৩ থেকে ১০৪৮ খ্রীস্টাব্দ) সুলতান মাহ্মুদের হাতে বন্দী হয়ে গজ্নিতে আনীত হন। অতঃপর একবার মাহ্মুদের বাহিনীর সঙ্গে পঞ্জাবে আসেন তিনি (আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সুলতানের জ্যোতিষী হিসেবে)। ভারত-সম্পর্কে প্রাপ্তব্য সকল সংবাদই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। পরে তিনি 'হিন্দুস্তান' নাম দিয়ে একখানি বিশ্বকোষের সংকলন করেন। এই বইখানি অমূল্য নানা ঐতিহাসিক তথ্যের ভাণ্ডার।

প্রথম সত্যিকার ইতিবৃত্ত অবশ্য রচনা করেন মিন্হাজউদ্দিন জুজইয়ানি (জন্ম—১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে) নামে জনেক পারস্যবাসী। মোঙ্গল-আগ্রাসকদের অত্যাচার এড়াতে ইনি ভারতে পালিয়ে আসেন। ইনি এ'র রচিত ইতিবৃত্তখানির নাম দেন এ'র পৃষ্ঠপোষক সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহ্মুদের নামানুসারে 'তবাগত্-ই-নাসিরি'। চতুর্দশ শতকে ফার্সি ভাষায় মূল্যবান নানা ঐতিহাসিক তথ্য সংকলিত করেন জিয়াউদ্দিন বারানি ও শাম্স সিরাজ আফিফ এ'দের রচনা ফার্সি-ভাষায় আদর্শ গদ্যরচনার নমুনা বলে গণ্য। এই উভয় লেখকই সুলতান ফিরুজ শাহ্ তুঘলকের সম্মানে এ'দের গ্রন্থখানির নাম দেন 'তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী'।

স্থাপত্যকলা

দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে মুসলিমদের উপাসনার উপযোগী প্রথম অট্টালিকাগুলি নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে ছিল মসজিদ, মিনার, সমাধিসৌধ ও মাদ্রাসাসমূহ। এই দালানগুলির আকার ছিল তৎকালীন ভারতের পক্ষে অপরিচিত: এগুলির গায়ে কোনো ভাস্কর্যশিল্পের অলঙ্করণ ছিল না, তবু অনুপাত-বোধ, সুষমতা ও রেখার সৌন্দর্যের বিচারে এগুলি ছিল লক্ষণীয়।

যেমন, কুত্‌বমিনার একটি সুউচ্চ, জবরদস্ত মিনার, যার দেয়ালগুলি সভঙ্গ, শিরালো এবং লালরঙের বেলে-পাথরে মোড়া। এর অলঙ্করণগুলি জ্যামিতিক ধাঁচের এবং সেগুলি উৎকীর্ণ আরবী লিপির সঙ্গে সুষমভাবে সংমিশ্রিত। মিনারটি যেমন সুদৃশ্য তেমনই জাঁকালো। ইল্‌তুত্‌মিশের সমাধিসৌধটি চতুষ্কোণ গম্বুজে শোভিত এবং চতুর্দিকে ধনুকাকৃতি খিলান সহ প্রবেশপথযুক্ত। পরবর্তী কালের সমাধিসৌধগুলির এটি ছিল এক আদর্শ নমুনাস্বরূপ। এই সমাধিসৌধটির দেয়াল অলঙ্করণ ও ছবির মতো হস্তলিপিতে সুসজ্জিত। তুঘলক-যুগের সৌধগুলি রেখার সরলতার জন্যে বিশিষ্ট, তবে সেগুলি বিপুলতা ও জাঁকালো ভাবের জন্যে মনে রেখাপাত না-করে পারে না। আলাউদ্দিনের তৈরি সিরি শহরের ও মুহম্মদ তুঘলকের তৈরি তুঘলকাবাদের ধ্বংসাবশেষ দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে নির্মিত দুর্গ-প্রাকার ও নগর-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়। লোদী-সুলতানবংশের রাজত্বকালে হিন্দু-স্থাপত্যশৈলীর কিছু-কিছু নমুনা স্থান পেতে দেখা যায় ইসলামী স্থাপত্যকলায়। লোদী-যুগের দালানগুলি আকারে ছোট হলেও দেখতে সুন্দর। মুসলিম স্থাপত্যশিল্প বিদর, মাণ্ডু, আহ্‌মদাবাদ, গুলবর্গা, ইত্যাদি দাক্ষিণাত্যের নানা সুলতানশাহীর রাজধানীতেও বিকশিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। আবার সেইসঙ্গে ভারতের মুসলিম-বিজয় হিন্দু-স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। মুসলিম-শাসনের আমলে বেশকিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ কোনো নতুন অট্টালিকা তখন গড়ে ওঠে না। তাছাড়া ভারতীয় চারু ও ভাস্কর্য-শিল্পেরও ক্ষতি হয় জীবন্ত প্রাণীর মূর্তি বা চিত্র নির্মাণ বা অঙ্কন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কারণে।

মোগল-সাম্রাজ্যের আমলে ভারত
(ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

মোগল-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

দিল্লীতে সুলতানশাহীর অস্তিত্ব, মুসলিম সামন্ত-ভূস্বামীদের এক শাসক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালীন সহ-অবস্থিতি এবং এই দুই সম্প্রদায়ের ওপর পারস্পরিক প্রভাব—এই সবকিছুই উত্তর ভারতে এক নতুন ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে। যদিও এই উপ-মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি—যেমন, মালাবার, গুজরাট, করমণ্ডল ও বঙ্গ—দীর্ঘকাল ধরে আরব-দেশগুলি, পারস্য, মালয় ও মলুক্কা-দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে সমুদ্রপথে মশলা ও বস্ত্রের ব্যবসায় প্রবলভাবে চালিয়ে যাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর উন্নত হয়ে উঠেছিল, তবু ওই অঞ্চলগুলি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহে ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি সমুদ্রপথের বাণিজ্য থেকে ভারতীয়দের ক্রমশ হটিয়ে দিয়ে ওইসব অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকায় অঞ্চলগুলির শক্তি-সামর্থ্যেও ক্রমশ ভাঁটা পড়ছিল। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা শক্ত নয় কেন সপ্তদশ শতাব্দীতে সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত কাঠামো নিয়ে মোগল-সাম্রাজ্য সকল বিরোধিতা দমনে সমর্থ হয়েছিল এবং দক্ষিণ ভারতের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ জয় করে নিয়েছিল।

উত্তর-ভারতে এই নতুন রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৈমুর-বংশীয় জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬ থেকে ১৫৩০ খৃীস্টাব্দ)। ইনি প্রথমে ছিলেন ফের্‌গানার অধিপতি, পরে সাইবেরিয়া থেকে আগত উজবেকরা এঁকে মধ্য-এশিয়া থেকে বিতাড়িত করেন। মুহম্মদ বাবরকে সাহায্য করেন ও সমর্থন যোগান তাঁর এক আত্মীয়, হিরাটের তৈমুর-বংশীয় শাসক। বাবর অতঃপর আফগান ভূখণ্ডগুলি দখল করেন এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন কাবুলে। কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন ভারত-জয়ের, মনে করেন একমাত্র ভারত জয় করতে পারলেই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এক রাজ্যের অধিপতি হতে পারবেন। ১৫১৮ ও ১৫২৪ খৃীস্টাব্দে বাবর একাধিকবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। অতঃপর ১৫২৫ খৃীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফের একবার ভারত আক্রমণ করলেন তিনি। এবার সঙ্গে নিয়ে এলেন মধ্য-এশিয়ার যোদ্ধৃবৃন্দ ও সেইসঙ্গে আফগান ও গাক্কার যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এক প্রবল শক্তিশালী সেনাবাহিনী। মোঙ্গলদের ব্যবহৃত যুদ্ধকৌশল

অবলম্বন করে—অর্থাৎ, অশ্বারোহী-বাহিনীগুলিকে দিয়ে আচমকা ঝটিকা-আক্রমণ করিয়ে এবং দড়ি-দিয়ে-পরস্পর-বাঁধা সারি-সারি গাড়ির পেছনে পদাতিক সৈন্যদলকে অগ্রসর করিয়ে—বাবর শেষপর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম শাহ্ লোদীর সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হলেন ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে, পানিপথের যুদ্ধে। এর একবছর পরে ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে চিতোরের রাজা ও অভিজ্ঞ যুদ্ধ-বিশারদ রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজপুত-বাহিনীকেও পরাস্ত করলেন। এর ফলে একদিকে যেমন সমগ্র রাজপুতানার ভূখন্ডকে নিজের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করার যে-বাসনা রাণা সঙ্গ পোষণ করছিলেন তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল, তেমনই পানিপথে ও ফতেপুর সিক্রিতে পরপর এই দুটি যুদ্ধজয় উত্তর ভারতে বাবরের শাসনকে সুনিশ্চিত ও দৃঢ়বদ্ধ করে তুলল। এর পরে বাবর সফল হন প্রায় সমগ্র গঙ্গা-উপত্যকাই অধিকার করে নিতে।

অতঃপর কিছু-কিছু আফগান-বাহিনী লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীতে ক্যারাভান ভারাক্রান্ত করে ঘরে ফিরে গেল। আর যে-সব যোদ্ধা রয়ে গেলেন ভারতে বাবর তাঁদের (রাজসেবার বিনিময়ে) জমি দান করলেন। এই ভূ-সম্পত্তিগুলিই পরে পরিচিত হয় 'জায়গির' নামে। এই ধরনের সকল তালুকের দেখাশোনা, তদ্‌বির-তদারক করতেন যে-সমস্ত রাজকর্মচারি তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। এই হিন্দু কর্মচারিরা দেশের রীতিনীতি জানতেন আর জানতেন কী পরিমাণে রাজস্ব ধার্য করলে কৃষকরা তা দিতে পারবেন।

বাবর ভারত শাসন করেন মাত্র তিন বছর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং পর্যবেক্ষণশীল মানুষ, শিল্পকলা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারবোধ-সম্পন্ন কবিও ছিলেন তিনি। তিনি যে-স্মৃতিকথাগুলি লিখে রেখে গেছেন তার ভাষা যেমন সরল তেমনই যথাযথ। হিন্দুদের অবশ্য তিনি 'বিধর্মী' বলেই গণ্য করতেন এবং হেয়জ্ঞান করতেন তাঁদের, তবে তাঁদের ওপর উৎপীড়ন চালাতেন না।

মৃত্যুর আগে বাবর তাঁর অধিকৃত রাজ্য ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তবে রাজ্যের প্রধান অংশ দিয়ে যান বড় ছেলে হুমায়ুনকে এবং অন্য তিন ছেলে, যাঁরা পঞ্জাব, কাবুল ও কান্দাহারের রাজ্যাংশ পেয়েছিলেন, তাঁদের নির্দেশ দিয়ে যান হুমায়ুনের আধিপত্য মেনে নিতে।

হুমায়ুন তাঁর রাজ্যের সীমানা পরিবর্ধনের চেষ্টা করেন গুজরাট, রাজপুতানার অংশ ও বিহার জয় করে। গোড়ার দিকে সাফল্য সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদের জন্যে তাঁর এই জয়লাভকে সংহত ও সুদৃঢ় করে তুলতে অসমর্থ হন তিনি। তাঁর ভাইয়েরা তাঁর আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার আশায় দিল্লী অধিকার করে নিতে সচেষ্ট হন। হুমায়ুনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্য ছিলেন বিহার ও বঙ্গে আফগান সামন্ত-রাজন্যদের প্রধান শের খাঁ সুর। বিহারে শের খাঁ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত

হয়ে হুমায়ুন শেষপর্যন্ত সিন্ধুদেশে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি স্থানীয় মুসলিম সেনাধ্যক্ষের চৌদ্দ বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেন এবং ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। এই পুত্রই হলেন আকবর। এর অল্প কিছুদিন পরেই একাধিক ভাই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে এগিয়ে আসতে থাকায় হুমায়ুনকে দেশ ছেড়ে আরও দূরে পালিয়ে যেতে হয়—এবার তাঁকে পালাতে হয় পারস্যে। এই সময়ে শিশু আকবরের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন কাবুলের শাসনকর্তা হুমায়ুনের ভাই কামরান।

হুমায়ুন ছিলেন ফার্সি-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সেনাধ্যক্ষও বটে, তবে তাঁর আফিমে আসক্তি তাঁর বিচারশক্তিকে প্রায়ই অক্রিয় করে তুলত। দিল্লীতে থাকতে তাঁর রাজত্বকালে হুমায়ুন সাম্রাজ্যে এক নতুন শাসন-ব্যবস্থা প্রচলনে প্রয়াসী হন, তবে এই শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতিগুলি ছিল কৃত্রিম, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তিনি তাঁর দরবারের অমাত্যদের তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেন: যথা, মন্ত্রিমণ্ডলী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও শিল্পিগোষ্ঠী (কবি, নর্তকী, ইত্যাদি)। এছাড়া তিনি চারটি সরকারি দপ্তরও স্থাপন করেন: যথা, অগ্নিকাণ্ড-বিষয়ক দপ্তর—সামরিক ব্যাপারের দায়িত্ব ছিল এই দপ্তরের ওপর ন্যস্ত; জল-দপ্তর—এই দপ্তর জমিতে জলসেচের ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করত এবং রাজকীয় মদ্য-ভাণ্ডারেরও ভারপ্রাপ্ত ছিল; ভূমি-সংক্রান্ত দপ্তর—এই দপ্তর ছিল রাজস্ব আদায়, 'খালিসা' জমির তত্ত্বাবধান ও নানা নির্মাণকর্মের ভারপ্রাপ্ত; এছাড়া ছিল বায়বীয় দপ্তর—ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কবিকুল ও ইতিহাসবেত্তাদের কাজকর্ম-সম্পর্কিত ব্যাপার ও তাঁদের বৃত্তি ও ভাতাদানের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিল এই দপ্তরটি। এই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো, যা একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌণ গুরুত্বের ব্যাপারগুলিকে মেলাতে চেষ্টা করছিল, তা স্বভাবতই স্থায়ী হতে পারল না এবং শের খাঁ সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিত্যক্ত হল।

১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শের খাঁ শের শাহ্ উপাধি নিয়ে দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তিনি তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করেছিলেন সামন্ত-ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণে রাখাকে, বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণে রাখা বিহার ও বঙ্গের আফগান ভূস্বামীদের। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ক্ষমতাদখলের সময় এই শেষোক্ত ভূস্বামীদের সমর্থনের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল শের শাহ্‌কে। যাই হোক, এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে তিনি 'জায়গিরদার'দের ওপর কড়া নির্দেশ জারি করলেন যে তাঁদের নির্দিষ্ট-সংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে অশ্বারোহী-বাহিনী গঠন করতে হবে (এই অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা নির্ভর করবে 'জায়গির' কত বড় তার ওপর)। এই অশ্বারোহী-বাহিনীগুলিই ছিল সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। এ-ব্যাপারে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্যে

শের শাহ্ নিয়ম করলেন যে ঘোড়াগুলির গায়ে বিশেষ-বিশেষ 'জায়গিরদার'-এর নিজস্ব সিলমোহরের ছাপ দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষে তাঁদের সেনাবাহিনীগুলির নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শের শাহ্ এই নিয়মের প্রবর্তন করলেন রাষ্ট্রীয় পরিদর্শনের সময় নিজেদের খুশিমতো লোক ভাড়া করে এনে তাদের অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে দেখিয়ে পরিদর্শন শেষ হওয়ার পর তাদের ফের বিদায় করে দেয়ার যে-অভ্যাস 'জায়গিরদার'রা এর আগে পর্যন্ত প্রচলন করেছিলেন তার অবসানকল্পেই। শের শাহ্ রাষ্ট্রের প্রাপ্য ফসলের অংশ নির্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন এবং রাজকোষের স্বার্থেই চেয়েছিলেন কৃষকদের জমির পরিমাণ যথাযথ মাপজোকের সাহায্যে নির্দিষ্ট না-করে ও তার ভিত্তিতে ফসলের অংশ দাবি না-করে খাজনা-আদায়কারীরা নিজেদের খেয়ালখুশি-মাফিক যেভাবে খাজনা আদায় করতেন তার অবসান ঘটাতে। তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে তাঁর সৈন্যদের কেবলমাত্র অর্থেই বেতন দিতে হবে এবং যেখানে সম্ভব হয়েছিল সেখানেই তিনি দ্রব্যসামগ্রীর পরিবর্তে অর্থে খাজনা দেয়ার ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। নিষ্ঠুরভাবে কৃষকদের প্রতিরোধ ও সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করেছিলেন শের শাহ্ (যেমন, তিনি দমন করেছিলেন আগ্রা অঞ্চলের অধিবাসী আফগান নিয়াজি-উপজাতির বিদ্রোহ)।

নিজ রাজ্যের সীমানা প্রসারণের চেষ্টায় হুমায়ুনের মতো শের শাহ্ও রাজপুত রাজ্যগুলি জয় করায় মনোনিবেশ করেন ও চেষ্টা করেন ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি দখল করার। কিন্তু ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে রাজপুতানার একটি দুর্গ কালিঞ্জর অবরোধের সময় মৃত্যু ঘটে তাঁর।

আকবরের রাজত্বকাল

এর ফলে ফের একবার দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে আফগান সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। শেষপর্যন্ত ক্ষমতা দখল করেন শের শাহের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি রাজত্ব করেন ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এঁর মৃত্যুর পরে আবার প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে, আর তা বাধে সিংহাসনের চারজন দাবিদারের মধ্যে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিলেন হুমায়ুন. তিনি এই সময়ে পারস্য থেকে ফিরে এসেছিলেন তুর্কি, পারসিক, আফগান, তুর্কোমান ও উজবেকদের নিয়ে গঠিত এক বহুজাতিক সেনাবাহিনী নিয়ে। সিংহাসনের অন্যান্য দাবিদারের সেনাবাহিনীগুলিকে উৎখাত করে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লী দখল করলেন। তবে এবারও তাঁর রাজত্ব ছিল স্বল্পস্থায়ী, কেননা কয়েক মাস পরে মার্বেল পাথরের একটি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটল তাঁর। এবার তেরো বছর বয়সী সম্রাটপুত্র আকবরের

অভিভাবক ও রক্ষক তুর্কোমান বৈরাম খাঁ আকবরকে তাড়াতাড়ি সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

ওই সময়ে মোগলদের রাজ্য গঙ্গা-যমুনার উপত্যকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কেননা উত্তরে পঞ্জাব ও আফগান ভূখণ্ডগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গিয়েছিল ছিন্ন হয়ে। মোগল-রাজ্যের প্রধান বিপদ হয়ে তখন দেখা দিয়েছিলেন হিমু, তিনি ছিলেন সুর-সুলতানদের একজনের সেনাপতি। 'নীচ'বংশ-সম্ভূত হওয়া সত্ত্বেও (হিন্দু বণিক-পরিবার থেকে এসেছিলেন তিনি) প্রতিভাবান সেনাধ্যক্ষ হিসেবে হিমু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি দিল্লী দখল করেন এবং রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়ে নিজেকে দেশের শাসক বলে ঘোষণা করেন। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে মোগলদের বিরুদ্ধে পানিপথের অতীব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে হিমু আকবরের সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তার পার্শ্বদেশে ভাঙন ধরাতে সমর্থ হন, কিন্তু হঠাৎ একটি তীর তাঁর এক চোখে বিদ্ধ হওয়ায় হাতির পিঠ থেকে পড়ে যান। ফলে সেনাপতিকে রণক্ষেত্রে দেখতে না-পাওয়ায় হিমুর সৈন্যরা পালাতে শুরু করে (ভারতে তখন ভাড়াটে সৈন্যদলের মধ্যে এইটাই ছিল রীতি — বেতন দেয়ার মালিক সেনাপতির মৃত্যু হলে সৈন্যরাও অবিলম্বে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাত) এবং যুদ্ধে বিজয়ী হন আকবর। বৈরাম খাঁ'র নির্দেশে ওই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই আকবর তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে জমি দান করতে ও খেতাব বিতরণ করতে শুরু করেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর দিল্লীতে রাজত্ব করেন আকবর (১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দ) এবং এই সময়ে উত্তর-ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় মোগল-সাম্রাজ্য। আকবর যমুনানদীর তীরে আগ্রা শহরে রাজধানী স্থাপন করেন।

আকবরের বিজয়-অভিযান

গোড়ার দিকে আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ'র হাতেই ছিল সত্যিকার শাসনক্ষমতা। তিনি আজমীর দখল করেন ও রাজপুতদের হাত থেকে কেড়ে নেন গোয়ালিয়র দুর্গ এবং পঞ্জাবে মোগল-শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে নিজে শিয়া-সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের মধ্যে সরকারি উচ্চ পদ ও জমিজায়গা বিতরণ করেন। এর ফলে দরবারের সুন্নি-সম্প্রদায়ভুক্তদের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল অসন্তোষ ও শত্রুতা। ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে দরবারের অপর একটি গোষ্ঠী ক্ষমতাদখল করে। অতঃপর বৈরাম খাঁকে 'সম্মানের সঙ্গে মক্কায় নির্বাসিত করা হয়, কিন্তু পথিমধ্যে গুজরাটে গুপ্তঘাতকের হাতে তিনি নিহত হন।

এই সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা কিছুকাল কুক্ষিগত থাকে আকবরের ধাত্রীর আত্মীয়স্বজন নিয়ে গঠিত এক উজবেক উপদলের। মালব-রাজ্য এই সময়ে

মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মালবের রাজা বজ বাহাদুর প্রথমে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান, অবশ্য পরে তিনি আকবরের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। তাঁর প্রেমিকা নর্তকী রূপমতী বন্দিদশার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়জ্ঞান করে আত্মহত্যা করেন। এই বজ বাহাদুর ও রূপমতীর কাহিনী পরে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক গাথাকাব্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অভিভাবক (অস্থায়ী শাসক)-এর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আপন হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে নেন আকবর। আঠারো বছরের তরুণ আকবর ছিলেন বুদ্ধিমান, সবলদেহ ও সাহসী; তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং ছিলেন আশ্চর্য এক স্মৃতিশক্তির অধিকারী, শ্রুতিধর পুরুষ। তবে তাঁর শিক্ষকদের প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও লিখতে বা পড়তে শেখার কোনো আগ্রহ প্রকাশ পায় নি তাঁর মধ্যে। ওই অল্প বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাহায্যেই ভারত শাসন করা সম্ভব। প্রথমেই তিনি রত হলেন যোদ্ধৃজাতি রাজপুতদের সমর্থন আদায়ে এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁদের সঙ্গে একের-পর-এক মৈত্রীচুক্তি করতে ও রাজপুত রাজকন্যাদের বিয়ে করে এই মৈত্রীকে দৃঢ়তর করে তুলতে উদ্যোগী হলেন। ফলে মানসিংহের নেতৃত্বে রাজপুত অশ্বারোহী-বাহিনী এবার যুক্ত হল মোগল সেনাবাহিনীর সঙ্গে। মানসিংহ ছিলেন প্রতিভাবান সেনাধ্যক্ষ এবং অম্বরের রাজার পালিত পুত্র। মুসলমান সম্রাটের কাছে রাজপুতদের একাংশের এই আনুগত্যস্বীকার রক্ষণশীল রাজপুত-মহলগুলিতে অবশ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, রক্ষণশীলরা বলতে লাগলেন যে মুসলমান সম্রাটের দরবারে হাজিরা দিয়ে হিন্দুরা নিজেদের অবমাননা করেছেন।

রাজপুত মিত্রদের সাহায্যে আকবর বিদ্রোহী রাজপুত-রাজ্যগুলিকে দমন করলেন এবং ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে চিতোর, ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে রণথম্বর ও পরে রাজপুতানার বেশির ভাগ অঞ্চলই দখল করে নিলেন। একমাত্র মেবারের রানা প্রতাপ সিংহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুচর নিয়ে আশ্রয় নিলেন পার্বত্য অঞ্চলে এবং আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন প্রায় পঁচিশ বছর ধরে।

আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ ইতিপূর্বে রানী দুর্গাবতীর শাসনাধীন বিস্তৃত গোন্ডওয়ানা রাজ্য দখল করে নেন। রাজ্যরক্ষার্থে এই রানী নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করেন এবং পরাজিত হলে পর ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন। এই সমৃদ্ধ অঞ্চল জয় করে এবং এ-রাজ্যের প্রাক্তন রাজাদের সঞ্চিত অর্থসম্পদ রাজকোষ থেকে লুণ্ঠন করে আসফ খাঁ মনে করলেন নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় করেছেন তিনি। এ-উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্জাবের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। পঞ্জাবে ১৫৬৩ সাল থেকেই বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল

এবং তার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আকবরের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে অপরাপর বিচ্ছিন্নতাকামীরা। এই বিদ্রোহীরা অতঃপর লাহোর দখল করলেন এবং কাবুলনিবাসী আকবরের ছোট ভাইকে তাঁদের সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। সম্বলের প্রভাবশালী উজবেক গোষ্ঠী-প্রধান বা তথাকথিত 'মির্জা'রাও যোগ দিলেন এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে। এঁরা সবাই ছিলেন আকবরের দরবারে নানা রাজপুত হিন্দু রাজার স্থানলাভের বিরোধী। আকবরের সৌভাগ্যবশত এই বিদ্রোহীরা নিজেদের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে সময়মতো ও যথাযথ সংযোগস্থাপনে অসমর্থ হওয়ায় ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে সামন্ত-ভূস্বামীদের এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। 'মির্জা'রা অতঃপর পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন গুজরাটে।

গুজরাটে ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগিজরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বাহাদুর শাহ্‌কে হত্যা করার পর বেশ কিছুদিন ধরে তুর্কি, আফগান, আবিসিনীয়, ইত্যাদি বিভিন্ন নৃকুল-গোষ্ঠীর ভিত্তিতে গঠিত নানা সামন্ত-চক্রগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলে। 'মির্জা'রাও গুজরাটে আসার পর এই লড়াইয়ে লিপ্ত হন, কেননা ক্ষমতালাভের লিপ্সা তাঁদেরও বড় কম ছিল না। এই সমস্ত সামন্ত-চক্রের বিরুদ্ধে আকবরের সেনাবাহিনী প্রেরিত হয় এবং ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে মোগল-সৈন্য গুজরাট-রাজ্য অধিকার করে। তবে মোগল-বাহিনী গুজরাট ছেড়ে আগ্রায় ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'মির্জা'রা ফের একবার বিদ্রোহ করেন, ফলে মোগল সেনাবাহিনীও বাধ্য হয় নতুন করে গুজরাট দখল করতে।

বঙ্গের মুসলমান সুলতান নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করায় (যদিও তিনি আকবরের সামন্ত-রাজন্য বলে গণ্য ছিলেন) বঙ্গকে দমন করতে মোগল-বাহিনীর দু'বছরেরও বেশি সময় লাগে। অতঃপর নতুন-নতুন রাজ্যজয়ের ব্যাপারে আকবর কিছুকাল ক্ষান্তি দেন। ওই সময়ে তিনি মনোযোগ দেন তাঁর ইতিমধ্যে-অর্জিত প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-সম্পর্কিত নানা ব্যাপারে।

প্রশাসন-ব্যবস্থা

মোগল-রাষ্ট্রে প্রধান প্রশাসনিক বিভাগ ছিল রাজস্ব-সম্পর্কিত বিভাগ। এ-বিভাগের প্রধান ছিলেন 'দিওয়ান'। রাজস্ব-আদায়কারী কর্মচারিরা বেশির ভাগই হিন্দু ছিলেন। সৈন্যবিভাগে সৈন্যদের খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও খাজাঞ্চি 'মির-ই-বখ্‌শি' 'জায়গির'গুলির বিলিবণ্টন তত্ত্বাবধান করতেন এবং তিনিই ফৌজী কুচকাওয়াজের সময় পরিদর্শন করতেন সৈন্যদের ও তাদের সাজ-সরঞ্জামের। এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন বাহিনীগুলির সেনাধ্যক্ষরা। ধর্মীয় ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত বিভাগটি পরিচিত ছিল 'সদারত্‌' নামে। এই বিভাগের

প্রধান 'সদ্র' মুসলমানদের ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনার জন্যে বিচারকদের নিযুক্ত করতেন এবং 'সুয়ুরগাল' বিতরণের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ও জেলাগুলিতে পাশাপাশি কাজ করতেন বে-সামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ, পরস্পরের কাজের ওপর নজর রাখতে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো লক্ষণ কোথাও প্রকাশ পেলে তা দমন করতে বাধ্য হতেন তাঁরা। কিছু-কিছু বড়-মাপের অঞ্চলে স্থানীয়ভাবেও 'সদ্র'রা নিযুক্ত হতেন।

কৃষকদের অবস্থা

মোগল-সাম্রাজ্যে জনসাধারণ ছিলেন বহুবিধ উপজাতি ও জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং বহুবিচিত্র ভাষাভাষী, তাঁদের সামাজিক বিকাশের স্তরও ভিন্ন-ভিন্ন এবং বিভিন্ন ধর্মমতে ও জাতিগত পংক্তিতে বিভক্ত ছিলেন তাঁরা। জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করতেন তাঁদের গ্রামীণ সমাজের ছোট্ট সংকীর্ণ জগতে। কৃষকরা রাষ্ট্রকে খাজনা দিতেন ভূমি-রাজস্ব হিসেবে। এই রাজকর তথা খাজনা যাতে কৃষকরা নিয়মিতভাবে দেন তা দেখা ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থসম্মত, তবে রাষ্ট্র কিংবা সামন্ত-ভূস্বামীরা কেউই কৃষকদের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না।

ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ছিল রাজস্ব হিসেবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। রাজস্বের এই পরিমাণকে সাধারণভাবে ন্যায্য বলেই মনে করা হোত, যদিও কখনও-কখনও কৃষকরা এই পরিমাণ রাজস্ব দিতেও অসমর্থ হতেন। এরকম ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে ডাকা হোত রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করার জন্যে। ইতিবৃত্তগুলিতে তথাকথিত 'অবাধ্য দস্যুদের' গ্রামের এমন কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে কৃষকরা আকবরের সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। একবার আকবর স্বয়ং হাতির পিঠে চেপে হাতির ধাক্কায় মাটির দেয়াল ভেঙে এক গ্রামের মধ্যে ঢুকেছিলেন তাঁর পিটুনি-বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে।

জমি আবাদ করা রাষ্ট্রের প্রতি প্রজাসাধারণের কর্তব্য বলে তখন ঘোষিত হয়েছিল এবং খাজনা-আদায়কারী কর্মচারিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে সকল আবাদযোগ্য জমিতে ফসল বোনা হয় সেদিকে কড়া নজর রাখতে। খাজনা আদায়ের ব্যাপারটা সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে আকবর এই ফরমান জারি করেন যে তাঁর রাজ্যের অংশে সকল জমি জরিপ করতে হবে দড়ি দিয়ে নয় (কারণ দড়ি ইচ্ছেমতো ঢিলে কিংবা টানটান করে মাপের হেরফের করা সম্ভব), বাঁশের খুঁটি দিয়ে।

মোগল-সাম্রাজ্যে গ্রামীণ সমাজগুলি ছিল জটিল ধরনের সব সংস্থা। যৌথ ভূস্বামী হিসেবে সমাজের নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল সাধারণত একেকটি গ্রামের

চতুষ্পার্শ্বস্থ ছোট এক ভূখণ্ডের ওপর এবং সমাজের প্রধান বা মোড়লের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত ওই ভূখণ্ডের অন্তর্গত আবাদী জমির প্রতিটি টুকরোর ওপর খাজনা ধার্য করার ও তা আদায় করার। কিন্তু গ্রামীণ সমাজের কারিগর-কারু শিল্পী ও ভৃত্যদের নিয়মিত খরিদ্দারেরা সাধারণত বাস করতেন একাধিক গ্রামে। ফলে, বলতে গেলে কার্যত, প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব 'মুকরর', অর্থাৎ খেত-খামারের পাহারাদার ও জিম্মাদার থাকলেও গ্রামের কর্মকারের খরিদ্দার হতে পারত একাধিক গ্রাম ও গ্রামের স্বর্ণকারের খরিদ্দার এমন কি পাঁচটি গ্রাম পর্যন্ত, ইত্যাদি। নানা ধরনের এইরকম কারিগর, যাঁরা নাকি পুরো একটি গ্রামাঞ্চলের চাহিদা মেটাতেন, তাঁদের সংখ্যা গড়পড়তা সাত থেকে বারোজনের মতো হতে বাধা ছিল না। আর এই সমস্ত কারিগরের তৈরি প্রতিটি বস্তুর জন্যে সাধারণত তাঁরা অর্থমূল্যে দাম পেতেন না, তাঁদের প্রাপ্য দাম মেটানো হোত ফসলের একটা অংশ দিয়ে কিংবা নিষ্কর একটুকরো জমির বিনিময়ে। প্রসঙ্গত এটাও লক্ষণীয় যে কোনো-একটি গ্রামীণ সমাজের সদস্যের পক্ষে কাছাকাছির মধ্যে অপর কোনো বসতির এলাকায় বাড়তি আরেক খণ্ড জমি সংগ্রহ করার পথে কোনো বাধা ছিল না (যদিও এই দ্বিতীয় বসতিতে তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ অধিকার ভোগ করতে পারতেন না, তবু)। এর ফলে কোনো-একটি গ্রামীণ সমাজের প্রভাবাধীনে ঠিক কতখানি ভূখণ্ড থাকত তা হিসাব করা বর্তমানে বেশ দুরূহ। তবে এটা ঠিক যে বেশ কয়েকখানি গ্রামের বাসিন্দা কৃষকরা হাটে বা বাজারে না-গিয়েও কারিগরদের তৈরি তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারতেন।

গ্রামীণ সমাজের মোড়ল ও পুথি-লেখক যেমন একদিকে ছিলেন সমাজের দুই প্রধান প্রতিনিধি তেমনই অপরদিকে তাঁরা ছিলেন রাজকর্মচারিও। মোড়ল তাঁর পরিচালনাধীন গ্রাম থেকে দেয় রাজস্বের পুরো অংশ আদায় করে দিতে পারলে তাঁর সমাজের স্বত্বাধীন সকল আবাদী জমির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জমি নিজস্ব হিসেবে পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। এই জমি হোত নিষ্কর।

আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে দ্রব্যসামগ্রীতে খাজনার পরিবর্তে অর্থমূল্যে খাজনা দেয়ার রীতি প্রবর্তন করায় কৃষকদের পক্ষে তা মস্ত এক বোঝার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এই অর্থ সংগ্রহের জন্যে ভারতীয় কৃষক অতঃপর বাধ্য হলেন নিজে থেকেই কিংবা গ্রামীণ সমাজের মোড়লের সাহায্যে তাঁর খেতের ফসল হাটে বিক্রি করতে এবং এর ফলে তিনি অত্যন্ত বেশিরকম নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন ব্যবসায়ী ও কুসীদজীবী মহাজনদের ওপর। যদিও আকবর কৃষকদের ওপর ধার্য-করা বেশকিছু ধরনের ছোটখাট খাজনা মকুব করে দিয়েছিলেন, তবু সামন্ত-ভূস্বামীরা যথারীতি সে-সমস্ত আদায় করে নিতেন কৃষকদের কাছ থেকে এবং নিজেদের প্রয়োজনে তা আত্মসাৎ করতেন।

খাজনা দেয়া ছাড়াও কৃষকরা কখনও-কখনও বাধ্য হতেন বিনা মজুরিতে রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করতে। এগুলি ছিল প্রধানত দুর্গ, শহর, ইত্যাদি নির্মাণের কাজ। বিনা পারিশ্রমিকের এই শ্রমকে বলা হোত 'বেগার খাটা'। এই শ্রম বিশেষ করে কঠিন হয়ে দাঁড়াত যখন গ্রামগুলির কাছাকাছি কোনো দুর্গ নির্মিত হোত, কারণ আকবর তখন সরাসরি হুকুম জারি করতেন যে আশপাশের সকল গ্রামের মানুষকে এই নির্মাণকার্যে হাত লাগাতে হবে।

জমিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানা

সামন্ততান্ত্রিক ভারতে প্রতিটি বড় আকারের রাজ্যই ভূ-সম্পত্তিতে তাদের অধিকার কায়েম করতে সচেষ্ট হোত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমিজমার অস্তিত্ব রাজকোষ পূর্ণ করার জন্যে খাজনা আদায় সম্ভব করে তুলত এবং এর ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হোত রাজসেবার বিনিময়ে সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে শর্তাধীনে জমি বিলি করা। এই সমস্ত জমির স্বত্বভোগীরা আবার বাধ্য হতেন ছোট-বড় সৈন্যবাহিনী পুষতে আর সেগুলি হোত রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর অংশ; আর রাষ্ট্রের অধীনে শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকলে তবেই সম্ভব হোত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, ইত্যাদি দমন করা, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা করা এবং জয় করা নিত্য নতুন ভূখন্ড। অবশ্য নতুন-বনে-যাওয়া-ভূস্বামীরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর রাষ্ট্রের কাছ থেকে শর্তাধীনে-পাওয়া জমিজমাকে তাঁদের ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তিতে পরিণত করার চেষ্টাও করতেন। এইভাবে জমিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েমের লড়াই চলেছিল ভারতের গোটা সামন্ততান্ত্রিক যুগ ধরেই।

মোগল-সাম্রাজ্যের দু'ধরনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি ছিল—যথা, 'খালিসা' ও 'জায়গির'।

সকল বিজিত ভূখন্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি-তহবিল বা 'খালিসা'র অংশভুক্ত হোত। এই জমি থেকেই সম্রাট 'জায়গির' ভূ-সম্পত্তি বিলি-বাঁটোয়ারা করতেন এবং এ-থেকেই তিনি জমি দান করতেন ধর্মীয় উপাসনা ইত্যাদির পরিচালনার ভারপ্রাপ্তদের এবং ধর্মগুরুদের। এই 'খালিসা' জমির পরিমাণের অনবরত হেরফের ঘটতে থাকায় এ-জমির মোট পরিমাণ হিসাব করা অসম্ভব ছিল। 'খালিসা' জমি ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রের সম্পত্তি।

'জায়গির' ভূ-সম্পত্তি বলতে বোঝাত শর্তাধীনে বিলি-করা জমি। এইসব ভূ-সম্পত্তির স্বত্বভোগীরা বাধ্য থাকতেন স্বত্বাধীন জমির পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বড় বা ছোট আকারের সেনাবাহিনী পোষণ করতে। এই সেনাবাহিনীগুলি

হোত সম্রাটের সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ। 'জায়গির' হিসেবে বিলি-করা জমিও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হোত। 'জায়গির'এর ওপর দেয় ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ও তার ধরন নির্ধারণ করতেন 'জায়গিরদার' নয়, রাষ্ট্র স্বয়ং এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকেই ঠিক করে দেয়া হোত কীভাবে এই রাজস্ব আদায় করা হবে। নিয়ম হিসেবেই 'জায়গিরদার'এর জমির স্বত্ব তাঁর পরিবারে বা বংশানুক্রমে অর্শাত না, বরং তাঁর মৃত্যুর পর তা ফের রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হোত। এমন কি কখনও-কখনও 'জায়গিরদার'এর কাছ থেকে তাঁর তালুক রাষ্ট্রের তরফ থেকে নিয়ে নেয়া হোত ও তার পরিবর্তে দেয়া হোত অপর কোনো তালুক। পরিবর্ত হিসেবে দেয়া এই দ্বিতীয় তালুকটি দেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন অপর এক অঞ্চলে হওয়াও বিচিত্র ছিল না। আকবরের রাজত্বকালে সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যে এ-ধরনের তালুকের পরিবর্তন রীতিমতো ঘনঘনই ঘটত। এর অর্থ, 'জায়গিরদার'রা সে-সময়ে সাধারণত একই জমির মালিকানা একসঙ্গে বছর-দশেকের বেশি ভোগ করতে পারতেন না।

'জায়গির' ভূ-সম্পত্তির মালিকানার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানার ধরনধারণের অবশ্য বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় বড়-বড় 'জায়গিরদার'রা জমি থেকে তাঁদের আদায়ীকৃত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশের মতো মাত্র ব্যয় করতেন তাঁদের সেনাবাহিনীগুলির ভরণপোষণের জন্যে, আর অপেক্ষাকৃত ছোট 'জায়গির' পেতেন যাঁরা এ-কাজে ব্যয় করতেন আদায়ীকৃত রাজস্বের অর্ধেকেরও কম। আকবরের রাজত্বকালের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই, যে-সমস্ত হিন্দু রাজা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতেন তাঁদের আগেকার ভূ-সম্পত্তি সাধারণত 'জায়গির' হিসেবে তাঁদেরই দান করা হোত আর এই সমস্ত জমি উত্তরাধিকার-সূত্রে ভোগদখল করা চলত। সপ্তদশ শতক নাগাদ অবশ্য পাকাপোক্তভাবে শিকড় গেড়েছিল 'বংশগত জায়গির' কথাটি।

সাধারণভাবে 'জায়গির'গুলি হোত ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বিঘা কি তার চেয়েও বেশি জমি নিয়ে গঠিত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ভূ-সম্পত্তি। আকবরের রাজত্বকালে 'জায়গিরদার'রা তাঁদের স্বত্বস্বামিত্বের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। ষোড়শ শতকের সপ্তম দশকের শেষ ও অষ্টম দশকের গোড়ার দিকে আকবর যখন চেষ্টা করলেন 'জায়গির'-প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে পরিবর্তে অর্থমূল্যে বেতনদান-ব্যবস্থা প্রবর্তনের, তখন পঞ্জাবের 'জায়গিরদার'রা খেপে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। পঞ্জাবে মোগল-বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ শাহ্‌বাজ খাঁ তখন সম্রাটের নামে ওই অঞ্চলের সকল 'খালিসা' ভূ-সম্পত্তি 'জায়গির' হিসেবে বিলি করতে বাধ্য হলেন। 'পাতশাহ্‌' বা চলতি কথায় বাদশাহ্‌কে লিখলেন তিনি: 'এইভাবে যদি আমি যোদ্ধৃবৃন্দের অশান্ত হৃদয়কে শান্ত না-করতাম তাহলে তাঁরা সরাসরি বিদ্রোহ করে

বসতেন। এখন গোটা রাজ্য ও সেনাবাহিনী জাঁহাপনার হুকুম-বরদারি করবে।' আকবরের রাজত্বকালে মোগল-সাম্রাজ্য সবেমাত্র পাকাপোক্তভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিল, তাই তখন 'জায়গিরদার'দের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র দু'হাজারের মতো (এই হিসাব বড় এবং ছোট 'জায়গিরদার'দের ধরেই)।

মোগল-সাম্রাজ্যের আমলে ব্যক্তিগত জমির মালিকরাও ছিলেন, যাঁদের বলা হোত 'জমিদার'। আকবরের রাজত্বকালে যে-সমস্ত শক্তিশালী ছোট রাজন্যদের তিনি পদানত করেছিলেন তাঁরা মোগল-সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার পর ও আকবরকে কর বা সেলামি দিতে রাজি হওয়ায় এই 'জমিদার' খেতাব পেয়েছিলেন। এই সেলামির পরিমাণ নির্ভর করত রাজন্যরা বশ্যতাস্বীকার করার সময় শক্তির সত্যিকার ভারসাম্য কীরকম হোত তার ওপর। মোগল-সাম্রাজ্যের রাজস্ববিভাগ 'জমিদার' ও তাঁর প্রজা বা কৃষকদের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। বলা বাহুল্য, এই 'জমিদার'রা কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব বলতে যা বোঝায় তা আদায় করতেন না, তাঁরা আদায় করতেন জমির ভাড়া বা খাজনা। এই খাজনার পরিমাণ ও তা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারিত হোত স্থানীয় রীতি-প্রথা অনুযায়ী। রাজপুত-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে, ওড়িষ্যায়, বিহারে ও অন্য কোনো-কোনো জায়গায় কিছু-কিছু 'জমিদার' তাঁদের ভূ-সম্পত্তিগুলি পরিচালনা করতেন খাস মৌজায় বেগার খাটানোর অনুরূপ পদ্ধতিতে, কিন্তু মোগল-সাম্রাজ্যের আমলে ভারতে প্রধানত কৃষক-শোষণের এই পদ্ধতি ক্রমে-ক্রমে লোপ পাচ্ছিল। 'জমিদার'দের ভূ-সম্পত্তিগুলি সরকারিভাবেই বংশানুক্রমিক বলে ঘোষিত ছিল, যদিও প্রতিবার এই সম্পত্তির নতুন উত্তরাধিকারীকে মালিকানা-স্বত্ব ভোগ করার আগে তাঁর ঊর্ধ্বতন শাসকের কাছ থেকে বিশেষ সনদ সংগ্রহ করতে হোত। তবে ওই জমিতে যদি একাধিক দাবিদার থাকতেন তাহলেই এই সনদ একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াত। এছাড়া ছোট-ছোট ভূস্বামীদেরও অনেকসময় বলা হোত 'জমিদার', তবে ইতিবৃত্তগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে একমাত্র 'জমিদার'-রাজন্যদেরই।

মোগল-সাম্রাজ্যে 'সুয়ুরগাল'-তালুকগুলিকেও 'মুল্ক', 'ওয়াকফ' বা 'ইনাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালুকগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই 'সুয়ুরগাল'-তালুকগুলি দান করা হোত 'সুফী' শেখ ও মুসলিম ধর্মগুরুদের এবং সামান্য দু-চারটে ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষভাবে অন্যান্যদের। আকবরের রাজত্বকালে তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি অনুসরণের ফলে কিছু-কিছু 'সুয়ুরগাল'-জমি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পুরোহিতদেরও দেয়া হয়। সাধারণত 'সুয়ুরগাল'-জমিগুলি ছিল ছোট আকারের ও বংশানুক্রমিক; জমির মালিকদেরও বিশেষ কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, একমাত্র সম্রাটের মঙ্গলকামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো

ছাড়া। এই 'সুয়ুরগাল'-তালুকগুলির মোট আয়তন রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির তিন শতাংশের মতো ছিল। তবে 'জমিদার'দের ভূ-সম্পত্তির মধ্যে মন্দিরগুলির জন্যে প্রদত্ত বা দেবত্র জমির পরিমাণ কতখানি ছিল তা অনুমান করা অসম্ভব।

কারিগরি শিল্প

গ্রামীণ সমাজে কারুশিল্পী প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবহার-দ্রব্য তৈরি করলে তার বিনিময়ে সমাজের কাছ থেকে তিনি পেতেন ফসলের একটা ভাগ কিংবা নিষ্কর ছোট্ট একটুকরো জমি। তবে কারুশিল্পীদের একটি বড় অংশই তখন বাস করতেন শহরে কিংবা কারুশিল্পীদের বসতিতে এবং তাঁরা সামন্ত-ভূস্বামীদের ফরমায়েশ অনুযায়ী তাঁদের জন্যে নানা ব্যবহার-সামগ্রী নির্মাণ করতেন আর নয়তো জিনিসপত্র তৈরি করে হাটে বা বাজারে বিক্রি করতেন।

ওই সময়ে ভারতে সবচেয়ে উন্নত কুটিরশিল্প ছিল বস্ত্রবয়নের। সুতী ও রেশমের বস্ত্র, এমব্রয়ডারি-করা ও ছাপা কাপড়, স্বাভাবিক ও রঙ্-করা কাপড়— এ-সবই উৎপন্ন হোত বিপুল পরিমাণে। সম্রাট আকবরের পোশাক-পরিচ্ছদের ভাণ্ডারের যে-তালিকা পাওয়া যায় তাতে প্রায় একশো বিভিন্নরকমের ভারতীয় বস্ত্রের উল্লেখ আছে।

আগ্রায় তখন নানা ধরনের সংশ্লিষ্ট পেশায় বিশেষজ্ঞ গৃহনির্মাণ-কর্মীদের বিপুল একটি সংখ্যার বাস ছিল, গুজরাটে বাস করতেন মর্মর-পাথরের কাজে দক্ষ শিল্পীরা এবং বাংলায় দক্ষ জাহাজনির্মাতারা। এছাড়া অন্যান্য ধরনের কারিগরি পেশায়ও দক্ষ ছিলেন ভারতের মানুষ: লোহা ও অ-লৌহ নানা ধাতু তোলা হোত খনি থেকে, তোলা হোত লবণ ও শোরা, গৃহ ইত্যাদি নির্মাণের জন্যে খনি থেকে পাথর কাটা হোত, তৈরি হোত কাগজ ও মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কার, উদ্ভিজ্জ তেল উৎপন্ন হোত ও তৈরি হোত নানা ধরনের মিষ্টান্ন, ইত্যাদি। ভারতীয় কারুশিল্পীদের হাতের কাজে শিল্পরুচি-বোধ ও সূক্ষ্ম কারিগরির জন্যে এর বহু আগে থেকেই দেশে-বিদেশে তা সমাদৃত হয়ে আসছিল। তবে ভারতীয় কারুশিল্পীরা কাজ করতেন খুব ধীরগতিতে, কারণ তাঁরা কাজ করতেন নিতান্ত শাদাসিধে যন্ত্রপাতির সাহায্যে আর সেগুলির বেশির ভাগই ওই শিল্পীরা নিজেরাই বানিয়ে নিতেন। আবার ওই একই সঙ্গে এটাও জানা ব্যাপার যে তাঁতের দণ্ডও (পাকখোলা পড়েনের সুতোকে সমান ফাঁক রেখে বোনার কাজে তাঁতযন্ত্রে ব্যবহৃত সবচেয়ে জটিল একটি অংশ) তখন বিক্রির জন্যে তৈরি করা হোত। এ-থেকেই বোঝা যায় ভারতে কারিগরি শিল্প তখন কোন স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কারুশিল্পীদের জাতিগুলি তখন নির্ভরশীল ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের ওপর এবং এইসব কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জাতিগুলির প্রধানদের ('মুকদ্দম'দের) মনোনীত করতেন আর নিযুক্ত করতেন তাঁদের ('দালাল'দের) যাঁরা এই হাতের কাজগুলি বিক্রি করতেন বাজারে। যে-সমস্ত কারুশিল্পী নিযুক্ত হতেন রাষ্ট্রীয় কর্মশালাগুলিতে, তাঁরা হয়ে পড়তেন আরও বেশি নির্ভরশীল। তাঁদের তৈরি করতে হোত সেনাবাহিনীর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম এবং সম্রাটের ব্যবহারযোগ্য নানা দ্রব্যসামগ্রী। এইসব দ্রব্যসামগ্রীর কিছু অংশ সম্রাট বিলি করতেন তাঁর অনুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে।

আগে থেকে টাকা দাদন দেয়া ও তারপর পাইকারি হারে উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিনে নেয়ার প্রথা ছিল কারুশিল্পীদের শোষণ করার পক্ষে ব্যবসায়ী বণিকদের সবচেয়ে ব্যাপক প্রচলিত পদ্ধতি। বণিকরা আগাম টাকা দাদন দিতেন যাতে কারুশিল্পীরা খেতে-পরতে ও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী কাঁচা মাল কিনতে পারেন। এর ফলে উৎপাদনকারী কারিগর তাঁর পৃষ্ঠপোষক সেই বিশেষ বণিককে তাঁর উৎপন্ন দ্রব্যাদি দিতে বাধ্য হতেন এবং তা তাঁকে দিতে হোত এমন একটা মূল্যে যা হোত প্রচলিত বাজারদরের চেয়ে (অর্থাৎ ওই কারিগর নিজে ওই জিনিসগুলি বাজারে বিক্রি করলে যে-দাম পেতেন তার চেয়ে) কম। ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে প্রধান-প্রধান ধরনের কারিগরি দ্রব্যসামগ্রী ও সেগুলি-সম্পর্কিত বাণিজ্য ছিল রাজকরের অধীন। এই কর ধার্য করার অধিকার আবার পেতেন নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কয়েকজন পত্তনদার। এই মধ্যবর্তী পত্তনদারদের একচেটিয়া অধিকার থাকত বিশেষ এক-একটি ধরনের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের বা উৎপাদন-তদারকির (এইসব পণ্যের মধ্যে থাকত সুতীবস্ত্র, পান, আছাঁটা চাল, হাতির দাঁতের দ্রব্যসম্ভার, ইত্যাদি)। যতদূর মনে হয়, উপরোক্ত এই সমস্ত ধরনের পণ্যদ্রব্য কর-পত্তনদারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত অপর কেউ বিক্রি করতে পারতেন না। সাধারণত এই পত্তনদাররা হতেন ধনী ভারতীয় বণিক কিংবা বিশেষ ধরনের কারিগরি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত জাতির কারুশিল্পীদের প্রধান বা মুকদ্দম।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও কুসীদজীবিকা

গুজরাট এবং বাংলা জয় করার ফলে সমুদ্র-বন্দরগুলির ওপর আধিপত্য পেল মোগল-সাম্রাজ্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বাধার সম্মুখীন হতে হল পোর্তুগিজদের। এমন কি যখন হজযাত্রীরা সমুদ্রপথে মক্কায় যেতে চাইতেন তখনও পোর্তুগিজদের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নেয়ার প্রয়োজন পড়ত। গুজরাটের দুটি সুরক্ষিত দুর্গসমন্বিত বন্দর দমন ও দিউ থেকে পোর্তুগিজদের বিতাড়িত করার ব্যাপারে

মোগলদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। বঙ্গদেশেও সপ্তগ্রাম (সাতগাঁ) ও হুগলির বন্দরদুটিতে পোর্তুগিজদের আধিপত্য মেনে নিতে হয়েছিল মোগলদের। মোগল-সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমুদ্রবন্দর ছিল গুজরাটের সুরাটে। তখন ক্যাম্বে-বন্দরের স্থান গ্রহণ করেছিল সুরাট এবং ক্যাম্বে পরিণত হয়েছিল তার পূর্ব-গৌরবের ছায়াশরীরে, কারণ এই শেষোক্ত বন্দরের প্রবেশপথটি ইতিমধ্যে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ক্যাম্বে-উপসাগরের উভয় তীর-বরাবর অনেকগুলি পোর্তুগিজ দুর্গের অবস্থানের দরুন।

মোগলদের বেশকিছু বাণিজ্য-জাহাজ ছিল, কিন্তু কোনো নিজস্ব নৌবহর ছিল না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ভারতীয় বণিকদের ব্যবসায়গত অভিজ্ঞতা ও বাইরের বহু দেশের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘকালের বাণিজ্য-সম্পর্ককে নিজেদের কাজে লাগাবার মানসে পোর্তুগিজরা সেই ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভারতীয় বণিকদের নিজেদের ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে নিয়োগ করে আসছিলেন। এর অর্থ, সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিকদের ব্যবসায়গত ক্রিয়াকলাপ ইতিমধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি, তবে তা বহুপরিমাণে-যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। গুজরাট আগের মতোই পারস্য-উপসাগরের দেশসমূহ, আফ্রিকা ও আরবের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল, ওদিকে বাঙালিরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করছিলেন প্রধানত প্রাচ্যের পেগু ও মলুক্কা-প্রণালীর দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে। বাঙালিরা সিংহল এবং মালাবার ও করমণ্ডলের সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরগুলির সঙ্গেও বাণিজ্যিক লেনদেন রাখছিলেন। মোগল-সাম্রাজ্য বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের দৌলতে এই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে লাভবান হচ্ছিল আর সে-কারণে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে অনুপ্রবেশ-বিষয়ে গ্রহণ করেছিল এক অনিশ্চিত, দ্ব্যর্থব্যঞ্জক মনোভাব। একদিকে তা বিদেশীদের প্রভাব সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করছিল যেমন, তেমনই অপরদিকে তাদের বাণিজ্য-সংক্রান্ত নানা সুযোগ-সুবিধাও দিয়ে চলছিল।

ভারতীয় তাঁতবস্ত্র তখন গোটা প্রাচী পৃথিবীতে অত্যন্ত সমাদর পেত এবং ভারত-মহাসাগরীয় ও দক্ষিণ সমুদ্রগুলির উপকূলবর্তী সকল দেশের কাছেই তা ছিল এক সর্বগ্রাহ্য পণ্য। অন্যান্য দেশ থেকে বণিকরা ভারতে আসতেন এই সমস্ত তাঁতবস্ত্র ও নানা ধরনের মশলা কিনতে, ভারতের 'দোরগোড়ায়' সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন তাঁরা বিদেশী নানা পণ্য। ভারতীয় বণিকদের অধিকাংশই নিযুক্ত ছিলেন তখন দেশের অভ্যন্তরীণ নানা হাট-বাজার থেকে দেশে-উৎপন্ন নানা পণ্য-সামগ্রী পাইকারি হারে কিনতে আর তারপর সে-সমস্ত চালান দিতে ভারতীয় বন্দরগুলিতে। আবার বিদেশী পণ্য-সামগ্রী বন্দরগুলি থেকে ভারতীয় রাজা-বাদশাদের দরবারগুলিতে চালান দেয়ার কাজও করতেন তাঁরা। যে-সমস্ত ভারতীয়

বণিক সমুদ্রপথে বিদেশে যেতেন তাঁরা সেই সমস্ত বসতি-স্থাপনকারী ভারতীয়দে সঙ্গে তাঁদের জাতিগত সম্পর্কের সূত্র ধরে যোগাযোগ রাখতেন। এই সমস্ত বণিক জাতিগুলি বলতে গেলে একেকটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মতোই কাজ করত বাণিজ্যের ব্যাপারে তারা নিজ-নিজ জাতির মধ্যে নানা ধরনের সহযোগিতা ও সাহায্য যোগাত, ঋণ দিত, ইত্যাদি। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, গুজরাটে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী জাতি ছিল বোহ্‌রা ও খাজা জাতি দুটি, তারা ছিল শিয়া-সম্প্রদায়ের মুসলিমদের ইস্‌মাইলী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয় বণিকদের সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার ব্যাপারে পোর্তুগিজরা বাধার সৃষ্টি করায় পারস্যের সঙ্গে উটের ক্যারাভানের পিঠে পণ্যদ্রব্য চাপিয়ে বাণিজ বৃদ্ধি পায়। এই ক্যারাভান-পথগুলি তখন দেশের মধ্যেই বিস্তৃত ছিল বাংলা থেকে লাহোর ও গুজরাট থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই পথগুলি সহায়ক হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল দু'ধরনের সম্প্রদায়ের হাতে। একদিকে ছিলেন প্রতিপত্তিশালী ধনী বণিক-সম্প্রদায়, যাঁরা নদীপথে ও ক্যারাভানের পথে বাণিজ্যের খরচখরচা যোগাতেন, আর ছিলেন গ্রাম থেকে গ্রামে ফেরি-করে-বেড়ানো ছোট-ছোট ফেরিওয়ালারা। গ্রামগুলিতে বাজার বা হাট বসত নিয়মিত। এই সমস্ত হাট থেকে কৃষকরা প্রধানত কিনতেন লবণ কিংবা নারকেল, লোহার ডাণ্ডা ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য। সেনাবাহিনীকে খাদ্যের সরবরাহ যোগাত বিশেষ একধরনের উপজাতি তথা জাতি, যাদের বলা হোত 'বিরিঞ্জারা' (বা'বঞ্জারা')। সৈন্যদলের পিছু-পিছু এই 'বঞ্জারা'রা যেতেন তাঁদের ভারবাহী জন্তু বলদ ও উটের সারির পিঠে চাল, লবণ, ইত্যাদি চাপিয়ে। সারা দক্ষিণ-ভারত জুড়েও এই 'বঞ্জারা'দের দেখতে পাওয়া যেত।

মোগল-সাম্রাজ্যের আমলে সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে যত বেশি সংখ্যায় ধনী বণিকরা বাস করতেন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রাঞ্চলে তাঁদের সংখ্যা মোটেই তত বেশি ছিল না। তবে ওই কেন্দ্রাঞ্চলে কুসীদজীবীদের মহাজনী কারবারের ছিল খুব বাড়বাড়ন্ত। এই কুসীদজীবীরা পদস্থ সামরিক কর্মচারি, দরবারের ওমরাহ্‌ ও কৃষককুল-নির্বিশেষে সবাইকে টাকা ধার দিতেন, বিশেষ করে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রাঞ্চলে টাকায় খাজনা দেয়ার প্রথা কড়াকড়িভাবে চালু থাকায় সকলের পক্ষেই এই ঋণগ্রহণের প্রয়োজন পড়ত। আকবরের রাজত্বকালে কুসীদজীবীরা টাকা ধার দিতেন দৈনিক ২·৫ শতাংশ সুদের হারে (অর্থাৎ বাৎসরিক ৯০০ শতাংশ সুদে)। এতে বোঝা যায় গ্রামগুলিতে টাকা-লেনদেনের সম্পর্ক কতখানি দুর্বল ও অনুন্নত ছিল।

ভারতে পণ্য-বনাম-টাকার সম্পর্কের যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও দেশে সকল ধরনের সত্যিকার ক্ষমতা পুঞ্জীভূত ছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের হাতে।

বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলির—যথা, বণিক ও কুসীদজীবী-সম্প্রদায়গুলির (কারুশিল্পী ও কারিগরদের কথা তো বাদই দিলাম)—দেশের রাজনৈতিক জীবনে সত্যিকার কোনো ভূমিকা ছিল না, তবে এদের স্বার্থ হয়তো কিছু-পরিমাণে রক্ষা করার চেষ্টা হোত, এইমাত্র। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, বাণিজ্যের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টায় আকবর স্বয়ং কিছু-কিছু ব্যবস্থা নেন: যথা, শহরের তোরণদ্বারে ও নদীর খেয়া ঘাটগুলিতে মাথাপিছু শুল্কের হার হ্রাস করে ১·৫ শতাংশ করা হয় এবং বিপুল মোগল-সাম্রাজ্যের গোটা এলাকা জুড়ে প্রবর্তন করা হয় সাধারণ মাপজোকের ও মুদ্রার ইউনিটের।

আকবরের শাসন-সংস্কারসমূহ

১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে আকবর নির্দেশ দেন আগ্রা থেকে কুড়ি কিলোমিটারটাক দূরে বাবর যেখানে রাণা সঙ্গকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন সেই সিক্রিতে নতুন একটি শহর-নির্মাণের। ‘পাতশাহের’ হুকুম অনুযায়ী আকবরের দরবারের আমির-ওমরাহ্‌রা আগে যেখানে ধু-ধু মাঠ ছিল সেই বিশাল প্রান্তরে বহুবিধ প্রাসাদ ও প্রমোদ-উদ্যান নির্মাণ করালেন। এইভাবে লাল বেলে-পাথরের তৈরি অপরূপ সুন্দর এক শহর গড়ে উঠল আর তা হল আকবরের রাজধানী। এই রাজধানীর নতুন নামকরণ হল ফতেপুর সিক্রি (বা ‘বিজয়নগর’)। এই শহরে শেখ সেলিম চিস্তি একদা যে-ঘরটিতে বাস করতেন (এই সেলিম চিস্তি আকবরের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন) সেখানে পরে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হয় এবং বেশ কিছুকাল পরে তা পুনর্নির্মিত হয় শ্বেতপাথর দিয়ে। এই প্রাসাদটিই পরবর্তী মোগল-আমলে নির্মিত অন্যান্য শ্বেতপাথরের প্রাসাদ ও সমাধিসৌধের অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফতেপুর সিক্রি শহরটি যখন গড়ে উঠল তখন দেখা গেল শহরে জলের সরবরাহ যথেষ্ট নয়। এ-কারণে ষোড়শ শতকের আশির দশকে আকবরের দরবার ফতেপুর সিক্রি পরিত্যাগ করে এলেন। শহরটি এখনও পর্যন্ত তেমনই শূন্য পড়ে আছে। শহরটি এখন অমূল্য স্থাপত্যশিল্পের এক নিদর্শন-সমাহার এবং অসংখ্য পর্যটকের তীর্থক্ষেত্রবিশেষ।

আকবর যখন প্রকাণ্ড এক সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে বসলেন তখন তিনি স্থির করলেন যে তাঁর গোটা প্রশাসন-ব্যবস্থাকে আঁটোসাটো করে বেঁধে পোক্ত করে তোলার সময় হয়েছে। ফলে তাঁর পরবর্তী প্রশাসনিক সংস্কার-ব্যবস্থাগুলির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল তাঁর রাজবংশের শাসনকে দৃঢ়বদ্ধ করে তোলা এবং ভারত জুড়ে

মুসলিম সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রাধান্য কায়েম করা। আবার সেইসঙ্গে বৈষম্যমূলক ধর্মীয় উৎপীড়নের বোঝা কিছুটা লাঘব করে তিনি চাইলেন দেশের হিন্দু জনসাধারণেরও সমর্থন লাভ করতে। তবে তাঁর এই শেষোক্ত নীতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন মুসলিম 'জায়গিরদার' ও শেখরা, তাঁরা চাইলেন কঠোর নীতি অনুসরণ করতে এবং সকল অসন্তোষের প্রকাশকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে।

১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর সকল অংশের মধ্যে সম্পর্ককে নিয়মিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় আকবর সরকারি পদসমূহের ('মনসব'গুলির) মধ্যে একটি ক্রমিক স্তরবিন্যাসের প্রবর্তন করলেন এবং তাঁর সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে তাঁদের পদ (বা 'জাট')-অনুযায়ী ছোট থেকে বড় 'জায়গির' বিতরণ করলেন। তবে 'জায়গিরদার'রা অবশ্য এবারেও আগেকার মতো উদ্ভাবন করে ফেললেন সম্রাটের হুকুমনামা এড়িয়ে যাওয়ার কলাকৌশল এবং সম্রাট-নির্দিষ্ট অর্থের চেয়ে কম অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন তাঁদের সেনাবাহিনীগুলির ভরণপোষণের জন্যে। ফলে আরও কড়াকড়ি নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং এবার নতুন একটি স্তরবিন্যাসের প্রবর্তন করা হল। এই স্তরবিন্যাসকে বলা হল 'সাভার'। তখনও অবশ্য 'জাট' দিয়ে সরকারি পদের ক্রমকে বোঝানো হতে লাগল, আর 'সাভার' কথাটি দিয়ে বোঝানো হল একজন সেনাধ্যক্ষ ঠিক কতজন অশ্বারোহী-সৈন্যের ভরণপোষণের ভার নিতে সরকারিভাবে বাধ্য তা-ই (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, এক হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক এক সেনাধ্যক্ষের এক হাজার, পাঁচ শো, এমন কি মাত্র চার শো অশ্বারোহীর ভরণপোষণ করণীয় বলে গণ্য ছিল)। 'জায়গির'এর আয়তন ক্রমে নির্ভর করতে শুরু করল 'জায়গির'-প্রাপকের 'জাট' ও 'সাভার'এর ওপর। এর ফলে বিলি-করা জমির আয়তন উঠল বেড়ে এবং 'খালিসা'-জমির তহবিল হ্রাস পেল।

এরপর আকবর স্থির করলেন যে 'জায়গির' প্রথার একেবারে অবসান ঘটাবেন। তৎকালীন ইতিবৃত্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দেই আকবর তিন বছরের জন্যে একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার নির্দেশ দেন, যে-পরিকল্পনা অনুযায়ী 'সকল রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তিই খালিসা জমি হিসেবে গণ্য হবে এবং বাদশাহ্ তাঁর সেনাধ্যক্ষদের বেতন দেবেন অর্থমূল্যে'। সেইসঙ্গে আকবর স্থির করেন যে ভূমি-রাজস্ব অতঃপর আদায় করবেন 'ক্রোরি' নামের রাজকর্মচারিরা। এই কর্মচারিদের নিজেদেরই মোটা একটা টাকা অগ্রিম জামিন হিসেবে দিতে হয়েছিল। এই প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে হস্তচ্যুত তালুকের মালিক 'জায়গিরদার'দের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে 'রায়ত'রাও আরও দরিদ্র হয়ে পড়েন। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি ঘটে এই কারণে যে তিন বছরের

জন্যে নিযুক্ত উপরোক্ত নতুন রাজস্ব-আদায়কারীরা তাঁদের জামিনের টাকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে এবং তার ওপর যতটা সম্ভব বেশি লাভ করার উদ্দেশ্যে 'রায়ত'দের কাছ থেকে যতটা যা পাচ্ছিলেন আদায় করে নিচ্ছিলেন।

আকবরের ধর্ম-সংস্কার ব্যবস্থা

প্রশাসনিক অন্যান্য পরিবর্তনগুলি সাধন করেছিলেন আকবর যে-উদ্দেশ্যে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম-সংস্কারগুলিরও উদ্দেশ্য ছিল তা-ই, অর্থাৎ তা হল তাঁর রাজক্ষমতার সামাজিক ভিত্তিকে আরও প্রসারিত করা। আকবর বুঝেছিলেন যে হিন্দুরা একমাত্র তাহলেই একনিষ্ঠভাবে তাঁর সেবা করবেন যদি তিনি তাঁদের ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেন। এই কারণেই ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের দেয় কর-ব্যবস্থা বাতিল করে দেন এবং এর পরের বছর বাতিল করে দেন 'জিজিয়া'-কর। যতদূর মনে হয়, মুসলিম 'জায়গিরদার'দের চাপের ফলে এই দুটি কর-ব্যবস্থা ফের একবার চালু করা হয়, তবে ১৫৮০'র দশকের সূচনায় আবার বাতিল হয়ে যায় এই করদুটি।

আকবরের প্রবর্তিত নতুন ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে রক্ষণশীল উচ্চপদস্থ মুসলিম ধর্মনেতাদের আপত্তি দেখে রক্ষণশীল ইসলাম-ধর্মের সঠিকতা সম্বন্ধেই আকবরের সন্দেহ জন্মায়। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রিতে একটি উপাসনালয় (বিশেষভাবে ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে) নির্মিত হয়। এখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনা-সভায় প্রচণ্ড তর্কবিতর্কের বহর দেখে আকবর ক্রমশ রক্ষণশীল ইসলাম-ধর্ম থেকে দূরে সরে যান। ওই সময়ে আকবরের একজন প্রধান বন্ধু ও অন্যান্য নানা ব্যাপারের সঙ্গে ধর্মীয় সমস্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন আবুল ফজ্‌ল। আবুল ফজ্‌লের বাবা শেখ মুবারক তাঁর 'মাহ্‌দি'-মতবাদ প্রচারের জন্যে নিগৃহীত হয়েছিলেন এবং বালক বয়সে আবুল ফজ্‌লকে বাবার সঙ্গে দেশান্তরী হয়ে নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। আবুল ফজ্‌ল নিজে 'সুফী'বাদের এক অত্যন্ত উদারনৈতিক রকমফেরের প্রবক্তা ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিক মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তিনি। তাঁর মত ছিল এই যে সকল ধর্মের পথই হল ঈশ্বর-সন্ধান এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই আছে সত্যের কিছু-না-কিছু উপাদান। আবুল ফজ্‌ল আকবরের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন যেমন অ-মুসলিম ধর্মগুলি সম্বন্ধে তেমনই নানা 'ধর্মবিরোধী' মতবাদ সম্বন্ধেও আগ্রহ। ওই সময়ে এই শেষোক্ত মতবাদগুলি ছিল সামন্ততন্ত্রের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরোধিতার তাত্ত্বিক রূপ।

আন্তরিকভাবেই বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠে আকবর পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করেন হিন্দু-ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং সেইসঙ্গে পারসি, জৈন ও ক্রিস্টিয়ান-ধর্মের সঙ্গেও। তাঁর অনুরোধে জেসুইট ক্রিস্টিয়ানদের তিনটি প্রতিনিধি-দলকে গোয়া থেকে তাঁর দরবারে পাঠানো হয়। এইরকম একটি ধর্মীয় দলের নেতা মনসেররাতে 'মন্তব্য' নাম দিয়ে কিছু টুকরো বিবরণী লিখে রেখে যান। এই বিবরণীগুলি দারুণ মূল্যবান বলে ইতিহাসবেত্তাদের কাছে গণ্য। আকবর ওই সময়ে তাঁর দরবারে হিন্দু ও ফারসি নিয়মকানুন চালু করতে শুরু করেন।

এর ফলে ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে এক ব্যাপক অভ্যুত্থানের সূচনা হয় এবং আকবর সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হন। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন শেখরা। তাঁরা এইমর্মে এক 'ফতোয়া' বা ধর্মীয় নির্দেশ জারি করেন যে আকবর ধর্মদ্বেষী, অতএব তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে হবে। এই অভ্যুত্থানের কেন্দ্র ছিল বাংলা ও পঞ্জাব, সেখানকার বিদ্রোহী সামন্ত-ভূস্বামীরা মোগল-সিংহাসনের সম্ভাব্য অধিকারী (অবশ্যই তাঁদের পছন্দমতো) বলে ঘোষণা করেন কাবুলস্থিত আকবরের শাসক-প্রতিনিধি ও অপর এক স্ত্রীর গর্ভজাত হুমায়ুনের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রকে। অনেক কষ্টে তবে আকবর এই অভ্যুত্থান সমনে সফল হন। বিজয়ী হয়ে আগ্রায় ফেরার পর আকবর তাঁর দরবারে এক নতুন ধর্মমতের প্রবর্তনা শুরু করলেন। এই ধর্মের নাম দিলেন তিনি 'দীন-ই-ইলাহি' (বা দিব্য বিশ্বাস)। এই 'দীন-ই-ইলাহি' ধর্মের মধ্যে আকবর একীভূত করতে চেয়েছিলেন ভারতের প্রধান-প্রধান ধর্মমতগুলির মধ্যে যে-উপাদানগুলিকে তিনি যুক্তিসম্মত বলে মনে করেছিলেন সেই সমস্ত উপাদানকে। এই ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রধান কয়েকটি ব্যাপার ছিল এই রকম: 'মাহ্দি'বাদীদের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আকবরকে 'ন্যায়বিচারক সম্রাট' বলে তাঁর গুণকীর্তন করা এবং হিন্দুধর্মের কিছু-কিছু ও কিছু-পরিমাণে মুসলিম-ধর্মেরও আচার-বিচার, পূজা-পদ্ধতি ও পুরাণকথাকে খানিকটা অস্বীকার করা।

কৃত্রিমভাবে জোড়াতাড়া-দিয়ে-তৈরি আকবরের এই ধর্মমতের সপক্ষে সমর্থন জুটল প্রধানত জনসমাজের দরিদ্রতর অংশগুলির মধ্যে থেকেই, যদিও আকবরের আশা ছিল তাঁর দরবারের নানা মহলকে এই ধর্ম বুঝি আকর্ষণ করতে পারবে। অতঃপর আর কোনো বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান না-ঘটলেও আকবরের ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু মুসলিমদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সমানে চলল। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলিতে আকবর মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার শেখদের নির্বাসিত করছিলেন সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে, বন্ধ করে দিচ্ছিলেন কিছু-

কিছু মসজিদ, ইত্যাদি। আকবরের মৃত্যুর পর 'দীন-ই-ইলাহি' আরও অর্ধ-শতাব্দীর মতো টিকে ছিল ছোট একটি সম্প্রদায়ের আচরিত ধর্ম হিসেবে। তবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মর্মবাণীটি এবং ভারতের দুটি প্রধান ধর্মকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্নিবেশিত না-করে বরং সে-দুটিকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করে তোলার উপায়াদি সন্ধান ও এক ধরনের একটি সংশ্লেষণ অর্জন—যা নাকি ছিল আকবরের উদ্দিষ্ট—তা ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে।

সমাজ-চিন্তা ও গণ-আন্দোলনসমূহ

আগেই বলা হয়েছে যে শেখ মুবারক 'মাহ্‌দি'বাদী আন্দোলনের অনুসারক ছিলেন এবং এই আন্দোলন আবুল ফজ্‌লের চিন্তাধারাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। শহরের মুসলিম ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পীদের মধ্যে প্রসারলাভ করে এই আন্দোলনটি। পঞ্চদশ শতকে গুজরাটে মীর সয়ীদ মুহম্মদ (১৪৪৩ থেকে ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দ) নামে এক প্রখ্যাত পণ্ডিত নিজেকে 'মাহ্‌দি' (অর্থাৎ, মানবজাতির ত্রাণকর্তা) বলে ঘোষণা করেন। তিনি সমধর্মীদের কাছে আহ্বান জানান ইসলাম-ধর্মের প্রাথমিক যুগের গণতান্ত্রিক নীতিগুলি পুনর্বার অঙ্গীকার করতে ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পত্তির সমানাধিকারের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে। গুজরাটের 'মাহ্‌দি'-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শেষোক্ত নীতিটি কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হোত: সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিটি মানুষের অর্জিত অর্থ জমা পড়ত সাধারণ একটি তহবিলে এবং তারপর সমানভাবে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোত। 'মাহ্‌দি'বাদী আন্দোলনের অনুসারীরা অবশ্য 'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের সমর্থকদের মতো হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে প্রচার চালাতেন না, তাঁদের আবেদন সীমাবদ্ধ থাকত কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে। 'মাহ্‌দি'বাদীরা আশা করতেন কোনো একদিন এক যথার্থ ন্যায়পরায়ণ শাসক সিংহাসনে বসবেন এবং ইসলাম-ধর্মের প্রথম যুগের নীতিগুলি তিনি অনুসরণ করবেন ও মুসলমান-সমাজের মধ্যে সমানাধিকার-সম্পর্কিত নীতিগুলিকে করে তুলবেন কার্যকর।

শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহের রাজত্বকালে 'মাহ্‌দি'বাদীরা আক্ষরিক অর্থেই দোয়াবের বিয়ানা ও হিন্দিয়া এলাকাদুটি দখল করেন এবং বলপ্রয়োগে তাঁদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বিয়ানা শহরে। অতঃপর সম্পত্তি ও সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় সমভাবে বণ্টনের নীতিটি 'মাহ্‌দি'-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার একবার প্রবর্তিত হল। শহরের বাসিন্দারা ছাড়াও 'মাহ্‌দি'বাদীদের সঙ্গে যোগ দিলেন 'রায়ত'রা, গ্রামীণ কারুশিল্পীরা এবং পূর্বোক্ত শেখ মুবারক সহ ইসলাম শাহের শাসনের বিরোধী কিছু-কিছু সামন্ত-ভূস্বামীও। ইসলাম শাহ্‌ এর প্রত্যুত্তর দিলেন দমননীতি

কায়েমের মধ্যে দিয়ে—আন্দোলনের একজন নেতাকে তিনি হত্যা করলেন লাঠিপেটা করে, অপর একজনকে শাস্তি দিলেন এবং বাকিদের ওপর উৎপীড়ন চালালেন। ১৫৪৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ শেষপর্যন্ত আন্দোলনটিকে দমন করা হল। ফের একবার ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে ও পঞ্জাবে পুনরুজ্জীবিত হয় এই ধর্ম-আন্দোলনটি, তবে এবার আর কোনোরকম বিদ্রোহ কিংবা অভ্যুত্থান ঘটে নি।

ওই যুগের অপর একটি অ-রক্ষণশীল ধর্মমত (পরবর্তী যুগের 'ভক্তি'বাদী মতাদর্শের সঙ্গে যা ছিল সম্পর্কিত) হল শিখবাদ, যে-মতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'গুরু' (অর্থাৎ শিক্ষাদাতা ও নেতা) নানক। আকবরেব রাজত্বকালে শিখরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন পঞ্জাবের মধ্যে এবং এই সম্প্রদায়টি তখন গঠিত ছিল বণিক ও কারুশিল্পীদের নিয়ে। শিখ-সম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু রামদাসের আমলে (১৫৭৪ থেকে ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দ) তিনি অমৃতসরের কাছে কিছু জমি লাভ করেন এবং সেখানে শিখরা একটি মন্দির (বা 'গুরুদ্বার') নির্মাণ ও একটি পূত জলের পুষ্করিণী খনন করেন। বিশেষভাবে নিযুক্ত ও ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্যে রামদাস ব্যবস্থা করেন পুজার উপচার হিসেবে নিয়মিত অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহের এবং তাঁর পরবর্তী গুরু অর্জুনদেব (১৫৮১ থেকে ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ) একদা যা ছিল ঐচ্ছিক দান তাকে পরিণত করেন নিয়মিত দানে। শিখদের প্রভুত্বের অধীন জেলায় যত লোক বাস করতেন তাঁদের সকলের কাছ থেকে, অর্থাৎ পরিবার-পিছু এই কর আদায় করা হতে লাগল। আকবর শিখধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং একটি শিখ-উপাখ্যান অনুযায়ী কথিত আছে যে তিনি গুরু রামদাসের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেছিলেন।

রাজপুতানায় ওই সময়ে 'ভক্ত' দাদু (১৫৪৪ থেকে ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দ) রাজপুতদের রাজ্যগুলিতে পরিভ্রমণ করে মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছিলেন আত্মসমর্পিত ভাব, বিনয় ও প্রেমের চর্চা করতে। তৎকালীন এক উপাখ্যান অনুযায়ী দাদুও নাকি আকবরের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তবে আকবর হিন্দি 'ভক্ত'কবি তুলসিদাসকে জানতেন বলে মনে হয় না। তুলসিদাসের সুদীর্ঘ কাব্য 'রামচরিত-মানস' ('রামায়ণ') (১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ) দ্রুত ভারতের হিন্দিভাষী জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই কাব্যে তুলসিদাস কলম ধরেন জাতিভেদ-প্রথা ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে; চারপাশের জগতে ভণ্ডামিরও সমালোচনা করেন তিনি, তবে তাঁর মতে এ-থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায় হল রামচন্দ্রের অবতার-মূর্তিতে আবির্ভূত ঈশ্বরের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় মিলনের মধ্যে দিয়ে।

তবে মোগল-সাম্রাজ্যের ক্ষমতার বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্ম-সম্প্রদায়ের আন্দোলনগুলিকে দৃঢ়হস্তে দমন করার প্রয়াস পান আকবর। মুসলিম রোশ্‌নিয়া

ধর্ম-সম্প্রদায়কে দমন করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন তিনি। বেশ কয়েকটি আফগান উপজাতি-গোষ্ঠী, বিশেষ করে ইউসুফজাইরা, রোশ্‌নিয়া ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ধর্ম-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বায়াজিদ আন্‌সারি (১৫২৪ থেকে ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দ)। সে-সময়ে যে-সমস্ত আফগান অভিজাত-বংশীয় তাঁদের ভূ-সম্পত্তিগুলি সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচে পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে এবং মোগল-সাম্রাজ্যেও জনসাধারণকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতেন আন্‌সারি। ১৫৮৫ থেকে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আকবর রোশ্‌নিয়া-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি পিটুনি-অভিযান পাঠান। রোশ্‌নিয়ারা ওই সময়ে ভারত ও কাবুলের মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী গিরিবর্ত্মগুলি দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছরব্যাপী যুদ্ধে আকবরের সেনাবাহিনী গুরুতরভাবে পরাস্ত হয় কয়েকবার। পরিশেষে অবশ্য আকবর আফগান রোশ্‌নিয়াদের অভ্যুত্থানগুলি দমন করতে সমর্থ হন, তবে তাঁর মৃত্যুর পর ফের অস্ত্রধারণ করেন রোশ্‌নিয়া-সম্প্রদায়।

নতুন বিজয়-অভিযান

১৫৮০'র দশকে আকবর ফের একবার নতুন-নতুন রাজ্যজয়ে মন দিলেন, তবে এবার তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইতিমধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা-বিস্তার। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে, কাশ্মীর প্রদেশে সিংহাসনের বিভিন্ন দাবিদারের খুঁচিয়ে-তোলা নানা বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করে আকবর সেনাবাহিনী পাঠিয়ে কাশ্মীর জয় করে নিলেন। তবে এই পাহাড়ি দেশটিতে তাঁর আধিপত্য কায়েম রাখার জন্যে দ্বিতীয় বার তাঁকে সেনাবাহিনী পাঠাতে হল সেখানে। ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন আকবর এবং সেখানে দ্রব্যসামগ্রীতে (পশম ও জাফরানে) করদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। কাশ্মীরের শীতল আবহাওয়া ও সেখানকার হ্রদগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন আকবর। অতঃপর প্রতিবছর গ্রীষ্মকালটা তিনি কাশ্মীরে কাটাতে শুরু করলেন।

১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁ'র ছেলে ও তাঁর রক্ষণাধীন আব্দুর রহিমকে থাট্টা (সিন্ধুদেশে) জয় করতে পাঠালেন। থাট্টার প্রাক্তন শাসক অতঃপর হয়ে দাঁড়ালেন আকবরের সভাসদ। ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে আকবর ওড়িষ্যা দখল করলেন ও সে-রাজ্যটিকে যুক্ত করে দিলেন তাঁর শাসনাধীন বাংলা-অঞ্চলের সঙ্গে। অতঃপর ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে বেলুচিস্তান জয় করলেন তিনি এবং পারস্যের কাছ থেকে কান্দাহার কেড়ে নিলেন। এই সময়ে বা এর কিছু আগে থেকেই মোগল-বাহিনী দাক্ষিণাত্যে হানা দিতে শুরু করেছিল। ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে মোগলসেনা

আহ্মদনগর নামে দাক্ষিণাত্যের দুর্বলতম সুলতানশাহী ও খুবই ছোট একটি রাজ্যের রাজধানী অবরোধ করে। পরিশেষে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে আহ্মদনগরের সুলতান মোগলদের সার্বভৌমত্ব মেনে নেন ও সামন্ত-রাজন্যে পরিণত হন। তবে তাঁর শাসিত ভূখণ্ডের অধিকাংশই এবং দৌলতাবাদও সরাসরি মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর স্বয়ং আকবরের নেতৃত্বে মোগল-সেনাবাহিনী আসিরগড় অবরোধ করে থাকে দু'বছরের জন্যে। আহ্মদনগর থেকে ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন, ছোট্ট খান্দেশ-সুলতানশাহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এই অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গটি। কিন্তু এই দুর্গও আত্মসমর্পণ করে ১৬০১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। এই সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মোগল-সেনাবাহিনীর দুর্বলতাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ওই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় ভাঁটা পড়ায় এই দুর্বলতা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে আরাম ও বিলাসের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধের সময়েও তাঁরা সর্বত্র সঙ্গে করে অসংখ্য গাড়িবোঝাই ব্যক্তিগত বিলাসের উপকরণ নিয়ে ঘুরতেন, ফলে সমগ্র বাহিনীর দ্রুত নড়াচড়ার ও রণকৌশল প্রয়োগের পক্ষে তা বাধা হয়ে দেখা দিত। এছাড়া ওই সেনাধ্যক্ষরা যুদ্ধে জয়লাভের চিন্তার চেয়ে খানাপিনার চিন্তাতেই সময় ব্যয় করতেন বেশি।

১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হল। অতঃপর সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র সেলিম, জাহাঙ্গীর উপাধি নিয়ে। আকবরের জীবনের শেষদিকে সেলিম তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং এলাহাবাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন স্বাধীন সুলতান হিসেবে। তবে সেলিমের রাজত্বকালে আগ্রাই রয়ে গিয়েছিল (সাম্রাজ্যের) রাজধানী হিসেবে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে জাহাঙ্গীরের মোগল-সিংহাসনে আরোহণ আকবরের ঘোষিত ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি থেকে কিছু-পরিমাণে বিচ্যুতির সূচক। এর ফলে হিন্দু 'জায়গিরদার'দের অধিকাংশের মধ্যে এবং মুসলিমদের কিছু-কিছু অংশের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেয়। এর অল্প কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খুসরো পঞ্জাবে পালিয়ে যান ও সেখানে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জন আর্থিক সাহায্য যোগান তাঁকে। তৎসত্ত্বেও মোগল-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে খুসরোর সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাঁর সমর্থকদের এবং তাঁকে অন্ধ করে দেয়া হয়। অর্জনদেবের ওপর জাহাঙ্গীর বরাদ্দ করে দেন মোটা একটা অর্থদণ্ডের এবং অর্জন তা দিতে

অস্বীকার করলে জাহাঙ্গীর তাঁকেও হত্যা করেন। এর পর থেকেই মোগলদের বিরুদ্ধে সক্রিয় শত্রুতার সূত্রপাত ঘটে শিখদের মধ্যে।

অতঃপর জাহাঙ্গীর ভারতের সেই সমস্ত অঞ্চল দখল করতে উদ্যোগী হন যে-অঞ্চলগুলি তাঁর পিতা জয় করতে অক্ষম হয়েছিলেন। ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে মেবারের রাজপুতেরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন মোগল-সেনাবাহিনীর কাছে। মেবারের রাজার ছেলেকে এরপর আনানো হল জাহাঙ্গীরের দরবারে এবং তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করে ও তাঁকে প্রচুর উপহার-দ্রব্য দিয়ে জাহাঙ্গীর চাইলেন এই কৌশলে অন্যান্য স্বাধীন রাজারাজড়াদেরও তাঁর পক্ষে আনতে।

মোগল-বাহিনীর আসাম-অভিযানের কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটল ওই বাহিনীর গুরুতর পরাজয়ে এবং বহু সৈন্যক্ষয়ে। এই যুদ্ধে মোগল-সাম্রাজ্যের নদীবাহিত নৌ-বাহিনীও ধ্বংস হয়ে গেল। অতঃপর কাঙ্‌ড়ায় অবস্থিত পঞ্জাবের দুর্গটির অবরোধ শুরু হল ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে। এর পাঁচ বছর পরে এই দুর্গের হিন্দু-অধিপতি আত্মসমর্পণ করলেন। অতীতে আকবরের সৈন্যদল এই দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত সে-চেষ্টা থেকে বিরত হতে বাধ্য হয়, তাই জাহাঙ্গীর তাঁর এই সাফল্যকে উদ্‌যাপন করেন বিপুল এক বিজয়োৎসবের মধ্যে দিয়ে এবং হুকুম দেন ওই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি মসজিদ-নির্মাণের।

উত্তর-ভারতে জাহাঙ্গীরের শেষ বিজয়-অভিযান পরিচালিত হয় ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে, কাশ্মীরের ছোট একটি রাজ্য কিস্‌ত্‌ওয়ার জয় করার মধ্যে দিয়ে।

বারবার জাহাঙ্গীরকে পোর্তুগিজদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছিল, কেননা পোর্তুগিজরা অনবরত মোগল-নৌবহরগুলিকে আক্রমণ করতেন। ফলে মোগল 'পাতসাহ্‌' পোর্তুগিজদের প্রতিদন্দ্বী ব্রিটিশ ও ওলন্দাজদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করে দিলেন। ওই সময়ে ব্রিটিশ ও ওলন্দাজরা সবেমাত্র ভারত-মহাসাগরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ বণিকরা পোর্তুগিজদের মতো শুধু ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় বাণিজ্য সীমাবদ্ধ রাখলেন না, তাঁরা দেশের অভ্যন্তরেও অনুপ্রবেশে সচেষ্ট হলেন এবং আগ্রা, ঢাকা, পাটনা ও দেশের অন্যান্য কারুশিল্প-উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতেও বাণিজ্য-কুঠির গড়ে তুললেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা প্রথম জেম্‌স এমন কি মোগল-দরবারেও টমাস রো নামে একজন প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দিলেন ভারতস্থিত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পক্ষে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে। এই টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে তিন বছর (১৬১৫ থেকে ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) অবস্থান করেন। ভারতে তাঁর এই তিন বছরের জীবনযাত্রার যে-সব খুঁটিনাটি তিনি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন তা পরবর্তী ইতিহাসবেত্তাদের কাজে লেগেছে।

বাংলায় মোগল-শাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি

যদিও আকবরের রাজত্বকালে বাংলা মোগল-শাসনের অধীনে আসে, তবু সাম্রাজ্যের এই প্রত্যন্ত প্রদেশটিতে মোগলদের শাসন যথেষ্ট নিশ্চিত ও নিরাপদ ছিল না। বাংলার 'জমিদার' ও 'জায়গিরদার'রা তাঁদের ভূ-সম্পত্তিগুলিকে নিজেদের বাহুবলে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিলেন সর্বদাই। বাংলার 'জমিদার'দের বশ্যতাস্বীকার করাতে মোগলদের সময় লেগেছিল চার বছর—১৬০৮ থেকে ১৬১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। বাঙালি 'জমিদার'দের দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুসা খাঁ ও ঈশা (উসমান) খাঁ এখনও পর্যন্ত ভারতে বাংলার স্বাধীনতার দুই অগ্রণী যোদ্ধা বলে সম্মানিত।

বঙ্গদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারুশিল্প ছিল অত্যন্ত উন্নত স্তরের এবং সেখানে নদনদী-পরিবৃত অঞ্চল ও কিছু-কিছু পার্বত্য-অঞ্চল ছিল যাতায়াতের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ-কারণে সেখানে সামন্ত-রাজন্যদের অধীনেও ক্রমান্বয়ে সামন্ত-রাজন্য গড়ে ওঠার প্রথা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে আগে বিকশিত হয়ে উঠতে শুরু করে। বাংলার মোগল-শাসনকর্তা ও প্রভাবশালী সেনাধ্যক্ষরা এমনভাবে এই বিজিত ভূখণ্ডটিকে ব্যবহার করতে থাকেন যেন এই রাজ্যটি তাঁদের নিজস্ব। তাঁরা খুশিমাফিক 'জায়গির' বিলি করতে থাকেন, নিযুক্ত করতে থাকেন রাজস্ব-আদায়ের কর্মচারি ও অন্যান্য স্থানীয় রাজকর্মচারি এবং 'খালিসা' জমিতে বসিয়ে দেন বহুতরো মধ্যস্বত্বভোগী। একজন লোকের একাধিক রাজকর্মচারির পদে বহাল হওয়া বাংলায় একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার মোগল-নিযুক্ত শাসক-প্রতিনিধিরা ছিলেন কার্যত স্বাধীন। যখন জাহাঙ্গীর বে-আইনী কাজকর্মের অপরাধে বাংলার জনেক শাসনকর্তাকে বরখাস্ত করলেন তখন সেই শাসনকর্তা ঢাকার কাছে এক দুর্গে বসলেন ঘাঁটি গেড়ে, আর তারপর তাঁকে দুর্গ থেকে বিতাড়িত করতে দরকার হল সামরিক বাহিনীব সাহায্য নেয়ার।

মোগলদের অনবরত আক্রমণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বাংলার কৃষকদের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন বিপর্যয়ের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলার 'রায়ত'দের জীবনে অপর এক অভিশাপস্বরূপ ছিল পত্তনদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও খাজনা-আদায়কারীরা, এই পত্তনদার ও খাজনা-আদায়কারীদের কার্যকলাপে কৃষকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। কানপুরে একবার সনাতন নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কৃষকরা খাজনা-আদায়কারী ও পত্তনদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত করেন। রাঙামাটির দুর্গ দখল করার পর কৃষকরা দখল করে বসলেন এক বিস্তৃত ভূখণ্ড। পরিশেষে অবশ্য মোগল-সৈন্য তাঁদের রাঙামাটি থেকে বিতাড়িত করল বটে, তবে বিদ্রোহীরা অতঃপর ঘাঁটি

গেড়ে বসলেন ধন্ধুমা দুর্গে। দীর্ঘকাল অবরোধ করে রাখার পর তবে এই দুর্গ মোগল-সৈন্যের হস্তগত হয়।

গণ-আন্দোলনসমূহ: রোশ্‌নিয়া ও শিখ

সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইউসুফজাই-উপজাতিগোষ্ঠী রোশ্‌নিয়া ধর্মান্দোলন থেকে বেরিয়ে যায়, তবে অন্যান্য আফগান উপজাতিরা ও বিশেষ করে বাঙ্গাশি-উপজাতিগোষ্ঠীটি তখনও এই আন্দোলনের সমর্থক থেকে যায়। রোশ্‌নিয়া-গোষ্ঠী এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন মোগল-শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কৃষকের মূলত সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সাম্য অর্জনের স্বপ্ন দেখার ফলে। এই সময়ে রোশ্‌নিয়া-গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পূর্বোক্ত বায়াজিদ আন্‌সারির পৌত্র আহ্‌দাদ। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে আহ্‌দাদ কাবুল দখল করতে সমর্থ হন, কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শহর থেকে বিতাড়িত হন তিনি। মোগলদের পিটুনি-অভিযানগুলিকে প্রায়ই রোশ্‌নিয়াদের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে পাঠানো হোত, আগ্রাসক সৈন্যদলের ওপর নির্দেশ থাকত রোশ্‌নিয়া-সম্প্রদায়ের কোনো লোককে দেখতে পেলেই তাঁকে হত্যা করতে। রোশ্‌নিয়া-গোষ্ঠীরই ভেতরকার বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে মোগলরা শেষপর্যন্ত রোশ্‌নিয়াদের সদর-ঘাঁটি ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে যাঁরা প্রাণে বেঁচে যান তাঁরা পালিয়ে যান দুর্গম পার্বত্য-অঞ্চলে। বহু বছর ধরে পশ্চাদ্ধাবন করার পর ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে আহ্‌দাদকে হত্যা করা সম্ভব হয়। অতঃপর অন্যান্য নেতা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর স্থান নেন এবং একমাত্র ১৬৩০'এর দশকের শেষদিকে রোশ্‌নিয়া-আন্দোলন নেতৃহীন হয়ে পড়ায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে শিখরা গোপনে পরিকল্পনা আঁটছিলেন মোগলদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার। গুরু হর্‌গোবিন্দ (১৬০৬ থেকে ১৬৩৮ বা ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ) নির্দেশ দেন প্রতিজন শিখকে অস্ত্রধারণ করতে ও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে। বেশ কয়েক হাজার শিখের কয়েকটি বাহিনী তাঁর ডাকে সাড়া দেন। এই বাহিনীগুলির আয়ত্তে কামান পর্যন্ত ছিল। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে গুরু হর্‌গোবিন্দকে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসতে আহ্বান জানানো হয়। তাঁর বাহিনীগুলিকে অটুট রাখার বাসনায় মোগলদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন হর্‌গোবিন্দ, তবে সেইসঙ্গে তাঁর যোদ্ধাদেরও গোপনে অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তাঁর আচার-আচরণে এত বেশি স্বাধীনচেতার ভাব প্রকাশ পায় যে শেষপর্যন্ত কারারুদ্ধ করা হয় তাঁকে। বারো বছর তিনি এইভাবে কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকেন।

১৬২৮ থেকে ১৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পঞ্জাবের মোগল-নিয়োজিত শাসনকর্তারা বেশ কয়েকবার পিটুনি-সৈন্যদল পাঠান শিখদের বিরুদ্ধে। তবু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সময়কালের মধ্যে তাঁদের দমন করা অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয়।

দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ

সপ্তদশ শতকের মোগল-সম্রাটরা সমগ্র দক্ষিণ-ভারত নিজেদের পদানত করার আশা ত্যাগ করেন নি। ওই সময়ে মোগল-সেনাবাহিনীর দাক্ষিণাত্য-অভিযান শুরু করার পক্ষে প্রধান অগ্রসর ঘাঁটি ছিল গুজরাট। আহ্‌মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা-রাজ্য মোগলদের বশ্যতাস্বীকারে রাজি ছিল না। এই তিনটি রাজ্য সর্বদাই নিজেদের সীমানা-সংলগ্ন ভূখণ্ডের দাবিদাওয়া নিয়ে পরস্পরের মধ্যে লিপ্ত থাকত যুদ্ধ-বিগ্রহে, তবে বিরল কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মোগল-সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে মৈত্রীচুক্তিতেও আবদ্ধ হোত।

মোগলরা দাক্ষিণাত্য-অভিযান শুরু করলেন সে-দেশের সবচেয়ে দুর্বল রাজ্য আহ্‌মদনগর আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। তবে এই আক্রমণ শুরু হওয়ার ঠিক আগের অল্প কয়েকটি বছরের মধ্যে ইথিওপীয় দাস-রাজা মালিক অম্বরের প্রবর্তিত নানা সংস্কারসাধনের ফলে রাজ্যটি লক্ষণীয়রকম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে মালিক অম্বর দেশের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করে তা উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশে ধার্য করেছিলেন ও কৃষকদের পক্ষে সম্ভব করে তুলেছিলেন রাজস্ব দেয়া, আবার সেইসঙ্গে তিনি ব্যাপকভাবে তাঁর সেনাবাহিনীতে লড়াইয়ের ক্ষমতার জন্যে তৎকাল-বিখ্যাত মরাঠি সৈন্যদের ভর্তি করে নেয়া শুরু করেছিলেন।

সপ্তদশ শতকে এই মরাঠিরা এক উল্লেখ্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন ভারতের ইতিহাসে। মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ সমাজগুলিতে তখন অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ক্রমশ চরমে উঠছিল এবং গ্রামীণ সমাজগুলির অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী সদস্যরা ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন ছোটখাট সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী। ওদিকে মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভূখণ্ডগুলি থেকে পশ্চিম সমুদ্রোপকূলের অভিমুখ বণিকদের ক্যারাভান-পথগুলি মরাঠা-ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। ফলে মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ সমাজগুলিতে অনেক আগে থেকেই অনুপ্রবেশ ঘটেছিল পণ্য-বনাম-মুদ্রার সম্পর্কের। জমি কেনাবেচা চলছিল, বলতে গেলে. অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে, যদিও আইনসঙ্গতভাবে একমাত্র গ্রামীণ সমাজের সদস্যদেরই অধিকার ছিল নিজেদের মধ্যে জমির স্বত্ব-সহ সকল স্বত্ব বিক্রি করার।

হালকা অস্ত্রশস্ত্রে-সজ্জিত আহ্মদনগরের মরাঠি অশ্বারোহী-বাহিনী শত্রুর বাহিনীগুলির ওপর বিদ্যুদ্বেগে আঘাত হানত, খাদ্য, ইত্যাদি সরবরাহে পূর্ণ গাড়িগুলিকে দিত ছত্রভঙ্গ করে এবং মোগলদের বিশাল অথচ জবড়জঙ্গ সেনাবাহিনীতে গুরুতর লোকক্ষয় ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াত। মোগলদের এই সামরিক অভিযান চলেছিল ১৬০৯ থেকে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, তবু এর মধ্যে মোগল-সৈন্য নতুন কোনো সাফল্য-অর্জনে সমর্থ হয় নি। কিন্তু বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সহায়তা সত্ত্বেও আহ্মদনগর-রাজ্যের পক্ষে প্রতিরোধ আরও বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। রাজ্যটির ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে বড়-বড় সেনাবাহিনী চলাচল করার ফলে রাজ্যটি এমনিতেই গিয়েছিল বিধ্বস্ত হয়ে এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের শক্তিসামর্থ্যও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে আহ্মদনগরের রাজধানী দখল করেন মোগলরা। অতঃপর যে-শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে বলা হয় যে আহ্মদনগরের ভূখণ্ডের একটা অংশ প্রাপ্য হবে মোগলদের। দাক্ষিণাত্যের উপরোক্ত তিনটি রাজ্যকেই মোটা অর্থ খেসারত দিতে হয়। অতঃপর প্রায় দশ বছর মোগলদের সঙ্গে ওই অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকে।

গুজরাটের অর্থনৈতিক অবস্থা

মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত এলাকা ও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ছিল গুজরাট। অপূর্ব চমৎকার নানা ধরনের কাপড় বোনা হোত সেখানে, নীলের চাষ হোত, মূল্যবান রক্তিমাভ ক্যর্নীলিআন পাথরের নানা হাতে-তৈরি জিনিস প্রস্তুত হোত আর তৈরি হোত আলঙ্কারিক নানা অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। অঞ্চলটির অভ্যন্তর-প্রদেশেও ব্যবসা-বাণিজ্য সু-বিকশিত ছিল এবং বেশির ভাগ শহরে ও বড়-বড় গ্রামে দৈনিক যে-বাজার বসত সেখানে বিক্রি হোত কৃষিজাত দ্রব্য ও কারিগরি শিল্পকাজ। ওই আমলে এর চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল গুজরাটের বৈদেশিক বাণিজ্য। সুরাট ছিল তখন ভারতের সর্ববৃহৎ বন্দর। এখান থেকে বাণিজ্য-জাহাজগুলি পণ্যদ্রব্যে বোঝাই হয়ে যাত্রা করত, তারা যেত পারস্য-উপসাগর ও আরবসাগরের বন্দরগুলিতে। এছাড়া ভারতের গোটা পশ্চিম-সমুদ্রোপকূল বরাবর চলত উপকূলবর্তী বাণিজ্য। স্বভাবতই এর ফলে গুজরাটে গড়ে উঠেছিল মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই বড়-বড় বণিক-গোষ্ঠী।

মুসলিম 'খাজা' ও 'বোহ্রা' এবং হিন্দু 'বঞ্জারা' ইত্যাদি বণিকদের সুনির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়গুলি ছাড়াও তৎকালীন আকর-উপাদানে উল্লেখ পাওয়া যায়

হিন্দু বণিকদের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'বানিয়া' বা 'বাক্কাল' শব্দদুটি। গুজরাটের কিছু-কিছু বণিক তখন অত্যন্ত ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। সুরাটের বণিক ভির্‌জি ভোরা (বা বোহ্‌রা)-কে তাঁর সমকালবর্তীরা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বলে মনে করতেন। তিনি বাণিজ্য-দপ্তর খুলেছিলেন আহ্‌মদাবাদ, আগ্রা, বুরহানপুর ও পরে এমন কি গোলকোণ্ডাতেও, তবে তাঁর ক্ষমতার আসল উৎস ছিল গুজরাটের সঙ্গে মালাবারের গোটা বাণিজ্য-ব্যবস্থার ওপর কার্যত তাঁর একচেটিয়া কর্তৃত্ব। সুরাটের সকল বণিককেই ভির্‌জি ভোরার ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেনে চলতে হোত এবং তিনিই নির্দিষ্ট করে দিতেন বিদেশ থেকে আমদানি-করা পণ্যদ্রব্যের দাম।

ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ ও ওলন্দাজদের বাণিজ্যেরও একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় সুরাট। ওই সময়ে ইউরোপীয় বণিকরা সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে ভারতীয় বণিকদের ক্রমশ উৎখাত করে চলেছিলেন। দেশের সামন্ত-ভূস্বামীদের ও 'পাতশাহ্‌'-এর জারি-করা নানা বিধিনিষেধ এড়াতে ইউরোপীয়রা পালাক্রমে উৎকোচ ও হুমকি দিয়ে চলতেন এবং এইভাবে ক্রমশ তাঁরা ভারতীয় বণিকদের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিজেদের অবস্থান আরও পাকাপোক্ত করে তুললেন।

ভারতীয় বণিকদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বেশি ক্ষমতাশালী তাঁরা শুরু করলেন বাণিজ্যের ব্যাপারে ইউরোপীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসায়ে অংশীদার বনে গিয়ে ইউরোপীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে লাগলেন। এইভাবে গুজরাটে গড়ে ওঠে বেনিয়ান বণিকদের (অর্থাৎ যাঁরা বিদেশী বণিকদের অংশীদার বা দালাল হিসেবে কাজ করতেন) একটি গোষ্ঠী। সামন্ত-ভূস্বামীরাও (এমন কি 'পাতশাহ্‌'এর পরিবারের লোকজনও) সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিতে লাগলেন—জাহাজগুলির সাজসরঞ্জাম যুগিয়ে এবং ইউরোপীয়দের কাছে বড়-বড় জাহাজভর্‌তি ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।

শাহ্‌ জাহান ও মহব্বত খাঁ'র পরিচালিত বিদ্রোহ

আহ্‌মদনগর জয় করার পুরস্কারস্বরূপ জাহাঙ্গীর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খুর্‌রমকে শাহ্‌ জাহান (অর্থাৎ দুনিয়ার শাসনকর্তা) উপাধি দিলেন ও তাঁকে নিযুক্ত করলেন সমৃদ্ধ গুজরাট-রাজ্যের শাসনকর্তা। ওই সময়ে জাহাঙ্গীর তাঁর প্রধানা মহিষী নুর জাহানের একেবারে হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিলেন এবং

এই প্রমত্ত আফিমখোর সম্রাট তাঁর রাজ্যের শাসনভার ক্রমশ ছেড়ে দিচ্ছিলেন নূর জাহানের হাতে। নূর জাহান ছিলেন জাহাঙ্গীরের অপর এক পুত্র শাহ্‌রিয়ারের পৃষ্ঠপোষক এবং এর ফলে শাহ্‌ জাহানের পক্ষে সিংহাসন লাভ করার পথে বিঘ্ন দেখা দিয়েছিল।

সিংহাসন হারানোর বিপদ উপস্থিত হওয়ায় শাহ্‌ জাহান গুজরাট থেকে সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয় করতে লাগলেন প্রকাণ্ড এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে এবং ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিন্তু সম্রাটের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন ও গোলকোণ্ডায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। সেখান থেকে তিনি গোপনে চলে এলেন বাংলায়। এখানে তিনি বহু সেনাধ্যক্ষের সমর্থন লাভ করলেন। বাংলা থেকে দিল্লী যাত্রার পথে এলাহাবাদের কাছে তিনি ফের একবার পরাস্ত হলেন সম্রাটের সেনাবাহিনীর হাতে। আহ্‌মদনগরে আরেকবার সেনাবাহিনী গড়ে তুলে মোগল-বাহিনীকে বুরহানপুর থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টাতেও ব্যর্থ হলেন শাহ্‌ জাহান। অবশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে ক্ষমা করলেন বটে, তবে তাঁর হাত থেকে গুজরাটের শাসনভার ফিরিয়ে নিয়ে পরিবর্তে তাঁকে দিলেন দাক্ষিণাত্যে ছোট্ট একটি 'জায়গির'।

যে মোগল-সেনাবাহিনী শাহ্‌ জাহানের বাহিনীকে যুদ্ধে বারবার পরাস্ত করেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন সেনাধ্যক্ষ মহব্বত খাঁ। মহব্বতের প্রধান সমর্থক ছিলেন রাজপুত সৈন্যরা। নূর জাহানের ঘনিষ্ঠ চক্র মহব্বত খাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং তাঁর কুৎসা-রটনায় সর্বপ্রকার ছলাকলার আশ্রয় নিতে কসুর করলেন না। মহব্বতকে দরবারে ডেকে পাঠানো হল, সেখানে সমাদর দেখানো হল না তাঁকে। অতঃপর মহব্বত তাঁর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে 'পাতশাহের' শিবির ঘেরাও করে সম্রাটকে বন্দী করলেন। কিছুদিনের জন্যে মহব্বতই হলেন কার্যত দেশের শাসক।

মহব্বতের রাজপুত সেনাবাহিনীকে হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠতে ও প্রাধান্য পেতে দেখে এদিকে মোগল-সেনাধ্যক্ষরা উঠলেন খেপে। শেষপর্যন্ত মোগল ও রাজপুত সৈন্যদলের মধ্যে ছোটখাট নানা সংঘর্ষ পরিণত হল বড়রকমের এক যুদ্ধে এবং সেই যুদ্ধে মহব্বতের প্রধান সমর্থক দু'হাজার রাজপুত নিহত হলেন। ফলে মহব্বত বাধ্য হলেন শাহ্‌ জাহানের দরবারে আশ্রয় নিতে।

১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হল ও সিংহাসনে বসলেন শাহ্‌ জাহান। সিংহাসনের অন্যান্য দাবিদারদের বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে শাহ্‌ জাহান হুকুম দিলেন তাঁর সকল নিকটতম আত্মীয়কে অবিলম্বে হত্যা করার।

শাহ্ জাহানের রাজত্বকাল

শাহ্ জাহানের দরবার আগেকার সকল সম্রাটের রাজসভাকে ঐশ্বর্যে ও জাঁকজমকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রধান-প্রধান শহরে নির্মাণ করা হয়েছিল তখন শ্বেতপাথরে-তৈরি ও অর্ধ-মূল্যবান মণিমাণিক্যে খচিত (আগ্রার বিখ্যাত তাজমহল সহ) চোখ-ধাঁধানো নানা দালান-কোঠা। এর ফলে রাজকোষ থেকে অর্থব্যয় হচ্ছিল প্রচুর। সেনাবাহিনীতে ইতিমধ্যে সৈনিকের সংখ্যা যদিও বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবু অতীতের মতো মোগল-সেনাবাহিনীর যুদ্ধের পারদর্শিতা আর ততটা ছিল না। এই সময়ে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার কাজে দেখা যাচ্ছিল যে মোগল-বাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যার চেয়ে বহুগুণে বেশি সংখ্যায় আছে শিবিরের সহযাত্রী অন্যান্য লোক ও ভৃত্যবর্গ। যুদ্ধক্ষেত্রেও তখন প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল অশ্বারোহী বা পদাতিক বাহিনীর ওপর ততটা নির্ভর না-করে রণহস্তীগুলিকে শত্রুর সেনাদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া। এর ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে মোগল-বাহিনী তখনও পর্যন্ত কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে জয়লাভ করলেও, হাতির চলাচলের অসাধ্য পাহাড়ি আফগান ভূখণ্ডে শাহ্ জাহান কিন্তু নিশ্চিত সাফল্য অর্জনের মতো অবস্থায় ছিলেন না।

অভ্যন্তরীণ নীতি

সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শাহ্ জাহানকে যুদ্ধে নামতে হল বিদ্রোহী সামন্ত-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। এক বুন্দেলা-রাজা নিজেকে স্বাধীন নৃপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন, পরে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হল শাহ্ জাহানের কাছে। অতঃপর জাহাঙ্গীরের এক প্রিয়পাত্র খাঁ জাহানও বিদ্রোহ করলেন সম্রাটের বিরুদ্ধে এবং গিয়ে যোগ দিলেন আহ্মদনগর-রাজ্যের সঙ্গে। কিন্তু মোগল-বাহিনী আহ্মদনগরের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করল এবং খাঁ জাহান পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন বুন্দেলখণ্ডে। সেখানে বুন্দেলা-রাজা 'পাতশাহের' অনুগ্রহলাভের আশায় খাঁ জাহানকে হত্যা করলেন।

দাক্ষিণাত্যের নানা যুদ্ধ এবং শূন্য রাজকোষ পূরণের জন্যে বর্ধিত হারে ভূমি-রাজস্ব আদায় করার ফলে গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং গোলকোণ্ডার অংশবিশেষে সংঘাতিক এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দাক্ষিণাত্যে সবচেয়ে বেশি করে এই দুর্ভিক্ষের শিকার হলেন গ্রামের জনসাধারণ আর গুজরাটে এর বলি হলেন শহরগুলির মানুষ। ইতিবৃত্তসমূহের বিবরণ অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষের ফলে গুজরাটে অসংখ্য কারুশিল্পী সহ মারা যান প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ। ওই অঞ্চলে

এত বেশি সংখ্যায় কারুশিল্পী মারা যাওয়ায় ও তার ফলে কারিগরি শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ রীতিমতো হ্রাস পাওয়ায় ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি অতঃপর করমণ্ডলের সমুদ্রোপকূলে কয়েকটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করতে মনস্থ করেন। তাঁরা ওই উপকূলে জমি-জায়গা কেনেন এবং সেখানেই পরে গড়ে ওঠে মাদ্রাজ বন্দর।

অতঃপর একমাত্র জাহাজনির্মাণ-শিল্পই টিকে থাকে ও তা ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে গুজরাটে। অনেক বেশি সংখ্যায় জাহাজ নির্মিত হতে থাকে সেখানে। কেবলমাত্র স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই নন, ব্রিটিশ কম্পানিও গুজরাটে-তৈরি জাহাজ কিনতে শুরু করে। তবে সবকিছু মিলিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হিসেবে ক্রমশ কমে যেতে লাগল গুজরাটের গুরুত্ব। তখন গুজরাটের স্থান নিল বাংলা। বাংলায় সূক্ষ্ম তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন জাঁকিয়ে উঠল (বিশেষ করে ঢাকায় ও পাটনায়) আর জাঁকিয়ে উঠল তামাকের চাষ ও শোরার উৎপাদন।

সপ্তদশ শতকে পোর্তুগিজরা বাংলায় তাঁদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে তুললেন। বর্ধিষ্ণু শহর হুগলি এই সময়ে কার্যত ছিল তাঁদের অধীন। পোর্তুগিজরা তামাকের ওপর কর ধার্য করলেন, ভারতীয়দের জবরদস্তি ক্রিস্টিয়ান ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী গ্রামগুলিতে হানা দিয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশে চালান দিতে লাগলেন ক্রীতদাস হিসেবে। এমন কি জাহাঙ্গীরের আমলেও পোর্তুগিজদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল প্রেরিত হয়। শেষপর্যন্ত ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে শাহ্ জাহানের রাজত্বকালে মোগল-সেনাবাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চালিয়ে যাবার পর ঝটিকা-আক্রমণে হুগলি দখল করে এবং চার হাজার বন্দী পোর্তুগিজকে চালান করে দেয় আগ্রায়। এই বন্দীদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হন তাঁদের পরে মুক্তি দেয়া হয় আর বাদবাকি বন্দীদের হত্যা করা হয়।

দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ

দাক্ষিণাত্য অধিকার করাকে শাহ্ জাহান তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ যুদ্ধ-পরিচালনার ক্ষেত্রের কাছাকাছি থাকার জন্যে, তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন বুরহানপুরে। ওদিকে মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর ফের একবার আহ্মদনগরে সামন্ততান্ত্রিক বিবাদ-বিসংবাদ শুরু হয়ে যায়। তখন দরবারের কিছু-কিছু ধর্মান্ধ মুসলমান ওমরাহের প্রভাবে পরে আহ্মদনগরের তৎকালীন শাসক তাঁর হিন্দু মরাঠি সেনাধ্যক্ষদের হত্যা করান।

মালিক অম্বরের ছেলে ফতে খাঁ-কেও তিনি কারারুদ্ধ করেন। মোগল-বাহিনী যখন আহ্‌মদনগরের বেশ কয়েকটি দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করে নিল তখন আহ্‌মদনগরের সুলতান ফতে খাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে প্রধান উজির হিসেবে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ফতে খান সুলতানকে হত্যা করে ও রাজ্য দখল করে মোগলদের পক্ষে যোগ দিলেন ও চাকুরি নিলেন মোগলদের অধীনে। এইভাবে স্বাধীনতা হারাল আহ্‌মদনগর (১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে)।

অতঃপর মোগলরা বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। দু'বার ওই রাজ্যের রাজধানী মোগল-সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধও হল, কিন্তু মোগল-শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়ার (আশপাশের গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত নিঃস্ব কৃষকরা মোগল-সৈন্যদের খাদ্য যোগাতে অসমর্থ হওয়ার) এবং মোগল-সেনাপতিদের মধ্যে নানা ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়ায় শেষপর্যন্ত মোগল-বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে ।

১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে মোগলরা ফের একবার যুদ্ধাভিযান সংগঠিত করলেন দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে। ওদিকে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি তখনও আগের মতো লিপ্ত ছিল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে। এইসব রাজ্যের দরবারগুলিও ছিল ষড়্‌যন্ত্র ও হানাহানিতে পূর্ণ, সামন্ত-ভূস্বামীরা একে অন্যকে হত্যা করায় ব্যস্ত। এই সুযোগে মোগল-বাহিনী ওই সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে অব্যাহত গতিতে জয়যাত্রায় এগিয়ে চলল আর পেছনে ফেলে রেখে গেল বিধ্বস্ত শহর আর গ্রাম। বিজাপুর আর গোলকোণ্ডা যথেষ্ট সবলভাবে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হল না, ফলে তাদের মেনে নিতে হল মোগল-সাম্রাজ্যের অধীনে সামন্ত-রাজ্যের অবস্থা এবং নতুন সার্বভৌম শাসককে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণবাবদ খেসারত ও বার্ষিক সেলামি দিতে বাধ্য হতে হল।

শাহ্‌ জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্‌জেব নিযুক্ত হলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। এই যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষধ্বস্ত দেশে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটি নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে আওরঙ্‌জেবের 'দেওয়ান' (ভূমি-রাজস্ব বিভাগের প্রধান) মুর্শিদকুলি খাঁ খাজনা ধার্য করার এক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতিটি 'মুর্শিদকুলি খানী ধারা' নামে পরিচিত। এই নতুন পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্য ছিল 'রায়ত'দের পরিত্যক্ত জমিগুলিতে এসে বসবাস করা ও চাষ-আবাদ করার জন্যে 'তকাবি' বা আগাম টাকা দাদন দিয়ে তাঁদের আকৃষ্ট করা। সেচের ব্যবস্থাযুক্ত জমির ওপর নিচুহারে খাজনা ধার্য হল, দেয় রাজস্বের পরিমাণ হিসাব করার প্রথা প্রবর্তিত হল রাজকর্মচারি ও 'রায়ত'দের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে, অর্থাৎ রাজস্ব দেয়ার ব্যাপারে কৃষকদের সামর্থ্যও ধরা হল হিসাবের মধ্যে। যদিও পরে দাক্ষিণাত্যের সামন্ত-ভূস্বামীরা প্রধান ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও প্রায় চোদ্দটির মতো

অতিরিক্ত ধরনের কর কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তবু 'মুর্শিদকুলি খানী ধারা' চালু করার ফলে দাক্ষিণাত্যে চাষ-আবাদের ক্রমিক পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল।

গণ-আন্দোলনসমূহ

যদিও এই সময়কার ইতিবৃত্তগুলিতে বড়রকমের কোনো গণ-আন্দোলনের উল্লেখ নেই, তবু মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অবসান ঘটে নি এ-যুগে। পঞ্জাবে শিখ-সম্প্রদায় বারেবারে দাঁড়িয়েছেন মাথা তুলে, তাঁদের বিরুদ্ধে শাহ্ জাহান তিন-তিনটি পিটুনি-অভিযান (১৬২৯, ১৬৩০ ও ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে) প্রেরণ করা সত্ত্বেও। বাংলায় তথাকথিত 'দস্যু'দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। দোয়াবে কৃষক-অভ্যুত্থান ঘটলে ১৬২৯ খ্রীস্টাব্দে 'রায়ত'দের শায়েস্তা করার জন্যে সৈন্যদল পাঠানো হয়। ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে ওই একই অঞ্চলে মেওয়াতি-উপজাতি বিদ্রোহ করে ও পরে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, ওদিকে দশ হাজার মোগল-সৈন্য গোটা জঙ্গল-এলাকা চষে ফেলে, মেওয়াতিদের গ্রামগুলি দেয় পুড়িয়ে আর মেওয়াতিদের মধ্যে যাঁরা প্রাণে বেঁচে যান তাঁদের বন্দী করে নিয়ে যায়।

যুদ্ধ ও সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ

উপরোক্ত এই সমস্ত গণ-আন্দোলনের ফলে মোগল-রাজকোষে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়। ওদিকে গোলকোণ্ডা-রাজ্য ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে মোগলদের যে-বার্ষিক সেলামি দেবে বলে চুক্তি করেছিল তা দেয় বন্ধ করে। ইতিমধ্যে মোগল-রাজকোষে অর্থের টানাটানি পড়ায় এই সেলামি পাওয়ার প্রয়োজন ছিল মোগলদের, তদুপরি আবার গোলকোণ্ডা ছিল ধনী দেশ। গোলকোণ্ডা রাজ্যের অর্থনীতির একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে প্রায় সবটা ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর সেখানে আদায় হোত মধ্যবর্তী পত্তনদার মারফত। এই প্রথা অবশ্য গ্রামের কৃষক ও শহরের জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই ছিল মারাত্মক ক্ষতিকারক। কিন্তু এ-ব্যবস্থা বিত্তবান সম্প্রদায়ের মানুষদের পক্ষে অনেক বেশি সুযোগের সৃষ্টি করেছিল সরকারি কর্মচারির পদ কেনার ব্যাপারে এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারি বনে যাওয়ায়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধনী ফার্সি বণিক মুহম্মদ সয়ীদ আর্দিস্তানী গোলকোণ্ডায় নিজস্ব এক বিরাট সেনাবাহিনী পোষণ করতেন এবং তিনি বিজয়নগর-রাজ্যের কাছ থেকে কর্ণাটকের একটি অংশ কেড়ে

নিয়ে সেখানকার হীরক-খনিগুলি থেকে হীরা তুলতে শুরু করে দেন। অতঃপর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও অগ্রসর হয় এবং গোলকোণ্ডার ভূমি-রাজস্ব বিভাগের প্রধান বা 'মীর জুমলা' বনে যান তিনি। ইতিহাসেও তিনি এই উপাধি দিয়েই পরিচিত এবং পরে তিনি এই উপাধিকেই নিজের নাম হিসেবে গ্রহণ করেন। ক্রমশ গোলকোণ্ডা-রাজ্যের সমস্ত বড়-বড় পদ নিজের কুক্ষিগত করে মীর জুমলা কার্যত শাসক হয়ে বসলেন গোলকোণ্ডার। এই পর্যায়ে গোলকোণ্ডার শাহ্ ও তাঁর এই প্রবলপ্রতাপ উজিরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে মীর জুমলা গোপনে মোগলের সঙ্গে চুক্তি করে তাঁদের পক্ষে চলে গেলেন ও চাকুরি গ্রহণ করলেন।

এ-খবর জানতে পেরে গোলকোণ্ডার শাহ্ মীর জুমলার ছেলেকে কারারুদ্ধ করলেন (১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দ)। ফলে আওরঙ্‌জেবের একটা অজুহাত জুটে গেল গোলকোণ্ডা আক্রমণ করার পক্ষে। মোগল-সেনাবাহিনী রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে গোলকোণ্ডার রাজধানী ভাগনগরে (বর্তমানে হায়দরাবাদে) প্রবেশ করল এবং শাহ্ যে-দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন তা অবরোধ করল। এই অবরোধ স্থায়ী হয় দু'মাস। অতঃপর যে-শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে গোলকোণ্ডা-রাজ্যের একাংশ মোগলদের ছেড়ে দিতে হয় ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণবাবদ গোলকোণ্ডার জনসাধারণকে দিতে হয় মোটা অর্থের খেসারত। রাজধানী লুণ্ঠিত হওয়ায় এবং সেলামিবাবদ মোটা টাকার দায় ঘাড়ে চাপায় রাজ্যে করের হার বাড়াতে হয় প্রচুর পরিমাণে। এই পরাজয় থেকেই গোলকোণ্ডার অর্থনৈতিক অবনতির সূচনা ঘটে।

গোলকোণ্ডাকে পদানত করার পর মীর জুমলার সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে আওরঙ্‌জেব বিজাপুর আক্রমণ করলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে (১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে) গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সম্রাট শাহ্ জাহান। ভারতে যেহেতু জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিধি প্রচলিত ছিল না এবং 'পাতশাহের' প্রতিটি পুত্রই সমানভাবে সিংহাসন দাবি করতে পারতেন, তাই এখন শাহ্ জাহানের চার ছেলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ বেধে উঠল। শাহ্ জাহানের প্রিয় ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শুকোহ্। দারা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং তাঁর মানসিক প্রবণতা ছিল অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি। তিনি হিন্দু 'সাধু-সন্ন্যাসী'দের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, 'সুফী'-মতবাদবিষয়ক গ্রন্থরচনা করতেন এবং স্বপ্ন দেখতেন ইসলাম-ধর্ম ও হিন্দুধর্মকে একত্র মেলাবার। কিন্তু তাঁর যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কারণ শাহ্ জাহান তাঁকে সারাজীবন দরবারেই ধরে রেখেছিলেন। দারা শুকোহ্‌কে সমর্থন করছিলেন হিন্দু রাজপুতরা, তাঁদের আশা ছিল যে দারা দিল্লীর সিংহাসনে বসলে আকবরের ধর্মীয় সহনশীলতার রাষ্ট্রনীতির পুনরাবির্ভাব ঘটবে।

শাহ্ জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ শুজা দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন বাংলার

শাসনকর্তা। শাহ্ জাহান মারা গেছেন এই ভুল খবর পেয়ে শুজা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে 'পাতশাহ্' বলে ঘোষণা করে সসৈন্যে আগ্রা-অভিমুখে যাত্রা করলেন। দারা শুকোহ্ শুজার বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন বটে, কিন্তু দারার সেনাবাহিনী বঙ্গদেশে ব্যস্ত থাকার সময় শাহ্ জাহানের অন্য দুই ছেলে — গুজরাটের শাসনকর্তা মুরাদ ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা আওরঙ্জেব — তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। শাহ্ জাহানের চার ছেলের মধ্যে এই রেষারেষি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং তার পরিণামে বিজয়ী হন আওরঙ্জেব। আওরঙ্জেব ছিলেন অসহিষ্ণু গোঁড়া মুসলিম এবং তিনি রাজত্ব করে যান যতটা নিজ শক্তিসামর্থ্যের জোরে তার চেয়ে অনেক বেশি করে চক্রান্ত ও নিষ্ঠুর আচরণের ওপর নির্ভর করে।

আওরঙ্জেবের রাজত্বকাল

সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে আওরঙ্জেবকে প্রচুর সাহায্য যোগান মীর জুমলা। কিন্তু সিংহাসনে বসার পর বিশ্বাসঘাতক আওরঙ্জেব তাড়াতাড়ি মীর জুমলাকে দূরে সরিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন এবং তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। কিন্তু সেখানেও মীর জুমলার সক্রিয়তা ও কর্মোদ্যোগ অব্যাহত রইল। প্রতিবেশী অহোম (বর্তমান আসামের অন্তর্ভুক্ত)-রাজ্য জয় করে নিলেন তিনি। তবে মীর জুমলার মৃত্যুর পর আসামের জনসাধারণ অস্ত্র-হাতে বিদ্রোহ করলেন এবং তাঁদের দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন থানাদার মোগল-বাহিনীগুলিকে।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে
মোগল-সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা

তাঁর দীর্ঘ রাজত্বের আমলে (১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ) আওরঙ্জেব অনবরত লিপ্ত ছিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহে, কখনও উত্তরে কখনও-বা পূর্ব ভারতে সেনাবাহিনী পাঠাতে হচ্ছিল তাঁকে এবং সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দমনের কাজে। মোগল-সৈন্যের সংখ্যা এই সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্যে এবং কয়েক লক্ষ শিবিরের সহযাত্রীতে। তা সত্ত্বেও মোগল-বাহিনীগুলির লড়াইয়ের ক্ষমতা অনবরত হ্রাস পেয়ে চলেছিল। ক্রমশ বেশি-বেশি করে আওরঙ্জেব বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করছিলেন উৎকোচ-প্রদান ও চক্রান্তের সাহায্যে, মোগল-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের জন্যে নয়। আর এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হচ্ছিল।

আওরঙজেবের রাজত্বকালে পদস্থ সামরিক কর্মচারি ও বে-সামরিক কর্মচারির সংখ্যা তাঁর পিতার আমলের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ওই সময়ে অভাব ঘটছিল 'জায়গির' হিসেবে বিলি করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ জমিরও। রাজকোষের তরফ থেকে তখন নানা ধরনের বহুসংখ্যক অতিরিক্ত কর দাবি করা হচ্ছিল বলে 'জায়গিরদার'দের আয়ও গুরুতররকমে হ্রাস পেয়েছিল। তাছাড়া অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকায় বহু 'জায়গিরদার' সে-কারণেও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁদের পক্ষে তখন আর মোগল-দরবারের বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট-সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য পোষণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অনেক সময় পরপর কয়েক বছর ধরেই এই সমস্ত সৈন্যদল বেতন পেত না, আর সে-সময়টায় তারা জীবনধারণ করত প্রধানত বে-সামরিক জনসাধারণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। অন্যদিকে আবার আগের চেয়ে অনেক বেশি করে 'জায়গির'গুলি পিতা থেকে পুত্রে, অর্থাৎ বংশ-পরম্পরায়, বর্তাচ্ছিল, যদিও এমন কি অষ্টাদশ শতকেও 'জায়গির'গুলিকে সরকারিভাবে গণ্য করা হোত রাজসেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত শর্তাধীন দান হিসেবে। সরকারি নিয়মে আগের মতোই 'জায়গিরদার'এর অধীনস্থ জমি তাঁর মৃত্যুর পর আবার রাজকোষের সম্পত্তিতে পরিণত হোত এবং চূড়ান্ত হিসাবনিকাশ করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারত রাজকোষই। তবে এই প্রক্রিয়াটি অনেক সময় বহু বছর ধরে চলত এবং এ-কারণে 'জায়গিরদার'রা রাজকোষের কাছে প্রার্থনা জানাতেন যে তাঁদের 'জায়গির'এর পরিবর্তে বেতন দেয়া হোক অর্থমূল্যে। কিন্তু আওরঙ্জেবের আমলে মোগল-সরকার সর্বদা এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতেন।

যাই হোক, পরিস্থিতি এইরকম দাঁড়ানোয়—অর্থাৎ সরকারের তহবিলে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদের অভাব ঘটায়, 'জায়গিরদার'রা তাঁদের আয়ের অধিকাংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এবং সেনাবাহিনী দীর্ঘকাল ধরে ঠিকমতো বেতন না-পাওয়ায়—সরকার, 'জায়গিরদার' ও সৈন্যরা সকলেই মন দিলেন প্রধানত কৃষকদের ঘাড় ভেঙেই নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে। আকবরের আমলে যেখানে সাধারণভাবে ভূমি-রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশে সেখানে অওরঙ্জেবের রাজত্বকালে তা বেড়ে দাঁড়াল উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকে এবং কার্যক্ষেত্রে 'রায়ত'দের কাছ থেকে নানাবিধ আদায়ের পরিমাণ ছিল এর চেয়েও বেশি। আর কৃষকদের ওপরে যত বেশি করে খাজনা ধার্য করা হতে লাগল, খাজনা আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ল তত বেশি করে। সাম্রাজ্যের বহু অঞ্চলে কৃষকদের জমিতে চাষ দেয়ার মতো সামান্য পুঁজিপাটাটুকুও আর ছিল না বলে তাঁরা নিজ পিতৃপিতামহের বাসভূমি গ্রামগুলি ও বংশ-পরম্বরায় পাওয়া চাষের জমিগুলি

ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করলেন। ওই সময়কার ইতিবৃত্তগুলিতে কৃষকদের দারিদ্র্য ও পরিত্যক্ত জনশূন্য গ্রামগুলি সম্বন্ধে বহু অভিযোগ লিপিবদ্ধ আছে।

এর ফলে সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা হল গ্রামের অবশিষ্ট কৃষকদের কাছ থেকে অন্যান্য কৃষকদেরও বাকি খাজনা আদায় করার এবং ক্রমশ এটা একটা সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়াল যে যাঁরা পালিয়ে গেছেন সেইসব কৃযকেরও বাকি খাজনা যাঁরা গ্রামে আছেন তাঁদের দেয়া। কাজেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এতে আর আশ্চর্য কী! বিশেষ করে ১৭০২ থেকে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে যে-দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তা এমন সাংঘাতিক রূপ নিয়েছিল যে সেই দুর্ভিক্ষে কুড়ি লক্ষেরও বেশি লোক মারা যায়। এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিবিধান একমাত্র সম্ভব ছিল রাজস্বের হার কমানোর মধ্যে দিয়ে, তাহলে যাঁরা জমি চাষ করতেন তাঁরা অন্ততপক্ষে কিছুটা আয় করতে পারতেন কাজ করে। কিন্তু মোগল-সরকার তাঁদের বহুতরো সামরিক অভিযানের খরচখরচা যোগানোর জন্যে অর্থ-সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন বলে রাজস্বের বোঝা লাঘব করায় রাজি ছিলেন না। বরং ব্যাপারটা ঘটছিল উল্‌টো—কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব ও অন্যান্য কর-আদায়ের দাবিদাওয়া ক্রমশ বাড়িয়েই চলছিলেন সামন্ত-ভূস্বামীরা।

কুটিরশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য

সপ্তদশ শতকে কুটিরশিল্প-কারখানাগুলি ক্রমশ বেড়ে চলেছিল, বিশেষ করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল বস্ত্রবয়ন-শিল্প (ইউরোপীয় ও এশীয় বাজারগুলিতে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প — যেমন, সুতো কাটা, ছাপা কাপড় বোনা ও কাপড়ে রঙ করা, ইত্যাদি। বড়-বড় গ্রাম ও শহরগুলিতে, বিশেষ করে ইউরোপীয়দের প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির আশেপাশে, কারিগরদের সংখ্যা ও বসতি বেড়ে চলেছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে মাদ্রাজ ক্রমশ হয়ে দাঁড়াল গোটা দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং বস্ত্রবয়ন-শিল্পের হৃৎকেন্দ্র। তখনকার প্রথা-অনুযায়ী শহরগুলির উপকণ্ঠে গড়ে উঠত কারিগরদের বসবাস ও কাজের মহল্লা। তাঁরা যে-সমস্ত শিল্পদ্রব্য তৈরি করতেন তা কিনে নিতেন বণিকদের দালালরা, তারপর সেই জিনিসগুলি তাঁরা পাঠিয়ে দিতেন নানা বাণিজ্য-কেন্দ্রে। বড়-বড় একেকটি বাণিজ্য-কেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে উঠত বেশ কয়েকটি ছোট-ছোট শহর, তারপর সেগুলি মিলেমিশে যেত আর সব মিলিয়ে সেগুলি হয়ে দাঁড়াত যাকে বলে একেকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল। বিভিন্ন

কারুশিল্পের বিকাশ ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির এই প্রতিষ্ঠার কাজ অবশ্য চলেছিল অসমভাবে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। সমুদ্রোপকূলবর্তী এই সমস্ত কেন্দ্রের মধ্যে উপকূল-বরাবর চলাচলকারী নৌবহর মারফত জোর বাণিজ্য চলত।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল ভারতের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু এই লাভের ব্যবসা থেকে যে-অর্থসম্পদ পাওয়া যেত তা জমা হোত পরভৃৎ অভিজাত-সম্প্রদায়ের হাতে বিলাসদ্রব্যের আকারে কিংবা সিন্দুকে জমা পড়ত তা, পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয় হিসেবে গণ্য হোত না মোটেই।

ছোট আকারের কুটিরশিল্পের উৎপাদননির্ভর এই অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্কের উল্লেখ্য বিস্তারের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই আবির্ভাব ঘটল বণিকদের নিয়োজিত দালালদের, যাঁরা কুটিরশিল্পীদের কাছ থেকে পণ্যসম্ভার কিনে নিতেন এবং যাঁদের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলেন কুটিরশিল্পীরা। এক্ষেত্রে এই শেষোক্তদের শোষণের প্রধান ধরনটা ছিল ফরমায়েশমাফিক ভবিষ্যৎ উৎপাদনের চুক্তিতে আগাম টাকা দাদন দেয়ার রীতি। ইউরোপীয় বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিও এই দালালদের কাজে লাগাত। 'তাঁদের' কারুশিল্পীদের ওপর বণিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতই বেশি ছিল যে বণিকরা তাঁদের প্রয়োজন ও সুবিধামতো কখনও-কখনও কারুশিল্পীদের স্থান থেকে স্থানান্তরে সরিয়ে নিয়ে যেতেন পর্যন্ত।

ভারতে কিছু-কিছু অপেক্ষাকৃত ধনী বণিক তখন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলেন। কেবল সামন্ত-ভূস্বামীরা তখন নিজেদের আয়বৃদ্ধির জন্য-যে ব্যবসায়ে লিপ্ত হচ্ছিলেন তা-ই নয়, বণিকরাও ব্যবসায়ে তাঁদের মুনাফা বাড়ানোর জন্যে যথেষ্ট উৎসাহিত ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নানা ফন্দিফিকির অবলম্বন করতে। ধনী বণিকরা কখনও-কখনও সশস্ত্র সেনাবাহিনী পোষণ করতেন ও 'জায়গিরদার' পর্যন্ত বনে যেতেন, অপরদিকে 'জায়গিরদার'দের মালিকানাধীনে প্রায়ই দেখা যেত বাণিজ্যপোত-বহর, বাজারের দোকানপাট, উটের ক্যারাভান ও পান্থশালা। ব্যবসা-বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ নিতেন এইসব 'জায়গিরদার'। দেশে উৎপন্ন সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যদ্রব্যগুলির বেলায় কখনও-কখনও এইমর্মে ঘোষণা করা হোত যে এগুলিতে একমাত্র 'পাতশাহ্'এরই একচেটিয়া মালিকানা আছে। তখন এগুলি কেনা বা বেচার জন্যে অন্যদের পক্ষে 'পাতশাহের' বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন পড়ত।

সপ্তদশ শতকের শেষদিকে কেন্দ্রীয় মোগল-প্রশাসনের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ছিল ক্রমশ। সেই সময়ে সামন্ত-রাজকর্মচারি ও ভূস্বামীরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মানসে কারুশিল্পী ও বণিকদের ওপর অতিরিক্ত নানা করের বোঝা

চাপাতে থাকেন এবং প্রায়শ কিছু-কিছু পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া মালিক বনে গিয়ে ওই সম্প্রদায়-দুটির পক্ষে যত রকমের সম্ভব বাধা ও অসুবিধার সৃষ্টি করতে লেগে যান। তদুপরি মোগল-সাম্রাজ্যের আমলে অধিকাংশ কারুশিল্পী ও বণিক হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে আওরঙ্জেবের রাজত্বে তাঁরা ছিলেন ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার এবং অ-মুসলমানদের ওপর ধার্য-করা অতিরিক্ত মাথট-খাজনার (বা 'জিজিয়া') ভারে জর্জরিত। এ-কারণেও তাঁদের মধ্যে বিরোধ ও বিরূপতার অন্ত ছিল না।

আওরঙ্জেবের ধর্মীয় নীতি

আওরঙ্জেবের সিংহাসনে আরোহণের ফলে 'জায়গিরদার'দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলি অতঃপর মোগল-দরবারে জাঁকিয়ে বসল, সর্বব্যাপারে তাদের প্রভাব হয়ে দাঁড়াল নির্ধারক। ঠাণ্ডামাথা ও হিসেবী রাজনীতিক আওরঙ্জেব ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান এবং দারা শুকোহের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় সূচিত করেছিল এমন এক রাষ্ট্রনীতির, যার মূলকথা ছিল হিন্দুদের সকল অধিকার হরণ ও শিয়া-মতাবলম্বী মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন। দেশের জীবনযাত্রাকে ইসলামের শিক্ষা-অনুযায়ী ঢেলে সাজার উদ্দেশ্যে আওরঙ্জেব শিয়া-মতাবলম্বীদের উৎসবগুলি নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং বন্ধ করে দিলেন মদ্যপান, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, নৃত্য, ভাঙের গাছ রোপণ, ইত্যাদি। ১৬৬৫ থেকে ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি হুকুম দিলেন হিন্দু-মন্দিরগুলিকে ভেঙে ফেলতে ও সেগুলির ধ্বংসস্তূপের ওপর মসজিদ বানাতে। হিন্দুদের পক্ষে মর্যাদাসূচক কোনো চিহ্ন ধারণ করা, হাতির পিঠে চড়া, ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সবচেয়ে গুরুতর বোঝাস্বরূপ ছিল অ-মুসলমানদের ওপর চাপানো মাথা-পিছু কর বা 'জিজিয়া'। আকবরের উঠিয়ে-দেয়া এই করের পুনঃপ্রবর্তন করেন আওরঙ্জেব ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে। এর ফলে গণ-বিদ্রোহ দেখা দেয় দিল্লী, গুজরাট, বুরহানপুর, ইত্যাদি জায়গায়। মরাঠা, রাজপুত, জাঠ, ইত্যাদিরা ফুঁসে উঠলেন বিদ্রোহে। আফগান মুসলমানরাও বিদ্রোহ করলেন। মোগল-শাসনের কবল থেকে স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের এই তাগিদ ছিল ভারতের বেশ কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় সচেতনা উন্মেষের প্রথম লক্ষণ। এই জাতিগুলি মোগল-রাষ্ট্রকে পরক ও উৎপীড়ক জ্ঞান করতে লাগলেন, জ্ঞান করতে লাগলেন তাঁদের ধর্মীয় মনোভাবের পক্ষে প্রায়শই বিঘ্নসৃষ্টিকারী হিসেবে। এই সমস্ত গণ-আন্দোলনের ফলে মোগল-সাম্রাজ্যের ক্ষমতার ভিত্তি গেল ধসে।

স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্যে সংগ্রামে মরাঠাদের ঐক্য জাতি হিসেবে তাঁদের গড়ে ওঠার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সূচক। দাক্ষিণাত্যের শাসকদের অধীনে সৈনিক হিসেবে তাঁদের চাকুরি থেকে যে-দীর্ঘকালীন সামরিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে মরাঠিদের মধ্যে তা মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁদের সহায়ক হয়। এই সংগ্রামের পেছনে চালক-শক্তিস্বরূপ ছিলেন সমগ্র মরাঠি-জনসাধারণ। তাঁরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে মোগল-রাজশক্তিকে একবার চূর্ণ করে দিতে পারলে তাঁরা দেশে ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। মরাঠি 'ভক্তি'বাদী কবিরাও তাঁদের কাব্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন এই ন্যায়ের সংগ্রামে যোগ দিতে। শিবাজীর গুরু রামদাস (১৬০৮ থেকে ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দ) ঘোষণা করলেন: 'সবই হারিয়েছি আমরা—জানো কি তুমি/আছে শুধু এই মোদের মাতৃভূমি!'

প্রথম যে-মরাঠা নেতা দাক্ষিণাত্যে এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি হলেন শাহ্‌জী। তাঁর নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের একবার আহ্‌মদনগর একবার বিজাপুর ইত্যাদি রাজ্যের চাকুরিতে ঢুকিয়ে শাহ্‌জী তার বিনিময়ে শর্তাধীনে কিছু-কিছু জমি লাভ করেন এবং এইভাবে পুনা ও মাওয়ালের 'জায়গির'দুটির অধিপতি হন। শাহ্‌জীর পরে তাঁর পুত্র শিবাজী মরাঠা যোদ্ধাদের নিয়ে ছোট-ছোট বাহিনী গড়ে তুলতে সক্রিয় হলেন এবং অভিজাত মরাঠা-পরিবারগুলির অধীনস্থ ছোট-ছোট দুর্গ একের-পর-এক আক্রমণ করে জয় করে নিলেন। এ-ব্যাপারে সামরিক কৃতিত্ব ছাড়া নানারকম ষড়্‌যন্ত্র ও চক্রান্তও তাঁর কাজে লেগে যায়।

শিবাজীর শক্তিবৃদ্ধিতে বিজাপুরের সুলতান ভয় পেয়ে গেলেন। ফলে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে বয়স্ক সেনাপতি আফজল খাঁ'র নেতৃত্বে প্রকাণ্ড এক সৈন্যবাহিনী পাঠানো হল মরাঠাদের বিরুদ্ধে। সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মগুলির মধ্যে যুদ্ধ হলে তাঁর সেনাবাহিনীর নড়াচড়ার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হবে এবং মরাঠাদের পক্ষে সুবিধা হবে বেশি—এটা অনুভব করে আফজল খাঁ শিবাজীকে আমন্ত্রণ জানালেন একটি পাহাড়ের চুড়োয় তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যে মিলিত হতে ও জানালেন যে ওই পাহাড়চুড়োয় শুধু তাঁরা দু'জন উঠবেন মাত্র। অপর কেউ থাকবেন না। আফজল খাঁ তাঁর পোষাকের নিচে একখানা ছোরা লুকিয়ে রেখেছিলেন, শিবাজীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি শিবাজীকে আলিঙ্গনের ছলে তাঁর দেহে ওই ছোরা দিয়ে আঘাত করলেন। কিন্তু শিবাজী বর্ম পরে আসায় এই আঘাতে তাঁর ক্ষতি হল না, উপরন্তু আফজল খাঁ-কে আলিঙ্গন করার সময় তিনি

তাঁর জামার আস্তিনের নিচে লুকনো লৌহনির্মিত বাঘনখ দিয়ে আফজল খাঁকে গুরুতরভাবে আহত করলেন। অতঃপর তিনি নিজ অনুচরদের ডাকলেন এবং তাঁরা পাহাড়ে উঠে মাথা কেটে ফেললেন মোগল-সেনাপতি আফজল খাঁ'র। সেনাপতি নিহত হওয়ায় বিজাপুরের সেনাবাহিনীও দ্রুত পর্যুদস্ত হয়ে গেল। এর পর মরাঠারা বিজাপুর-রাজ্যের মধ্যেও শুরু করলেন হানা দিতে ও লুটপাট করে প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আসতে।

আওরঙ্জেব স্থির করলেন যে মরাঠাদের — ঘৃণাভরে যাঁদের তিনি 'পাহাড়ি ইঁদুর' বলে উল্লেখ করতেন — তাঁদের উপদ্রবের শেষ নিষ্পত্তি ঘটাবেন। এই উদ্দেশ্যে শায়েস্তা খাঁ'র নেতৃত্বে এক মোগল-বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন তিনি। শায়েস্তা খা পুনা অধিকার করলেন, কিন্তু একরাত্রে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে শিবাজী শায়েস্তা খাঁকে পরাজিত করলেন ও শায়েস্তা খাঁ ভয়ে শিবির ছেড়ে পালালেন। ফলত, মোগল-সেনাবাহিনীও পশ্চাদপসরণ করল। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী আক্রমণ করলেন সুরাটের অরক্ষিত বন্দরটি। সেখানকার বণিকদের বিপুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করায় ও বন্দরের বাসগৃহ ও গুদামঘরগুলি ধ্বংস করে দেয়ায় সমগ্রভাবে গুজরাটের ব্যবসা-বাণিজ্য ও মোগল-সাম্রাজ্যও গুরুতর ঘা খেল। অতঃপর আওরঙ্জেব শিবাজীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাঠালেন তাঁর সবসেরা সেনাপতিদের একজন, রাজপুত জয় সিংহকে। এবার শিবাজী বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে পুরন্ধরে যে-শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হল সেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মোগলদের বড়-বড় সবক'টি দুর্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন শিবাজী এবং মোগল-সরকারের অধীনে কাজ করবেন বলে কথা দিতে হল তাঁকে। জয় সিংহ শিবাজীকে বুঝিয়ে রাজি করালেন আগ্রায় গিয়ে সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানাতে, বললেন যে শিবাজী এ-কাজ করলে 'পাতশাহের' অনুগ্রহ পাবেন তিনি। কিন্তু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শিবাজী যখন মোগল-রাজধানীতে পৌঁছলেন তখন তাঁদের উলটে বন্দী করা হল। অনেক কষ্টে, বহুতর কূটকৌশল প্রয়োগ করে তবে শিবাজী পুত্রসহ বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে ও আগ্রা ছেড়ে পালাতে সক্ষম হলেন। দেশে ফিরে আসার পর ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে ফের নতুন করে আক্রমণ শুরু করলেন শিবাজী। দ্বিতীয়বার সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করলেন তিনি। এর ফলে বিদেশী বণিকরা তখন সেখানে ব্যবসা করতে ও এমন কি বাণিজ্য-জাহাজ পর্যন্ত ওই বন্দরে ভেড়াতে সাহস পেতেন না। বন্দরটির অর্থনৈতিক গুরুত্বও হ্রাস পেল এর ফলে।

এই সময়ে শিবাজী বারেবারে হানা দিতে লাগলেন বিজাপুর, বেরার, খান্দেশ, গুজরাট ও কর্ণাটক-অঞ্চলে। হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মরাঠা অশ্বারোহী-বাহিনী তখন বিখ্যাত ছিল তার দ্রুত চলাফেরার জন্যে: মোগল-সৈন্যের বিচ্ছিন্ন একেকটা

বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ও সবকিছু লুণ্ঠন করে বিদ্যুদ্‌বেগে লুঠের মাল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত মরাঠা-বাহিনী। ওই সময়কার সকল ভারতীয় শাসকের সৈন্যদলের মতো শিবাজীর সেনাবাহিনীও ছিল ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে গঠিত, তবে তাঁর সৈন্যদের বেতন দেয়া হোত সরাসরি রাজকোষ থেকে, 'জায়গিরদার'-সেনাধ্যক্ষরা ব্যক্তিগতভাবে বেতন দিতেন না তাঁদের। তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল কড়া সামরিক নিয়মকানুন ও ওপরওয়ালাকে মেনে চলার নীতি। প্রতিজন সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিক সুনির্দিষ্ট হারে বেতন পেতেন। যুদ্ধাভিযান পরিচালনার সময় অবশ্য—অর্থাৎ বছরের মধ্যে আট মাসই—সৈন্যরা ও সেনাপতিরা বেতন পেতেন না, তাঁরা তখন বিজিত অঞ্চলের জনসাধারণের খরচেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। তবে শত্রুর ভূখণ্ডস্থিত জনসাধারণের মতো মরাঠা কৃষকদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল। বর্ষাকালে মরাঠা-বাহিনী যখন ঘরে ফিরে আসত তখন সকল লুণ্ঠিত দ্রব্য রাজকোষে সমর্পণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। অতঃপর ওই লুণ্ঠিত দ্রব্য যুদ্ধকালীন সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট প্রত্যেকের বেতনের হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকল যোদ্ধার মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোত এবং বাকি অংশ জমা পড়ত রাজকোষে।

মোগল-সাম্রাজ্য ও বিজাপুর-রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন ও স্বনির্ভর এক মরাঠা-রাষ্ট্র গঠন করার পর ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে পুনায় রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হলেন শিবাজী। পরক উৎপীড়কদের কবল থেকে নিজ মাতৃভূমিকে মুক্ত করেছিলেন যাঁরা সেই মরাঠাদের জাতীয় সচেতনা এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে আরও বলীয়ান হল।

মহারাষ্ট্রে (মরাঠাদের মূল ভূখণ্ডে) শিবাজী রাজস্ব ধার্য করেছিলেন অপেক্ষাকৃত নিচু হারে। তিনি রাজকোষে অর্থাভাব পূরণ করতেন লুণ্ঠিত দ্রব্যের সাহায্যে এবং 'চৌথ' দিয়ে ('চৌথ' হল তথাকথিত উপদ্রব এড়ানোর জন্যে এক ধরনের ঘুস। আওরঙ্‌জেবের নিযুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তারা মরাঠাদের অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় এই অর্থ মরাঠাদের দিতেন। ওই শাসনকর্তারা তাঁদের শাসিত অঞ্চলের জন্যে আগে মোগলদের যে-পরিমাণ রাজস্ব দিতেন মরাঠারা তার এক-চতুর্থাংশ বা 'চৌথ' দাবি করতেন তাঁদের কাছে)। শিবাজী এই 'চৌথ'কে নিয়মিত দান বা রাজস্বে পরিণত করেন। অষ্টাদশ শতকে মরাঠারা এছাড়া আরও একটি অতিরিক্ত করের প্রবর্তন করেন, যার পরিমাণ ছিল কোনো একটি অঞ্চলের মোট রাজস্বের এক-দশমাংশ। একে বলা হোত 'সর্‌দেশমুখী'।

১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী গোলকোণ্ডার সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে

কর্ণাটক আক্রমণ করেন। তাঁর সেনাবাহিনীর পিছু পিছু এবার গিয়েছিল ধ্বংসসাধক ও লুণ্ঠনকারীদের কয়েকটি বিশেষ বাহিনী। যে-পথ দিয়ে এই বাহিনীগুলি গিয়েছিল সেখানকার সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল তারা। মরাঠা-বাহিনী আসছে শুনলে আক্রান্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা তখন সবকিছু ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতেন। নিছক আগ্রাসনের উদ্দেশ্য নিয়েই মরাঠা-বাহিনীগুলি অন্যান্য রাজ্যে যেত তখন, তাদের চরম লক্ষ্য ছিল নতুন-নতুন ভূখণ্ড দখল করে নিজেদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা।

শিবাজীর আমলে তাঁর সহযোদ্ধা সঙ্গীরা বৈষয়িক লাভালাভের চিন্তা না-করে তাঁদের দেশবাসীর জাতীয় ও ধর্মীয় মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করে গেছেন। কেননা তাঁরা যদি মোগল-সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতেন তাহলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের জুটত অনেক বেশি। কিন্তু ক্রমশ ভূ-সম্পত্তি ও ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তাঁরা পরিণত হয়ে গেলেন সেকালে যেমনটি দেখা যেত তেমনই সাধারণ সামন্ত-ভূস্বামীতে। শিবাজীর নিজের ছেলে শম্ভাজীই মেতে উঠলেন স্বচ্ছন্দ ও বিলাসবহুল জীবনযাপনে। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পর তিনিই মরাঠা-রাজ্যের অধিপতি হলেন।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গণ-অভ্যুত্থানসমূহ

মোগল-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে তখন ক্রমাগত ফুঁসে উঠেছিল নানা গণ-অভ্যুত্থান। যদিও এইসব অভ্যুত্থানের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন-ভিন্ন এবং এগুলির মধ্যে সংযোগ কিংবা সমন্বয় ছিল সামান্যই। এগুলির পেছনে চালক-শক্তি এবং লক্ষ্য ইত্যাদিও ছিল বিভিন্ন, বিচিত্র। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, বিদ্রোহী জাঠদের অধিকাংশ যেমন ছিলেন কৃষক তেমনই শিখ-ধর্মান্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন শহরের জনসাধারণ। আবার মরাঠা, রাজপুত ও শিখরা যেমন উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ও তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখার সপক্ষে সংগ্রামকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, স্বাধীনতা অর্জনে উদ্যোগী আফগানদের কাছে তেমনই এই ধর্মবিশ্বাসের সমস্যাটি ছিল অনেকখানি অবান্তর। বরং আফগানরা আওরঙ্‌জেবের মতোই সুন্নি-মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন। এই সমস্ত বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান ঘটছিল তখন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় সচেতনার উন্মেষ ঘটার ফলে। আগ্রা ও দিল্লী-অঞ্চলে জাঠ-কৃষকরা উঁচু হারে কর ধার্য করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। তাঁদের নেতা গোকলার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করলেন এবং আগ্রা থেকে দিল্লীগামী বাণিজ্য-ক্যারাভানপথটি দিলেন বন্ধ

করে। মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশিদিন যুদ্ধে পেরে ওঠা জাঠদের পক্ষে সম্ভব হল না, ফলে বীরোচিত প্রতিরোধ সত্ত্বেও পর্যুদস্ত হলেন তাঁরা। সৈন্যশিবিরে বন্দী করে রেখে গোকলাকে পরে আগ্রায় হত্যা করা হল।

১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে নারনোলে (ওই নামেরই অঞ্চলে অবস্থিত) সৎনামী (অর্থাৎ, 'সত্যিকার নাম'ধারী)-সম্প্রদায় বিদ্রোহ করলেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্রোহী জাঠরা আওরঙ্‌জেবকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। দশ হাজার মোগল-সৈন্যের এক বাহিনী এই অভ্যুত্থানকে দমন করে। কিন্তু জাঠদের অভ্যুত্থান ফের একবার ফুঁসে ওঠে ১৬৮৫ থেকে ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, আর তারপর আরও একবার তা মাথা তোলে চৌরামন নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে।

ওদিকে ইউসুফজাই, খট্টক কিংবা আফ্রিদি-সম্প্রদায়গুলির নেতৃত্বে আফগানদের বিদ্রোহ বারেবারে দেখা দিতে থাকে। কখনও-কখনও, যেমন ১৬৬৭ ও ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে, আফগানরা তাঁদের সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মগুলির মধ্যে যুদ্ধ করে একেকটা গোটা মোগল-বাহিনীকেই ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হন। কিন্তু এরপর আওরঙ্‌জেব নিজে তাঁর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন এবং কিছু-কিছু আফগান উপদলীয় নেতাকে উৎকোচ দিতে ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর আফগান সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিতে শুরু করেন। ফলে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আফগান উপজাতিদের মধ্যেকার ঐক্য। একমাত্র জনেক একাগ্র দেশপ্রেমিক ও বিশিষ্ট কবি কুশ্‌হল খাঁ মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং খট্টক-ভূখণ্ডে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর (১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে) অভ্যন্তরীণ কলহবিবাদে ওই রাজ্যের পতন ঘটে। এমন কি আজও আফগানরা কবি ও বীর-নায়ক হিসেবে শ্রদ্ধা জানিযে থাকেন কুশ্‌হল খাঁ'র স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

শিখরাও মোগলদের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ সংগ্রাম চালিয়ে যান। ক্রমশ বেশি-বেশি করে শিখদের দলে যোগ দিতে থাকেন পঞ্জাবের জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ। শিখ-সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগ বাহাদুর এই বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ করেন ও আনন্দপুরে এক দুর্গ স্থাপন করেন। পঞ্জাবি কৃষকরাও সাড়া দিতে থাকেন তাঁর আহ্বানে। কিন্তু ইতিমধ্যে মোগলদের হাতে ধরা পড়ে যান তিনি এবং ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। তাঁর পুত্র গুরু গোবিন্দ সমগ্র শিখ-আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করেন সামরিক শিক্ষার ভিত্তিতে, এর পর থেকে শিখ-আন্দোলন আর বণিক ও কারুশিল্পীদের সমর্থনপুষ্ট নিছক একটি সম্প্রদায়গত ধর্মীয় আন্দোলন হয়ে রইল না, তা গড়ে উঠতে লাগল বিদ্রোহী কৃষকদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী মতাদর্শভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে। গোবিন্দ

ঘোষণা করলেন যে অতঃপর 'গুরু'র কর্তৃত্ব বিস্তৃত হবে গোটা শিখ-সম্প্রদায়ের ('খালসা'র) ওপর। শিখদের কাছে দাবি করা হল তাঁদের পূর্ববর্তী 'জাতি'-পংক্তি ও ধর্মীয় আনুগত্যকে বর্জন করতে এবং স্বীকার করতে একমাত্র অন্যান্য শিখের সঙ্গে তাঁদের ঐক্য ও সংযুক্তিকে। শিখ-ধর্মাবলম্বীদের জন্যে বিশেষ নিয়মকানুন প্রবর্তিত হল এবং এর ফলে তাঁরা নির্ভুলভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের থেকে পৃথক বলে চিহ্নিত হলেন। তাঁরা অতঃপর বিশেষ ধাঁচের পোশাক পরতে, লম্বা চুল রাখতে বিশেষ ধর্মীয় প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

উপরোক্ত এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় গুরু গোবিন্দ শিখ-সম্প্রদায়কে প্রবল শক্তিশালী এক সংগঠনে পরিণত করতে সক্ষম হলেন এবং এর ফলে এই সম্প্রদায় পঞ্জাবে মোগল-রাজশক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। শিখ-আন্দোলনের মূল ভিত্তি অবশ্য ছিলেন পঞ্জাবিরাই, তবে ভারতের অন্য যে-কোনো অঞ্চলের যে-কোনো লোকের পক্ষে বাধা ছিল না এ-আন্দোলনে যোগ দেয়ার। গুরু গোবিন্দ পঞ্জাবে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করলেন, পাহাড়ি অঞ্চলের ছোট-ছোট 'রাজা' ও 'জমিদার'দের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হলেন, তবু এ-সমস্ত সত্ত্বেও মোগল-সেনাবাহিনীগুলির আক্রমণ-প্রতিরোধে সক্ষম হলেন না শেষপর্যন্ত। দীর্ঘ ও দৃঢ়সংকল্প প্রবল প্রতিরোধের পর আনন্দপুরের পতন হল, পালাতে বাধ্য হলেন গুরু গোবিন্দ। অতঃপর দীর্ঘদিন তাঁকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে হয় এবং ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন তিনি। কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও শিখরা তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যান।

মোগল-সেনাবাহিনীর মধ্যে যাঁরা ছিলেন সর্বদাই শক্তির প্রধান উৎস, সেই রাজপুতদের মধ্যেও এ-সময়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্‌জেবের দরবারের এক প্রাক্তন উচ্চপদস্থ ওমরাহ্ মাড়োয়ারের রাজার মৃত্যু ঘটলে ওই রাজ্যে মোগল-সম্রাটের পৃষ্ঠপোষিত ব্যক্তি এবং মৃত রাজার শিশুপুত্রের সমর্থকদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মাড়োয়ার-রাজের এই শিশুপুত্র রাজ্যে মোগল-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রতীকী নেতা হিসেবে গণ্য ছিলেন। ফলে মাড়োয়ারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন আওরঙ্‌জেব। এই সেনাবাহিনী যথারীতি রাজ্যটির গ্রামগুলি ধ্বংস করে দিল, শহরগুলি লুট করল এবং বিনষ্ট করে দিল হিন্দু-মন্দিরগুলি। ঠিক ওই সময়ে মাড়োয়ারের প্রতিবেশী রাজপুত মেবাররাজ্যের রানা রাজসিংহও বিদ্রোহ করলেন। মেবারের বিরুদ্ধে আওরঙ্‌জেব পাঠালেন পুত্র আকবর ও তাঁর সেনাবাহিনীকে, কিন্তু মেবার-সৈন্য আকবরের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করল এবং রাজসিংহ আকবরের সঙ্গে এই গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে তিনি যদি তাঁর পিতাকে সিংহাসন থেকে

উৎখাত করতে চেষ্টা করেন তাহলে রাজপুতরা সাহায্য করবেন তাঁকে। এরপর আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন কিন্তু ধূর্ত আওরঙ্জেব আকবর ও রাজপুতদের মধ্যে মৈত্রীর সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিলেন। অতঃপর আকবর পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন মরাঠাদের।

মেবার-রাজ্যের সঙ্গে আওরঙ্জেব এবার শান্তিচুক্তি করলেন। তবে মাড়োয়ার মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায় ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজপুতদের দুটি বৃহত্তম রাজ্যের প্রতিটির সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে রাজপুতদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে মোগল-বাহিনী কিছুটা দুর্বলই হয়ে পড়ে। কেননা রাজপুতানায় সেনাবাহিনীর বড় একটি অংশ থানাদারির কাজে রাখতে হওয়ায় সেই অংশটিকে মরাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না মোগলদের পক্ষে।

বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা-বিজয়

গণ-অভ্যুত্থানগুলিকে দমন করার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ছিল বলে আওরঙ্জেব তাঁর রাজকোষ পূর্ণ করতে মনস্থ করলেন এবং এ-উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে বসলেন বিজাপুর-রাজ্য। বিজাপুরের রাজধানী অবরুদ্ধ হল এবং আশপাশের এলাকা গেল বিধ্বস্ত হয়ে। দুর্গকেন্দ্রিত রাজধানী প্রতিরোধ করে চলল দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে, অবশেষে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলিত প্রতিরোধকারীদের মনোবল গেল নষ্ট হয়ে। বিজাপুর আত্মসমর্পণ করার পর মোগল-বাহিনী গোটা শহর লুণ্ঠন করে শহরের জল-সরবরাহের ব্যবস্থা সহ সবকিছু ধ্বংস করে দিল। একদার ঐশ্বর্যশালী জমকালো রাজধানী বিজাপুর পরিণত হল ধ্বংসস্তূপে ও কালক্রমে তা গ্রাস করে নিল অরণ্য। অতঃপর পালা এল গোলকোণ্ডার। মোগলরা শুধুমাত্র গোলকোণ্ডার সেনাধ্যক্ষদের উৎকোচ দিয়েই দুর্গ-রাজধানী দখল করে ফেললেন (১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ)। খোদ মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল গোলকোণ্ডা। ফলে আওরঙ্জেবের রাজকোষে লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের আর অবধি রইল না।

এটা ছিল সেই সময় যখন মোগল-সাম্রাজ্য তার ইতিহাসে বৃহত্তম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন প্রায় সমগ্র ভারত-উপমহাদেশ এবং তা দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর পেন্নোর ও তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত আর উত্তরে তার অন্তর্ভুক্ত ছিল কাশ্মীর এবং কাবুল ও গজনি-শহর সহ আফগান প্রদেশগুলি। একমাত্র কান্দাহার তখনও পর্যন্ত পারস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর যে-সমস্ত জরুরি আইনকানুন মরাঠাদের রাজ্যে সামন্ততন্ত্রের বিকাশকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল সে-সমস্ত লঙ্ঘিত হতে শুরু করল। মরাঠা সেনাপতিরা সেনাবাহিনীর লুট-করা অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রীর অধিকাংশ নিজেদের ব্যক্তিগত অধিকারে রাখতে শুরু করলেন, ফলে মরাঠা সেনাপতিদের ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে লাগল বিষয়-সম্পত্তিগত পার্থক্য। শম্ভাজী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচররা যুদ্ধাভিযান সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশি করে মন দিলেন আরাম ও বিলাস-সম্ভোগে। সিদ্দি-রাজবংশশাসিত জাঞ্জিরা দ্বীপ দখলের জন্যে মরাঠাদের প্রয়াস ব্যর্থ হল (১৬৮০-১৬৮২ খ্রীস্টাব্দ), ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগিজদের চৌল বন্দরের ওপর আক্রমণও হল বিফল। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে মোগল-বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে শম্ভাজীর রাজধানী দখল করে নিল এবং পুত্র শাহু সহ বন্দী হলেন শম্ভাজী। ফের একবার মহারাষ্ট্র মোগল-শাসনের অধীন হল।

মরাঠা-রাজ্যের পতনের পর মরাঠাদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম বৃদ্ধি পেল বিপুল আকারে এবং পরে তা পরিণত হল সত্যিকার এক জনযুদ্ধে। শিবাজীর শিশুপুত্র রাজারাম তখন জিঞ্জিতে মরাঠাদের নামেমাত্র রাজা হিসেবে বাস করছিলেন আর এই ঘটনাটিই মরাঠা-সেনাপতিদের যুদ্ধ-বিগ্রহকে বৈধ ক্রিয়াকলাপের একটা চেহারা দিয়েছিল। তবে মরাঠা-সেনাবাহিনী ক্রমে তাদের বৈশিষ্ট্যসূচক জাতীয় সত্তা ফেলছিল হারিয়ে। বহু মরাঠি তখন মোগলদের অধীনে চাকুরি নিচ্ছিলেন, মোগল-সৈন্যদেরও অনেকে তাঁদের প্রাপ্য বেতন ইত্যাদি ঠিকমতো না-পাওয়ায় ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ পাওয়ার আশায় কখনও-কখনও পালিয়ে এসে যোগ দিচ্ছিলেন মরাঠা-বাহিনীতে। মরাঠা সেনাপতিদের মধ্যেও বিবাদ-বিসংবাদ বাধতে শুরু করল এবং কখনও-কখনও তা পরিণত হতে লাগল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। ঐক্যবদ্ধ এক সামরিক শক্তি হিসেবে মরাঠা-বাহিনীর অস্তিত্ব আর রইল না।

মোগল-সেনাবাহিনীও ইতিমধ্যে বিভিন্ন মরাঠা-বাহিনীগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল, অবরোধ করতে লাগল তাদের দুর্গগুলিকে। তবু এইসব মরাঠা-দুর্গ সাড়ম্বরে জয় করে নেয়া সত্ত্বেও মোগলদের আধিপত্যের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি ঘটল না। কেননা, ছোট একেকটি থানাদার বাহিনীকে ওইসব দুর্গে বসিয়ে রেখে মূল মোগল-বাহিনী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরাঠারা দ্রুত ফের দখল করে ফেলতে লাগলেন দুর্গগুলিকে। ভারতীয় এক ইতিহাসবেত্তার চমৎকার একটি মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে, আওরঙ্জেবের এইসব সামরিক অভিযান ছিল নদীর বুক চিরে নৌকো চলে যাওয়ার সমান, কেননা

নৌকোটি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে রেখে-যাওয়া নদীর বুকচেরা চিহ্নটি আশপাশের জল এসে ঢেকে দিত।

১৭০৭ সালে কোনো একটি সামরিক অভিযান শেষ করে মোগল-সেনাবাহিনী যখন বুরহানপুরে ফিরছিল (এই বুরহানপুরেই তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন আওরঙ্জেব ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে) তখন মরাঠা-বাহিনীগুলি সমগ্র মোগল-বাহিনীটিকেই চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। মোগল-বাহিনীর এই অভিযান পরিচালনা করছিলেন আওরঙ্জেব স্বয়ং। তখন তাঁর বয়স উননব্বুই বছর। আর ঠিক ওই সময়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর অনুচরেরা কোনোমতে তাঁকে আহ্মদনগরে এনে ফেলতে পেরেছিলেন। ছেলেদের কাছে লেখা আওরঙ্জেবের শেষ চিঠিগুলি তিক্ততায় ভরা। তিনি লিখছেন: 'এমন-যে মূল্যবান জীবন তা-ও অকারণে নষ্ট হয়ে গেল।' দৌলতাবাদের কাছে (মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল) তাঁর সমাধির ওপর কোনো জমকালো সমাধিসৌধ নির্মিত হয় নি, সমাধির ওপর আছে শুধু শাদাসিধে একখানা শ্বেতপাথরের ফলক ও ফলকে খোদাই-করা একটি লেখন।

আওরঙ্জেবের উত্তরাধিকারীদের—বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-১৭১২ খ্রীস্টাব্দ), মুহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ) এবং আহ্মদ শাহের (১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্বকালে মোগল-সম্রাটরা পুতুলরাজার চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বহুতরো পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী-চক্রের পৃষ্ঠপোষিত অক্ষম ব্যক্তিমাত্র। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নতুন-নতুন ভূখণ্ড একে-একে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল, নিজেদের স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করতে লাগল তারা, তবু সার্বভৌম মোগল-সাম্রাজ্য সম্পর্কে জনপ্রবাদ, 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা'র ধারণা জনমনে টিকে থেকেছিল আরও কিছুকাল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ভারতীয় সংস্কৃতি

সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি

আকবরের রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছিল মুসলমান ও হিন্দু এই দুটি প্রধান সংস্কৃতি থেকে আহৃত উপাদানসমূহের এক সংশ্লেষণী প্রক্রিয়া। হিন্দু-সংস্কৃতির উপাদানগুলি স্পষ্টতই প্রাধান্য পেয়েছিল ফতেপুর সিক্রির অট্টালিকাগুলির স্থাপত্যশৈলীতে: তাই আমরা দেখতে পাই সমতল ছাদের গঠন, ফুলের মালার বিজড়িত ছাঁদে হিন্দু অলঙ্করণ-শৈলীর ছাপ, ইত্যাদি।

ফতেপুর সিক্রিতে কিছু-কিছু দালানের ছাদের কার্নিশ অলঙ্কৃত করা হয়েছিল জীবজন্তুর মূর্তি দিয়ে এবং রাজপ্রাসাদের একটি ঘরের দেয়ালে ছিল পশুপাখিদের মূর্তিশোভিত একখানি ব্যাস-রিলিফের খোদাই-কাজ। এই মূর্তিগুলি পরে কুপিয়ে কেটে নষ্ট করে ফেলা হয় আওরঙ্জেবের হুকুমে। কারণ আওরঙ্জেব ছিলেন কোরানের কঠোর অনুসারী এবং কোরানে নির্দেশ আছে যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর প্রতিমূর্তি ইত্যাদি গড়া চলবে না।

পার্সি-ভাষায় লিখিত আকবরের দরবারের কাব্যগুলিতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নানা লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়—যেমন, কবির প্রিয়তমার সঙ্গে হিন্দু দেবীর তুলনা এবং কবির নিজেকে তুলনা করা ব্রাহ্মণের সঙ্গে, তাছাড়া সর্বজনীন মানবপ্রেমের কাব্যিক প্রশস্তি-রচনা। কিছু-কিছু কবি তখন হিন্দু পুরাণ থেকে উপাখ্যান সংগ্রহ করেও সে-বিষয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন (যেমন, আবুল ফজ্লের ভাই ও আকবরের সময়ে ফার্সি-ভাষার কবিদের মধ্যে অন্যতর প্রধান ফৈজী রচনা করেছিলেন 'নল-দময়ন্তী' কাব্য)। আবুল ফজ্ল স্বয়ং তাঁর 'আইন-ই-আকবরি' (আকবর-প্রচলিত সংবিধি) গ্রন্থে (এটি তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থ 'আকবর-নামা'র অংশ হিসেবে লিখিত হয়, তবে বর্তমানে এটি পৃথক গ্রন্থ হিসেবেই প্রকাশিত হয়ে আসছে) অনেকখানি স্থান ছেড়ে দেন প্রাচীন ভারতের দার্শনিক মতবাদগুলির, হিন্দুসমাজে স্বীকৃত অধিকারসমূহ ও হিন্দু-রীতিনীতির এবং হিন্দু-পুরাণগুলির বর্ণনায় ও ব্যাখ্যায়। 'আইন-ই-আকবরি'র 'দর্শটি সুবার জরিপ' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে প্রতিটি 'সুবা' (বা অঞ্চল)-এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে আবুল ফজ্ল ওই অঞ্চলের হিন্দু-জনসাধারণের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, তাঁদের মন্দির ও তীর্থস্থান এবং অন্যান্য কীর্তিস্তম্ভ ইত্যাদি সম্পর্কিত বহু তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। পরবর্তী যুগে অবশ্য উপরোক্ত এই প্রবণতার প্রকাশ হ্রাস পায় এবং বিশেষ করে আওরঙ্জেবের আমলে কেবল-যে চারুশিল্প ও কবিতা অবক্ষয়ের যুগে প্রবেশ করে তাই নয়, এমন কি ইতিবৃত্ত-রচনাও সম্রাটের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হয়। এক কথায়, শিল্প-সাহিত্যের সবকিছুই ছিল এই ধর্মান্ধ সম্রাটের অপছন্দ।

সাহিত্য

ওই যুগের সাহিত্যসৃষ্টি কেবলমাত্র বাদশাহের দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বহু আঞ্চলিক ভাষায় ও বহুবিধ সাহিত্য-রীতিতে প্রকাশ ঘটেছিল তার। ওই যুগে সাহিত্যের সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ধরনটি ছিল 'ভক্তি'বাদী কাব্য। আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে লিখিত লোকগীতিগুলি মধুর সুরে গেয়ে শোনাতেন

'ভক্ত' কবিরা, আর সেগুলির বিষয় হোত রূপক-কাহিনী কিংবা তাঁদের ধ্যানলব্ধ উপলব্ধির কথা। এইসব গানের অনেকগুলিই এখনও পর্যন্ত লোকগীতি হিসেবে টিকে আছে। 'ভক্ত' কবিরা মানুষের কাছে আবেদন জানাতেন জাতি ভেদ-প্রথার বিরোধিতা করতে, তাঁরা ঘোষণা করতেন যে ঈশ্বরের চোখে সকল মানুষই সমান এবং ধনী, ভূস্বামী ও ধর্মীয় নেতাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করতেন। তবে এই সমস্ত মূলত মানসিক ধ্যানধারণা তাঁরা প্রকাশ করতেন সাধারণ ধর্মকথার আবরণে। আকবরের শাসনকাল থেকে শুরু করে পরবর্তী মোগল-যুগের শ্রেষ্ঠ 'ভক্তি'বাদী কবিদেরই মধ্যে ছিলেন: তুলসিদাস (১৫৩২ থেকে ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দ), যাঁর রচিত 'রামচরিত-মানস' নানাবিধ হিন্দি কথ্যবুলিতে রূপান্তরিত হয়ে গীত হোত হিন্দুদের উৎসবগুলিতে ও এইভাবে তা জনসাধারণ্যে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে; এছাড়া ছিলেন ষোড়শ শতকের শেষার্ধের কবিকুল—রাজপুতানার অধিবাসী সুরদাস, রাজপুত মহিলা-কবি মীরাবাই, মহারাষ্ট্রের একনাথ, আসামের শঙ্করদেব এবং শিখ-গুরুবৃন্দ। বাংলায় ওই যুগের দু'খানি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীরচিত চৈতন্যজীবনী-কাব্য 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'এ আছে সে-যুগের বাংলার বাস্তববাদী জীবনচিত্র ও তার সঙ্গে মেশানো লোককথা ও অলৌকিক কল্পনা। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে 'ভক্তি'বাদ আরও বিকশিত হয়ে ওঠে বাংলার বৈষ্ণব গীতিকাব্যে — চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ইত্যাদির পদরচনায় এবং সপ্তদশ শতকে জাতীয় সংগ্রামের আবেদনে পূর্ণ মরাঠা ও শিখদের গানে ও গাথাকাব্যে।

ভারতে দরবারী কবিতা লেখা হচ্ছিল রাষ্ট্রভাষায়, কিন্তু সে-ভাষা জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল না। মোগল-সাম্রাজ্যে এই রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি, আর দাক্ষিণাত্যের সুলতানশাহীগুলিতে তা ছিল উত্তর-ভারতের ভাষা উর্দু। যদিও এই দুটি ভাষায় লিখিত কাব্যে ঐতিহ্যসিদ্ধ ভারতীয় বিষয়বস্তু ব্যবহার করা হচ্ছিল এবং এমন কি ভারতীয় ভূ-দৃশ্য, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, ইত্যাদির বর্ণনাও স্থান পাচ্ছিল ক্রমে-ক্রমে, তবু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এইসব কাব্যের রচনা-রীতি ও চিত্রকল্পের ব্যবহার ছিল তাজিক ও পার্সি-কাব্যনির্ভর। এই পার্সি ও উর্দু-ভাষা দেশের ব্যাপক জনসাধারণের কাছে পরক হলেও এই দরবারী কবিদের মধ্যে কেউ-কেউ তৎসত্ত্বেও সত্যিকার শিল্পসিদ্ধ কাব্যরচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। পার্সি-ভাষায় যাঁরা লিখতেন সেই ভারতীয় কবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন ফৈজী—বিশেষ করে গীতিকবিতা রচনায়—এবং বেদিল (১৬৬৪ থেকে ১৭২১ খ্রীস্টাব্দ)। বেদিল যদিও 'সুফী'রূপকবর্ণনাকে তাঁর প্রধান অবলম্বন হিসেবে নিয়েছিলেন, তবু তাঁর কাব্য গভীর আবেগ ও বিষাদে পূর্ণ। জনসাধারণের

নিপীড়ক স্বৈরশাসকদের নিষ্ঠুরতার নিন্দা করেছেন তিনি। ফারসি-ভাষা যখন আর ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রইল না দেশের মানুষের কাছে বেদিল তখন কার্যত বিস্মৃতই হলেন, কিন্তু তাঁর কাব্য তখন দ্বিতীয় আশ্রয় খুঁজে পেল মধ্য-এশিয়ায়। উর্দু-ভাষায় কাব্যরচয়িতা দাক্ষিণাত্যের কবি গাওয়াসির (ষোড়শ শতাব্দী) ভাগ্যেও এই একই ব্যাপার ঘটেছে, উত্তর ভারতে তিনি পরিচিত হলেও দাক্ষিণাত্যের মানুষ তাঁর কাব্যপাঠে অসমর্থ।

ইতিহাস

ভারতের ইতিহাসবেত্তারা তাঁদের রচনাবলীতে বহু-পরিমাণে আকর-উপাদানসমূহ ব্যবহার করেছেন এবং প্রায়ই তাঁদের বর্ণনায় অঙ্গীভূত করেছেন তাৎকালিক আকর-দলিলপত্র কিংবা ওইসব দলিলের সার-সংক্ষেপ। ষোড়শ শতকের মূল্যবান আকর-উপাদান মেলে বাবরের স্মৃতিকথা 'বাবরনামা'য় এবং আবুল ফজলের ইতিবৃত্ত 'আকবর-নামা' ও বদাউনির 'মুন্তাখব-উত্-তাওয়ারিখ'এ। সপ্তদশ শতকে এই ধারা অনুসরণে লিখিত হয় বাংলার তৎকালীন মোগল-সেনাধ্যক্ষ মির্জা নাথানের স্মৃতিকথা 'বাখারিস্তান-ই-গাইবি' ('বসন্তবর্জিত দেশ') এবং আব্দুল হামিদ লাহোরি-রচিত ইতিবৃত্ত 'পাতশাহ্-নামা' ও মুহম্মদ সালিহ্ কাম্বুর 'আমাল-ই-সালিহ্' ('সালিহের শ্রম')। আওরঙ্জেবের রাজত্বকালে কাফি খাঁ-রচিত 'মুন্তাখব-উল্-লুবব' ('নির্বাচিত রচনাংশ') আমাদের কাল পর্যন্ত টিকে গেছে।

স্থাপত্য-শিল্প

অন্যান্য সকল শিল্পের চেয়ে স্থাপত্য-শিল্প তখন নির্ভরশীল ছিল ধনী পৃষ্ঠপোষকদের ওপর। মোগল-সাম্রাজ্যের শক্তি ও আধিপত্য প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বেশি-বেশি সংখ্যায় জমকালো প্রাসাদ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটতে লাগল। এইসব দালানে মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর পাশাপাশি স্থান পেতে লাগল স্থানীয় ভারতীয় শিল্পরীতির ঐতিহ্য। ফতেপুর সিক্রি শহরটি তার চারিপাশের ভূ-দৃশ্যপটের পরিবেশে চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল, স্থাপত্যশৈলীর বিচারে শহরটির দালানগুলি ছিল নিরাভরণ; সরল ছাঁদের। শাহ্ জাহানের রাজত্বকাল ছিল স্থাপত্যশৈলীতে সমৃদ্ধ জমকালো ভাব আমদানির বিচারে সবচেয়ে উল্লেখ্য। আকবরের আমলেও ফতেপুর সিক্রিতে একটিমাত্র শ্বেতপাথরের সমাধি নির্মিত হয়েছিল শেখ সেলিম চিস্তির স্মৃতিরক্ষার্থে। আর শাহ্ জাহানের রাজত্বে, বিশেষ

করে আগ্রা ও দিল্লীতে, স্থাপত্য-শিল্পে অলঙ্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্ধ-মূল্যবান ও কখনও-কখনও এমন কি মহা মূল্যবান মনিরত্নে পর্যন্ত খচিত চমৎকার শ্বেতপাথরের ব্যবহার। আওরঙ্‌জেবের রাজত্বকালেও গোড়ার দিকে বর্তমানে লালকেল্লার অন্তর্বর্তী মোতি মসজিদের মতো মূল্যবান উপাদানে হর্ম্য-নির্মাণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দেয়ায় বাদশাহ্‌ আরও সাধারণ ধরনের হর্ম্য-নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে আওরঙ্‌জেবের প্রিয়তমা পত্নী রাবেয়া দৌরানির কবরের ওপর নির্মিত সমাধিসৌধ মোটের ওপর তাজমহলের ঢঙে তৈরি হলেও তাতে আদি তাজমহলের সুশোভন সামঞ্জস্য-বোধের অভাব ঘটতে দেখা গেছে। আবার আওরঙ্গাবাদে নির্মিত সমাধির শুধুমাত্র প্রধান সৌধটিরই সামনের দিকের দেয়াল, তাও আবার এক-মানুষ-সমান উঁচু পর্যন্ত, শ্বেতপাথরের ফলক লাগানো হয়েছে, আর সৌধটির বাকি অংশ নির্মিত হয়েছে হালকারঙের বেলে-পাথর দিয়ে। তাছাড়া এই সৌধ-সমাহারের মিনারগুলি নির্মিত হয়েছে ইট গেঁথে ও তার ওপর চুনের প্রলেপ দিয়ে।

পারস্য, মধ্য-এশিয়া এবং দিল্লী ও আগ্রা থেকে আমদানি-করা দাক্ষিণাত্যের হর্ম্যগুলির মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল রেখার শোভনতা, কারুকার্যের জটিলতা ও সুসমঞ্জস অনুপাত-বোধ। অপরপক্ষে বঙ্গদেশে প্রচলিত স্থাপত্যশৈলী ততখানি ভাবপ্রকাশক হয়ে ওঠে নি। যদিও কিছু-কিছু মন্দির ও বসত-বাড়ি সেখানে কারুকার্য-খচিত ও ব্যাস-রিলিফশোভিত পোড়ামাটির টালির আস্তরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, তবু সাধারণভাবে তা ছিল ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি ও চুনকাম-করা এবং দেয়ালগুলিতে জানলা থাকত খুবই কম ও তাও আবার সংকীর্ণ।

চিত্রকলা

মিনিয়েচর (ক্ষুদ্রাবয়ব) চিত্রই ছিল ওই যুগের চিত্রশিল্পের প্রধান ধরন। ষোড়শ শতাব্দীতে মিনিয়েচর-চিত্রের রাজপুত ধারাটি গড়ে ওঠে রাজপুতানার ভিত্তিচিত্রের প্রভাবে। এটি জৈন মিনিয়েচর-চিত্র-ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারা হিসেবেও পরিচিত। বাদশাহের দরবারে মোগল মিনিয়েচর-চিত্রেরও একটি ধারা গড়ে ওঠে, এটি ছিল পারসিক চিত্র-ঐতিহ্যের জের। বস্তুত চিত্রকলার এই বিশেষ ধরনটির সৃষ্টি হয়েছিল পারস্যেই, যদিও মোগল-দরবারের মিনিয়েচর-চিত্রগুলি পারস্যের মিনিয়েচর-চিত্রের চেয়ে বেশি বাস্তববাদী ও কম শিল্পকেতা-দুরস্ত ছিল। বস্তুত, রাজপুত ও মোগল-মিনিয়েচার চিত্রকলা প্রভাবিত করেছিল পরস্পরকে। মোগল-মিনিয়েচরগুলি ছিল এক-মাত্রিক, শুধুমাত্র তুলির আঁচড়ে বোঝানো হোত চিত্রিত বিষয়ের আয়তন বা ত্রিমাত্রিকতা এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চতর এই তিনটি স্তরের সাহায্যে চিত্রানুপাত

বোঝানো হোত। এই মধ্য-স্তরবর্তী মানুষ বা অন্যান্য বস্তুর আকারগুলি অপর দুটি স্তরের চেয়ে হোত অপেক্ষাকৃত বড়। এইসব ছবি দেখলে মনে হয় শিল্পী যেন বাড়িগুলিকে ওপর থেকে দেখছেন। সপ্তদশ শতকে, বিশেষ করে শাহ্ জাহানের রাজত্বকালে, ইউরোপীয় বিষয়বস্তু ইত্যাদিকেও এই মিনিয়েচর-চিত্রে কখনও-কখনও প্রবেশলাভ করতে দেখা যায় (যেমন, ম্যাডোনা ও শিশুর চিত্র) আর দেখা যায় কিছু-কিছু ইউরোপীয় অঙ্কন-রীতিকে গ্রহণ করতে (যেমন, কিছু-কিছু মূর্তির চিত্রাঙ্কনে আলো-আঁধারির সাহায্যে ত্রিমাত্রিকতা প্রকাশ করা)। ছবিগুলিতে ব্যবহৃত রঙ ছিল প্রাকৃতিক বস্তুজাত, সাধারণত খনিজ পদার্থজাত, আর এই রঙ আজও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। দাক্ষিণাত্যে আগ্রার মিনিয়েচর-চিত্রধারার মতো অনেকটা একরকম একটি মিনিয়েচর-চিত্রাঙ্কনের ধারা গড়ে উঠেছিল, তবে মোগল-দরবারের চিত্রকলার চেয়ে তা ছিল অনেক বেশি খুঁটিনাটি বিশদে ভরা। অষ্টাদশ শতকে চিত্রাঙ্কনের ঐতিহ্যসিদ্ধ শৈলীগুলির ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দেয়, তবে তখন রাজপুতদের ছোট-ছোট রাজ্যে চিত্রাঙ্কনের নতুন-নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়। এগুলি পরে পরিচিত হয় 'পাহাড়ি' ধারা নামে।

জনপ্রিয় উৎসবসমূহ

মধ্যযুগীয় ভারতে অতীতের মহাকাব্যের নানা ঘটনা ও জনশ্রুত বীর-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে সঙ্গীত ও নৃত্য-সহযোগে নানা ধরনের জনপ্রিয় উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হোত। বিশেষ করে বিষ্ণুর উপাসনা ও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে এগুলি ছিল সম্পর্কিত। তামিলনাড়ুতে এই জনপ্রিয় উৎসবগুলি পরিচিত ছিল 'টেরাকুটু' নামে, কর্ণাটকে 'যক্ষগণ' ও অন্ধ্রদেশে 'বিধিনাটকম' নামে, আর উত্তর-ভারতে 'রামলীলা' ও বাংলায় 'পাঁচালি', 'যাত্রা', 'কবিগান', 'আখড়াই' ইত্যাদি নামে। (অতীতের মহাকাব্যগুলির ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা) এইসবে অবশ্য প্রায়ই সমকালীন মোগল-উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে (ও পরে ব্রিটিশ-শাসকদের বিরুদ্ধে) ব্যঙ্গবিদ্রূপের নানা দৃশ্য ও ঘটনাও যোগ করে দেয়া হোত। কখনও-কখনও বিশেষ পুজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষে এইসব উৎসব মঞ্চস্থ হোত সামন্ত-ভূস্বামীদের গৃহে ও মণ্ডপেও। তবে রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অনেক সময় উৎসবগুলি তাদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলত এবং পরিণত হোত কৃত্রিম ভণ্ডামিতে।

আধুনিক ভারত

কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি কতোভ্স্কি

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষ দখল
(আঠারো শতক)

মোগল সাম্রাজ্যের পতন

আঠারো শতকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং এদেশ স্বাধীনতা হারায়। ভারতীয় রাজ্যসমূহ এবং নিজ নিজ দেশের পৃষ্ঠপোষকতাধীন ভারতে ব্যবসারত ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির মধ্যেকার শক্তিস্থিতি ইউরোপীয়দের অনকূলেই নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছিল। ষোল শতকে ভারতে ইউরোপীয়দের সামান্য কয়েকটি শক্ত ঘাঁটি ও পণ্য-গুদাম ছিল; সতেরো শতকে সেখানে গড়ে ওঠে অনেকগুলি ব্যবসাঘাঁটি ও বসতি এবং আঠারো শতকে তারা ভারতীয় রাজ্যসমূহ দখল শুরু করে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ইউরোপীয়রা বল বা ভেটের সাহায্যে যে-মোগলদের কাছ থেকে একদা ব্যবসার সুবিধা আদায় করেছিল আঠারো শতকে তারা সেই মোগলদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে নি। তখন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বরত ভারতীয় রাজ্যগুলি একে অন্যের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং এভাবেই শেষোক্তরা এই সংগ্রামে শরিক হওয়ার সুযোগ পায়।

আওরঙ্‌জেবের শাসনকালে শুরু-হওয়া এই পতনের গতি তাঁর মৃত্যুর পর আরও ত্বরিত হয়। উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে অতঃপর যে-লড়াই দেখা দেয় জ্যেষ্ঠতম মোয়াজ্জেমের বিজয়ের মধ্যেই এর সমাপ্তি ঘটে। মোয়াজ্জেম তখন বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-১৭১২) নাম ধারণ পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭০৭)। এই বয়স্ক অস্থিরমতি শাসক একমাত্র শিখদেরই দমনের প্রয়াস পান, যারা গুরু গোবিন্দ সিংয়ের হত্যার পর বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। দৃঢ়চেতা এই শিখনেতা অনেক 'নিচু শ্রেণীর অসন্তুষ্ট ভারতীয়দের' (তৎকালীন ঐতিহাসিকের ভাষায়) নিজ লক্ষ্যের অনুবর্তী করেন ও সিরহিন্দ দখল করে নেন। অতঃপর সত্তর হাজার সৈন্য সহ বান্দা শাহারানপুর জেলাটি হস্তগত করে লাহোর অবরোধ করেন ও ব্যর্থ হন। বাহাদুর শাহ্ নিজে বান্দার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন ও ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে শিখদের প্রধান ঘাঁটি সিরহিন্দের পতন ঘটে। মোগল বাহিনীর চাপে শিখরা হিমালয়ের পাহাড়তলী পর্যন্ত পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এবার যিনি সবচেয়ে অযোগ্য সেই জাহান্দর শাহ্ (১৭১২-১৭১৩) জনৈক

সুদক্ষ পরামর্শদাতার সাহায্যে সিংহাসন লাভ করলেন। অবশ্য কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফারুকশিয়ার (১৭১৩-১৭১৯) দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত ও কয়েদখানায় নিহত হন। বলতে গেলে, তখন ফারুকশিয়ারের পরামর্শদাতারাই ছিলেন দেশের সত্যিকার শাসক। এদের মধ্যে আকবরের আমল থেকে যোদ্ধা হিসাবে খ্যাত বার্হা'র সৈয়দ-গোষ্ঠীর দুই ভাইই প্রধান ছিলেন।

ইতিমধ্যে বান্দা আরেকবার পঞ্জাবে সামরিক অভিযান চালান। কিন্তু কামানের অভাবে তিনি লাহোর দখলে ব্যর্থ হন। ফারুকশিয়ার শিখদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠান এবং তারা গুরুদাসপুর গড় অবরোধ করে। ক্ষুধায় অবরুদ্ধ শিখরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। মোগল সৈন্য গড়ে প্রবেশ করে সেখানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে আনীত বান্দা ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘ নির্যাতন ভোগের পর নিহত হন।

ফারুকশিয়ার এবার সৈয়দ-ভাইদের অপসারণের চেষ্টা শুরু করলেন, কিন্তু তাঁর পরাজয় ঘটল। অতঃপর বাহাদুর শাহের দুই পৌত্র কিছুকাল দিল্লীর সিংহাসনে ক্রমান্বয়ে আসীন থাকেন। অবশেষে তৃতীয় পৌত্র পারিষদদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সৈয়দ-ভাইদের হটিয়ে মুহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮) নাম ধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু বিলাস ছাড়া তাঁর অন্যতর কোন লক্ষ্য ছিল না। মুহম্মদ শাহের বিলাসবহুল রাজসভা এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য বিপুল অর্থব্যয় হত। কৃষকদের উপর সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় শোষণ চলছিল এবং খাজনার সত্যিকার কোন নিয়মকানুনও ছিল না। ফলত, বহু কৃষক খাজনা এড়ানোর জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে সৈন্যদলে যোগ দিচ্ছিল কিংবা নিজেরাই বাহিনী গড়ে তুলে আশপাশের গ্রাম-গঞ্জে লুটপাট চালাচ্ছিল, এমন কি দিল্লী পর্যন্ত আক্রমণ করেছিল। ক্রমান্বয়ে উত্তরাধিকারী বদলের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

আওরঙ্জেব কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার গভর্নর মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে মোগলদের পাঠানো তাঁর সরকারী উত্তরাধিকারীকে প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি দিল্লীকে করদানও বন্ধ করে দেন এবং মুর্শিদাবাদ শহরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭১৪ ও ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি বিহার এবং ওড়িষ্যাকেও বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে নেন।

এই নতুন বঙ্গদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল-শাসকদের অধীনতা মেনে নিলেও কার্যত এটি ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে ফারুকশিয়ার কর্তৃক ইংরেজ বণিকদের দেয়া বাণিজ্য সুবিধাগুলি তারা বঙ্গদেশে কার্যকর করতে পারে নি। দাক্ষিণাত্যের মোগল গভর্নর আসফ জা'ও মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হায়দরাবাদ নামে একটি নতুন রাজ্য গঠন করেন। গোলকোণ্ডা দুর্গের অদূরে হায়দরাবাদ নামে একটি স্থানে নতুন রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়।

আসফ জা ও হায়দরাবাদ সিংহাসনের নিজাম উপাধিধারী তাঁর উত্তরাধিকারীরা দক্ষিণ ভারত অধিকারের জন্য মরাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যাও মোগলদের হস্তচ্যুত হয়। লক্ষ্ণৌতে রাজধানী স্থাপন করে এটিও একটি স্বাধীন রাজ্য হয়ে ওঠে। অতঃপর দিল্লীর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপজাতি রোহিলা-আফগানদের হটিয়ে অযোধ্যা নিজ সীমানা বিস্তারের প্রয়াস পায়। ততদিনে মোগল সাম্রাজ্য আগ্রা-দিল্লী এলাকার মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছিল।

এই সময় কেবল মরাঠারাই সারা ভারতের উপর নিজের অধিকার দাবি করতে পারত। মোগল সিংহাসনের বিভিন্ন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলাকালে মরাঠারা কেবল পশ্চিম ভারতেই নিজেদের অবস্থান মজবুত করে নি, মধ্যভারতেও তাদের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে এনেছিল। সেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো সংগঠিত সৈন্যবাহিনী না থাকায় নিজ প্রাপ্য 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের অজুহাতে তারা শহর ও বসতির উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। দিল্লী থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত শম্ভাজীর পুত্র শাহু ও শাহুর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলবর্তী হিসাবে শাসনরত রাজারামের বিধবা পত্নী তারা বাইয়ের মধ্যে তখন মহারাষ্ট্রের সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

ইতিমধ্যে পেশোয়া (প্রধানমন্ত্রী) বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০) যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি বস্তুত সকল ক্ষমতাই নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করে মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বংশ পত্তন করেন। শিবাজী বংশের সভ্যরা তখনো রাজা হিসাবে গণ্য হলেও নিজেদের বাসস্থান কোলাপুর শহর ছেড়ে তাঁরা কোথাও যেতে পারতেন না। সৈয়দ-ভাইদের সমর্থন করার জন্য বালাজী দক্ষিণ মোগল-সাম্রাজ্যের ছ'টি 'সুবা' (প্রদেশ) থেকে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের ফরমান পান। অর্থাৎ এতে মরাঠাদের লুণ্ঠন আইনসম্মত হয়ে ওঠে। যথাসম্ভব অধিক সংগ্রহ এবং ধনীদের গোপন ধনভাণ্ডার হস্তগত করার জন্য ওদের উপর অত্যাচার চালানোর অধিকার দিয়ে তারা তাদের সৈন্যবাহিনী সেইসব প্রদেশে পাঠাত। মরাঠাদের আগমন সংবাদে এসব সুবার বাসিন্দাদের উদ্বেগের সীমা থাকত না, তারা ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালাত।

আঠারো শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত মধ্যভারতের বিশাল এলাকা মরাঠাদের হস্তগত হয়। ফলত তাদের চারটি বড় রাজ্য গড়ে ওঠে। নাগপুরে ভোঁসলা, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, ইন্দোরে হোলকার এবং বরোদায় গাইকোয়াড়-রাজবংশ যথাক্রমে এগুলি শাসন করত। এসব রাজ্য পুনায় অবস্থিত পেশোয়াদের শাসনকেন্দ্রের কিছুটা অধীনস্থ ছিল। অচিরেই বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মিশ্র সমাহারের মধ্যে মরাঠাদের এই রাজ্যসংঘে মরাঠারা এক সংখ্যালঘু শাসকে পর্যবসিত হয়। মরাঠা সৈন্যবাহিনী অতঃপর আদর্শহীন জাতীয় চেতনাবর্জিত একটি বিচিত্র জনসংঘ হয়ে উঠেছিল। এই রাজ্যগুলিতে বহু রকমের করভারে জর্জরিত কৃষকদের অবস্থা

খুবই শোচনীয় ছিল। বস্তুত, মরাঠা রাজ্যসংঘ একটি সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। চরম উন্নতির দিনের মোগল সাম্রাজ্য থেকে এর সহজলক্ষ্য পার্থক্য হল—এটি ছিল কিছুটা বিকেন্দ্রীকৃত।

বালাজীর পুত্র প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০) উত্তরের দিকে মরাঠাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মরাঠারা দিল্লী দখল করলে যে সারা ভারত তাদের হস্তগত হবে এতে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি বলতেন: 'কোন শুকনো গাছের কাণ্ডে আঘাত করলে তার ডালপালা আপনা থেকেই ঝরে পড়ে।' কিন্তু দক্ষিণ থেকে মরাঠারা যখন দিল্লী অভিমুখে এগিয়ে আসছিল তখনই উত্তর থেকে পারস্যরাজ নাদীর শাহের সৈন্যরা দিল্লী আক্রমণ করে। মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহের হতাশ সৈন্যরা এই আক্রমণরোধে ব্যর্থ হয়। দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত নাদীর শাহের সৈন্যরা প্রায় বিনা বাধায় পেঁছলে পাণিপথের অদূরে কর্ণালে শেষপর্যন্ত মোগল ও পারসীকদের মধ্যেকার মূল যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল সিদ্ধান্তমূলক না হওয়ায় নাদীর শাহ্ সৈন্যদের দেশে ফেরার আদেশ দেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই শান্তির প্রস্তাব নিয়ে মুহম্মদ শাহের দূত তাঁর কাছে পেঁছয়। অতঃপর নাদীর শাহ্ দিল্লীতে দু'মাস কাটান, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটান, সিন্ধুনদের উত্তরের মোগল এলাকা (বর্তমান আফগানিস্তান) নিজের দখলে নেওয়ার ফরমান আদায় করেন এবং মোগলদের প্রচুর ধনদৌলত ও বিজয়ীর ভেট সহ স্বদেশে রওয়ানা হন। নাদীর শাহের প্রত্যাবর্তনের পর বিধ্বস্ত দিল্লীতে তখন লুটেরাদের রাজত্ব, বাসিন্দাদের অধিকাংশই উধাও এবং সামন্ত নেতারা অন্য অভিজাতদের দরবারে, বিশেষত লক্ষ্ণৌতে (অযোধ্যার রাজধানী) আশ্রয়প্রার্থী।

আফগানরা দীর্ঘকাল পারসীকদের অধীনে থাকে নি। ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে নাদীর শাহ্ নিহত হলে তারা আহ্মদ শাহ্ আবদালীর (দুর্রানী) নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আহ্মদ শাহ্ কিন্তু নাদীর শাহের সৈন্যদের সঙ্গে দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানে মোগলদের দুর্বলতাটি বুঝতে পেরে তিনি সারা ভারত জয়ে অভিলাষী হন। তিনি ১৭৪৮, ১৭৫০, ১৭৫২, ১৭৫৬-৫৭, ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে এই পাঁচবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মোগলদের বদলে শিখদের কাছ থেকেই তিনি প্রধানত বাধার সম্মুখীন হন। আফগানিস্তানের সঙ্গে তাঁর সরবরাহ-পথটি বার বার কেটে দিয়ে শিখরা তাঁকে স্বদেশ প্রত্যবর্তনে বাধ্য করেছিল।

ইতিমধ্যে পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের (১৭৪০-১৭৬১) নেতৃত্বে মরাঠারা উত্তর দিকে এগিয়ে আসে। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে ভারত দখলের মূল লড়াইটি বাধে পাণিপথে। এতে মরাঠাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে সেরা মরাঠা-সেনাপতিরা নিহত হন এবং আহত পেশোয়াও শেষে প্রাণ হারান। অবশ্য,

জয়টি আহ্‌মদ শাহের জন্য মোটেই সহজ ছিল না। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় এটি পূরণের জন্য তাঁকে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংকটের জন্য দীর্ঘকাল তিনি দেশে থাকতে বাধ্য হন। তাঁর মৃত্যুর পর সামন্ততান্ত্রিক দ্বন্দ্বের ফলে ভারতে আফগান আক্রমণের অবসান ঘটে।

ভারত থেকে আহ্‌মদ শাহের সৈন্য প্রত্যাহৃত হলে শিখরা অচিরেই পঞ্জাব থেকে আফগানদের উৎখাত অভিযান শুরু করে। অতঃপর সেখানেই তাদের উদ্যোগে স্বাধীন পঞ্জাব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ততদিনে অবশ্য দেশের অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্র আগ্রা-দিল্লী থেকে বাংলা ও দক্ষিণ ভারতেই স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই ব্যাপক সংঘাতের ফলে সারা দেশ নির্জীব হয়ে পড়ায় তার পক্ষে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রহৃত করা আর সম্ভবপর ছিল না।

এইসঙ্গে দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ ও মরাঠাদের মধ্যে, স্বাধীন রাজ্য মাদুরা ও হায়দরাবদের সামন্তরাজ্য আরকটের মধ্যে যুদ্ধের বিরাম ছিল না। বিজয়নগরের ধ্বংসের উপর প্রতিষ্ঠিত মহীশূরে রাজ্যও এতে জড়িয়ে পড়েছিল।

ষোল শতক থেকে 'মিরাসদার' নামে পরিচিত জমিওয়ালা চাষীদের সংখ্যা সতেরো শতকের শেষে ও আঠারো শতকে দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। এই সময়ে গ্রামীণ প্রজারাও খাজনাদাতা হিসাবে নিজ জমির মালিক হয়ে উঠছিল এবং জমির মালিকানার উপর বিভিন্ন বর্গের কৃষকদের অধিকারও সমান হয়ে আসছিল: কৃষকরা খাজনা দেয়ার শর্তে তাদের জোতের সঙ্গে বাঁধা থাকলেও এতে তাদের উত্তরাধিকারীর অধিকার বর্তাত। জমির উপর রায়তের অধিকার তখন খাজনার দাবি মেটানোর সামর্থ্যের উপর নির্ভর করত। কুটিরশিল্প ও জমিচাষের সমাবন্ধভিত্তিক গোষ্ঠীসংগঠন তখনো টিকে ছিল। কিন্তু এখন সারা গ্রামের উপর খাজনার দাবি বর্তাল, এমন কি যেসব এলাকায় ইতিপূর্বে এটি প্রচলিত ছিল না সেখানেও। গোষ্ঠীসংগঠন জোড়া দেয়ার এই ব্যবস্থার এবং গ্রামাঞ্চলে সামন্ত ভূস্বামীরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী হওয়ার ফলে সতেরো ও আঠারো শতকে নিম্নোক্তভাবে জমির পুনর্বণ্টন ঘটেছিল: যারা বেশি অর্থ দিতে পারত তারাই বেশি জমি পেত। ক্রমান্বয়ে খাজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমি প্রায়ই কৃষকের বোঝা হয়ে উঠত। এমতাবস্থায় সে বাড়তি খাজনা এড়াতে 'বাড়তি' জমিটুকু হস্তান্তর করতে চাইত। ছোটখাটো সামন্ত ভূস্বামী হিসাবে মোড়ল ও মুনশিদের ব্যাপক অভ্যুদয় ঘটেছিল। এই অধিকারবলে বহিরাগত তসিলদাররাও কোন গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে মোড়লের পদ অধিকার করছিল। পণ্য-বন্যাম-মুদ্রা অর্থনীতির অগ্রগতি সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার বদলে গ্রামকে সামন্ত ভূস্বামীদের উপর অধিকতর নির্ভরশীল করে তুলেছিল এবং গ্রামীণ গোষ্ঠীধরনের সংস্থাকে টিকিয়ে রেখে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ তীব্রতর করেছিল।

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে হায়দরাবাদের শাসক আসফ জা'র মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র

নাসির জং ও মুজফ্ফর জংয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই বাধে। ততদিনে বন্দরলগ্ন ছোট ছোট এলাকার মালিক হয়ে-ওঠা ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানিগুলি এই যুদ্ধে যোগ দেয়। ফলত, যথার্থ অর্থে দুটি প্রধান ইউরোপীয় শক্তি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্য-যুদ্ধ শুরু হয়। এসব যুদ্ধেরই শেষ পরিণতি — ভারত বিজয়।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানি

ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিকদের জন্যে একাধারে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাধারণত বণিকরা কোম্পানি স্থাপন করত এবং তাদের দেশের সরকার এগুলিকে অনুমোদন দিত। মূলত এক্ষেত্রে বিভিন্ন বণিকের বদলে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই সংঘাত দেখা দিত। ভারতবর্ষে পর্তুগীজ অভিযানের সাজসরঞ্জাম ও অর্থ যুগিয়েছিলেন পর্তুগালের রাজা। ওলন্দাজ এবং ব্রিটিশ কোম্পানিগুলিও তাদের সরকারের কাছ থেকে সনদ পেয়েছিল। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ব্রিটিশ সরকার ক্রমান্বয়েই বেশি বেশি অধিকার মঞ্জুর করছিল। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কয়েকটি সনদের কল্যাণে ব্রিটেনে কোম্পানিগুলির অবস্থান খুবই মজবুত হয়ে উঠেছিল। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের ক্রমওয়েল-সনদ এবং ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দের সনদ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যুদ্ধঘোষণা ও শান্তি-প্রতিষ্ঠার অধিকার আর ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের সনদ কোম্পানিকে মুদ্রা তৈরি ও সামরিক দণ্ডবিধি সহ নিজস্ব সৈন্য ও নৌবাহিনী রাখার ক্ষমতা দিয়েছিল। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন বণিক ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে আরও একটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করলে এবং ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানিদুটির মিলন ঘটলে ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেণ্টের একটি আইনের মাধ্যমে উদ্যোগটিকে অনুমোদন দেয়া হয়। সেদিন থেকেই ভারতে কোম্পানির কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ব্রিটিশ ও পর্তুগীজদের মধ্য সংঘাত ঘটানোর আশায় জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেন। কিন্তু উপকূল বরাবর ব্রিটিশরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর মোগল শাসকরা বার বার তাদের বহিষ্কারের প্রয়াস পান। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্জেব কর্তৃক বাংলা থেকে ব্রিটিশদের বহিষ্কারের চেষ্টাটি উল্লেখ্য। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে এক বিশাল মোগল বাহিনী বোম্বাই (ব্রাগান্জার ক্যাথারিন দ্বিতীয় চার্লসকে বিয়ে করলে উপহার হিসাবে পর্তুগীজরা দ্বীপটি ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনকে দেয়) অবরোধ করে। এটি

ছিল পশ্চিম উপকূলে ব্রিটিশ অধিপত্যের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু মোগল শাসকদের এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আঠারো শতকে ভারতের ব্রিটিশ কোম্পানিই সবচেয়ে ধনী ছিল। ১৬৩৯-১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে স্থানীয় শাসকের কাছ থেকে দখলীকৃত করমণ্ডল উপকূলের মাদ্রাজ ছিল তাদের প্রধান ঘাঁটি। আঠারো শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশরা সেখানে সেণ্ট জর্জ দুর্গ ও একটি বন্দর তৈরি করলে অচিরেই এটি একটি সমৃদ্ধ ও জনবহুল শহর হয়ে ওঠে।

বাংলার কলিকাতাই ক্রমে ব্রিটিশ কোম্পানির কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজ পণ্য গুদামগুলি রক্ষার জন্য কোম্পানি সেখানে সেই সতেরো শতকেই একটি দুর্গ তৈরি করে। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের সম্মানে দুর্গটির ফোর্ট উইলিয়ম নামকরণ করা হয়। এই দুর্গ থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তার কার্যাদি পরিচালনা করত। কলিকাতার পাশের গ্রামের জমিদার হিসাবেও কোম্পানি স্বীকৃতি পেত।

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে ফারুকশিয়ার ব্রিটিশদের আরও আটত্রিশটি গ্রাম ইজারা দেন। মোগলদের কোষাগারে বার্ষিক ৩ হাজার টাকা নজরানা দেয়ার শর্তে ব্রিটিশদের পণ্য শুল্কমুক্ত করা হয়। তদুপরি বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত 'দাস্তাক' (বিশেষ অনুমতি) বলে শুল্ক-দফতরের পরিদর্শন ছাড়াই ব্রিটিশদের মালপত্র চলাচলের সুবিধা দেয়া হয়েছিল। তখন থেকেই এখানকার ব্রিটিশ রপ্তানিতে বাংলার পণ্যের অংশভাগ দ্রুত বাড়ছিল। কোম্পানির কর অচিরেই ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬শ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার পাউণ্ডে পৌঁছয়।

কলিকাতা, ঢাকা, কাসিমবাজার ও বাংলার অন্যান্য কয়েকটি স্থানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্রের আশেপাশে তাঁতিসম্প্রদায় নিজেদের বসতি গড়ে তোলে। কলিকাতার অদূরে কৃষ্ণনগরেই কোম্পানির জন্য কর্মরত তাঁতিদের সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় দালালরা তাঁতিদের কাঁচামাল সরবরাহ করত এবং ইউরোপীয় বাজারে বিক্রেয় বস্ত্রাদি তৈরির ফরমাশ দিত। এসব দালালরা কেবল কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবেই নয়, স্বনামে মধ্যগ হিসাবেও প্রায়ই কারিগরদের কাছ থেকে পণ্যাদি ক্রয় করত।

ব্রিটিশদের বাণিজ্য প্রসারে বাংলার নবাব খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যেই তিনি আসলে স্বাধীন শাসক হয়ে উঠেছিলেন। এক সময় যে এসব শহর ও সুরক্ষিত পণ্যগুদামগুলি ব্রিটিশের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠবে এবং সেখান থেকে তাদের হটানো কঠিন হবে, সেজন্য তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত

ব্যবসা এমন কি কোম্পানিকেও অতিক্রম করছে বলে নবাব কোম্পানির বিরুদ্ধে সারা দেশের ব্যবসা একচেটিয়া করার অভিযোগ আনেন।

বাংলা থেকে ব্রিটিশরা প্রধানত সুতি ও রেশমী বস্ত্র, কাঁচা রেশম, শোরা, চিনি, আফিম, নীল, ঘি, উদ্ভিজ্জ তেল ও চাউল রপ্তানি করত। কোম্পানির কাছে অঢেল অর্থ ছিল এবং সে পাইকারীভাবে পণ্যাদি ক্রয়ের চেষ্টা করত। প্রসঙ্গত চাউল ক্রয়ের ব্যাপারটি উল্লেখ্য: ফসল তোলার অনেক আগে মধ্যগদের ভূমিকাসীন শক্তিশালী ভারতীয় মহাজনদের সুপারিশ মোতাবেক কোম্পানির কর্মচারীরা ভারতীয় বণিকদের নানা অঙ্কের টাকা বণ্টন করত, তারা আবার এটি আগাম হিসাবে ক্রেতাদের দিত এবং এদের মাধ্যমে সেটি কৃষকদের হাতে পেঁছিত। অর্থাৎ ধানের ফসলটি আগেভাগেই সস্তায় ক্রয় করা হত।

ব্রিটিশের স্থানীয় দালালরা (গোমস্তা) কারিগরদের সঙ্গে লেনদেনে এই ধরনের পদ্ধতিই প্রয়োগ করত এবং কারিগরদের দাদন দেয়ার মাধ্যমে তাদের বস্তুত দাসের স্তরেই পর্যবসিত করেছিল।

মরাঠাদের ওড়িষ্যা-আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬) কর্তৃক কোম্পানির কাছ থেকে গৃহীত অর্থসাহায্যের প্রতিদানে তিনি কোম্পানিকে কিছু বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করেন। অবশ্য নবাব ব্রিটিশ বণিকদের বর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন। এসব বণিকরা ইতিমধ্যে তাদের ঘাঁটিগুলিতে হাজার হাজার তাঁতি নিয়োগ করেছিল এবং ভারতীয় মহাজন, মুৎসুদ্দী ও বণিকদের সঙ্গে একযোগে ব্যবসা চালাচ্ছিল আর প্রাচ্যের সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে ক্রমেই ভারতীয় বণিকদের হটিয়ে দিচ্ছিল।

অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির অনুকরণে ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ কলবের্তের উদ্যোগে ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। এই কোম্পানিকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়। সে দখলীকৃত এলাকার উপর অবাধ অধিকার স্থাপন, বিচার ব্যবস্থা পরিচালন, নিজ এলাকার সকল বাসিন্দাদের শাস্তিদান এবং অবস্থানুযায়ী যুদ্ধঘোষণা ও শান্তি-প্রতিষ্ঠার অধিকার পায়। শত্রুর কাছ থেকে কোম্পানিকে রক্ষার এবং তার জাহাজগুলি পাহারার আশ্বাস ফরাসী সরকার তাকে দিয়েছিল। কিন্তু সতেরো ও আঠারো শতকে এটি সামন্ততান্ত্রিক নিয়মের অধীনে থাকায় রাজা, প্রধান নিয়ামক, বণিকসংঘ, উপনিবেশ ও নৌবাহিনীর মন্ত্রী সবাই নিজেদের বহুবিধ নির্দেশ পাঠিয়ে কোম্পানির কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করেন। ফলত, কোম্পানি ফলপ্রসূভাবে কার্যপরিচালনায় ব্যর্থ হয়।

কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলীর কেউ কেউ আবার সরকার কর্তৃক মনোনীত হত। কার্যত সরকার মনোনীত প্রধান নিয়ামক ও তার সহকারী, বিশেষ কমিশনারই কোম্পানির কার্যপরিচালনার সিদ্ধান্ত নিত। রাজসভার অনুগৃহীত ও সমর্থকরাই

কোম্পানির মূল অংশীদার ছিল এবং তারাই এর বিষয়-আশয় তত্ত্বাবধান সহ সৈন্য ও নৌবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করত। পরিচালকদের মধ্যে এবং প্রশাসক ও লগ্নিকারীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের অন্ত ছিল না। কোম্পানির ব্যাপারটি এভাবে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিনষ্ট হতে থাকে এবং ঘুসের ব্যাপারটি কেবল ভারতস্থ কর্মচারীদের মধ্যেই নয়, খোদ ফরাসী দেশেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে দখলীকৃত করমণ্ডল উপকূলের পণ্ডিচেরীতেই ফরাসীরা তাদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। ফরাসীদের দখলভুক্ত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহরটি ছিল বাংলার চন্দননগর। বাংলার তৈরি বস্ত্রাদি ফরাসী জাহাজে চালান দেয়ার জন্য এখানেই এগুলি মজুত রাখা হত।

আঠারো শতকে ব্রিটিশদের তুলনায় ফরাসী কোম্পানির ব্যবসার পরিমাণ ছিল অনেক কম। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে দক্ষিণ ভারত থেকে ক্রীত সুতি, বিশেষত রেশমী বস্ত্রই তারা প্রধানত চালান দিত। ফরাসী সরকার তাদের প্রাচ্য উপনিবেশ ও বাণিজ্যকে কোনই গুরুত্ব দিত না। বরং পঞ্চদশ লুইয়ের জনৈক মন্ত্রী একটি উক্তির জন্য যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং সেটি হল — তিনি নাকি ফরাসী দেশের রাজা হলে একটি ছুঁচের দরে সবক'টি উপনিবেশই বিকিয়ে দিতেন।

ফরাসী কোম্পানির আওতায় কোন শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল না এবং অপরাধীদের নিয়েই তার সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল। তদুপরি সেনাবাহিনীর অফিসররা প্রায়ই যুদ্ধকৌশলের বিশেষ কিছু জানত না এবং এদের প্রায়ই অর্থমূল্যে ক্রয় করা চলত।

ভারতে বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যে ব্রিটিশ ও ফরাসীরাই সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল। এদের বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বসতিগুলি ছাড়াও সতেরো শতকে গঠিত ওলন্দাজ কোম্পানি ও ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে গঠিত দিনেমার কোম্পানি এদেশে ব্যবসা করত। ওলন্দাজরা করমণ্ডল উপকূলে (নাগাপট্রম) ও বাংলায় (মূল ব্যবসাকেন্দ্র ঢাকা ও চুঁচুড়া) এবং দিনেমাররা বাংলার শ্রীরামপুরে ঘাঁটি গড়েছিল। অবশ্য ওলন্দাজ ও দিনেমাররা এদেশে কোন উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করে নি।

ভারত-রুশ সম্পর্ক

সতেরো শতকে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য পুরোপুরি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির হস্তগত হলে ভারতীয়রা তাদের উত্তরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে ক্রমেই অধিক পরিমাণে ক্যারাভান যোগাযোগ স্থাপন করে। পারস্য ও বোখারার পথে ভারতীয় বণিকরা আস্ত্রাখানে পৌঁছয় এবং ১৬৪০-র দশক নাগাদ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয়রা সেখানে বিশেষ প্রাচীরবেষ্টিত

একটি এলাকায় দোকান ও ঘরবাড়ি সহ শেষপর্যন্ত একটি বিষ্ণুমন্দিরও তৈরি করে। আস্ত্রাখান থেকে রুশ শহরগুলিতে আসার পথে রুশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় বণিকরা মস্কো ও নিজনি-নোভ্গরদ শহরের (মাকারেয়েভস্কায়া) মেলায় প্রধানত প্রাচ্যের (ভারতীয় ও পারসীক) পণ্যাদি বিক্রয়ের জন্য আসত। প্রাচ্যের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বের দিক থেকে জুলফার (ইস্পাহান) আর্মেনীয়দের পরই ছিল ভারতীয়দের স্থান। আর্মেনীয়রা ছিল প্রধানত ইরানের শাহের ব্যবসায়ী (পারস্য থেকে সরকারী পণ্য নিয়ে ব্যবসা করত), কিন্তু ভারতীয়রা ব্যবসা চালাত মূলত ব্যক্তিগত সামর্থ্যে। তাছাড়া তাদের ব্যবসার পরিসর ছিল যথেষ্ট ব্যাপক (এদের কেউ কেউ হাজার-হাজার রুবল মূল্যেরও ক্রয়বিক্রয় করত)।

সতেরো শতকে জার সরকার ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কয়েকটি উদ্যোগই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াতে অসুবিধার দরুন তা আর বাস্তবায়িত হয় নি। নিকিতা সিরোয়েজিনের নেতৃত্বে ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে এবং রদিওন পুশ্নিকভ ও ইভান দেরেভেন্স্কির নেতৃত্বে ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে দুদুবার শাহ্ জাহানের দরবারে রুশ দূত পাঠানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু পথে এরা পারসীক কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হওয়ায় চেষ্টাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বোখারার মুহম্মদ ইউসুফ কাসিমভের নেতৃত্বে আরও একটি দূতদল মোগল সাম্রাজ্যের উপকণ্ঠে কাবুল পর্যন্ত পেঁছলেও আওরঙ্জেব তাঁদের এগিয়ে যাবার অনুমতি দেন নি। শেষপর্যন্ত ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে সেমিওন মালেন্কির নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য-প্রতিনিধিদলই কেবল দিল্লী, আগ্রা, সুরাট ও বুরহানপুরে পেঁছতে সমর্থ হয়। দলটি আওরঙ্জেবের কাছ থেকে তুর্কিতে লিখিত অবাধ বাণিজ্যের একটি ফরমান লাভ করে। কিন্তু দেশে ফেরার আগে পারস্যে মালেন্কির মৃত্যু ঘটে।

আঠারো শতকেও আস্ত্রাখানের ভারতীয় বসতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু ভারতের সঙ্গে ওই বণিকদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় তারা প্রধানত পারস্যের সঙ্গে এবং অংশত ককেশাসের সঙ্গে ব্যবসা চালাতে পারত। ইতিমধ্যে ভারতীয় বণিকরা মহাজনী ব্যবসায় অর্থলগ্নি শুরু করে এবং উচ্চপদস্থ রুশ কর্মচারীরা তাদের অধমর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জার সরকার তাদের এই কাজে সমর্থন যোগায়। আঠারো শতকে আস্ত্রাখানের ভারতীয় বণিকরা রাশিয়ায় একটি বাণিজ্য সংস্থা গঠন করে এবং এটি ব্যাপক পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। রুশ ব্যবসায়ীরা নিজেদের দিক থেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য চালানোর জন্য জার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকবারই উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু স্থলপথের বাধাজনিত কারণে পরিকল্পনাগুলি কখনই আর বাস্তবায়িত হয় নি।

রাশিয়ায় কোন ভারতীয় নারী না থাকায় এসব ভারতীয়রা তাতার নারীদের

পাণিগ্রহণ করে। এদের সন্তান-সন্ততিরা আস্ত্রাখানে 'আগ্রিজান' (পুত্রের তুর্কিশব্দ 'অগ্‌লে' থেকে উৎপন্ন) নামে পরিচিত। ক্রমে ভারতীয়রা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আত্তীভূত হয়। ১৮৪০-র দশকে জার সরকার ভারতীয় বাণিজ্য-সংস্থার অবশিস্ট সম্পত্তিটুকু বেওয়ারিশ হিসাবে বাজেয়াপ্ত করে।

ভারত দখলের জন্য ব্রিটিশ-ফরাসী দ্বন্দ্ব
(১৭৪৬-১৭৬৩)

ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোক্তা। পণ্ডিচেরীর গভর্নর যোসেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী অফিসরদের অধীনে ভারতীয়দের নিয়ে সৈন্যদল গঠন শুরু করেন। এভাবেই প্রথম 'সিপাহী' বাহিনী গড়ে ওঠে এবং এদের রণনৈপুণ্য দেখে ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশরাও সিপাহী-বাহিনী গঠন শুরু করে।

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষিত হলে ভারতেও এটি ছড়িয়ে পড়ে এবং লা বর্দোনে'র নেতৃত্বে একটি ফরাসী নৌবাহিনী পণ্ডিচেরী রওয়ানা হয়।

দুপ্লে ও তাঁর সিপাহীদের এসব জাহাজের সাহায্যে মাদ্রাজে নামিয়ে দিয়ে লা বর্দোনে শহরটি দখল করেন। কিন্তু দখলীকৃত মাদ্রাজের ব্যাপারে অচিরেই বুর্জোয়া দুপ্লে এবং অভিজাত লা বর্দোনে'র মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। মাদ্রাজ দখলে ব্যবহৃত জাহাজগুলি তার নিজের নির্মিত বিধায় লা বর্দোনে শহরটিকে ব্যক্তিগত বিজয়-ভেট হিসাবেই দেখেছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থের বিনিময়ে এটি ব্রিটিশদের ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভারত থেকে চিরকালের জন্য ব্রিটিশ প্রভাব মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে দুপ্লে বন্দরটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান।

এই মতানৈক্যের জন্য লা বর্দোনে তাঁর জাহাজগুলি ভারত থেকে প্রত্যাহার করে নেন। জাহাজের অভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় দুপ্লে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কার্যকর আক্রমণ চালাতে ব্যর্থ হন।

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে অ্যা-লা-সাপেলির চুক্তি মোতাবেক ইউরোপে কিছু সুবিধার বিনিময়ে ফরাসী সরকার অক্ষত অবস্থায় মাদ্রাজকে ব্রিটিশের হাতে প্রত্যর্পণ করে। পরের বছরই ভারতের ব্রিটিশ ও ফরাসী কোম্পানিগুলির মধ্যে লড়াই বাধলে এই চুক্তির ফলাফলগুলি তখন যথাযথভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে।

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে আসফ জা'র মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র নাসির জং ও মুজফ্‌ফর জংয়ের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বাধে এবং দুপ্লে এতে যোগ দেন। চাঁদ সাহেব নামে মুজফ্‌ফর জংয়ের জনৈক আত্মীয় পণ্ডিচেরী থেকে ৫০০ ফরাসী

ও ২০০০ সিপাহীর একটি দল নিয়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান। মুজফ্ফর অতঃপর সিংহাসন লাভ করেন এবং চাঁদ সাহেব করদরাজ্য আর্কটের নবাব হন। এভাবে দাক্ষিণাত্যের পুরো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ফরাসীদের প্রভাবাধীন হয়।

পরিস্থিতিটি যে ভারতে ব্রিটিশ অবস্থানের পক্ষে মারাত্মক ভবিতব্যের সূচক এটি উপলব্ধি করে ব্রিটিশরাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তারা হায়দরাবাদে নাসির জংয়ের এবং আর্কটে মুহম্মদ আলীর (প্রাক্তন নবাবের পুত্র) সাহায্যে এগিয়ে আসে।

বিদ্রোহী সামন্তদের হাতে মুজফ্ফর জং নিহত হন। হায়দরাবাদে ফরাসী বাহিনীর সেনাপতি বুসি তখন নাসির জংয়ের এক নাবালক পুত্রকে (হত্যাকারীদের হাতে অতঃপর নিহত) সিংহাসনে বসান এবং হায়দরাবাদকে ফরাসীদের সঙ্গে একটি তথাকথিত অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করান। এই চুক্তি মোতাবেক নিজাম (হায়দরাবাদের শাসক) ফরাসী সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য (অথবা তৎকালীন পরিভাষানুযায়ী ভরতুকি'র জন্য) করমণ্ডল উপকূলের চারটি সমৃদ্ধ জেলা (শেষে 'উত্তরের সরকার' বা প্রদেশ হিসাবে খ্যাত) তাদের কাছে হস্তান্তর করেন। (পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ভারতে রাজনৈতিক অধিকার কায়েমের জন্য এই ধরনের অধীনতামূলক চুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের এলাকার ভারতীয় জনগণের উপর করের দুর্ভার বোঝা চাপিয়ে তাদের ধ্বংস করে ফেলত এবং ভারতীয় শাসকদের সাহায্যে ব্যবহৃত তাদের সৈন্যদলের ব্যয়নির্বাহের জন্য কেবলই অধিক পরিমাণ জমি দাবি করত।) এভাবেই ফরাসীরা ভারতে অরেকবার তাদের অবস্থান মজবুত করতে সমর্থ হয়।

দক্ষিণ ভারতের চাবিকাঠি স্বরূপ ত্রিচিনপল্লীর শক্তিশালী দুর্গটিই কেবল তখনো ব্রিটিশদের আশ্রিত মুহম্মদ আলীর দখলে ছিল। বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও দুপ্লে এটি দখল করতে পারেন নি। ত্রিচিনপল্লীর এক ব্যর্থ অবরোধের সময় ফরাসীদের আশ্রিত চাঁদ সাহেব নিহত হন।

নিজ সৈন্যবাহিনী পোষণের মতো যথেষ্ট তহবিল বুসির ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহের জন্য বস্তুত কোন ভারতীয় পণ্যই ফ্রান্সে পৌঁছত না এবং লাভের বদলে ভারত ফরাসীদের জন্য লোকসানের কারণ হয়ে উঠেছিল। সেজন্য কোম্পানির অংশীদাররা যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানাচ্ছিল। তদুপরি ফরাসী সরকার আশা করেছিল যে এই যুদ্ধবিরতি সহ ভারতে ব্রিটিশদের দেয়া তাদের সুবিধাগুলি ইউরোপে এই দুই শক্তির মধ্যে শান্তি নিশ্চিত করার সহায়ক হবে। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানির অন্যতম পরিচালক গঁদে ভারতবর্ষে যান। ব্রিটিশদের সকল দাবিপূরণ সহ তিনি তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে মুহম্মদ আলীকে (১৭৫৪-১৭৯৫)কর্ণাটক ফেরত দেয়া হয়, উত্তরের সরকারগুলি থেকে ফরাসীরা দাবি প্রত্যাহার করে এবং

দ্যুপ্লে ফ্রান্সে ফেরেন। অতঃপর ফরাসী সরকার ভারতে তাদের সকল বিড়ম্বনার জন্য দ্যুপ্লে ও লা বর্দোনেকে দোষী সাব্যস্ত করে। লা বর্দোনে কয়েক বছর জেলে কাটান এবং দ্যুপ্লে তাঁর অর্থসম্পদ হারিয়ে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে মারা যান।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে 'সাত বছরের যুদ্ধ' বাধে। দুই দেশের এই সংঘাতটি ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল ব্রিটিশবিরোধী আয়র্ল্যাণ্ডবাসী লালি টলেণ্ডাল ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে একদল সৈন্য নিয়ে ভারতে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা পূর্ব উপকূলে কেবল তাদের অবস্থানই মজবুত করে নি, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলাও দখল করেছিল। এবার সেখান থেকেই মাদ্রাজে অর্থ ও সৈন্য আসতে শুরু করল। অর্থাৎ, বর্তমান পরিস্থিতিটি আর ফ্রান্সের অনুকূলে ছিল না। তাসত্ত্বেও লালি ব্রিটিশদের শক্ত ঘাঁটি সেণ্ট ডেভিড দুর্গ দখলের পর ব্রিটিশ বসতির রক্ষাপ্রাচীর খোদ মাদ্রাজও অবরোধ করেন। এখানেই সর্বশক্তি নিয়োগের উদ্দেশ্যে লালি হায়দরাবাদ থেকে বুসেকে ডেকে পাঠান এবং ফলত তৎক্ষণাৎ হায়দরাবাদ ব্রিটিশদের হস্তগত হয়।

লালি ছিলেন অটল, অসহিষ্ণু ও রূঢ় প্রকৃতির মানুষ। ফরাসী নৌবহরের অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর এক ঝগড়ার ফলে শেষোক্ত ব্যক্তিটি ভারত থেকে তাঁর সকল জাহাজ প্রত্যাহার করেন। লালি তারপর পণ্ডিচেরীর পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে ঝগড়া বাধালে তারা মাদ্রাজ অবরোধকারী ফরাসী সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো বন্ধ করে দেয়। লালি ভারতীয়মাত্রকেই ঘৃণা করতেন এবং ভারী কামানগুলি টেনে আনার জন্য জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পণ্ডিচেরীর সকল ভারতীয়র উপরই চাবুক চালাতেন।

১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে একটি ইংরেজ সৈন্যদল পেঁছলে লালি পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। ওয়াণ্ডেওয়াশের দুই যুদ্ধে ব্রিটিশরা লালির সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করে ও বুসে বন্দী হন। অতঃপর পণ্ডিচেরী অবরুদ্ধ হলে শহরটি এক বছর পরে চূড়ান্ত বুভুক্ষার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে। পণ্ডিচেরীর দুর্গগুলি ধূলিসাৎ করে ফেলা হয়। লালি ফ্রান্সে ফিরে গেলে ফরাসী সরকার ভারতে তাদের পরাজয়ের জন্য তাঁকেই দোষী সাব্যস্ত করে এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

প্যারিস-চুক্তি অনুসারে ফরাসীদের প্রাক্তন অধিকারভুক্ত পাঁচটি শহরই কেবল তারা ফেরত পায়। অতঃপর ফ্রান্স আবার ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সংযোগ গড়ে তোলে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ ভূভাগটি আর কোনদিনই তাদের দখলে আসে নি। ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধীনে চাকুরীরত বিক্ষিপ্ত ফরাসী সৈন্যরা আঠারো শতকের শেষ অবধিও ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সাফল্য সত্ত্বেও এসব সৈন্যরা ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের কোনই রদবদল ঘটাতে পারে নি।

অর্থনৈতিক প্রাধান্যের কারণেই মূলত ব্রিটিশরা ভারতে ফরাসীদের উপর জয়ী

হয়েছিল। ভারতস্থ ফরাসী কোম্পানির বহু প্রতিনিধির প্রতিভা ও কার্যকর উদ্যোগ সত্ত্বেও ফরাসীদের পরাজয় ঘটেছিল। এর কারণ, ব্রিটিশের তুলনায় তাদের নৌবহর, সৈন্যবাহিনী বা আর্থিক সামর্থ্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া ব্রিটেনের মতো ফরাসী সরকার উপনিবেশ স্থাপনে ততটা উৎসাহীও ছিল না।

ব্রিটেনের বঙ্গবিজয়

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে উন্নততম এলাকাগুলির অন্যতম হিসাবে গণ্য হত। মোগল সিংহাসন নিয়ে সামন্তদের মধ্যেকার রাজনৈতিক সংঘাতে এদেশের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। মূলত বস্ত্রোৎপাদনই ছিল বাংলার সম্পদের ভিত্তি। এখানে পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্কের বিকাশ খুবই উন্নত স্তরে পেঁছেছিল। এখানকার কৃষকরা নানা জাতের ধান, আখ ও তুলা চাষ করত এবং 'জমিদার' খ্যাত ভূস্বামীরা বেতনের বিনিময়ে খাজনা আদায় সহ তা কোষাগারে জমা দিত। এই সঙ্গে তারাও বড় অঙ্কের অর্থ জমা দিতে বাধ্য থাকত। কিন্তু ব্যবস্থাটি দ্রুত এক ধরনের খাজনা সংগ্রহের ইজারাদারীতে পর্যবসিত হয়। যে-এলাকা থেকে জমিদাররা খাজনা সংগ্রহ করত সেখানে তারা বিবেচনা, নীতি বা আইনের তোয়াক্কা না করে নিজেদের শক্তি খাটাতে শুরু করে। তারা নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে খাজনা সংগ্রহ করাত, স্থানীয় জনগণের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করত এবং সরকারী আমলাদের উৎকোচে বশীভূত রাখত। এইসঙ্গে আবার জমিদার ও খাজনা-ইজারাদাররা বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ'র উপর নির্ভরশীল ছিল। খাজনা বাকি থাকলে তিনি এমন কি মুর্শিদাবাদে 'নোংরাবোঝাই' বিশেষ ধরনের কুয়োর মধ্যে এদের কয়েদ রাখতেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ'র উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে বাংলার জমিদাররা আরও স্বাধীন হয়ে ওঠে। তারা তখন পুরোপুরি খাজনা পরিশোধ করত না। তাছাড়া নিজেদের জমিদারি থেকে সংগৃহীত আয়ের সঙ্গে নবাবের কোষাগারে দেয় অর্থের মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকত না। অর্থাৎ, 'জমিদারদের' জমিদারির খাজনা তথা কর ক্রমেই বিশুদ্ধ সরল খাজনায় রূপান্তরিত হচ্ছিল এবং জমিদারিগুলি বংশানুক্রমিক হওয়ায় এগুলি ব্যক্তিগত সামন্ত সম্পত্তি হয়ে উঠছিল।

মোগল সাম্রাজ্য থেকে নিজ স্বাধীনতা মজবুত করার জন্য এবং রাজসভার বিলাসবাহুল্য অটুট রাখার তাগিদে বেপরোয়া মুর্শিদকুলি খাঁ কয়েকবারই তাঁর কোষাধ্যক্ষ, যোধপুরের জনৈক ধনী মাড়োয়ারীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হন। বাংলায় বসবাসের উদ্দেশ্যে আগত এই ব্যক্তিটিকে মুর্শিদকুলি খাঁ মুদ্রা তৈরির অধিকার সহ কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেন এবং 'জগৎ শেঠ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

জগৎ শেঠ ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য দিলেও বাংলায় এদের প্রভাব বৃদ্ধি সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন।

বাঙ্গালী বণিক ও মহাজনদের মধ্যগ হিসাবে ব্যবহারক্রমে কোম্পানি তার প্রয়োজনীয় পণ্য — শোরা, কাঁচা রেশম, চিনি, আফিম, মশলা ও সর্বোপরি তুলা ও রেশমী বস্ত্রাদি সংগ্রহ করে নিত।

আঠারো শতকের ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকগুলিতে বিপুল রপ্তানির ফলে তাঁতশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সারা কৃষক সম্প্রদায়, কোন কোন শহরের, বিশেষত ঢাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই এভাবে তাঁতির পেশা গ্রহণ করে। কোম্পানির আমলারাও অবশেষে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শরিক হয়ে ওঠে। কোন কোন সময় তারা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে অন্যটিতে পণ্য-সরবরাহের অজুহাতে বিনা শুল্কে নিজ পণ্যাদিও চালান দিত।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের বাংলায় উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই বাধলে শেষাবধি তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলা বাংলার সিংহাসন লাভ করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত জনৈক অভিজাত কলিকাতায় ব্রিটিশদের আশ্রয়প্রার্থী হন। তাঁকে নবাবের কাছে প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হলে সিরাজদ্দৌলা প্রথমে কাসিমবাজার ও পরে কলিকাতা হঠাৎ আক্রমণে দখল করে নেন।

অতঃপর দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের সঙ্গে সংগ্রামে খ্যাতিপ্রাপ্ত দু'জন ব্রিটিশ সেনাপতি — ক্যাপ্টেন ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে জাহাজযোগে মাদ্রাজ থেকে বাংলায় পাঠানো হয়। ক্লাইভ ভারতীয় মহাজন জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এ'দের মাধ্যমে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের সাহায্য চান আর ব্রিটিশরা জয়ী হলে তাঁকে বাংলার মসনদে বসানোর আশ্বাস দেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের তিন হাজার সৈন্যের (এদের মধ্যে মাত্র ৮০০ জন ইউরোপীয়) কাছে ১৮ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০ হাজার পদাতিক নিয়ে গঠিত নবাবের বিরাট সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে। দিনটি ব্রিটিশদের কাছে তাদের ভারত বিজয়ের দিন হিসাবে খ্যাত হয়ে আছে।

জয়লাভের পর অচিরেই ব্রিটিশরা নবাবের কাছে বিরাট অঙ্কের (১ কোটি আশি লক্ষ পাউণ্ডের মতো) খেসারত দাবি করে। সম্ভবত এটি ছিল কলিকাতাবাসীদের অস্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্যের চেয়েও বেশি। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিরোধ এবং দিল্লীর নবাব কর্তৃক অযোধ্যার শাসকের সহযোগিতায় দুইবার বিহার দখলের চেষ্টা (১৭৫৯ ও ১৭৬০) ব্রিটিশদের বাংলার নবাবের কাছ থেকে অর্থদোহনের সুযোগ যুগিয়েছিল। হেনরি ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হলে মীর জাফর পদচ্যুত এবং তাঁর জামাতা মীর কাসিম নবাবী পান। এজন্য

মীর কাসিম বাংলার গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলকে ২ লক্ষ পাউন্ড দেন এবং দেশের সমৃদ্ধতম তিনটি অঞ্চল — বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম কোম্পানিকে হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। ফলত, মীর কাসিম অর্ধেক রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হন এবং কোম্পানি ও কোম্পানির কোন কোন সদস্যের কাছে তাঁর ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

বিজয়ী ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয় সামন্ত ভূস্বামীদের এই প্রকাশ্য লুণ্ঠনের ফলগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই ব্রিটেনে ভারতীয় সম্পদের নির্লজ্জ পাচার শুরু হয়। ভারতীয় অর্থবিদদের হিসাবমতো ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারত থেকে পণ্য ও অর্থ সহ ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পদ স্বদেশে পাচার করে। শাসনক্ষমতাসীন ভারতীয় সামন্তশ্রেণীর বল ও বিত্ত হানি ঘটার ফলে তখন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা পুনর্গঠনের সূচনা দেখা দেয়। ১৭৬০-র দশকের মাঝামাঝি নবাবের রাজসভা ও সামন্তদের বিলাসী পারিষদবর্গের ক্রমবিলুপ্তি ঘটলে এবং বর্তমানে জায়গীরদারদের অশ্বারোহী বাহিনী অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে এদের চাহিদানুগ পণ্যোৎপাদনে মন্দা শুরু হয়। একদা মহার্ঘতম ও সূক্ষ্মতম ধরনের বস্ত্রোৎপাদনের জন্য প্রখ্যাত ঢাকার সমৃদ্ধিরও এইসঙ্গে অবসান ঘটে। কুটিরশিল্পের এই মন্দার ফলে কারিগরদের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য দেখা দেয়। অতঃপর এরা গ্রামে ফিরে যায় এবং নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যেকোন শর্তে চাষের জমি ইজারা নিতে বাধ্য হয়। সস্তা দামের বস্ত্রাদি উৎপাদনরত তাঁতিদের অবস্থারও ক্রমাবনতি ঘটে। বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানি মধ্যগ হিসাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্য এড়িয়ে নিজস্ব দালাল বা 'গোমস্তা'দের মাধ্যমে তাঁতিদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বঙ্গবিজয়ের পর গোমস্তারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দেয় দামের ২০ থেকে ৩০ ভাগ কম দরে কারিগরদের কাপড় তৈরিতে বাধ্য করা সহ দাদন নিতে এদের উপর অত্যাচার চালায় এবং তাদের কাপড়গুলি কোম্পানিকে দিতে বাধ্য করে। এভাবে গোমস্তারা কারিগরদের উপর প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।

পলাশীর বিজয়ের পর কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ধনদৌলত উপার্জনে মনোযোগী হয় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ইউরোপীয় একক বণিক সহ সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের উৎখাতে বিজয়ীর সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে থাকে। কোম্পানি তাদের স্বল্পবেতনভোগী কর্মচারীদের সর্বদাই লেনদেনের সুযোগ দিত। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে মোগল শাসক কর্তৃক ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেয়া শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের একক অধিকারের আড়ালে কোম্পানির কর্মচারীরা দেশের অভ্যন্তরেও শুল্কহীন বাণিজ্য চালাত। তদুপরি যে-দাস্তাক বা সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে পণ্য চালান দিত, তারা সেগুলিও নিজেদের দালালদের বিক্রি করতে শুরু করেছিল। এইসব দাস্তাকের সাহায্যে ব্রিটিশদের সঙ্গে

অসহযোগী বণিকদের তারা সহজেই ব্যবসা থেকে উৎখাত করে দিয়েছিল। সমকালীন জনৈক পর্যবেক্ষকের ভাষায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশে 'বণিকের ছদ্মবেশে শাসকের' মতোই আচরণ করত।

যে-উদ্যমী মীর কাসিম ব্রিটিশদের কাছ থেকে বস্তুত নবাবী ক্রয় করেছিলেন তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে পুতুলের বদলে সত্যিকার বঙ্গশাসক হবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কর আদায় করে এবং এটির দাবিতে অটল থেকে দু'বছরের মধ্যে সিংহাসন লাভের জন্য ব্রিটিশদের দেয় অর্থ তিনি পুরোপুরি পরিশোধ করেন। অতঃপর তিনি কোম্পানির কর্মচারী কর্তৃক দাস্তাক প্রদান বন্ধের দাবি জানান, কারণ এতে দেশে মারাত্মক দারিদ্র্য দেখা দিচ্ছিল। তাঁর এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি যাবতীয় ভারতীয় বণিকদের সকল শুল্ক মকুব করে তাদের ব্রিটিশদের সমপর্যায়ে উন্নীত করেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোম্পানির কর্মচারীরা যুদ্ধঘোষণা সহ ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে পাটনা দখল করে। অতঃপর মীর কাসিম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব সংগঠনের উদ্যোগী হন।

বাংলায় ব্রিটিশ অত্যাচারের সকল বিরোধীরা মীর কাসিম ও তাঁর সৈন্যদলের (এর মূল অংশটি বিভিন্ন জাতির ভাগ্যান্বেষীদের নিয়ে গঠিত ছিল) সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়। কৃষক ও কারিগররা তাঁর পতাকাতলে আসে এবং তিনি ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কলিকাতার শক্তিশালী আর্মেনীয় বণিকদের আর্থিক সমর্থন পান। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে মীর কাসিম পাটনা পুনর্দখলে সমর্থ হন, কিন্তু অচিরেই তাঁর এই মিশ্র ও স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে।

অতঃপর অযোধ্যায় পশ্চাদপসরণ সহ মীর কাসিম অযোধ্যার নবাব ও মোগল সম্রাটের পুত্র আলী গওহরের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাণিপথ যুদ্ধের পরবর্তী পলায়ন পর্ব শেষ হলে আলী গওহর দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৬০-১৮০৬) নামে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এদের মিলিত সৈন্যবাহিনী পাটনার দিকে অগ্রসর হয় এবং ব্রিটিশদের অবস্থা মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাসত্ত্বেও ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের চূড়ান্ত যুদ্ধে ব্রিটিশরা পুনরায় তাদের শত্রুদের পরাজিত করে। শাহ্ আলমের আত্মসমর্পণ এবং মীর কাসিমের দিল্লীতে পলায়নের মধ্যেই এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

বক্সার যুদ্ধে পরাজয়ের পর আর কেউ নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় ব্রিটিশ আধিপত্য মুকাবিলার সাহস দেখায় নি। মীর জাফর পুনরায় বাংলার ক্রীড়নক নবাব হন। তাঁর মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে নবাবের কয়েকজন নাবালক আত্মীয়কে নবাব পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা বড় বড় ভাতা পেতেন এবং শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতেন।

মীর কাসিমকে পরাজিত করার পর ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হন। তিনি বন্দী

দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে কোম্পানির হাতে 'দেওয়ানী'র (অর্থসংক্রান্ত প্রশাসন) দায়িত্ব তুলে দিয়ে একটি ফরমান স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। এভাবেই 'দ্বৈত সরকার' নামক একটি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটল: এতে স্থানীয় বাঙ্গালী প্রশাসনের হাতে আদালত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বেসামরিক দায়িত্ব থাকল, আর কোম্পানি পেল রাজস্ব আদায় ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার। প্রথম দিকে এতেও রাজস্ব আদায়কারীদের পুরো সংস্থান এবং করব্যবস্থা অপরিবর্তিতই ছিল।

১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ ভারত ত্যাগ করেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে হাউস অব কমন্সের একটি কমিশন ভারতে তাঁর লুণ্ঠিত সম্পদের প্রশ্ন নিয়ে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু স্বদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় কার্যসম্পাদনের প্রেক্ষিতে তিনি এথেকে বেকসুর খালাস পান।

'দ্বৈত সরকার' প্রবর্তনের পর কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের কাছে বাণিজ্যের ব্যাপারটি গৌণ হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালী কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ই ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। এভাবে অর্জিত অর্থ তারা ভারতীয় পণ্যক্রয়ে ব্যয় করত। প্রথাটিকে ভণ্ডামী করে 'লগ্নি' বলা হত। আসলে কোন অর্থ ছাড়া শুধু 'লগ্নি'র কল্যাণেই কোম্পানি ইংল্যান্ডে পণ্য আমদানি করত। বাংলার লুণ্ঠন থেকে অর্জিত অর্থ অন্যান্য অংশে আক্রমণাত্মক যুদ্ধচালনার ব্যয় মেটাত। এভাবেই ভারতীয় জনগণ স্বদেশকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধার অর্থ যোগাতে বাধ্য হয়েছিল।

ইতিপূর্বে প্রচলিত গ্রামীণ সামাজিক রীতিভিত্তিক কৃষকশোষণ এবার ব্যাপকতর হয়ে উঠল। তসিলদাররা কৃষকদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে লাগল, এমন কি মুখের অন্ন হিসাবে সঞ্চিত ফসলটুকুও এথেকে বাদ পড়ল না। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের শস্যহানির ফলে সারা দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ অনাহার মৃত্যু এবং খাদ্যের দাম আকাশচুম্বী হয়ে উঠলেও কিন্তু খাজনা কমানোর আর্জিটি লণ্ডনের ভদ্রমণ্ডলীর কানেও পেঁছিয় নি। অবশ্য, ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি পার্লামেণ্টের কাছে ঋণ প্রার্থনায় বাধ্য হয়। বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে অতঃপর হুইগ ও টোরিদের মধ্যে দলগত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কিন্তু ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে দুই দলের আপোসের ফলশ্রুতি হিসাবে 'নিয়ন্ত্রণ বিধি' বলবৎ করা হয় এবং এতে কোম্পানি শুধু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানই নয়, ভারতের শাসক হিসাবেও স্বীকৃতি পায়। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির রাজনৈতিক কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পার্লামেণ্ট একজন গভর্নর-জেনারেল (এসময়ই পদটি প্রতিষ্ঠিত হয়) ও চারজন উপদেষ্টা নিয়োগের অনুমোদন দেয়। পাঁচজনের এই দল নিয়ে বাংলার সুপ্রিম কাউন্সিল গঠিত হয় এবং সংখ্যাগুরুর ভোটে এরাই বিভিন্ন বিষয়গুলি মীমাংসা করত। তদুপরি কলিকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্টও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শহরের বাসিন্দাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তার উপর বর্তায়।

তরুণ বয়স থেকে কোম্পানিতে কর্মরত ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং ফারসী ও হিন্দি ভাষায় অভিজ্ঞ এই ব্যক্তিটি কলিকাতায় ক্লাইভের এক অপরিহার্য দোসর হয়ে ওঠেন।

ইতিপূর্বে হেস্টিংস মাদ্রাজে কর্মরত অবস্থায় কতকগুলি সংস্কার চালু করেন। এগুলির মধ্যে ছিল: কোম্পানির কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি ও সৈন্যবাহিনীর সরবরাহের জন্য একটি চুক্তিব্যবস্থা প্রবর্তন, যা এই কর্মচারীদের, বিশেষত পরিচালকদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে মুনাফাখোরী ও দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছিল। তদুপরি কোম্পানির জন্য মধ্যগ ও ক্রেতা হিসাবে কার্যরত ভারতীয় বণিকদের সংখ্যা কমিয়ে হেস্টিংস কোম্পানির কিছুটা আয়বৃদ্ধিও করেছিলেন। ঘটনাটি লণ্ডনস্থ কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে কোম্পানির আয়বৃদ্ধিকেই হেস্টিংস নিজের প্রধান কাজ মনে করতেন। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি ক্লাইভের মঞ্জুরীকৃত বাংলার নবাব ও দ্বিতীয় শাহ্ আলমের অবসরভাতা হ্রাস করেন। অতঃপর হেস্টিংস ৫০ লক্ষ টাকায় অযোধ্যার কাছে কোড়া ও এলাহাবাদ জেলা বিক্রি করে দেন (ইতিপূর্বে ক্লাইভ এগুলি মোগল শাসককে দিয়েছিলেন)। তিনি অযোধ্যার কাছে ব্রিটিশ অফিসরদের নেতৃত্বে সিপাহী বাহিনীগুলি হস্তান্তরিত করান এবং রোহিলাদের ব্যাপারে কোম্পানির কোন স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও এই বাহিনীকে রোহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগান। এই 'কুখ্যাত' যুদ্ধে রোহিলাদের পরাজয় ঘটে এবং তাদের দেশকে অযোধ্যাভুক্ত করা হয়। এসব কাজের মাধ্যমে কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে হেস্টিংসের খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

হেস্টিংস বাংলার কাউন্সিলে কোম্পানির কর্মচারী বারওয়েলের সমর্থন পান। কিন্তু অবশিষ্ট তিনজন সদস্য — লর্ড ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন ও ফিলিপ ফ্রান্সিস (সম্ভবত ইনিই লণ্ডনে প্রকাশিত জুনিয়াস স্বাক্ষরিত কয়েকটি খোলা চিঠির লেখক যা এই সরকারের সমালোচনায় সেখানে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল) লণ্ডন থেকে আসেন এবং তাঁরা ছিলেন কোম্পানির বদলে ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি। তাঁরা হেস্টিংসের পদচ্যুতি চান, তাঁর কার্যকলাপ ভুল ঘোষণা করেন এবং ক্লেভারিংয়ের কাছে তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। এই ঘটনাবলীর মধ্যে কোম্পানি এবং ভারত থেকে অর্জিত মুনাফার একটা বৃহত্তর অংশভোগেচ্ছু ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের একটি চক্রের মধ্যেকার তৎকালীন বিদ্যমান দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছিল।

বাংলার কাউন্সিলের মতবৈষম্যের খবর কলিকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং হেস্টিংসের হাতে অত্যাচারিতদের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। তাসত্ত্বেও হেস্টিংস নিজ সহপাঠী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পের সহায়তায় তাঁর প্রধান সমালোচক নন্দকুমার নামক জনৈক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ছ'বছর

আগে অনুষ্ঠিত এক জালিয়াতির অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেন, যদিও তখনো কলিকাতায় কোন ব্রিটিশ কোর্টই ছিল না। জনসমক্ষে নন্দকুমারের ফাঁসির পর হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আর কেউ কোন নালিশ জানায় নি। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে কর্নেল মনসনের মৃত্যুর পর আচিয়ে ক্লেভারিংও মারা গেলে বাংলায় হেস্টিংস অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হন।

ব্রিটিশ বিজয়ের পর বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ব্রিটিশ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ফলে এই অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের অর্থনৈতিক বন্ধন এবং বাংলার সঙ্গে অন্যান্য প্রাচ্যদেশের বাণিজ্য যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ আসার আগ অবধি বাংলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। এখন সকল সামুদ্রিক বাণিজ্যই বস্তুত ব্রিটিশদের কাছে কেন্দ্রিত হল। দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ক্রমেই ব্রিটিশদের হস্তগত হচ্ছিল। আঠারো শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশদের দালাল হওয়ার শর্তেই কেবল ভারতীয় বণিকরা বড় ধরনের লেনদেনের সুযোগ পেত। অর্থসংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলি থেকে একইভাবে ব্রিটিশরা তাদের হটিয়ে দিচ্ছিল।

ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বে ভারতীয় মহাজন ও মুৎসুদ্দীদের বৃহত্তম ও সবচেয়ে সুবিধাজনক লেনদেন ছিল মুর্শিদাবাদের কোষাগারে রাজস্ব পাঠানোর সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে কোষাগারটি মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হলে এর উপর জগৎ শেঠ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রভাবের অবসান ঘটে। রাজস্ব ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত করার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ১৭৭৩-১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের তৎকালীন টাকশালগুলি বন্ধ করে দেন। এভাবে টাকা তৈরির উপর কলিকাতার একচেটিয়া অধিকার বর্তায়। তখন থেকেই জগৎ শেঠ ও তাঁর পরিবারের ধ্বংসের সূচনা ঘটে। তিনটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রক্রিয়াটি আরও ত্বরিত হয়। এসব ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কনোট ইস্যু করত এবং ঋণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি চালাত।

ব্রিটিশের কাজে নিযুক্ত ভারতীয় দালাল বা 'বানিয়াদের' স্থলে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ব্যক্তিগত ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থাগুলিই ক্রমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের দ্বারা ভারতবর্ষ শোষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এগুলি আমদানি-রপ্তানির লেনদেন, কর আদায়, মহাজনী, ভারত থেকে লুণ্ঠিত মূল্যবান সামগ্রীগুলি ব্রিটেনে পাচার ও অনুরূপ কার্যকলাপ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিল। শহর থেকে বিতাড়িত শক্তিশালী ভারতীয় বণিক ও মহাজনরা অতঃপর গ্রামাঞ্চলে 'জমিদারি' ক্রয়ে ও তেজরাতিতে তাদের পুঁজিলগ্নি শুরু করেছিল।

কারিগরদের শোষণও তখন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে কোম্পানির বা তার একক কর্মচারীর ফরমাশের কাজ শেষ না হওয়া অবধি অন্য কোন ক্রেতা বা বাজারের জন্য কাপড় তৈরি তাঁতিদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এরা যাতে তাদের তৈরি সামগ্রী অন্যত্র বিক্রি করতে না পারে সেজন্য গোমস্তারা তাঁতিদের বাড়ির দরজায় পাহারাদার বসাত। এভাবে তাঁতিরা তাদের স্বাধীনতার অবশেষটুকুও হারায়। এই সময় তাঁতিরা প্রায়ই বাড়িঘর ছেড়ে গ্রামে পালাত এবং সেখানে রায়ত চাষীর সংখ্যা বাড়াত, যাদেরও অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। ১৭৭৩ ও ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে শান্তিপুরে তাঁতিবিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে সোনার গাঁ'র তাঁতিরা প্রতারিত, অত্যাচারিত ও গ্রেপ্তার হওয়ার অভিযোগ জানায়। লবণ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকেও অনুরূপ অভিযোগ আসে।

বাংলার চাষীরা তখন ক্রমেই হীনাবস্থায় পতিত হচ্ছিল। ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থা এবং তার পরিচালকদের উপর ক্লাইভ কোনই হস্তক্ষেপ করেন নি। পক্ষান্তরে হেস্টিংস ব্রিটিশ করব্যবস্থা প্রবর্তন শুরু করেন। জমির উপর বাংলার প্রাক্তন শাসকদের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধিকার এখন ব্রিটিশদের উপর বর্তিয়েছে ভেবে হেস্টিংস এদেশের কৃষক শোষণের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়াস পান যা ফ্রান্সিসের বিদ্রূপাত্মক ব্যাখ্যায় দেশীয় প্রজাদের শোষণের মাধ্যমে নিরক্ত করে ফেলার অধিকার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ফ্রান্সিসের মতে ভারতের জমির একমাত্র মালিক হল 'দেশীয় ভূস্বামীরা' — তাঁর ভাষানুসারে, 'জমিদাররা'। ফ্রান্সিসের বিরোধিতা সত্ত্বেও হেস্টিংস স্বল্পকালীন ইজারার ভিত্তিতে জমিচাষের নিয়ম প্রবর্তন করেন। এমতাবস্থায় প্রজাদের কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ ও ফসল আদায় ইজারাদারদের একক লক্ষ্য হয়ে ওঠায় কৃষকরা চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের তুলনায় ১৭৯০-১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যায় জমির খাজনা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এই নীতির ফলে আঠারো শতকের শেষ নাগাদ বাংলার এক-তৃতীয়াংশই জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ওঠে এবং এককালীন ফসলের উর্বর মাঠগুলি ক্রমে হিংস্র বাঘের আস্তানায় পরিণত হয়।

তারপর অসংখ্য কৃষকবিদ্রোহ এক নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে বৃহত্তমটি ঘটেছিল ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে দিনাজপুরের ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে। সে খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাত। রংপুর শহরের কাছে প্রজারা মিলিত হয়ে একজন নেতা নির্বাচনক্রমে থানা দখল করে ও কলিকাতায় একটি দরখাস্ত পাঠায়। কিন্তু কোন উত্তর না আসায় তারা অস্ত্রধারণ করে। বিদ্রোহ দমনের জন্য সেখানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পাঠান হয়।

আঠারো শতকের শেষ চার দশকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ছোটখাটো বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। জঙ্গলের অনুন্নত আদিবাসীরাও কখনো কখনো এতে

কৃষকদের সঙ্গে যোগ দিত। ব্রিটিশ সৈন্যদের পক্ষে দুর্গম সাঁওতাল ও চুয়ার বিদ্রোহ এগুলিরই দৃষ্টান্ত। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্ন্যাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহটি অনেক বছর স্থায়ী হয়েছিল। একবার কয়েক হাজার সশস্ত্র সন্ন্যাসী কলিকাতার উপকণ্ঠ অবধি পেঁাছেছিল। হেস্টিংস এদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অফিসরদের অধীনে একটি নিয়মিত সিপাহীদল পাঠান। সন্ন্যাসীদের গণসমর্থন নষ্ট করা সহ এদের দলে কৃষকদের যোগদান বন্ধের জন্য হেস্টিংস ধৃত প্রতিটি বিদ্রোহীকে তার নিজ গ্রামে ফাঁসি দেয়া, সেই গ্রাম থেকে প্রচুর পিটুনি কর আদায় ও নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে দাস হিসাবে ধরে আনার নির্দেশ দেন। নিজ কার্যকালের শেষ নাগাদ হেস্টিংস সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে ও এদের বাংলা থেকে বিতাড়নে সফল হন।

অধীনতামূলক চুক্তির ব্রিটিশ নীতি

আঠারো শতকের সত্তর ও আশির দশকগুলিতে কোম্পানি ভারতে রাজ্যবিস্তারের বদলে ইতিমধ্যে দখলীকৃত অঞ্চলগুলিতে তাদের অবস্থান মজবুত করা এবং ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলিতে প্রভাব বিস্তারের দিকেই বেশি নজর দিয়েছিল।

কোম্পানির সঙ্গে অধীনতামূলক চুক্তিসম্পাদনকারী স্বাধীন রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সিপাহীদের সাহায্য দিয়ে তারা এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি পূরণ করত।

এই ধরনের চুক্তিস্বাক্ষরের পর একটি স্বাধীন রাজ্যকে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত তার স্বাধীনতা প্রত্যাহার করতে হত। অতঃপর এই রাষ্ট্র কোম্পানির মাধ্যমে তার বৈদেশিক সম্পর্ক চালনায় বাধ্য থাকত, সেই রাজ্যে কোন ফরাসী বাহিনী থাকলে তা ভেঙ্গে দিতে হত এবং কোন ফরাসীকে চাকুরি দিতে পারত না। এই দুটি শর্তের ফলে অধীনতামূলক চুক্তিভুক্ত দেশগুলির পক্ষে আর ব্রিটিশ প্রভাবের বাইরে আসা সম্ভব হত না। পরিশেষে, এই চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি সম্ভাব্য বৈদেশিক আক্রমণের অজুহাতে এসব দেশে সিপাহী বাহিনী পাঠাত। ব্রিটিশের দেয়া শর্ত মোতাবেক সেই রাজ্যের শাসক এই সৈন্যবাহিনীর যথাযথ ভরণপোষণের ভার নিতেন! নিজ আওতাধীন এলাকায় খাজনা আদায়ের অধিকারের বলে সিপাহীরা বস্তুত সেখানে লুণ্ঠন চালাত এবং রাজ্য সেখানে কোম্পানির জন্য নতুন এলাকা বরাদ্দ করতে বাধ্য থাকত কিংবা সিপাহীদের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য কোম্পানির কর্মচারীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করত। উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক দিক থেকে অনিবার্য ধ্বংসই রাজ্যগুলির নিয়তি হয়ে উঠত। শেষপর্যন্ত কোম্পানি 'কুশাসনের' অজুহাতে এসব নিঃস্ব রাজ্যগুলিকে নিজ এলাকাভুক্ত করত।

অধীনতামূলক চুক্তির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রাজ্যদখলের এই নীতিটি প্রবল গণবিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কখনো কখনো একটি এলাকার পুরো জনসংখ্যাই

ব্রিটিশদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত এবং স্থানীয় বিদ্রোহ ব্যাপকতর পরিসর লাভ করত। এভাবেই বারাণসী ও অযোধ্যার ব্যাপারগুলি ঘটেছিল।

পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার অনুসমর্থনের বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে হেস্টিংস ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে করদরাজ্য বারাণসী দখল করে নেন। কোম্পানি অতঃপর বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংকে তাঁর দেয় কর কখনই না বাড়ানোর আশ্বাস দেয়। কিন্তু সামরিক ব্যয়বহনের জন্য অতিরিক্ত খরচার প্রয়োজন দেখা দিলে হেস্টিংস রাজার কাছে বাড়তি করের দাবি জানান। শেষপর্যন্ত এই দাবি বারাণসী রাজ্যের সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে। হেস্টিংস তখন অর্থসংগ্রহের জন্য নিজেই বারাণসী আসেন। এমতাবস্থায় চৈৎ সিং কিছুটা সময় চাইলে হেস্টিংস তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। এই সংবাদে উত্তেজিত এক জনতা বারাণসী প্রসাদে ঢুকে পড়ে, রাজার অধীনে কর্মরত ব্রিটিশ সিপাহীদের হত্যা করে এবং চৈৎ সিংকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। ব্রিটিশদের হাতে নিরন্তর অত্যাচারিত হওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণের মনে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। হেস্টিংস অত্যন্ত সংকটের মুখোমুখি অবস্থায় খুবই কষ্টের মধ্যে শেষাবধি বারাণসী থেকে পালাতে সক্ষম হন।

অচিরেই বিদ্রোহ সারা বারাণসী, এমন কি অযোধ্যা অবধি ছড়িয়ে পড়ে। ভীত ব্রিটিশরা সারা বাংলায় তাদের মোট সৈন্যদের জড় করতে শুরু করে। কিন্তু চৈৎ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন সামন্ত ভূস্বামীরা হেস্টিংসের কাছে সন্ধির সনির্বন্ধ অনুরোধ পাঠানোর ফলে এবং স্থানীয় মহাজনরা ব্রিটিশদের অর্থসাহায্য দেয়ায় কিছুটা সহজেই বিদ্রোহ দমন করা যায়। প্রাক্তন রাজার দেয়া প্রায় দ্বিগুণ করের বিনিময়ে এবং খাজনা আদায় ও যুদ্ধে এককভাবে ব্রিটিশ সৈন্য ব্যবহারের শর্তে অন্য এক রাজা বারাণসীর সিংহাসন লাভ করেন। অতঃপর বারাণসীর শক্তিশালী 'জায়গীরদাররা' তাদের 'জায়গীর' হারাতে থাকে। কোম্পানির অত্যাচার থেকে সংগৃহীত বাড়তি খাজনা আদায়ের ফলে বারাণসীর সমৃদ্ধ এলাকাগুলি দারিদ্র্যপীড়িত, বিধ্বস্ত অঞ্চলে পর্যবসিত হয়। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে বারাণসীর ব্রিটিশ রেসিডেন্টের ঘোষণা থেকে জানা যায় যে এই এলাকায় বিগত বছরগুলির কুশাসনের ফলে জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশেই কোন চাষাবাদ সম্ভবপর হয় নি।

১৭৮১ খৃস্টাব্দে বারাণসীর বিদ্রোহ দমনের পর আবার পরবর্তী বছরেই অযোধ্যায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোম্পানি অযোধ্যাকে সেখানে অবস্থানরত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য ক্রমবর্ধমান খরচ যোগাতে এবং অধিকতর পরিমাণে জমি ইজারা দিতে বাধ্য করছিল। জনগণের অন্যান্য অংশের সমর্থনের অভাবে বিদ্রোহী কৃষকরা সেখানকার শক্তিশালী সামন্তদের অধীনস্থ সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়। ব্রিটিশের দুর্ভার খাজনার ফলে ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া

সত্ত্বেও হেস্টিংস অযোধ্যার দেয় কর কিছুমাত্র কমান নি। পরবর্তী বছরগুলিতে খাজনাশোধে অক্ষম অথচ এজন্য উৎপীড়িত বিক্ষুব্ধ কৃষকদের হাত থেকে কেবল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীই অযোধ্যার নবাবকে রক্ষা করছিল।

বস্তুত শূন্য কোষাগার পুনর্গঠনের জন্য কোন কোন সামন্তের বিষয়-আশয় নানা অজুহাতে বাজেয়াপ্ত করায় সামন্তদের মধ্যেও অসন্তোষ বাড়ছিল। অযোধ্যার নবাব নিজেও কার্যত ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিলেন। তৎকালে বারাণসীতে নির্বাসিত প্রাক্তন নবাবের পালিত পুত্র ওয়াজিদ আলীর নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট সামন্তরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত বারাণসী, বিহার ও বাংলার সামন্তবর্গ (মুসলিম ও হিন্দু উভয়ই), কলিকাতায় আর্মেনীয়রা সহ বাংলার সকল বণিক এবং অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী ওয়াজিদ আলীকে সমর্থন করে। রোহিলার নেতৃবর্গ, গোয়ালিয়রের মরাঠারাজের সঙ্গেও তিনি আলোচনা চালান এবং আফগানিস্তানের জামান শাহ্‌কে ভারত আক্রমণের অনুরোধ জানিয়ে সেখানে প্রতিনিধি পাঠান। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসীদের সঙ্গেও একটি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রিটিশরা তাঁর কার্যকলাপে সন্দিহান হয়ে ওঠে ও তাঁকে কলিকাতা যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ওয়াজিদ আলী অস্বীকৃত হন এবং বিদ্রোহ করেন। কিন্তু অপরিপক্কতার দরুন শুরুতেই বিদ্রোহ দমন সম্ভবপর হয়। ওয়াজিদ আলী কলিকাতায় নির্বাসিত হন।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দের এক চুক্তি মোতাবেক অযোধ্যা গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় এক বিরাট এলাকা, রোহিলখণ্ড ও গোরক্ষপুর হারায়। অতঃপর অযোধ্যার নবাব তাঁর সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন এবং কোম্পানি অযোধ্যায় তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নতুন নবাব ক্ষমতাসীন হলে গণ-অসন্তোষের মুখে সরকার খাজনা কমাতে বাধ্য হয়। তাসত্ত্বেও অধিক খাজনার বিরুদ্ধে দু'বছর পরই বেরিলীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুফতি ওয়াজের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিদ্রোহ কেবল বিশেষ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই শেষাবধি দমন করা গিয়েছিল। সবকিছুই আসলে অপরিবর্তিতই ছিল। নবাবের কোন আপত্তি না থাকায় করদরাজ্য অযোধ্যায় দশ হাজারের বেশি সৈন্যপোষণ কোম্পানির পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। আসলে এদের অবস্থানের কল্যাণেই তো নবাবের পক্ষে ক্ষমতাসীন থাকা সম্ভবপর হচ্ছিল।

ব্রিটিশের দক্ষিণ ভারত বিজয়

মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের প্রধান প্রতিবন্ধ এসেছিল মহীশূর রাজ্য থেকে। দক্ষিণ ভারতের কেন্দ্রবর্তী এই রাজ্যটি দুই দিকে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট

পর্বত ও দক্ষিণে কাবেরী নদী বেষ্টিত একটি মালভূমিতে অবস্থিত থাকায় সেখানে শত্রুসৈন্য প্রবেশ মোটেই সহজ ছিল না। মোগল ও মরাঠাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মূল ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকার জন্য মহীশূর নিজ শক্তি সংহতির সুযোগ পেয়েছিল। অসংখ্য আঞ্চলিক পাহাড়ী নদী এবং বাঁধ ও জলভাণ্ডারের ব্যাপক জালবিন্যাস সহ কাবেরীর জলের প্রাচুর্য সেখানকার কৃষকদের জন্য অঢেল ফসল নিশ্চিত করত। ভূমিরাজস্ব মহীশূরে মোটামুটি কমই ছিল এবং কুটিরশিল্প খুবই উন্নতি লাভ করেছিল।

রাজ্যের অনেকগুলি শহরে কাপড় (প্রধানত মোটা ধরনের) উৎপন্ন হলেও লোহার টুকরাই ছিল প্রধান রপ্তানিদ্রব্য এবং সারা ভারতে তার বিক্রয় চলত। পাহাড়ী নদীর স্রোতে লৌহ আকরিকের টুকরোগুলি মালভূমিতে পৌঁছত এবং প্রধানত বালু থেকেই এখানে লোহা সংগৃহীত হত। অঢেল কাঠ থাকার প্রেক্ষিতে আদিম ধরনের চুল্লিতে এই লোহা গলানো যেত এবং শেষে ছোট ছোট চুল্লিতে বার বার শোধনের মাধ্যমে এথেকে লোহা ও ইস্পাত তৈরি করা হত। গ্রামীণ মানুষ মরশুম ভিত্তিতে এই ব্যবসা চালাত এবং বছরের বাকি সময় এরা নিজের জমি চাষ করত কিংবা অন্য কৃষকের জমিতে মজুর খাটত। অন্যান্য প্রধান কারিগরী পেশার মধ্যে ছিল কাঁচের চুড়ি তৈরি, রঙ করা, বই সেলাই, খাল কাটা ও লবণ উৎপাদন।

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ওদিয়ারের হিন্দুবংশের রাজাকে তাঁর মুসলিম সেনাপতি হায়দার আলি (১৭৬৬-১৭৮২) পদচ্যুত করে সিংহাসনটি দখল করেন। প্রথমেই তিনি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। হায়দার আলি একক জায়গীরদার কর্তৃক সংগৃহীত ও রক্ষিত এবং কেবল তাদের অনুগত সৈন্যবাহিনী রাখার প্রাক্তন পদ্ধতির স্থলে সরাসরি নিজের অধীনে যোদ্ধা ও অফিসর রাখার ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি সরকারী তহবিল থেকে তাদের বেতন দিতেন এবং এইসঙ্গে 'জায়গীর' বণ্টনের প্রথা রহিত করেন। তাঁর সৈন্যদলে তিনি ব্যাপক ভিত্তিতে বিদেশী অফিসর (বিশেষত ফরাসী) নিয়োগ করতেন। এসব অফিসরদের কাছ থেকে হায়দার আলির সৈন্যরা নতুন মানের শৃঙ্খলা, নতুন কৌশলাদি শিক্ষা পায়। হায়দার আলিই প্রথম ভারতীয় শাসক যিনি অশ্বারোহীর বদলে পদাতিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর কর্মরত মোট ৫০-৫৫ হাজার সৈন্যের মধ্যে পদাতিকের সংখ্যা ছিল ২৬-৩১ হাজারের মতো। এদের মধ্যে ইউরোপীয় ধারায় প্রশিক্ষিত, বন্দুকধারী নিয়মিত সৈন্য ছিল ২০ হাজার। হায়দার আলির অশ্বারোহী বাহিনী একজন মাত্র সেনাপতির অধীনস্থ ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের একটি করে যুদ্ধের ঘোড়া থাকায় যুদ্ধে তারা অধিকতর সাহস দেখাতে উৎসাহ পেত। তদুপরি তাঁর প্রথম শ্রেণীর গোলান্দাজ বাহিনীটি ছিল ব্রিটিশদের সমকক্ষ ও অত্যন্ত গতিশীল। যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসা সাহায্যের জন্য তিনি একটি বিশেষ সেনাদল গঠন করেন। সুসংগঠিত

ব্যাপক পরিদর্শক ব্যবস্থা তাঁর সামরিক বাহিনী পরিচালনার ব্যাপারটি সহজতর করেছিল।

এসব উদ্ভাবন ও মহীশূরের অঢেল সম্পদের কল্যাণে কয়েক বছরের মধ্যেই হায়দার আলি ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী গঠনে সক্ষম হন। ১৭৬১-১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি অনেকগুলি যুদ্ধ চালিয়ে জয়লাভ করেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে হায়দার আলি তিন লক্ষ টাকায় হায়দরাবাদ সিংহাসনের অন্যতম দাবিদারের কাছ থেকে সদর সহ সেরা জেলাটি ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি হস্‌কোট, দড্ডা বালাহপুর, চিক বালাহপুর, নান্দিদুর্গ, গুড়িবান্ডা, কোডিকান্ডা ও নিকটস্থ অন্যান্য কয়েকটি ছোট এলাকাও নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেন। একালের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা ছিল প্রায় ৬০ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত বেদ্‌নোর নামক নগর বিজয়। কয়েক প্রস্ত প্রাচীরবেষ্টিত ও পশ্চিমঘাট পর্বতে অবস্থিত থাকায় মালাবার উপকূল ও মালাবার ও কানাড়া থেকে মহীশূরে আসার গিরিপথগুলি এর নিয়ন্ত্রণে থাকত। বেদ্‌নোরের সিংহাসনের অন্যতম শরিককে সমর্থনের অজুহাতে হায়দার আলি সেখানে বংশপরম্পরায় বেদ্‌নোর শাসকদের সঞ্চিত অঢেল ধনদৌলত সহ দুর্গটি অবরোধ করেন। হায়দারনগর হিসাবে নতুন নামকরণের পর শহরটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রাগারে পরিণত করা হয়।

হায়দার আলির সৈন্যরা অতঃপর বেদ্‌নোর গিরিবর্ত্ম দিয়ে মালাবার উপকূলে পৌঁছয় এবং সহজেই বৃহৎ বন্দর-শহর হনাবার (হনর) ও মাঙ্গালোর সহ বেদ্‌নোরের করদরাজ্য সুন্দা (পরবর্তীকালে কান্নাড়া) জয় করে। হায়দার আলি তারপর সাভানুরের নবাবের সৈন্যদল উৎখাতে উদ্যোগী হন। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষতি এড়ানোর জন্য এই রাজ্যটি দখল থেকে তিনি বিরত থাকেন।

হায়দার আলি মরাঠাদের মতো পরদেশ আক্রমণ করে সেখান থেকে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করতেন না। বিজিত এলাকাগুলিকে তিনি তাঁর রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। সারা দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য বিস্তারক্ষম এবং ব্রিটিশদের মুকাবিলায় সমর্থ শক্তিশালী সংযুক্ত মহীশূর রাজ্য দ্বারা তিনি ছোট ছোট অসংখ্য এলাকাগুলিকে প্রতিস্থাপিত করেন। কিন্তু অন্যান্য সকল বিজয়ীর মতো হায়দার আলি ও তাঁর সৈন্যবাহিনী বিজিত জাতিগুলিকে লুণ্ঠন করতেন এবং শেষে সৈন্যবাহিনী পোষণে অধিকতর তহবিলের প্রয়োজন দেখা দিলে নতুন দখলীকৃত রাজ্যগুলি থেকে বাড়তি খাজনা আদায় করতেন। এই ব্যবস্থার ফলে বিজেতা শাসক ও জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং এভাবে প্রথমে মহীশূর রাজ্যের একটি ও পরে অন্যতর এলাকায় বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

হায়দার আলির রাজ্যবিস্তারের অনিবার্য ফলস্বরূপ দক্ষিণ ভারতের দুটি প্রধান শক্তি — সংযুক্ত মরাঠা রাজ্যগুলি ও হায়দরাবাদের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেয়। এসব

রাজ্যের কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা ছিল না এবং এরা প্রতিবেশীকে হটিয়ে নিজ রাজ্যবিস্তারে সর্বদাই তৎপর ছিল। ছোট ছোট এলাকাগুলির অনেকটিই ক্রমান্বয়ে তাদের কোন-না-কোন প্রতিবেশীর কবলে পড়ত এবং এরা চলতি অথবা প্রাক্তন মালিক হিসাবে কর দাবি করত। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে মরাঠারা মহীশূর আক্রমণ করলে হায়দার আলি দুই বার পরাজিত হওয়ার পর শেষপর্যন্ত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খেসারত দিয়ে তাদের দূরে রাখতে সক্ষম হন।

হায়দার আলি অতঃপর বালাম ও কুর্গে (পশ্চিমঘাটের মধ্য দিয়ে এই এলাকাগুলির গিরিপথ রয়েছে) অভিযান চালান। বালাম তখনই আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু কুর্গের বিরুদ্ধে ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে শেষে মহীশূর একটি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। মুসলিম বণিক 'মপলাদের' রক্ষা করার অজুহাতে হায়দার আলির সৈন্যবাহিনী বালাম গিরিপথ দিয়ে মালাবার উপকূল পর্যন্ত পেঁছিয়। কালিকটের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ এবং নিষ্কর ভূমিস্বত্ব ভোগের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক কাজে নিযুক্ত নায়ার যোদ্ধা ও জমিদাররা ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কয়েক দিনের মধ্যেই ছয় হাজার মপলা বণিককে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। নায়াররা কেবল পদাতিক সৈন্য নিয়েই যুদ্ধ চালাত এবং অসি ও তীরধনুক ব্যবহার করত। তারা অবশ্য হায়দার আলির সৈন্যদের প্রতিরোধ করতে পারে নি।

আঙ্গারাকাণ্ডি নদীর তীরে এক যুদ্ধে নায়ার সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে ও হায়দার আলি কালিকট দখল করেন। এই প্রথম বারের মতো মালাবার উপকূল অঞ্চলে অত্যধিক ভূমিরাজস্ব বসানো হয়। তিন-চার মাস পর নায়াররা আবার তাদের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস পায়। একটি বিদ্রোহের মাধ্যমে সেখানে অবস্থিত হায়দার আলির সৈন্যবাহিনীকে তারা পরাজিত করে। হায়দার আলি ইতিমধ্যেই কোয়েম্বাটুর পেঁছেছিলেন। ভরা নদী ও অশ্রান্ত বৃষ্টির বাধা এড়িয়ে হায়দার আলির সৈন্য এখানে পেঁছতে পারবে না ভেবে নায়াররা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু বর্ষাকাল সত্ত্বেও হায়দার আলি কালিকটে ফিরে আসেন এবং অস্ত্র ও আগুনে শহরটিকে ধ্বংস করে দেন। অতঃপর পনেরো হাজার নায়ারকে সবলে মহীশূরের কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের বিরুদ্ধে হায়দার আলির পরবর্তী অভিযান তাঁর বিরুদ্ধে মরাঠা, হায়দরাবাদ ও ব্রিটিশের রক্ষিত আর্কটের নবাবকে ঐক্যবদ্ধ করে ছিল। হায়দার আলি তাঁর ভারতীয় শত্রুদের ক্রয় করতে সমর্থ হলেও ব্রিটিশরা এই পর্যায়ে বড়মহাল আক্রমণ করে এবং মহীশূরের কেন্দ্র, রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টমের দিকে এগিয়ে যাবার হুমকি দেয়। এই সংবাদ পেয়ে হায়দার আলির পুত্র টিপু আর্কট আক্রমণ করলে ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ বাধে।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের পরাজয় ঘটিয়ে এবং বঙ্গবিজয়ের পর ব্রিটিশরা হায়দার আলির উপরও সমান দ্রুত জয়লাভ আশা করেছিল। কিন্তু ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে সাঙ্গামা ও ত্রিনোমালির যুদ্ধের পর হায়দার আলি বড় রকমের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেন। অতঃপর তিনি নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেন। যেমন: তিনি সৈন্যবাহিনীকে অতি দ্রুত নতুন স্থানে চালিয়ে নিয়ে একক সৈন্যদল বা অরক্ষিতপ্রায় স্থানে আঘাত করতেন। ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনীর তুলনায় মহীশূরের অশ্বারোহী ও গোলান্দাজ বাহিনীর অত্যধিক দ্রুতগতি কয়েকটি ক্ষেত্রে হায়দার আলির সাফল্য নিশ্চিত করেছিল।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই উভয়দিক থেকে মহীশূর আক্রমণের মাধ্যমে ব্রিটিশরা কিছু উল্লেখ্য প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করে। বোম্বাইয়ের সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় মালাবার উপকূলবাসীরা বিদ্রোহ করলে হায়দার আলি তাঁর মূল সৈন্যবাহিনীকে মালাবারে পাঠাতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজের সৈন্যরা মহীশূরের পুরো দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটি দখল করে নেয়। কিন্তু মূল সরবরাহ-ঘাঁটি থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং তারা যুদ্ধের সামর্থ্য অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। হায়দার আলি তখন তাঁর সেরা সৈন্যবাহিনী নিয়ে কর্ণাটক আক্রমণ করেন এবং পথের গ্রাম-গঞ্জ পুড়িয়ে অচিরেই মাদ্রাজের শহরতলী অবধি পেঁাছন। এমতাবস্থায় ব্রিটিশরা বাধ্য হয়ে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এবং তদনুযায়ী তারা পরস্পরের দখলীকৃত এলাকাগুলি ফিরিয়ে দেয়া সহ তৃতীয় শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হলে পরস্পরকে সাহায্যদানে সম্মত হয়।

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে মরাঠারা উত্তর মহীশূর আক্রমণ করলে হায়দার আলি ব্রিটিশের সাহায্য চান। কিন্তু ইতিপূর্বেই মরাঠাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে বলে ব্রিটিশরা প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করে।

হায়দার আলির পূর্বে সকল ভারতীয় রাজাই ব্রিটিশকে তাঁদের সমপর্যায়ের শাসক মনে করতেন। কখনো তাঁরা ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতেন, আবার কখনো বা অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতেন। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে হায়দার আলিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশরাই ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রধান শত্রু এবং এদের সঙ্গে কোন চুক্তি একেবারেই অসম্ভব। তাই '...**হায়দার আলি ও টিপু সাহেব কোরান নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চিরদিন ঘৃণাপোষণ সহ এদের ধ্বংসের শপথ নেন।'***

হায়দার আলি ১৭৭২ সালে মরাঠাদের ক্রয় করতে সফল হন। এই সঙ্গে যুদ্ধে যে মহীশূরের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে এটি তিনি উপলব্ধি করোছলেন।

হায়দার আলি করদরাজ্যগুলি থেকে, বিশেষত মরাঠা আক্রমণের সময় শত্রুপক্ষ সমর্থকদের কাছ থেকে বাড়তি কর সংগ্রহ মাধ্যমে তাঁর শূন্যপ্রায় রাজকোষ পুনর্গঠন করেন। ১৭৭২-১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনরায় মালাবার উপকূলটি দখলে আনেন এবং ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে কুর্গ এলাকাও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়।

প্রথম ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ও মরাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে হায়দার আলি এতে জড়িয়ে পড়েন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠাবাহিনী বিধ্বস্ত হলে অন্যান্য মরাঠা রাজাদের উপর পেশোয়ার পূর্বক্ষমতা আর অটুট থাকে নি। তখনকার সর্বপ্রধান মরাঠা রাজ্য ছিল গোয়ালিয়র (সিন্ধিয়া বংশের অধীন) ও ইন্দোর (হোলকার বংশ শাসিত)। তাসত্ত্বেও প্রথম মাধব রাওয়ের শাসনকালে (১৭৬১-১৭৭২) দক্ষিণ ভারতে মরাঠাদের উল্লেখ্য ভূমিকা ছিল। প্রথম মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে পুনায় লড়াই বাধে। এঁদের অন্যতম রঘুনাথ রাও বা রাঘব তখন হায়দার আলির সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু কুর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকার প্রেক্ষিতে হায়দার আলির পক্ষে তাঁকে সাহায্য দান সম্ভব ছিল না। অতঃপর তিনি সুরাটে বোম্বাই কাউন্সিলের দ্বারস্থ হন এবং বেসিন, সালসেটের মরাঠা-ভূমি ও বোম্বাই সংলগ্ন আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তরক্রমে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তদুপরি রঘুনাথ রাও তাঁকে দেয়া ২৫০০ জন ব্রিটিশ সৈন্যের ভরণপোষণ বাবদ প্রতিমাসে ১লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিতেও রাজী হন।

কিন্তু মরাঠা প্রধানদের সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণকারী ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রচণ্ড বাধা দেয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অবস্থানজনিত প্রধানের ক্ষমতাবলে হেস্টিংস সুরাট-চুক্তি বাতিলক্রমে রঘুনাথ রাওয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নাবালক দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের মন্ত্রী নানা ফড়নবিশের সঙ্গে পুরন্দরের চুক্তি সম্পাদন করেন। পেশোয়াকে এই চুক্তি মোতাবেক কোম্পানিকে তার সৈন্য অপসারণের জন্য নগদ ১২ লক্ষ টাকা সহ ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদায়ী এলাকা ছেড়ে দিতে হয়। এতে সালসেটে দ্বীপটিও কোম্পানির হাতেই থেকে যায়। কিন্তু বোম্বাই কাউন্সিল হেস্টিংসের নির্দেশ অমান্য করে রঘুনাথ রাওকে ক্ষমতাসীন করার চেষ্টায় আরেকবার মহারাষ্ট্রে তাদের সৈন্য পাঠায়।

বোম্বাই থেকে পাঠান সৈন্যবাহিনী অচিরেই পুনা থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে উয়রগাঁওয়ে মহাদাজী সিন্ধিয়ার সৈন্যদের কাছে ঘেরাও হয়ে পড়লে এদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। কিন্তু পেশোয়ার থেকে আলাদাভাবে স্বীকৃতিলাভ এবং রঘুনাথ রাওকে পেশোয়ার কাছে প্রত্যর্পণ ও ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দ অবধি মরাঠাদের অধিকৃত সমগ্র অঞ্চল তাদের ফেরত দেয়ার শর্তে তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়াস পান। অতঃপর সিন্ধিয়া ব্রিটিশ সৈন্যদের বোম্বাই প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। কিন্তু তাদের সৈন্যবাহিনী নিরাপদ স্থানে পেঁছিনোর সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সরকারের কাউন্সিল চুক্তিটি বলবৎ করতে অস্বীকৃত হয়। এই নির্লজ্জ প্রবঞ্চনার ফলেই মরাঠারা ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে হায়দার আলি ও নিজামের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। মরাঠা ও নিজাম মহীশূর কর্তৃক দখলীকৃত এলাকাগুলিতে তার অধিকার স্বীকারে সম্মত হন এবং হায়দার আলি নিজ দায়িত্বে কর্ণাটকে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় কানাডা দখল নিয়ে ফরাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশদের যুদ্ধ চলায় ফরাসীরা হায়দার আলিকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। এগুলিই ছিল দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের প্রেক্ষিত। তৎকালীন জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারীর মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসান ঘটানোই ছিল এর স্বীকৃত লক্ষ্য।

তখনকার ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিজয় প্রতিরোধক্ষম কেবল দুটি শক্তি — সম্মিলিত মরাঠা রাজ্যগুলি ও মহীশূরই টিকে ছিল। অবশ্য এগুলির মধ্যে মহীশূরই ছিল অধিকতর কেন্দ্রীভূত ও অটলতর শক্তি, তার সৈন্যবাহিনী ছিল আধুনিকতর এবং কেন্দ্রাঞ্চলীয় বাসিন্দারা ছিল জাতিগতভাবে অভিন্নতর। আঠারো শতকের শেষার্ধের বছরগুলিতে ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণ প্রতিরোধের প্রথম সারিতে মহীশূরের অবস্থানের কারণ এতেই নিহিত। কিন্তু মহীশূরের রক্ষাব্যূহের একটি দুর্বল গ্রন্থি ছিল এবং তা হল সাম্প্রতিক দখলীকৃত মালাবার, কুর্গ ও অন্যান্য এলাকার জনগণের অসন্তোষ। ব্রিটিশরা এসব অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটাত এবং হায়দার আলি সেগুলি দমন করতেন। তিনি মহীশূরের ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং খাজনা আদায়কারীদের কাছ থেকে লুকনো অর্থ আদায়ে চাবুক চালাতেন। এই প্রেক্ষিতে তাঁর ধর্মনীতিও ছিল খুবই তাৎপর্যশীল। হায়দার আলি হিন্দুদের ধর্মবোধে আঘাত দিতেন না। তিনি ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কুটিরশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি অস্ত্রকারখানায় ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ররা তত্ত্বাবধায়কের কাজ করত।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

দক্ষিণ ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে হায়দার আলি কর্ণাটক আক্রমণ করেন। সৈন্যদের একাংশ হঠাৎ পোর্টোনোভো আক্রমণ চালায় এবং সমৃদ্ধ বন্দরটি দখলে আনে। এদের অন্য একটি অংশ হায়দার আলির পুত্র টিপুর নেতৃত্বে আর্কট অবরোধ করে। টিপুর সৈন্যবেষ্টিত কর্নেল বেইলির বিরাট সৈন্যদলটি পেরাম্বাকমের যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রধান হেক্টর মনরো কাঞ্জিভরম থেকে মাদ্রাজে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। অচিরে আর্কটেরও পতন ঘটে। এভাবে বস্তুত কর্ণাটকের পুরোটাই হায়দার আলির হস্তগত হয়।

সেকালের শ্রেষ্ঠতম ব্রিটিশ সেনাপতি আয়ার কুটের নেতৃত্বে বাংলা থেকে নতুন সৈন্যদল এসে পৌঁছলে অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয়। হায়দরাবাদের ব্রিটিশবিরোধী ঐক্যজোট ত্যাগ এবং বিনিময়ে গুণ্টুর জেলা (পূর্বে ব্রিটিশ অধিকৃত) ফেরত পাওয়ার শর্তে হায়দরাবাদের নিজাম কর্তৃক ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পাদিত একটি চুক্তির সঙ্গে এই অবস্থা বদলের সন্নিপাত ঘটেছিল। স্থলে কুট এবং সমুদ্রে এডমিরাল হিউজের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে ফরাসী সৈন্যরা (মরিশাস থেকে আগত) স্থলে নামতে ব্যর্থ হয়। কুট ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে হায়দার আলির বিরুদ্ধে পোর্টোনোভো, পেরাম্বাকম ও সোলিংঘুরের যুদ্ধে আরও কয়েকটি উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেন।

মালাবার উপকূল, বালাম ও কুর্গে মহীশূরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ডাচরা হায়দার আলির সঙ্গে যোগ দেয়ার ভয়ে দক্ষিণ ভারতে ওলন্দাজদের শক্ত ঘাঁটি নাগাপট্টম ব্রিটিশরা দখল করে নেয়। ব্রিটিশদের এক আকস্মিক নৈশ আক্রমণের ফলে দুর্ভেদ্য হিসাবে বিবেচিত মহাদাজী সিন্ধিয়ার রাজধানী গোয়ালিয়র দুর্গটিরও পতন ঘটে। এভাবে ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধিয়া সালাবাইয়ে এক চুক্তিস্বাক্ষরে বাধ্য হন এবং ব্রিটিশরা তাঁকে স্বাধীন শাসকের স্বীকৃতি দেয়। অবশিষ্ট মরাঠা নেতারাও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রত্যাহার করেন।

এমতাবস্থায় হায়দার আলির চরম বিপদে এডমিরাল সুফ্রেনের নেতৃত্বে একটি ফরাসী নৌবাহিনী তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজের অদূরে এক জলযুদ্ধে ফরাসীরা এডমিরাল হিউজের রণক্লান্ত নৌবাহিনীকে হটিয়ে দেয়। কর্নেল ব্রেথওয়েটের অধীনস্থ বিরাট ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী একান্ত অভাবিতভাবে আঙ্গুতির নিকটে টিপুর সৈন্যদলের কাছে বেষ্টিত এবং নিহত হয়। জনৈক ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে এই বিপর্যয়ের ফলে ব্রিটিশরা দক্ষিণ ভারতে এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে অনেকদিন পর্যন্ত তারা আর কোন নতুন আক্রমণ চালাতে পারে নি।

ফরাসীদের অবতরণের জন্য অপেক্ষারত হায়দার আলি ইতিমধ্যে কাড্ডালোর বন্দরটি দখল করে নেন। এখানেই ফরাসী সৈন্যদের জন্য ঘাঁটি নির্দিষ্ট হয়েছিল। এরপরও ফরাসী ও ব্রিটিশদের মধ্যে কয়েকটি নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়, কিন্তু এর কোনটিই সিদ্ধান্তমূলক ছিল না। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে হায়দার আলির মৃত্যু ঘটে। তাঁর পুত্র টিপু সুলতান মূলত পিতার নীতিই অনুসরণ করছিলেন এবং ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করাকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ভাবতেন। তিনি ছিলেন সুযোগ্য সেনাপতি ও সৈন্যরা তাঁর অনুগত ছিল।

কিন্তু নিজ শাসনকালের একেবারে গোড়াতেই টিপু হিসাবে একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন। বেদ্‌নোরের অধিনায়ক, হায়দার আলির অতি প্রিয় শেখ আয়াজকে টিপু অপছন্দ করতেন এবং গোপনে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। কিন্তু আদেশটি খোদ আয়াজের হাতে পড়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য তিনি ব্রিটিশদের সাহায্যপ্রার্থী হন। ফলত, ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে জেনারেল ম্যাথুসের নেতৃত্বাধীন বোম্বাই সৈন্যবাহিনী একটিও গুলি খরচা না করে বেদ্‌নোর দখল করে। বেদ্‌নোর হারানোর ফলে টিপু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এর ফলে মহীশূরের কেন্দ্র অবধি পোঁছনোর পথটি ব্রিটিশদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

টিপুর সৌভাগ্য, ভারতবর্ষে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বোম্বাইয়ের সৈন্যদলই ছিল দুর্বলতম এবং ম্যাথুস ছিলেন অযোগ্য ও নমনীয় অধিনায়ক। বেদ্‌নোর দুর্গ দখলের পর ম্যাথুস ও তাঁর সৈন্যদল সেখানে সঞ্চিত বিপুল সম্পদের মালিকানা পায়। এই সমৃদ্ধ নগরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে ব্রিটিশ সৈন্যরা অঢেল ধনদৌলত সংগ্রহ করে। এজন্য বোম্বাইয়ের সৈন্যদলের মনোবল ভেঙ্গে পড়ছিল। টিপু বেদ্‌নো ঘেরাও করে চরম বুভুক্ষার মধ্যে শহরটি দখল করে নেন ও ম্যাথুস বন্দী হন। বেদ্‌নোরের পর টিপু মালাবার উপকূল আক্রমণ করেন এবং ব্রিটিশদের কাছ থেকে কয়েকটি দুর্গ কেড়ে নন। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মালাবার উপকূলে বোম্বাইস্থ সেনাদলের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি মাঙ্গালোর অবরোধ করেন। ঠিক তখনই বৃদ্ধ বুসির নেতৃত্বে ফ্রান্স থেকে একটি নৌবাহিনী কাড্ডালোরে পোঁছয়।

১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ইউরোপে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সংবাদটি ভারতে পোঁছলে এদেশে অবস্থিত সকল ফরাসী সৈন্য, অর্থাৎ কেবল বুসির সঙ্গে আগতরাই নয়, টিপুর অধীনস্থ ও মাঙ্গালোর অবরোধের শরিক ফরাসী সৈন্যরাও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে অস্বীকৃত হয়। এককভাবে মহীশূর সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অবরোধ অব্যাহত রাখা সিন্ধিয়ার (এখন তিনি ব্রিটিশদের সহযোগী) সৈন্যদের সম্ভাব্য আক্রমণের প্রেক্ষিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হয়। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ টিপু মাঙ্গালোরের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন এবং তদনুযায়ী কর্ণাটক থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করেন। ব্রিটিশরাও অতঃপর মালাবার উপকূল ত্যাগে স্বীকৃত হয়। উভয় পক্ষই যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দানের শর্ত মেনে নেয়। এভাবেই দুটি পক্ষের ভাগ্যে নাটকীয় পরিবর্তনসূচক দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

যারা একদিন যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল সেই ব্রিটিশরা মাঙ্গালোর-চুক্তির পর থেকে মহীশূরের বিরুদ্ধে সর্বদাই আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করছিল। ব্রিটেনের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবের ফল ক্রমেই অধিকতর প্রকটিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতেই টিপু তাঁর রণকৌশল পরিবর্তন করেন। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে তিনি মুসলিম শাসকদের মধ্যে নতুন মিত্র সন্ধানের প্রয়াস পান। দক্ষিণ ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যেই টিপু সুলতান ও হায়দার আলির অনুসৃত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মধ্যেকার পার্থক্যের কারণগুলির কিছুটা ব্যাখ্যা মেলা সম্ভবপর।

দক্ষিণ ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে আরও একটি যুদ্ধ ঘটাবে এতে কেবল ব্রিটিশরাই নয়, টিপু সুলতানও নিশ্চিত ছিলেন। এজন্য উভয় পক্ষই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। টিপু ১৭৮৬-১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে মরাঠা ও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান এবং জয়লাভের পর কয়েকটি মরাঠা এলাকা নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও মরাঠারা শেষে ব্রিটিশের পক্ষাবলম্বন করে এই ভয়ে তিনি তাদের অনুকূলেই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে নিজ রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টমে টিপু 'পাতশাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন এবং এভাবে মহীশূরের হিন্দু রাজার কল্পকাহিনীতুল্য শক্তির অবসান ঘটে।

ব্রিটিশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আরও যুদ্ধের সম্ভাবনা অনুমান করে টিপু তখন ফরাসীদের সাহায্যপ্রার্থী হন। তিনি ফ্রান্সে দুটি দূতদল পাঠান। কিন্তু এদের একটি কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল থেকে দেশে ফিরতে বাধ্য হয় এবং অন্যটি ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে পেঁছয়। টিপু ফ্রান্সকে তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটি আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক চুক্তি-সম্পাদনের প্রস্তাব দেন। টিপুর দূতদলকে ভার্সাইয়ে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রাক্কালীন পরিস্থিতির দরুন ফরাসীদের পক্ষে দূর ভারতবর্ষে সৈন্যপ্রেরণ সম্ভবপর ছিল না।

সহযোগী মুসলিম শাসক হিসাবে তাঁকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ১৭৮৪ ও ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে টিপু কনস্ট্যান্টিনোপলে নবাবের কাছে দূত পাঠান। তুরস্ক তখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধরত ও ব্রিটিশের সাহায্যপ্রার্থী। সুতরাং তার পক্ষেও টিপুকে সাহায্যদান সম্ভবপর হয় নি।

ইতিমধ্যে মালাবার উপকূল ও কুর্গে বার বার বিদ্রোহ ঘটছিল। ১৭৮৬ সালে টিপ্নকে বস্তুত মালাবার উপকূল প্ননর্দখল করতে হয়। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দেও মহীশ্নর সৈন্যবাহিনীর ওপর নায়ারদের আক্রমণ যথারীতি অব্যাহত ছিল। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে কুর্গে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। টিপ্নর সৈন্যরা কুর্গে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় মালাবার উপকূলের জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অতঃপর মহীশ্নরের সৈন্যরা মালাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে কুর্গের জনগণ ম্নল দ্নর্গ বাদে অরেকবার মহীশ্নর সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে স্বদেশ প্ননরুদ্ধার করে।

টিপ্ন ত্রিবাঙ্কুরের জর্নরি অবস্থার প্রেক্ষিতে কুর্গের ঘটনাবলী অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হন।

সতেরো শতকের প্রথমার্ধে ত্রিবাঙ্কুর সামান্য এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে ওঠে এবং উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মালাবার উপকূলের সমগ্র দক্ষিণাংশ জয় করার পর ক্রমে ক্রমে প্নরোটাই কুক্ষিগত করার ফন্দি আঁটেন। কিন্তু হায়দার আলির কাছে তাঁর অভিসন্ধি ধরা পড়লে তিনি মহীশ্নরকেই তাঁর প্রধান শত্রনপক্ষ বিবেচনা করেন ও ব্রিটিশের মৈত্রীপ্রত্যাশী হন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশ্নর য্নদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্য দেন। টিপ্নর আক্রমণের ভয়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজা ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে অধীনতাম্নলক চুক্তির মাধ্যমে নিজ দেশে দ্নই ব্যাটালিয়ন সিপাহী রাখার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তাঁর উদ্যোগে মহীশ্নরের করদরাজ্য কোচিনে দ্নর্গনির্মাণ শ্নর্ন হয়। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে টিপ্নর সৈন্যরা এসব দ্নর্গ ভেঙ্গে দিলেও শেষাবধি তাদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় চেষ্টা ফলবতী হয় এবং রাজার পরাজিত সৈন্যরা পলাতে থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের মিত্রশক্তিকে সাহায্যের অজ্নহাতে ঠিক তখনই ব্রিটিশরা মহীশ্নর আক্রমণ করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশ্নর য্নদ্ধ

য্নদ্ধের প্রাক্কালে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩) মহীশ্নরের বির্নদ্ধে পেশোয়া ও নিজামের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেন। তদন্নযায়ী নির্ধারিত ব্যবস্থা ছিল এর্নপ: য্নদ্ধজয়ের পর ব্রিটিশের এই মিত্ররা হায়দার আলি ও টিপ্ন স্নলতান কর্তৃক দখলীকৃত তাঁদের এলাকাগ্নলি ফেরত পাবেন এবং মহীশ্নরের নিজস্ব এলাকাগ্নলি সমানভাবে হায়দরাবাদ, প্ননা ও কোম্পানির মধ্যে বিভক্ত করা হবে আর নিজাম ও পেশোয়া প্রত্যেকে ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে একযোগে য্নদ্ধ করবেন। এইসঙ্গে কর্নওয়ালিস কুর্গ, কোচিন ও মালাবার উপকূল অঞ্চলের অসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গের

সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাদের সামরিক সাহায্য দেয়ার এবং কোম্পানির করদরাজ্য হলে নামমাত্র কর আদায়ের আশ্বাস দেয়া হয়।

কর্নওয়ালিসের কৌশলী পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী তিনদিক থেকে মহীশূর আক্রমণ করে এবং মরাঠা ও নিজামকে মহীশূরের সীমান্তে লুণ্ঠন চালাতে ও মহীশূরের অশ্বারোহী-বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের রক্ষা করতে বলা হয়। সম্মিলিত বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ৫৭ হাজারের কম ছিল না। বাঙ্গালোর অবরোধ ও ধ্বংসের পর ব্রিটিশ সৈন্যরা শ্রীরঙ্গপট্টম অবরোধ করে। তিন সপ্তাহ অবরোধের পর টিপু সুলতান সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। সৈন্যবাহিনীর সরবরাহে অসুবিধা এবং মালটানা পশুগুলি সংক্রামক রোগে মারা পড়ার প্রেক্ষিতে কর্নওয়ালিসের জন্য শান্তি তখন খুবই জরুরি হয়ে উঠেছিল।

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্টমের শান্তিচুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। টিপু ৩·৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন এবং অর্থশোধ পুরো না হওয়া অবধি তাঁর দুই পুত্রকে ব্রিটিশের কাছে পণবন্দী রাখেন। মরাঠারা কৃষ্ণানদী অবধি বিস্তৃত তাদের প্রাক্তন অঞ্চলগুলি এবং হায়দরাবাদ তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী তার প্রাক্তন এলাকা ফেরত পায়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা বড়মহাল ও দিন্দুগুল সহ মালাবার উপকূলের একটা বড় অংশ ও কুর্গ কুক্ষিগত করে। অর্থাৎ, কর্ণাটক ও বোম্বাই থেকে মহীশূরে যাওয়ার সবগুলি পথই তাদের দখলে আসে। তবু কর্নওয়ালিস মহীশূরকে ধ্বংস করলেন না। মরাঠাদের বিরুদ্ধে এটিকে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে টিকিয়ে রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

যুদ্ধশেষে টিপু রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দৃঢ়করণে মনোযোগ দেন। নতুন যুদ্ধের জন্য দেশকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন। তিনি অশ্বারোহীর সংখ্যা কমিয়ে পদাতিকের সংখ্যাবৃদ্ধি করেন। যুদ্ধের খেসারত এবং সৈন্যপোষণের জন্য যথেষ্ট সম্পদের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় ভূমিরাজস্ব ৩০ শতাংশে এবং বাণিজ্যের মাসুল ও শুল্ক ৭ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি করা হয়। তদুপরি 'পাতশাহ্' ছোট ছোট সামন্ত বা 'পালায়াক্কার' (পলিগড়), 'জায়গীরদার' ও হিন্দু মন্দিরগুলির জমি দখল করতে লাগলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যে এতে জনগণের মধ্যে কোন অসন্তোষ দেখা দেয় নি।

হিন্দুরাজ্যগুলি দ্বারা, মহীশূর রাজার সমর্থকদের দ্বারা বার বার প্রতারিত হওয়ার ফলে টিপু সুলতান মুসলিম সভাসদদের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপনে বাধ্য হন এবং কেবল তখনই তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে উন্নীত করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের হস্তগত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় বড়

প্রদেশগুলিতে মুসলিম গভর্নর নিয়োগের ফলে ইতিমধ্যেই দুর্নীতিপঙ্ক দেশে কেবল ঘুসের মাত্রাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। খাজনা আদায়কারীরা কৃষকদের একাধিকবার একই খাজনা দিতে বাধ্য করল এবং রাজস্ব গ্রহণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ঘুস দিয়ে বশীভূত রাখল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টিপু কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব বিভাগের প্রধান মীর সাদিকও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফলত, রাজস্ব আদায় রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে কেন্দ্রীকরণ এবং জমিদারদের সম্পত্তিভোগের সুদূরপ্রসারী অধিকার উৎখাতের জন্য টিপু সুলতানের উদ্যোগ সর্বদাই দৃঢ় প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছিল।

ইউরোপীয়দের কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন টিপু নিজদেশে নতুন ধরনের শিল্প, বিশেষত যুদ্ধলগ্ন শিল্পগুলি গড়ে তোলার প্রয়াস পান। ফরাসী অফিসরদের সাহায্যে তিনি শ্রীরঙ্গপট্টমে কামান ও রাইফেল তৈরির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উৎপাদনের হার (মাসিক একটি কামান ও ৫-৬টি বন্দুক) সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে টিপুর সকল বেপরোয়া চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতে শুধু দেশের জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল ও সাধারণ অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাধ্যতামূলক শ্রমের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্মশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলেছিল। বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যবসায়ীদের নিজ পণ্যের যথার্থ দরের চেয়ে বেশি মূল্য দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল। মালাবার থেকে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থা চালু করা সহ দক্ষিণ ভারতের ব্রিটিশ এলাকাগুলির সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যেসব স্থানে টিপু বড় বড় যুদ্ধ জয় করেছিলেন তাঁর সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে তৈরি শহরগুলিতে বলপূর্বক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। টিপুর কোন কোন সংস্কার ছিল তাঁর নিজস্ব খেয়ালের ফল এবং দেশের জন্য সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন (পোশাকের ধরন বদলাতে জনগণকে বাধ্যকরণ, সরকারী বিভাগ ও কার্যালয়, মাস ও দিনের নাম পরিবর্তন, জেলার সংখ্যাবৃদ্ধি বা এগুলি পুনর্গঠন, সৈন্যবাহিনীর পুনর্বিভাগ ইত্যাদি)।

বহু উদ্যোগের ব্যর্থতা সত্ত্বেও চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে টিপু কয়েক বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার ভরে তোলেন এবং একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশদের যুদ্ধের খেসারত ফেরত দিলে টিপুর পুত্ররাও মুক্তি পায়। টিপু প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠলে ব্রিটিশরা আবার মহীশুর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

উত্তেজিত টিপু পুনরায় স্বধর্মী অন্যান্য শাসকদের কাছ থেকে সাহায্যলাভের চেষ্টা শুরু করেন। তিনি আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহের সাহায্যপ্রার্থী হন এবং ভারতজয় যে এখন খুবই সহজ এটি তাঁকে বুঝান। এই প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে এবং অযোধ্যার প্রাক্তন নবাবের আহ্বানে আফগানিস্তানের শাসক পঞ্জাব আক্রমণ

করেন। কিন্তু শিখদের প্রতিরোধের মুখে এবং দেশে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংবাদ শুনে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। টিপু রোহিলা নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

টিপু ফ্রান্সেরও সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের দিকে তিনি ফ্রান্সে দ্বিতীয় গোপন দূতদল পাঠান। কিন্তু কার সঙ্গে এই আলোচনা চলেছিল এবং কী ফলাফল হয়েছিল তা জানা যায় নি। ১৭৯৫-১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়নের জন্য ফ্রান্স ও মহীশূরের মধ্যেকার আক্রমণ ও আত্মরক্ষার গোপন চুক্তির পরিকল্পনা তিনি ফরাসীদের কাছে পাঠান। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতস্থ ফরাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। অনির্দিষ্ট কর্মসূচি সত্ত্বেও শ্রীরঙ্গপট্টমে একটি 'জেকবিন ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। টিপু সুলতানের উপস্থিতিতে ক্লাবের সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার নামে একটি তরুরোপণ সহ তাঁদের বক্তৃতায় সকল অত্যাচারীর মৃত্যু ও 'স্বাধীন টিপু'র দীর্ঘজীবন কামনা করেন। ফরাসী বিপ্লবীদের কায়দায় একটি 'সান্‌ক্যুলোত' টুপিও অনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে পরানো হয়। মনে হয়, সমকালীন বিশ্ব ঘটনাবলী সম্পর্কে টিপু অবহিত ছিলেন না। অবশ্য অনুষ্ঠানটি যে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নির্ভরযোগ্য সমর্থনলাভের পক্ষে তাঁর সহায়ক হবে তা তিনি বুঝেছিলেন এবং এটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলেন।

ফরাসী সাহায্যের জন্য টিপু আরেকবারও চেষ্টা করেছিলেন। একটি জাহাজে প্রেরিত দু'জন গোপন দূতকে তিনি মরিশাস দ্বীপ থেকে ফরাসী সৈন্য আনতে এবং খোদ ফ্রান্সে সাহায্যলাভের চেষ্টায় পাঠান। কিন্তু তারা যখন মরিশাসে পেঁছিয় তখনই ফ্রান্সে কু'দেতা ও দ্বিতীয় বিপ্লবী পরিষদ প্রতিষ্ঠার সংবাদ আসে। অতঃপর ফ্রান্সে দূত পাঠানো নিরর্থক হয়ে পড়ে। দ্বীপের গভর্নর এই গোপনীয়তা ভঙ্গ করে প্রকাশ্যে টিপুর পতাকাতলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানান। কিন্তু এই আহ্বানে সামান্যই ফলোদয় ঘটেছিল: মাত্র ৯৯জন ফরাসী নাগরিক দূতদের সঙ্গে মহীশূর রওয়ানা হয়েছিল। টিপুর এই কার্যকলাপের সংবাদে এবং টিপুর সঙ্গে যোগদানেচ্ছু বোনাপার্তের মিশর অভিযানের ফলাফলে আতঙ্কিত ব্রিটিশরা অতঃপর তাদের ভীষণতম শত্রু মহীশূরকে অচিরে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভারতের তৎকালীন নতুন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির (১৭৯৮-১৮০৫) এই সম্পর্কিত প্রস্তাবটি লন্ডনে পুরোপুরি অনুমোদিত হয়। প্রথমেই তিনি ভারতে ব্রিটিশের উল্লেখ্য ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী, যথা হায়দরাবাদের শাসকের অধীনস্থ ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নেন। এদের পরিবর্তে নিজামকে একটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর আশ্বাস দেয়া হয়। ব্রিটিশরা তখন ফরাসী

সৈন্যবাহিনীকে ঘিরে ফেলে এবং একটিও গুলি খরচা ছাড়াই তাদের নিরস্ত্র করে ও নিজামের দেয় বেতন মিটিয়ে দিয়ে সৈন্যদলটি ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর ওয়েলেস্‌লির সৈন্যদল মহীশূর আক্রমণ করে। কর্নওয়ালিসের সকল ভুলত্রুটি থেকে ইতিমধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। এবার ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ছিল সুসজ্জিত। টিপুর স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারে অতিষ্ঠ সেনাপতিরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলত, শ্রীরঙ্গপট্টম পুনরায় ব্রিটিশদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয় এবং ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল এক অতর্কিত আক্রমণে ব্রিটিশদের হাতে তার পতন ঘটে। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিপু নিহত হন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী অবাধে কয়েক দিন শ্রীরঙ্গপট্টমে লুণ্ঠন চালায়।

মহীশূর দখলের ফলেই ব্রিটিশের পক্ষে পুরো ভারত দখল সম্ভবপর হয়েছিল। ত্রিশ বছর পর্যন্ত মহীশূরের মানুষ তাদের স্বাধীনতা অটুট রেখেছিল। ব্রিটিশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ছিল যথার্থই বীরত্বপূর্ণ। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে পতনের পূর্বাবধি মহীশূর ছিল এই প্রতিরোধের কেন্দ্রস্থল। সামন্তবাদী মহীশূরের ওপর পুঁজিবাদী ব্রিটেনের বিজয় অনিবার্য ছিল। তাসত্ত্বেও মহীশূরের জনগণের দীর্ঘ প্রতিরোধের মুখে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ভারতে সর্বক্ষণ একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

মহীশূর দখলের পর ঔপনিবেশিকরা তাকে তখনই নিজ এলাকাভুক্ত করার সাহস পায় নি। ওদিয়ার রাজবংশের এক উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসিয়ে 'পরাজিত' করদরাজ্যের আড়ালে তারা নিজেদের আধিপত্য প্রচ্ছন্ন রেখেছিল।

কর্ণাটক দখল

কর্ণাটকের ঘটনাবলী আসলে অধীনতামূলক চুক্তির মাধ্যমে করদরাজ্য দখলেরই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের প্যারিস-চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশের আশ্রিত মুহম্মদ আলীকে কর্ণাটকের (আর্কট) শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অবশ্য তাঁর সত্যিকার কোন ক্ষমতা ছিল না। তিনি ছিলেন ব্রিটিশের ক্রীড়নক মাত্র। ১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধের পর কোম্পানি মুহম্মদ আলীর কাছে সামরিক খরচা বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করে। নতুন নবাবের হাতে এত অর্থ ছিল না। এমতাবস্থায় কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী কোন কোন জেলা থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভের শর্তে তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দেয়। কুটিল আর্থিক কার্যকলাপের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের অধীনস্থ জেলাগুলি থেকে উচ্চহারে বাড়তি রাজস্ব আদায়ে সমর্থ হয় এবং তা নবাবের কাছে ঋণ হিসাবে উচ্চসুদে লগ্নি করে। কোম্পানির অন্যতম সাধারণ কেরানী পল বেনফিল্ড বিশেষত বড় অঙ্কের লেনদেন

চালাত। বার্ষিক ২ শত পাউণ্ড বেতন পেলেও সে নবাবকে হাজার হাজার পাউণ্ড ঋণ দিয়েছিল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নবাব এই ঋণ থেকে মুক্তিলাভে ব্যর্থ হন। ঋণের সুদ মেটাতে গিয়ে মুহম্মদ আলীকে নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হয়। **'উত্তমর্ণদের** (অর্থাৎ **বদমাশ ব্রিটিশ মহাজনদের)** জন্য এটি ছিল 'খুবই সুবিধাজনক'। এতে এসব 'পরজীবীরা' **হঠাৎ জমিদার হয়ে উঠত** এবং **রায়তদের শোষণ করে বিপুল বিত্তসঞ্চয়ের সুযোগ পেত**। ফলত, স্থানীয় প্রজাদের উপর **ইউরোপীয় (ব্রিটিশ) ভুঁইফোড় জমিদারদের অত্যাচার,** নির্মমতর অত্যাচার চলত! এরা ও নবাব সারা কর্ণাটককে ধ্বংস করে ফেলেছিল।'*

আর্কটের নবাবের সৈন্য এবং কোম্পানির সৈন্যরা সমৃদ্ধ তাঞ্জোর দখল ও লুণ্ঠন সত্ত্বেও কোষাগার পুনর্গঠিত হল না। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিণ্ডসে এবং ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড পিগট কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে কর্ণাটকের এই লুণ্ঠন বন্ধের চেষ্টা করেন, কিন্তু তা মোটেই ফলপ্রসূ হয় নি। ব্যর্থ লর্ড লিণ্ডসে দেশে ফিরতে বাধ্য হন। মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কর্ণাটক ও তাঞ্জোর লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তারা লর্ড পিগটকে জেলখানায় আটক করে ও পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে পল বেনফিল্ড ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসাবে ইংলণ্ডে পৌঁছয়।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আশ্রিত করদরাজ্য কর্ণাটক কোম্পানির নিজস্ব এলাকায় পরিণত হয়। এমতাবস্থায় নবাবের বদলে ঋণশোধের দায় কোম্পানির উপর বর্তায় এবং কেবল তখনই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এসব ঋণের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি বিস্তারিত তদন্ত শুরু করে। এরই ফলে ১৩ লক্ষ পাউণ্ড ঋণের দাবির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় এবং অতিরিক্ত ১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড প্রতারণামূলক বা প্রমানহীন দাবি হিসাবে বাতিল হয়ে যায়। 'এবং ২০ বছর পর (১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে) ঋণের শেষ অংকটি অবধি পরিশোধের পর যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তেমনিই দেখা গেল যে **মুহম্মদ আলী** ইতিমধ্যেই **৩ কোটি টাকার নতুন ঋণচুক্তি করেছেন!** তারপর শুরু হয় একটি নতুন তদন্ত। **নবাবের পুরো ব্যাপারটি মীমাংসা হতে এতে সময় লেগেছিল ৫০ বছর, খরচ হয়েছিল ১০ লক্ষ পাউণ্ড।** এভাবেই ব্রিটিশ সরকার — এবং কোম্পানি নয়, তারাই পীটের খসড়া আইনের পরবর্তীকালে শাসন চালিয়েছিল (ভারতবর্ষে) — হতভাগ্য ভারতবাসীকে শোষণ করেছিল!**

* Karl Marx, *Notes on Indian History,* p. 110.
** Karl Marx, *Notes on Indian History,* p. 111.

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কুর্গ ও ত্রিবাঙ্কুরের সংগ্রাম

মহীশূরের পতনের পর ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং সেগুলি দমন করা মোটেই কঠিন হয় নি। ব্রিটিশের সহযোগী অঞ্চলের যেসব বাসিন্দা একদা ইংরেজকে তাদের মুক্তিদাতা ভাবত তারাই এখন ক্ষমতাসীন হয়ে ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করল। এর দৃষ্টান্ত হল কুর্গ ও ত্রিবাঙ্কুর।

শ্রীরঙ্গপট্টমের চুক্তি (১৭৯২) অনুসারে কুর্গ ব্রিটিশ শাসকদের কাছে হস্তান্তরিত হলে প্রাক্তন উদ্বাস্তু জমিদাররা ('নায়ার' ও 'নাম্বুদ্রি') দেশে ফেরে এবং তাদের জমিতে ইজারাদার হিসাবে অথবা টিপু সুলতানের আদেশে যারা পুনর্বাসিত হয় সেই 'মপলাদের' উৎখাত করতে শুরু করে। এতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা দেখে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটিতে অনুমোদন দিয়েছিল। এইসঙ্গে কোম্পানি ভূমিরাজস্ব আরও উচ্চ হারে আদায় করছিল এবং প্রভাবশালী জমিদারদের বার্ষিক খাজনা আদায় ইজারা দিতে শুরু করেছিল।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে খাজনা আদায়ের একটি চুক্তি এর দাবিদার নায়ার-নেতা বর্মরাজের বদলে তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়। ফলত, বর্মরাজ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ খাজনা আদায়কারীদের বিতাড়িত করলে কোম্পানি কয়েক বারই এদের বিরুদ্ধে তার সৈন্যদল পাঠায়। কিন্তু নিবিড় বনের আড়ালে লুকনো এসব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই অভিযানগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে ১১'শ ব্রিটিশ সিপাহীদের একটি দল কুর্গ সৈন্যদের হঠাৎ আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোম্পানি বর্মরাজকে শেষে বার্ষিক ৮ হাজার টাকার পেন্সনের ঘুস দিয়ে বশীভূত করে ফেলে এবং তিনি সংগ্রাম ত্যাগ করেন। কিন্তু অন্যান্য বিদ্রোহী নেতারা সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। এমতাবস্থায় জঙ্গলে আত্মগোপনক্রমে ব্রিটিশ সৈন্য ও তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর বিক্ষিপ্ত আক্রমণের মধ্যেই তাঁদের কার্যকলাপ সীমিত হয়ে পড়ে।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে আরও একটি বিদ্রোহ ঘটে এবং আবার বর্মরাজ এর নেতৃত্ব দেন। এবার ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ওয়েলিংটনের ভাবী ডিউক, আর্থার ওয়েলেসলি। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিদ্রোহীদের সকল নেতাই বন্দী হয়ে ফাঁসিতে প্রাণ দেন। প্রতিরোধ চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে ভেবে ব্রিটিশরা ভূমিরাজস্বের হার অত্যধিক বৃদ্ধি সহ টাকার বদলে দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে খাজনাশোধের নতুন বিনিময় হার চালু করে। এটি ছিল সাধারণ কৃষকের পক্ষে অসুবিধাজনক এবং এর প্রতিবাদে কৃষকদের মধ্যে নতুন বিদ্রোহ দেখা দেয়। এবারের বিদ্রোহের শরিক ছিল কুর্গের একটি বিশেষ এলাকার বাসিন্দারা। তারা হঠাৎ আক্রমণে ব্রিটিশ

সৈন্যবাহিনীকে হটিয়ে পানামারামের ব্রিটিশ দুর্গটি দখল করে। অতঃপর তারা গিরিপথগুলি অধিকার করে, ব্রিটিশদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে এবং উপকূল অবধি সারা জেলার মানুষকে তাদের সংগ্রামের শরিক করে তোলে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তখন কৃষকদের সুবিধা দিতে বাধ্য হয়, খাজনা পূর্বতন স্তরে নামিয়ে আনে এবং তাদের অন্যান্য দাবিদাওয়াও মেটানো হয়। কেবল ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দেই ঔপনিবেশিকদের পক্ষে এই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিল। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই শেষযুদ্ধে মারা পড়েছিল।

তারপর ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে ভূমিরাজস্ব শেষপর্যন্ত অর্থে পরিবর্তিত হলে এই অঞ্চলে আরও একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু মালাবার উপকূল থেকে প্রেরিত সৈন্যদল বিদ্রোহটি দ্রুত দমন করে।

ত্রিবাঙ্কুরেও অভিন্ন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে সেখানে ব্রিটিশ শোষকদের বিরুদ্ধে 'দালাভাই' (প্রধান মন্ত্রী) ভেলু তাম্পি একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তাঁর বিদ্রোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ও কামান ছিল ১৮টি। কোচিনের মানুষও ত্রিবাঙ্কুরের বিদ্রোহে যোগ দেয়। অবশ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতেও তখন বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। দুটি পরাজয়ের পর বিদ্রোহের অবসান স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ভেলু তাম্পি তাঁর উদ্দেশ্যের নিশ্চিত ব্যর্থতা উপলব্ধির পর আত্মহত্যা করেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী অতঃপর যে-নৃশংসতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করে তা এমন কি কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী দ্বারাও নিন্দিত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ

ভারতে সুদূর পঞ্জাবের শিখরাজ্য এবং মরাঠা রাজ্যগুলিই শুধু তখনো ব্রিটিশদের অধীনস্থ হয় নি। মহীশূর জয়ের পর (এতে মরাঠাদেরও কিছুটা অবদান ছিল) ব্রিটিশরা মরাঠাদের বিরুদ্ধে তাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। শক্তিশালী মিত্রহীন মরাঠাদের পক্ষে এই অজেয় শত্রুকে প্রতিরোধ করা আর সম্ভবপর ছিল না। অতএব বলা যায় টিপুর পতনের ফলেই মরাঠাদের পতনও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মরাঠা রাজাদের মধ্যে কলহ বিশেষভাবে পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। তাঁরা সর্বদাই পরস্পরের বিরুদ্ধে ছোটখাটো ষড়যন্ত্রে রত ছিলেন এবং ফলত, ব্রিটিশের পক্ষে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে একে একে অধীনস্থ করা সম্ভবপর হয়েছিল। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে গোয়ালিয়রের রাজা দৌলত রাও সিন্ধিয়া (১৭৯৪-১৮২৭) এবং ইন্দোরের রাজা যশোবন্ত রাও হোলকারের (১৭৯৭-১৮১১) মধ্যে

রাজ্যসীমা নিয়ে যুদ্ধ বাধলে তাঁরা পরস্পরের রাজ্য আক্রমণক্রমে যদৃচ্ছা হত্যা ও লুণ্ঠন চালান। ততদিনে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীই পুনর্গঠিত হয়েছিল: প্রধান শক্তি হিসাবে অশ্বারোহী বাহিনীকে ইউরোপীয় অফিসরদের অধীনস্থ পদাতিক বাহিনী প্রতিস্থাপিত করেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় অফিসরদের পরিচালনাধীন সিপাহীরা যে-কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ ছিল তার কোন ইউরোপীয় শিক্ষা ছিল না। অর্থাৎ, এসব রাজা ও সেনাপতিরা ব্রিটিশ সিপাহীদের প্রতিরোধে একেবারেই অক্ষম ছিল। তদুপরি ব্রিটিশরা তখন বিভিন্ন মরাঠা রাজাদের মধ্যে শত্রুতারও ইন্ধন যোগাচ্ছিল।

১৮০২ খ্রীস্টাব্দে পুনার যুদ্ধে হোলকারের সৈন্যরা সিন্ধিয়া ও দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাওয়ের (১৭৯৬-১৮১৮) মিলিত সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে। পলায়িত দ্বিতীয় বাজীরাও বেসিনে ব্রিটিশের আশ্রয়প্রার্থী হন এবং ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে কমপক্ষে ৬ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য রাখা ও এদের ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের শর্তে অধীনতামূলক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করেন। তদুপরি ব্রিটিশ কৃর্তপক্ষের কঠোর তত্ত্বাবধানের আওতায় নিজ বৈদেশিক নীতি পরিচালনেও তিনি রাজি হয়েছিলেন।

অর্থাৎ, মহারাষ্ট্র ততদিনে যথার্থই তার স্বাধীনতা হারিয়ে ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্য হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা অতঃপর পুনা দখলক্রমে সেখানে পেশোয়াকে ক্ষমতাসীন করে। মরাঠা রাষ্ট্রগুলির ওপর পুনার সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি ঘোষণা করেন যে, পেশোয়ার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিটি সকল মরাঠা রাজাদের ওপরও প্রযোজ্য। যদিও সিন্ধিয়া ও হোলকার বেসিন-চুক্তি অস্বীকার সহ জাতীয় সংকটের মুখোমুখি পারস্পরিক সংঘাত বন্ধ করেছিলেন, তবু তখনো তাঁরা একে অন্যের প্রতি অবিশ্বাসী ছিলেন ও তাঁদের কার্যকলাপ সমন্বিত করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধে তাঁদের পক্ষে এটিই ছিল এক বিরাট প্রতিবন্ধ।

ওয়েলেস্‌লি শুরুতেই হোলকারকে গুরুত্ব না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করেন। সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভেদ্য কথিত আহ্‌মদনগর দুর্গটির পতন ঘটে এবং খান্দেশে সিন্ধিয়া ও নিজামের রাজ্যের সংযোগস্থলটি তাঁর হস্তগত হয়। হায়দরাবাদ সীমান্তের অদূরস্থ আসাই নামক স্থানে জেনারেল ওয়েলেস্‌লি ৫ হাজার সৈন্য নিয়ে সিন্ধিয়া ও নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার — এই দুই মরাঠা রাজের মিলিত ৩৫ হাজার সৈন্যকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়াকে আক্রমণের মুখে ফেলে ভোঁসলা পশ্চাদপসরণ করেন এবং ফলত, ব্রিটিশের জয় আসন্ন হয়ে ওঠে। ওয়েলেস্‌লি ভোঁসলার পশ্চাদ্ধাবন করলে সিন্ধিয়া তাঁর অযোগ্য মিত্রকে সাহায্য থেকে বিরত থাকেন। আরগাওঁয়ের চূড়ান্ত যুদ্ধে ভোঁসলার সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন

হয়ে যায় ও নাগপুরের গাওয়িলগড় মুল দুর্গের পতন ঘটে। ১৮০৩ সালের ডিসেম্বরে ভোঁসলা দেওগাওঁয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং তদনুযায়ী নাগপুর এলাকা স্বাধীনতা হারায় আর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও বাংলার সীমান্তবর্তী কটক প্রদেশটি ব্রিটিশের হস্তগত হয়।

ইতিমধ্যে উত্তর ভারতের ব্রিটিশ সেনাপতি লেক আলিগড় দুর্গ দখলক্রমে দিল্লীর নিকটস্থ একটি দুর্গ জয়ের পর দিল্লী দখল করেন। অতঃপর আগ্রাও তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। এসব যুদ্ধে সিন্ধিয়ার সৈন্যবাহিনী ফরাসী অফিসর — পেরন ও বুর্কুইনের পরিচালনাধীন ছিল। যুদ্ধশেষে তারা (পেরন আলিগড়ে ও বুর্কুইন দিল্লীর বাইরে) আত্মসমর্পন করে। এসময় মরাঠা সৈন্যবাহিনী পরিচালক হন মরাঠা সেনাপতি অম্বাজী ইংলিয়া। লাসওয়ারীর (সঠিকভাবে নাসওয়ারী) যুদ্ধে মরাঠা সৈন্যরা বেপরোয়া লড়াইয়ের পর অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। উত্তরে যুদ্ধরত সিন্ধিয়ার সৈন্যরাও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। চম্বল নদীর উত্তরের সম্পূর্ণ ভূখণ্ডই তখন ব্রিটিশের দখলভুক্ত হয়। এই সময় অম্বাজী ইংলিয়া সিন্ধিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাক্রমে নাগপুর রাজ্যের রাজধানী ও দুর্গ গোয়ালিয়র ব্রিটিশের কাছে হস্তান্তর করেন। অতএব ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর সিন্ধিয়া সুরজী-আন্‌জনগাওঁয়ের সন্ধিচুক্তিতে বাধ্য হন এবং তদনুযায়ী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সকল এলাকার সঙ্গে তাঁকে আহ্‌মদনগর ও ভারুচের স্বত্বও ত্যাগ করতে হয়। যুদ্ধকালে ব্রিটিশের সমর্থক রাজপুত এলাকাগুলির উপরও তাঁর দাবি তিনি প্রত্যাহার করেন। তদুপরি অধীনতামূলক চুক্তির শর্তে তাঁর দেশের সীমান্তে ব্রিটিশ এলাকায় অবস্থিত একদল ব্রিটিশ সৈন্যের ভরণপোষণের ব্যয়বহনের দায়ও তাঁর উপর বর্তায়। ব্রিটিশরা মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসায়। রোহিলাদের দ্বারা অন্ধকৃত বৃদ্ধ এই সম্রাটের হাতে সত্যিকার কোন ক্ষমতা ছিল না। সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী গোয়ালিয়র ও সেখানকার দুর্গ ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য গোহাদ-এর রাজাকে হস্তান্তর করা হয়।

সিন্ধিয়ার সৈন্যদল উৎখাত করার পর ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশরা হোলকারকে হিন্দুস্তান থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনী অপসারণ সহ এই অঞ্চল থেকে 'চৌথ' আদায়ের অধিকার প্রত্যাহার করতে বলে। হোলকার এই দাবি অস্বীকার করেন এবং সিন্ধিয়ার সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের প্রয়াস পান। কিন্তু ইতিমধ্যে সিন্ধিয়া ব্রিটিশের অধীনস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম দিকে হোলকার সংকীর্ণ মুকুন্দারা গিরিপথ থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের হটিয়ে দেন, এমন কি ভরতপুরের রাজার সঙ্গে একযোগে দিল্লী পর্যন্ত অবরোধ করেন। কিন্তু সুরক্ষিত এই শহর দখলে ব্যর্থ হয়ে তিনি প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। এই সময় ব্রিটিশ সৈন্য আক্রমণাত্মক যুদ্ধ

শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে হোলকারের দুর্গগুলির পতন ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে ভরতপুরের রাজা ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং পলায়িত হোলকার পঞ্জাবে আশ্রয় নেন।

মরাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যথেষ্ট অর্থব্যয়ের ফলে কোম্পানির শেয়ার- মালিকদের মধ্যে তাদের লভ্যাংশ সম্পর্কে উদ্বেগ দেখা দেয়। নতুন অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল জর্জ বার্লো (১৮০৫-১৮০৭) সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র এবং হোলকারকে চম্বল নদীর দক্ষিণ অবধি তাঁর এলাকাগুলি ফেরত দেন। তিনি আশা করেছিলেন যে এই দুই রাজার শক্তি তাঁদের করদরাজ্যগুলির রাজপুত রাজাদের (যাঁরা পূর্বতন যুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষে ছিলেন) সঙ্গে যুদ্ধে আপনা থেকেই খর্বিত হবে। অবশ্য মরাঠা রাজ্যে আবার আত্মধ্বংসী যুদ্ধ দেখা দেয়। সিন্ধিয়া ও হোলকারের বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। কিন্তু বর্তমান পতিত অবস্থায় তাঁদের পক্ষে আর এই সৈন্যবাহিনী রাখা সম্ভবপর ছিল না। অর্থাৎ, এসব ভাড়াটে সৈন্যরা পুরোপুরি লুণ্ঠনজীবী হয়ে উঠেছিল। তারা গ্রাম, এমন কি শহরও আক্রমণ করত, চলার পথে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন চালাত, তাদের হত্যা করত এবং দুর্ভার সবকিছু নির্বিচারে ধ্বংস করে দিত।

পিণ্ডারী নামের এই লুটেরাদের সঙ্গে যোগ দেয়া ছাড়া নিঃস্ব কৃষকদের আর গত্যন্তর থাকত না। এদের নেতা ছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে (১৮০৪) স্বনামখ্যাত, হোলকারের অন্যতম প্রাক্তন সেনাপতি, আমির খাঁ রোহিলা, হোলকারের সঙ্গী করিম খাঁ, সিন্ধিয়ার প্রাক্তন সেনাপতি চিতু এবং ভুপাল শাসকের কর্মচারী ওয়াসীল মাহ্মুদ। পিণ্ডারীদের সৈন্যসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফলত, লুণ্ঠিত রাজপুত ও মরাঠা অঞ্চলে খাদ্য ও পশুখাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা পিণ্ডারীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত ছিল। কিন্তু ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে এদের দ্বারা কোম্পানির অধীনস্থ উত্তর সর্কারগুলি আক্রান্ত হওয়ায় সেখানকার রাজস্বে হঠাৎ ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পিণ্ডারীদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমত ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশরা পুনায় পেশোয়াকে আরও একটি চুক্তিস্বাক্ষরে বাধ্য করে। ফলত, তিনি মরাঠা রাজাদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রত্যাহার সহ কোঙ্কণ প্রদেশ ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তর করেন এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মাধ্যমে পররাষ্ট্র নীতি চালাতে রাজি হন। নাগপুরও ব্রিটিশের সঙ্গে অধীনতামূলক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্রিটিশের সঙ্গে অতঃপর চুক্তিস্বাক্ষর ব্যতীত সিন্ধিয়ারও গত্যন্তর ছিল না। ফলত, পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের কাছে সৈন্যবাহিনী হস্তান্তরে তিনি বাধ্য হন। তদুপরি রাজপুত রাজ্যগুলি থেকে তিন বছর কর গ্রহণ না করার শর্ত সহ তাঁকে বিশ্বস্ততার নিদর্শনস্বরূপ ব্রিটিশের কাছে আসিরগড় এবং হিন্দিয়া দুর্গও হস্তান্তর করতে হয়। অর্থাৎ সকল

মরাঠা রাজারা তখন ব্রিটিশের অধীনস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এভাবেই ব্রিটিশরা পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যের একটা বড় অংশ মহারাষ্ট্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পুনার মরাঠারা বিদ্রোহ শুরু করে। এদের সঙ্গে নাগপুরও যোগ দেয়। এমতাবস্থায় ব্রিটিশরা ভারতে তাদের অবস্থানকালের মধ্যে বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী মরাঠাদের বিরুদ্ধে পাঠায়। এতে ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য (১৩ হাজার ব্রিটিশ সহ) ও ৩০০ কামান। খাদ্খা, সিতাবালদা, নাগপুর, সালিয়া ঘাট, আশতা ও সিওনির যুদ্ধে মরাঠাদের পরাজয় ঘটে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়া আত্মসমর্পণ করেন। মরাঠাদের উপর জয়ী হওয়ার পুরস্কারস্বরূপ নবপ্রবর্তিত উপাধি 'মার্কুইস অফ্ হেস্টিংস' খেতাবে ভূষিত তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ময়রা তখন মরাঠা ঐক্যের প্রতীক সেই পেশোয়া উপাধিটি চিরতরে লুপ্ত করার জন্য এটি তুলে দেন। সাতারা ও কোলাপুর এলাকাভুক্ত দুটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছাড়া সারা মহারাষ্ট্রকে তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বোক্ত রাজ্য দুটি পান শিবাজীর বংশধররা, যাঁদের কোনই রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না। পিণ্ডারীদের অন্যতম নেতা আমির খাঁ তখনই তাঁর সৈন্যদল ভেঙ্গে দিতে রাজী হলে ব্রিটিশরা তাঁকে টঙ্ক নামের ক্ষুদ্র রাজ্যটি 'উপহার' দেয়। কিন্তু অন্যান্য পিণ্ডারী নেতারা প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে।

ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে মারাত্মক কলেরা মহামারীর প্রকোপে ৯ হাজার সৈন্য প্রাণ হারানো সত্ত্বেও তারা পিণ্ডারীদের অনুসরণ অব্যাহত রাখে। হোলকারের সেনাপতিরা (তাদের নেতা তখন অপ্রকৃতস্থ) পিণ্ডারীদের সমর্থন দানের চেষ্টা করে, কিন্তু মাহিদপুরের যুদ্ধে হোলকার সৈন্যদের পরাজয় ঘটে। অতঃপর পিণ্ডারীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। করিম খাঁ আত্মসমর্পণ করে এবং গোরক্ষপুরের অদূরে একটি 'জায়গীর' পায়। ওয়াসীল মাহ্মুদ ব্রিটিশদের জেলখানায় আত্মহত্যা করে ও চিতু জঙ্গলে প্রাণ হারায়।

মরাঠাদের পতনের ফলে ভারতে ব্রিটিশ বিজয়ের প্রধান অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারতে ব্রিটিশের শেষ অভিযান -- পঞ্জাব দখলের ব্যাপারটি ঘটেছিল আরও ৩০ বছর পরে।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি: আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রারম্ভকাল

ব্রিটিশের ভারত বিজয়ের ফলে শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনই নয় দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও ব্যাপক রদবদল ঘটে। প্রাক্তন অভিযানকারীদের মতো এদেশে স্থায়ী বসবাস ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে আত্তীভূত হওয়ার বদলে পুঁজিতান্ত্রিক

উন্নয়নের পথযাত্রী ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে সম্পদাহরণ এবং তা তাদের মাতৃভূমিতে পাঠানোর উৎস হিসাবে দেখেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত শোষণের বহুবিধ রকমফের সত্ত্বেও ভারতবর্ষ সর্বদাই তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ছিল।

ভারত বিজয়ের সময় থেকেই এদেশের সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করা শুরু হয়েছিল। এই অবাধ অর্থনৈতিক শোষণ ভারতকে নিরক্ত ও নিঃস্বতায় পর্যবসিত করেছিল। পনেরো শতকের পর্যটক আফানাসি নিকিতিন ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক পর্যায়ে এই দারিদ্র্য প্রকটতর হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ আসার পর ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এতে প্রায় ১ কোটি লোক প্রাণ হারায়। তারপর দুর্ভিক্ষ এবং আনুষঙ্গিক কলেরা, প্লেগ ও অন্যান্য রোগের মহামারী ভারতীয় জীবনের নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিক ভারতের জনগণের পক্ষে তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর ছিল না। অতঃপর দেশের ইতিহাসের বাকি অংশটুকু অধিকার করে রয়েছে ঔপনিবেশিক জোয়াল থেকে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের কাহিনী।

বিজয়কালীন বছরগুলিতে ব্রিটিশরা ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের সম্পদলুণ্ঠন থেকে সংগৃহীত অগণিত পরিমাণ যুদ্ধ-ভেট স্বদেশে রপ্তানি করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীরঙ্গপট্টমের পতনের ঘটনাটি উল্লেখ্য। তখন সাধারণ সিপাহী পর্যন্ত মূল্যবান মণিরত্নে তাদের থলি বোঝাই করেছিল। ব্রিটিশ শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শোষণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল। কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত ভূমিরাজস্ব ছিল ঔপনিবেশিক আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃক কৃষি-উন্নয়নের সহায়ক একটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাদের প্রবর্তিত বাংলায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', দক্ষিণ ভারতের 'রায়তওয়ারি', উত্তর ভারতের 'মৌজাওয়ার' এবং পঞ্জাবের গ্রাম-পঞ্চায়েত সহ সকল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একই পরিণতি ঘটেছিল। ব্যবস্থা নির্বিশেষে ঔপনিবেশিক শক্তি সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করত এবং কোনক্রমে জীবিকানির্বাহের পর চাষীদের হাতে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জাম ও কৃৎকৌশল উন্নয়নের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। সামন্ততান্ত্রিক ভারতে সকল রাজস্ব ব্যবস্থায়ই ওঠা-নামা দেখা দিত। জমির ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে জমিদারদের স্বার্থ জড়িত থাকায় তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে অথবা হঠাৎ দাম পড়ে গেলে ভূমিরাজস্বও কমে যেত। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকারের অধীনে স্থায়ী খাজনা চালু হলে তারা প্রতিকূল পরিস্থিতি ইত্যাদি নির্বিশেষে পুরো খাজনাই আদায় করত। কোন বিকল্প না থাকায় সামন্ত ভূস্বামীরা তাদের কৃষকদের সাহায্য দিত (মোগল শাসনকালের 'তাকাবি' স্মরণীয়)। কৃষিচক্র অব্যাহত রাখার পক্ষে এটি ছিল অপরিহার্য। কিন্তু ঔপনিবেশিক

কর্মচারীরা এগুলি তাদের বিচার্য বিষয় ভাবত না। খাজনা আদায়ই ছিল তাদের একক দায়িত্ব। অর্থাৎ, সামন্ততান্ত্রিক ভারতের তুলনায় ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষকদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছিল।

সর্বোচ্চ কর সংগ্রহের একটি প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্রিটিশদের প্রবর্তিত তিনটি পরীক্ষামূলক ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় কৃষকদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। কর্নওয়ালিস ছিলেন এসব উদ্যোগের প্রথম পথিকৃৎ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলার গভর্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিস কলিকাতাস্থ তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে হঠাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অনুকূলে একটি আইন জারি করেন। সাধারণভাবে আইনটি 'জমিদারদের' সম্পর্কে ফিলিপ ফ্রান্সিসের ধারণগ [illegible] কেহ বাস্তবায়িত করে [illegible]। কর্নওয়া[illegible] মতে তাঁর আইন ভারতীয় জমিদারদের চিরকালের জন্য বংশানুক্রমিক মালিকানার অধিকার দিয়েছিল। এইসঙ্গে জমিদাররা ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে সংগৃহীত ভূমিরাজস্বের নয়-দশমাংশ সরকারী তহবিলে জমা দিতে বাধ্য ছিল এবং এই অঙ্কটিও চিরকালের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, তাতে সত্যিকার অর্থ যতই আদায় হয়ে থাকুক। অনাদায়ে জমিদারি নিলামের ব্যবস্থা ছিল। আগামীতে সরকারী তহবিলে যথেষ্ট ভূমিরাজস্ব সঞ্চয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই কর্নওয়ালিস এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে একটি শ্রেণীসমর্থন সৃষ্টির জন্যও বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং সেজন্য কৃষির প্রত্যাশিত উন্নয়ন এবং ভূমিরাজস্বের তথাকথিত বৃদ্ধি থেকে সংগৃহীতব্য খাজনা আদায়ের ভার জমিদারদের অনুকূলে হস্তান্তর করেন।

কিন্তু কার্যত আইনটি জমিকে জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে এর উপর কৃষকের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার উৎখাত করে। কোন জমিদারি (ইতিপূর্বে জমিদার যে-এলাকা থেকে খাজনা আদায় করত, বর্তমানে সেটিই হয়ে উঠল তার জমিদারি) বিক্রি হলে প্রাক্তন জমিদারের সঙ্গে কৃষকদের জমির আয়তন, খাজনা ইত্যাদি সংক্রান্ত চুক্তিগুলিও বাতিল হয়ে যেত এবং নতুন জমিদার ইচ্ছামতো খাজনা বাড়াতে পারত। মার্কসের ভাষায়, **'কর্নওয়ালিস ও পীট** গ্রামবাংলার **মানুষকে কৃত্রিমভাবে ভূমিহীন করেছিলেন।'*** কর্নওয়ালিসের আইন কেবল কৃষকদের প্রাক্তন ভূমিস্বত্বই উৎখাত করে নি, কৃষকদের জমিচাষে উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তনও প্রহত করেছিল,

* Karl Marx, *Notes on Indian History*, p. 118.

কারণ জমির উন্নতিতে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পেত। এভাবে বাংলায় কৃষির মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং এখানকার কৃষকরা সারা ভারতের মধ্যে দরিদ্রতম অবস্থায় পেঁাছয়।

খাজনা আদায়ের অধিকারটি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা তখন জমিদারদের মধ্যে একটি নিয়মে দাঁড়িয়েছিল। এই দ্বিতীয় ইজারাদার আরও চড়া দরে এটি আরও একজনের কাছে বিক্রি করত। বাংলার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বর্ধমানের রাজার কার্যকলাপ এরই একটি কুখ্যাত দৃষ্টান্ত। তার জমিদারিতে নিয়মিত ৫-৬টি ইজারাদারের একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এদের প্রত্যেকেই ক্রমান্বয়ে অধস্তন ইজারাদারকে অধিক দামে জমি ভাড়া দিত। এভাবে উপ-ইজারাদারদের একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল তৈরি হয়েছিল এবং অধিকারটি বংশপরম্পরায় অর্সাত।

কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব কিন্তু জমিদাররা যথারীতি সামন্ততান্ত্রিক ধরনেই, অর্থাৎ অনুৎপাদী খাতে (আপ্যায়ন, লোকলস্কর পোষণ ইত্যাদি) অপব্যয় করত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের ব্রিটিশ কর্মচারীদের প্রতিবেদনে জানা যায় যে, জমিদারদের আয় পরাশ্রয়ী ও কাঙালি ভোজনে, চাকরবাকর ও দেহরক্ষী পোষণে, বাইজী ও নর্তকীদের পেছনে, স্থানীয় অন্যান্য জমিদারদের জন্য আয়োজিত উৎসবে ও ব্রাহ্মণসেবায় ব্যয়িত হত, আয়ের সবটুকুই তারা ব্যয় করত, উৎপাদনের জন্য কিছুই বাঁচাত না এবং এমন কোন গ্রামের নজির ছিল না যেখানে জমিদার বা ইজারাদার উন্নয়ন খাতে অর্থব্যয় করত।

কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের জন্য কখনো কখনো জমিদাররা ভূমিরাজস্ব থেকে নির্ধারিত অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হত। তখন অনাদায়ে জমিদারি নিলাম ব্যাপক আকারে দেখা দিত। এভাবে বিক্রীত জমিগুলি সস্তায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় দালাল, আদালতের কর্মচারী বা প্রভাবশালী মহাজনরা ক্রয় করত। ফলত শহরে একশ্রেণীর নতুন জমিদার গড়ে উঠেছিল। এরা পুরনো, সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কৃষকদের উপর শোষণ চালাত এবং জমিদারিগুলিকে সুদিলগ্নিতে টাকা খাটানোর মতোই সুবিধাজনক পুঁজিলগ্নি হিসাবে ভাবত।

প্রসঙ্গত কার্ল মার্কসের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন, '**এই 'বন্দোবস্তের' ফল হল** — প্রথমত রায়তদের **গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি** লুণ্ঠনের ফল: (এদের উপর চাপিয়ে দেয়া) 'জমিদারদের' বিরুদ্ধে **রায়তদের ধারাবাহিক অভ্যুত্থান**; কোন কোন ক্ষেত্রে **জমিদারদের বহিষ্কার এবং এদের স্থলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুপ্রবেশ**; অন্যত্র, **জমিদারদের দারিদ্র্য এবং বকেয়া খাজনা ও ব্যক্তিগত ঋণ শোধের জন্য বাধ্য হয়ে কিংবা স্বেচ্ছায় জমিদারি বিক্রি। ফলত, দেশের জমির বৃহত্তম অংশটি দ্রুত শহুরে পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়**, যাদের বাড়তি পুঁজি ছিল সরাসরি লগ্নি করেছিল।'*

* Karl Marx, *Notes on Indian History*, p. 120.

বাংলার কৃষকদের উপর নির্বিশেষ দারিদ্র্য চাপানোর ফলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেখা দেয়। কখনো কখনো এসব অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে ভূমিস্বত্বহারা প্রাক্তন জমিদাররা। এসব ক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে সারা জেলার সমর্থনলাভের নিশ্চয়তা থাকত এবং তাদের সংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন হয়ে উঠত। প্রসঙ্গত পান্‌চেটের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ্য। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে সেখানকার প্রাক্তন জমিদার নিজের ন্যায্য অধিকার পুনর্স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের সাহায্যে নতুন জমিদারের দখল তিন বছর আটকে রেখেছিল। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে রায়পুরে ও ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে বালাসোরেও এরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। ১৭৯৯-১৮০০ খ্রীস্টাব্দে নতুন ভূমিরাজস্ব প্রবর্তনের প্রতিবাদে অভ্যুত্থান ঘটে এবং কৃষকরা কয়েকটি গ্রাম ও শহর দখলক্রমে মেদিনীপুর আক্রমণের হুমকি দেয়। তখন খাজনাটি প্রত্যাহার করা হয় এবং জমিদারি পুনর্বিক্রয় আইনত বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়ভাবে সংগঠিত এসব স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান দ্রুত অবদমিত হয়েছিল। কর্নওয়ালিসের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষকরা (এবং পুরনো সামন্ত পরিবারগুলিও) কী কঠিন অবস্থায় পড়েছিল এতে তারই প্রমাণ মেলে।

ঔপনিবেশিকরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলা জয়ের ফলে জায়মান অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে একটি আইনসম্মত কাঠামো দিয়েছিল। ব্রিটিশ বিজয়ীরা এভাবে সামন্ত শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণ করেছিল এবং পুঁজিতান্ত্রিক মাতৃভূমির চাহিদা অনুযায়ী সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক ধারায় পরিবর্তন শুরুর প্রয়াস পেয়েছিল।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থা

আঠারো শতকের শেষে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও ব্রিটিশরা এক ধরনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। কিন্তু মহীশুরের অধিকৃত এলাকাগুলির যে-সামন্তরা কিছুকাল আগেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল তাদের জমির উপর দখল মজবুতে ব্রিটিশরা কোন উদ্যোগ নেয় নি। সেজন্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তারা সেখানে ভিন্ন ধরনের একটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যা পরবর্তীকালে ‘রায়তওয়ারি’ ব্যবস্থা নামে খ্যাত হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহির্ভূত এলাকাগুলিতে ১৮১৮-১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থার আওতায় ব্রিটিশরা জমিদারদের বদলে ‘মিরাসদার’ (বংশপরম্পরায় ভূস্বত্বভোগী গ্রাম-সমাজের সদস্য) ও মিরাসদারদের মতো সমান অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি সরকারী তহবিলে খাজনা দেয় এমন সব কৃষকদের জমির আইনসম্মত মালিক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এমন কি, ব্রিটিশ

আসার আগেও কোন কোন এলাকায় কোন কোন মিরাসদার ছোটখাটো জমিদার হয়ে উঠেছিল এবং কখনো কখনো পুরো গ্রাম তার ক্ষমতাধীনে হয়ে পড়ত। প্রথমে সে রাষ্ট্রের স্বার্থে এবং পরে নিজের জন্য গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করত, এবং এভাবেই সে ক্রমে ক্রমে ছোটখাটো জমিদার হয়ে উঠেছিল আর এখন ব্রিটিশের আওতায় এই জমিতে তার ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হল। গ্রামীণ জনসাধারণের অধস্তন স্তরগুলি (অন্য জেলা থেকে আসা কৃষক, ক্রীতদাস ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর কারিগরদের অধিকাংশ) অল্প পরিমাণ অধিকার ভোগ করত। ইতিপূর্বে স্থানীয় প্রথানুযায়ী তারা যথারীতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে এবং গ্রাম-সমাজের নেতাদের কাছে নিজ জমির খাজনা শোধ করলে তাদের জমি থেকে উৎখাত করা চলত না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা জমির অধিকার হারাল এবং স্বত্বাধিকারহীন 'রায়ত' বা ভাগচাষী হয়ে উঠল। এখন যেকোন সময় তাদের জমির খাজনা বৃদ্ধি ও যেকোন সময় তাদের জমি থেকে উৎখাত করা চলত।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থানুযায়ী ইতিপূর্বে গ্রাম-সমাজের মালিকানাধীন গোচর ভূমি ও অনাবাদী জমিগুলি এবার রাষ্ট্রায়ত্ত হল। ফলত, কৃষকরা নিখরচায় পশুচারণ ও জ্বালানি সংগ্রহের অধিকার হারাল। জমিগুলি ঔপনিবেশিক রাজ্যের অধীন — এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রায়তদের তাদের স্থায়ী প্রজা মনে করতে শুরু করেছিল যাদের কাছ থেকে যেকোন অঙ্কের খাজনা আদায় করা চলত, অর্থাৎ ইচ্ছামতো তারা এদের উপর যেকোন রাজস্ব চাপাতে পারত। কার্যত সবচেয়ে
পরিস্থিতিতে ভারতীয় কৃষকদের পক্ষে প্রদেয় সর্বাধিক পরিমাণ অঙ্কের হি২॰
খাজনা ধার্য করা হয়েছিল। মাদ্রাজ রাজস্ব বিভাগে রক্ষিত তথ্যানুযায়ী রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টায় ফলে 'প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশের উপর সরকারের দাবি প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছিল।' কৃষকরা বস্তুত এত বেশি খাজনা দিতে অপারগ ছিল এবং তাদের বকেয়া বেড়েই চলছিল। সারা উনিশ শতক ধরে প্রতিবারই রাজস্ব দাবি পুনর্বিবেচনার সময় সরকার বকেয়া মাপ করতে ও খাজনার হার কমাতে বাধ্য হয়েছিল।

ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকার ১৮১৮-১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ ও পরবর্তীকালীন ভূমিরাজস্বের পুরো ইতিহাসটিকে খাজনার হার কমানোর নিরন্তর ও ন্যায্য দাবি ও বকেয়া বাতিলের ইতিহাস বলেই স্বীকার করেছে। এটি হল রায়তদের কাছ থেকে অত্যধিক ভূমিরাজস্ব দাবির ফলশ্রুতি। বাংলার ভূমিরাজস্ব প্রণালী ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থার মূল পার্থক্য হল: বাংলায় জমিদাররা জমির মালিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল, কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় প্রধানত কৃষকদের উপরই এই স্বত্ব বর্তেয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কৃষকরা জমির মালিক হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও

ততদিনে খোদ জমিই তাদের জন্য মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দ্বারা ভারতীয় জনগণের কাছ থেকে সামন্ততান্ত্রিক এবং অতঃপর আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রণালীতে ঔপনিবেশিক মুনাফা শোষণের ফলেই এটি ঘটেছিল।

মৌজাওয়ার ব্যবস্থা

মরাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দখলীকৃত মধ্যভারতের যেসব এলাকা বাংলা প্রেসিডেন্সির তথাকথিত উত্তরপ্রদেশ (আজকের উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ) নামে পৃথকীকৃত হয়েছিল সেখানে প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থাকেই 'মৌজাওয়ার' বা 'মালগুজারি' বলা হত। অন্যান্য ধরনের ভূমিপ্রশাসন থেকে এটির পার্থক্য হল: এখানে সারা গ্রাম-সমাজকেই একটি রাজস্ব-একক ও জমির মালিক ধরা হত। কিন্তু এতে প্রতিটি খেতজমির মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল এবং একজন কৃষকেরও খাজনা বাকি পড়লে সরকারী নিলাম-ডাকে সারা গ্রামের জমি বিক্রি হয়ে যেত। সাধারণ বিচার বা রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা এসব জমি কিনত এবং তারাই জমিদার হয়ে উঠত। বাংলার জমিদারদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এটুকই ছিল যে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে সরকারী তহবিলে দেয় রাজস্বের পরিমাণ পর্যায়িকভাবে পুনর্বিবেচিত ও বর্ধিত হত।

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত বিজয়ের অর্থনৈতিক ফলাফল: উনিশ শতকের প্রারম্ভকাল

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ফল দাঁড়িয়েছিল: পুরনো সামন্ত পরিবারগুলির পতন, সামন্তদের সৈন্যবাহিনী, বিপুল সংখ্যক লোকলস্কর, চাকরবাকর উৎখাত। ভারতের সামন্ত সমাজের শত শত বছর ব্যাপ্ত জীবনযাপনের অভ্যাস এতে তার পুরোটাই বদলে যায়। যে-অসংখ্য কারিগর এইসব সামন্ত পরিবারগুলির চাহিদা মেটাত এর ফলে তাদের অবস্থানও প্রভাবিত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে একদা সূক্ষ্ম ও মহার্ঘ বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত বাংলার অন্তর্গত ঢাকা শহরের গুরুত্বহানির কথা উল্লেখ্য। যেসব কারিগর তখনো গ্রামে আশ্রয় নেয় নি, তারা কোম্পানির মারাত্মক শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছিল। এর কারণ, বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের এসব কারিগররা তখন আর স্বাধীন বণিকদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রয় করতে পারত না। ১৭৯০-র দশকে কোম্পানির দালালদের হাতে এদের অত্যাচারিত হওয়ার বহু মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। নির্ধারিত সাপ্তাহিক উৎপাদন পূরণ না করলে কোম্পানির কর্মচারীরা তাঁতিদের পানাহার ছাড়াই জেলে আটক করত।

উনিশ শতক শুরুর আগ অবধি ভারত থেকে ব্রিটেনে বস্ত্র রপ্তানি হত। কিন্তু কোন সংস্থা হিসাবে কোম্পানি এই কাজ করত না, কোম্পানির কোন কোন কর্মচারী নিজ ক্ষমতাবলে এসব ব্যক্তিগত ব্যবস্থা চালাত। উনিশ শতক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এর বদলে এখান থেকে ব্রিটিশ বস্ত্রকারখানার জন্য সুতা চালান যেত। আঠারো শতকের শেষের দিকে আরও একটি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলায় গুটিপোকা চাষ এবং শোরা ও লবণ উৎপাদন কমানো হয়। কুটিরশিল্পের সাধারণ ক্রমাবনতি, কারিগরদের দ্রুত সংখ্যাহ্রাস ইত্যাকার পরিস্থিতিতে স্থানীয় শ্রমিকদের কাজ পাওয়ার মতো একটিমাত্র উৎপাদন খাতই শুধু ব্রিটিশরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং সেটি হল কলিকাতা বন্দরে জাহাজনির্মাণ। এটি ছিল পুরোপুরি ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত। এখানে নির্মিত অধিকাংশ জাহাজই চীনদেশের বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোম্পানির একাধিপত্যের ফলে বড় ধরনের বাণিজ্য ও আর্থিক কার্যকলাপ থেকে ভারতীয়দের বহিষ্কার ঘটেছিল।

কৃষি, কুটিরশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি বাংলার তুলনায় দক্ষিণ ভারতে কিছুটা পৃথক ছিল। দেশের দক্ষিণে বিশেষভাবে কৃষিজমির শিল্পলগ্ন ফসল চাষের পূর্বতন খেতগুলির মোট পরিমাণ যুদ্ধ ও ধ্বংসের ফলে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। ব্রিটিশ আসার আগে নির্মিত জলসেচ ব্যবস্থাও মেরামতের অভাবে অকেজো হয়ে পড়েছিল। কারিগরদের অবস্থা বলতে সেখানে তাঁতিদের উপর নির্যাতন বাংলার মতো এতটা মারাত্মক হয়ে ওঠে নি। এর কারণ, ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের আগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আশপাশে কয়েকটি স্বাধীন ভারতীয় রাজ্য থাকায় কারিগররা সেখানে পালিয়ে আশ্রয় নিতে পারত। অসংখ্য সামন্ত সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এখন ব্যবসা ক্ষেত্রে সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহকারী ও যুদ্ধভেট-ক্রেতা 'বানজারা'দের গুরুত্বহানি ঘটেছিল। চেট্টি-জাতের মাদ্রাজী বণিক ও জৈনরা ক্রমে ক্রমে কোম্পানির বণিকদের সহযোগী ও দালাল হয়ে উঠেছিল। আঠারো শতকের শেষের দিকে বোম্বাইয়ের পারসীরা বণিক ও মহাজনদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। বাংলার মতো দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের বড় বড় ব্যবসা, মহাজনী ও বাণিজ্যিক অর্থলগ্নি থেকে ততটা উৎখাত করতে পারে নি।

মরাঠা-যুদ্ধগুলির একেবারে শেষপর্যায়েও বোম্বাই ছিল ব্রিটিশদের একটি ছোট বসতি এবং মরাঠা এলাকার বাসিন্দা — গুজরাটী বণিকদের সাহায্যের কল্যাণেই শুধু ব্রিটিশরা পণ্যরপ্তানি নিশ্চিত করতে পারত। ব্রিটিশরা গুজরাটী বণিকদের (পরবর্তীকালে মাড়ওয়ারী বণিকদেরও) সহযোগিতা প্রত্যাশী ছিল এবং তারা যথেষ্ট অনুকূল শর্তে এই মধ্যগদের সাহায্য লাভ করত। মরাঠা রাজ্যগুলি ব্রিটিশের দখলভুক্ত হওয়ায় গুজরাটী বণিকরা মহারাষ্ট্রে রাজস্ব আদায় ও হস্তান্তরের সুবিধাজনক কাজ

থেকে বঞ্চিত হলেও তারা অন্যতর খাতে তাদের কার্যাদি বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল। তারা কৃষকদের শোষণ ও দাসত্ববন্ধন সহ ব্রিটিশ ব্যবসার অংশীদার হত, চুক্তি মোতাবেক রপ্তানির জন্য কৃষিদ্রব্য ও কুটিরশিল্পের চালান নিশ্চিত করত এবং বোম্বাইয়ের জনসাধারণ ও সৈন্যদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী চালান দিত। পরবর্তীকালে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে গুজরাটী বণিকরা স্থানীয় বাজারে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ে মধ্যগ হিসাবে কাজ করত। তারা মালব থেকে চীনে আফিম ও ব্রিটেনে তুলা রপ্তানি সহ নিজের জাহাজ-ঘাটায় জাহাজ তৈরি করত। বোম্বাইয়ের দালালরা যথেষ্ট পুঁজিসঞ্চয় করতে পেরেছিল এবং এতে নতুন বণিকগোষ্ঠী গড়ে উঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। উনিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত মহাজনী ব্যবস্থা পুরোপুরি ভারতীয়রাই নিয়ন্ত্রণ করত।

ঔপনিবেশিক শাসনের কাঠামো

ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে উপনিবেশ হয়ে ওঠায় ঔপনিবেশিক মুনাফার একাংশ লাভের জন্য ব্রিটিশ শিল্প-বুর্জোয়াদের সংগ্রামের ফলাফল দ্বারাই ক্রমবর্ধমান মাত্রায় কোম্পানির নীতি নির্ধারিত হচ্ছিল। ভারত শাসনে পার্লামেণ্টের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার মধ্যেই এটি প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। আনুমানিক প্রতি দশ বছরে কোম্পানির সনদ একবার নবীকৃত হত। প্রতি বারই এসময় ব্রিটেনে মারাত্মক রাজনৈতিক সংগ্রাম দেখা দিত।

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে নিয়ন্ত্রক আইন প্রণয়নক্রমে পার্লামেণ্ট কোম্পানির ব্যাপারে প্রথম হস্তক্ষেপ করে। এই শর্তানুসারে কোম্পানির বদলে রাজাই গভর্নর-জেনারেল, বেঙ্গল কাউন্সিলের ও কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টের সদস্যবর্গ নিয়োগ করেন। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে সনদ পুনর্বিবেচনার সময় কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার দরুন ভারতে বাণিজ্যবিস্তারে ব্যর্থ বণিকবর্গের সঙ্গে 'নবাবদের' (লুণ্ঠিত সামগ্রী সহ ভারতপ্রত্যাগত ও পরে পার্লামেণ্টের সদস্যপ্রার্থীর যোগ্যতা লাভের জন্য সদস্য মনোনয়নক্ষম অথচ বর্তমানে পরিত্যক্ত এলাকা ক্রেতারা তৎকালে এই নামে অভিহিত হত) রাজনৈতিক প্রভাবে বিরক্ত অভিজাত ভূস্বামীরা কোম্পানির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে। হুইগরাও কোম্পানির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তারা বলত: রাজা ও কোম্পানির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ব্রিটেনের স্বাধীনতার খোদ ভিতের পক্ষেই হুমকি হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনের প্রগতিশীলরাও এইসঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কোম্পানি যে ঘুসের ভিত্তিতেই টিকে ছিল এবং দুর্নীতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এটি তারা লক্ষ্য করেছিল। হুইগদের উপস্থাপিত ফক্স বিল পার্লামেণ্টে অনুমোদিত হয় নি এবং ফক্স নিজেও প্রধান মন্ত্রিত্বের জন্য প্রতিযোগিতায় পীটের কাছে পরাজিত হন।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে অনুমোদিত পীটের ভারতবিধি কোম্পানিকে স্থায়ী ক্ষমতার বাহ্যিক অধিকার দেয়। কিন্তু আসলে ভারত শাসনের সকল যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির ভার ন্যস্ত হয় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক নিযুক্ত নিয়ন্ত্রক কাউন্সিলের হাতে। এটিই ক্রমে ক্রমে এক ধরনের ভারত সংক্রান্ত বিভাগের রূপলাভ করে। কিন্তু তখনো সর্বাধিক লাভজনক নিয়োগাধিকার (সকল বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারী নিয়োগ) কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলীর করায়ত্ত ছিল।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ফক্সের বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় পরাজিত হুইগরা প্রতিহিংসা বশত ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে হাউস অব লর্ডসের গুরুগম্ভীর পরিবেশে শুনানী শুরু হওয়ার পর এটি আট বছর অব্যাহত ছিল। ব্রিটেনের সেরা বক্তা এডমণ্ড বার্ক ও রিচার্ড শেরিডন বাদীপক্ষ সমর্থন করেন এবং ভারতে কোম্পানির কুকর্ম সম্পর্কে অবহিত ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যোগান। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা, অন্যায় ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আসলে এতে কোম্পানিই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। বাদীপক্ষের অভিপ্রায় এড়িয়ে মামলার সময় আনীত তথ্যাদি প্রাথমিক সঞ্চয়কালে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয়দের উপর প্রভুত্ব কায়েম ও শোষণের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছিল।

অবশ্য, ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণের ফলভোগী ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা কেবল এই কারণেই হেস্টিংস ও কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত না। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ হত ভারত বিজয় ও লুণ্ঠনের ব্রিটিশ নীতির প্রতি দণ্ডাদেশেরই নামান্তর। হেস্টিংস বেকসুর খালাস পান।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির সনদ পুনর্বিবেচনার সময় ভারত শাসনের ব্যাপারটি সাংবিধানিক লড়াইয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। মহীশূর বিজয়, প্রধান মরাঠা রাজ্যগুলি দখল ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছিল এবং সবচেয়ে লাভজনক বাজার হিসাবে ভারত শোষণের পূর্বশর্ত পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক একযোগে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরোধিতা এতদ্দ্বারাই ব্যাখ্যেয়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতবিধি ভারত শাসন সম্পর্কে কোম্পানির সুবিধাগুলি অটুট রেখে চীনের সঙ্গে চায়ের ব্যবসা ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য সুযোগ প্রত্যাহার করেছিল। এইসঙ্গে কোম্পানির রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা হিসাবে নিয়ন্ত্রক কাউন্সিলের ভূমিকাও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ, ভারত কোম্পানির উপনিবেশ থেকে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় ব্রিটিশ বুর্জোয়াদেরই উপনিবেশ হয়ে উঠেছিল।

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির অবস্থানের আরও পরিবর্তন ঘটানো হয়। হুইগ

দলের উদ্যোগে প্রবর্তিত ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের বিধি অনুযায়ী ভারত শাসনে কোম্পানির অধিকার অটুট থাকে, কিন্তু বাংলা কাউন্সিলে রাজার নিযুক্ত একজন কর্মচারীর পদ সৃষ্টির ফলে এটি অধিকতর সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসে। সারা ভারতের জন্য আইন প্রণয়ন ছিল তার বিশেষ দায়িত্ব। এর প্রথম আইন উপদেষ্টা হন উদারনৈতিক ইতিহাসবিদ টি. জি. মেকলে (১৮০০-১৮৫৯)। কিন্তু তাঁর প্রণীত ফৌজদারী বিধিটি কার্যকর করা হয় নি।

ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণযন্ত্রটি ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হয়েছিল এবং প্রক্রিয়াটিতে কোনই মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে উঠলে এবং তারা পুরোপুরি নতুন কার্যকলাপের মুখোমুখি হলে এসব কার্যসম্পাদনের জন্য কোন নতুন শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠার বদলে কেবল বিদ্যমান ব্যবস্থাকেই অভিযোজিত করা হয়েছিল। জালের মতো ছড়ানো বাণিজ্য সংস্থাগুলিই ক্রমে ক্রমে বিশাল একটি দেশ শাসনের মতো আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে পরিণতি লাভ করেছিল। যন্ত্র হিসাবে এটি ছিল দুর্ভার, অপটু এবং ক্ষেত্রবিশেষে শাসনকার্যের বাধাস্বরূপ। এর সকল কার্যকলাপের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এতে ঔপনিবেশিক আমলাদের যথেচ্ছাচারের বহু সুযোগ ছিল এবং তদুপরি বিপুল সম্পদও অপব্যবহৃত হত। ভারত ও ব্রিটেন উভয় স্থানেই কোম্পানির প্রশাসনিক সংস্থা ছিল। ব্রিটেনে কোম্পানি একটি পরিচালক মণ্ডলীর নেতৃত্বে পরিচালিত হত। শেয়ার-মালিকদের একটি সভা এদের নির্বাচন করত এবং শেয়ারের মূল্যানুযায়ী তারা এক থেকে চারটি অবধি ভোট দিতে পারত। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির অর্ধেকের বেশি শেয়ারের মালিকানার বদৌলতে ৪৭৪ জন প্রভাবশালী শেয়ার-মালিকই কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত। মার্কসের ভাষায় এই 'পরিচালক মণ্ডলী ছিল বৃহৎ বৃটিশ পুঁজিমালিকদের **অধস্তন সংস্থা**।'* কোম্পানির এই পরিচালকদের আয় ও ক্ষমতার একটি প্রধান উৎস ছিল নিয়োগের অধিকার। এই পরিচালকরা অর্থ, রাজনৈতিক প্রভাব বা পার্লামেন্টের আসনের বিনিময়ে চাকুরির ব্যবস্থা করত। পরিচালক মণ্ডলী কয়েকটি কমিটিতে বিভক্ত ছিল এবং এগুলি ভারতের ঔপনিবেশিক নীতি-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ পাঠাত ও প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল থেকে প্রাপ্ত পত্রাদির উত্তর দিত।

ভারত শাসনের এই জটিল যন্ত্রটি ছিল চূড়ান্ত ঝঞ্ঝাটে ও মন্থর। ভারত থেকে কোন চিঠি ইংলণ্ডে পেঁছিতে ছয় থেকে আট মাস লাগত। অতঃপর পরিচালক মন্ডলী ও নিয়ন্ত্রক কাউন্সিলে কোন প্রশ্ন আলোচনা সহ এই দুই সংস্থার মধ্যেকার মতবৈষম্যের আপোস-আলোচনার পর এই চিঠির উত্তর পেতে কয়েক মাস, এমন

* K. Marx/F. Engels, *Werke,* Band 9, S. 185.

কি একাধিক বছরও কেটে যেত। ইতিমধ্যে ভারতের পরিস্থিতিতে হয়ত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটত। অর্থাৎ, কার্যত বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গভর্নর এবং তাঁদের কাউন্সিলগুলিই দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করত।

প্রতিটি প্রেসিডেন্সিরই পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অধিকার ছিল, এর সিদ্ধান্তগুলি জনসমক্ষে প্রচারিত হত এবং এগুলি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর উল্লিখিত প্রেসিডেন্সির সর্বত্র চালু থাকত। অর্থাৎ, বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বিভিন্ন নিয়ম চালু ছিল এবং ফলত বাণিজ্য, শিল্প ও বেসামরিক কাজকর্মে নানা অসুবিধা দেখা দিত। ভারতের সকল ব্রিটিশ এলাকার জন্য ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা একই ধরনের আইন চালুর দাবি জানিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, শাসনযন্ত্রের বড় বড় চাকুরিগুলি ব্রিটিশদেরই করায়ত্ত ছিল এবং ভারতীয়রা অতি সাধারণ পদ দখল করত।

ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রে সিপাহী সেনাদল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এদের দিয়েই ব্রিটিশরা ভারত দখল করেছিল এবং এই নতুন পরিস্থিতিতে এদের সাহায্যেই ব্রিটিশরা এই দেশকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এই সৈন্যসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৫ শত। তৃতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধের (১৮১৭-১৮১৯) পর ত্রিশ বছর পর্যন্ত ভারত আর যুদ্ধে বিজড়িত হয় নি এবং দেশের সীমান্তের বাইরে সৈন্যবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশই শুধু যুদ্ধলিপ্ত হয়েছিল। তাসত্ত্বেও ব্রিটিশরা সিপাহী বাহিনী ভেঙ্গে দেয় নি এবং এরা মূলত দেশের প্রয়োজনীয় পুলিশের কার্জকর্মই চালাত। কখনো কখনো রাজস্ব আদায়ের সহায়তার জন্যও এদের পাঠান হত। অবশ্য, এই তুলনায় অসন্তোষের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা দমনের জন্য কর্তৃপক্ষ এদের প্রায়ই কাজে লাগাত।

ভারতের শোষণযন্ত্রে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভাগে ঘুস ও দুর্নীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বিচার ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর জবানবন্দী সহজেই ক্রয় করা যেত বা বলপ্রয়োগেও আদায় করা চলত। বেসামরিক ক্ষেত্রে আদালতী আমলাতন্ত্র ছিল অনাচারের অকুস্থল, এতে বছরের পর বছর মামলা নিষ্পত্তি হত না এবং ইত্যবসরে অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বা অস্বীকৃত কৃষকের মালিকানার অধিকার থেকে বহুতর অভিযোগ দেখা দিত। আইন ব্যবস্থার অযোগ্যতা গ্রাম-সমাজের বিলুপ্তিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। এর কারণ, বহিরাগত কৃষক যারা গ্রামে একখণ্ড জমি কিনত কিন্তু সমাজের সাধারণ দাবিপূরণ করত না, এটি তাদের আনুকূল্য দিত। প্রসঙ্গত গ্রামাঞ্চলে সরকার নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীদের পক্ষপাতদুষ্ট শাসনের ব্যাপারটিও উল্লেখ্য। কৃষকরা এদের ডাকাতের চেয়েও বেশি ভয় করত। গ্রাম-সমাজ উৎখাত ও জমির ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎসাহ দানের অনুকূল ব্রিটিশ নীতি কৃষকের শোষণকে তীব্রতর করে তুলেছিল।

ব্রিটেনে শিল্প-পুঁজিপতিরা তাদের অবস্থান মজবুতের পর ওই বুর্জোয়াদের স্বার্থানুকূলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরও রূপান্তর ঘটেছিল। ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার ও ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামালের উৎসে পরিণত হওয়া ভারতের পক্ষে অনিবার্য ছিল।

ব্রিটেনের শুল্কনীতি ছিল অল্প শুল্কে ভারতে ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানির সহায়ক। কিন্তু অত্যধিক শুল্ক ভারত থেকে ব্রিটেনে কুটিরশিল্প আমদানিতে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছিল। ভারতে ব্রিটেনের বস্ত্র আমদানিতে দুই থেকে সাড়ে তিন শতাংশ শুল্ক দিতে হত। কিন্তু ব্রিটেনে আসা ভারতীয় বস্ত্রের শুল্ক ছিল বিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ। তাই আগের মতো রপ্তানির বদলে ভারত বস্ত্র আমদানি শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ শুল্কনীতিতে সুইডেন ও রাশিয়া থেকে ভারতে ইস্পাত আমদানি লাভজনক বিবেচিত হয়েছিল এবং পোর্টোনোভোতে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়রের তৈরি ছোট ছোট ঢালাই কারখানাগুলির অবস্থা গোড়ার দিকে খুবই অনুকূল (উন্মুক্ত খনি থেকে আকরিক উত্তোলন, অঢেল কাঠের সরবরাহ, বন্দরের সুবিধা ইত্যাদি) বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এগুলি অলাভজনক হয়ে উঠেছিল ও কয়েক বছর পর বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কলিকাতার জাহাজনির্মাণের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি ঘটেছিল, কারণ এখানকার তৈরি জাহাজগুলি ব্রিটেনে তৈরি জাহাজের সমকক্ষ ছিল না। বোম্বাইয়ের জাহাজনির্মাণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগী পারসীদের হস্তগত থাকায় ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য অনুকূল হওয়ায় কেবল এই শিল্পের উন্নতিই উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছিল।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র স্থানীয় কাপড়ের তুলনায় অল্প দামে বিক্রি হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শহর ও বন্দরলগ্ন কতকগুলি গ্রামেই কেবল এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। প্রাক্তন বাজার থেকে বঞ্চিত ভারতীয় কারিগররা তাদের হাতে-তৈরি কাপড়গুলি ব্রিটেনে উৎপন্ন কাপড়ের সমান দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলত, কারিগরদের জীবিকার মানের খুবই অবনতি ঘটেছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১৮১৫-১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁতির মাথাপিছু আয় ৭৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ১৮২০-র দশকে ভারতে ব্রিটেনের শিল্পজাত সুতা আমদানি শুরু হয় এবং এই শতকের মাঝামাঝি ভারতে আমদানিকৃত মোট তুলাজাত পণ্যে এটির অংশভাগ এক-ষষ্ঠাংশে পেঁছিয়। সুতাসংগ্রাহক ব্যবসায়ী ও মহাজনরা তাঁতিদের অবস্থা আরও জটিল করে তুলেছিল। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁতিদের ৬০ শতাংশই মধ্যগ ব্যবসায়ীর কাছে অঢেল ঋণের দায়ে বাঁধা পড়েছিল।

কৃষকশোষণের সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যবহার ও তা তীব্রতরকরণের মাধ্যমে কোন পূর্ব পুঁজিলগ্নির ঝামেলা ছাড়াই ব্রিটিশরা ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিল। সম্ভবত এই কারণেই ভারতে কোন বড় আবাদ গড়ে ওঠে নি (উনিশ শতকের মধ্যভাগে আসামের জনবিরল এলাকায় চায়ের আবাদগুলি ছাড়া)। আফিম ও নীল ক্রয়ে জবরদস্তিমূলক চুক্তির ব্যাপক প্রচলন ছিল। নিজ খেতে এসব ফসলের চাষীরা বস্তুত ভূমিদাসেই পরিণত হয়েছিল। 'নীলকররা' কৃষকদের দাদন দিয়ে অসহায় করে ফেলেছিল এবং শেষে তারা পক্ষপাতী চুক্তির শর্তমোতাবেক অত্যল্প দামে এদের পুরো ফসল কিনে নিত। অর্থাৎ, কৃষকরা কখনই আর ঋণশোধে সমর্থ হত না। পৈত্রিক ঋণ সন্তান-সন্ততিদের উপর বর্তাত। প্রতিটি নীলকর বরকন্দাজ রাখত, এরা কৃষকদের পাহারা দিত এবং পলাতকদের নিজ খামারে ফিরিয়ে আনত বা পাশের খামারের খেতমজুরদের জোর করে নিজেদের খামারে খাটাত। এইসব বেআইনী পদ্ধতি, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ ১৭৮০-র দশকগুলি থেকে উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত বার বার 'নীল বিদ্রোহের' মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ওইসব বিদ্রোহের পর কখনো কখনো কৃষকরা তাদের দাবি আদায়ে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু রাসায়নিক নীল উদ্ভাবন ও ফলত, নীলচাষ অলাভজনক না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

১৮২০-র দশকে ব্রিটিশ খামারমালিকরা বিহারের কৃষকদের অধিকতর আখ চাষে উৎসাহ দিতে থাকে। এইসঙ্গে বেরারে কোম্পানির উদ্যোগে লম্বা আঁশের তুলাচাষ প্রবর্তনের চেষ্টাও শুরু হয়। তদুপরি ইতালি থেকে বাংলায় গুটিপোকা আমদানি সহ তারা মহীশূরে কফি এবং তামাক চাষও শুরু করেছিল। কিন্তু উচ্চমানের কাঁচামাল সরবরাহকারীর ভূমিকা পালনে ভারতীয় অর্থনীতিকে অভিযোজনের এইসব চেষ্টা উল্লেখ্য সাফল্য লাভ করে নি। এর কারণ, জীবিকার নিম্নমানের দরুন কৃষকদের পক্ষে প্রচলিত চাষবাসের ধরন ত্যাগ সম্ভবপর হয় নি। ভারতীয় কৃষকরা তাদের কর ও ভূমিরাজস্ব দেয়ার জন্য প্রায়ই উৎপাদন-মূল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন দামে কৃষিদ্রব্যাদি বিক্রি করতে বাধ্য হত। ১৮২০-র ও ১৮৩০-র দশকগুলিতে বেমানান নিষ্কর ভূমি সম্পর্কে ব্যাপক পুনর্বিবেচনার প্রেক্ষিতে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সামগ্রিকভাবে খাজনা বৃদ্ধি করা হয় এবং তদনুযায়ী বাংলায়ও ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে সেখানে জমিদাররা গ্রামাঞ্চলে মহাজনের ভূমিকাসীন হয় এবং ঋণের সুদ হিসাবে শস্য গ্রহণের রেওয়াজ চালু হয়ে যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দেশের নানা অংশে সাতবার দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ও ১৫ লক্ষের মতো মানুষের মৃত্যুর কারণ এতেই নিহিত রয়েছে।

বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সংযোগ প্রসারিত হওয়ায় বন্দর-নগরগুলির বিকাশ ঘটে এবং এগুলি ও দেশের অভ্যন্তরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ ভারতের প্রথম রেলপথটি নির্মিত হয়ে যায়। অতঃপর রেলের মেরামতি কর্মশালা ও বন্দরের নতুন সাজসরঞ্জাম তৈরি, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তন ও ডাক ব্যবস্থার উন্নতি, পুরনো জলসেচ খাল মেরামত ও নতুন খাল কাটার কাজগুলি সম্পূর্ণ করা হয়। এভাবেই শিল্পপুঁজি কর্তৃক ভারতবর্ষে তীব্রতর শোষণের পূর্বশর্তগুলি গড়ে ওঠে (বিশেষভাবে লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে — ১৮৪৮-১৮৫৬)। এই সময় প্রথমত ও প্রধানত বোম্বাই ও কলিকাতায় ভারতীয় মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির মধ্য থেকে খোদ ভারতীয় ব্যবসায়ী পরিবারগুলির উন্মেষ ঘটে। এরা ছিল কোটি কোটি টাকার পুঁজিমালিক এবং তারা ইউরোপীয় ধারায় বাণিজ্যিক ও অর্থসংক্রান্ত কার্যকলাপ চালাত।

ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকগুলিতে ভারতীয় শিল্প-বুর্জোয়াদের অভ্যুদয় ঘটে এবং প্রথম কারখানার সঙ্গে প্রথম মানুফ্যাকচারিং সংস্থাগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলি ছিল কলিকাতার নিকটস্থ একটি ব্রিটিশ চটকল ও বোম্বাইয়ের একটি ভারতীয় বস্ত্র-কারখানা। কিন্তু ভারতীয় শিল্প-বুর্জোয়াদের উন্মেষ ছিল একাধারে মন্থর ও অন্তরায়কীর্ণ। বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্তি এবং নতুন অর্থনৈতিক যোগাযোগ দেখা দেয়া সত্ত্বেও পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্কের স্তর এবং মোটামুটি কৃষিজাত পণ্যোৎপাদন ছিল খুবই নিম্নমানের। তদুপরি এই উন্নয়নও সুসম হয় নি। প্রায় শতবর্ষ অবধি ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলা প্রেসিডেন্সিতে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হিসাবে ত্রিশ দশকে নবগঠিত উত্তর ভারতের অবশিষ্টাংশেও বোম্বাইয়ের অভ্যন্তরীণ এলাকা ও বিশেষত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তুলনায় পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্ক খুবই দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল।

সাধারণত ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারের অর্থনৈতিক কর্মনীতি ছিল উভয়বলদুষ্ট: একদিকে নতুন অর্থনৈতিক এলাকা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে উৎসাহ দান অথচ গ্রাম-সমাজ তখন অবক্ষয়গ্রস্ত; পক্ষান্তরে খাজনার মাধ্যমে কৃষকের উপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মাত্রাবৃদ্ধি ও জমির ব্যক্তিগত মালিকানার মজবুতির দরুন জমিমালিকরা ভাগচাষীদের কাছে জমি ভাড়া দিত ও কৃষকদের অবস্থা প্রায় ভূমিদাসের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছিল। একদিকে ভারত ব্রিটেনের জন্য কাঁচামাল ও কৃষিদ্রব্য সরবরাহকারী দেশে পরিণত হচ্ছিল (যে-উন্নয়ন দেশে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন উন্মেষের প্রেক্ষিত তৈরি করে), অন্যদিকে নানা ধরনের সামন্ততান্ত্রিক কার্যকলাপ ও জাতীয় উৎপাদনের পথে বহু প্রতিবন্ধ ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশকে প্রহত করছিল।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের ভাগ্যনিয়ামক ঘটনাপ্রবাহ থেকে পঞ্জাব দূরস্থ ছিল। তখন পঞ্জাব রাজ্যে মোগল ও আফগান বিজয়ীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন শিখদের সামরিক নেতা 'সর্দার'শাসিত ১২টি শিখ-'মিস্‌ল' বা যোদ্ধৃসংঘ ছিল। শিখ অভ্যুত্থানের পর সেখানে খুব সামান্য এলাকাই মুসলিম ও হিন্দু সামন্তদের দখলে ছিল।

প্রত্যেকটি মিস্‌লই ছিল নিজ অধিকার বলে একটি ছোট এলাকাবিশেষ, যদিও মিস্‌লগুলি একত্রে একটি সম্পূর্ণ একক — শিখ খালসা অর্থাৎ সম্প্রদায়ের ('খালসা' শব্দটি আরবী শব্দ 'খালিসা' — পরিচ্ছন্ন থেকে উদ্ভূত) নিজস্ব ভূমি হিসাবে বিবেচিত হত। ক্রমান্বয়ে শব্দটি অন্যতর অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। এটি সৈন্যদলের নেতৃত্বও বুঝাত। পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর খালসারা শিখ রাজাদের বিরোধিতা শুরু করে। 'সর্দাররা' স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাত এবং পূর্বাহ্নে তাদের নেতৃপরিষদে আলোচনার পরই কেবল তারা কোন যৌথ উদ্যোগের শরিক হত।

মিস্‌লগুলির নেতৃত্বে শিখ সামন্তদের অবস্থানের নিরিখেই এগুলি বর্ধমান মাত্রায় সাধারণ ভারতীয় সামন্তরাজ্যের সদৃশ হয়ে উঠছিল। ১৭৬৫ ও ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সকলেই প্রতিবেশীদের জমির বিনিময়ে নিজ এলাকা বিস্তারের চেষ্টা শুরু করলে প্রাধান্যের জন্য সর্দারদের মধ্যে প্রবল সংঘাত দেখা দেয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় এবং আঠারো শতকের শেষপাদে বারকয়েক ভারত আক্রমণকারী আফগান শাসক জামান শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে রণজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন সুকারচাকিয়া মিস্‌লটিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোর দখলের পর রণজিৎ সিং (১৭৯৯-১৮৩৯) 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর নিজ নেতৃত্বে পঞ্জাবকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। সর্দারদের নিরন্তর সংগ্রামে পীড়িত ও কোম্পানির উপস্থিতিতে ভীত কৃষকরা রণজিৎ সিংয়ের সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে যোগ দিচ্ছিল।

১৮২০-র দশকে রণজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে পঞ্জাবে একটি শক্তিশালী শিখরাজ্য গড়ে ওঠে। 'সর্দারদের' এলাকাগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ঘোষিত হয় এবং পঞ্জাবের মধ্যাঞ্চলের এই ধরনের এলাকাগুলি রণজিৎ সিং দখল করে নেন। কাশ্মীর ও আফগান এলাকার কিছু অংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করার পর রণজিৎ সিং সামরিক কার্যে শরিকানার শর্তে 'জায়গীর' বণ্টনের এবং যথেষ্ট অর্থ জমা রাখার পর তহসীলদারদের কিছু জমি বন্দোবস্ত দেয়ার সামর্থ্য অর্জন করেন। প্রভূত সম্পদ সঞ্চিত হওয়ায় তিনি জনগণের সাধ্যানুগ মাত্রায় খাজনার হার কমান এবং ফরাসী অফিসরদের, বিশেষত

নেপোলিয়নের প্রাক্তন সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয় ধারায় নিজ সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এই সৈন্যদল প্রধানত কৃষক পদাতিক দ্বারা গঠিত হয়েছিল। গ্রাম-সমাজের এই প্রাক্তন সদস্যরা ছিল খুবই সহিষ্ণু ও যুদ্ধক্ষম।

পঞ্জাবের সংযুক্তির ফলে কুটিরশিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। এটি বিশেষভাবে ঘটেছিল বাণিজ্যপথলগ্ন এলাকায়, যদিও অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে তখনো দ্রব্যবিনিময়ই বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রধান ধরন ছিল।

রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর কিছুকাল রাজ্যের অবস্থার অবনতি ঘটে। শক্তিশালী 'জায়গীরদার' ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা (বিশেষত মুলতান ও কাশ্মীরের) স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে এবং কেন্দ্রে বিভিন্ন সামন্তচক্রের মধ্যে তীব্র ক্ষমতাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তারপর ক্রমান্বয়ে একের পর একজন মহারাজা দ্রুত সিংহাসন দখল করেন এবং ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে রণজিৎ সিংয়ের নাবালক পুত্র দলীপ সিংয়ের সিংহাসন আরোহণ অবধি এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। এই ক্ষমতাদ্বন্দ্বে প্রধান প্রধান শিখ সেনাপতিদের মৃত্যু ঘটে।

এই পর্যায়ে শিখরাজ্যের সেনাবাহিনী রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ করে। আঞ্চলিক সংস্থা বা 'পঞ্চায়েতের' মাধ্যমে এটি দেশের প্রশাসনের উপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। পঞ্চায়েত বস্তুত ক্ষমতা দখল করে নেয়, কিন্তু সেনাবাহিনী তখনো শিখ সামন্ত সেনাপতিদের অধীনস্থ ছিল, যদিও তারা পঞ্চায়েতেরই তত্ত্বাবধানে থাকত। শিখ সৈন্যবাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে 'নামধারী' সম্প্রদায় বা 'কুকিস' (কলকণ্ঠ) ধর্ম-সংস্কারবাদী মতধারা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নামধারী সম্প্রদায়ের সদস্যরা শিখবাদের গোড়ায়, এর কঠোর নীতিপরায়ণ ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শে ফিরে যেতে বলত এবং শিখ অভিজাতদের বিলাসিতার বিরোধিতা করত। পঞ্চায়েতের প্রভাবমুক্তিতে উদ্‌গ্রীব পঞ্জাবের সামন্তরা অতঃপর কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

১৮৩৯-১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের আফগানিস্তান দখলের যুদ্ধে পরাজিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করে নিজ মর্যাদা পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয়। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে হায়দরাবাদের (সিন্ধুনদের তীরস্থ) যুদ্ধে সিন্ধুর আমিরদের হারিয়ে তারা সিন্ধুকে নিজ এলাকাভুক্ত করে। সিন্ধুর উত্তরাঞ্চলে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলে জমিদাররা জমিমালিকের স্বীকৃতি পায়। সিন্ধু দখলের পর পঞ্চাব আক্রমণের আরও একটি অগ্রঘাঁটি ব্রিটিশদের হস্তগত হয়।

১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-ভারতীয় সরকার শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে মুদকি ও ফিরোজসহরে এবং ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে সোব্‌রাওঁয়ে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ সত্ত্বেও প্রতিবারই সামন্ত সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায়, চরম মুহূর্তে তাদের সৈন্যপ্রত্যাহার বা নিরাপদ স্থানে পলায়নের ফলে শিখদের পরাজয়

ঘটে। ফলত, পঞ্জাব ব্রিটিশদের কুক্ষিগত হয় এবং শিখরাজ্য তার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হারায়।

সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ব্রিটিশরা দলীপ সিংকে শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, যদিও তাঁর রিজেন্টস কাউন্সিলের ক্ষমতা লাহোর এলাকা ও পেশোয়ারের মধ্যেই সীমিত ছিল। বীর শিখ কৃষকরাও কিছু সুবিধা পায়: তাদের ভূমিরাজস্ব কিছুটা কমান সহ শিখ সর্দারদের দ্বারা সংগৃহীত 'আবওয়াব'ও প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু মুলতানের শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করা ও সেখানে একদল ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানোর চেষ্টার ফলে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবধি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। চিলিয়ানবালা ও গুজরাটের যুদ্ধে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ব্রিটিশ সৈন্যরাই জয়লাভ করে এবং পঞ্জাব ব্রিটিশ দখলভুক্ত হয়। রণজিৎ সিংয়ের প্রাক্তন সেনাপতি ও শক্তিশালী 'জায়গীরদার' গোলাব সিংয়ের কাছে কোম্পানির করদরাজ্যের শর্তে ব্রিটিশরা জম্মু ও কাশ্মীর হস্তান্তর করে।

পঞ্জাব বিজয়ের পর গোড়ার দিকের বছরগুলিতে ব্রিটিশরা গ্রাম-সমাজের কাঠামো বদলায় নি, যদিও তারা রাজস্বের বিনিময়ে সাম্প্রদায়িক জমিগুলির সমৃদ্ধ রায়তদের কাছে তথাকথিত জোতস্বত্বের অধিকার (একই খাজনা দেয়ার বদলে চিরকাল নিজ জমিচাষের অধিকার) সমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। সারা পঞ্জাবে দ্রব্যসামগ্রীর খাজনার বদলে অর্থ দিয়ে খাজনা শোধের ব্যবস্থা চালু হয়। ফলত, জমির মালিকরা বাজারে কৃষিদ্রব্য বিক্রিতে বাধ্য হয় এবং খাদ্যমূল্য কমে যায়, কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটে ও মহাজনদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জমিতে নিজ মালিকানা সংহত হওয়ায় শিখ সামন্তরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের কট্টর সমর্থক হয়ে উঠেছিল।

উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ

এদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছে এই বিশ্বাসে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ সারা ভারতে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধীরে ধীরে দেশীয় রাজ্যগুলি তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যার্জনের অন্যতম উপায় ছিল 'রাজ্যগুলির স্বত্বলোপ নীতি' প্রবর্তন। এতে নিঃসন্তান রাজার দত্তক পুত্রের উপর রাজ্যের মালিকানা অর্সাত না। এভাবে ১৮৪৮-১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর ও অন্যান্য বহু রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। তাঞ্জোরের রাজা ও কর্ণাটকের (আর্কট) নবাবের মৃত্যুর পর এই উপাধিগুলি চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। অনাদায়ী ঋণের জন্য হায়দরাবাদের নিজামের কাছ থেকে বেরারের সমৃদ্ধতম তুলাচাষ এলাকাটি কেড়ে নেওয়া হয়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ থেকে আগামী বছরগুলিতে মহীশূর প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। এক্ষেত্রে রাজা অবসরভাতা পেলেও

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সন্তান-সন্ততিরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কুশাসনের অভিযোগে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতের মানচিত্র থেকে অযোধ্যারও চিরলুপ্তি ঘটে।

ক্ষমতা ও স্বত্বলুপ্তির পর প্রাক্তন রাজারা তাঁদের দরবারও ভেঙ্গে দেন। ফলত. প্রাক্তন সভাসদরা তাঁদের জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, অভিজাত ও রাজন্যবর্গের সৈন্যবাহিনীর জন্য কোন কাজের প্রয়োজন না থাকায় কারিগররা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, খাজনা বৃদ্ধি পায় এবং ফসলহানির সময় ব্রিটিশ সরকারদত্ত কোন সুবিধা বা 'তাকাবি'র কোন সুযোগ না থাকায় আগের তুলনায় কৃষকদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। পরিশেষে, রাজন্যবর্গের পদমর্যাদাকে সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিকের পর্যায়ে নামিয়ে আনায় ভারতীয়দের জাতীয় মর্যাদায় আঘাত লাগে। অর্থাৎ. এতে ভারতীয় জনগণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে অসন্তোষ পরিপক্ক হয়ে ওঠে ও প্রায়ই প্রাক্তন সামন্তদের নেতৃত্বে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। ভারতীয় উপজাতিদের প্রতি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নীতিও এই অসন্তোষে ইন্ধন যুগিয়েছিল। এদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে সামরিক দায়িত্ব বা পথে পাহারা দেয়ার শর্তে খাজনা মকুবের সুযোগ ভোগ করত। উপজাতিদের এইসব দায়িত্ব অনাবশ্যক বিবেচনায় ব্রিটিশরা তাদের জায়গা-জমির উপর খাজনা বসায়। ফলত, সারা ভারতে উপজাতি বিদ্রোহ দেখা দেয়।

উনিশ শতকের পুরো প্রথমার্ধ জুড়ে ভারতের নানা অংশে কৃষক, উপজাতি ও পদচ্যুত সামন্তদের কার্যকলাপের মধ্যে অব্যাহত ঔপনিবেশিকতাবিরোধী ঘটনাবলী প্রকটিত ছিল। উত্তর সর্‌কারগুলির সামন্ত 'পালায়াক্কাররা' উনিশ শতকের শুরু থেকেই দৃঢ়ভাবে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরোধিতা করছিলেন এবং ১৮০১-১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি ওই অঞ্চলে ক্রমাগত বহুবার ব্রিটিশদের পিটুনি অভিযান চালাতে হয়েছিল। পুনরায় ১৮১৩-১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে সেখানে অভ্যুত্থান ঘটে। শেষোক্ত অভ্যুত্থান দমনে কয়েক বছর সময় লেগেছিল।

১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র দিল্লী অঞ্চলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীর অদূরে সশস্ত্র রাজপুত কৃষকদের প্রতিরোধে জনৈক 'বহিরাগতের' কাছে একটি বড় গ্রামের অবাধ নিলাম-বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। নিষ্কর জমির উপর খাজনা ধার্যের প্রতিবাদে ১৮১৭-১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে ওড়িষ্যার কৃষকরা জনৈক স্থানীয় সামন্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। প্রাক্তন মরাঠা-সৈন্যদের সমর্থনপুষ্ট রামুসি-বিদ্রোহ ১৮২৬-১৮২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সারা পুনা জেলাকে আলোড়িত করেছিল। শেষপর্যন্ত সরকার প্রজাস্বত্বভোগীদের কম খাজনার দাবি মানতে বাধ্য হয়। ১৮৩০-১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে খাজনা বৃদ্ধির কারণে বেদ্‌নোর কৃষক বিদ্রোহ ঘটলে সেটি দমনের জন্য ব্রিটিশরা মহীশূরে সৈন্য পাঠায়। জনৈক স্থানীয় সামন্তের জমিদারি

বাজেয়াপ্ত (বকেয়া খাজনার জন্য) এবং প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের প্রতিবাদে ১৮৩৫-১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে গুমসুরে (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) একটি বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে একই কারণে সগরেও একটি অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ১৮৪৬-১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে কর্ণালের কৃষকরা জনৈক স্থানীয় পালায়াক্কারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে নাগপুরের রোহিলাদের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সীমান্তবর্তী কোলাপুর ও সান্তওয়াদী রাজ্য দুটিতে সেখানকার রাজাকে ভাড়া দেয়ার জন্য প্রজাদের ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করায় প্রবল ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ দেখা দেয়। ভূমিজরিপ ও ফলত খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে খোদ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ এলাকার কৃষকরা বিদ্রোহ করে।

উপজাতিদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল এবং ফলত, ঔপনিবেশিক শাসকরা কঠিন ও ক্লান্তিকর 'খুদে যুদ্ধ' চালাতে বাধ্য হচ্ছিল। ১৮৩১-১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ছোটনাগপুরে (বাংলা প্রেসিডেন্সি) সংঘটিত হোস-উপজাতির বিদ্রোহ এর একটি উল্লেখ্য নজির। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও বহু বিদ্রোহ ঘটে। এগুলি হল: ১৮১৮-১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ভিল বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের কোল বিদ্রোহ, ১৮২৪ ও ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের কিট্টুরের কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮১৫-১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের কচ্ছেরে অসংখ্য বিক্ষোভ। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে শাহীয়াদ্রিতে আবার কোল বিদ্রোহ ঘটে এবং ১৮৪৪-১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে তা পুনরাবৃত্ত হয়। দেশের অন্যান্য অংশেও অভিন্ন ধরনের অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল: ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে রাজপুতানায় মের বিদ্রোহ, ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে ওড়িষ্যার গোন্ড বিদ্রোহ ও ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল বিদ্রোহ।

সাধারণত নতুন কর প্রবর্তনের ফলে শহরগুলিতেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এটি যথানিয়মে হরতালের রূপলাভ করত। নতুন আবাসিক কর প্রবর্তনের জন্য বারাণসীতে এবং নতুন পুলিশী কর ঘোষণার পর ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে বেরিলীতে এরূপ হরতাল সংগঠিত হয়। যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি সহ কৃষক-সংগঠন দ্বারা পরিচালিত অভ্যুত্থানগুলিই অটলতর হত। সাধারণত এইসব সংগঠন কোন-না-কোন ধরনের সাম্প্রদায়িক আদর্শ প্রচার করত এবং সহধর্মীদের 'বিধর্মীদের' (অর্থাৎ, ব্রিটিশ) বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানাত। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির 'বোহ্‌রা মাহ্‌দি' বিদ্রোহীদের কথা উল্লেখ্য। জনৈক প্রাক্তন সেনাপতি আব্দুর রহমান এদের নেতৃত্ব দেন এবং সুরাট দুর্গ দখলের পর নিজেকে 'মাহ্‌দি' (ত্রাণকর্তা) ঘোষণা করেন।

এক্ষেত্রে ওয়াহাবী আন্দোলন সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হোলকারদের অন্যতম প্রাক্তন সেনাপতি সৈয়দ আহ্‌মদ বারেল্‌বী (১৭৮৬-১৮৩১)। তিনি ভারত দখলকারী 'বিধর্মীদের' বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে বাংলা ও বিহারের মুসলিম কৃষক এবং শহরের

কারিগর ও ছোট দোকানদাররা সাড়া দিয়েছিল। ওয়াহাবীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘোষিত সামাজিক ন্যায়ের নীতিভিত্তিক সমাজ পুনর্গঠনের আহ্বানও জানাত। অবশ্য, এই ন্যায়নীতির কাঠামো ছিল খুবই অস্পষ্ট। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসকরা ওয়াহাবীদের বিহার থেকে বিতাড়িত করলে তারা পুশতু উপজাতিদের এলাকা সিতানায় অনুপ্রবেশ করে। সেখানে শিখদের সঙ্গে ওয়াহাবীদের সংঘাত বাধলে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তাদের হাতে সৈয়দ আহ্‌মদ নিহত হন। তাসত্ত্বেও বাংলা ও বিহারে ওয়াহাবী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তিন-চার হাজার সশস্ত্র ওয়াহাবী বারাসাত জেলার একটি ছোট শহর দখলের পর কলিকাতার দিকে অগ্রসর হয়। একটি ভয়ংকর যুদ্ধের পর কামানের গুলিতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

হাজী শরিয়ত উল্লার নেতৃত্বাধীন 'ফারাজী' আন্দোলন ছিল ওয়াহাবীদেরই একটি উপশাখা। হিন্দু, মুসলিম জমিদার ও ব্রিটিশ নীলকর নির্বিশেষে সকল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এরা সহিংস প্রতিশোধ গ্রহণ করত। বাংলায় এটি ছিল মূলত মধ্যযুগীয় ধরনের একটি কৃষক আন্দোলন। তাদেব পূর্ববর্তী ওয়াহাবীদের মতো এরাও বিশুদ্ধ ইসলামের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরত এবং খোদার দুনিয়ায় সকল মানুষের সমানাধিকারের কথা বলত। তারা ঘোষণা করত যে, তাদের সম্প্রদায়ের সকল সভ্যই সমান, জমির মালিক খোদা ও নিজ স্বার্থে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার কারও নেই। ইতিমধ্যে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে পাটনায় ওয়াহাবীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা কৃষক ও শহুরে মানুষের, বিশেষভাবে বাংলার সিপাহীদের সাদর সমর্থন পেয়েছিল।

কেবল উপনিবেশবিরোধী এইসব আন্দোলনের তালিকা থেকেই তখনকার মানুষের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের গভীরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিকল্প হিসাবে সামন্ততান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষ ছাড়া এইসব আন্দোলন থেকে আর কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা ছিল না। ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধাচারী এইসব নেতাদের অতীতের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই এর ব্যাখ্যা মেলে।

বুর্জোয়া আন্দোলনের উন্মেষ

ইতিমধ্যে ভারতে অন্যতর একটি আন্দোলনের উন্মেষ ঘটছিল। এর নেতারা ছিলেন এমন সব মানুষ যাঁরা তৎকালীন ভারতবর্ষকে একটি অনগ্রসর দেশ মনে করতেন এবং কিছু কিছু প্রচলিত ঐতিহ্য ও রীতিনীতির বিরোধী ছিলেন। ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত এইসব ব্যক্তিরা দেশের সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে যুক্তিবাদী

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচনা করতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা ব্রিটিশকেও সহযোগিতা দিয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে সংস্কৃতিবান ব্রিটিশরা জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে, যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁদের সহায়তা দেবে। এই নতুন আন্দোলনের নেতৃবর্গ বাংলায় ছিলেন জমিদার ও কোম্পানির কর্মচারী, বোম্বাইয়ে ধনী পারসী ও মাদ্রাজে ব্যবসায়ী। ঔপনিবেশিক সরকারের কোন কোন কাজের সমালোচনা করলেও ভারতে রাজ্যবিস্তারে তাঁরা কোম্পানির বিরোধিতা করেন নি।

এই নতুন আন্দোলনের প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন বিখ্যাত বাঙ্গালী জমিদার রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তিনি ১৮১৫ ও ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে 'আর্যসভা'ও 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মীয় সংস্থার বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত হলেও নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ ইত্যাদি সহ ইউরোপীয় প্রতিমান অনুসারে গঠিত এগুলিই ছিল ভারতের প্রথম আধুনিক ধরনের সমাজসংস্থা। রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম থেকে তাঁর মতে 'পরবর্তীকালে পুঞ্জিত' নিকৃষ্টতম সামন্ততান্ত্রিক কার্যকলাপ ও বিধিবিধানগুলি তোলে দেয়ার চেষ্টা করেন।

তাঁর উদ্যোগে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র 'সংবাদ কৌমুদী' বাংলায় এবং ১৮২২ সালে আরও একটি সংবাদপত্র 'মিরাত-উল-আকবর' ফার্সীতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা দুটিতে ভারত ও বাংলার সমাজ-জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নাদি আলোচিত হত।

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব খর্ব করার জন্য ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনবিরোধী ভারতীয় বণিকদের উদ্যোগে 'ধর্মসমাজ' নামে আরও একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ই হেনরি ডিরোজিও (পর্তুগীজ পিতা ও হিন্দু মাতার সন্তান) হিন্দু কলেজে (আধুনিক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। প্রচলিত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরোধিতায় এটি ছিল স্বশ্রেণীর অন্যান্য সংস্থার তুলনায় অটলতর। এই সংস্থা থেকেই 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠানের জন্ম। হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের বিরোধিতার মুখে অ্যাসোসিয়েশনটি ভেঙ্গে গেলে এটির এককালীন সদস্যারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার দায়িত্ব পান। এই নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালী বণিক ছিলেন ইউরোপীয় ধারার প্রথম ভারতীয় বাণিজ্য কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৩০ ও ১৮৪০-র দশকে জ্ঞানপ্রচার ও অনুরূপ আদর্শব্রতী অসংখ্য সভা-সমিতি বাংলায় গড়ে উঠতে থাকে। পরিশেষে, পরিপক্ব রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বোম্বাইয়েও অনুরূপ ঘটনাবলীর নজির মিলবে। দেশের এই অংশের এরূপ আন্দোলনে অগ্রগণ্য ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসকদের সহযোগী ধনী ও সম্ভ্রান্ত

পারসীরা এবং ইউরোপীয় ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষত এলফিনস্টোন কলেজের আওতায় গড়ে ওঠা তরুণ, উদ্যমী মরাঠী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য: বাল শাস্ত্রী জামভেলকার (১৮১২-১৮৪৬), প্রথম ইঙ্গ-মরাঠা সাপ্তাহিক 'বোম্বাই দর্পণ' কাগজের প্রতিষ্ঠাতা (এটি ভারত শাসনে ভারতীয়দের শরিকানার দাবি জানাত এবং ঔপনিবেশিক রাজস্ব ও শুল্কনীতির কঠোর সমালোচনা করত); মরাঠী ভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস রচয়িতা রামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ (উক্ত ইতিহাসে ভারতে ব্রিটিশ নীতি সমালোচিত হলেও লেখক শিক্ষিত ইংরেজ ও ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান দেখতেন); পুনার 'প্রভাকর' নামক সংবাদপত্রে 'লোকহিতবাদী' এই ছদ্মনামের লেখক গোপাল হরি দেশমুখ (তিনি ভারতের স্বাধীনতা হারানোর কারণ হিসাবে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক আচার-আচরণ এবং অভিজাতবর্গ ও ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যেকার ফারাককেই দায়ী করেন। শিক্ষাবিস্তারে আহ্বান জানিয়ে দেশমুখ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ব্রিটিশের অধীনতা মুক্তির জন্য ভারতীয়দের অন্তত দু'শ বছর সময় লাগবে)।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার অ্যাসোসিয়েশনের মতো এটিও বিভক্ত হয়ে পড়ে: 'সকল ভারতীয়ের জন্য ব্রিটিশের সমমর্যাদা দান' এই দাবি নিয়ে ছাত্র ও যুবকরা এগিয়ে এলে মধ্যপন্থী বণিকরা সংস্থাটি ত্যাগ করে। কেবল মাদ্রাজ অ্যাসোসিয়েশনই ভারতীয় জমিদারদের দ্বারা কৃষকশোষণ সীমিতকরণের প্রশ্নটি উপস্থাপিত করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্বিবেচনার সময় এই তিনটি অ্যাসোসিয়েশনই ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের 'অবিচার' সংক্রান্ত অভিযোগপত্র লণ্ডন পার্লামেণ্টে পাঠায়।

বিদ্রোহের শরিক ও ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতে সচেষ্ট কৃষক ও শহুরে গরীবদের সেই স্তরগুলির সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের এই জায়মান আন্দোলনের কোনই সংযোগ ছিল না। সেজন্যই ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান থেকে প্রভাবশালী বুর্জোয়া চক্র সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং তারা এতে শরিক হয় নি।

১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের মহান গণ-অভ্যুত্থান

সারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে জনগণের নির্দিষ্ট স্তরগুলির বিক্ষিপ্ত ও পুরোপুরি স্থানীয় কার্যকলাপের মধ্যে প্রকটিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে ঘৃণাশ্রিত বিক্ষোভ শেষে দীর্ঘকাল সংগঠিত কার্যকলাপে অভ্যস্ত সিপাহীদের দ্বারা জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের পরই অনেকটা সংহত হয়েছিল। ব্রিটিশ সিপাহীরা বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে

১ লক্ষ ৭০ হাজার (এদের মধ্যে ভারতীয় ১ লক্ষ ৪০ হাজার) সৈন্য নিয়ে গঠিত, সামাজিকভাবে সর্বাধিক সমসত্ত্ব বাংলার সৈন্যদল ছিল বৃহত্তম। প্রায় এককভাবে অযোধ্যা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি থেকে সংগৃহীত বাংলার এই সৈন্যদলটি ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জাট ও মুসলমান (সৈয়দ ও পাঠান) সিপাহীদের নিয়ে গঠিত ছিল। এইসব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ছিল গ্রাম-সমাজের উচ্চস্তরের ('পাট্টিদার') মানুষ বা ছোটখাটো সামন্ত ভূস্বামী — গ্রামীণ জমিদারের সন্তান। এরা সকলেই হিন্দুস্তানী ভাষা ব্যবহার করত এবং নিজ গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত।

দীর্ঘকাল কোন যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটায় পুলিশের কর্তব্যরত এইসব সিপাহীদের সারা উত্তর ভারতে ছড়ান সব ক্যান্টনমেন্টে, বিশেষত দোয়াবে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় মান অনুসারে এরা ভাল বেতন পেলেও সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল: কখনই সার্জেন্টের উপরে ভারতীয়দের কোন পদোন্নতি হত না এবং ব্রিটেনের যেকোন নবাগতই সরাসরি তাদের উপরের পদে বহাল হতে পারত। সামরিক ক্যান্টনমেন্টে ব্রিটিশদের নিজস্ব মেস ছিল, তারা আরামপ্রদ বাংলোয় থাকত, আর সিপাহীরা সপরিবারে বসবাসের জন্য পেত আদিম কুঁড়েঘর।

পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ জয়ন্তী এগিয়ে এলে ওয়াহাবীদের প্রচার সিপাহীদের মধ্যে খুবই সাড়া জাগিয়েছিল এবং ঠিক সেইদিন ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য সিপাহীরা প্রস্তুত হচ্ছিল। বহুকাল থেকেই অভ্যুত্থানের ধারণাটি দানা বেঁধেছিল। কিন্তু ব্যাপারটি সুশৃংখলভাবে সংগঠিত ছিল না। বস্তুত, এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটেছিল। সামন্তযুগ থেকে প্রচলিত এবং বিদ্রোহের পূর্বক্ষণে অনুষ্ঠিত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নীরবে চাপাটি চালানের ব্যাপারটিও অভ্যুত্থানের স্বতঃস্ফূর্ততার যুক্তি খণ্ডন করে না।

এনফিল্ড রাইফেলের জন্য একধরনের নতুন টোটা প্রবর্তনকেই বিদ্রোহের আশু কারণ হিসাবে ধরা হয়। এই টোটা মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্য শূকর ও গোরুর চর্বিমিশ্রিত এমন একটি ধারণা সিপাহীদের মধ্যে ছড়ান হয়েছিল। নতুন টোটা ব্যবহারে গররাজি সিপাহীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক দপ্তর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ মে মীরাটে এজন্য একদল সৈন্য ও সার্জেন্টকে প্রকাশ্যে হীনপদস্থ করার পর দীর্ঘ নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়। ঘটনাটি শহুরে গরীব ও নিকটস্থ গ্রামের কৃষকদের সমর্থনপুষ্ট সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিসংযোগ করে। ব্রিটিশ অফিসরদের হত্যা করার পর তারা ১১ মে দিল্লী রওয়ানা হয় এবং সেখানে দিল্লী গ্যারিসন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। দিল্লী দখল ও ব্রিটিশ অফিসরদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের পর সিপাহীরা লালকেল্লায় যায় এবং ব্রিটিশের পেন্সনভোগী ও ক্ষমতাচ্যুত বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে (১৮৩৭-১৮৫৭) ভারতের শাসক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করতে ও বিদ্রোহীদের নির্দেশমতো একটি আবেদনে স্বাক্ষর দিতে

বাধ্য করে। মুসলিম 'উলেমারা' ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধের 'ফতোয়া' দেন। দিল্লীতে অভিজাতদের নিয়ে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীদের কাছে বাহাদুর শাহ্ ভারতের পুনরুদ্ধারকৃত স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠেন।

সারা দেশ থেকে দলে দলে সিপাহীরা দিল্লীতে একত্রিত হওয়ায় সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সিপাহীরা কেবল নিজ নিজ সেনাপতিরই আদেশ মানত এবং দিল্লীর দরবার-সরকারকে বিশ্বাস করত না। জমিদাররা দেয় ভূমিরাজস্বের অর্থ দিল্লীতে না পেশছনোর ফলে শহরে খাদ্য ও সহায়-সম্পদের অভাব দেখা দেয়। অচিরেই সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে।

এই জটিল পরিস্থিতিতে সিপাহীদের ৬ জন এবং নাগরিকদের ৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে সিপাহীরা 'জলসা' নামক একটি নিজস্ব প্রশাসন সংস্থা গঠন করে। কিন্তু দিল্লীতে বিদ্যমান জটিল পরিস্থিতি মুকাবিলার ক্ষমতা জলসার ছিল না। এসময় কার্ল মার্কস লিখেছিলেন '...নিজ সেনাপতিদের হত্যাকারী, শৃঙ্খলাবর্জিত এবং সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব বহনক্ষম কোন ব্যক্তিসন্ধানে ব্যর্থ এইসব বহুধাবিভক্ত বিদ্রোহী সিপাহীদের পক্ষে কোন সংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা খুবই সামান্য আছে।'*

কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ কিন্তু যুদ্ধকৌশলে বা ক্ষুদ্র সৈন্যদলের বেশি কিছু পরিচালনায় অনভ্যস্ত সিপাহীরা কলাকৌশলের সমস্যা মুকাবিলায় সমর্থ হলেও রণকৌশলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। দিল্লীর লালকেল্লার মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখলের পর তারা তখনো শান্ত এলাকাগুলিতে বিপ্লব ছড়ানোর বদলে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের পথগ্রহণ করেছিল। ফলত, ব্রিটিশদের পক্ষে নিজেদের সামর্থ্য পুনরুদ্ধার, অবশিষ্ট অনুগত সৈন্যদের পুনর্গঠন ও দিল্লী অবরোধ সম্ভবপর হয়েছিল।

সার্বিক চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ দোয়াব ও মধ্যভারতের বাইরে বিস্তার লাভ করে নি। বাংলার তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২) ব্রিটিশ বেসামরিক লোকজন সহ সকল ইউরোপীয়দের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন এবং পূর্বানুমানের ভিত্তিতে সিপাহীদের পরবর্তী উদ্যোগ ব্যর্থকরণে সফল হন। এদের নিরস্ত্রীকরণ সহ কোন কোন দলে সংগঠিত আনুষঙ্গিক বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ দমন করা হয়। পঞ্জাবে ব্রিটিশ সৈন্যরা একটি সাধারণ সিপাহী বিদ্রোহও দমন করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত ধরনের। তদুপরি কয়েকটি সৈন্যদলই কেবল দিল্লীর

* K. Marx and F. Engels, *The First Indian War of Independence 1857-1859*, p. 44.

সিপাহীদের সঙ্গে যোগদানে সমর্থ হয়েছিল। শিখরা হিন্দুস্তানের এই সিপাহীদের দখলদার বাহিনী মনে করে কোনই সমর্থন দেয় নি।

পক্ষান্তরে অযোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ডের কৃষকরা তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। তারা 'বহিরাগত' নতুন জমিদারদের অচিরেই বিতাড়িত করে, স্থানীয় সরকারী ভবনগুলির উপর আক্রমণ চালায় এবং এমন কি তাদের পুরনো জমিদার ও তালুকদারদেরও খাজনা দেয়া বন্ধ রাখে। ঔপনিবেশিক সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিতাড়নের পর কৃষকরা আত্মরক্ষার জন্য নিজ সম্প্রদায় থেকে সশস্ত্র দল গঠন করে এবং বিজয়ী ব্রিটিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত তাদের গ্রামের সাম্প্রদায়িক জমিগুলি রক্ষার প্রয়াস পায়।

দোয়াব অঞ্চলের শহরগুলির ভারতীয় জনগণ বিদ্রোহের সক্রিয় শরিক ছিল। আলিগড় (২১ মে), বেরিলী ও লক্ষ্ণৌ (৩১ মে), কানপুর (৪ জুন) ও এলাহাবাদ (৬ জুন) ইত্যাদি অনেকগুলি বড় বড় শহর দখলের পর এগুলির প্রত্যেকটিতে তারা এক একটি সরকার গঠন করে। বেরিলীর নতুন প্রশাসনের প্রধান ছিলেন ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধে নিহত হাফিজ রহমান খাঁ রোহিলার বংশধর খাঁ বাহাদুর খাঁ। কানপুরের শাসনভার ছিল ডালহৌসী কর্তৃক রাজ্যাধিকারবঞ্চিত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেবের উপর। এলাহাবাদের দায়িত্বে ছিলেন জনৈক স্কুলশিক্ষক ও ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের অনুগামী মৌলবী লিয়াকত আলী। পাটনার বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন জনৈক ওয়াহাবী পুস্তকবিক্রেতা পীর আলী।

ইতিমধ্যে দিল্লীর সিপাহীরা কয়েকটি অভিযান সত্ত্বেও কোন বড় ধরনের আক্রমণ চালায় নি। এমন কি বেরিলীর সেনাপতি, অন্যতম প্রতিভাবান সিপাহী নেতা বখ্‌ত খাঁ'র মতো উদ্যমী ব্যক্তি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। সিপাহীদের দিক থেকে এই নিষ্ক্রিয়তার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশরাই আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। তারা মাদ্রাজ এবং ইরানের সৈন্য দিয়ে ও চীনযাত্রী ইউনিটগুলি ফিরিয়ে এনে এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করে। প্রায় ৬৫ হাজার সিপাহী দিল্লী আক্রমণকারী ৬ হাজার ব্রিটিশ সৈন্যকে হটিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। সামরিক পরিস্থিতির অবনতি ও অর্থাভাবের জন্য কোন কোন সিপাহী স্বেচ্ছায় দিল্লী ত্যাগ করে। নাজাফগড়ে ব্রিটিশের হাতে বখ্‌ত খাঁ'র পরাজয় সিপাহীদের মনোবলের উপর গুরুতর আঘাত হানে। তদুপরি ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বিদ্রোহীদের ঘোষণাপত্রে বিজয়ের পর বণিক এবং মুসলমান ধর্মনেতাদের জন্য বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি থাকলেও ভূমিরাজস্ব কমানোর কোন উল্লেখ ছিল না। এতে সিপাহীদের, বিশেষত গ্রামীণ সিপাহীদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশরা বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ দিল্লীর উপর আক্রমণ চালায়

এবং পাঁচ দিন পর শহর ও দুর্গগুলি দখল করে। তারপরই শুরু হয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাশব প্রতিহিংসা গ্রহণ। এমন কি বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোনও দিল্লী দখলের পর ব্রিটিশ সৈন্যদের অনুষ্ঠিত অপরাধকে অবর্ণনীয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। এদের প্রতিহিংসা থেকে শত্রু-মিত্র কেহই নিরাপদ ছিল না। এই অত্যাচার এমন কি নাদীর শাহ্‌কেও হার মানিয়েছিল।

দিল্লী দখলের পর ব্রিটিশরা শুধু তাদের ১৭ হাজার সৈন্যদেরই মুক্ত করে নি, বিদ্রোহীদের মনোবলও ভেঙ্গে দিয়েছিল। কারণ, দিল্লী সিপাহীদের কাছে স্বাধীন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। দিল্লীর শহরতলীতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধে আত্মগোপনকারী বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করা হয়। বিচারের পর রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন। যুদ্ধবন্দী হিসাবে বাহাদুর শাহের পুত্রদের জনৈক ব্রিটিশ অফিসর হডসন হত্যা করে। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর দিল্লী বহু বৎসর বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়েছিল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্যের জন্য কলিকাতা থেকে দিল্লী অভিযাত্রী জেনারেল নেইল বারাণসী ও এলাহাবাদের বিদ্রোহী শহরগুলির সিপাহী ও বাসিন্দাদের নির্বিচারে হত্যা করেন। তাঁর নিষ্ঠুরতায় এমন কি লর্ড ক্যানিংও বিরক্ত হন এবং জেনারেল হ্যাভলককে তাঁর স্থলবর্তী করেন। তিনিও চলার পথে গ্রাম-গঞ্জ পুড়িয়ে, শত শত মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালান। দিল্লী ও লক্ষ্মৌ বরাবর পথে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কানপুর শহরটিও তিনি অতিক্রম করেছিলেন। এই শহরের বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন নানা সাহেব আর তাঁর দেহরক্ষী তাঁতিয়া তোপী এবং সচিব সুপণ্ডিত, দু'বার ইউরোপ ভ্রমণকারী আজিমুল্লাহ খাঁ। ব্রিটিশ গ্যারিসনের সৈন্য ও তাদের পরিবারবর্গ সামরিক ক্যান্টনমেন্টের সুরক্ষিত এলাকায় আশ্রয় নেয় এবং কামানের সাহায্যে সিপাহীদের কাছ থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে গ্যারিসনটি আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে শহরে বিদ্রোহী সৈন্য ও সিপাহীদের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারে পৌঁছয়। ফলত এখানেও খাদ্যাভাব ও দিল্লীর অনুরূপ সমস্যাদির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এখানকার সিপাহীরা দু'বার হ্যাভলকের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও প্রতিবারই তারা পরাজিত হয়। জুন মাসের মাঝামাঝি কানপুরে প্রবেশ করার পর হ্যাভলকের সৈন্যরা শহরে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংস চালায়। অতঃপর হ্যাভলক বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র লক্ষ্মৌ যাবার জন্য দু'বার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সেই শহরের ঘটনাবলীর ধারা ছিল নিম্নরূপ। বিদ্রোহের পর প্রাক্তন নবাব বংশকে (অযোধ্যার নবাব) ক্ষমতায় পুনর্বাসিত করা হয় এবং অযোধ্যার রাজসভার প্রাক্তন সভাসদরা শহরের শাসনভার গ্রহণ করে। সেখানকার বিদ্রোহের মূল নেতা ছিলেন মাদ্রাজের এক অভিজাত সন্তান আহ্‌মদ উল্লাহ্‌। এক সময় তিনি ব্রিটেনে

যান এবং দেশে ফিরে ওয়াহাবী আন্দোলনে যোগ দেন ও ভ্রাম্যমাণ ওয়াহাবী প্রচারকের কাজ করেন।

ব্রিটিশ গ্যারিসনের সৈন্যরা সপরিবারে শহরের শাসনকর্তার বাসভবনে আশ্রয় নিয়েছিল। সিপাহীরা সর্বক্ষণ গুলি চালিয়ে দীর্ঘকাল বাসভবনটি অবরোধ করে রাখে। কিন্তু সিপাহীরা উত্তম সন্ধানী না হওয়ায় তাদের উল্লেখ্য কোন ক্ষয়ক্ষতি ঘটে নি। তারপর বিদ্রোহীরা ভূগর্ভে একটি পথ খোঁড়া শুরু করে। ২১ সেপ্টেম্বরের আগ পর্যন্ত হ্যাভলক লক্ষ্ণৌয় প্রবেশ করতে পারেন নি। কিন্তু সিপাহীরা তাঁর সৈন্যদের ঘিরে ফেলে এবং তিনি নিজেও অবরুদ্ধ হন।

ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌয় কেবল সিপাহী ও দোয়াবের বিভিন্ন অঞ্চলের অস্ত্রধারী কৃষকরাই নয়, চলার পথে ব্রিটিশ সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত গ্রাম-গঞ্জ থেকে বহু নরনারীও এখানে সমবেত হয়েছিল। শহরে ৫০ হাজারের মতো মানুষ থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ব্রিটিশ সেনাপতি কলিন ক্যাম্বেল মাত্র সাড়ে চার হাজার সৈন্য ও গোলন্দাজ নিয়ে কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌয় এসে সেখানকার অবরোধ ভেঙ্গে ফেলেন। লক্ষ্ণৌ দখলে ব্যর্থ হলেও তিনি শাসকের বাসভবনে বন্দী ইউরোপীয়দের উদ্ধারে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে তাঁতিয়া তোপী গোয়ালিয়র থেকে একদল সৈন্য (ব্রিটিশের প্রতি অনুগত রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী) নিয়ে দ্রুত কানপুরে পেঁছন এবং উইন্ডহ্যাম কর্তৃক সেখানে রক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যদলটিকে উৎখাত করেন। এর পরবর্তী যুদ্ধে ক্যাম্বেল শেষাবধি তাঁতিয়া তোপীকে পরাজিত করে কানপুর পুনর্দখলে সমর্থ হন। এর তিনমাস পরে সংগৃহীত ৪৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ক্যাম্বেল লক্ষ্ণৌর উপর শেষ আক্রমণ চালান। ইতিমধ্যে শহরে একত্রিত প্রায় ২ লক্ষ মানুষ এই সংগ্রামে যোগ দেয়। তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও দক্ষ সেনাপতি ছিল না। লক্ষ্ণৌর যুদ্ধ এক মাস স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ শহরটির পতন ঘটে। তারপর প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ সৈন্যরা শহরে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায় এবং প্রভূত যুদ্ধ-ভেট সংগ্রহ করে।

সিপাহীদের অন্যতম প্রধান প্রতিরোধকেন্দ্র লক্ষ্ণৌর পতনের পর সিপাহীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সত্যিকার অর্থে গেরিলা যুদ্ধ চালায়, ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর অতর্কিত হামলা ইত্যাদি অব্যাহত রাখে। অযোধ্যার তালুকদাররা নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চে গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং তাদের তালুকদারি লোপ করেন। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য তালুকদাররা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং বেরিলীতে খাঁ বাহাদুর খাঁ'র সঙ্গে যোগ দেয়। প্রবল প্রতিরোধের জন্য ক্যাম্বেলের পক্ষে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চের আগে বেরিলী দখল সম্ভবপর হয় নি। তারপর নানা সাহেব এবং অযোধ্যার সভাসদরা কিছু সিপাহী সহ নেপালের সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। আহ্মদ উল্লাহ্ এবং আরও কয়েক জন নেতা সহ এদের

অন্য একটি দল অযোধ্যায় ফিরে এলে সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতায় আহ্‌মদ উল্লাহ্‌ নিহত হন।

বুন্দেলখণ্ডে তাঁতিয়া তোপী তখনো যুদ্ধরত ছিলেন এবং একজন সুদক্ষ সিপাহীনেতা হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জেনারেল রোজ তখন বোম্বাই থেকে সসৈন্যে বুন্দেলখণ্ডে রওয়ানা হন। সেখানে ঝাঁসি দুর্গ সহ এই নামের একটি ছোট রাজ্য ছিল। লক্ষ্মীবাই নামে জনৈক যুবতী রানী তাঁর দত্তকপুত্রের পক্ষ থেকে রাজ্যটি শাসন করতেন। ঝাঁসির জনগণও একটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে এবং তাদের হাতে জনকয়েক ব্রিটিশ নিহত হয়। কিন্তু লক্ষ্মীবাই প্রজাদের চরমপন্থা গ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। ব্রিটিশ হত্যার অজুহাতে রোজ ঝাঁসি আক্রমণ করেন। লক্ষ্মীবাই রোজকে এই হত্যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কহীনতার কথা বুঝানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হলে ব্রিটিশরা ঝাঁসি অবরোধ করে এবং রানী নিজে দুর্গ রক্ষার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

ব্রিটিশদের হাতে ঝাঁসির পতন ঘটলে লক্ষ্মীবাই পলায়ন করেন ও তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা গোয়ালিয়র দখলে সমর্থ হন। কিন্তু শেষে রোজের প্রেরিত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালনা করেছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মীবাই। তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁতিয়া তোপী বিধ্বস্ত সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্টাংশ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। অনুসরণকারীদের এড়ানোর জন্য তিনি বার বার পথ বদলাতে থাকেন। প্রথমে তিনি যান খান্দেশে, শেষে আবার গোয়ালিয়রে ফিরেন। ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তাঁতিয়া তোপী ফাঁসিকাঠে আত্মদান করেন।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার এক প্রকাশ্য ঘোষণা মোতাবেক ভারত শাসনের দয়িত্ব ব্রিটিশ রাজ গ্রহণ করে ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভেঙ্গে দেয়া হয়। ব্রিটিশ হত্যায় প্রত্যক্ষ শরিক নন এমন সকল বিদ্রোহী সামন্তদের সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শনের আশ্বাস সহ তিনি ভারতীয় সামন্তদের সম্পত্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিশ্চয়তা দেন।

এই ঘোষণার ফলে প্রধান সামন্তরা নিজেদের বিদ্রোহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। ক্যানিংয়ের মার্চ-ঘোষণার ফলে বিদ্রোহী অযোধ্যার তালুকদার, রাজা ও জমিদাররা অস্ত্রত্যাগ করে। যেসব সামন্তদের ক্ষমালাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেবল তারাই তখনো লড়াই অব্যাহত রেখেছিল।

ইতিমধ্যে তাদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছিল। নানা সাহেব ও আজিমুল্লাহ জঙ্গলে প্রাণ হারান এবং বাহাদুর খাঁকে ব্রিটিশরা হত্যা করে। এভাবেই অভ্যুত্থানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হওয়ার মূলে অনেকগুলি কারণ ছিল। এর মূল সৈন্যদল কৃষক ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত হলেও এর নেতৃত্ব ছিল অভিজাত সামন্তদের হাতে। এইসব নেতারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালনায় নিজেদের অযোগ্যতার প্রমাণ দেন। তাঁরা কোন সাধারণ রণকৌশল বা সঙ্ঘবদ্ধ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন নি। প্রায়ই তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করতেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত বিদ্রোহের তিনটি কেন্দ্রের প্রত্যেকটিই স্বাধীনভাবে কার্যকলাপ চালাত। তদুপরি সামন্তরা কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় এদের কোন কোন অংশ অভ্যুত্থানের সঙ্গে একাত্মতা হারিয়ে ফেলেছিল। ব্রিটিশরা সামন্তদের সুবিধাদানের সঙ্গে সঙ্গে তারা এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল। এমন জটিল একটি যুদ্ধ চালনার পক্ষে এসব সিপাহী নেতাদের যোগ্যতা ছিল সামান্যই। তাঁর কৌশলগত সমস্যার মুকাবিলা করতে পারলেও রণনীতি চিন্তার মতো, পুরো সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ বিচারের মতো শিক্ষা তাঁদের ছিল না। পরিশেষে, বিদ্রোহীদের সামনে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্যও তুলে ধরা হয় নি। তাঁরা আহ্বান জানাতেন অতীত প্রত্যাবর্তনের, মোগল সাম্রাজ্যের অধীন স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার, যদিও উনিশ মধ্যভাগে সামন্ত সমাজে প্রত্যাবর্তন অনেকটা অবাস্তবই ছিল।

গণবিদ্রোহ দমনে সমর্থ হলেও ব্রিটিশরা ভারতে তাদের নীতিবদলে বাধ্য হয়েছিল: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তুলে দেয়া হয় ও ভারতবর্ষ ব্রিটিশের উপনিবেশ হয়ে ওঠে এবং এখানে কর্মচারী নিয়োগের সকল দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর বর্তায়। ব্রিটিশরা সামন্তদের অসন্তুষ্ট করতে আর ইচ্ছুক ছিল না এবং তারা সর্বাধিক প্রভাবশালী সামন্তদের সুবিধাদানের মাধ্যমে সতর্কতামূলক নীতি অনুসরণ করত। এই বিদ্রোহের পর সাধারণভাবে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির এক নবপর্যায় শুরু হয়েছিল।

আঠারো শতক ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ভারতীয় সংস্কৃতি

মোগল সাম্রাজ্যের পতন, ব্যাপক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ক্রমান্বয়ে ভারতের স্বাধীনতা হারানোর ফলে আলোচ্য কালপর্বে সংস্কৃতির সাধারণ ক্রমাবনতিই ঘটেছিল। তথাপি এইসঙ্গে সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য সাফল্য দেখা দিয়েছিল এবং স্মরণীয় শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য, এসময় মধ্যযুগে উদ্ভূত শিল্পরূপগুলিরই বিস্তার আমরা লক্ষ্য করি। দৃষ্টান্ত হিসাবে সাহিত্যে আগের

মতোই কাব্যপ্রীতি, স্থাপত্যে পূর্বেকার নির্মাণরীতির পর্যাপ্ত অনুকৃতি, চিত্রশিল্পে মিনিয়েচরে গণ্ডীবদ্ধতা অব্যাহত ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একটি নতুন আলোড়ন দেখা দেয় এবং তা ছিল বহুলাংশে ব্রিটিশেরই প্রভাবাশ্রিত। সাহিত্যেই আলোড়নটি সর্বাধিক প্রকটিত: কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় গদ্যসাহিত্য, সমকালীন বিষয়ভিত্তিক পত্রসংগ্রহ এবং ভারতে অজ্ঞাত সাংবাদিকতার উন্মেষ ঘটেছিল। অবশ্য এই রচনাবলী ব্রিটিশ প্রতিমানের প্রত্যক্ষ অনুকৃতি ছিল না। এগুলির বিষয়বস্তু সমকালীন জীবনাশ্রিত হওয়ায় নতুন রীতিভিত্তিক একটি নতুন ভাষার উন্মেষ ঘটেছিল।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তখনো মোগলরীতির গৃহনির্মাণ অব্যাহত থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে কৃৎকৌশলগত কোন কোন সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল। অবশ্য ব্রিটিশদের তৈরি দালানগুলি ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। এইসব দালানের কোন কোনটি পরবর্তীকালে, বিশেষত উনিশ শতকের শেষার্ধে উদ্ভূত তথাকথিত ইঙ্গ-ভারতীয় স্থাপত্যরীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

ইতিহাস

পুরনো রীতির ধারাবিবরণী রচনা আঠারো শতকেও অব্যাহত ছিল। এইসব ধারাবিবরণীর মধ্যে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে লিখিত 'সিয়ার উল-মতাখেরিন' (শেষ শাসকবর্গের জীবনী) সবিশেষ উল্লেখ্য। এই গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত আমির গোলাম হোসেন খাঁ তাবাতাবাই দিল্লীর মোগলদের এবং বাংলার নবাবদের সভাসদ ছিলেন এবং মীর কাসিমের পতনের পর কোম্পানির চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন। হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সভাসদ মীর হোসেন আলী খাঁ কেরমানীও অনুরূপ ধারাবিবরণী লিখেছিলেন।

আঠারো শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকগুলিতে দেওয়ান (রাজস্ববিভাগের প্রধান) হিসাবে গুজরাটে কর্মরত আলী মুহম্মদ খাঁ লিখিত গুজরাটের ইতিহাস—'মীরাটী আহম্মদী' (আহ্মদ দর্পণ) গ্রন্থটি এক অতি মূল্যবান ইতিহাস। লেখক কেবল বহুসংখ্যক ফরমান ও অন্যান্য দলিলই উল্লেখ করেন নি, গ্রন্থের পরিশিষ্টে দালানকোঠা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঐতিহাসিক স্থান, প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ আঠারো শতকের গুজরাটের বিশ্বকোষকল্প এক বিবরণীও যুক্ত করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির উৎস হিসাবে 'মাসির-উল-উমারা' (আমিরদের কার্যাবলী) নামক বহুসংখ্যক জীবনীসমৃদ্ধ গ্রন্থটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। এই বিশাল গ্রন্থের লেখক শাহ্ নেওয়াজ খাঁ ছিলেন আসফ জা ও পরবর্তীকালে নাসির জংয়ের কর্মচারী। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীদের বিরোধিতা করার ফলে তিনি তাদের হাতে নিহত হন।

ষোল, সতেরো ও আঠারো শতকের মোগল-ভারতের ৭ শত অভিজাত ব্যক্তির জীবনীতে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। এটি মুখ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির উৎস। পরিশেষে, আঠারো শতকে মোগল শাসনের আওতায় ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য লালনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের কথাটি স্মরণীয়। আর্থিক ব্যয়সংবহনের উপযোগী পৃষ্ঠপোষকের অভাবে উনিশ শতকে এই ধরনের ধারাবিবরণী লেখার ঐতিহ্য বস্তুত লোপ পেয়েছিল।

জ্যোতির্বিদ্যা

প্রযুক্তিলগ্ন বিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেই কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছিল। এক্ষেত্রে জয়পুরের জয় সিংয়ের (?-১৭৪৩) কার্যাদি সবিশেষ উল্লেখ্য। তিনি প্রাচীন গ্রীক, আরব ও পর্তুগীজদের অবিষ্কারগুলি সম্পর্কে অবহিত হন এবং জয়পুর (মার্বেল দিয়ে), দিল্লী (লাল বেলেপাথরের সাহায্যে), মথুরা, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতে বহুসংখ্যক মানমন্দির নির্মাণ করেন।

সাহিত্য: সাধারণ পরিক্রমা

আঠারো শতকে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের বিবিধ সাহিত্যানুগ ভাষার যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও আলোচ্য প্রসঙ্গ এবং বিষয়বস্তুর সাবেকী ধরন তখনো অপরিবর্তিতই ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এদেশে সাংবাদিকতার প্রথম উন্মেষ ঘটে। ভারতের সাহিত্য বহু ভাষাভিত্তিক বিধায় এখানে শুধু প্রধান ভাষাগুলির সাহিত্যই আলোচিত হবে।

উর্দু সাহিত্য

প্রধানত সভাকবিদের লিখিত উর্দু কবিতা ছিল কঠোরভাবে প্রথাসিদ্ধ। সাউদা (মীর্জা মুহম্মদ রফী, ১৭১৩-১৭৮১) ছিলেন প্রথমে দিল্লীর মোগলদের সভাকবি। কিন্তু নাদীর শাহ্ কর্তৃক দিল্লী ধ্বংসের পর তিনি লক্ষ্ণৌয় অযোধ্যার নবাবের সভায় আশ্রয় নেন। সাউদা ছিলেন ব্যঙ্গসাহিত্যিক। বিরোধীদের কঠোর সমালোচনার অনুষঙ্গ হিসাবে প্রচলিত নৈতিকতা লঙ্ঘন, দরবারে সুবিধাজনক পদ দখলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ইত্যাদি উদ্‌ঘাটনক্রমে তিনি ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পতনের ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক মীর তাকি মীর (১৭২৫-১৮১০) ছিলেন গীতিকবি। অকপট আবেগপূক্ত তাঁর

গজলগুলি ছিল বিত্ত ও আভিজাত্যের মোহে অন্যত্র বিবাহদত্ত এক নারীর জন্য দুর্ভাগা প্রেমের আকুল আর্তিতে মুখরিত। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার দিল্লীতে নিত্যসংঘটিত সব ধরনের স্বৈরাচার এবং হিংস্রতারও প্রতিবাদী।

সমকালীন অন্যান্য উর্দু কবিদের ব্যতিক্রমী হিসাবে নাজির আকবরাবাদী (১৭৪০-১৮৩০) সভাকবির পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হন এবং আগ্রায় শিক্ষকতারত থাকেন। তিনি বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং মুসলমান, হিন্দু ও শিখদের ধর্মোৎসবে শরিক হতেন। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ মানুষের জীবন এবং ভাষ্য ছিল প্রাণবন্ত, মাটির কাছাকাছি তথা জনবোধ্য।

সেকালের শ্রেষ্ঠতম লেখক মীর্জা গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯) উর্দু সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। তাঁর গজলে নিজ উপলব্ধি ও জটিল অনুধ্যানগুলি তিনি বর্ণনা করেন এবং নতুন শব্দাবলী ও ব্যঞ্জনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভাষার সীমাবদ্ধতা উত্তরণের প্রয়াস পান। উর্দু ভাষায় আত্তীভূত তাঁর এইসব উদ্ভাবন একে সমৃদ্ধতর করেছে। নিজ পত্রাবলী প্রকাশের মাধ্যমে গালিব উর্দু গদ্যের পিতৃপুরুষের মর্যাদা লাভ করেন এবং সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রয়োগের প্রথম উদ্যোক্তার স্বীকৃতি পান। মোগল সম্রাটদের সভাকবি হওয়া সত্ত্বেও মোগল সমাজের পতনের মুখোমুখি নিরুদ্যম গালিব ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানের শরিক হন নি।

উর্দু গদ্যের বিকাশে তৎকালে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিশিষ্ট অবদানও স্মরণীয়। ঔপনিবেশিক কর্মচারীদের স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে উর্দুতে বিশেষ ধরনের পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থনায় ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুর অভাবে তাঁরা মধ্যযুগীয় 'দাস্তান'গুলির (ছোটগল্প) আধুনিক ভাষ্য লেখেন এবং ফলত, সাহিত্যানুগ উর্দু গদ্যের জরুরী ভিত্তি নির্মিত হয়। এই কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রায় অর্ধশত উর্দু বইয়ের মধ্যে 'বাগ-ও-বাহার' (বাগান ও বসন্ত) নামক গল্পসংকলনটিই ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয়। এই গ্রন্থের লেখক ছিলেন প্রাক্তন জায়গীরদার ও আহ্‌মদ শাহ্‌ দুর্‌রানীর দিল্লী অভিযানের পর কলিকাতা প্রবাসী মীর আমান।

মরাঠী সাহিত্য

আঠারো শতকে মরাঠী ভাষায় অনেকগুলি বীরগাথা বা 'পাভাদাস' রচিত হয়েছিল। এগুলিতে শিবাজীর সময় থেকে মরাঠী ইতিহাসের বহু কাহিনী বিবৃত। এই যুগের বিখ্যাত কবি হলেন রামযোশী (১৭৫৮-১৮১২) ও আনন্দ ফান্দো (১৭৪৪-১৮১৯)। এই সময়কার বিশেষ ঘটনা হল মরাঠী গদ্য, বিশেষত রাজনৈতিক

ও সামাজিক ভাষ্যকারদের রচনাবলীর উন্মেষ। মরাঠী সাহিত্যানুগ ভাষার উল্লেখ্য বিকাশ সাধনের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়: ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে নিজের প্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ-মরাঠী 'বোম্বাই দর্পণ' পত্রিকায় মরাঠী ভাষায় সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধকার বাল শাস্ত্রী জামভেকার, ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতের ঘটনাবলী: অতীত ও বর্তমান' গ্রন্থের লেখক রামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ, ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'প্রভাকর' সংবাদপত্রের প্রবন্ধলহরীর (পরে 'শতপত্র' নামক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত) লেখক লোকহিতবাদী। এইসব লেখকরা ইতিপূর্বে মরাঠী সাহিত্যে অনালোচিত বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন এবং তাঁরা নতুন ধারণা, নতুন প্রকাশভঙ্গি প্রবর্তন করেছিলেন। ফলত, মরাঠী তৎকালীন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধতম ভাষা হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের দশকগুলিতে মরাঠী সাহিত্যনুগ ভাষার ব্যাকরণ ও আভিধানিক কাঠামো নিয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। সেকালের বিখ্যাত মরাঠী ভাষাবিদ ছিলেন দাদবা পাণ্ডুরাঙা (১৮১৪-১৮৮২)।

বাংলা সাহিত্য

আঠারো শতকে মধ্যযুগীয় কাব্যসাহিত্যের আরও প্রসার ঘটেছিল। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সাবেকী ধরন কিছু পরিমাণে অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তখন খোদ ভাষার বিকাশ ঘটছিল, কবিদের বর্ণনার উপকরণাদি আরও পরিশীলিত হচ্ছিল, অর্থাৎ উৎপমাগুলিতে প্রথাসিদ্ধতার বদলে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল, চরিত্রগুলি বাস্তবতর হয়ে উঠছিল এবং কাব্যে স্বতন্ত্র কবিসত্তার আবির্ভাব ঘটছিল। একালের প্রধান কবিদের মধ্যে বাংলার অন্যতম সামন্ত, নদীয়ার রাজার সভাকবি 'রায়গুণাকর' ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০) ও রাজার সাহায্যপুষ্ট 'কবিরঞ্জন' রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮-১৭৭৫) সবিশেষ স্মরণীয়।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য-কাহিনীর সৌন্দর্য ও নাগরিক বিদগ্ধতায় আকৃষ্ট প্রথম রুশ ভারততত্ত্ববিদ গেরাসিম লেবেদেভ (১৭৪৯-১৮১৭) এটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কোন কোন কবিতায় সুরারোপ সহ সেগুলি ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় একটি নাট্যানুষ্ঠানে ব্যবহারও করোছলেন।

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ নতুন বাঙ্গালী গদ্য লেখকগোষ্ঠীর পরে বাংলা গদ্যের সত্যিকার পথিকৃৎ ছিলেন রামমোহন রায়। বাংলা গদ্যের আধুনিকীকরণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় তিনি বিবিধ সামাজিক সমস্যা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও সেকেলে রীতিনীতির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিকাশমান বাংলা গদ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি অনুসৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী, বিশেষ করে অক্ষয়কুমার দত্ত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পঞ্চাশের দশকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে (তাঁর 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', ধর্মসংস্কার-সম্বন্ধীয় রচনাবলী ও বাদানুবাদ এবং অন্যান্য রচনা মারফত) বাংলা গদ্য তার ভাবগম্ভীর সমৃদ্ধ রূপ পায়। এই ধারাটিকে পূর্ণ পরিণত ও আধুনিক চিন্তাচিহ্নিত রূপ দান করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অজস্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ-রচনার মধ্য দিয়ে -- উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে।

তামিল সাহিত্য

তামিল সাহিত্য ছিল দক্ষিণ ভারতের সর্বোন্নত সাহিত্য। এতে সংস্কৃত সাহিত্যের টীকা রচনায় মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য তখনো অব্যাহত ছিল। কিন্তু আঠারো শতকের লেখকরা প্রথাসিদ্ধভাবে নিজেদের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী আলোচ্য গ্রন্থের টীকা রচনার বদলে এইসব গ্রন্থের সাহায্যে প্রায়ই অত্যন্ত অবাস্তব রূপে ভারতের অতীত ইতিহাস পুনর্নির্মাণের প্রয়াস পেতেন। তামিলদের জন্য প্রাচীন ভারতের গৌরবদীপ্ত দিনগুলি পুনঃস্মরণ ছিল নিজ জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার একটি উপায়বিশেষ।

আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে ইতালীয় মিশনারী কনস্তানজিও বেসচি (১৬৮০-১৭৪৬) তামিল গদ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান সংযোজন করেন। 'বিরাম মুনি' নামে তাঁর লিখিত খ্রীস্ট-বিষয়ক কিছু রচনা ছাড়াও স্থানীয় তামিল ভাষায় তাঁর সংকলিত 'সরল গুরুর কাহিনী' নামের রূপকথাটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ভক্তিবাদের অনুসারী হলেও আঠারো শতকের প্রথমার্ধের তামিল কবি তায়ুমানভার তাঁর রচনায় শিবকে সকল জাতি ও ধর্মের মানুষের গ্রহণযোগ্য বিমূর্ত দেবতা হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন। অন্য ভক্তদের মতো তায়ুমানভারও মানবিক সাম্যের ধারণা প্রচারের প্রয়াস পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ধারণাবলী সুন্দরম পিল্লাই ও পরবর্তীকালে রামলিঙ্গ স্বামীর (১৮২৩-১৮৭৪) লোকভাষাঘনিষ্ঠ রচনায় আরও বিকশিত হয়েছিল। তামিল গদ্যসাহিত্যের বিকাশে রামলিঙ্গ স্বামীর লিখিত গল্পগুলির অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। আরুমুগা নাভেলার (১৮২২-১৮৭৪) ছিলেন এযুগের প্রধান গদ্যলেখক। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধের আগে তামিল উপন্যাসের উন্মেষ ঘটে নি।

থিয়েটার

আঠারো শতকে নাট্যকলার অবক্ষয়ের যুগে মূলত মঞ্চের বদলে আবৃত্তির জন্যই নাটক লিখিত হত। প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যভিত্তিক জনপ্রিয় নাটকগুলি মেলায় মঞ্চস্থ হত। কিন্তু এগুলি ছিল পুরনো কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য কলিকাতায় কোম্পানির উদ্যোগে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অভিনীত নাটকগুলির বিষয়বস্তু ভারতীয়দের অপরিচিত থাকায় এবং অধিকাংশ ভারতীয় ইংরেজী ভাষা না জানায় তারা অনুষ্ঠান বুঝত না, এগুলি দেখত না।

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয়দের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক রঙ্গমঞ্চ থেকে এক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সঙ্গীতবিদ (পরে ভারততত্ত্ববিদ) গেরাসিম লেবেদেভ। তিনি ১২ বছর ভারতে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দুস্তানী ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরেজী নাটকের দৃশ্যাবলীকে ভারতের পটভূমিতে স্থানান্তরিত করেন এবং নায়ক-নায়িকাকে বাঙ্গালী বানিয়ে তিনি চলতি বাংলায় দুটি ইংরেজী নাটকের রূপান্তর ঘটান। কোম্পানির রঙ্গমঞ্চ মালিকরা তাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেউলিয়া বানানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং এটি বন্ধ হয়ে যায়। লেবেদেভ ভারত ছাড়তে বাধ্য হন এবং শেষাবধি ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইংরেজী নাটক ও তার কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ অভিনয়ের জন্য 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের মধ্যে কলিকাতায় অনেকগুলি রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলিতে বাংলায়ও অভিনয় চলত। উনিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রামনারায়ণ তর্কালংকারের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', 'শর্মিষ্ঠা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও সামাজিক সমস্যামূলক আধুনিক নাটক রচনা ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের দৃঢ় অগ্রগতি সূচিত হয়। অতঃপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করার পর শুরু হয় বাংলা নাটক ও থিয়েটারের সত্যিকার আধুনিক স্বর্ণযুগ।

স্থাপত্যশিল্প

সব মিলিয়ে আঠারো শতকে স্থাপত্যশিল্পেই পতন দেখা দিয়েছিল। অনুপাতের আশ্চর্য সামঞ্জস্যচিহ্নিত মোগলদের গৌরবোজ্জ্বল দিনের প্রাসাদগুলি ততদিনে অতীতে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। অত্যধিক অলংকরণ, কাঠামোর পক্ষে

অপ্রয়োজনীয়, সাধারণত সার্বিক গঠনশৈলী থেকে দৃষ্টিনিক্ষেপক অঢেল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য এটিকে খণ্ডিত করত। এটিই ছিল আঠারো শতকের নির্মাণরীতি। এইসঙ্গে স্থাপত্যশিল্পের নতুন পদ্ধতি ও কৃৎকৌশলের উদ্ভব ঘটছিল।

আঠারো শতকে প্রাসাদ, সরণী, সেতু ইত্যাদি নিয়ে গঠিত কয়েকটি সম্পূর্ণ নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে রাজা জয় সিং কর্তৃক নির্মীয়মাণ জয়পুর শহরটি উল্লেখ্য। শহরের প্রাসাদটি ছিল বহু দালানের সমাহার এবং তন্মধ্যে 'হাওয়া মহল' ছিল বিখ্যাত। অসংখ্য কুলঙ্গি ও অলিন্দ এই বিশাল দালানটিকে ঠাণ্ডা রাখত এবং এগুলির মধ্যে প্রবাহিত বাতাস অভ্যন্তরে মৃদু স্বনন সৃষ্টি করত। প্রাসাদের অভ্যন্তর বহুবর্ণ, স্তরিত মার্বেল ও পাথরের জাফরি শোভিত ছিল। প্রাসাদ ও দুর্গগুলির মধ্যেকার ইংরেজ-রীতির বাগানগুলি ছিল শহরপ্রাচীরের ওপারের পাহাড়ী নিসর্গদৃশ্যের সঙ্গে সুবিন্যস্ত। এই ধরনের অন্যতর শহর ছিল ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে তৈরি গোয়ালিয়রের নতুন রাজধানী লাসকর। এখানকার দালানগুলিতে সামনের প্রসারিত বারান্দা, ক্ষুদ্র সরু স্তম্ভের উপরকার সূক্ষ্ম খিলান সহ ঝুল-বারান্দা, পাথরের জাফরির কারুকার্যসজ্জিত উন্মুক্ত 'ঝারুয়া' ব্যালকনি ইত্যাদি প্রথাসিদ্ধ উপকরণগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। লাসকরের অন্যতর আকর্ষী দ্রষ্টব্য হিসাবে একটি সুন্দর সেতুও উল্লেখ্য।

আঠারো শতকে অযোধ্যার নবাবদের নির্মিত তাঁদের রাজধানী লক্ষ্মৌ ছিল প্রাসাদ, মসজিদ, অযোধ্যার শাসক ও অভিজাতবর্গের সমাধিমিনার, বড় ও ছোট ইমামবাড়ার নামাজ-কক্ষ ইত্যাদির সমাহারবিশেষ। ধূসর বেলেপাথর বা 'চুনাম' (খোলকের চকচকে গুঁড়ো) প্লাস্টারযুক্ত চৌকো পাথর দিয়ে এইসব দালান অলঙ্কৃত হয়েছিল। এগুলি ছিল সমৃদ্ধ কারুকার্য এবং প্রান্তিক গোলক বা শিরাল স্তম্ভের উপর আটকানো নানা আকারের গোলক সহ মোচাকার চূড়ায় সুসজ্জিত। এই দালানগুলি মৌলিক ও বলিষ্ঠ নকশার জন্যই বিশিষ্ট। দৃষ্টান্ত হিসাবে বড় ইমামবাড়ার আয়তাকার বিশাল কক্ষটি (প্রায় ৮০০ বর্গ মিটার) উল্লেখ্য। একটিও স্তম্ভ বা আলম্বহীন প্রশস্ত ছাদ ও আশ্চর্য শ্রুতিব্যবস্থা যুক্ত এই কক্ষের একপ্রান্তের ফিসফিসানি পর্যন্ত অন্যপ্রান্তে স্পষ্ট শোনা যেত।

গঙ্গার খাড়া কিনারে বারাণসীর বহু মন্দির, প্রাসাদ ও আশ্রম এবং ঘাটগুলিও আঠারো শতকেই তৈরি হয়েছিল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তৈরি কতকগুলি দালানও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। এতে রয়েছে: আহ্মদাবাদের শ্বেতপাথরের ধর্মনাথ জৈন মন্দির (১৮৪৪-১৮৪৮); বিকানীরের জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর তৈরি সমৃদ্ধ খোদাই ও ভাস্কর্য সজ্জিত এবং প্রান্তিক পাঁচিলযুক্ত ছাদওয়ালা চারতলা দালান। আঠারো শতকী স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল সুন্দর চত্বর ও সোনার পাতমোড়া তামার গোলগম্বুজ সজ্জিত

অমৃতসরের শিখ স্বর্ণমন্দির (১৭৬৪-১৭৬৬)। মোগলদের স্বর্ণযুগের প্রতীক দিল্লীর সাফদর জং মসজিদটি (১৭৫৩) প্রসঙ্গত স্মরণীয়। কিন্তু এটি ততটা মূল্যবান উপকরণে নির্মিত নয়।

আঠারো শতকে ভারতে, বিশেষত বাংলায় ইউরোপীয় ধরনের দালান তৈরি শুরু হয় (যদিও দক্ষিণ ভারতে তখনো ষোল শতকী কয়েকটি পর্তুগীজ চার্চ, ডাচ গোদামঘর ও সতেরো শতকী বাড়িঘর ছিল)। আঠারো শতকে তৈরি এখানকার ব্রিটিশ বাড়িগুলি ছিল প্রধানত ক্ল্যাসিকাল ধরনের। পারিপার্শ্বিক নিসর্গদৃশ্যের সঙ্গে সাধারণত স্তম্ভশোভিত এই বাড়িগুলির কোনই সামঞ্জস্য ছিল না। লক্ষ্ণৌর 'লা মর্তিনিয়র' কলেজ (সামরিক স্কুল) হল এযুগের কুশ্রীতম ইউরোপীয় দালানের দৃষ্টান্ত। একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরে এই বাড়িটি তৈরি করেন অযোধ্যায় আদি নবাবদের গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ও অপরিমিত সম্পদের মালিক জনৈক ফরাসী ভাগ্যান্বেষী ক্লদ মার্তিন। নিরাভরণ দেয়াল, চৌকো ও গোলাকার কোঠা, তিনতলায় অবস্থিত উঁচু মিনারের মাথাজোড়া মুকুট — সব মিলিয়ে অট্টালিকাটি হল ইউরোপীয় সুরক্ষিত প্রাসাদের স্মৃতিবহ সামঞ্জস্যহীন রীতিসমূহের এক জটিল মিশ্রণ। উঁচু কোঠাগুলির উপর বিভিন্ন উচ্চতায় ইউরোপীয় ক্ল্যাসিকাল ধরনের মূর্তি এবং সামনের বারান্দার উপর বিশাল পাথরের দুটি দ্বিমাত্রিক সিংহ বসানো রয়েছে — সিংহগুলির উন্মুক্ত দাঁতের মধ্য দিয়ে ওপারের আকাশ চোখে পড়ে। সৌভাগ্যবশত, এই ধরনের দালান ভারতীয় স্থাপত্যকে প্রভাবিত করে নি।

চিত্রকলা

আঠারো শতকে মোগল মিনিয়েচরের প্রসার সর্বাধিক মাত্রায় পেঁছেছিল। পুরনো প্রতিমান অনুকৃত হলেও এগুলির রং ছিল উজ্জ্বলতর, কখনো বা চোখ-ধাঁধানো। পেটরা, থালা, হাতির দাঁতের পদক ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য সজ্জায় বহু মিনিয়েচর ব্যবহৃত হত। আঠারো শতকের মধ্যভাগের পর মোগল মিনিয়েচর চিত্রীগোষ্ঠীর বস্তুত বিলোপ ঘটে। কিন্তু এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মিনিয়েচর চিত্রের স্বর্ণযুগ শুরু হয় জম্মু, চম্বা, মন্দি, কাংরা ও তেউরি-গাড়োয়ালের মতো ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যে (যেজন্য এগুলি 'পাহাড়ী' মিনিয়েচর নামে খ্যাত)।

এগুলির মধ্যে কাংরা গোষ্ঠীই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মোগল অমাত্যের জীবন চিত্রণ বা ফারসী কবিদের রচনা অলঙ্করণে ব্যবহৃত মোগল মিনিয়েচর-গোষ্ঠীর ব্যতিক্রমী হিসাবে কাংরা গোষ্ঠীর বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু মহাকাব্যের উপকরণ, বিশেষত কৃষ্ণের কাহিনী — তাঁর শৈশব, রাখাল সখীদের মধ্যে কৃষ্ণ, বাঁশিবাদনরত কৃষ্ণ, সখীবেষ্টিতা প্রিয়তমা রাধা, রাধাকৃষ্ণের মিলন ইত্যাদি। এসব মিনিয়েচরে কৃষ্ণকে

সর্বদাই অস্বাভাবিক হালকা নীল আভায় আঁকা হত। সাধারণত পার্শ্ব থেকে দেখা ও কিছুটা প্রসারিত চোখ সহ দ্বিমাত্রিক নরনারীর ছবির রাজপুত চিত্রধারার প্রতিফলন এতে খুবই স্পষ্ট। ছবিগুলি সাধারণত প্রেক্ষিতহীন ছিল। এতে জনসমষ্টি এভাবে আঁকা যে মূর্তিগুলি অনেক সারিতে শ্রেণীবদ্ধ ও পেছনের সারি সামনের চেয়ে কিছুটা উঁচু হত। গাছগুলি অলঙ্কৃত থাকত, সাধারণত নৈশ দৃশ্যাবলীই নির্বাচিত হত যখন আকাশ নক্ষত্রখচিত। তথাপি সীমিত পরিসরের হলেও গাঢ় রং — নানা গভীরতর নীল বা সোনালী-বাদামীই নির্বাচিত হত। উল্লেখ্য যে, কাংরা মিনিয়েচরে সভাসদ, আমির-ওমরাহ্‌দের বদলে কৃষক, রাখাল, কারিগর ইত্যাদিই চিত্রিত।

আঠারো শতকের শেষপাদে হালকা রং ব্যবহার শুরু হয়। তখনকার গ্রন্থনার দক্ষতায় দৈন্য প্রকটিত ছিল, এমন কি দেবদেবীদেরও দৈনন্দিন বাস্তবতার পরিবেশে, প্রায়ই পরিবারের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবয়বে আঁকা হত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চিত্রশিল্প তখন শিল্পকলার বদলে অনেকটাই কারুকর্ম হয়ে উঠেছিল: এতে ব্রিটিশ কর্মচারীদের প্রতিকৃতি ও সব ধরনের ধর্মীয় শোভাযাত্রার প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। মিনিয়েচর ততদিনে গ্রন্থচিত্রণের সীমানা পেরিয়ে নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীগুলির অলঙ্করণেরও উপকরণ হয়ে উঠেছিল।

সাম্রাজ্যবাদের জন্মলগ্নে ভারতবর্ষ
(১৮৬০-১৮৯৭)

ঔপনিবেশিক শাসন প্রণালীর পরিবর্তন

১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এতে ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ভিত্তির আপেক্ষিক দুর্বলতা প্রকটিত হয়েছিল এবং শোষকদের বিরুদ্ধে জনগণের গভীর ঘৃণাও আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রসঙ্গত জওহরলাল নেহরুর 'ভারত সন্ধানে' বইটির একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ্য: 'বিপ্লব কেবল প্রত্যক্ষভাবে দেশের কোন কোন অংশে দেখা দিলেও এটি সারা ভারতকে, বিশেষত ব্রিটিশ শাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল।'

ষাটের দশকের শাসন সংস্কার

প্রশাসন যন্ত্রের মজবুতি এবং নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির চাহিদা পূরণের জন্য ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ঔপনিবেশিক শাসন প্রণালীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হয়েছিল। এইসব শাসন সংস্কারের পথে রাষ্ট্রযন্ত্রের শেষ রূপটি, অর্থাৎ ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতে ঔপনিবেশিক দাসত্ব কায়েমের মূল উপায়গুলি প্রধানত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মার্কস দেখিয়েছেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 'যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভেঙ্গে পড়েছিল',* কারণ, এটি কেবল ভারতেই নয়, ব্রিটেনেও সুনাম খুইয়েছিল, অনেক আগেই ঐতিহাসিক কালসঙ্গতিও হারিয়ে ফেলেছিল।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক 'ভারতে সুশাসন প্রবর্তনের আইন' প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের উপর ন্যস্ত হয় এবং ঔপনিবেশিক শাসন অতঃপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে। এভাবে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক বোর্ড ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলীর মাধ্যমে শাসন পরিচালনার অবসান ঘটে। ব্রিটিশ সরকার এই সংস্থাগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নবগঠিত ভারত বিষয়ক মন্ত্রকের কাছে এগুলির কার্যাদি হস্তান্তর করে এবং এটির তত্ত্বাবধায়কের (রাষ্ট্রীয় সচিব) অধীনে ব্রিটিশ ও

* K. Marx, *Notes on Indian History,* p. 186.

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রধান প্রধান কর্মচারীদের নিয়ে ভারতীয় পরিষদ নামে একটি উপদেষ্টা-সংস্থা গঠিত হয়। ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল ভাইসরয় উপাধি নিয়ে দেশে ব্রিটিশ রাজের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হয়ে উঠেন। প্রশাসন কেন্দ্রীভূত করে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কার্যকলাপে তাদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পত্তি ব্রিটিশ রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়। কিন্তু কোম্পানির শেয়ার-মালিকরা এজন্য ভারতীয় বাজেটের অংশ থেকে (অর্থাৎ, ভারতীয় করদাতাদের খরচায়) মোট ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের খেসারত পেয়েছিল।

১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহে সিপাহী বাহিনীগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে ১৮৬১-১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে সামরিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ইউনিট ও উপ-ইউনিটগুলির অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ব্যবস্থা রেখেই এই পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করা হয়েছিল (সংস্কারের পূর্বেকার ব্রিটিশ ও সিপাহীদের ১:৬ অনুপাতটি পরে ১:২ ও আরও পরে ১:৩ অনুপাতে পেঁছিয়)। তারা বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সিপাহীদের মিশ্রণ ঘটিয়েই ইউনিটগুলিকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করেছিল। এবার পঞ্জাবী শিখ এবং হিমালয়ের পাদদেশের ও নেপালের পাহাড়ী জাতিগুলি থেকেই অধিকাংশ সিপাহী সংগৃহীত হচ্ছিল, যেসব জাতিগুলির সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডের জনগণের বিশেষ কোন সংযোগ ছিল না। সিপাহী ও ব্রিটিশ সৈন্যরা পেত যথাক্রমে মসৃণ নলের আর পেঁচ-কাটা নলের রাইফেল। সিপাহীদের তুলনায় সামরিক কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যদের উৎকর্ষতা টিকিয়ে রাখার জন্য গোলন্দাজ বাহিনীতে তাদের একক আধিপত্য রাখা হয়েছিল।

সামরিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অধস্তন অফিসর নিয়োগের ব্যাপারে একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতীয় সামন্ত অভিজাতদের সামরিক উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার ব্যবস্থা পাকা করেছিল।

দেশের ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যান্য রদবদলের মতো এই সামরিক সংস্কারেরও দুটি উদ্দেশ্য ছিল: একদিকে ভারতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্রীকরণ ও দৃঢ়ীকরণ, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের সপক্ষে ভারতীয় সমাজে সমর্থন লাভের একটি মজবুত ভিতপ্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণীর সমর্থন নিশ্চিত করা।

এটিই ছিল এই কালপর্বে প্রবর্তিত শাসন সংস্কারের মর্মবস্তু। 'ভারতীয় পরিষদের' আইনানুসারে (১৮৬১) ভাইসরয়, তিনটি প্রেসিডেন্সির গভর্নরত্রয়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি ও পঞ্জাবের লেফটান্যাণ্ট গভর্নরগণের নেতৃত্বে উপদেষ্টামূলক ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। এই পরিষদ সদস্যের অন্তত অর্ধেক অবশ্যই সিভিল সার্ভিস বহিস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মনোনীত হবেন, এটিই নির্ধারিত ছিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কমন্স সভায় প্রদত্ত তৎকালীন ভারতসচিব স্যার চার্লস উডের বক্তৃতায়ই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এতে দেশীয়

উচ্চশ্রেণীকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন করে তোলার সেরা উপায় হিসাবে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি ভারতীয় সামন্তদের ব্যবস্থাপক সভার কাজে শরিক করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ব্যবস্থাপক সভা কিন্তু ভাইসরয় ও প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রাধিকারী বৈশিষ্ট্যকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করে নি। লক্ষণীয় যে, ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ভারত পরিষদ বিধিতে ফিনান্স, কর, সামরিক বাহিনী, ধর্ম, ভারতীয় রাজ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক তথা বৈদেশিক সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপারগুলিকে বিশেষ উল্লেখক্রমে পরিষদের আলোচনার এক্তিয়ারবহির্ভূত রাখা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সমবায়ে গঠিত একটি নির্বাহী পরিষদ ভাইসরয়ের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার যেকোন সিদ্ধান্ত বাতিলের অধিকার ভাইসরয়ের ছিল।

তৎকালীন আইন সংস্কার ও রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকতর কেন্দ্রীকরণ সহ এটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মচারীদের আরও প্রভাববৃদ্ধির লক্ষ্যেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। ফলত, সুপ্রিম কোর্ট ও কোম্পানি কোর্টগুলি ('সদর দেওয়ানি' ও 'নিজামত আদালত') উঠে যায় এবং ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনটি প্রেসিডেন্সির প্রত্যেকটিতে ও ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র মোটামুটি নির্দিষ্ট আকার লাভ করেছিল। ব্রিটিশ শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই ছিল এটির প্রথম ও প্রধান কাজ। এজন্যই এটির উচ্চতর স্তরগুলি (ভারতের জন্য আইন প্রণয়নকারী পার্লামেণ্ট এবং বিশেষ মন্ত্রকের সাহায্যে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কার্যাদি নিয়ন্ত্রক সরকার) ব্রিটেনে অবস্থিত ছিল।

রাজন্যবর্গ ও সামন্ত ভূস্বামীদের সঙ্গে মৈত্রী

সেই ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১ নভেম্বরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা থেকেই ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় সামন্ত অভিজাতদের সম্পর্কে অনুসৃত নতুন নীতির সম্পূর্ণ ও অটল বাস্তবায়ন শুরু করেছিল।

বিদ্রোহের সময় সক্রিয় সমর্থনের পুরস্কার হিসাবে ব্রিটিশরা সামন্ত অভিজাতদের উদারভাবে উপহার দিতে থাকে। ফলত, ১৮৬৭-১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলির বহু সামন্তই রাজা ও নবাব উপাধিতে ভূষিত হয় এবং তারা বিরাট অঙ্কের টাকা সহ যথেষ্ট পরিমাণ ভূসম্পদ ও অবসর-ভাতা পায়। পাতিয়ালা, ঝিন্দ, রামপুর ও গোয়ালিয়রের শাসকের মতো বহু রাজাই বিদ্রোহের শরিকদের বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি থেকে বিরাট বিরাট এলাকা উপহার পেয়েছিল।

সামন্ত ভূস্বামী ও রাজন্যবর্গকে ভূমিদানের মাধ্যমে ব্রিটিশরা আর্থিকভাবে ভারতীয় সমাজের অভিজাতদের সঙ্গে তাদের মৈত্রী মজবুতের প্রয়াস পেয়েছিল, আর এই মৈত্রী ছিল ভারতীয় জনগণের জাতীয় স্বার্থের প্রতি সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেই মূলীভূত। এই কর্মপ্রণালীতে ভারতে ব্রিটিশ নীতির একটি মূল ধারা প্রকটিত এবং এটি হল: 'বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন'। জনগণের মধ্যে সহজে ধর্মীয় সংঘাত বাঁধানোর অনকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ঔপনিবেশিক শাসকরা বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা বদলে দিয়েছিল।

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে আগ্রায় অনুষ্ঠিত সমারোহ অভ্যর্থনায় (বা 'দরবারে') গভর্নর-জেনারেল ও ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের (১৮৫৬-১৮৬২) সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং 'স্বত্বলুপ্ত রাজ্যগুলি' (অর্থাৎ পুরুষ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী না থাকায় দখলীকৃত রাজ্যগুলি) সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতিবদলের প্রথম ঘোষণা শোনার জন্য রাজপুতানা সহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কিছু কিছু শাসক আমন্ত্রিত হয়েছিল। গোয়ালিয়রের রাজা সিন্ধিয়াকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরের বছর জায়গীরদারের ঊর্ধ্বতন সকল সামন্তই ব্রিটিশের প্রতি নির্বিশেষ আনুগত্যের শর্তে দত্তক গ্রহণের অধিকার পেয়েছিল। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কোন কোন রাজ্য সেগুলির প্রাক্তন রাজাদের মনোনীত দত্তকদেব কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়, যথা: তেউরি-গাড়োয়াল ১৮৫৯, কোলাপুর ১৮৬১ ও ধর ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে। ডালহৌসী কৃত 'স্বত্বলুপ্ত রাজ্যগুলির' নীতিত্যাগী বর্তমান ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত এইসব ব্যবস্থাবলী রাজন্যবর্গের বিষয়সম্পত্তি নির্বিঘ্ন ও অটুট রাখা সম্পর্কে মহারানী ভিক্টোরিয়া প্রদত্ত আশ্বাসকেই কার্যত বাস্তবায়িত করেছিল।

তাসত্ত্বেও ডালহৌসী কর্তৃক দখলীকৃত রাজ্যগুলির অধিকাংশ এলাকাই ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থেকেছিল। প্রসঙ্গত হায়দরাবাদের বেরার উল্লেখ্য। এটি 'চিরন্তন ইজারার' শর্তে ব্রিটিশের এলাকাভুক্ত হয়েছিল।

রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদের রাজসভার ব্যয় এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের দেয় নজরানার ফলে রাজ্যে প্রায়ই অর্থাভাব ঘটত এবং শাসকরা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবার ও বড় বড় মহাজনদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঋণগ্রহণে বাধ্য হত। ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্ববর্তী কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্যকে ব্রিটিশের এলাকাভুক্ত করার ব্যাপারে এই ঋণের সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। এখনকার অনুসৃত নতুন অভ্যন্তরীণ নীতির প্রেক্ষিতে আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ কর্মচারীদের অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ করা একটি নিয়ম হয়ে উঠেছিল।

অধীনস্থ রাজন্যবর্গের সঙ্গে 'গাজর' নীতি অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা

সামরিক ব্যাপারে তাদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অটুট রেখেছিল। রুশ পণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদ ই. প. মিনায়েভ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে মধ্যভারত ভ্রমণের সময় তাঁর 'ডায়েরিতে' রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ রেসিডেন্টরাই সর্বেসর্বা থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

রাজন্যবর্গের সৈন্যবাহিনী রাখার অধিকার অব্যাহত ছিল। এগুলি প্রথমত ও প্রধানত রাজ্যে সামন্তবিরোধী, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন দমনের জন্যই ব্যবহৃত হত। যথাযথ সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবগ্রস্ত এইসব সৈন্যবাহিনীর জন্য ঔপনিবেশিক শাসকদের আশংকার কোনই কারণ ছিল না। তদুপরি এই রাজারা ছিল ব্রিটিশের অনুগত সেবাদাস। কিন্তু এইসব রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্রিটিশ 'রেসিডেন্ট' ও 'রাজনৈতিক এজেন্টদের' গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য সেখানকার সৈন্যবাহিনীতে ইঙ্গ-ভারতীয় ইউনিট, এমন কি সৈন্যদলও থাকত। ব্রিটিশ গ্যারিসনগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখা হত ও তারা যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি পাহারা দিত।

রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বর্তমান দৃঢ়তর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি আসলে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ভাইসরয় কর্তৃক আয়োজিত গের এক বিশেষ সম্বর্ধনা সভায় ভিক্টোরিয়াকে ভারতের মহারানী ঘোষণার সময়কার দলিলেই সূত্রবদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ, রাজ্যগুলি এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই অংশ হয়ে উঠল এবং এগুলির শাসকরা কেবল কার্যতই নয়, আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্রিটিশ রাজের কাছে ব্যক্তিগত আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য ছিল।

ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে ব্রিটিশরা দেশটিকে কেবল 'ব্রিটিশ ভারত' ও কয়েক শ' 'দেশীয় রাজ্যেই' ভাগ করে নি, এগুলির প্রত্যেকটির জন্য প্রথমত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ও শেষে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তিমূলক অবস্থানও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। দেয় নজরানার পার্থক্য এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সরকার কর্তৃক প্রযুক্ত সামরিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রিক বৈষম্যের ফলে রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল। ছোট ছোট রাজ্যগুলি তাদের চেয়ে শক্তিশালী শাসকদের করদরাজ্য হিসাবে থাকার অব্যাহত নীতির ফলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অশেষ ভুল-বোঝাবুঝি ও বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব বিবাদ-বিসংবাদে সাধারণ মধ্যস্থ হিসাবে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ প্রভাববৃদ্ধির জন্য তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করত।

আলাদা আলাদা রাজারা বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে যথানিয়মে নিজেদের বিরোধিতা প্রকাশ করত ও ঔপনিবেশিক সরকারের উপর চাপসৃষ্টির প্রয়াস পেত। মধ্য-এশিয়া রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় এবং ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটার ফলে কোন কোন দেশীয় রাজা রাশিয়ার শাসকদের সঙ্গে তাশখন্দে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল (যেমন ১৮৬৫ ও ১৮৭০ খ্রীঃ কাশ্মীরের, ১৮৬৭ খ্রীঃ

ইন্দোরের, ১৮৭৯ খ্রীঃ গোয়ালিয়রের ও ১৮৮০ খ্রীঃ জয়পুরের রাজা)। কিন্তু প্রচেষ্টাগুলি জার-সরকারের সতর্কতামূলক অবস্থানের জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর কারণ, জার-সরকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করত।

ব্রিটিশ শাসনবিরোধী রাজাদের তখন ঔপনিবেশিক সরকার নানা অজুহাতে অপসারিত করত (১৮৭৫ খ্রীঃ বরোদার ও ১৮৮৯ খ্রীঃ কাশ্মীরের রাজা), কিংবা বিশেষ সুবিধাদানের মাধ্যমে তাদের 'শান্ত' রাখত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গোয়ালিয়র দুর্গটি গোয়ালিয়রের রাজাকে পুনরায় হস্তান্তর করা হয় এবং মহীশূরের স্থানীয় মহারাজা (ব্রিটিশ কর্মচারীদের দ্বারা অর্ধশতাব্দী শাসিত হওয়ার পর) পুনরায় রাজ্যলাভ করেন।

কিন্তু রাজন্যবর্গ ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মধ্যেকার সম্পর্ককে প্রভাবিত করার পক্ষে এসব বিচ্ছিন্ন মতানৈক্য ও সংঘাতের উল্লেখযোগ্য সত্যিকার কোন তাৎপর্য ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে করদরাজ্যের রাজা ও শক্তিশালী সামন্তদের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেষোক্তদের সঙ্গে মৈত্রী সম্প্রসারণ ও মজবুত করাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের নীতি ছিল। কৃষিসম্পর্ক এবং করাদানের ঔপনিবেশিক নীতিও অভিন্ন লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশ
(উনিশ শতকের ষাট থেকে নব্বইয়ের দশক)

উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে পুঁজিতন্ত্রের শেষপর্যায়, সাম্রাজ্যবাদে ব্রিটেনের উত্তরণের কতকগুলি কারণ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ক্রমশই স্পষ্ট হতে থাকে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অর্থনীতির এই পরিবর্তনগুলির ফলে ভারতের ঔপনিবেশিক অবদমন ও লুণ্ঠনের নতুন প্রকার ও প্রকরণ দেখা দেয়। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের শক্তিবৃদ্ধি ও শোষণ তীব্রতর করার উদ্দেশ্যেই উনিশ শতকের শেষার্ধে ব্যাপক ভূমিজরিপ ও ভূমিবন্দোবস্তের কার্যকলাপটি পরিচালিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ কৃষিনীতি। ভূমির ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক একচেটিয়া ব্যবস্থা

উনিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষে রায়তওয়ারি ও অস্থায়ী জমিদারি এলাকাগুলিতে নতুন ভূমিজরিপ ও খাজনা নির্ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজদলের সম্পত্তির অধিকার আসলে ব্যক্তিগত ভূমি-মালিকানার ভিত্তিতেই নিষ্পন্ন হয়েছিল।

এই শতকের প্রথমার্ধে শুরু হলেও এই সময়ই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারও সম্পূর্ণ হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক সরকার বিদ্রোহের এলাকাগুলিতে ভূমি-মালিকানার অধিকারের উপর বিশেষ নজর দিয়েছিল: অযোধ্যার ২৩,৫২২টি গ্রামের মধ্যে বিদ্রোহের সময় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ২৩,১৫৭টি গ্রাম সেখানকার তালুকদাররা ফেরত পেয়েছিল। ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বিশেষ আইনের মাধ্যমে জমিমালিক হিসাবে তাদের অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল।

জমিতে সামন্ত ভূস্বামীদের মালিকানা মজবুত করার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকার অবশ্য বিপ্লবের সক্রিয় শরিক, গ্রামীণ সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরগুলির স্বার্থরক্ষায়ও বাধ্য হয়েছিল। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের সময় মোড়ল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলি ও অযোধ্যার 'ইনামদাররা' কৃষক ও জমিদারদের (জমিদার ও তালুকদার) মধ্যেকার সামন্ত উপমালিক-মধ্যগ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

বিভিন্ন সামন্তদলের মধ্যে সম্পত্তি খণ্ড-বিখণ্ড করার ব্যবস্থা অংশত অটুট রেখে ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক সরকারের সামাজিক ভিত প্রসার ও মজবুতের প্রয়াস পেয়েছিল।

ঔপনিবেশিক সরকারের কৃষিনীতি ছিল অসঙ্গতিজীর্ণ। এটি একদিকে আঠারো শতকের শেষপর্ব থেকে ভূমিরাজস্ব সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে ভূমি-মালিকানায় গোষ্ঠীগত বিন্যাস ও ব্যবহার ভেঙ্গে দিয়ে সামন্ত ও ক্ষুদ্র কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা পোক্ত করেছিল (পরবর্তীকালে রায়তওয়ারি এলাকাগুলিতে)। অথচ পক্ষান্তরে, ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার মধ্যে জমির রাষ্ট্রীয় মালিকানার জের টিকিয়ে রেখে এবং জমির কার্যকর ব্যবহারের উপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ (স্পষ্টত এটিই ছিল উনিশ শতকের পঞ্চাশ থেকে আশির দশকগুলির প্রজাস্বত্ব আইনের উদ্দেশ্য) করে সামন্ত মালিকানা ভেঙ্গে পড়ার আসন্ন শেষপর্যায়ে ভারতের কৃষিকাঠামোকে আটকে রাখা হয়েছিল।

'জমিদারি' ধরনের সামন্ত ভূমি-মালিকানা মজবুত করে ঔপনিবেশিক সরকার পঞ্জাবে প্রাক্তন গ্রামীণ সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরের স্বার্থরক্ষায় বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ সেখানকার সামন্ত ভূস্বামীদের ঊর্ধ্বতন স্তরগুলি (যথা, 'তালুকদার' ও 'আলা-মালিক') সরকারের পেন্সনভোগী হয়ে ওঠে। খাজনার সুবিধাভোগী সামন্ত ভূস্বামীদের মালিকানার অধিকার নিষ্পত্তির পর, এমন কি তাদের জমিদারির আয়তনও কমান হয়েছিল (জায়গীরদার ও ইনামদারদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত)।

জায়গীরদাররা কোন কোন প্রদেশে ইনামদারদের মতো আইনসম্মত জমি-মালিক হয়ে উঠেছিল, তারা কম হারে খাজনা দিত (যথা, বোম্বাই ও বেরার প্রদেশে)। ব্রিটিশের উদ্যোগেই সিদ্ধুতে শর্তাধীন অনুদানপ্রাপ্ত প্রাক্তন

জায়গীরদারদের মালিকানাস্বত্ব তাদের আওতাধীন জমির ক্ষেত্রে এবার স্থায়ী হয়ে উঠল। কিন্তু অধিকাংশ জায়গীরদার এবং অন্য কয়েক ধরনের সামন্তবর্গ ও ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের শরিকানা থেকে ক্রমে ক্রমে বহিষ্কৃত হয়েছিল। তদুপরি ইনাম ও জায়গীর সম্পর্কে তদন্তকারী কমিটিগুলির কার্যশেষে কিছুসংখ্যক ইনামদার ও জায়গীরদার তাদের ভূমি ও অর্থের অনুদান হারিয়েছিল। যেসব অঞ্চলে ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানে ঔপনিবেশিক সরকার সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ফলত, ঔপনিবেশিকরা নিজেদের অবস্থান অধিকতর নিরাপদ ভেবেছিল (পঞ্জাব, সিন্ধু, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত) সেখানেই এটি প্রযুক্ত হয়েছিল। শাসকবর্গ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ইনাম ও জায়গীরের সংখ্যা বিশেষভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। ইনামদার ও জায়গীরদারদের আওতাধীন জমির পরিমাণ কমানোর জন্যই প্রধানত উনিশ শতকের শেষ ত্রিশ বছর মরাঠী ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর জমি-মালিক ও তাদের শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবিদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ ও বিরোধিতা প্রকটিত ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা কেবল ভূস্বামীদের বড় বড় জমিদারিগুলি অটুট রাখার একক কাজেই নিজেদের সীমিত রাখে নি। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ এলাকায়ই ভূমি-মালিকানার অধিকার কেবল জমিদার ও তালুকদারদের মতো পুরনো সামন্ত অভিজাতদের প্রতিনিধিদেরই নয়, তথাকথিত 'মালগুজারদের' মতো তহশীলদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও দেয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ বিজয়ের আগে এদের অধিকাংশই ছিল গ্রামসমাজের মোড়ল বা তহশীলদার। অর্থাৎ, ভারতের এই অংশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা সামন্তযুগে পুরোপুরি ভূমির অধিকারহীন একটি শ্রেণীর মধ্য থেকে ভূমি-মালিকদের একটি নতুন স্তর সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগাচ্ছিল। তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে জমির ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক একচেটিয়া মালিকানা একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছিল।

কাঁচামালের উৎস এবং পণ্যবিক্রয়ের বাজার হিসাবে ভারত-শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি। পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্কের বিকাশ

ব্রিটিশ কৃষিনীতি কেবল ঔপনিবেশিকদের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে ভারতের সামন্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থান মজবুতির প্রয়োজনেরই নয়, ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সংগঠিত পরিবর্তনগুলিরও শর্তাধীন ছিল। উনিশ শতকের সেই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকগুলিতেই কাঁচামালের উৎস ও পণ্যবাজার হিসাবে ভারত-শোষণ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের প্রধান রূপ হয়ে উঠেছিল। কৃষিজাত ও কাঁচামাললগ্ন সামগ্রীর ক্ষেত্রে পুঁজিতান্ত্রিক ব্রিটেনের উপাঙ্গস্বরূপ এই দেশের

তীব্রতর শোষণের জন্য কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূলতর পরিস্থিতি সৃষ্টি, বিশেষত এর বিক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য ছিল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার মজবুতি ছিল এর অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতকে ব্রিটেনের কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনের উপাঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলার কাজটি প্রধানত শেষ হয়েছিল। 'বিশ্বের কর্মশালা' হিসাবে ব্রিটেনের ভূমিকার ক্রমাবনতির ফলে এবং আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ায় (যে-চৌহদ্দিতে প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ব্রিটেনের ক্ষমতা কেন্দ্রিত ছিল) জার্মান ও ফরাসীদের প্রাধান্য ঘনীভূত হওয়ায় ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারতের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে তুলার বাজারে চড়া-ভাব দেখা দিলে প্রক্রিয়াটি ত্বরিত হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারত থেকে কাঁচামাল, বিশেষত তুলা রপ্তানি প্রচুর বৃদ্ধি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের (১৮৬২-১৮৬৫) ফলে ইউরোপীয় বাজারে মার্কিন তুলার রপ্তানি কমে গেলে সেখানে ভারতীয় তুলার চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছিল। ১৮৬০-১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে ব্রিটেনের তুলা আমদানির পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ভারত তখন থেকে ব্রিটেনের প্রধান তুলা সরবরাহকারী দেশ হয়ে ওঠে।

রপ্তানির চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই ভারতে তুলা উৎপাদনে সমারোহ দেখা দেয়। গত শতকের ষাটের দশকে মধ্য ও পশ্চিম ভারত (বোম্বাই, সিন্ধু, রাজপুতানা, মধ্যভারতের বহু এলাকা, বেরার, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ) রপ্তানিযোগ্য তুলা উৎপাদনের বিশেষীকৃত অঞ্চলে পরিণত হয়।

মার্কিন দেশে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটলে তুলার চড়া-বাজার স্বাভাবিক হয়ে আসে। এমতাবস্থায় ভারতের তুলার দামও কমে যায়, কিন্তু দেশে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি তখনো অব্যাহত থাকে। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে, বিশেষত জলসেচকৃত এলাকাগুলিতে তুলার নতুন নতুন আবাদ গড়ে ওঠে। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি আসলে ব্রিটিশ প্রসেসিং শিল্প ও ভারতের কৃষির মধ্যে, ব্রিটিশ শহরগুলি ও ভারতের গ্রামগুলির মধ্যে বর্ধমান শ্রমবিভাগকেই প্রকটিত করেছিল।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ভারত থেকে অধিকতর পরিমাণে কৃষিজাত সামগ্রী আমদানি শুরু করে। এতে ছিল প্রধানত তুলা, পশম, পাট, নারকেলের আঁশ, চাল, গম, তৈলবীজ, মশলা, নীল ও আফিম। ভারতীয় রপ্তানির প্রধান অংশই (যেমন তুলার ৮০ শতাংশ) যেত ব্রিটেনে। ভারত তখন ব্রিটেনের প্রধান খাদ্য সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠছিল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই শতকের শেষ নাগাদ ব্রিটিশরা ভারত থেকে বার্ষিক তিনগুণ পরিমাণ মূল্যের পণ্য আমদানি করত।

পণ্যবাজার হিসাবেও ভারতের শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ব্রিটেন থেকে ভারতের আমদানি পাঁচগুণ হয়ে উঠেছিল। এতে ছিল প্রধানত বস্ত্র, ধাতব তৈজস ও অন্যান্য ধরনের ভোগ্যপণ্য।

নিম্নোক্ত হিসাবগুলির মধ্যেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আবর্তনের ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যটি সহজলক্ষ্য: ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতের মোট রপ্তানি ও আমদানিতে তৈরী-সামগ্রীর অংশভাগ ছিল যথাক্রমে ৮ ও ৬৫ শতাংশ। ইতিমধ্যে ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থার অন্তর্গত দেশের মেহনতিদের, বিশেষত কৃষককের রক্তচোষা, পঙ্গুকারী করসমূহের ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি গ্রামে নতুন কর প্রবর্তন করা হয় এবং ভূমিরাজস্বের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে খোদ ঔপনিবেশিক কর্মচারীরাই স্বীকার করে যে, জমিমালিকদের কাছ থেকে খারাপ বছরেও ভাল বছরের মতোই সমান খাজনা আদায় করা চলত।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজস্বের মূল উৎস, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৩৬·১ কোটি টাকা থেকে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ৮৫·৯ কোটি টাকায় পেঁছয়। করভার বৃদ্ধির মধ্যেই দেশটির কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনের উপাঙ্গ হয়ে ওঠার ব্যাপারটি সহজলক্ষ্য। কর ভারতীয় কৃষকদের নিজ উৎপন্নের একটি বড় অংশ বিক্রয়ে বাধ্য করেছিল। ফলত, ব্রিটিশদের পক্ষে এদেশ থেকে কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানির সহজ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

তৎকালীন বিশ্ব শস্যবাণিজ্যের বর্ণনায় মার্কস দেখিয়েছেন যে, রাশিয়া ও ভারতে কৃষকরা 'নির্মম ও অত্যাচারী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রায়শ নির্যাতনের মাধ্যমে নিঙড়ে নেওয়া করের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের উৎপন্নের একাংশ বিক্রয়ে বাধ্য হত এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল।'*

অর্থাৎ, নবযুগের প্রাক্কালে ঔপনিবেশিক শোষণের পুরনো পদ্ধতি নতুন লক্ষ্যে, দেশে ব্রিটেনের নিজের চাহিদা পূরণের জন্য কাঁচামাল নিষ্কাশনে অভিযোজিত হচ্ছিল।

কাঁচামালের উৎস ও শিল্পপণ্যের বাজার হিসাবে ভারতের তীব্রতর শোষণ— এদেশের শহর ও গ্রাম উভয়তই পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্ক বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী তখনো গঠনমূলক পর্যায়ে থাকায় সরল পণ্যোৎপাদনের বিকাশ কৃষি-উৎপাদনে ও কুটিরশিল্পে বাণিজ্যিক ও তেজারতি পুঁজির গভীরতর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল।

সামন্তযুগের বাণিজ্য ও তেজারতির ব্যাপারে একচেটিয়া (বানিয়া, মাড়ওয়ারী ইত্যাদি), ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এখন একটিমাত্র ফসল (মনোকালচার) উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে, বিশেষত পঞ্জাব এবং পশ্চিম ও মধ্যভারতে বসবাসের উদ্যোগ গ্রহণ করল। ভারতীয় বণিক ও মহাজনদের সংবহনকৃত পুঁজি ভারতের পণ্যাবর্তন প্রণালীর—শক্তিশালী ব্রিটিশ বা ভারতীয় পাইকারদের আমদানি-রপ্তানি থেকে ভোক্তা ও উৎপাদক—ভারতীয় কৃষক ও কুটিরশিল্পীদের মধ্যে অধস্তন ও মধ্যম পর্যায়ের সংযোগ সৃষ্টি করেছিল।

ভারতীয় বণিক ও মহাজনদের সঞ্চিত অর্থপুঁজির দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলশ্রুতি হল: একদিকে জনগণের ভূমি-মালিক অংশের মধ্যে বণিক ও মহাজন সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তর্ভুক্তি, অন্যদিকে জাতীয় শিল্পগঠনের পূর্বশর্তের উন্মেষ।

কৃষকদের বর্ধমান ঋণ ও ভূমিহীনতা

সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৮৫৯) শুরু হওয়ার আগেই রায়তওয়ারি এলাকাগুলিতে ভূমিজরিপ ও করনির্ধারণের কাজ ষাটের ও সত্তরের দশকে শেষ হয়ে গিয়েছিল। করনির্ধারণের জন্য এই নতুন জরিপের সময় রায়তদের ব্যক্তিগত ভূমি-মালিকানার অধিকার শেষপর্যন্ত স্থায়ী করা হয়েছিল।

দ্রুত পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্ক উন্নয়নের পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ভূমি-মালিকানার অধিকার মজবুতি আসলে ভূমির মূল্যধারী হওয়ার এবং ক্রমাগত অধিক পরিমাণে বাজারের পণ্যসংবহনের আওতাধীন হওয়ারই নামান্তর। এভাবে জমির দর দ্রুত বেড়ে যায় এবং এটি কৃষি-উৎপাদের সাধারণ দরবৃদ্ধিকে অতিক্রম করে। অনুন্নত পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের প্রেক্ষিতে ভূমিক্রয় অতঃপর বণিক, মহাজন ও সামন্তদের পক্ষে তাদের সঞ্চিত অর্থলগ্নির অনুকূলতম পথ হয়ে ওঠে।

এভাবে জমি ক্রমেই মহাজনদের ঋণের সেরা জামিন হয়ে ওঠায় জমিবন্ধক গ্রহণের মাধ্যমে বণিক, মহাজন ও সামন্ত ভূস্বামীরা কৃষকদের জমিদখলে সমর্থ হয়েছিল।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে উনিশ শতকের চল্লিশ সাল থেকে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের বছরগুলিতে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি ‘অকৃষিজীবীদের’ আওতাধীন হয় এবং জমিতে এদের অংশভাগ ১০ থেকে ২৭ শতাংশ অবধি বৃদ্ধি পায়। পঞ্জাবে ষাট ও সত্তর দশকের গোড়ার দিকে মোট বিক্রীত জমির ৪৫ শতাংশই বণিক ও মহাজনদের কুক্ষিগত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে বিশেষভাবে কৃষকদের এই ভূমিচ্যুতি মারাত্মক পরিসর পেয়েছিল এবং সেখানকার

সাতারা জেলায় আশির দশকের শেষের দিকে মোট খেতজমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই মহাজনরা দখল করেছিল।

এজন্যই রায়তওয়ারি এলাকাগুলিতে ও পঞ্জাবে সামন্ত ধরনের জমিদারদের সঙ্গে নতুন জমি-মালিকরা প্রধানত বণিক ও মহাজন সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।

মহাজন, বণিক ও জমিদারদের কাছে জমি হস্তান্তরের ফলে ভারতীয় কৃষির অর্থনৈতিক ভিত্তি কিন্তু মোটেই বদলায় নি। কখনো নিজ খেতের মালিকানা হারিয়ে সেটিই চাষবাস করা, কখনো বা প্রজা হিসাবে করভারাক্রান্ত থাকা অতঃপর কৃষকের নিয়তি হয়ে উঠেছিল। কৃষকদের কাছে জমি-বন্দোবস্তের পরিমাণ এবং রায়ত-চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ভূমিরাজস্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল: ১৮৮১-১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে তখন সামন্ত ভূস্বামীদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষে পেশছেছিল।

উনিশ শতকের চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকগুলিতে, বিশেষত সিপাহী বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭-১৮৫৯) কৃষকদের বর্ধমান অসন্তোষের প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিকরা বিদ্রোহের পরবর্তী তিন দশকে বাংলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলি, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশগুলিতে জমিদার-রায়ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছিল। এইসব আইনের ফলে কেবল বেশি সুবিধাভোগী একদল রায়ত-চাষীর উপর থেকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ নামমাত্র কমেছিল। অবশ্য, কার্যত জমি-মালিকরা কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উৎপন্ন অর্ধেক বা ততোধিক পরিমাণ ফসলের সমান মূল্যের খাজনা দাবি করত। তদুপরি সামন্ত ভূস্বামীদের বহুবিধ সেবামূলক কাজে বেগার খাটতেও রায়তরা বাধ্য ছিল।

ভারতীয় কৃষকদের অসন্তোষ কমানোর জন্য গৃহীত ঔপনিবেশিক প্রজাস্বত্ব আইন কার্যত এদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ প্রণালীকেই অধিকতর পাকাপোক্ত করেছিল। অবশ্য, এইসঙ্গে রায়ত-চাষীদের ঊর্ধ্বতন স্তরের দখলীস্বত্বের মজবুতি এবং ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে এই অধিকারগুলির রূপান্তর, খাজনা বৃদ্ধির উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ এবং দ্রব্যসামগ্রীর বদলে অর্থ দ্বারা খাজনাশোধে উৎসাহদান ইত্যাকার ব্যবস্থার ফলে এক ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের উন্মেষ ঘটছিল। কৃষকদের মূল অংশের বর্ধমান নিঃস্বতার পরিস্থিতিতে উপরোক্ত ঘটনার ফলে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীগত স্তরায়ন সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল।

ধনী কৃষক ও অর্থপুঁজির মালিক কর্তৃক ভূমিক্রয় ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশের প্রশস্ততর সম্ভাবনা গড়ে তোলায় সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজের সেইসব দিন থেকে তখনো অব্যাহত কৃষকদের সম্পত্তিগত বৈষম্য

স্বীয় বিকাশের একটি নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি পেয়েছিল। সামন্ত সমাজের মজ্জাগত অসঙ্গতির পরবর্তী তীব্রতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের অনুসৃত ঔপনিবেশিক শোষণের নতুন পদ্ধতি, অর্থাৎ পুঁজিরপ্তানি ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর বিকাশ ত্বরিত করেছিল।

ব্রিটিশ পুঁজিলগ্নির ক্ষেত্র: ভারতবর্ষ

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে ব্রিটিশ পুঁজিলগ্নি শুরু হয়েছিল। রেলপথই হল এদেশে ব্রিটিশের লগ্নির প্রথম উল্লেখ্য নজির। কাঁচামালের উৎস এবং পণ্যবাজার হিসাবে ভারত-শোষণের জন্য তখন যোগাযোগ ও পরিবহণের আধুনিক উপায়গুলি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য ১,৩০০ কিলোমিটার থেকে ২৫,৬০০ কিলোমিটারে পেঁছেছিল। প্রধান বন্দরগুলি থেকে দেশের ছড়ানো এবং দেশে ব্রিটিশের প্রধান ঘাঁটিগুলির সঙ্গে যুক্ত রেলপথের আসলে সামরিক ও স্ট্রাটেজিক বিবেচনা প্রভাবিত ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের দ্বারা দেশের অব্যাহত দাসত্ব ও শোষণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই রেলপথের নকশা তৈরি হয়েছিল। মালবহনের ভাড়ার জন্য নির্ধারিত মাসুল-ব্যবস্থার মধ্যেই এটি সহজলক্ষ্য। অভ্যন্তরীণ এলাকা সংযোগকারী লাইনের মাল ভাড়া ছিল অভ্যন্তরের সঙ্গে বন্দর যোগাযোগকারী লাইনের ভাড়ার চেয়ে বেশি। রপ্তানির লক্ষ্যে উন্নীত এই পরিবহণ দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসংবহনের বিকাশ ব্যাহত করেছিল। রেলপথ ছিল তিন ধরনের: প্রশস্ত, মধ্যম (মিটার) ও সংকীর্ণ। এতে পথসন্ধিতে মালপত্র গাড়িবদল করাতে হত এবং সেজন্য দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছিল। অথচ অন্যভাবে এটি এড়ানো চলত।

ঔপনিবেশিক সরকার তাদের যথার্থ ব্যয় নির্বিশেষে কোম্পানিগুলিকে সর্বোচ্চ মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ফলে রেলপথ নির্মাণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কাছে নিয়মিত 'স্বর্ণখনি' হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ঠিকাদারদের অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্যের মাসুল দিয়েছিল ভারতীয় জনগণ তাদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে।

ব্রিটিশ পুঁজিলগ্নির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল জলসেচ প্রকল্প। এগুলি রপ্তানিযোগ্য ফসলচাষের এলাকায় নির্মিত হয়েছিল (যেমন রপ্তানিযোগ্য তুলা ও গম চাষের প্রধান এলাকা সিন্ধু ও পঞ্জাবে)। জল-কর বসিয়ে ব্রিটিশরা শুধু কৃষকদের খরচায় তাদের লগ্নিই আদায় করে নি, প্রভূত মুনাফাও কামিয়েছিল।

জলসেচ প্রকল্প ও রেলপথ যথানিয়মেই ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে এদেশের আবাদগুলি ব্যক্তিগত পুঁজিলগ্নির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতে চা, কফি ও রবার চাষের জন্য উপযোগী জায়গা অনুকূল শর্তে বিক্রি বা বন্ধকের সুযোগ দিয়ে খামারীদের উৎসাহ যুগিয়েছিল।

কারখানা নির্মাণ এবং খনিতেও ব্রিটিশরা পুঁজিলগ্নি করেছিল। (যথাক্রমে কলিকাতায় ও কানপুরে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের চটকল ও বস্ত্রকল ছিল।) রেলপথের বিস্তার এই ধরনের প্রকল্প নির্মাণে নতুন উদ্দীপনা যুগিয়েছিল: কয়লা ও ধাতু যথাক্রমে অপরিহার্য ছিল ইঞ্জিন ও রেলের জন্য। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ব্রিটিশ মালিকানাধীন একটি ছোট ধাতুশিল্প কর্মশালা কলিকাতায় চালু হয়েছিল আর জ্বালানি হিসাবে কয়লাও সেখানকার খনি থেকেই উত্তোলিত হত। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রেলপথ চালু রাখার জন্য একটি মেরামতি কারখানা, ছোট লোহাঢালাই কারখানা এবং খুচরো যন্ত্রাংশ নির্মাণের কারখানা তৈরিও অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী ধারার (পুঁজি আমদানি এবং কাঁচামালের বর্ধমান রপ্তানি) শোষণের উপকরণ হিসাবে ভারতবর্ষকে ব্যবহারের উদ্যোগ হল ঐতিহাসিক অনিবার্যতারই এক ফলশ্রুতি। তাই লেনিনের ভাষায়: 'উনিশ শতকের মাঝামাঝি গ্রেট ব্রিটেনে সাম্রাজ্যবাদের দুটি প্রকট বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল— বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বিশ্ববাজারে একচেটিয়া অবস্থান।'*

কর, তৈরীপণ্য আমদানি, কাঁচামাল রপ্তানি ইত্যাকার ঔপনিবেশিক শোষণের সকল প্রণালী ব্যবহারক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই বন্দী দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ঔপনিবেশিক 'ভেট' নিঙড়ে নিচ্ছিল যার বার্ষিক পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ কোটি পাউন্ড। প্রসঙ্গত ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে ভারত প্রসঙ্গে মার্কসের একটি উক্তি স্মরণীয়: 'খাজনা, খোদ ভারতীয়দের কাছে একান্তই নিষ্প্রয়োজন রেলপথের ডিভিডেন্ট, সামরিক ও প্রশাসনিক রাজকর্মচারীদের পেন্সন, আফগান ও অন্যান্য যুদ্ধের খরচা ইত্যাদি বাবদ ইংরেজরা প্রতি বছর ভারতীয়দের কাছ থেকে যা কেড়ে নেয়, প্রতি বছর **খোদ** ভারতে তারা যা আত্মস্থ করে **সে-কথা না তুলেও একেবারে বিনা তুল্যমূল্যেই,** একতরফাভাবে তারা যা ওদের কাছ থেকে নেয় — অর্থাৎ শুধু যে-পণ্যগুলি ভারতীয়রা প্রতি বছর ইংলন্ডে **বিনামূল্যে পাঠাতে** বাধ্য হচ্ছে কেবল **তার মূল্যই ভারতের ৬ কোটি কৃষি ও কারখানা-মজুরের মোট আয়ের চেয়ে বেশি!** এটি একটি হিংস্র রক্তশোষণ প্রক্রিয়া! একের পর এক

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 22, p. 283.

সেখানে আসে দুর্ভিক্ষের বছর এবং এগুলির পরিসর ক্রমেই ব্যাপকতর হয়ে ওঠে, অথচ সে-সম্পর্কে ইউরোপীয়দের আজও কোন ধারণা নেই।'*

ভারতীয় জাতীয় পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থার বিকাশ

ভারতে গড়ে ওঠা বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থাগুলি (কারখানা, রেলপথ, আবাদ) ভারতের জাতীয় পুঁজিতন্ত্র বিকাশে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। বণিক ও মহাজনদের সামনে সম্প্রতি উন্মুক্ত বিস্তৃততর সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে দেশে অর্থ-পুঁজি সঞ্চয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ভারতীয় বণিকরা মধ্যগ বা মুৎসুদ্দীর কাজের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিল।

শ্রমবাজারও ঠিক এই সময়ই গড়ে উঠতে শুরু করে। বিধ্বস্ত কুটিরশিল্পী এবং নিঃস্ব কৃষকদের নিয়েই আবাদ, নির্মাণকার্য, প্রথম কারখানা ও বস্ত্রকলের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম বাহিনীটি গড়ে উঠেছিল।

অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর দুটি মুল শর্ত পূর্ণ হয়েছিল: উৎপাদন-উপায়হীন 'মুক্ত' মেহনতির আবির্ভাব এবং পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ের (ভারতীয় বণিক ও মুৎসুদ্দীদের সঞ্চয়) সমাপ্তি।

ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ দুটি সমান্তরাল ধারা অনুসরণ করেছিল। প্রাক্তন কারিগরদের কর্মশালার ভিত্তিতে পুঁজিতান্ত্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থা দেখা দিচ্ছিল এবং এটি চূড়ান্ত ধরনের শোষণ সহ (মহাজনের বজ্রমুষ্টির সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীর সমাবদ্ধ এবং উচ্চবর্ণ দ্বারা নিম্নবর্ণের উপর স্বৈরাচারিতার মাধ্যমে) আমদানীকৃত বা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সস্তা অর্ধনির্মিত পণ্যের সাহায্যে বড় বড় কারখানার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত। মিলের তৈরি সুতার ভিত্তিতে ম্যানুফ্যাকচারিং কাঠামোর মধ্যে হস্তচালিত তাঁতের পুনর্জন্ম ঘটেছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে (বিশেষত, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে) বিশেষীকৃত কুটিরশিল্পের বড় বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে আদমশুমারি অনুযায়ী কুটিরশিল্পে কর্মরতদের সংখ্যা ছিল ৪·৫ কোটি (সপরিবারে)। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে এইসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিযুক্ত মেহনতিরা বস্ত্রকলের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি সুতা ব্যবহার করত।

কারিগরদের সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মশালার মালিক ও মজুররাও ঔপনিবেশিক জোয়ালের চাপ তীব্রভাবেই অনুভব করছিল। একই ধরনের পণ্যোৎপাদী ব্রিটিশ সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে সঙ্গে এদের দুর্ভার কর ও ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের নির্মম ব্যবহার সহ্য করতে হত।

কৃষকদের পর শহর ও গ্রামের কারিগর সম্প্রদায়, কর্মশালা ও ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানার মজুর, ক্ষুদ্র মনিব ও বণিকদের নিয়েই ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি গঠিত হয়েছিল।

হস্তশিল্পভিত্তিক এইসব সংস্থাগুলি ছাড়াও উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের উন্মেষ দেখা দেয় ও বোম্বাই তখন দেশের বৃহদায়তন শিল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বোম্বাইয়ের বণিক ও মুৎসুদ্দীরা ব্যবসার মাধ্যমে যথেষ্ট পুঁজিসঞ্চয় করেছিল (এদের অধিকাংশই ছিল পারসী বণিক এবং মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়)। এরা ব্যাপকভিত্তিক লেনদেন চালাত এবং আফিমের ব্যবসার মধ্যগ হিসাবে শুধু চীনেরই নয়, পুরো দূর প্রাচ্যের বাজারগুলি সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। উনিশ শতকের চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকগুলিতে বোম্বাইয়ের বড় বড় ব্যবসায়ী পরিবারগুলি ব্রিটেনে তাদের প্রতিনিধি রেখেছিল এবং সরাসরি বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিল।

এমতাবস্থায় বোম্বাইয়ের বণিকরা সুতাকল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ শতকের আরম্ভকাল অবধি এগুলি প্রধানত চীন ও দূর প্রাচ্যের অন্যান্য বাজারের জন্য সুতা উৎপাদন করত।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম সুতাকলের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে এর দ্বিতীয় কলটি তৈরি হয় দেশের ভাবী দ্বিতীয় বৃহত্তম বস্ত্রশিল্পকেন্দ্র আহ্মদাবাদে।

উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাও এদেশে বস্ত্রকল (বোম্বাই এবং কানপুর) তৈরি করে। অবশ্য কলিকাতা ও এর শহরতলীতে ঘনীভূত চটকলগুলিই ছিল ব্রিটিশ ব্যক্তিগত পুঁজির রক্ষাপ্রাচীর। তদুপরি ব্রিটিশ পুঁজির ভিত্তিতে কৃষিজাত কাঁচামালের প্রসেসিংলগ্ন অনেকগুলি সংস্থাও গড়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বৃহদায়তন উৎপাদনে (অর্থাৎ, কারখানা ও আবাদে) শেয়ারের দুই-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশদের এবং এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয়দের হস্তগত ছিল। এতেই ভারতে বৃহদায়তন ব্রিটিশ পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থার প্রাধান্য সহজলক্ষ্য।

নতুন শ্রেণীসমূহের উদ্ভব এবং জাতীয় অসঙ্গতির তীব্রতা বৃদ্ধি

পুঁজিতন্ত্র বিকাশের অনুষঙ্গ হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীরও উন্মেষ ঘটেছিল। বৃহদায়তন শিল্পের অসম বিকাশের ফলে দেশের সর্বাধিক উন্নত প্রদেশগুলিতে,

বোম্বাই ও বাংলায় এগুলি ঘনীভূত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বৃহদায়তন শিল্প, রেলপথ ও খনিতে কর্মরত মজুরের মোট সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষে পৌঁছেছিল। এদের অধিকাংশই ছিল বস্ত্রকলের শ্রমিক।

ভারতীয় শ্রমিকদের বসবাস ও কাজের পরিস্থিতি ছিল খুবই মারাত্মক। কারখানা-শ্রমিকের মজুরি এতই কম ছিল যে একজন মজুরের পক্ষে পরিবার ভরণপোষণ সাধ্যাতীত হয়ে উঠত। বৃহদায়তন শিল্পের প্রথম দশকগুলিতে কেন সেখানকার মজুরদের অধিকাংশই গ্রামের ছোট ছোট জমি-মালিক বা ইজারাদার ছিল, এতেই তার ব্যাখ্যা মেলে। অভিন্ন কারণেই কারখানা ও খনিতে নারী ও শিশুদের শ্রম এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের সঙ্গে শ্রমিকরা আবার নানা ধরনের অনর্থনৈতিক নির্যাতন এবং ঋণের পীড়ন ভোগ করত।

উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে ভারতীয় কারখানাগুলিতে সপ্তাহিক কার্যদিনের পরিসর ছিল ৮০ ঘণ্টা (ব্রিটেনের ৫৬ ঘণ্টার সঙ্গে তুলনীয়)। কার্যদিনও ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ, ১৬ ঘণ্টা। কারখানায় কোন বিজলীবাতি না থাকায় কার্যদিন আরম্ভ হত সূর্যোদয়ের পনেরো মিনিট আগে আর শেষ হত সূর্যাস্তের পনেরো মিনিট পরে।

ভারতীয় শ্রমিকদের এই চূড়ান্ত শোষণের মাধ্যমেই প্রধানত দেশীয় কারখানার মালিকরা বাজারে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের মুকাবিলায় সক্ষম হয়েছিল।

উৎপাদনী খরচা বাড়িয়ে ভারতীয়দের চেয়ে অধিকতর সুবিধালাভে উদ্যোগী ব্রিটিশ বস্ত্রকলের মালিকরা ব্রিটেনের পার্লামেণ্টে তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতে কারখানা-আইন প্রবর্তনের দাবি জানাতে থাকে। কেবল ভারতীয় কারখানা মালিকরাই নয়, বৃহদায়তন ভারতীয় কারখানার কিছুসংখ্যক ব্রিটিশ মালিকও এর বিরোধিতা করেছিল। আইনটি গৃহীত হলেও ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের মাত্রার কোনই উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটে নি। ১৮৮১ ও ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের আইনানুযায়ী যথাক্রমে শিশু-শ্রমিকের সর্বনিম্ন বয়স ৭ ও ৯ বছর নির্ধারিত হয়েছিল। এইসব আইন শিশু ও তরুণদের জন্য কার্যদিনও সীমিত করেছিল। যথাযথভাবে অপ্রযুক্ত উক্ত আইনগুলিই ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর মারাত্মক দুরবস্থার ছবি স্পষ্ট করে তোলে।

ভারতে বিকাশমান জাতীয় শিল্পের জন্য নিজস্ব একচেটিয়া ব্যবস্থার দৌলতে উচ্চমূল্যে সাজসরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহক্রমে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা প্রভূত 'ভেট' আদায় করেছিল। ইঞ্জিনিয়র ও কৃৎকৌশলীদের জন্য এখানে ব্রিটেনের চেয়ে যথেষ্ট বেশি বেতন দাবি করা হত। পুনর্বার ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে অধিকতর শোষণের মাধ্যমেই এই বাড়তি চাহিদা মেটানো হত এবং এরা

দুদুটি শোষণের, ভারতীয় ও বিদেশী বুর্জোয়াদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছিল।

ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা সম্ভাব্য সর্বত্রই এদেশের স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্রকল-মালিকদের উদ্যোগে ভারতে আমদানীকৃত কাপড়ের উপর থেকে শুল্ক বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী, ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের নবগঠিত এই শিল্পের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আমদানীকৃত সকল ব্রিটিশ পণ্যকেই শুল্কমুক্ত করা হয়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে আর্থিক কারণে কাপড়ের উপর পুনরায় শুল্ক প্রবর্তিত হলেও এইসঙ্গে ভারতে ব্যাপকভিত্তিতে উৎপন্ন কাপড়ের উপর অন্তঃশুল্কও বসান হয়।

সুসংগঠিত ঋণব্যবস্থার অভাব ভারতীয়দের জন্য খুবই বড় বাধা হয়ে উঠেছিল। ভারতস্থ ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান, ব্রিটিশ বাণিজ্য কোম্পানি ও শিল্পসংস্থাগুলিকেই কেবল ঋণসুযোগ দিত এবং প্রধানত বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকেই লক্ষ্য রাখত। এমতাবস্থায় ভারতীয় কারখানার মালিকরা তথাকথিত ম্যানেজিং এজেন্সি, বড় বড় ব্রিটিশ একচেটিয়া সংস্থার শাখাগুলির উপরই নির্ভরশীল ছিল। এইসব এজেন্সি অপরিহার্য ঋণ ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করত এবং কারখানা চালু হলেই তারা প্রায়ই কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপন্ন পণ্যের বাজারের ব্যবস্থা সহ এটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করত। ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি সুদ হিসাবে ভারতীয় মালিকদের মুনাফা থেকে বড় অঙ্কের অর্থ পেত।

কৃষিতে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জের এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পে বাণিজ্যিক তেজারতি পুঁজির অব্যাহত প্রাধান্যের জন্য এদেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল।

শ্রেণী হিসাবে তরুণ ভারতীয় বুর্জোয়ারা একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হয়েছিল। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সহ এই নির্যাতন এবং বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে পাওয়া অনুরূপ অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতে এবং কৃষি ও কুটিরশিল্পেই সবচেয়ে বেশি অনুভূত হত।

ঔপনিবেশিক, সামন্ত, বণিক ও মহাজনদের শোষণের ফলে কৃষক, কারিগর ও মেহনতিরা ব্যাপকভাবে দরিদ্র হয়ে পড়েছিল এবং অজন্মার বছরে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দারিদ্র্য কেবলই বেড়ে চলত। ১৮২৫ ও ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দুদুবার ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ৪ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। তারপর ১৮৫০-

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ৬ বার, কিন্তু ১৮৭৫-১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ১৮ বার দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে শেষে ২·৬ কোটিতে পৌঁছয়।

সামন্ত ও মহাজনদের হাতে ক্রমবর্ধমান শোষণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণের তীব্রতা, বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে গঠিত বুর্জোয়া সমাজের উন্নেতা হিসাবে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব গভীরতর করে তুলেছিল।

কৃষকদের জোতজমা এবং প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীর অংশ হিসাবে অর্ধ-বিনিময়ভিত্তিক কুটিরশিল্প সংস্থাগুলির মাঝখানে পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল সমুদ্রমধ্য দ্বীপের মতো। এই উপাত্তের ভিত্তিতেই এদেশের ঔপনিবেশিক-সামন্ত সমাজের সামাজিক ও শ্রেণীগত কাঠামোর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। এতেই শ্রেণীগুলির সংগ্রামের আধার ও আধেয় প্রতিফলিত।

ভারতীয় জনগণের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম:
উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক

জনগণের মধ্যে (কৃষক ও কারিগর) উনিশ শতকের ষাট থেকে নব্বইয়ের দশকের মধ্যে সংঘটিত অসন্তোষগুলির মধ্যেই ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ অসঙ্গতিগুলির প্রকটতম অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

বাংলার কৃষক অভ্যুত্থান

১৮৫৯-১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের নীলবিদ্রোহ হল গ্রামীণ জনগণের প্রথম উল্লেখযোগ্য অভ্যুত্থান।

নীলরঙ উৎপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার ব্রিটিশ মালিকরা জমিদারদের কাছ থেকে কয়েক বছর ধরে এলাকাবিশেষের রায়তদের খাজনা আদায়ের অধিকার ইজারা নিত এবং শেষোক্তদের নীলচাষে বাধ্য করত। নীলকরদের নির্ধারিত দামেই নিজেদের পুরো ফসল বিক্রিতে কৃষকরা বাধ্য থাকত। ক্রমে ক্রমে বর্ধমান ঋণের চাপে রায়তরা ব্রিটিশ নীলকরদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং নীলকররা সারা অঞ্চলে জুলুমের শাসন কায়েম করে।

নির্যাতনমূলক চুক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত এই কৃষক অভ্যুত্থান শেষে নীলচাষ অস্বীকার ও নীলকরদের পুরনো দাদন ফেরত দেয়ার রূপ গ্রহণ করে। কয়েকটি গ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হওয়া এই অভ্যুত্থান বাংলার পাঁচটি জেলায় দ্রুত

ছড়িয়ে পড়ে। রায়তদের এই আন্দোলন সবলে দমন করার জন্য নীলকরদের চেষ্টা প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় এবং তা নীলকরদের নিজস্ব খামারগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণের আকার ধারণ করে। আন্দোলনের পরিসর দেখে ঔপনিবেশিক সরকার এতই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে এসব ঘটনাবলী তদন্তের জন্য গঠিত কমিটি জবরদস্তিমূলক আদায় ব্যবস্থা তুলে দেয়ার সুপারিশ করেছিল।

অভ্যুত্থানের আওতাভুক্ত গ্রামগুলিতে সামরিক পিটুনি পুলিশ পাঠানো সত্ত্বেও সংগ্রাম তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলত, বংশ-পরম্পরায় ভূমিস্বত্বভোগী রায়তরা একটি বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করে: নির্যাতনমূলক চুক্তির অবসান ঘটে। অভ্যুত্থানের এলাকাভুক্ত জেলাগুলিতে বহু নীলকরও অতঃপর তাদের কার্যকলাপ বন্ধ রাখে।

এই অভ্যুত্থানের সময়ই কৃষক সংগঠনের বীজ উপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে (১৮৭২-১৮৭৩) বাংলার কৃষকদের ব্যাপক অভ্যুত্থানে এই কৃষক সংগঠন ('রায়ত সভা') উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

নীলবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শিল্পোদ্যোগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং বাংলার পাবনা ও বগুড়া জেলায় কৃষক অভ্যুত্থান ছিল সামন্তবিরোধী। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট বাংলা প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের) কয়েকটি ধারা জমিদারদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করলে জমিদাররা পাইকারিভাবে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করে এবং মূলত এজন্যই অভ্যুত্থানটি ঘটে।

কৃষকরা জমিদারদের বাড়িঘরে লুটপাট চালায় এবং চুক্তিনামা ও খাজনার রসিদগুলি ধ্বংস করে ফেলে। 'বিদ্রোহী' নামের সংগঠনগুলি এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিল। পাবনা ও বগুড়ার এই কৃষক অভ্যুত্থান ঔপনিবেশিকরা নিষ্ঠুরভাবে দমন করে এবং পরে বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত একটি নতুন বিধির মাধ্যমে প্রজাবর্গের অধিকার কিছুটা সুরক্ষিত করা হয়।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে গণ-অসন্তোষ

সামন্তবিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সাধারণ বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত কৃষকবিদ্রোহ ছাড়াও ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের প্রচলিত ধরনগুলির মাধ্যমেও গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই কেবল সামন্ততান্ত্রিক জেরগুলির প্রাধান্য নয়, অধিকাংশ মানুষের মন তখনো সামন্ততান্ত্রিক বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্ন ছিল এবং সেজন্য সামন্ত ও বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রায়ই 'সত্যিকার ধর্মের জন্য' সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করত। ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানের পরাজয় সত্ত্বেও ব্রিটিশরা এর অন্যতম শরিক ওয়াহাবীদের আন্দোলন পুরোপুরি

নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ওয়াহাবীরা পাটনায় (বিহার) কেন্দ্র স্থাপনক্রমে পুনরায় তাদের গোপন সংগঠন গড়ে তোলে এবং ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সোৎসাহে নতুন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালায়। তাদের সংগঠনের মধ্যে কৃষক ও কারিগর ছাড়াও এর নেতৃত্বে ছিল বহু অধস্তন কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও বু

স্বাধীন পাঠান উপজাতি এলাকা সিতানায় ইতিপূর্বে ওয়াহাবীদের সংগঠিত একটি বড় সামরিক ক্যাম্পে এখন স্বেচ্ছাসেবীরা জড় হতে শুরু করল এবং গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ চলল। সম্প্রদায়ের নেতারা সিতানাকেই বিধর্মীদের (অর্থাৎ ব্রিটিশ) বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে ('জেহাদ') তাদের কেন্দ্র হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সিতানায় একদল সৈন্য পাঠায়। ওয়াহাবী সমর্থক আফগান উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধে বহু হতাহতের পরই শুধু ব্রিটিশের পক্ষে বিদ্রোহের এই কেন্দ্রটি ধ্বংস করা সম্ভবপর হয়েছিল। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে পাটনা ও দিল্লীর শক্ত ওয়াহাবী ঘাঁটিগুলিরও পতন ঘটে এবং অতঃপর আন্দোলনটি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের ষাট থেকে আশির দশকের মধ্যে পঞ্জাবে একটি সামন্তবিরোধী, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রাম ক্রমাগত জোরদার হয়ে ওঠে। এই শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত 'নামধারী' শিখ সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের মধ্যে এটি রূপলাভ করেছিল।

১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে জনৈক ছুতারপুত্র রাম সিং এই সম্প্রদায়ের নেতা হওয়ার পরই এই সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে রাম সিং নামধারী আদর্শ সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন এবং তদনুযায়ী তাঁর শিষ্যবর্গকে ব্রিটিশ পণ্য ও ঔপনিবেশিক সরকারের সংস্থাগুলি বর্জনের পরামর্শ দেন। প্রাক্তন সৈনিক এই রাম সিং জেলা, তহশীল ও গ্রামে সুচিহ্নিত সামরিক ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠিত করেন। এই সম্প্রদায় ঔপনিবেশিক সিপাহী বাহিনীতে কার্যরত শিখদের সঙ্গেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। নামধারীদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারে পৌঁছনোর ফলে এবং রাম সিংয়ের প্রতি নির্বিশেষ আনুগত্য সহ বিশেষত সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সুসংগঠিত হওয়ায় এরা একটি বড় শক্তি হয়ে উঠেছিল। এজন্যই সম্প্রদায়টিকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছিল।

শিখ সম্প্রদায়ের মন্দিরের ভূমি বেদখলকারী শিখ সামন্তদের বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায় ষাটের দশকের শেষার্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শিখ সামন্তদের সাহায্যে ব্রিটিশরা নামধারীদের কয়েকটি প্রত্যক্ষ আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়।

ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের গোড়ায় নামধারীদের কার্যকলাপে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়ে ওঠে। রাম সিং সমিতির কার্যকলাপের এই দিকটির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপন করেছিলেন। তিনি জানতেন ব্রিটিশরা শিখ-মুসলিম বিরোধ বৃদ্ধিতে এটি ব্যবহার করবে এবং তাদের আন্দোলন ধ্বংস করে দেবে।

কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে উঠতে থাকে এবং রাম সিংয়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির মাঝামাঝি পঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, মালের কোটলার শাসককে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।

মালের কোটলার পথে শতাধিক নামধারী মালোধ দুর্গ আক্রমণ করে। এটি ছিল শিখ সম্প্রদায় অবদমনে ব্রিটিশের সক্রিয় দালাল জনৈক শিখ সামন্তের আবাস। আক্রমণকারীরা সেখানকার দুর্গে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু মালোধ ও মালের কোটলা আক্রমণের এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রতিবেশী শিখ এলাকাগুলি থেকে আসা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে নামধারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। বিশ্বাসঘাতক শিখ রাজন্যবর্গ গণ-আন্দোলন দমনে পুনরায় ব্রিটিশের অনুগত সহায়ক হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশের হাতে বন্দী নামধারীদের বিনা বিচারে কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ভারত ভ্রমণরত মহান রুশ চিত্রশিল্পী ভেরেশ্চাগিন এই বর্বর অত্যাচারভিত্তিক একটি ছবি এঁকেছিলেন।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের এই ব্যর্থতার পর সরকার নামধারী সম্প্রদায়ের উপর বর্বর অত্যাচার চালায় এবং রাম সিং সহ এর নেতৃবৃন্দকে বর্মায় আজীবন নির্বাসনে পাঠান হয়।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে পুনরায় গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়।

মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলন। বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে পরিচালিত বিদ্রোহ

মহারাষ্ট্রেই প্রধানত কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হচ্ছিল এবং সেই জমি দ্রুতগতিতে মহাজনদের দখলে আসছিল। এটি ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এবং বিশেষত ষাটের দশকে তুলার চড়া-বাজারের সময় পশ্চিম ও মধ্যভারতের এলাকাগুলি বাণিজ্যিক রপ্তানিযোগ্য ফসল উৎপাদনের জন্য পুনর্গঠিত হওয়ার ও গ্রামাঞ্চলে পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্কের বিকাশ সহ বণিক ও মহাজনদের পুঁজির সক্রিয়তর ভূমিকার অন্যতম ফলশ্রুতি।

মহারাষ্ট্রে কৃষক আন্দোলন মহাজনবিরোধিতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কৃষকরা তাদের ঋণের নথিপত্রগুলি কেড়ে নিয়ে নষ্ট করে ফেলত এবং বাধার মুখোমুখি হলে মহাজনদের গ্রামছাড়া করে তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগাত। দেশের এই এলাকার কৃষক আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের আকার নিয়েছিল। ১৮৭৩-১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের সকল জেলায় সশস্ত্র কৃষকদল সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এদের বৃহত্তমটি কৃষকনেতা কেংলিয়ার নেতৃত্বাধীন ছিল। তিনি কৃষকদের মধ্যে 'ঋণীর বান্ধব' নামে পরিচিত হতেন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশের পিটুনী বাহিনীর কাছে কেংলিয়া বন্দী ও কৃষকদের প্রধান সশস্ত্র দলটি বিধ্বস্ত হওয়ার কিছুকাল পরে আন্দোলনটি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৭৮-১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে নতুন সশস্ত্র কৃষক-বাহিনী গড়ে ওঠে। প্রধানত রামুসি উপজাতির লোকজনদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর মানুষগুলি যথানিয়মে জমিদার ও মহাজনদের কাছে ঋণবন্দী ছিল। মুখ্য কৃষক-সম্প্রদায়ভুক্ত সমৃদ্ধ চাষীরাও এতে যোগ দিয়েছিল।

১৮৭৬-১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু তখনই ব্রিটিশরা লবণ-কর চালু করে এবং ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উপর পেটেন্ট-শুল্ক চাপায়। ফলত, জনগণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব প্রকটতর হয়ে ওঠে এবং নানা স্থানে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের সুরাট শহরের ব্যবসায়ী ও কারিগররা ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভের শরিক হলে আন্দোলনটি তুঙ্গে পৌঁছয়।

পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রামরূপে বিকশিত ১৮৭০-১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেকার মহারাষ্ট্রের কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের আন্দোলনই বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের (১৮৪৫-১৮৮৩) নেতৃত্বাধীন বীরত্বপূর্ণ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল।

মরাঠা পেশোয়াদের প্রাক্তন কর্মচারী ও শেষে দরিদ্র হয়ে পড়া একটি পরিবারে ফাড়কের জন্ম। তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং ভাল সংস্কৃত ও ইংরেজি জানতেন। পুনার প্রশাসন-বিভাগে অধস্তন কর্মচারী হিসাবে কার্যরত থাকার সময় তিনি ভারতীয় পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নিয়তিকল্প বহু অপমানকর অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ স্বাদ পেয়েছিলেন। বিশ্লেষণী মন ও প্রবল দেশাত্মবোধতাড়িত এই মানুষটির মনে অচিরেই স্বদেশের বিদেশী শাসকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা দেখা দেয়।

গোড়ার দিকে ফাড়কে পুনার তরুণদের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী উত্তেজনা ছড়াতেন। অতঃপর তিনি তাঁর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার উৎখাতের জন্য একটি শসস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি শুরু করেন। বিদ্রোহী কৃষকনেতা হরি নায়কের সঙ্গে যোগাযোগের পর ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের বসন্তে তাঁর উদ্যোগে একটি সৈন্যদল গঠিত হয়। শুরুতে স্থানীয় মহাজন ও সামন্তদের উপরই

তিনি আক্রমণ চালাতেন এবং তাদের ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত করতেন। এভাবে সংগৃহীত অর্থে পেশাদার যোদ্ধা ভাড়া করে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তোলাই তাঁর পরিকল্পনা ছিল। তিনি ভেবেছিলেন এই বাহিনী ঔপনিবেশিক শাসনকেন্দ্রগুলি আক্রমণ করবে, গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও পরিবহণ পথগুলি অবরোধ করবে এবং মহারাষ্ট্র জুড়ে অভ্যুত্থানের সংকেত জানাবে এবং পরে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

এই পরিকল্পনায় ফাড়কে মহারাষ্ট্রের ব্যাপক কৃষকসাধারণের সাহায্যের উপর ভরসা করেছিলেন। অবশ্য, তাদের সমর্থনেই তাঁর পক্ষে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্মে দুঃসাহসী আক্রমণ চালান ও বড় বড় উৎখাত কার্যকর করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু দুর্বল সামরিক সংগঠন এবং আন্দোলন দমনের জন্য পাঠান পিটুনী বাহিনীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য গ্রীষ্মের মাঝামাঝি তাঁর সৈন্যদলের প্রধান অংশটিই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ফাড়কে ধরা পড়েন এবং পুনার আদালতে বিচারে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ফাড়কে তাঁর সৈন্য অধ্যুষিত জেলাগুলির ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। এতে উল্লিখিত তাঁর মূল কর্মসূচি ছিল: কম খাজনা, জনহিতকর কার্যকলাপ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মচারীদের উচ্চ বেতন হ্রাস। তাঁর কর্মসূচি গৃহীত না হলে ফাড়কে সারা মহারাষ্ট্রে অভ্যুত্থান ঘটানোর হুমকি দিয়েছিলেন। ফাড়কের রোজনামচা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে তাঁর কর্মসূচিতে ভারতীয়দের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সারগ্রাহী, প্রজাতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক আদর্শের এক সরল সংশ্লেষ।

কিন্তু এই মানুষটির ভাবাদর্শ ও বাস্তব কার্যকলাপ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি প্রবল ঘৃণাপৃক্ত ছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সংকল্পে তিনি অটল ছিলেন।

জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও স্থানীয় মহাজনবিরোধী সংগ্রামের সংযোজক প্রথম গণ-অভ্যুত্থান হিসাবে ফাড়কের এই আন্দোলনের গুরুত্ব সমধিক। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে কাঁধাকাঁধি সাধারণ মানুষের আন্দোলনে নামারও এটিই প্রথম নজির।

রাম্পার অভ্যুত্থান

ফাড়কের লড়াইয়ের সময় মাদ্রাজের গোদাবরী তীরস্থ রাম্পায় এক বিরাট কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে।

রাম্পায় বসতকারী পাহাড়ী উপজাতির এই অভ্যুত্থানের কারণ ছিল ব্রিটিশ কর্তৃক রাজস্ব বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও আঞ্চলিক তহশীলদারদের অত্যাচার।

অভ্যুত্থানটিতে ক্ষুদ্র সামন্ত ভূস্বামীরা ও গ্রামীণ মোড়লরা নেতৃত্ব দিয়েছিল। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ ও জুলাই মাসের মধ্যে সশস্ত্র কৃষকদলের বিক্ষিপ্ত আক্রমণগুলি পুরোপুরি গেরিলা যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে এবং কিছু কিছু সাফল্য সহ এটি ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এই অভ্যুত্থানে গড়ে-ওঠা অনেকগুলি বড় বড় বিদ্রোহীদল ২০ লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত গোদাবরী ও ভিজাগাপট্টম জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসব জেলায় যেসব স্থানে বিদ্রোহীরা সক্রিয় ছিল সেখানকার কৃষকরা তাদের যথেষ্ট সাহায্য দিত। জঙ্গলাকীর্ণ এই পার্বত্য অঞ্চলের পুরো সুবিধা পেয়ে কুশলী গেরিলা রণনীতির মাধ্যমে বিদ্রোহীরা তাদের দমনের জন্য পাঠান বিপুল সংখ্যাগুরু নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারত। শত্রুদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ও থানা-লুঠ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই বিদ্রোহীরা নিজেদের সজ্জিত করেছিল।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সমগ্র রাম্পা এলাকা ও সংলগ্ন জেলাগুলি বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। এমন কি বিদ্রোহ দমনের জন্য গোদাবরী দিয়ে পাঠান সৈন্যবোঝাই দুটি জাহাজেরও একটি তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বিদ্রোহীদের কোন কর্মসূচি ছিল না এবং অভ্যুত্থানটি ছিল পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের। বিদ্রোহীদের ঐক্যহীন বিভিন্ন দলনেতারা দৈবাৎ সমন্বিত অভিযান চালাত। দরিদ্রতম কৃষক থেকে ক্ষুদ্র সামন্ত অবধি বহুবিধ শ্রেণী সমবায়ে গঠিত এই অভ্যুত্থানের কাঠামোও ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মচারী, পুলিশ, মহাজন ও তহশীলদাররা বিতাড়িত হওয়ার পর বস্তুত অভ্যুত্থানের লক্ষ্য অর্জিত হলে বিদ্রোহীদের নেতারা নিজেদের 'রাজা' বা 'মহারাজা' ঘোষণা করেছিল।

অস্ত্রবলের উপর একক ভরসা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পর ব্রিটিশরা বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে ঝগড়া বাধানোর, ঘুস ও ষড়যন্ত্রের চেষ্টা শুরু করে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে অন্যতম সেরা বিদ্রোহীনেতা অমল রেড্ডি বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়েন। অতঃপর ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে অভ্যুত্থানের প্রখ্যাততম নেতা ধারাকন্দ চেন্দ্রায়া তাঁর জনৈক বিশ্বাসঘাতক অনুগামীর হাতে নিহত হন।

চেন্দ্রায়া নিহত হওয়ার পর অভ্যুত্থানটি থিতিয়ে আসতে থাকে। বিদ্রোহীদের বিক্ষিপ্ত দলগুলি তখনো রাম্পার জঙ্গলে ব্রিটিশ পিটুনী বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে চলছিল। কিন্তু শেষ গেরিলানেতা, চেন্দ্রায়ার প্রধান সহযোদ্ধা, তাম্মান ধরা'র মৃত্যুর পর ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বস্তুত প্রতিরোধের অবসান ঘটেছিল।

এই ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে উনিশ দশকের সত্তরের ও আশির

দশকের গোড়ার দিকে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ভারতের স্থানীয় উপজাতিদের (ভিল, সাঁওতাল, গোন্দ, লুসাই, কুকি, নাগা ইত্যাদি) মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এগুলি ছিল দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং প্রতিবেশী প্রাগ্রসরতর জাতিগুলি থেকে আসা সামন্ত ও মহাজনদের দ্বারা তাদের ভূমিদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই ফলশ্রুতি। স্থানীয় ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়ার জন্য এগুলি সাধারণত প্রকাশ্য ঔপনিবেশিকতাবিরোধী বৈশিষ্ট্য লাভ করত।

'সামন্ততন্ত্রের ঘাঁটি' ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দুর্গস্বরূপ চিহ্নিত এলাকাগুলির জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটছিল। স্থানীয় শাসকের পদচ্যুতির বিরুদ্ধে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে বরোদা রাজ্যের রাজধানী বরোদায় ব্যাপক ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। মরাঠা রাজ্য কোলাপুরের শাসক ও তাঁর ঔপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ফাড়কে-অভ্যুত্থানের অনুরূপ একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়।

উনিশ শতকের ষাট থেকে আশির দশকের গোড়ার দিকের গণ-আন্দোলনগুলি ছিল স্থানীয় ও সাধারণত স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এগুলির শরিকদের কোন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না এবং তারা প্রায়ই নিজ নিজ ধর্ম বা সরল রাজতন্ত্রের নামে প্রচার চালাত। কিন্তু তাসত্ত্বেও এইসব আন্দোলনে কৃষক, কারিগর, কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ী ও জায়মান পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর যোগদান, দেশের সকল প্রধান এলাকাগুলিকে প্রকটিত গণ-অসন্তোষ এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান সহ সংগ্রামের অটলতর ধরনগুলি সংগঠনের মধ্যে এই সময়কার গণ-আন্দোলনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের বৈশিষ্ট্যটি সহজলক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।

দেশ ছিল তখন নতুন বৈপ্লবিক সংকটের মুখোমুখি। কিন্তু কৃষক ও কারিগরদের ঔপনিবেশিকতা ও সামন্তবিরোধী সংগ্রামগুলি নিজ চেষ্টায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। স্মর্তব্য, বুর্জোয়া সমাজের নতুন শ্রেণীগুলি—জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উত্তরসূরীকল্প শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সত্তা তখনো তার গড়নের প্রাথমিক পর্যায় উত্তীর্ণ হয় নি।

শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত

বস্ত্রশিল্পেই শ্রমিক শ্রেণীর বৃহত্তম সমাবেশ ঘটেছিল। শোষকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে বস্ত্রকল শ্রমিকদের নেতৃত্বলাভের কারণ এতেই নিহিত। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে মধ্যভারতের অন্যতম শহর নাগপুরের একটি বস্ত্রকলে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দেয়। ১৮৮২-১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও

মাদ্রাজ প্রদেশে ২৫টি ধর্মঘট সংগঠিত হয়। শিল্প ও রেল শ্রমিক ছাড়া কুলি এবং সরকারী কল্যাণ সংস্থার মেহনতিরাও ধর্মঘট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এইসব ধর্মঘটের প্রথমগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, স্বল্পস্থায়ী ও খুবই স্থানীয় ধরনের। ধর্মঘটীদের দাবি ছিল অর্থনৈতিক।

বোম্বাইয়ের শ্রমিকরাই ছিল ভারতের সক্রিয়তম মেহনতি মানুষ। এখানেই ট্রেড ইউনিয়নের পূর্বসূরীকল্প শ্রমিক সংস্থা গঠনের প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের প্রথম জনসভা আহূত হলে সেখানে একদিন সাপ্তাহিক ছুটি ও কার্যদিনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ ইত্যাদি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। সেই বছরই বস্ত্রকলের জনৈক মরাঠী উচ্চপদস্থ কর্মচারী এন. এম. লোখাণ্ডে বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের প্রথম সংগঠন পত্তন করেন। অবশ্য, এটির সদস্যসংখ্যা কখনই স্থির থাকত না। সংগঠনটি মরাঠী ভাষায় 'দীনবন্ধু' নামে বুর্জোয়া লোকহিতবাদী ধরনের একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল।

আশির দশকের শেষে ও নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে ধর্মঘট-আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছিল। সব কারখানায় তখন বছরে অন্তত একটি বা দুটি ধর্মঘট দেখা দিত। বোম্বাইয়ের প্রলেতারিয়েত ছাড়া কলিকাতা, মাদ্রাজ, আহ্‌মদাবাদ ও অন্যান্য শহরের মেহনতিরাও সংগ্রামে যোগ দিতে শুরু করেছিল। এতে নারী শ্রমিকদের সক্রিয় শরিকানাও ক্রমাগতই বাড়ছিল।

বোম্বাই শ্রমিক সংগঠনের কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে লোখাণ্ডের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের দ্বিতীয় জনসভাটি আহূত হয়। সংগঠনটি ক্রমেই সংস্কারপন্থী ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের এই প্রারম্ভিক পর্যায়েই বুর্জোয়ারা এতে নিজেদের ভাবাদর্শ আরোপে সচেষ্ট ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক নির্যাতন চালানোর পর আশির দশকের অপেক্ষাকৃত শান্তির বছরগুলি শেষ হলে নব্বইয়ের দশকে আবার ধর্মঘট-আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত নতুন গণ-অসন্তোষের সঙ্গে এই আন্দোলন বৃদ্ধির সন্নিপাত ঘটেছিল।

নব্বইয়ের দশকের গণ-অসন্তোষ

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম ভারতের এক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য কাম্বেতে বিদ্রোহী কৃষকরা সেখানকার নবাবের বিতাড়ন সহ উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বাধ্য হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করে ও ভূমিরাজস্ব কমায়।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে একালের বৃহত্তম গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল মণিপুর রাজ্যে। পূর্ব ভারতের এই দেশীয় রাজ্যে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একদল সামন্ত অভিজাত ক্ষমতাসীন হয়েছিল। এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সত্যিকার অর্থে রাজ্যের শাসক, পদচ্যুত রাজার ভাই। ইতিমধ্যে অস্থায়ী রাজপ্রতিনিধি টিকেন্দ্রজিৎ সিংয়ের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার সংবাদ শুনে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে একদল ব্রিটিশ সৈন্য পাঠান হয়। তারা বিনা বাধায় সেখানে পেঁছয়। কিন্তু রাজপ্রাসাদ দখলের ব্যর্থ চেষ্টার পর ব্রিটিশ সেন্যবাহিনী ইম্ফলের ব্রিটিশ রেসিডেন্টের আবাসে বস্তুত বন্দী হয়ে পড়ে। বহু সৈন্য ও কিছুসংখ্যক অফিসর হারিয়ে তারা শেষাবধি পশ্চাদপসরণ করে।

ব্রিটিশ সৈন্যদলের এই পরাজয় কলিকাতার ঔপনিবেশিক দপ্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে। সেই বছরই এপ্রিলে ব্রিটিশরা ইম্ফলে বড় আকারের একটি সামরিক অভিযান পাঠায়। রাজ্যের জনগণের প্রতিরোধ এবং কয়েকটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ও যোগাযোগের উপায়গুলি ধ্বংস করে দেয়া সত্ত্বেও ইম্ফলের পতন ঘটে ও শহরটিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। টিকেন্দ্রজিৎ সিং বন্দী ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর জনৈক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকে নতুন নাবালক রাজার রিজেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

মণিপুরের এই বিদ্রোহটি ছিল সামন্তশ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত ঔপনিবেশিকতাবিরোধী শেষ গণ-অভ্যুত্থান।

সেই ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দেই পূর্ব ভারতের কেয়োঞ্ঝর রাজ্যেও একটি সামন্তবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে।

উনিশ শতকের শেষ দশকে খোদ ভারতে কোন উল্লেখ্য গণ-আন্দোলনের নজির না থাকলেও এর পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে ঔপনিবেশিকরা যথাক্রমে পাঠান ও নাগা উপজাতির প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ ও আফগানিস্তানের আমির আব্দুর রহমানের মধ্যে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে সীমান্তচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই বিশেষভাবে আফগান উপজাতিদের সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। এর ফলে 'ডুরান্ড লাইন' বরাবর বহুসংখ্যক আফগান উপজাতি আফগানিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও ব্রিটিশ প্রভাবের আওতাধীন হয়। সেখানে দুর্গ তৈরি ও রাজস্ব প্রবর্তনের ব্রিটিশ উদ্যোগ পাহাড়ী জাতিগুলির সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল।

সেখানকার সংখ্যাতীত গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে ১৮৯৪, ১৮৯৫ ও ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ঘটনাগুলিই ছিল বৃহত্তম। গোলন্দাজ বাহিনী সহ নানা ধরনের মোট

৪০ হাজার সৈন্য নিয়োগের পরই কেবল ব্রিটিশদের পক্ষে এদের দমন করা সম্ভবপর হয়েছিল।

কিন্তু পাঠান সীমান্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে ব্রিটিশদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও তা কখনই তেমন দৃঢ় হতে পারে নি।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিবিধ প্রবণতা

ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ও একটি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উন্মেষের ফলে বুর্জোয়াদের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক কাঠামোয় ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রকট প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

ভারতের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ দুটি পর্যায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। উনিশ শতকের ষাটের ও সত্তরের দশকের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অংশে বুর্জোয়া ও জমিদারদের স্থানীয় সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। আশির দশকের দেশব্যাপী এর ঐক্যসাধনই হল বুর্জোয়া-জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়।

ষাট ও সত্তরের দশকের বুর্জোয়া-জাতীয় আন্দোলন

বাংলা ও বোম্বাইয়ের মতো অর্থনৈতিকভাবে উন্নততম প্রদেশেই বুর্জোয়া ও জমিদারদের প্রথম সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল। সেই চল্লিশের দশক থেকেই কলিকাতার 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ও 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন' সক্রিয় ছিল। উভয় সংগঠনই শক্তিশালী বণিক ও মুৎসুদ্দী সহ বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীজাত উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ রক্ষা করত। তদুপরি লক্ষণীয় যে, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে' বাংলার উদারনৈতিক জমিদাররা খুবই প্রভাবশালী ছিল।

কর ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ব্যয়হ্রাস এই সংগঠনগুলির অর্থনৈতিক কর্মসূচির দাবিভুক্ত হয়েছিল। এগুলির রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল খুবই সীমিত: ভারতীয় সমাজের উচ্চস্তরগুলির জন্য ইউরোপীয় শিক্ষার অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায় (ঔপনিবেশিক প্রশাসনে পদোন্নতির জন্য) এবং দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

গণ-আন্দোলনের ফলে ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যপন্থী অংশের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পুরনো সংগঠনগুলি সামাজিক দিক থেকে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ছিল। এভাবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের জন্য নতুন, আরও র‍্যাডিকাল সংগঠন তৈরির বিষয়গত চাহিদা দেখা দিয়েছিল।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 'পুনা সার্বজনিক সভা' এবং ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। দুটি সংগঠনই ভারতীয় বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় অধিকতর সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই এই নতুন সংগঠনগুলির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না (ওই একই অবস্থা ছিল পুরো বুর্জোয়া-জাতীয় আন্দোলনে)। বুর্জোয়া-জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস যে দুটি প্রধান প্রবণতার উন্মেষ ও বিকাশ দ্বারা সুচিহ্নিত সেগুলি হল: উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রবণতা।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে আশির দশকের গোড়া অবধি জাতীয় আন্দোলনের সংগঠনগুলিতে উদারনৈতিকদেরই অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল, কারণ পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নিজস্ব সংগঠন তখনো গড়ে ওঠে নি।

বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দাদাভাই নৌরজী ও মহাদেব গোবিন্দ রানাডের নেতৃত্বে উদারনৈতিকরা ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে নতুন ভারতীয় শিল্পগুলির প্রতি সংরক্ষণমূলক নীতি অনুসরণ এবং রাজস্ব ও ঔপনিবেশিক কর হ্রাসের দাবি জানাত। কৃষিনীতির ক্ষেত্রে তারা জমিদারি অটুট রাখার (অবশ্য রাজস্ব হ্রাসের শর্তে) এবং ক্রমশ বৃহদায়তন জমিদারি গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিল।

ভাইসরয় ও গভর্নরদের নেতৃত্বাধীন আলোচনা সভাগুলিতে ভারতীয় সমাজের ধনী উচ্চবর্গের প্রতিনিধির সংখ্যাবৃদ্ধি সহ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যেই এদের রাজনৈতিক কর্মসূচি সীমিত থাকত। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বয়ঃসীমা বৃদ্ধি এবং পরীক্ষাটি ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতে অনুষ্ঠানের দাবিও তারা জানাত।

ঔপনিবেশিকরা বুর্জোয়া পরিবারের তরুণ ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের উচ্চ বেতনের চাকুরিগুলিতে তাদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার চেষ্টা করত বলেই এই শেষোক্ত দাবিটি উত্থাপিত হয়েছিল। তাই, উক্ত পরীক্ষার জন্য ঊর্ধ্বপক্ষে ২২ বছর বয়ঃসীমা নির্ধারিত ছিল এবং এটি কেবল ইংলণ্ডেই অনুষ্ঠিত হত। ব্যবস্থাটি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশকেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। তখনকার

দিনে ভারতীয়রা ব্রিটেনস্থ ছাত্রদের তুলনায় অধিক বয়সে স্নাতক হত। তদুপরি ব্যয়বাহুল্য ছাড়াও সেইসব দিনে অতি সমৃদ্ধ ভারতীয় পরিবারগুলির সন্তানদের পক্ষেও ব্রিটেনে যাওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না।

ভারতীয় উদারনৈতিকদের কর্মনীতি তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির মতোই মধ্যপন্থী ও সতর্কতামূলক ছিল। পার্লামেন্টে ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত পেশ, ভাইসরয়ের কাছে বা ব্রিটেনে প্রতিনিধি পাঠান, সংবাদপত্রে নরম প্রতিবাদ, জাতীয় সংগঠনগুলিতে প্রস্তাব গ্রহণ—জাতীয় আন্দোলনের মধ্যপন্থীরা এই ধরনের সংগ্রামই তখন চালাত।

উদারনৈতিকরা গণবিক্ষোভের প্রবল বিরোধিতা করত এবং তারা এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিল।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটি বামপন্থী, র‍্যাডিকাল অংশ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ছিল বণিক-বুর্জোয়াদের অধস্তন স্তর ও ক্ষুদ্র কারখানা মালিক এবং শিক্ষক, কেরানী, ডাক্তার ইত্যাদি স্বল্পবেতনভুক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি। তদুপরি তারা দারিদ্র্যগ্রস্ত সাধারণ জমিদার এবং কৃষকদের ধনী স্তরগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখত।

উদারনৈতিকদের প্রতিপক্ষ বাংলার পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা জনগণের সামন্তবিরোধী সংগ্রামের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। নীলবিদ্রোহের সময় লেখক ও গণতন্ত্রী দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে নির্যাতনমূলক চুক্তিব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। নাটকটি বাঙ্গালী সমাজের প্রগতিশীল অংশের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাবনার অভ্যুত্থানের সময় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে মীর মশার্‌রফ হোসেন 'জমিদার দর্পণ' নাটকটিতে জমিদারি অত্যাচারের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছিলেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে কৃষক অভিনেতাদের সাহায্যে অনুষ্ঠিত এই নাট্যাভিনয় বাংলার রায়তদের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের সহায়ক হয়েছিল।

কৃষক আন্দোলন যে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে, ঔপনিবেশিক শোষণকে দুর্বল ও শেষাবধি উৎখাত করবে বাংলার জাতীয়তাবাদী বামপন্থীরা এতে নিশ্চিত ছিল।

ভারতের বুর্জোয়া অভ্যুদয়ের সমর্থকদের স্বার্থরক্ষায় অটল থাকার জন্যই বাংলার পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এই সামন্তবিরোধী বৈশিষ্ট্যটি গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় পেটি-বুর্জোয়া যুবকদের ব্যাপক স্তরের মধ্যে দেশাত্মবোধক শিক্ষাপ্রচারের মধ্যেই পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল। এজন্যই সংবাদপত্রে নিজ আদর্শ প্রচারকেই তারা প্রথম অগ্রাধিকার

দিয়েছিল। ঘোষ ভ্রাতৃবর্গ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সেকালের প্রখ্যাত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেকে তাঁদের প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলিতে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করতেন। উদারনৈতিকদের থেকে তাঁদের কোন আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন না থাকার মধ্যেই আসলে এ'দের দুর্বলতা নিহিত ছিল। বাংলার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত মহারাষ্ট্রের পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি।

এখানকার বামপন্থী, র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে প্রখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী ও গণতন্ত্রী বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৮২০) নামটি বিশেষভাবে যুক্ত। মরাঠা-ব্রাহ্মণদের প্রাচীন এক বংশের সন্তান তিলক তরুণ বয়স থেকেই শিবাজী কর্তৃক প্রথম মরাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা সহ মরাঠা মুক্তি-আন্দোলনের সকল ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি এই জাতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট ছিল। কলেজে পাঠরত অবস্থায় তিনি অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও জাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মরাঠা যুবকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে পুনায় 'নিউ ইংলিশ স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে তিলক যথাক্রমে মরাঠা ও ইংরেজীতে 'কেশরী' ও 'মরাঠা' নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

এইসব সংবাদপত্রে তিলক ও তাঁর সহযোগীদের প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং স্কুলে দেয়া তাঁদের বক্তৃতাগুলি থেকে দেখা যায় যে, তাঁরা সর্বভারতীয় বুর্জোয়াদের অটল সমর্থক ছিলেন। ব্রিটিশ পণ্যবর্জনের মধ্যেই তিলক ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার পথ খুঁজে পান।

বাংলার পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মতো তিলকও জনগণের বৈষয়িক অবস্থা উন্নয়নের সপক্ষে প্রচার চালাতেন। কিন্তু তিনি কৃষিসমস্যা সমাধানের কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচি দেন নি।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও তিলক স্বাধীনতা লাভের পথ হিসাবে সশস্ত্র সংগ্রামের বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বাধীনতা লাভের ভাবী সংগ্রামের জন্য 'জনগণের' (অর্থাৎ সমাজের পেটি-বুর্জোয়ার ব্যাপক স্তরের) প্রস্তুতিকেই তিলক ও তাঁর অনুগামীরা এই পর্যায়ের প্রধান কাজ বিবেচনা করতেন।

উনিশ শতকের সত্তর এবং আশির দশকগুলিতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বাইরে ভারতের অন্যান্য অংশে জাতীয় আন্দোলন বিকাশের এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ভারতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিকাশকে নির্যাতনমূলক পন্থায় প্রহৃত করার চেষ্টা করে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় লিটন (১৮৭০-১৮৮০) কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় অস্ত্রবিধি অনুসারে ভারতীয়রা এমন কি বন্যজন্তুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার হারায়। সেই বছরই অতি কঠিন ধরনের সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন পাশের মাধ্যমে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সবকিছুর জন্য প্রাথমিক সেন্সর প্রবর্তনের এক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা চালু করা হয়।

কিন্তু এইসব নির্যাতনে আকাঙ্ক্ষিত ফল ফলে নি। তাই, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনে লিবারেল পার্টি ক্ষমতাসীন হলে তারা বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করে। নতুন ভাইসরয় রিপন (১৮৮০-১৮৮৪) সংবাদপত্র আইনটি প্রত্যাহার করেন।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে শহরগুলির মিউনিসিপাল পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই বিত্তশালীদের ঊর্ধ্বতন স্তর দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। ভারতীয় উদারনৈতিকদের সঙ্গে সমঝোতার সময় আইনের ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য উৎখাতের জন্য নির্বাহী পরিষদের জনৈক সদস্য এলবার্ট উপস্থাপিত খসড়াটি রিপনের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের বিরোধিতায় পার্লামেণ্টে এটি পাশ হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় এবং রিপন অবসর গ্রহণ করেন। এই দাবির আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সারা দেশে প্রচারাভিযান চালায়।

সত্তরের দশকে ও আশির দশকের গোড়ার দিকে ভারতে একটি নতুন ক্রান্তিলগ্নের উন্মেষ ঘটছিল। ঔপনিবেশিকরা তখন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের একটি বামপন্থী অংশের সঙ্গে গণ-আন্দোলনের সংযোগের সম্ভাবনায় বিশেষভাবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। জনৈক সরকারী কর্মচারী অ্যালান হিউম তাঁর একটি প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে এগুলি অধিকতর উদ্দেশ্যমুখী, এমন কি একটি জাতীয় অভ্যুত্থানের আকারও ধারণ করতে পারে।

উদারনৈতিকদের নেতৃত্বে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের পক্ষে ঔপনিবেশিকদের সমর্থন থাকার কারণ এতেই সহজবোধ্য।

বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সত্তরের দশকের শেষ

থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৮৩-১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে জাতীয়তাবাদীদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন তৈরির প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল।

শেষপর্যন্ত, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন আহূত হয়। এটি ছিল জমিদার ও বুর্জোয়াদের প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। শাসকবর্গের অনুমোদনে এবং ভাইসরয় লর্ড ডাফ্‌রিনের (১৮৮৪-১৮৮৮) অনুরোধে হিউমকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে এটি স্থাপিত হয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জমিদার ও বুর্জোয়াদের উচ্চস্তরের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করত। কংগ্রেসের প্রথম ছয়টি অধিবেশনের প্রতিনিধিদের সামাজিক স্তর প্রসঙ্গত লক্ষণীয়। এগুলিতে ছিল ৫০ ভাগ বুর্জোয়া ও জমি-মালিক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, ২৫ ভাগ ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও ২৫ ভাগ জমিদার।

জাতীয় আন্দোলনের উদারনৈতিক অংশই কংগ্রেসে নেতৃত্ব করত। অবশ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে তারা কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল: জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের, করহ্রাস এবং ভারতে সংগঠিত পুঁজিতান্ত্রিক ঋণদান ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অটলতর দাবি উচ্চারিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিকদের শুল্কনীতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ভারতীয় শিল্পের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতি প্রতিবাদ আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্পসম্মেলন ও শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সারা দেশে অভিন্ন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মধ্যেই কংগ্রেসের কৃষিকর্মসূচি সীমিত ছিল।

জনতাবিচ্ছিন্ন এইসব ভারতীয় উদারনৈতিকরা নিজেদের জনগণেকেই ভয় পেত। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে নৌরজী ঔপনিবেশিক সরকারকে দৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার দাবি জানান। দৃঢ়হস্তে জনগণের শান্তিনাশী শক্তিগুলি দমন করাকেই তিনি সরকারের আশু কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছিলেন।

কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক দাবি ছিল—ব্যবস্থাপক সভার কাঠামোর বিস্তার সহ বুর্জোয়া ও জমি-মালিকদের উর্ধ্বতন স্তরের নির্বাচিত সংখ্যাগুরু প্রতিনিধিদের নিয়ে এটি গঠন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে এই স্তরগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় আন্দোলনের শরিক বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি তিলক পুনা সার্বজনিক সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পান। ইতিমধ্যে তিনি দেশের পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সর্বজনমান্য নেতা হয়ে উঠেছিলেন। 'মরাঠা' পত্রিকায় লিখিত তাঁর

প্রবন্ধাবলী অন্যান্য প্রদেশেও র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদ বিকাশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তিলকের উদ্যোগে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুদের দেবতা গণেশ এবং মরাঠাদের জাতীয় বীর শিবাজীর সম্মানে গণ-উৎসব আয়োজন শুরু হয়। শীঘ্রই এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান রাজনীতির কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং তিলকের অনুগামীরা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারের জন্য এগুলির সুযোগ নিতে থাকে। বাংলায় 'শিবাজী উৎসব' নাম দিয়ে অনুরূপ উৎসব সংগঠনের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

কিন্তু তিলকের অনুগামীদের এই কার্যকলাপের হিন্দুধর্মের সংশ্লিষ্ট নেতিবাচক দিকটিও লক্ষণীয়। আশির দশকের গোড়ার দিকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ প্রহত করার চেষ্টায় এবং ব্রিটিশের সক্রিয় সমর্থনে মুসলিম সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছিল, অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের একটি হেতুর সংযোজন ঘটেছিল।

মুসলিম সামন্ত ও শক্তিশালী বণিকদের অধিকতর সচেতন অংশের নেতা সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বহু সমিতি ও আলিগড় কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রে কাজের জন্য মুসলিম তরুণদের প্রশিক্ষণ দিত। সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের গোঁড়া সমর্থক।

সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ প্রবর্তিত এই আন্দোলন ছাড়াও দিল্লীর অদূরস্থ দেওবন্দকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পেটি-বুর্জোয়া মুসলিম গণতন্ত্রীদের একটি সংগঠনও উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। কিন্তু এই আন্দোলনেরও প্রকট ধর্মীয় প্রবণতা দেওবন্দ এবং অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক জাতীয় সংগঠনগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা জটিল করে তুলেছিল।

সত্তরের দশক থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতে ইন্ধন যোগান ব্রিটিশের 'বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন' নীতির একটি সার্বক্ষণিক অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। নব্বইয়ের দশকে ব্রিটিশরা বোম্বাইয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক হত্যানুষ্ঠান সংগঠনে সফল হয়।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশবিরোধিতার তুঙ্গ পর্যায়ে মহারাষ্ট্রে তিলকের অনুগামী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় রুণ্ড নামক জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যা করেন। ফলত, তিলক গ্রেপ্তার ও জেলবন্দী হন।

উনিশ শতকের শেষে ভারতের রাজনৈতিক চিত্র খুবই জটিল হয়ে উঠেছিল। সেটি ছিল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একটি নবপর্যায়ের সূচনা।

যুদ্ধপূর্ব সাম্রাজ্যবাদের কালপর্বে ভারতবর্ষ। এশিয়ার জাগরণ (১৮৯৭-১৯১৭)

ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে প্রকটতর দ্বন্দ্বের উদ্ভব

উনিশ শতকের শেষার্ধে উদ্ভূত প্রবণতাগুলি বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রকটতর হয়ে উঠেছিল। এই প্রক্রিয়ার মূলে ছিল পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ, যেজন্য এই উপমহাদেশে বিভিন্ন শ্রেণী ও জনবর্গের মধ্যে তীব্রতর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি

এই শতকের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদের যুগচারিত্র্য হিসাবে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের প্রকার ও পদ্ধতির গুরুত্ব আত্যন্তিক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮৯৩-১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক একটি আর্থিক সংস্কারের ফলে ব্রিটেনের জন্য কৃষিজাত সামগ্রী ও কাঁচামালের যোগানদার হিসাবে ভারতের ভূমিকা আরও পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল এবং তা এদেশে ব্রিটিশ পুঁজির অনুপ্রবেশ সহজতর করেছিল। রুপোর টাকা তৈরির ভারতীয় টাঁকশালগুলি বন্ধ করে দিয়ে তারা সেখানে প্রাক্তন রৌপ্যমানের স্থলে নতুন স্বর্ণমান চালু করেছিল। বিনিময় হারবৃদ্ধি সহ এটিকে ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিংয়ের অধীনস্থ করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে পণ্যসংবহনের উন্নতি ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আমদানি ও রপ্তানীকৃত পণ্যের মধ্যেকার দরপার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসঙ্গে অন্যান্য এশীয় দেশগুলিতে রৌপ্যমুদ্রার মূল্যহ্রাস ঘটায় এই নতুন ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছিল। ব্যবসা ও অসমতুল্য বিনিময়ের দৌলতে এতে কেবল ব্রিটিশ রপ্তানিকারীরাই লাভবান হয়েছিল। এর আশু ফলশ্রুতি হিসাবে অনেকগুলি ভারতীয় ব্যবসায়ী পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, দরবৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু জনগণের সঞ্চয়ের মূল সামগ্রী—রুপোর অলঙ্কারপত্রের মূল্যহ্রাসের ব্যাপারটিই ছিল এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ এটি ছিল মেহনতিদের উপর একটি নতুন আঘাত।

আর্থিক সংস্কারটি ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ রপ্তানিকারীদের অবস্থান মজবুত করেছিল এবং ফলত, দেশটি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে ব্রিটেনের জন্য

কৃষিজাত সামগ্রী ও কাঁচামালের উৎস হয়ে উঠেছিল। ব্রিটেন ও ভারত এবং অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অসমতুল্য বাণিজ্যসম্পর্ক আসলে যথার্থ মূল্যের চেয়ে কম দামে, কিংবা বিনা দামেই এদেশ থেকে অপরিমিত বৈষয়িক মূল্যের রপ্তানি ঘটিয়েছিল। নিচের হিসাবেই এটি সহজলক্ষ্য: ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে আমদানি থেকে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১·১ কোটি স্টারলিং পাউন্ড বেশি, কিন্তু ১৯০৯-১০ — ১৯১৩-১৪ খ্রীস্টাব্দের এর গড়পড়তা হিসাব দাঁড়িয়েছিল ২·২৫ কোটি পাউন্ড।

এইসঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজিলগ্নির ক্ষেত্র হিসাবে ভারতকে শোষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল। আগের মতোই নির্মাণক্ষেত্রে, রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়, জলসেচ, আবাদে এবং খনি, বস্ত্রকল ও খাদ্যশিল্পে ব্রিটিশ পুঁজিলগ্নির ঘনীভবন অব্যাহত ছিল। ব্যাঙ্ক এবং বীমায়ও যথেষ্ট পুঁজি লগ্নি করা হয়েছিল।

সর্বোপরি দেশের প্রত্যক্ষ শোষণলগ্ন ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে ব্রিটিশ ফিনান্স পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটছিল এবং এর বিকাশের ফলে ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের মারাত্মক প্রতিযোগিতায় পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

বাংলা, আসাম ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ চা-বাগান, মহীশূরের কফি-বাগিচা ও ত্রিবাঙ্কুরের রবার খামারগুলি, কলিকাতার সকল চটকল, যন্ত্র মেরামতের অধিকাংশ কর্মশালা, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশের বহুসংখ্যক বস্ত্রকল, দেশের প্রায় পুরো রেলপথ ও খনিগুলি ব্রিটিশ একচেটিয়াদের মালিকানাধীন ছিল। ব্রিটিশরাই ছিল দেশের বড় বড় শিল্পসংস্থার মালিক। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে চটকল ও বন্দর কর্মীদের সবটা, রেলপথ ও ট্রাম কর্মশালার শ্রমিকের প্রায় পুরোটা, চিনি ও পশম কারখানার অর্ধেক, কাগজ শিল্পের প্রায় ৮০ ভাগ এবং নির্মাণ ও ধাতু শিল্পের প্রায় ৬০ ভাগ শ্রমিক ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কারখানায়ই কাজ করত।

১৮৯৬-১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজিলগ্নি ৪০০-৫০০ কোটি থেকে ৬০০-৭০০ কোটি টাকায় পেঁছয়। নিম্নোক্ত হিসাবগুলিতেই ভারতের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ ফিনান্স পুঁজির দখলটি সহজলক্ষ্য: ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনে রেজিস্ট্রীকৃত ১৬৫টি কোম্পানি ভারতে তাদের পুঁজি খাটাচ্ছিল। সংখ্যাটি কিন্তু খোদ ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত কোম্পানির (ব্রিটিশ ও ভারতীয়) তিন গুণের বেশি।

কিন্তু ভারতের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ একচেটিয়াদের অবস্থান এখানকার অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় কেবল প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ পুঁজিলগ্নির দ্বারাই নির্ধার্য নয়। ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা নিজেদের আওতাধীন প্রধান ভূমিকা অটুট রাখার জন্য খোদ নিজেদের তৈরি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণও ব্যবহার করত।

আগের মতো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রই ছিল ভারতে তার অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক প্রাধান্য রক্ষার সহায়ক ব্রিটেনের মূল অর্থনৈতিক কব্জা। ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ পুঁজির অর্ধেকেরও বেশি ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক চালুকৃত বন্ড ও নিদর্শনপত্র। আগের মতোই ভারতের জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সামরিক অভিযানের খরচ যোগত, যথা: চীনে 'বক্সার বিদ্রোহ' দমন, তিব্বত অভিযান, বুয়োর যুদ্ধ ইত্যাদি। ১৯০০-১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের স্টারলিং ঋণ ১৩·৩ কোটি থেকে ১৭·৭ কোটি পাউন্ডে পেঁছয়।

ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক একচেটিয়াদের ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির গুরুত্বও তখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পুরনো ও নতুন উভয় ধরনের ম্যানেজিং এজেন্সিই (বড় বড় ব্রিটিশ একচেটিয়াদের অনুমোদিত সংস্থা) ব্রিটিশ ফিনান্স পুঁজির সঙ্গে, প্রধান ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সুসংশ্লিষ্ট ছিল। এগুলি ভারতে ঔপনিবেশিক শাসকদের ঊর্ধ্বতন স্তর, ব্রিটিশ ফিনান্সিয়াল ধনিকগোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখে কাজকর্ম চালাত। প্রখ্যাত ভারতীয় অর্থবিদ পি. লোকনাথন রসিকতার সঙ্গে বলেছিলেন যে এই ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি হল এক ধরনের সংকীর্ণ পথ যার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতে প্রবাহিত হয়ে খোদ সেইসব এজেন্সিরই প্রতিষ্ঠিত নানা সংস্থায় ছড়িয়ে পড়ে। অনুমোদিত সংস্থাগুলির অর্জিত লভ্যাংশের ভাগীদার এই এজেন্সিগুলি ভারতে সংবহনশীল ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় পুঁজির প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রণ করত।

ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন তীব্রতর হওয়ার ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এগুলি নিয়ে 'সিটি অব লন্ডন'এর পরিচালনাধীন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ তৈরি করা হয়। 'মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক', 'চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া' ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত এবং আমদানি-রপ্তানিকারী বড় বড় ব্রিটিশ পাইকারদের অর্থ যোগাত। ভারতীয় ব্যবসা ও তেজারতির মধ্যগ পুঁজির মাধ্যমে এই ব্যাঙ্কগুলি গ্রামের সঙ্গে, কাঁচামাল উৎপাদক ও ব্রিটিশ শিল্পজাত মোট ভোগ্যপণ্যের ভোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এইসঙ্গে দেশে প্রকৃত পক্ষে কোন সংগঠিত ঋণদান ব্যবস্থার অস্তিত্ব না থাকায় ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা ম্যানেজিং এজেন্সি বা বড় বড় মহাজনদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য ছিল—যারা দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত এবং যাদের উপর কারিগর ও ক্ষুদ্রায়ত শিল্পের মালিকরা নির্ভরশীল ছিল।

দেশে পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্কের অটল বিকাশ এবং সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কবন্দী একটি সমাজে অভ্যন্তরীণ বাজারের উন্মেষ ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক ও

রতি পংজির গুরুত্ব অসম্ভব বৃদ্ধি করেছিল যা প্রথমত ও প্রধানত বিদেশী একচেটিয়াদের শক্তি হিসাবেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকের গোড়ার দিকে মহাজনদের মোট বার্ষিক আয় ২০ কোটি টাকায় পেঁছেছিল।

দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলিতে একটি শক্তিশালী মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়া গোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটছিল এবং এরাই ভারতে ব্রিটিশের আমদানি-রপ্তানির লেনদেন চালাত।

বুর্জোয়ার শক্তিবৃদ্ধি

ব্যবসা ও তেজারতির মাধ্যমে ভারতীয় বিত্তশালীদের হাতে সঞ্চিত ক্রমবর্ধমান পংজি অবশেষে শিল্পলগ্নির পথ খুঁজে পেয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের অবদমিত রাখার ব্রিটিশ নীতি সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতির পংজিতান্ত্রিক ধরন ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছিল। ১৯০০-১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির সংখ্যা ১৩৬০ থেকে ২৫৫২টিতে এবং এগুলির প্রাপ্তপংজি ৩৬·২ কোটি থেকে ৭২·১ কোটি টাকায় পেঁছয়। আগের মতো বস্ত্রশিল্পই ছিল ভারতীয় কারখানা-মালিকদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাগান এবং খনিতেও ভারতীয় পংজির অনুপ্রবেশ ঘটছিল। তুলা-শোধন মিল, গম, ধান ও তেলের কল এবং মুদ্রণশিল্পের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়দের মালিকানাধীন।

ভ দের সংস্থাগুলির অধিকাংশই ছিল ক্ষুদ্র বা মধ্যম আকারের আর এগুলির আশি ভাগই যন্ত্রীকৃত ছিল না। আধুনিক ধরনের বৃহৎ শিল্পসংস্থা ছাড়া মানুফ্যাকচারিং কারখানাগুলির সংখ্যাও তখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বস্ত্র, চামড়ার সামগ্রী, টিনের তৈজসপত্র ও অন্যান্য গৃহস্থালী দ্রব্যাদি উৎপাদনে এবং কৃষিজাত কাঁচামালের প্রাথমিক প্রসেসিংয়েই পংজিতান্ত্রিক সংস্থার সরলতম ধরনগুলি সর্বাধিক সংখ্যায় প্রকটিত ছিল। কৃষি ও কুটিরশিল্পেই তখন বৃহত্তম সংখ্যক মেহনতি কাজ করত এবং এদের সংখ্যা বহু কোটিতে পেঁছেছিল।

দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান মজবুতির চেষ্টায় তরুণ জাতীয় বুর্জোয়ারা এখন ভারীশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় মালিকানাধীন সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় বুর্জোয়াদের শক্তিশালী চক্র-সমর্থিত জনৈক ভারতীয় পংজিপতি জামসেদজী টাটা জামসেদপুরে (বিহার) প্রথম ভারতীয় মালিকানাধীন ধাতুশিল্প কারখানাটি স্থাপন করেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে টাটা-সংস্থা একটি জলবিদ্যুৎ স্টেশনও নির্মাণ করেছিল।

পংজিতান্ত্রিক ঋণব্যবস্থা গঠন আসলে জাতীয় সংস্থা নির্মাণের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হওয়ায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা নিজস্ব ব্যাঙ্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ

করে। এই শতকের গোড়ার দিকে কয়েকটি বড় বড় ভারতীয় জয়েণ্ট-স্টক ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে এগুলির সংখ্যা ১৮টিতে পেঁছয়। তদুপরি ছিল ভারতীয় পুঁজিপতিদের মধ্যম ধরনের ২৩টি ব্যাঙ্ক। অবশ্য, এই কালপর্বে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-পুঁজি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থাগুলির বিকাশ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ভারতের শোষণ বৃদ্ধির ফলে জায়মান ভারতীয় বুর্জোয়া ও বিদেশী একচেটিয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় বস্ত্রবাজারেই এই দুই দলের স্বার্থসংঘাত নগ্নতমভাবে প্রকটিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষে দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে সস্তা জাপানী কাপড় দেখা দিলে ভারতীয় বস্ত্রকলগুলি সুতারপ্তানির বদলে অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য প্রধানত কাপড় তৈরি শুরু করেছিল। হাতে-তৈরি কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল বিদেশের সঙ্গে সফল প্রতিযোগিতার অন্যতম উপায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বস্ত্রকল ও ভারতীয় তাঁতিদের (এদের সংখ্যা তখন ১ কোটির অধিক) মধ্যে নিবিড় পারস্পরিকতা বিদ্যমান ছিল। ১৮৯৭-১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বস্ত্রকলগুলি বছরে ৮·৫ কোটি পাউন্ড এবং তাঁতিরা (একক কারিগর ও মানুফ্যাকচারিং সংস্থার কর্মী সহ) মোট ২০ কোটি পাউন্ড সুতা ব্যবহার করত।

১৮৮৬ ও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সুতিকাপড় উৎপাদনকারী মিলগুলির (এগুলির অধিকাংশই ছিল ভারতীয়দের) সংখ্যা ৯৫টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭টিতে পেঁছয়। এই সময়ের মধ্যে মাকু ও তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে দ্বিগুণ ও তিনগুণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতে সুতিবস্ত্র আমদানি বৃদ্ধি করে। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকারের অনুমতিক্রমে তারা ভারতীয় বস্ত্রের উপর ৩·৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করে। তাসত্ত্বেও ১৯০১-১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বস্ত্রবাজারে আমদানীকৃত কাপড়ের অংশভাগ ৬৩ শতাংশ থেকে ৫৭ শতাংশে নেমে যায়, অথচ ভারতের মিলের ও হাতে-তৈরি কাপড়ের অংশভাগ একই সময়ে যথাক্রমে ১২ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে ও ২৫ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশ পেঁছয়।

এই পর্যায়ে ভারতীয় কারিগররা ভারতীয় মিলগুলির প্রতিযোগিতামূলক আঘাতের যথার্থ গভীরতা অনুভব করে নি। কিন্তু তখন থেকে স্থানীয় কারখানাগুলিতে উৎপন্ন কাপড় কেবল ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গেই নয়, স্থানীয় কারিগরদের উৎপাদগুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। ১৯০১ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ তাঁতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বা জীবিকার সম্বল হারিয়েছিল। ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন স্তরে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি, অথচ মিলের তৈরি কাপড়ের উৎপাদন

তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য তখনো ল্যাঙ্কাশায়ারই ছিল ভারতীয় মিল-মালিক ও তাঁতিদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই সময়টি সাধারণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্বে সূচিহ্নিত। এইসঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ঊর্ধ্বতন স্তরগুলি ঋণসুযোগ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রিটিশ ফিনান্স পুঁজির সঙ্গে বিশেষত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখত। বুর্জোয়াদের এই অংশটি সামন্ত সমাজের শোষক স্তরের সঙ্গে নিবিড়তর বন্ধনে বন্দী ছিল। ভারতীয় কারখানা-মালিকদের অধিকাংশই ছিল বড় বড় বণিক ও মহাজন এবং তারা ব্যবসা ও তেজারতির মাধ্যমে তাদের আয়ের একাংশ অর্জন করছিল। এই সময় গড়ে ওঠা ভারতীয় জয়েণ্ট-স্টক বাণিজ্যক ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে শিল্পপতিরা বণিক এবং মহাজনদেরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকানার সঙ্গে একযোগে পুঁজির (বিশেষত বাণিজ্যিক ও তেজারতি পুঁজি) বৃদ্ধি ঘটছিল। বণিক, মহাজন ও ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের ভূমিক্রয় এমন পর্যায়ে পেঁছিছিল যে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকার পঞ্জাবে কৃষকের জমি অকৃষকদের কাছে হস্তান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে বহু বড় বড় জমিদার, এমন কি কোন কোন রাজাও শিল্প-কোম্পানি ও ব্যাঙ্কিং সংস্থার শেয়ার ক্রয় শুরু করেছিল। ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়া ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সংযোগ এবং বিশেষত পূর্বতনদের সঙ্গে সামন্তদের সংযোগ জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে তার ভূমিকার ক্ষেত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত করেছে।

মেহনতিদের অবস্থার ক্রমাবনতি। শ্রেণী-উদ্ভব ও জাতিদ্বন্দ্ব

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ সত্ত্বেও এই শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ একটি অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ ছিল এবং সেখানে অতীতের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিও অটুট থেকেছিল। অগণিত কারিগর বিধ্বস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়ায় শিল্প-প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেও ১৯০১ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কৃষিরত জনসংখ্যা ৬৬ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশে পেঁছয়। আগের মতোই কৃষকদের উপর তিন ধরনের শোষণ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের, জমিদারদের এবং বাণিজ্যিক ও তেজারতি পুঁজির শোষণ অব্যাহত ছিল। রায়তওয়ারি এলাকায় ভূসম্পত্তির দ্রুত

ঘনীভবনের এবং ভারতীয় ক্ষুদ্র ভাগচাষীদের কাছে বর্ধমান মাত্রায় জমি ইজারা দেয়ার ফলস্বরূপ ক্রমেই অধিক সংখ্যক দরিদ্র কৃষক তার জমি হারাচ্ছিল এবং সেগুলি জমিদার ও ধনী কৃষকের কুক্ষিগত হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে কৃষিজাত সামগ্রীর দরবৃদ্ধির ফলে কৃষকদের ধনী স্তরগুলির অবস্থায় উন্নতি দেখা দিয়েছিল। ব্যাপকতর বাণিজ্যিক চাষাবাদের এবং শহরগুলিতে পুঁজিপতিরা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে নতুন বুর্জোয়া সম্পর্কের উন্মেষ ঘটছিল। শহর বা আবাদ ও নিবিড় চাষপ্রধান এলাকায় নিঃস্ব কৃষকদের নিয়মিত প্রচরণের মধ্যেই এদের একাংশ প্রলেতারিয়েত হয়ে উঠছিল। কৃষিজীবীদের বর্ধমান সংখ্যাধিক্য আসলে শ্রমসরবরাহের সহজলভ্যতারই নামান্তর যা পালাক্রমে ধনী কৃষক ও কোন কোন জমিদারের খামারে ভাড়াটে শ্রম ব্যবহারের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক তখনো ভ্রূণাবস্থা অতিক্রান্ত হয় নি। এই ক্রান্তিকালে কেবল শহরেই শ্রেণীগত ও জাতীয় (ভারতীয় জনগণ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে) দ্বন্দ্ব প্রকটিত ছিল। যেখানে উনিশ শতকের শেষার্ধে গণবিক্ষোভের অধিকাংশ ঘটনাস্থল ছিল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেখানে সাম্রাজ্যবাদের যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত শহরগুলিতেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের কেন্দ্রভূমির উন্মেষ ঘটছিল।

ইতিমধ্যে অনেকগুলি কারখানাতেই বহু বছরের অভিজ্ঞ কর্মিদল গড়ে উঠেছিল। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আহ্‌মদাবাদ ইত্যাদি প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের সংখ্যা ও ঘনীভবন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রমিকদের বৈষয়িক অবস্থার কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। আগের মতোই তাদের উপর স্থানীয় ও বিদেশী পুঁজিপতি, মহাজন ও নানা ধরনের মধ্যগ ঠিকাদারের শোষণ অব্যাহত ছিল। অধিকাংশ কারখানারই কার্যদিনের পরিসর ছিল ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা। ব্রিটিশ একচেটিয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা কম মজুরি দিয়ে উৎপাদন খরচা কমানোর চেষ্টা করত। অর্থাৎ, বিশ শতকের গোড়ার বছরগুলিতে তীব্রতর হয়ে ওঠা শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈশিষ্ট্যও লাভ করেছিল।

তৎকালে জায়মান শিল্প-প্রলেতারিয়েত ছাড়া শহরগুলিতে কারিগর, মেহনতি, ছোট ছোট কারখানার মালিক ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিল। সমাজের এই স্তরগুলি তখন দেশ ব্রিটিশ পণ্যের বাজার হয়ে ওঠার মারাত্মক ফলগুলি যথার্থই অনুভব করেছিল এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন সংক্রান্ত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছিল।

তখনো পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাই ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রধান উদ্যোক্তা। এটি শহুরে জনতার পেটি-বুর্জোয়া স্তর সহ ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র

জমিমালিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখত এবং সাধারণত নিজেরা কোনক্রমে টিকে থাকত। প্রধানত স্বাধীন পেশাজীবী, শিক্ষক ও ছোট ছোট কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা নিত্যদিনের কঠোর জীবনসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান বেকারীর সমস্যায়ও জর্জরিত ছিল। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে পুঁজিতন্ত্রের জায়মান প্রক্রিয়াটি একাধারে মন্থর ও বিকৃত বিধায় এতে ভারতীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতকদের চাকুরিসুযোগের সীমাবদ্ধতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গঠিত ভারতীয় ছাত্রসমাজ ছিল এদেশের অন্যতম সেরা বিপ্লবী শক্তি।

দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সর্বক্ষণই বর্ণবৈষম্য ও জাতীয় মর্যাদাহানিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হত। ঔপনিবেশিক সরকারের কেবল নিম্নতম চাকুরিগুলিতেই ভারতের বিপুল জনসংখ্যার প্রবেশাধিকার ছিল। চাকুরিগত বৈষম্যের নজির হিসাবে নিম্নোক্ত বিস্ময়কর তথ্যগুলি লক্ষণীয়: ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ৮ হাজার ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর মোট বেতন ছিল ১·৪ কোটি পাউন্ড স্টারলিং, আর ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতীয় কর্মচারী পেত মাত্র ৩০ লক্ষ পাউন্ড।

তাই, ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক বর্গের জাতীয় চেতনা উন্মেষের সহায়ক হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের এই পর্যায়ে জনগণের বৈষয়িক অবস্থার অবনতি এবং পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের সঙ্গে সামন্ত, বণিক ও মহাজনদের শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি তাদের বৈপ্লবিক উদ্দীপনায় ইন্ধন যুগিয়েছিল।

খাদ্যের দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও শিল্পশ্রমিক, বাবু-কর্মী ও জনগণের অন্যান্য স্তরের বেতনের প্রায় কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। অজন্মা ও খারাপ ফসলের বছরগুলির পর পরই এদেশে দুর্ভিক্ষ নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৬-১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ৬·২ কোটি জন-অধ্যুষিত এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ার পর ক্রমান্বয়ে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ২·৮ কোটি, ১৯০৫-১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ৩৩ লক্ষ, ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ১·৩ কোটি, ১৯০৭-১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ৪·৯৬ কোটি মানুষের এলাকাগুলি দুর্ভিক্ষের কবলগ্রস্ত হয়েছিল। এইসব দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দেখা দিত কলেরা ও প্লেগ মহামারী। ১৮৯৬-১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের ৬০ লক্ষ মানুষ প্লেগে প্রাণ হারিয়েছিল। মাথাপিছু জাতীয় আয়ও তখন দ্রুত কমে গিয়েছিল এবং চরম দারিদ্র্য তীব্র হয়ে উঠেছিল।

দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির মাধ্যমেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা সেখানে অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছিল এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ
(১৯০৫-১৯০৮)

ঔপনিবেশিক সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের বৈপ্লবিক আন্দোলন

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় (১৮৯৯-১৯০৫) নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল দল বা উগ্রজাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধি। তাঁর নীতি ছিল জাতীয় আন্দোলনের নির্মম দমন এবং উন্মুক্ত বর্ণবৈষম্যর লক্ষ্যে পরিচালিত। তাঁর শাসন ব্রিটিশ শিল্পোদ্যোগীদের সক্রিয় সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিদের কার্যকলাপ খোলাখুলিভাবেই প্রহৃত করেছিল। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ সন্ধান ও ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ একচেটিয়াদের অনুকূলে একটি বিশেষ আইন প্রবর্তিত হয়।

কার্জন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিশেষ ঘৃণা পোষণ করতেন। করযোগ্য আয়ের সর্বনিম্ন বার্ষিক পরিমাণকে তিনি ৫ শত থেকে ১ শত টাকায় নামিয়ে আনেন। ব্যবস্থাটি ছিল তথাকথিত শহুরে মধ্যবিত্তদের একটি বড় অংশের উপর মারাত্মক আঘাতস্বরূপ।

৯৮৯৮ ও পুনরায় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় সংবাদপত্রগুলিকে রাষ্ট্রীয় গোপনতা আইনের আওতাধীন করা হয়।

ভাইসরয় কর্তৃক প্রবর্তিত প্রথম দিকের আইনগুলির মধ্যে একটির বলে কলিকাতা পৌরসভার সদস্যসংখ্যা হ্রাস করা হয়। ভারতীয় বিত্তশালীদের প্রতিনিধিত্ব কমানোই এর লক্ষ্য ছিল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার প্রবর্তন করেন। এতে ব্যাপকভাবে ছাত্রবেতন বাড়ান সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যাবলীকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের আওতাধীন করা হয়। ভারতীয় মধ্যবিত্তদের একটা বড় অংশকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে কার্জনের অভিমত ছিল: তাঁর সাহায্যের কল্যাণেই এটি শান্তিপূর্ণ মৃত্যুবরণের পথ খুঁজে পাবে। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ঘৃণাবোধ তিনি গোপন করতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় তিনি প্রকাশ্যভাবে দেশের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্জন এশিয়ায় নতুন সামরিক অভিযানেরও প্রস্তুতি চালান। তিনি সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে দ্রুত

সংগঠিত করেন। ব্যুয়োরদের দমনকারী জেনারেল কিচেনার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। তিনি সামরিক বরাদ্দও যথেষ্ট বাড়ান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সৈন্যবাহিনীর অনুপ্রবেশ সহজতর করার জন্য সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নতুন রেলপথ তৈরি করা হয়। এই এলাকায় ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করা এবং পাঠান উপজাতিগুলির অটল প্রতিরোধ মুকাবিলার জন্য সীমান্ত অঞ্চলকে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নতুন এলাকায় আলাদা করেন।

কিন্তু কার্জনের নিগ্রহমূলক নীতি কেবল ঔপনিবেশিকতার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকেই দৃঢ়তর করেছিল, বৈপ্লবিক উদ্দীপনায় ইন্ধন যুগিয়েছিল।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিলক পুনরায় 'কেশরী' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয় আন্দোলনের বামপন্থীরা অতঃপর মহারাষ্ট্রে খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানকার যুবসমিতিগুলির আধা-আইনী খেলাধুলার উপর পুলিশ পুরো নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, মরাঠা যুবসমাজের জাতীয়তাবাদী অংশ ঔপনিবেশিক দমনের বিরুদ্ধে আগামী দিনে সক্রিয় সংগ্রামের জন্য এই সমিতিগুলিতেই নিজেদের প্রস্তুত করত। ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলনের বামপন্থী অংশের নেতা হিসাবে খ্যাত তিলকের প্রভাব বোম্বাই প্রদেশের সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। মরাঠা দেশপ্রেমিক ও বাংলার জাতীয়তাবাদীদের সংযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

এই শতকের গোড়ার দিকে মহারাষ্ট্রের মতো বাংলায়ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের অনেকগুলি আধা-আইনী সংগঠন ও সম্মিলনী গড়ে উঠেছিল। এগুলির সদস্যরা ছিল জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের উচ্চারিত নমনীয় বিরোধিতার কঠোর সমালোচক এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন উৎখাতের পক্ষে বিক্ষোভ বিস্তারে তৎপর। বাংলায় প্রবর্তিত গণেশপুজা গণ-উৎসব (মহারাষ্ট্রের অনুকরণে) হয়ে ওঠে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ভারতীয় জনগণের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে ব্যাপক দেশাত্মমূলক দৃষ্টান্তের রূপলাভ করেছিল। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংঘটন ছিল এর ঘোষিত নীতি।

এইসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় সংগঠনগুলিও সক্রিয়তর হয়ে উঠেছিল। এগুলির অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সম্মেলনগুলিতে বামপন্থী পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছিল। তিলকের মতো আরও জাতীয় নেতার অভ্যুদয় ঘটছিল। এদের মধ্যে বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ এবং পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় উল্লেখ্য। তৎকালে নরমপন্থীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা 'চরমপন্থী' নামে আখ্যাত হত।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ এবং গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত

পূর্বাহ্নেই সম্ভাব্য অভ্যুত্থানটি পণ্ড করার চেষ্টায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আগেভাগেই আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্যেই ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকেও আগের মতোই বঙ্গদেশেই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল। ভারতীয় জাতিগুলির মধ্যে বাঙ্গালীরা ছিল সর্বাধিক সুচিহ্নিত জাতীয় স্বকীয়তার অধিকারী এবং তাদের জাতীয় ঐক্য দেশের এই অংশে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিকাশে উল্লেখ্য অবদান যুগিয়েছিল। বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গ (বিহার ও ওড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করে) এবং পূর্ববঙ্গে (আসাম সহ) বিভাগের এই প্রস্তাবের ফলে ধর্মীয় ও জাতিগত বিরোধ প্রকটতর হয়ে উঠেছিল। ফলত, পশ্চিমবঙ্গে বিহারী ও ওড়িয়াদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল এবং পূর্ববঙ্গের সকলেই বাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মুসলিম প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের মুসলিম জমিদার ও ব্যবসারত শক্তিশালী মুসলিম বুর্জোয়াদের বুঝান হয়েছিল যে এই নবগঠিত প্রদেশের ঔপনিবেশিক প্রশাসনে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদলাভের সুযোগ পাবে।

কিন্তু এতে ঔপনিবেশিকদের পরিকল্পনার বিপরীত ফল ফলেছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙ্গালীদের সকল স্তরের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। শিল্প ও ব্যবসারত জাতীয় বুর্জোয়ারা বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্বেকার প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার এবং তাদের স্বার্থরক্ষক প্রধান সংস্থাগুলি, বিশেষত 'চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রির' প্রভাব হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনায় ভীত হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের ফলে শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ এবং ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পায় এজন্য জমিদাররাও ভয় পেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ যে কলিকাতার প্রশাসনিক ও আইন-আদালতী সংস্থাগুলির সংখ্যা হ্রাস ঘটাবে এবং উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারীর মাত্রা বাড়াবে, এতে বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চিত ছিল। এই মতাবলীর সমর্থনে বাংলার মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, এতে বাঙ্গালীরা অপমানিত, অসম্মানিত হচ্ছে এবং তাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়েছে। তাঁর মতে বঙ্গভঙ্গ ছিল বাংলা ভাষাভাষী জনগণের বর্ধমান ঐক্যের প্রতি সতর্কভাবে পরিকল্পিত এক আঘাতস্বরূপ।

জমিদার, মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের অল্প কয়েকটি দল এবং মুসলিম সামন্ত বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশই কেবল বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিল। ঔপনিবেশিক সরকার ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সরকারীভাবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করে এবং

আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে কলিকাতায় ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। এগুলিরই একটি সভা ব্রিটিশ পণ্যবর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এইসঙ্গে জাতীয় সংবাদপত্র, জনসভা ও জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সম্মেলন স্থানীয় ভারতীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহদান ও দেশীয় পণ্য (স্বদেশী) ক্রয়ের জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানাতে থাকে।

বাহ্যত অর্থনৈতিক চারিত্র্যের হলেও স্বদেশী আন্দোলন অচিরেই সমগ্র জাতির গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে এটি বাংলার সীমানা পেরিয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষত মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিলক ও তাঁর অনুগামীরা এই আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন যুগিয়েছিলেন। অতঃপর সর্বত্র স্বদেশীদের দোকানপাট ও কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে এবং বিদেশী পণ্যবিক্রেতা দোকানগুলিতে পিকেটিং শুরু হয়।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর (যেদিন বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ হয়) বঙ্গভঙ্গ দিবস হিসাবে প্রাক্তন প্রদেশের সর্বত্র জাতীয় শোকদিবস ঘোষিত হয়। সেইদিন কলিকাতায় এক বিরাট বিক্ষোভের পর এক বিশাল শোভাযাত্রা গঙ্গাতীরে পৌঁছয় এবং 'বন্দে মাতরম' এই জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে মাতৃভূমিকে পুনরায় সংযুক্ত করার দৃঢ় শপথ নেয়। শহরে সেদিন দোকানপাট বন্ধ থাকে, অরন্ধন পালিত হয়। এই আনুষ্ঠানিক প্রতিজ্ঞার নিদর্শন হিসাবে মণিবন্ধে রাখি বাঁধা হয়। এই রাখিবন্ধন ছিল বাঙ্গালী জাতির ঐক্যের প্রতীক।

শহরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। পণ্যবর্জনের বিরোধীদের সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। ফলত, বহু ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্ধি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য শহরে প্রধানত গুপ্তসমিতি ও যুবকদের ক্রীড়াসঙ্ঘ থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা গঠিত হয়েছিল। বিশেষ পোশাক-পরা (হলুদ টুপি ও লাল সার্ট) স্বেচ্ছাসেবকরাই শোভাযাত্রা ও গণবিক্ষোভের প্রধান সংগঠক ছিল এবং তারাই ব্রিটিশ পণ্যবিক্রেতা সংস্থাগুলির সামনে পিকেটিং চালাত।

স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বকেও প্রভাবিত করেছিল। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের শেষে কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে মধ্যপন্থীদের অন্যতম প্রধান নেতা ও কংগ্রেস সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে বাংলায় ব্রিটিশ পণ্যবর্জনকে সমর্থন দেন। এই সময় তিলক ও চরমপন্থীদের উত্থাপিত সারা ভারতের সমুদয় প্রদেশে স্বদেশী আন্দোলন বিস্তারের এবং ভারতীয় জনজীবনের সর্বস্তরে বয়কট অনুসরণের প্রস্তাবটি মধ্যপন্থীরা বর্জন করে।

মধ্যপন্থী কংগ্রেস নেতারা যে গণ-আন্দোলন এড়াতে ক্রমেই অপারগ হচ্ছেন, কংগ্রেসের এই অধিবেশনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইসঙ্গে সম্ভাব্য সকল

পন্থায় সংগ্রামের পরিসর সীমিতকরণে তাদের চেষ্টার ফলে এদের সঙ্গে চরমপন্থীদের মতপার্থক্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বৈপ্লবিক সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেকার এই মতবৈষম্য প্রকটতর আকার ধারণ করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের বিকাশ ও গণ-আন্দোলন

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের শুরু থেকে আগামী বছরগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলন বাংলার শহর ও গ্রাম সহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাংলা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে অতঃপর চরমপন্থীদের কার্যকলাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'অনুশীলন সমিতি' নামে ঢাকায় গঠিত একটি বেআইনী বিপ্লবী সংস্থা দেশের আত্মগোপনকারী কর্মী ও বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সমন্বয়ের উদ্যোগ নিয়েছিল। বোম্বাই প্রদেশে এবং পঞ্জাবেও একই ধরনের সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্তসমিতিগুলি শহুরে পেটি-বুর্জোয়া স্তরগুলির, বিশেষত উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাত।

এই সময় বামপন্থী মতবাদ-ঘেঁষা নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় এবং এগুলির মধ্যে 'যুগান্তর' ও 'বন্দে মাতরম' খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ, গ্যারিবল্ডি, মাৎসিনি ও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে বহু পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে থাকে।

চরমপন্থীরা সারা দেশে গঠিত ক্রীড়াসমিতি ও যুবসংস্থা এবং স্বদেশী দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের গুপ্ত কার্যকলাপের আইনী আড়াল হিসাবে ব্যবহার করত। স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা জনগণের ব্যাপক অংশকে সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে শরিক করার প্রয়াস পেয়েছিল। কেবল শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেই তারা তাদের কার্যকলাপ সীমিত রাখে নি, শ্রমিক এমন কি গ্রামীণ জনগণের মধ্যেও প্রচার চালান হত।

সাধারণত জনসভা ও বিক্ষোভগুলি শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেও এগুলি শ্রমিক শ্রেণীরও সমর্থন লাভ করত। সেই ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে বোম্বাই বস্ত্রকলে কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের কার্যদিনের দৈর্ঘ্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। বাংলা সেই ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দেই ধর্মঘট আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

সেই বছর গ্রীষ্মে পূর্বভারত রেলপথে দুটি বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় সরকারী মুদ্রণালয়ের শ্রমিক ও বাবু-কর্মীরা শহরের পৌরসভা কর্মচারীদের সঙ্গে একযোগে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। এই বছরের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে এখানকার ব্রিটিশ মালিকানাধীন বস্ত্রকলেও কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্ম ও শরতের ধর্মঘটগুলি ছিল দিকচিহ্নকল্প, কারণ এতে শ্রমিকরা শুধু বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক দাবিই নয়, অনেকগুলি রাজনৈতিক দাবিও হাজির করেছিল। এক্ষেত্রে ব্রিটিশদের অনুসৃত বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ অবশ্যই উল্লেখ্য। রেলপথ ও বস্ত্রকল শ্রমিকদের এইসব ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সাহায্যে স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের এই সমাবন্ধ আসলে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একটি উল্লেখ্য অগ্রগতি হিসাবেই চিহ্নিতব্য।

চরমপন্থীরাও (বিশেষত বাংলা ও পঞ্জাবে) কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়াতে থাকে। ব্রিটিশ পণ্যবর্জনের জন্য ক্রমেই গ্রামাঞ্চলে অধিক পরিমাণ সভাসমিতি ও বিক্ষোভের চলে। চরমপন্থী প্রচারকরা কৃষকদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারপত্র ছড়াতে থাকে। এগুলিরই একটিতে বলা কুটিরশিল্প ধ্বংসকারী, আমাদের তাঁতি ও কামারদের পেশা হরণকারী এই চোরদের আমরা কী করে নিজেদের শাসক হিসাবে স্বীকার করব? তারা তাদের দেশে-তৈরি অজস্র পণ্য আমদানি করে, আমাদের বাজারে আমাদের জনগণের কাছে এগুলি বিক্রি করে, এভাবে আমাদের ধনদৌলত লুট করে, আমাদের জনগণের রুজি-রোজগার কড়ে নেয়। যারা আমাদের মাঠের ফসল লুট করে, আমাদের অনাহার, জ্বর ও প্লেগের মধ্যে ঠেলে দেয় তাদের আমরা কিভাবে শাসক ভাবব? যারা আমাদের উপর ক্রমাগত করের বোঝা চাপাচ্ছে সেইসব বিদেশীদের আমরা কিভাবে শাসকের স্বীকৃতি দেব?.. ভাইসব, আপনারা এগুলি যত সহ্য করবেন এই শঠরা ততবেশি আপনাদের শোষণ করবে। আপনাদের শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে, মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। ভাইসব, আমরা দুনিয়ার সেরা জাতি। আমাদের ধনদৌলতেই তারা কাজ কম না করে নিজেদের মেদ বাড়াচ্ছে। এরা আমাদের রক্তপায়ী। আমরা কেন এইসব সহ্য করব?... হিন্দু ভাইয়েরা কালী, দুর্গা, মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নামে শপথ করুন, মুসলমান ভাইরা আল্লার নামে কসম নিন আর গ্রামে গ্রামে আওয়াজ তুলুন—হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের সেবা করবে।... ভাইরা জাগুন! জন্মভূমির সুযোগ্য সন্তানের পরিচয় দিন, সাহসের সঙ্গে লড়াই করুন, বাংলা মায়ের জন্য প্রাণ কুরবানি দিতে প্রস্তুত হন!'

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এই আবেদন কোন আপাতিক ঘটনা নয়। সভা ও উপর নিষেধাজ্ঞা, 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ, সভা ভেঙ্গে দেয়া, ইত্যাকার প্রত্যক্ষ অবদমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় শত্রুতার ইন্ধন যুগিয়ে আন্দোলনে ফাটল ধরানোর জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করছিল। তাসত্ত্বেও ১৯০৫-১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তারা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মারাত্মক সংঘর্ষ বাধাতে পারে নি। বর্ধমান বৈপ্লবিক উদ্দীপনার এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল শক্তিশালী মুসলিম সামন্ত ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের দ্রুত সংগঠিত করে তোলে।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের শরতে নতুন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো'র (১৯০৬-১৯১০) সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের জন্য 'মুসলিম নেতাদের' একটি প্রতিনিধিদল গঠিত হয়। তাঁর কাছে দেয়া এই প্রতিনিধিদের স্মারকলিপিতে তাঁরা পৌরসভা ও আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাবি জানান। শক্তিশালী মুসলমান সামন্তদের উত্থাপিত এই দাবি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের সমর্থন পায়। ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা বিশেষ সুবিধা পাবে, প্রশাসনিক বিভাগে তাদের চাকুরির ব্যবস্থা হবে।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য লালনের জন্য এই বছর ডিসেম্বরে ঢাকায় 'মুসলিম লীগ' নামে ব্রিটিশের সহযোগী একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

একই বছর শাসকদের সমর্থনপুষ্ট হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী 'শ্রীভারত ধর্মমণ্ডল' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে ভারতীয় জাতিগুলির বিভিন্ন দলের মধ্যেকার বৈষম্যকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহারে ব্রিটিশরা ব্যর্থ হয়েছিল। মধ্যপন্থীরা কিছুটা শর্তসাপেক্ষে হলেও স্বদেশী আন্দোলনে তাদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছিল এবং তা ভারতীয়দের মালিকানাধীন পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থাগুলির উন্নতিতে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। ঠিক এই আন্দোলনের সময়ই টাটা ইস্পাত কোম্পানি তার ৭ হাজার অংশীদারের মধ্যে শেয়ার বণ্টন করেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়াদের মুখ্য অংশ তখন ব্রিটিশ পণ্যবর্জনের সুফলগুলি ভোগ করছিল। এটি সবিশেষ উল্লেখ্য যে, ১৯০৫-১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় কাপড়ের দাম ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বিলাতী কাপড়ের দাম ২৫ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

চরমপন্থীরা এতকাল যাবত মধ্যপন্থীদের থেকে খোলাখুলিভাবে আলাদা হওয়ার কথা চিন্তা করে নি। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের শরতে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে চরমপন্থীদের প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য তিলকের নাম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু মধ্যপন্থীরা এই নির্বাচন এড়ানোর জন্য

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের অবিসংবাদিত শ্রদ্ধেয় নেতা বিখ্যাত রাজনীতিবিদ দাদাভাই নওরোজীকে এই পদে অধিষ্ঠিত করে।

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন শুরু হওয়ার পর চরমপন্থীদের চাপে এই প্রথম 'স্বরাজের' দাবি উপস্থাপিত হয়। তৎকালে এটিকে স্বায়ত্তশাসিত অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের ধারানুসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন হিসাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

রুশ বিপ্লব দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল জাতীয় কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই এটি সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে। সভাপতি হিসাবে দাদাভাই নওরোজী সেখানে ঘোষণা করেন যে, যদি রুশ কৃষকরা কেবল স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তুতিই নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্রের কবল থেকে সেই অধিকারও ছিনিয়ে আনতে পারে, যদি এশিয়ার পূর্বে চীনে ও পশ্চিমে পারস্যে জাগরণ দেখা দিতে পারে, যদি ইতিমধ্যে জাপানের পক্ষে জেগে উঠা সম্ভব হয়, যদি রাশিয়া মুক্তির জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাতে পারে, তাহলে কিভাবে ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্যের মুক্ত জনগণ হিসাবে আমরা একটি স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে সম্পূর্ণ অধিকারবঞ্চিত অবস্থায় বসে থাকতে পারি?

জাতীয় আন্দোলনের উপর প্রথম রুশবিপ্লবের (১৯০৫) প্রভাব। সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়: স্বরাজ

প্রথম রুশবিপ্লব চরমপন্থীদেরই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সংবাদ ভারতে প্রধানত ইউরোপীয় বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমেই পৌঁছত এবং সেগুলি 'রুশী পদ্ধতি' হিসাবে চিহ্নিত সাধারণত বিচ্ছিন্ন ভীতিপ্রদ কার্যকলাপগুলির উপরই অধিক গুরুত্ব দিত। অবশ্য বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর বর্ণনা সহ গোপনে মুদ্রিত প্রচারপত্রগুলিও ভারতে পৌঁছেছিল। সেখানকার পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও গুপ্তদলগুলির সদস্যরা রুশবিপ্লবের স্বকীয় ব্যাখ্যানুসারে দেশপ্রেমিক যুবকদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাদান শুরু করেছিল।

ইউরোপে দেশান্তরী ভারতীয় বিপ্লবীরা রাশিয়ার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা বিসরণের সহায়ক হয়েছিল। ১৯০৫-১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রথমে লণ্ডনে ও পরে প্যারিসে একটি করে চক্র গঠন করে। এই উদ্বাস্তুদের সঙ্গে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের যোগাযোগ স্থাপিত হলে শেষোক্তদের মাধ্যমে ভারতীয়রা বিপ্লবের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্টুট্গার্ট

কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিরা ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। তাঁরা রুশবিপ্লবের বৈপ্লবিক দৃষ্টান্তের প্রতি ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা ব্যক্ত করেন।

রুশবিপ্লবের প্রতিধ্বনি ভারতে পেঁছনোর পর সেদেশের বৈপ্লবিক উদ্দীপনায় তা আরও উত্তেজনা সঞ্চার করে। জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ের অন্তিম সূচিত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর স্বদেশী আন্দোলন স্বরাজ লাভের আন্দোলনে রূপলাভ করতে থাকে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তে পঞ্জাবে এই গণ-আন্দোলনের কার্যকলাপ তুঙ্গে পেঁছয়। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনসভা, বিক্ষোভ ও ধর্মঘটে সেখানে শহুরে জনতার ব্যাপক স্তরের সঙ্গে শ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করে। লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংয়ের নেতৃত্বে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ইতিমধ্যেই জনসভার শরিক সিপাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। লাজপৎ রায় ও অজিত সিং গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হলে রাওয়ালপিণ্ডিতে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা সেটি দমন করে। পঞ্জাবের শহরগুলিতে সংগঠিত আনুষঙ্গিক বিক্ষোভগুলিতে স্থানীয় কৃষকরাও সমর্থন যোগায়। আন্দোলনটি সত্যিকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে।

বাংলায়ও আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। সেখানে ইতিমধ্যেই 'বন্দে মাতরম সম্প্রদায়' নামে গঠিত একটি গুপ্তসমিতি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন শুরু করে। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যাগে বাজার ঘেরাও ও ব্রিটিশ পণ্যধ্বংসের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তখন প্রায়ই সভা ও শোভাযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটত। এই জাতীয় একটি সংঘর্ষে কলিকাতায় একবার কিছু পুলিশ সেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

বিভিন্ন শহরকেন্দ্রে পুনরায় ধর্মঘট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মতো এবারও রেল-শ্রমিকরাই অগ্রগামীর ভূমিকাসীন ছিল। এই বছর বসন্তে বোম্বাইয়ের রেল-শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। অক্টোবর মাসে পূর্বভারত রেলপথের শ্রমিক ও বাবুশ্রেণীর কর্মীরা দশদিনের একটি সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেয়। ফলত, বাংলার অর্থনৈতিক জীবন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে: কয়লার অভাবে কলিকাতা ও অন্যান্য শহরের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, মাল খালাসের অভাবে অসংখ্য মালগাড়িতে স্টেশনগুলি ভরে ওঠে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য যে, ভাইসরয় তখন দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনক্ষুব্ধ একটি দেশে এতে ঔপনিবেশিক সরকারের ব্যাপক মর্যাদাহানি ঘটেছিল। বছরের শেষ পর্যন্তও নানা স্থানে ধর্মঘট অব্যাহত ছিল। আগের মতো এবারও এগুলি প্রধানত চরমপন্থীরাই সংগঠিত করেছিল।

জাতীয়তাবাদীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি। জাতীয় কংগ্রেস বিভাগ

বৈপ্লবিক সংগ্রামের গতিবেগ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকটতর মতবৈষম্য দেখা দিয়েছিল। শক্তিশালী ভারতীয় বুর্জোয়া, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ঊর্ধ্বতন স্তর ও জাতীয়তাবাদী জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে মধ্যপন্থীরা সংরক্ষণশীল নীতি প্রবর্তন, বিদেশী পুঁজির উপর সীমিত নিয়ন্ত্রণ, ভাইসরয় ও প্রাদেশিক গভর্নরদের অধীনস্থ আইন পরিষদগুলিতে বিত্তশালী শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন সম্প্রসারণ নিয়েই তুষ্ট ছিল। এরা এই পরিষদগুলিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কোন কোন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়ারও দাবি জানিয়েছিল।

চরমপন্থীদের অধিকাংশ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী না হলেও তারা সকলেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে জনগণের শরিকানা ব্যতীত যে সাফল্য অসম্ভব এটি তারা জানত। একদিন যে দেশে ফেডারেল প্রজাতন্ত্র গঠিত হবে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির বিলোপ ঘটবে, এতেও তাদের সন্দেহ ছিল না। দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে চরমপন্থীদের কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচি না থাকলেও জনগণের প্রতি তাদের আবেদনগুলি বিষয়গতভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রামে শরিক হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের আঞ্চলিক সংগঠনগুলির মধ্যে থেকে কার্যপরিচালনাব উপযোগী দেশব্যাপ্ত নিজস্ব সংগঠনের অনুপস্থিতি ছিল এদের দুর্বলতার মূল উৎস।

জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগমুক্তি এবং ধর্মঘট আন্দোলনের বিস্তারের ফলে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ঊর্ধ্বতন স্তর ও মধ্যপন্থীরা ভীত হয়ে পড়েছিল। বোম্বাইয়ের শক্তিশালী কারখানা-মালিক এবং গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মধ্যপন্থী নেতাদের বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে আপোসের সুর ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল।

জাতীয়তাবাদীদের দক্ষিণপন্থী অংশের পশ্চাদপসরণ ত্বরিত করার জন্য ভাইসরয় মিণ্টো আসন্ন শাসন সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন। ঔপনিবেশিক সরকার বাংলার জমিদারদের অধিকারগুলি অক্ষত রাখার আশ্বাস দিয়েছিল।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের বসন্তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার মধ্যপন্থীদের একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এর সদস্যারা 'বাংলার উচ্ছৃত বিক্ষোভ' নিয়ন্ত্রণে তাঁর সাহায্য চায়। অন্যান্য প্রদেশেও মধ্যপন্থীরা আনুগত্য প্রদর্শনে এগিয়ে আসে। সেই বছর গ্রীষ্মে বাংলার জমিদাররা সম্ভাব্য যেকোন গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করে।

এইসঙ্গে চরমপন্থীদের সমর্থন সংহত করার উদ্দেশ্যে তিলক সারা দেশে কয়েকটি পর্যটন-অভিযান চালান। সারা ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর বক্তৃতার পুরো বিবরণী প্রকাশিত হয়। 'ফৌজদারি বিধিকল্প ভারতীয় সংবিধান' বর্জনে তাঁর আহ্বান সমগ্র জাতির সমর্থন লাভ করে।

জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও এই পদে তিলকের নির্বাচন আদায়ের জন্য শেষাবধি চরমপন্থীদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুরাটে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের অধিকাংশ উপস্থিত সদস্যই ছিলেন দক্ষিণপন্থী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিলক পূর্ববর্তী অধিবেশনে গৃহীত স্বরাজ আন্দোলন ত্যাগ করার জন্য মধ্যপন্থীদের অভিযুক্ত করেন। সভাক্ষেত্রে হট্টগোল বাধলে মধ্যপন্থীদের উদ্যোগে পুলিশ ডাকা হয়। পরদিন দুই দল আলাদা আলাদা সভার আয়োজন করে। মধ্যপন্থীদের বক্তৃতা ও গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পনের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য চরমপন্থীদের একটি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তারা গণ-আন্দোলন বৃদ্ধির আবেদন করে। কংগ্রেস বিভাগই অতঃপর ভবিতব্য হয়ে ওঠে।

গণ-আন্দোলনের বিকাশ। বোম্বাইয়ের রাজনৈতিক ধর্মঘট

মধ্যপন্থীদের আত্মসমর্পণের পর বাংলার গণ-আন্দোলন মন্দাপর্বে প্রবেশ করে এবং গুপ্তসমিতিগুলির কার্যকলাপ বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসে পর্যবসিত হয়। এই সময় মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতে সংগ্রাম-কেন্দ্রের স্থানান্তর ঘটে।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের বসন্তে তিন্নাভেলি ও তুতিকরিনে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং এটি আঞ্চলিক চরমপন্থী সংগঠনের নেতৃত্বে একটি সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের রূপলাভ করে। আন্দোলনটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় নির্মমভাবে দমন করা হয়।

মহারাষ্ট্রের চরমপন্থীরা বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেকটি তালুকে নিজস্ব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালায়। তারা বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের মধ্যে তাদের কাজ বৃদ্ধি করে এবং কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এগুলিরই একটি, টেলিগ্রাফকর্মীদের ধর্মঘট অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রত্যাঘাত চালায়। বাংলায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনটি বেআইনী ঘোষিত হয়। জাতীয় স্লোগানচিহ্নিত পোশাক পরাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে ওঠে। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে

'রাজদ্রোহমূলক সভানুষ্ঠান বিধি' পাশ করা হয়। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সভা ও শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দেয়া চলত। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে 'সংবাদপত্র আইন' পাশ করা হয়। 'বিদ্রোহে উসকানি দানের' অজুহাতে এই আইনবলে যেকোন সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া যেত।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক এবং তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রসচিব মর্লির এই নীতি সম্পর্কে লেনিন লিখেছিলেন: 'স্বাধীন ব্রিটেনের সেরা উদারনৈতিক ও র‍্যাডিকাল প্রতিনিধিবর্গ, রুশ ও অরুশ কাদেতদের* আদর্শ, 'প্রগতিশীল' সাংবাদিকতার জ্যোতিষ্কস্বরূপ (আসলে পুঁজিতন্ত্রের তল্পিবাহক) জন মর্লির মতো মানুষরাও ভারতশাসনের দায়িত্ব পেলে রীতিমতো চেঙ্গিস খাঁ হয়ে উঠেন। নিজেদের অধীনস্থ জনগণকে 'শান্তকরণের' জন্য সম্ভাব্য যেকোন পন্থার আশ্রয়, এমন কি রাজনৈতিক প্রতিবাদীদের জন্য বেত্রদণ্ড অনুমোদনেও দ্বিধা বোধ করেন না।'**

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে চরম আঘাত হানার জন্য ঔপনিবেশিক সরকার ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের সংবাদপত্র আইনের আওতায় তিলককে গ্রেপ্তার করে। তিলকের গ্রেপ্তার ও বিচারের (১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩-২২ জুলাই) ফলে সারা বোম্বাই প্রদেশে গণবিক্ষোভ ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তিলকের সমর্থকরা বোম্বাইয়ের কলকারখানাগুলিতে ধর্মঘট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়।

বিচারে আত্মসমর্থনের জন্য প্রদত্ত বিবৃতিটিকে তিলক ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির তীব্র নিন্দায় রূপান্তরিত করেন। এই বক্তৃতার ফলে ভারতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং এটির খ্যাতি দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে।

জনগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিলক বিপুল অর্থদণ্ড সহ ৬ বছরের কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশ্য পরে এটি বদলে তাঁকে সাধারণ কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

দণ্ডাদেশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চরমপন্থীরা তাঁর কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডের প্রতিটি বছরের জন্য একদিন করে বোম্বাইয়ে ৬ দিনের সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে।

২৩ জুলাই সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হয়। বোম্বাইয়ের সকল কলকারখানার কর্মীরাই ধর্মঘটে যোগ দেয়, দোকানপাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। দেশাত্মবোধক স্লোগান ও তিলকের ছবিতে শহরটি ভরে ওঠে। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভার শরিকরা পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা ধর্মঘটের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হয় এবং এটি পরিকল্পনা মোতাবেক ছয়দিন পর প্রত্যাহৃত হয়।

* নিয়মতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্যরা। — সম্পাঃ

** V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 15, p. 184.

বোম্বাইয়ের এই ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণক্রমে লেনিন লিখেছিলেন: 'ভারতীয় গণতন্ত্রী তিলকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শৃগালেরা যে-জঘন্য দণ্ডাদেশ দেয়—দীর্ঘমেয়াদী নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি এবং এই সেদিন ব্রিটিশ কমন্স সভার এক প্রশ্নে প্রকাশ পেল যে ভারতীয় জুরিরা মুক্তির সপক্ষে ছিলেন আর দণ্ডাদেশটি পাশ হয় **ব্রিটিশ জুরিদের ভোটে!** গণতন্ত্রীদের উপর টাকার থলির সেবাদাসদের এই প্রতিহিংসায় বোম্বাইয়ে দেখা দেয় শোভাযাত্রা ও ধর্মঘট। ভারতেও প্রলেতারিয়েত ইতিমধ্যেই সচেতন, রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এই প্রেক্ষিতে ভারতে রুশী ধরনের ব্রিটিশ সরকারের নিশ্চিত ধ্বংস ঘটবে!'*

বোম্বাইয়ের এই ধর্মঘট ১৯০৫-১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর তুঙ্গাবস্থা হিসাবেই চিহ্নিতব্য। ইতিমধ্যে বাংলা ও পঞ্জাবে শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের ব্যাপক স্তর, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষকদের কোন কোন দল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দিতে শুরু করেছিল। বৈপ্লবিক কার্যকলাপে চরমপন্থীদের সক্রিয় শরিকানা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের সংগঠিত গণপ্রতিবাদ মূলত জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অন্তর্গত পেটি-বুর্জোয়া, গণতান্ত্রিক অংশের সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়েছিল। প্রথম রুশবিপ্লবের প্রভাব পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের কার্যকলাপের মধ্যে সর্বাধিক প্রকট হয়ে উঠেছিল। তারা এই ব্যাপক রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও সাধারণ ধর্মঘটের রুশী অভিজ্ঞতাকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং ভারতীয় অবস্থায় এটি অভিযোজনার প্রয়াস পেয়েছিল। পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের আদর্শগত অগ্রগতি ক্রমেই ভারতীয়দের জাতীয় ঐক্যের বর্ধমান উপলব্ধিতে প্রকটিত হয়েছিল এবং তা একটি নতুন স্তরে পেঁছেছিল। তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতাদের রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে এটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু ১৯০৫-১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ঘটনাবলীর স্থানীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রকটিত জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতা আসলে ছিল তৎকালীন দেশের ইতিহাসনির্ধারিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরাবস্থানেরই ফলশ্রুতি। জাতীয় শক্তির মধ্যে বিভেদ ও পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের দেশব্যাপ্ত সংগঠনের অভাবই ছিল এর দুটি প্রধান সমস্যা।

বিশ শতকের প্রথম দশকের ঘটনাবলী জাতীয় আন্দোলনে জনগণের শরিকানার সম্ভাবনা (সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সাফল্যের মৌল পূর্বশর্ত) স্পষ্ট হয়ে উঠলেও ভারতীয় জনগণের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ, কৃষকদের পক্ষে তখনো রাজনৈতিক

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 15, p. 184.

সংগ্রামে যোগদানের অপরিহার্য সামাজিক চেতনার বিশেষ স্তরে পেঁাছন সম্ভবপর হয় নি।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের এই পর্যায়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হল: ভারতীয় সমাজের যে শ্রেণী ও স্তরগুলি দ্বারা আগামী বিশের দশকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কালপর্বের ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামের চালিকাশক্তি গঠিত, এতেই তাদের রাজনৈতিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালীন এবং যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষ

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার

বোম্বাইয়ের রাজনৈতিক ধর্মঘটের পর গণ-আন্দোলনে কিছুটা মন্দাভাব সৃষ্টি হয় এবং ঔপনিবেশিকতাবিরোধী দলের ভাঙ্গন গভীরতর করার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-ভারতীয় শাসকদের অনুসৃত অভ্যন্তরীণ নীতির জন্যই অংশত এমনটি ঘটে। আগের মতোই ব্রিটিশ প্রশাসন গাজর দেখিয়ে কাজ হাসিলের পদ্ধতি অনুসরণ করছিল।

একদিকে তখন ঔপনিবেশিক সরকারের সক্রিয় বিরোধীদের উপর নির্যাতন চলছিল: ব্রিটিশবিরোধী গুপ্তসংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার্য ১৯০৮-১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত আইনগুলি (১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন; ১৯০৮ ও ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ফৌজদারি বিধি সংশোধন আইন) দ্বারা সন্ত্রাসসৃষ্টির একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল।

বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে সভা আহ্বান বন্ধের জন্য অস্থায়ী আইনটির (১৯০৭) আওতা ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ অবধি বাড়ানোর পর শেষে এটি অনির্দিষ্ট কাল চালু রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত নতুন ভারতীয় সংবাদপত্র আইনের আওতায় ঔপনিবেশিক শাসকরা জাতীয় সংবাদপত্রগুলিকে হয়রানি করার ব্যাপক ক্ষমতা পায়। আইনটি গৃহীত হওয়ার প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে শতশত ভারতীয় বইপুস্তিকা বন্ধ, বাজেয়াপ্ত কিংবা এগুলির উপর মোটা অঙ্কের জরিমানা চাপান হয়। সারা দেশে পুলিশী সন্ত্রাসের বন্যা দেখা দেয়।

অন্যদিকে তাদের সমর্থক বিত্তশালী শ্রেণীগুলির (রাজা, সামন্ত ও মুৎসুদ্দী) অবস্থান মজবুতের জন্য এবং জাতীয় আন্দোলনের মধ্যপন্থী নেতাদের সপক্ষে আনার জন্য ব্রিটিশরা নানাবিধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় মিণ্টো ও ভারতের রাষ্ট্রসচিব মর্লি নতুন ভারতীয়

পরিষদ-বিধি প্রবর্তন করেন। এটিই মর্লি-মিণ্টো সংস্কার নামে খ্যাত। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে বলবৎ এই নতুন বিধি অনুসারে ভাইসরয়ের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বাড়িয়ে মোট সংখ্যার অর্ধেক এবং বড় বড় প্রদেশে গভর্নরের আইন পরিষদে নির্বাচিত সদস্যেদের সংখ্যাগুরু করার ব্যবস্থা চালু হয়। এইসঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়: সাধারণ, জমিদার ও মুসলিম এবং মুসলমানদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি যেখানে জমিদার ও মুসলমানরা প্রত্যক্ষ ভোট দিত সেখানে সাধারণ তালিকাভুক্তদের নির্বাচন চলত দুটি-তিনটি পর্যায়ে। এই ব্যবস্থাবলীর দৌলতে সামন্ত ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা হিন্দু বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ঊর্ধ্বতন স্তরগুলির তুলনায় বিশেষ সুবিধাভোগী হয়ে ওঠে। এইসব ব্যবস্থার একটিই লক্ষ্য ছিল: হিন্দু-মুসলমানের 'বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন' পরিচালনা।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের শাসন সংস্কার ভারতীয় সংখ্যাগুরু জনসাধাণের স্বার্থকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করে নি। এতে ভোটদানের অধিকারী ছিল জনগণের মাত্র ১ শতাংশ মানুষ এবং আগের মতো পরিষদের ক্ষমতা ছিল উপদেশদানেই সীমিত।

বিত্তশালী শ্রেণীগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকারের সামাজিক সমর্থনের ভিত প্রশস্ততর করার লক্ষ্যেই নতুন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের (১৯১০-১৯১৬) অভ্যন্তরীণ নীতি পরিচালিত হয়েছিল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে এই প্রথম ব্রিটিশ সম্রাট ভারত পরিদর্শনে আসেন। মোগল প্রসাদে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে (দরবার) ভারত সম্রাট হিসাবে ৫ম জর্জের অভিষেক নিষ্পন্ন হয়। ব্রিটিশরাজের প্রতি সামন্ত-জমিদার শ্রেণীর আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য অনুষ্ঠিত এই রাজ্যাভিষেকে জনধিকৃত বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং আসাম, বিহার ও ওড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায় আর বিক্ষুব্ধ কলিকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

এই শেষ কার্যটি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিসংক্রান্ত বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এশিয়ায় প্রভাবাঞ্চল চিহ্নিতকারী ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে ভারতের সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে, বিশেষত তিব্বতে ব্রিটিশ প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দেই তিব্বতে একটি ব্রিটিশ সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। এশিয়ায় ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রানুসারে বিশ্বের এই অঞ্চলে ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে বর্ধমান সংঘাতের সম্ভাবনার নিরিখেই ভারতের ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা মুসলিম প্রাচ্যের দিকে তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করেছিল। স্মর্তব্য, অটোমান সাম্রাজ্যের যে-অংশ নিয়ে মুসলিম প্রাচ্যের রাজ্যগুলি গঠিত সেখানে জার্মান এজেন্টরা খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এইসঙ্গে ব্রিটিশরা আফগানিস্তানে তাদের ক্ষমতা মজবুতে সফল হয়েছিল। মোগল সম্রাটদের সিংহাসনে ব্রিটিশরাজের আইনসঙ্গত অধিকারলাভ ছিল (ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের চোখে)

ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান উভয়ের কাছে ঔপনিবেশিক সরকারের সম্মানবৃদ্ধিরই নামান্তর।

এই সময় ঔপনিবেশিক সরকারের পরিচালিত সাংস্কৃতিক নীতিও ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে এরই লক্ষ্যমুখী।

এই শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ

উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে, লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালে, মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের কতকগুলি সেরা নিদর্শন (প্রধানত তথাকথিত ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য) পুনর্গঠিত হয়। ইউরোপীয় প্রথাসিদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যম ধরনের কিছু ছবি ছাড়াও ভারতীয় কারুশিল্প, মধ্যযুগীয় মিনিয়েচর ও ভাস্কর্যগুলি বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত নতুন জাদুঘরগুলিতে (কলিকাতার মহারানী ভিক্টোরিয়া জাদুঘর, বোম্বাইয়ের প্রিন্স অব ওয়েল্‌স জাদুঘর) প্রদর্শিত হত। কিন্তু এইসঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অসংখ্য স্থাপত্যসৌধ অবহেলিত অবস্থায় ধসে যাচ্ছিল এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদের ব্যারাকের উপযোগী করার জন্য ঐতিহাসিক দুর্গগুলির (দিল্লীর লালকেল্লা, এলাহাবাদ, আহ্‌মদনগর ও অন্যান্য শহরের দুর্গগুলি) মারাত্মক বিকৃতি ঘটান হচ্ছিল।

ভারতের ঐতিহ্যানুসারী জাতীয় স্থাপত্যের নির্মাতা, পাথর-মিস্ত্রিদের বর্ণজাত কারিগররা এখন রাষ্ট্র বা ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে কোন বড় কাজের ফরমাশ না পেয়ে ক্রমেই লোপ পেতে শুরু করেছিল। গ্রামের বসতবাড়িতে এবং মফস্বল শহরের দালানকোঠায়ই কেবল এই ঐতিহ্য মোটামুটি টিকে ছিল। রেলস্টেশন ও অফিসের মতো সরকারী দালানগুলিতে তখনো প্রধানত ভিক্টোরীয় যুগের জাঁকজমকের রীতিই অনুসৃত হত এবং তা ছিল ভুয়ো-ক্লাসিক ও ভুয়ো-গথিকের সঙ্গে হিন্দুমন্দির ও মুসলিম প্রাসাদের সাজসজ্জার এক কুশ্রী মিশ্রণের নামান্তর। এই সময় তথাকথিত নব্যভারতীয় রীতির উন্মেষ ঘটে। এটি ছিল মূলত ভারতের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের, বিশেষত মোগল-যুগের প্রাসাদের কৃত্রিম অনুকরণ মাত্র। এই রীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে দেশের নতুন রাজধানী নয়া দিল্লীর (১৯১৩-১৯৩১) ইউরোপীয় এলাকার সরকারী দালানগুলি দ্রষ্টব্য।

পূর্ত-স্থাপত্যে এই নব্যভারতীয় রীতি বিস্তারের ব্যাপারটি ঔপনিবেশিক সরকারের 'রাজকীয় ঐতিহ্য' উন্নয়নের নীতির সঙ্গে বিজড়িত ছিল। কিন্তু এই শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় জনগণের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি ব্রিটিশ ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল চক্রের নবজাগ্রত কৌতূহলই আসলে এই রীতির উন্মেষে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পের প্রতি

সৃষ্টির ক্ষেত্রে কলিকাতার শিল্পকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, ব্রিটেনের শিল্প-ইতিহাসবিদ ই. বি. হ্যাভেল এবং তাঁর ভারতীয় সহকর্মী আনন্দ কুমারস্বামীর নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। ভারতীয় শিল্পকলা ও কারুশিল্পের গবেষণা ও পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

উনিশ শতকের শেষপাদে কতকগুলি কারুশিল্পের প্রতি কিছু ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের কৌতূহল বৃদ্ধি ভারতীয় ফলিত শিল্পের (পাথর খোদাই, ধাতুকার্য, কাঠখোদাই, অলঙ্কার, চীনামাটির দ্রব্যাদি, বস্ত্র, সূচিশিল্প ইত্যাদি) ঐতিহ্য রক্ষায় সহায়তা যুগিয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রধানত ইউরোপীয় ক্রেতাদের কথা মনে রেখে তৈরি কারুশিল্পগুলিতে (কাশ্মীরের শাল, দিল্লীর স্বর্ণকারদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী ইত্যাদি) কিছু বিদেশী প্রভাব দেখা দিয়েছিল।

দেশের ধ্রুপদী চিত্রকলার ঐতিহ্য অনুসারী ও উন্নয়নব্রতী বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের চিত্রাঙ্কন ও ছবিতে ইউরোপীয় এবং প্রাচ্যের (জাপান ও চীন) কলাকৌশল ব্যবহার শুরু করেছিলেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পের এই ঐতিহ্যের স্রষ্টা ছিলেন কলিকাতায় কর্মরত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। দেশে জ্ঞানবিস্তারের জন্য বিখ্যাত এই ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সন্তান হিসাবে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও সবিশেষ স্মরণীয়। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ শিল্পীই বাঙ্গালী বিধায় ভারতীয় শিল্পে এই আন্দোলন বাঙ্গালী রেনেসাঁস নামেই চিহ্নিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সারদাচরণ উকিলের শিল্পকর্মের মাধ্যমেই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা ও গ্রাফিক চিত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঔপনিবেশিক ভারতে জায়মান বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন ভারতীয় সংস্কৃতির উন্মেষের মধ্যে নতুন ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশই স্পষ্টতম বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকের দশকগুলিতে ভারতীয় লেখকরা ইউরোপীয় গদ্যসাহিত্য—উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়াগুলি আত্তীকরণ সম্পূর্ণ করেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যলগ্ন কাহিনীই ছিল অধিকাংশ ভারতীয় গণসাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং নাটক ও কাব্যেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষিতে অতীতকালীন যুদ্ধ ও অভ্যুত্থানের নায়কদের নিয়ে নিবিষ্ট থাকার মধ্যেই প্রধানত এই লেখকরা তাঁদের পাঠকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ লালনের একমাত্র সম্ভাবনা দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক ও বীরত্বপূর্ণ এইসব কাহিনীতে আবদ্ধ থাকা ছিল আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের রোমাণ্টিক পর্বের অবশ্যম্ভাবী দীর্ঘস্থায়িত্বেরই নামান্তর।

কিন্তু এটাও অবশ্য লক্ষণীয় যে, সত্যিকার সাহিত্যরসোত্তীর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়াও ভারতীয় সাহিত্যে এমন সব অনুকৃতিরও ব্যাপক অনুপ্রবেশ

ঘটেছিল যেখানে সামন্তবাদী অতীতের প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের মধ্যেই পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর রোমাণ্টিক বিশ্লেষণ পর্যবসিত হয়েছিল।

তথাপি বিশ দশকের গোড়ার দিকে এই রোমাণ্টিকতা থেকেই শেষাবধি বিশ্লেষণাত্মক বাস্তববাদের উন্মেষ দেখা দিয়েছিল: আলোচ্য লেখকদের ব্যবহৃত এইসব বীরত্বপূর্ণ ও রোমাণ্টিক ঘটনাগুলির মধ্যে ভারতীয় গদ্যের সামাজিক লক্ষ্য তার সামাজিক অভীষ্ট খুঁজে পেয়েছিল। শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদের প্রগতিশীল অংশের আকর্ষী সমস্যাগুলিই এইসব গ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করছিল। মুখ্য ভারতীয় লেখকদের রচনাবলীতে অতঃপর সামাজিক দ্বন্দ্বলগ্ন বিষয়গুলিই ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল।

নতুন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থানে অবস্থিত বাংলা সাহিত্যেই নতুন প্রবণতার উন্মেষ তখন সর্বাধিক প্রকটিত ছিল।

বাংলা সাহিত্য তখনো ভারতের নতুন সাহিত্যে তার নেতৃস্থান অটুট রেখেছিল। এই সময় বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অভ্যুদয় ঘটে যিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধ ব্যাপী সারা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, সঙ্গীত-রচয়িতা, শিল্পী, দার্শনিক, শিক্ষক ও জননেতা। তাঁর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, সাহিত্য-সমালোচনা, স্কেচ, দার্শনিক প্রবন্ধ ও নাটক ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য অবদান। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৭৬-১৯৩৮) তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের বাস্তবধর্মী ধারার দ্বিতীয় প্রখ্যাত লেখক। সমকালীন জীবনের বাস্তবতাচিহ্নিত তাঁর উপন্যাসগুলি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য অবদান।

আধুনিক যুগের অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যেও অভিন্ন ঘটনাবলীর নজির মেলে, সেগুলিতেও নতুন শৈলীর উন্মেষ ঘটছিল, বিশ্লেষণাত্মক বাস্তববাদ দেখা দিয়েছিল। মহারাষ্ট্রে এইসব প্রবণতার পথিকৃত ছিলেন আধুনিক মরাঠী গদ্যের পিতৃপুরুষ হরিনারায়ন আপ্তে (১৮৬৪-১৯১৯)। তাঁর চিন্তায় তিলকের প্রভাব সহজলক্ষ্য। অন্যান্যদের সঙ্গে হিন্দী (শ্রীনিবাস দাস, কিশোরীলাল গোস্বামী ইত্যাদি) এবং তেলেগু লেখকরাও (কলাচলম শ্রীনিবাস রাও, বেদান্ত ভেঙ্কটারায়া শাস্ত্রী ইত্যাদি) তাঁদের উপন্যাস ও নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যবহার করতেন। আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের জনক ফকিরমোহন সেনাপতি (১৮৪৭-১৯৪৮) তাঁর উপন্যাস 'ছয়বিঘা আটকাঠা জমি'তে (১৯০২) তৎকালীন ভারতের গ্রামীণ সমাজের মারাত্মক সমস্যাগুলির ছবি এঁকেছিলেন।

এই নতুন ধরনের রচনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী রচনাগুলি—কাব্য এবং অংশত নাটকেরও বিকাশ ঘটছিল। তখন, এমন কি কাব্যেও নতুনের দোলা

লেগেছিল, কবিতার আধেয় ও অন্তর্নিহিত বক্তব্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই সময় ভারতের আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মহম্মদ ইকবালের (১৮৭৩-১৯৩৮) রচনাবলী উর্দু, ফারসী ও পঞ্জাবীতে প্রকাশিত হতে থাকে। বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেই সামাজিক সমস্যা ও দেশপ্রেম ইকবালের কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল।

মুখ্য জাতীয় লেখক ও অন্যান্য নেতৃবর্গের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাকেন্দ্র এবং আলোচনামূলক সাহিত্য সাময়িকীগুলি ভারতের বিভিন্ন জাতির এই নতুন সাহিত্যের আবির্ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এগুলির মধ্যে ইতিহাস গবেষণা এবং হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের জন্য ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'কাশী নগরী প্রচারণী সভা' উল্লেখ্য। ভারতীয় সমালোচনা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে হিন্দী সাহিত্যে মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী, উর্দু সাহিত্যে মহম্মদ হোসেন আজাদ ও তামিল সাহিত্যে সুব্রাহ্মণ্য আয়ার স্বনামখ্যাত।

নব্যধারার লেখকদের রচনাবলীতে চলতি শব্দাবলীর ব্যবহার সহ একটি প্রাণবন্ত নতুন ভাষার উন্মেষ ঘটছিল। এ'দের মধ্যে ভাষাসংস্কারক হিসাবে অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন: তেলেগুতে কান্দুকুরি বিরেশালিঙম (১৮৪৮-১৯১৯) ও গুরুজাদা আপ্পারাও (১৮৬১-১৯১৫)।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে চালিত স্বাধীনতা আন্দোলন আধুনিক ও প্রথানুসারী সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও আবেদনের উপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। জনপ্রিয় নাট্যকলা এবং তৎকালীন সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রেও এটি বহুলাংশে প্রযোজ্য। এগুলিতে অতি সংক্ষেপে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের মুখ দিয়ে রূপকথার ভাষায় ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা জনগণের মধ্যে প্রচার করা হত। জনপ্রিয় শিল্পকলায় স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে ব্রিটিশবিরোধী গুপ্তসমিতিগুলির কর্মীদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত নীতিগুলি প্রতিধ্বনিত হত।

বিপ্লবী গুপ্তসমিতিগুলির কার্যকলাপ

এই শতকের গোড়ার দিকে গড়ে ওঠা এবং স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনে সক্রিয় বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতিগুলি গণ-আন্দোলনে মন্দাভাব দেখা দেয়ার পর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কৌশল গ্রহণ করে। বাংলার গুপ্তসমিতির মধ্যে ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' ও কলিকাতায় 'যুগান্তর পার্টিই' প্রধান ছিল। অন্যান্য শহর, এমন কি গ্রামেও এগুলি তাদের শাখা গঠন করেছিল। পুস্তিকা ও কলিকাতার 'যুগান্তর'-এর সংবাদ অনুসারে এই বিপ্লবী সমিতিগুলির আরব্ধ লক্ষ্য

ছিল: ভারতীয় যুবকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য লালন, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য যেকোন পথে সংগ্রাম চালানোর প্রস্তুতি এবং পরিশেষে সশস্ত্র আক্রমণ ও সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্যোগ। গুপ্তসমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'বর্তমান রণনীতি' নামক পুস্তিকার বক্তব্য অনুসারে: 'যদি অন্যকোন পন্থায় শোষণের অবসান ঘটান না যায়, যদি দাসত্বের কুষ্ঠরোগ আমাদের জাতির রক্তকে বিষাক্ত করে তোলে ও তার জীবনীশক্তি শোষে নেয়, তবে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।'

ভারতীয় আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের দ্বারা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের এই কৌশল গ্রহণ অনেকাংশেই ইউরোপীয় বিপ্লবী সংগঠনের, বিশেষত রাশিয়ার প্রভাবেই ঘটেছিল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে 'যুগান্তর পার্টির' অন্যতম সদস্য হেমচন্দ্র দাস পশ্চিম ইউরোপে যান এবং নির্বাসিত রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের সর্বত্র বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে 'বোমা ভক্তির' বন্যা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস ভারতীয় বিপ্লবীদের শেষলক্ষ্য ছিল না। যেসব ব্রিটিশ বা ভারতীয় গুপ্ত আন্দোলনের পক্ষে আশু বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিল কেবল তাদের বিরুদ্ধেই এটি প্রযুক্ত হত। গুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসকে ভারতীয় সমাজের মধ্যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির অনুঘটক হিসাবে বিবেচনা করতেন। বাংলার অন্যতম সন্ত্রাসবাদীদের নেতা বারীন ঘোষ লিখেছিলেন যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা কয়েকটি ব্রিটিশ হত্যার মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার কথা ভাবেন নি, তাঁরা কিভাবে বিপদ ও মৃত্যু বরণ করেন এটা দেখানোই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই বিভিন্ন গুপ্তসমিতির মধ্যে সন্ত্রাসের অর্থ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। 'যুগান্তর পার্টির' প্রধান উপদল—'মানিকতলা গার্ডেন সোসাইটির' মতে সন্ত্রাসের মধ্যেই তাদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রধান অংশ নিহিত ছিল। কিন্তু গোয়ালিয়রের 'নবভারত সমিতি' ও ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' ভাবী অভ্যুত্থানের লক্ষ্যেই তাদের কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত করেছিল।

মহারাষ্ট্রেও আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা সক্রিয় ছিল। সেখানকার সমিতিগুলির মধ্যে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে বিনায়ক ও গণেশ সাভারকর ভাইদের প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত' সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল। বাংলা ও মহারাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সমিতিগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুপ্ত সংগঠনও পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে সক্রিয় ছিল।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দেই বাংলা ও মহারাষ্ট্রে প্রথম সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক সরকার নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা গ্রহণ করে: হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্টদের মৃত্যুদণ্ড এবং গুপ্তসমিতির সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদী বা কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯০৮-১৯০৯

খ্রীস্টাব্দের মধ্যে 'মানিকতলা গার্ডেন সোসাইটি', 'অভিনব ভারত' ও 'অনুশীলন সমিতির' বিলুপ্তি ঘটে এবং বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ ও সাভারকর ভাইদের সহ বিপ্লবী গুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দ জেলবন্দী হন। কিন্তু এইসব নির্যাতন সত্ত্বেও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পুরোপুরি থেমে যায় নি। নিশ্চিহ্ন সমিতিগুলির স্থলে নতুন দল ও সংগঠন দেখা দিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 'অনুশীলন সমিতির' একটি শাখা, মহারাষ্ট্রে 'অভিনব ভারত সমিতি', কলিকাতায় 'রাজাবাজার' সমিতি ও পূর্ববঙ্গে 'বরিশাল সমিতি' ইত্যাদি খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ এবং পুলিশের দালাল শ্রেণীর ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে। ১৯০৯-১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এইরূপ ৩২টি ঘটনা ঘটে। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বিপ্লবীরা ভাইসরয় হার্ডিঞ্জকে হত্যার চেষ্টা করে এবং বোমাবিস্ফোরণে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন।

১৯০৫-১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির সময় আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে তাদের প্রচার জোরদার করেছিল। সৈন্য ও ননকমিশন্‌ড অফিসরদের তারা ভাবী অভ্যুত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ভাবত। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় অবস্থিত পঞ্জাবী সৈন্যদের মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটানোর একটি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাবের প্রধান শহর লাহোর সহ উত্তর ভারতের পাঁচটি গ্যারিসনে একসঙ্গে অভ্যুত্থান ঘটানোর একটি সতর্কতর প্রস্তুতি নিষ্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু ছদ্মবেশী জনৈক দালালের জন্য পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং সংশ্লিষ্টরা বন্দী হন। অতঃপর রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীন এর সংগঠকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন।

প্রথমত ও প্রধানত জনগণের সঙ্গে দুর্বল সংযোগ এবং কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির অনুপস্থিতির জন্যই আসলে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী এই বিপ্লবীদের পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। উল্লেখ্য বৈষয়িক সহায়-সম্পদহীন, নির্মম পুলিশী অত্যাচারের লক্ষ্যস্বরূপ এই বিচ্ছিন্ন ও অতি সীমিত সংখ্যক গুপ্তসমিতিগুলি কেবল ছাত্র, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত করেছিল। কোন কোন বছর গুপ্তসমিতিগুলির বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ ঘটলেও কোনদিনই এদের মধ্যে দেশব্যাপ্ত কোন সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার এই অভাবের কারণ আসলে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে, তার জাতি, অঞ্চল, বর্ণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিবন্ধের মধ্যেই মূলীভূত ছিল।

যেহেতু তখনো ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রথাসিদ্ধ নিয়মের দ্বারাই বিপুল সংখ্যাগুরু ভারতীয়রা চালিত হত, সেজন্য ধর্মীয় আধেয় ব্যতিরেকে কোন আবেদনই এই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এটি চরমপন্থী ও আত্মগোপনকারী সমিতিগুলির কার্যকলাপের ক্ষেত্র উভয়তই প্রযোজ্য। ১৯০৫-১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে এদের ভাবাদর্শ তাই ব্যাপকভাবে অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবাধীন হয় (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের পর সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগক্রমে তিনি ধর্মসংস্কার, শিক্ষা ও দার্শনিক সমস্যাবলী ব্যাখ্যায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন)। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সংহতির বিবিধ আবেদন প্রচার সত্ত্বেও কেন বিপ্লবী গুপ্তসমিতিতে কেবল হিন্দুরাই যোগ দিয়েছিল, এতেই তা ব্যাখ্যেয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের র‍্যাডিকাল অংশের কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির কাঠামোর মধ্যেই এগিয়ে চলছিল।

নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের র‍্যাডিকাল প্রবণতাগুলি শুধু খোদ ভারতেই নয়, দেশের সীমান্তের বাইরেও বিকশিত হচ্ছিল। প্রবাসী ভারতীয়রা প্রথমে ইউরোপে এবং শেষে আমেরিকা ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বহু বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। প্রবাসী ভারতীয়দের এরূপ প্রথম কেন্দ্রটি ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা নামক জনৈক প্রবাসী ভারতীয় সেখানে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল' সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণবর্মার উদ্যোগে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' নামের সাময়িকীটি পাঠকদের ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কৃষ্ণবর্মার 'ভারত ভবন' নামের যে-বাড়িটিকে কেন্দ্র করে প্রবাসী ভারতীয়রা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, আসলে সেটি ছিল ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের একটি আবাসিক ভবন। কৃষ্ণবর্মা ছাড়াও সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিলেন বিনায়ক সাভারকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এস. রাভাভাই রানা, ভি. ভি. এস. আয়ার প্রমুখরা। পুলিশী অত্যাচারের ফলে লণ্ডন দলের অধিকাংশ সদস্যই ১৯০৯-১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস চলে যেতে বাধ্য হন। ১৯১০-১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল।

প্যারিসের দলটি গঠিত (এর প্রধান সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আর. কামা, হরদয়াল এবং লণ্ডন থেকে আগত কৃষ্ণবর্মা, এস. রাভাভাই রানা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভি. ভি. এস. আয়ার প্রমুখরা) হওয়ার পর ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বামপন্থী দলগুলির আন্তর্জাতিক সংযোগের পরিসর বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অথচ ইতিপূর্বে

এটি ব্রিটিশ উদারনৈতিক ও শ্রমিক দলের সদস্যদের মধ্যেই মূলত সীমিত ছিল। কামা, রানা, হরদয়াল প্রভৃতিরা শুধু ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গেই নয়, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ, বিশেষত প্রবাসী রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে (সোশ্যাল ডেমোক্রাট) এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকের সঙ্গেও সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারিস কেন্দ্রটি ভারতীয় গুপ্তসমিতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে এবং সেখানে তাদের প্রকাশিত সাময়িকী 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' (কৃষ্ণবর্মা সম্পাদিত) ও 'বন্দে মাতরম' (কামা ও রানা সম্পাদিত) ভারতে পাঠায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্যারিসের ভারতীয় বিপ্লবীদের কেন্দ্রটি বস্তুত ভেঙ্গে পড়ে: কামা ও রানাকে অন্তরীণ করা হয়, কৃষ্ণবর্মা সুইজারল্যাণ্ডে ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার্লিনে পালান। তাঁদের প্রকাশিত সাময়িকীগুলিও বন্ধ হয়ে যায়।

ইউরোপের এই সংগঠনগুলি ছাড়াও এই সময় উত্তর আমেরিকায় — কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ওইসব দেশের কারখানা ও অফিসের স্থানীয় সহকর্মীদের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের দাবি নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রবাসী ভারতীয়রা প্রথম সংগঠনগুলি (যেমন 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান লীগ') গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সেখানে আগত ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রভাবে অচিরেই এই সংগঠনগুলি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কানাডায় আগত বাঙ্গালী বিপ্লবী তারকনাথ দাস ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালনায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তারকনাথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে 'ফ্রি হিন্দুস্তান' নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ শুরু করলে সেটি প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারকনাথের সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদ ছিল সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতার সমালোচনায় অনুরঞ্জিত। 'লেভ তলস্তয়ের কাছে খোলা চিঠি' নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি সার্বজনীন মানব-ভ্রাতৃত্বে নিজ আস্থা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যেকোন বর্ণ, জাতি, সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক অন্যদের শোষণের বিরোধিতা করেছিলেন। তারকনাথ এই প্রচারের মাধ্যমে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিত তৈরি করেছিলেন যার মূলে সংগঠক ছিলেন হরদয়াল।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে সান ফ্রান্সিস্‌কো পৌঁছনোর পর অচিরেই হরদয়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী ভারতীয়দের এক উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে 'গদর' (বিদ্রোহ) নামক একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নামটি ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের স্মৃতি থেকেই চয়িত হয়েছিল। সেই বছরেই আমেরিকা প্রবাসী বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত একটি কংগ্রেসে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামক যে-সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল তারও মূলে ছিলেন

হরদয়াল। অচিরেই সংস্থাটিকে 'গদর' নাম দেয়া হয়। আমেরিকা এবং জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, চীন ইত্যাদি সহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহু দেশে এটির শাখা-প্রশাখা জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এর সদস্যরা ভারতে অভ্যুত্থান ঘটানোর বহু পরিকল্পনা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দলনেতাদের পরিকল্পনা মোতাবেক বিপ্লবীদের কোষকেন্দ্র হিসাবে কাজের জন্য প্রবাসীদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রবাসীদের (যাদের কেউ কেউ ছিল খুবই ধনী) কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে অস্ত্রশস্ত্রও ক্রয় করা হয়েছিল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'গদর' এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মার্কিন প্রবাসী দলনেতাদের প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি খোদ ভারতেও প্রচারিত হওয়ার ফলে সেগুলি জনগণের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার পক্ষে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রভাবিত হয়েছিল।

যুদ্ধকালীন ভারতীয় পুঁজি

১৯১৩-১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি ভারতীয় ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে পড়লে উৎপাদন এবং পণ্যসংবহন উভয়তই ভারতীয় মালিকানাধীন অনেকগুলি সংস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূলত ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চারিত্র্যের ফল হিসাবেই এবং সরকারের কাছ থেকে ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি থেকে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-পুঁজি কোন সাহায্য না পাওয়ার জন্যই এমনটি ঘটেছিল।

যুদ্ধের বছরগুলিতে ভারতে ব্রিটিশ শোষণ তীব্রতর হয়েছিল। প্রচুর পরিমাণ খাদ্য, কৃষিজাত ও শিল্পলগ্ন কাঁচামাল, খনি ও ধাতুশিল্প উৎপাদের একটি বৃহৎ অংশ রপ্তানি করার ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ অর্থদপ্তর সাধারণ ভারতীয় করদাতাদের উপর চাপসৃষ্টির মাধ্যমে বিপুল যুদ্ধব্যয় সাশ্রয়ের প্রয়াস পেয়েছিল। এই নীতির ফলে কেবল জনসাধারণই নয়, ভারতীয় বিত্তশালীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকার এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল (১৯১৪-১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চলতি কাগজী মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ত্রিগুণিত হয়েছিল) এবং রূপার দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটার ফলে দেশের আমদানি ও রপ্তানিতে মারাত্মক ঘাটতি দেখা দেয়। এই সবই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।

অর্থ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ ও শাসন, ভারতীয় সংস্থাগুলির কাছে বড় বড় সামরিক ফরমাশ এবং সরকার কর্তৃক দেশীয় বাজারে ব্যাপক ক্রয় তখন ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের উন্মেষে সহায়তা দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের অনুসৃত অর্থনীতিজাত বর্ধমান বিধি-নিষেধের ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলির ভারতীয় মালিকদের কার্যকলাপে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হয়েছিল।

এইসঙ্গে স্থানীয় বুর্জোয়াদের সম্পদবৃদ্ধিরও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ভারত থেকে ব্রিটিশ সংস্থা ও বিভাগগুলির ক্রীত পণ্যসামগ্রীর একটা বড় অংশই ভারতীয় শিল্পপতিদের কারখানাগুলিই তৈরি করেছিল। এই সময়ে ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির সংখ্যা ও সেগুলির মোট পুঁজি যথাক্রমে ১০ ও প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমদানীকৃত ও হাতে-তৈরি কাপড়ের পরিমাণ তখন কমছিল, ভারতীয় মিল-বস্ত্র ও দেশে এগুলির ব্যবহার যথেষ্ট বেড়েছিল এবং এটি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধের বছরগুলিতে ভারতীয় কারখানা-মালিকদের মুনাফার হার ও পরিমাণে যথেষ্ট বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল।

জনগণের বৃহত্তম অংশের বর্ধমান দারিদ্র্য এবং মৌলিক যন্ত্রপাতি আমদানির সুযোগের অভাবে অভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কোচনের ফলে বহু অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। এমতাবস্থায় ভারতীয় শিল্পপুঁজিপতিদের বিভিন্ন দল এবং বণিক ও মহাজনদের সঞ্চিত অর্থলগ্নির তেমন কোন সুযোগ ছিল না।

এইসবই জাতীয় বুর্জোয়াদের গৃহীত রাজনৈতিক পদক্ষেপকে প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ সামরিক উদ্যোগের প্রতি সার্বিক সমর্থন সত্ত্বেও এদের ব্যাপক স্তরের মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'জাতীয় কংগ্রেস' ও 'মুসলিম লীগ' (প্রধান জাতীয় সংগঠন) উভয় সংগঠনের মধ্যেই এই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালীন ও যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। 'হোমরুল' আন্দোলন

গণ-আন্দোলন মন্দাপর্বে প্রবেশ করার পর চরমপন্থীদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে তারা প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তিলক তখন জেলখানায় এবং অরবিন্দ ঘোষের মতো কেউ কেউ ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রাম ত্যাগ করেছেন আর বিপিনচন্দ্র পাল ও তাঁর অনুগামী তৃতীয় দলটি ততদিনে

মধ্যপন্থী হয়ে উঠেছে। সেই সময় গুপ্তসমিতিগুলি অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে মধ্যপন্থী পরিচালিত কংগ্রেসের নেতারা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষণায় দ্বিধান্বিত ছিলেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের গৃহীত সংবিধানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে 'সাংবিধানিক উপায়ে' ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভকেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের কৌশলের জন্য বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের নেতৃপদে নির্বাচন অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু অচিরেই চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী সাধারণ কর্মীদের মধ্যে পুনরায় সমঝোতা গড়ে তোলার লক্ষণ দেখা দেয়।

জেলমেয়াদ শেষে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে তিলক মুক্তিলাভ করেন। রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর পুনরাবির্ভাবের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট ব্যাপক উদ্দীপনা আসলে জাতীয়তাবাদীদের কাছে তিলকের অক্ষয় জনপ্রিয়তাকেই প্রকটিত করেছিল। কর্তৃপক্ষের কিছুটা চাপে এবং কিছুটা কৌশলগত কারণে তিলক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা সহ সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের নিন্দা করেন। বয়কট কর্মকৌশলকে গণ-আন্দোলনভিত্তিক রাজনৈতিক বিক্ষোভে রূপান্তরণই অতঃপর তিলকের অনুসৃত পথের মূললক্ষ্য হয়ে উঠেছিল এবং ফলত ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে চরমপন্থীরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিলক ও তাঁর অনুগামীরা 'হোমরুল', অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান থিয়সফিক্যাল সোসাইটির' নেতৃ আনি বেশান্ত প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে তাঁদের কর্মসূচি হিসাবে বেছে নেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে তিলক পুনায় 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর অনুগামীদের একটি সংগঠনে একত্রিত করেন। এই বছরের মধ্যেই কর্মীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই লীগের বহু শাখা গড়ে তুলে এবং শরৎকালে আনি বেশান্তের নেতৃত্বে মাদ্রাজে 'নিখিল ভারত হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানোর এই সাফল্যের প্রেক্ষিতে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে তিলকের অবস্থান মজবুত হয়ে ওঠে। এইসঙ্গে একদিকে তাঁর নমনীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধির ফলে তিলক এবং গোখলে ও মেহ্‌তার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সমঝোতার পথ প্রশস্ত হয়। ১৯১৫-১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের আলাপ-আলোচনার ফলে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত কংগ্রেস সংবিধানের নিষেধাজ্ঞাটি প্রত্যাহার করা হয় এবং ফলত ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থীরাও যোগদান করেন। এই অধিবেশনে হোমরুল লীগের কার্যকলাপের প্রতি কংগ্রেস অনুমোদন দেয়।

হোমরুল লীগ অতঃপর চরমপন্থীদের সাংগঠনিক কাজের ভিত্তি তৈরি করে

এবং খোদ আন্দোলনই জনগণের ব্যাপক স্তরকে বিশেষত মধ্যবিত্তদের এই স্বায়ত্তশাসন লাভের সংগ্রামে বিজড়িত করার উপায় হয়ে ওঠে।

কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে আইনী কার্যকলাপরত জাতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির ঐক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এতে কংগ্রেসের দুটি দলের ঘনিষ্ঠতা ছাড়াও নতুন নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের সঙ্গেও একটি চুক্তিতে পৌঁছন গিয়েছিল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের আন্দোলনের মধ্যে একটি নতুন গণতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। মুসলিম পেটি-বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতিতে যোগদানের নতুন ঘটনা থেকেই এটি উন্মেষিত হয়েছিল। এই নতুন প্রবণতার তাত্ত্বিকদের মধ্যে নোমানি শিবলী, আবুল কালাম আজাদ, মুহম্মদ আলী সবিশেষ উল্লেখ্য। তাঁদের বক্তৃতা ও রচনাবলীর মধ্যে ভারতের শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিতকরণের এবং দেশের গণসংগঠনগুলির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেষ্টা সহজলক্ষ্য।

নরমপন্থী ধরনের হলেও আজাদ সম্পাদিত 'আল্ হিলাল', মুহম্মদ আলী সম্পাদিত 'কমরেড' ও জাফর আলী খাঁ প্রকাশিত 'জমিদার' সংবাদপত্রগুলি ঔপনিবেশিক সরকারের সমালোচনা করত। ১৯০৫-১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীতে আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা তাঁকে মুসলিম মধ্যবিত্তদের মধ্যে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল। আজাদ, মুহম্মদ ও শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে সংহত মুসলিম লীগের বামপন্থীরা সংগঠনের রাজনৈতিক লক্ষ্য পরিবর্তনের জন্য প্রচার শুরু করেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে এটির সংবিধান সংশোধিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ এই সংগঠনের ঘোষিত নীতি হয়ে ওঠে। এটি তখনো মূলত সাম্প্রদায়িক থাকলেও বর্তমানে অন্যান্য জাতীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে সহযোগিতা বিস্তারের অপরিহার্যতার কথা এতে উল্লিখিত হয়েছিল।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে সভাপতি পদে আজাদ ও অন্যান্য বামপন্থীদের সমর্থিত মুহম্মদ আলী জিন্নার নির্বাচনের ফলে লীগের মধ্যে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল।

এই পরিবর্তনের ফলে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিসম্পাদনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এই চুক্তি ছিল সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির ঐক্যবন্ধনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সূচকস্বরূপ। লক্ষ্মৌ চুক্তি মোতাবেক নির্বাচিত বিধান পরিষদগুলিতে লীগকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের (যারা কেবল বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হবে) একচেটিয়া অধিকার দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের

এই নীতির সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপোস হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন রাখার ব্রিটিশ নীতির অব্যাহত অস্তিত্বকেই যুক্তিসিদ্ধ করে তুলেছিল। অবশ্য কংগ্রেস ও লীগের (লক্ষ্ণৌতেও মুসলিম লীগের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়) মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিকে ব্যাপক ভারতীয় জনগণ দেশের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের লক্ষণ হিসাবেই দেখেছিল।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর
রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রারম্ভিক পর্যায়

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ভাবী নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) আগমন তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি দেশে ফিরেছিলেন ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে। গুজরাটের এক সমৃদ্ধ বণিক পরিবারে গান্ধীর জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষরা গুজরাটের একটি ছোট দেশীয় রাজ্যের কর্মচারী ছিলেন। ব্রিটেনের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর গান্ধী আইন ব্যবসায় ১৯০৩-১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ অবধি দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটান। ওখানেই তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের হাতেখড়ি। সেখানে নিষ্ঠুর বর্ণবৈষম্যের শিকার প্রবাসী ভারতীয়দের (তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক) অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসের সেই বছরগুলিতেই গান্ধীর দার্শনিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবাদর্শগুলি মোটামুটি রূপলাভ করেছিল। স্মর্তব্য, পরবর্তীকালে এর ভিত্তিতেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কৌশলটি নির্ধারিত হয়েছিল। সেখানেই তিনি অহিংস প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহের নীতিগুলি প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাবেই মূলত এর উদ্ভব ঘটেছিল। রাশিয়ার বিপ্লব-পরিত্যক্ত অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে দেশব্যাপী সংঘটিত রাজনৈতিক ধর্মঘট থেকে গান্ধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর চাপসৃষ্টির উপায় হিসাবে সংগঠিত গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন। রাশিয়ার ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ঘটনাবলীর মূল্যায়নের সময় গান্ধী লিখেছিলেন যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শাসকও শাসিতদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাসনকার্য চালাতে পারেন না। অহিংসা সম্পর্কে তলস্তয়ের লেখা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম অসহযোগ আন্দোলন, অর্থাৎ সংগঠিতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অনুসৃত বর্ণবৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন।

প্রত্যেকটি প্রচার শুরুর আগে গান্ধী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

করতেন। তিনি এমন কি, সত্যাগ্রহ চলাকালেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় পৌছনোর প্রয়াস পেতেন। নিজ কাজের অহিংস, শান্তিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণক্রমে তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর অনুগত্য দেখাতেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত একটি ভারতীয় চিকিৎসকদল জুলুদের এলাকায় সামরিক অভিযান পরিচালনার সময় ঔপনিবেশিক সৈন্যদের পক্ষে কাজ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর নিজস্ব প্রদেশ গুজরাট থেকে কৃষকদের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তির জন্য প্রচার চালিয়ে তিনি ব্রিটিশদের সহায়তা দিয়েছিলেন।

আফ্রিকায় কয়েকটি অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য এবং সংবাদপত্রে, বিশেষত নিজের সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' (ভারতের স্বায়ত্তশাসন সমর্থক) কাগজে প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ খোদ ভারতে ক্রমান্বয়ে গান্ধীর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সত্যাগ্রহের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য গান্ধী গুজরাটের বুর্জোয়াদের সহায়তায় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আহ্মদাবাদে 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। অতঃপর ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে রাজকোট রাজ্যে কতকগুলি শুল্ক বাতিলের জন্য, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের বাইরে কাজের জন্য কুলিদের নিয়োগ প্রথা সংস্কারের দাবিতে এবং এই বছরের শেষে-১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিহারে ব্রিটিশ আবাদ-মালিকদের চাষী শোষণের বিরুদ্ধে তিনটি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় তিনি সাফল্যলাভ করেন। এইসব আন্দোলন জনমনে গভীর ছাপ ফেলেছিল এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনের একেবারে অগ্রভাগে গান্ধীর স্থান পাকাপোক্ত করেছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে বিজড়িত করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীরা তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলী মাধ্যমেই নিশ্চিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বিপ্লবী গুপ্তসমিতি

যুদ্ধকালে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয় বিপ্লবী সমিতিগুলি পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইউরোপে যুদ্ধশুরু ও অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্য ও নৌবাহিনীর প্রধান অংশ প্রেরিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে 'গদর' পার্টির নেতৃবৃন্দ ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পক্ষে খুবই অনুকূল ও সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম মাসগুলিতে পার্টি-নেতৃবৃন্দের আহ্বানে পার্টিসদস্য ও সমর্থক হাজার হাজার প্রবাসী ভারতীয় নানা পথে, প্রধানত চীন, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ দিয়ে দেশে ফিরেছিল। সোহান সিং ভাকনার নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক 'গদর'-নেতাও তখন ভারতে আসেন। ১৯১৪-১৯১৫

খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৮ হাজার ভারতীয় দেশে ফিরেছিল। ভারতে অস্ত্রশস্ত্রের বড় বড় চালান পাঠানোর কিছু কিছু ব্যর্থ চেষ্টাও করা হয়েছিল। দেশে ফিরে 'গদর'-সদস্যরা স্থানীয় গুপ্তসমিতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সফল হন। তদুপরি বার্লিন কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত প্রবাসী সংগঠনগুলিরও সমর্থন এ'রা পেয়েছিলেন। এভাবে 'গদর'-সদস্যরা অভ্যুত্থানের আয়োজন শুরু করেছিলেন। অধিকাংশ 'গদর'-সদস্যই ছিলেন শিখ এবং সেজন্য পঞ্জাবে এই পার্টির প্রভাব ছিল খুবই ব্যাপক।

এই অভ্যুত্থানে ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যদের চূড়ান্ত ভূমিকাসীন হওয়ার কথা ছিল। এদের মধ্যে 'গদর' পার্টি সফল ব্রিটিশবিরোধী প্রচার চালিয়েছিল। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনেকগুলি গ্যারিসনে বিদ্রোহ শুরুর সম্ভাব্য তারিখটি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছিল। কিন্তু দুর্বল সংগঠন এবং 'গদর'-সদস্যদের সাধারণ স্তরে এজেন্টদের অনুপ্রবেশ ও এদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষঙ্গিক খবরাদি ফাঁস হওয়ার ফলে নাটকীয় ব্যর্থতা অবধারিত হয়ে উঠেছিল। হাজার হাজার আত্মগোপনকারী কর্মী এবং পঞ্জাবে 'কৃষক আন্দোলন' সংগঠকদের গ্রেপ্তার ও বিচারে সোপর্দ করা হয়। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বরে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সিপাহী বিদ্রোহটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিধায় এটিকে সহজেই দমন করা গিয়েছিল। এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও 'গদর'-সদস্যরা সংগ্রাম অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্ব ও বৈষয়িক সহায়-সম্পদের অভাবে এইসব উদ্যোগ অচিরেই হতাশায় পর্যবসিত হয়। যুদ্ধের শেষ নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সবকটি 'গদর'-কেন্দ্র ভেঙ্গে পড়েছিল।

'গদর' আন্দোলনের সমান্তরালে ভারত থেকে বলপূর্বক ব্রিটিশ সরকার উৎখাতের আর একটি প্রচেষ্টাও চলছিল। এটি ছিল দেওবন্দের মুসলিম ধর্মীয় বিদ্যালয় দার-উল-উলেমাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা মুসলমান জাতীয়তাবাদীদের গুপ্তসমিতির উদ্যোগ। মুসলিম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের জাতীয় বিপ্লবী অংশের চরম বামপন্থী তাত্ত্বিক মাহ্‌মুদ হাসান ছিলেন এর নেতা। মাহ্‌মুদ হাসান ও তাঁর অনুগামীরা প্যান-ইসলাম এবং তুরস্কের খলিফার অধিকার রক্ষার নামে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। দেওবন্দ-কেন্দ্র ভারতবহিঃস্থ মুসলমানদের সঙ্গে এবং ব্রিটিশবিরোধী সরকারগুলি, বিশেষত জার্মান ও তুরস্কের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিল। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মাহ্‌মুদ হাসানের অন্যতম সহকর্মী ওবায়েদউল্লাহ সিন্ধী বার্লিনের প্রবাসী কেন্দ্রের প্রতিনিধি এবং জার্মান সামরিক ও কূটনৈতিক মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কাবুল পেঁছিন। এইসঙ্গে তিনি আফগানিস্তানের আমির হাবিবুল্লাহকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্ররোচিত

করারও চেষ্টা করেছিলেন (যার ফলে সীমান্তের পাঠান উপজাতিগুলির মধ্যেও অভ্যুত্থান দেখা দিত)।

কিন্তু হাবিবুল্লাহ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণে অবিচল ছিলেন। 'সিল্ক ল্যাটার কন্সপিরেসি' নামে খ্যাত এই ষড়্‌যন্ত্রটির পরিকল্পনা ব্রিটিশের হস্তগত হয় এবং এর সদস্যরা শাস্তিভোগ করেন।

ভারতের অভ্যন্তরীণ বিপ্লবী এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত প্রবাসী ভারতীয় উভয়ই যুদ্ধে ব্রিটিশের শত্রুপক্ষের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে গঠিত বার্লিন কমিটিই প্রধানত জার্মান ও তুরস্ক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার কাজে সচেষ্ট ছিল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে এই কমিটি একটি কর্মসূচির মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে যুদ্ধঘোষণা করেছিল। সেইসময় হরদয়াল ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সেরা বিপ্লবীরা বার্লিন-কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে এই কমিটির সাহায্যে কাবুলে নির্বাসিত অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকাতউল্লাহ ও ওবায়েদউল্লাহ। ১৯১৬-১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে এই অস্থায়ী সরকার তিন তিন বার রাশিয়ার জার-সরকারের কাছে ও পরে অস্থায়ী রুশ সরকারের কাছে সরাসরি সাহায্যের আশায় প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

জার্মান সরকার বা তুরস্ক সাম্রাজ্য কেউই যে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামকে সমর্থনদানে উৎসাহী নয়, এই সত্যটি যুদ্ধের শেষ নাগাদ জাতীয় বিপ্লবীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বার্লিন-কেন্দ্রের অধিকাংশ সক্রিয় সদস্যই স্টোকহোল্‌মে চলে যান এবং সেখান থেকে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী প্রচার-আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে প্রভূত 'দাহ্য পদার্থ' পুঞ্জীভূত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনে তিনটি ধারা—মধ্যপন্থী, চরমপন্থী ও জাতীয় বিপ্লবী—এদের কোনটিই ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারে নি। অবশ্য এইসব ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের কার্যকলাপ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উন্মেষের ক্ষেত্রে অপরিহার্য কিছু উপাদান সংযোজিত করেছিল। স্মর্তব্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং রাশিয়ায় মহান অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার ফলেই ভারতে এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

সাম্প্রতিক ইতিহাস

গ্রিগোরি কতোভস্কি

প্রথম বৈপ্লবিক উচ্ছ্রয় এবং রাজনৈতিক গণসংগঠনের উন্মেষ (১৯১৮-১৯২৭)

রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট সৃষ্টি করেছিল এবং এর অংশ হিসাবে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়ও সংকট দেখা দিয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রাচ্যের রাজনৈতিক জাগরণের ফলে সেখানকার জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। বিশ শতকের বিশের দশকগুলির গোড়ার দিকে ভারতে সংঘটিত ঘটনাবলী এশিয়ার প্রায় সবকটি আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশ সহ এই মহান আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায়ই ভারতবর্ষ ইতিহাসের সাম্প্রতিক পর্বে প্রবিষ্ট হয়েছিল।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের জোয়ার

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ তার প্রধান উপনিবেশের উপর অধিকাংশ সামরিক ব্যয়ের বোঝা চাপানোর ফলে ভারতের উপর শোষণ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল এবং সাধারণ মানুষ এর মারাত্মক ফলভোগ করেছিল।

যুদ্ধকালীন বিশ্ব-অর্থনীতির অব্যবস্থার দরুন ভারতের পাট, তুলা, তৈলবীজ ও অন্যান্য শিল্পলগ্ন ফসল রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। খোদ উৎপাদক, অর্থাৎ, কৃষকদের শোষণ তীব্রতর করে জমিদার ও ব্যবসায়ীরা তাদের ক্ষতিপূরণের প্রয়াস পেয়েছিল। ১৯১১-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মহাজনদের কাছে কৃষকের ঋণ দ্বিগুণিত হয়ে মোট ৬০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছিল।

জমিদার ও সামন্ত ভূস্বামী, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও মহাজনদের বর্ধমান কৃষকশোষণের ফলে জমি হস্তান্তর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। বন্ধক বা বিক্রয়ের ফলে ক্রমেই অধিক সংখ্যক কৃষক তাদের জমি হারাচ্ছিল।

কৃষকদের পরই কারিগর ও তাদের পরিবারগুলি মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন

হয়েছিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধকালে কতকগুলি কারুকর্ম ও কুটিরশিল্পের (বিশেষত তাঁতের কাপড়) উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় লক্ষ লক্ষ কারিগর, ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ফলত সাধারণ ব্যবসায়ীর আয় যথেষ্ট কমে গিয়েছিল।

শ্রমবাজারে লক্ষ লক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত কারিগরদের আবির্ভাব শিল্প-প্রলেতারিয়েতের অবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, ক্রমাগত দরবৃদ্ধির ফলে তাদের মজুরির মূল্যহানি ঘটেছিল।

১৯১৮-১৯১৯ এবং ১৯২০-১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দু'দুবার ফসলহানির ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। উৎপাদনে ঘাটতি অথচ শস্যরপ্তানি পূর্ববৎ থাকায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং সেইসময় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী দেখা দেওয়ায় (মৃত্যুসংখ্যা ১·৩ কোটি) এর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ রূপলাভ করেছিল।

খাদ্যঘাটতি ও চড়াদরের জন্য কেবল শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান অংশেরই নয়, শিল্পোদ্যোগীদের অধস্তন স্তর, বুদ্ধিজীবী ও বাবু-কর্মচারীদেরও স্বার্থহানি ঘটেছিল।

ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়ারা যুদ্ধকালে তাদের ব্যবসা-উদ্যোগ সম্প্রসারিত এবং অর্থনৈতিক অবস্থান মজবুত করেছিল। ফলত তারা ঔপনিবেশিক শোষণজনিত বাধা-নিষেধ এবং দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রবর্তিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদী হয়ে উঠেছিল।

এই শতকের বিশের দশকের গোড়ার দিকে ভারতের অসঙ্গতিগুলি বিশেষ দুটি ক্ষেত্রে প্রকটিত হয়েছিল: এতে ছিল শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব, একদিকে প্রধান শ্রেণীগুলি ও ভারতীয় সমাজের সামাজিক স্তরগুলি এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব, যারা তখনো জমিদার ও সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণী, রাজন্যবর্গ, মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়া, ও এদের সহযোগী ব্যবসায়ী ও মহাজনদের সমর্থনের উপর নির্ভর করছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর নতুন আন্দোলনের ফলে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও আহ্‌মদাবাদে সেইকালের তুলনায় ব্যাপক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন উৎপাদন গুটিয়ে ফেলার ফলে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে অর্থনৈতিক চারিত্রের এই ধর্মঘটগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দেখা দিয়েছিল। ধর্মঘট প্রচার জোরদার হয়ে উঠলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন শুরু হয়েছিল (বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে ট্রেড ইউনিয়নের ধারায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাবু-কর্মীদের সংগঠনগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে পুরোপুরি লোপ পেয়েছিল)। এগুলি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ও জনদরদীরা

গড়ে তুলেছিল। মাদ্রাজে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বি. পি. ওয়াদিয়া কর্তৃক দেশের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বোম্বাই ও আহ্মদাবাদ সহ অন্যান্য কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে আহ্মদাবাদে এম. কে. গান্ধীর সহযোগিতায় আহ্মদাবাদ মিল মজদুর ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল।

রাশিয়ায় বিপ্লবের সংবাদগুলি অতঃপর ক্রমান্বয়ে ভারতে পেঁছিতে থাকে এবং ফলত দেশে বৈপ্লবিক আবেগের এক নতুন উচ্ছ্রয় দেখা দেয়।

ভারতে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব

ব্রিটিশ সংবাদপত্র মাধ্যমে ভারতে পেঁছিন ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও জারের পতন সংবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই জাতীয়তাবাদীরা জার স্বৈরতন্ত্রকে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সমপর্যায়ের ঘটনা হিসাবে বিচার করতেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে হোমরুল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'রাশিয়ার উদাহরণ' (হোমরুল সিরিজ-২৩) এই প্রতীকিত নামের পুস্তিকায় শিক্ষিত সমাজের প্রতি এক আবেদনে তাদের ভারতীয় জনগণকে রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য ও মর্মার্থ বুঝানোর কথা বলা হয়েছিল। সফল রুশ বিপ্লব ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মুক্তিসংগ্রাম তীব্রতর করার প্রেরণা যুগিয়েছিল। এইসব ঘটনার প্রতি ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গির নজির হিসাবে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'অভ্যুদয়' (২৪ মার্চ, ১৯১৭) পত্রিকায় একটি মন্তব্য লক্ষণীয়। এতে বলা হয়েছিল: 'উদ্দীপক, প্রাণদাত্রী জাতীয়তাবাদের কাছে যে পৃথিবীর সকল বাধাই তুচ্ছ, রাশিয়ার বিপ্লব থেকে আমরা তা বুঝতে পেরেছি।'

রাশিয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সহ পশ্চিমের সকল বুর্জোয়া সংবাদপত্র তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমেই বর্ধমান অপপ্রচার চালিয়ে নিজ পাঠকদের বিভ্রান্ত করছিল। ভারতে ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার ঘটনাবলী সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে কমিউনিস্ট সাহিত্য ছাপা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসনের এইসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লবের সত্য ঘটনাবলী খুবই দ্রুত ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারত সচিব মণ্টেগু ও ভাইসরয় চেম্‌সফোর্ড ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ভারতের সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত তাঁদের প্রতিবেদনে এই সত্য স্বীকার করে লিখেছিলেন যে রাশিয়ায় বিপ্লব ও তার সূচনা ভারতে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিজয় হিসাবেই বিবেচিত হয়েছে... এটি ভারতের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে।

ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যুদ্ধশেষে দেশে প্রত্যাগত দলভাঙ্গা সৈন্যদের কাছ থেকে ভারতের গ্রামের মানুষরা দূর রাশিয়ার ঘটনাবলী জানতে পেরেছিল। এটি উত্তর ভারতে, বিশেষত পঞ্জাবেই ঘটেছিল, কারণ ওখান থেকেই ভারতীয় সৈন্যের প্রধান অংশ সংগৃহীত হত, এরা যুদ্ধের সময় তুর্কিস্তান, মধ্য-এশিয়া সহ কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অন্যান্য রাজ্যেও সামরিক অভিযানে শরিক হয়েছিল।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের মাঝামাঝি ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার ঘটনাবলী প্রকাশ করতে শুরু করেছিল এবং 'রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার' সংক্রান্ত লেনিনের বিখ্যাত ঘোষণা (১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর গৃহীত) ও সেইবছর ৩ ডিসেম্বর গণকমিসার কাউন্সিল কর্তৃক 'রাশিয়ার ও প্রাচ্যের সকল মেহনতি মুসলমানদের প্রতি' আবেদনটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের গোড়ার দিকের বছরগুলিতে রাশিয়ায় এই সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এই বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সামাজিক তাৎপর্যগুলি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তবে নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র জাতীয় ও ঔপনিবেশিক শোষণবিরোধী সংগ্রামের সমর্থক হোক এটিই তাঁরা আশা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ই জাতীয় আন্দোলনের কোন কোন বামপন্থী নেতা অক্টোবর বিপ্লবে যুগান্তকারী এক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করেছিলেন।

লেনিনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলির কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁকে সমর্থন জানিয়ে তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় (২৯ জানুয়ারি, ১৯১৮ খ্রীঃ) এক সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন: 'অভিজাতদের জমিজমা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার ফলে সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লেনিনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।' বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পালও সোভিয়েত রাষ্ট্রের অনুসৃত মূল রাজনৈতিক নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর একটি বক্তৃতায় খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে বলশেভিকরা সব ধরনের অর্থনৈতিক ও পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ, ফটকাবাজী ও সামাজিক অসাম্যের বিরোধী।

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়ার সত্যিকার খবর পরিবেশনের প্রেক্ষিতে বলশেভিকদের কর্মসূচি ও নীতি সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের আগ্রহ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকেই লেনিন ও সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতীয় লেখকদের রচনাগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল। গ্রন্থাকারে ভারতে লেনিনের প্রথম জীবনী (ইংরেজী ভাষায়) রচয়িতা হলেন দক্ষিণ ভারতের

জি. ভি. কৃষ্ণ রাও। 'নিকোলাই লেনিন: জীবনী ও কর্ম' নামের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে প্রকাশিত হয়। ১৯২১-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে ভারতে হিন্দি, উর্দু, বাংলা, মরাঠী, কানাড়া ও ইংরেজীতে অনেকগুলি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছিল।

বিপ্লবী গুপ্তসমিতিতে কার্যরত বামপন্থী ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে দেখেছিলেন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের শেষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের এক সভায় রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একটি বেআইনী পত্রিকা ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে এটি প্রকাশ করে। সাত্তার ও জব্বার—এই খৈরী ভ্রাতৃদ্বয়কে সোভিয়েত সরকারের কাছে পূর্বোক্ত অভিনন্দনটি দেয়ার জন্য মস্কোয় পাঠান হয়। তাঁরা ইউরোপ হয়ে অনেক ঘুর-পথে শেষে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে সোভিয়েত রাজধানীতে পেঁছিন। বৈদেশিক দপ্তর সংক্রান্ত জন-কমিশারিয়েতের কাছে প্রদত্ত তাঁদের স্মারকলিপিতে এই ভারতীয় পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীরা রুশ বিপ্লবের প্রতি তাঁদের প্রশস্তি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক জোয়াল থেকে মুক্তিপ্রয়াসী ভারতীয় আন্দোলনে রাশিয়ার সহায়তা পাবার আশাও প্রকাশ করেছিলেন। ২৩ নভেম্বর প্রতিনিধি দলটিকে লেনিন অভ্যর্থনা জানান এবং দু'দিন পরে তাঁরা সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় যোগ দেন ও জব্বার খৈরী সেখানে বক্তৃতা করেন। মস্কোয় দেখা সবকিছু এবং লেনিন ও সভের্দলভের সঙ্গে সাক্ষাৎ এই ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল দেশে ফেরার পর তাঁদের ঘোষণার মধ্যেই এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরাও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা শুরু করেছিলেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চে অস্থায়ী ভারত সরকারের (কাবুল) রাষ্ট্রপতি মহেন্দ্র প্রতাপ পেত্রগ্রাদে পেঁছিন। সেইদিন ভারতের সঙ্গে সংহতি প্রদর্শনের জন্য সেখানে লুনাচারস্কির সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত স্মৃতিকথায় মহেন্দ্র প্রতাপ ঘটনাটিকে অবিস্মরণীয় ও বিস্ময়কর বলে বর্ণনা করেছিলেন। পরের বছর সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী বরকতউল্লাহ মস্কো আসেন। 'ইজ্‌ভেস্তিয়ার' জনৈক সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অনুসৃত নীতির একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা উপস্থাপিত করেছিলেন। বরকতউল্লাহ বলেছিলেন যে তিনি কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী নন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি হল এশিয়া থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন। তিনি কমিউনিস্টদের মতোই নিজেকে ইউরোপীয়

পুঁজিতন্ত্রের একজন আপোসহীন শত্রু মনে করেন এবং এই অর্থে কমিউনিস্টদের প্রবাসী বিপ্লবীদের সত্যিকার সহযোগী হিসাবে উল্লেখ করেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতউল্লাহ'র নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি দল মস্কো পরিদর্শনে এলে লেনিন ৭ মে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান।

অতঃপর লেনিন ও ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে আরও কয়েকটি সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের নেতা ভারতের মুক্তিসংগ্রাম বিকাশের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। এটি ছিল তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্তবিশেষ। 'বরং কম, কিন্তু ভালো করে' প্রবন্ধে লেনিন লিখেছিলেন: 'রাশিয়া, ভারত, চীন ইত্যাদি দেশগুলি পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যার অধিকারী হওয়ার ঘটনাই সংগ্রামের ফলাফল নির্ধারণ করবে। গত কয়েক বছরে এই সংখ্যাগুরুরাই অতি দ্রুত মুক্তিসংগ্রামের শরিক হতে শুরু করেছে।'*

কাবুলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিপ্লবী সম্মিলনীর (এ. বার্ক প্রতিষ্ঠিত) সমাবেশ থেকে পাঠান অভিনন্দন বাণীর জবাবে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২০ মে লেনিন তাঁর বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি সহ ভারতের সংগ্রামে সাফল্য লাভের অন্যতম নির্ধারক উপাত্ত, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণক্রমে লিখেছিলেন: 'মুসলিম ও অমুসলিমদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীকে আমরা স্বাগত জানাই। এই মৈত্রী প্রাচ্যের সকল মেহনতির মধ্যে বিস্তার লাভ করুক এটিই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।'**

সুতরাং, অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মৈত্রীর উল্লেখ্য সম্প্রসারণকে অপরিহার্য করে তুলেছিল এবং এগুলিতে গুণগতভাবে একটি নতুন উপাত্তের—পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রাচ্যের জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যেকার মৈত্রীর — অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের উপর এর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবের ফলে জাতীয়তাবাদীদের বামপন্থী দলের উপস্থাপিত সামাজিক কর্মসূচি অনেকটা বৈপ্লবিক হয়ে উঠেছিল এবং এরা ক্রমেই শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধির সমীপবর্তী হচ্ছিল। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর জনসভায় এক বক্তৃতায় তিলক বলেছিলেন: 'সময়ের

* V. I. Lenin, Collected Works, Vol. 33, p. 500.

** V. I. Lenin, 'To the Indian Revolutionary Association', *Collected Works*, Vol. 31, p. 138.

সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রমিকদের শাসক হওয়ার দিনও এগিয়ে আসছে।'* সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রায় বলেছিলেন: 'ইউরোপীয় শ্রমিকরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আরও একটি হাতিয়ার পেয়েছে। এদের শিখরে আছে রুশ শ্রমিকরা, যারা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'**

অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব নিশ্চিতই চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের কোন কোন দলের এবং ব্রিটিশবিরোধী গুপ্তসমিতিগুলির সদস্যদের পক্ষে দ্রুত বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সহজতর করেছিল।

রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সামগ্রিকভাবে অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, যদিও তাঁরা এর সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মসূচি সমর্থন করেন নি। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের একটি অধিবেশন উদ্বোধনকালে আনি বেশান্ত ঘোষণা করেছিলেন: 'রুশ বিপ্লব এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় রুশ প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য উন্মেষ ভারতে ইতিপূর্বে বিদ্যমান পরিস্থিতিগুলিকে পুরোপুরিই পালটে দিয়েছে।'***

ভারতে অক্টোবর বিপ্লবের অভিঘাত ছিল এক দীর্ঘ ও বহুমুখী প্রক্রিয়া। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং এগুলির প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনগুলি রাশিয়ার ঘটনাবলী থেকে যে-শিক্ষা লাভ করেছিল তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অভ্রান্ত হল: জনগণের সক্রিয় শরিকানার শর্তেই কেবল মুক্তিসংগ্রামের সফল সমাপ্তি সম্ভবপর।

ভারতে ব্রিটিশ নীতি। মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার

ইঙ্গ-ভারতীয় ঔপনিবেশিক সরকারও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারেই রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসেই ভাইসরয় চেম্‌সফোর্ড ভারতে ব্রিটিশ নীতি পরিবর্তনের জরুরী প্রয়োজনের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রুশ বিপ্লবের প্রভাবের ফলে দেশের পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ

হয়ে উঠেছিল। এই বছর ২০ আগস্ট ভারতসচিব মণ্টেগ্ কমন্সসভায় ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অনুকূল ভিত্তি তৈরির লক্ষ্যে একটি সরকারী বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেণ্টের জন্য মণ্টেগ্ ও চেম্‌সফোর্ড প্রণীত ভারতে ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনের মূল বিষয়গুলি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত ও পরে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার নামে খ্যাত ভারতবিধির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এই বিধি অনুসারে কেন্দ্রীয় (পূর্ণবয়স্কদের ১ শতাংশ) ও প্রাদেশিক (পূর্ণবয়স্কদের ৩ শতাংশ) আইনসভার নির্বাচকমণ্ডলীর কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটেছিল। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত মর্লি-মিণ্টো সংস্কারে পূর্ণবয়স্কদের মাত্র ০·২ শতাংশের ভোটাধিকার পাওয়ার হিসাবটি প্রসঙ্গত তুলনীয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্ন পরিষদে (লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলি) ও উচ্চ পরিষদে (কাউন্সিল অফ্ স্টেট্‌স্) এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে অচিরেই একটি স্থায়ী নির্বাচিত সংখ্যাগুরুর উদ্ভব ঘটেছিল।

ভাইসরয় ও প্রাদেশিক গভর্নরদের নির্বাহী পরিষদগুলিতে ভারতীয়দের আসন দেয়া হয়েছিল এবং তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কয়েকটি বিভাগে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের অধিকার পেয়েছিল। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই পরিষদ তখনো ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছেই দায়ী ছিল।

শাসন সংস্কারের এই ব্যবস্থাগুলি ছিল ভারতের বিত্তশালী শ্রেণীগুলিকে কিছু সুবিধাদানেরই নামান্তর। তদুপরি একদিকে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া, জমিদার এবং বুর্জোয়া ও জমিমালিক পরিবারগুলির শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, আর অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে ফারাক সৃষ্টিই ছিল এর লক্ষ্য। প্রসঙ্গত, এতে আইনসভার নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কর্মীদের বিভক্ত করার ব্যবস্থাটিও উল্লেখ্য। এই ব্যবস্থায় শুধু হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক ভোটই নয়, শেষোক্তরা কিছু বিশেষ সুবিধার নিশ্চয়তাও পেয়েছিল। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির আইনসভায় তাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা সহ মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে তাদের অর্ধেকের বেশি আসনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল। নতুন ভারত বিধি এদেশে হিন্দু-মুসলিম বিরোধিতা সৃষ্টির ব্রিটিশ নীতিকে আরও সম্প্রসারিত করেছিল।

ভারতীয় সমাজের উচ্চস্তরের প্রতিনিধিদের দেশের শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে পৌঁছনোর কিছু কিছু সুযোগ সম্প্রসারিত করা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা আসলে তাদের কোন ক্ষমতাই ত্যাগ করে নি। পূর্ববৎ অর্থ, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি সবকিছু

তাদেরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। তদুপরি ভাইসরয় ও প্রাদেশিক গভর্নরদের নির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার ও এই পরিষদে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত মনঃপূত না হলে সেটি নাকচ করার ক্ষমতা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। নির্বাচনী নীতি ও নির্বাহী পরিষদে ভারতীয় মন্ত্রীদের সীমিত ক্ষমতার সঙ্গে ভাইসরয় ও তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক গভর্নরদের স্বৈরাচারী ক্ষমতার এই সমাবন্ধ দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত হয়েছিল। ভারতে তাদের সামাজিক অবস্থান মজবুতির জন্য ব্রিটিশরা এইসঙ্গে দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন দমনের যন্ত্রটি আরও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

ব্রিটিশ বিচারপতি রাওলাটের নেতৃত্বাধীন কমিটি কর্তৃক প্রণীত এদেশে ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন তীব্রতরকরণের জন্য এই কমিটির নির্ধারিত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতেই 'রাওলাট বিধি' নামে একটি নতুন আইন ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ মার্চ জারি করা হয়। এই নতুন মারাত্মক আইনের বলে ভাইসরয় ও প্রাদেশিক গভর্নররা যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক রাখতে পারতেন।

বিশ শতকের গোড়া থেকে এদেশে অনুসৃত ব্রিটিশের প্রলোভন-বনাম-নির্যাতন নীতিটির কার্যকরতা শেষাবধি হ্রাস পেয়েছিল। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রবল জোয়ারের মুখে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার বা 'রাওলাট আইন'—এর কোনটিরই আর ফলপ্রসূ সম্ভাবনা অটুট ছিল না। এইসঙ্গে এই ব্যবস্থাবলী গণসংগ্রামে ও সংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের ধারা পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল।

কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কর্তৃক জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ

তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থীদের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন এবং হোম রুল লীগের কার্যকলাপ অতঃপর পার্টির মধ্যপন্থী, উদারনৈতিক নেতৃত্বের মুখোমুখি একটি প্রতিপক্ষের ক্রমাগত উন্মেষে সহায়তা যুগিয়েছিল। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার বিবেচনার জন্য আহূত কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভাঙন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ ভোটে এই ব্রিটিশ প্রস্তাবটি অপ্রতুল, অযোগ্য ও নৈরাশ্যজনক হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। জনগণের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া স্তরগুলির মধ্যে বহুব্যাপ্ত বিরোধী মনোভাবটি জাতীয় কংগ্রেস ক্রমেই স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ করছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের

দক্ষিণপন্থীরা তখন কংগ্রেস ত্যাগ করে এবং তাদের উদ্যোগে লিবারেল ফেডারেশন নামে একটি নতুন পার্টি গঠিত হয়। বুর্জোয়া ও জমিদারদের ঊর্ধ্বতন স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই রাজনৈতিক সংগঠনটি প্রধানত ভারতের মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়াদেরই স্বার্থরক্ষা করত এবং পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক সরকারকেই পূর্ণসমর্থন জানাত। বলা বাহুল্য, এই পার্টি ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নি।

অতঃপর কংগ্রেসে গান্ধীর প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতে পরিচালিত তাঁর দুটি সফল সত্যাগ্রহ এবং আহ্‌মদাবাদে তাঁর সংগঠিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, সংবাদপত্রে ঘন ঘন প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ও রাজনৈতিক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির কল্যাণে বিশ শতকের গোড়ার দিকে গান্ধী ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা সত্ত্বেও প্রথম দিকে তিনি কংগ্রেসের বাইরে থেকেই তাঁর কার্যকলাপ চালাতেন।

জাতীয় ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন সংগঠনে গান্ধীর প্রথম প্রধান উদ্যোগ হল 'রাওলাট আইনের' বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সহকর্মী ও সহযোগীদের সহায়তায় তিনি সত্যাগ্রহের একটি শপথ সূত্রবদ্ধ ও স্বাক্ষর করেন। তারপর আইন অমান্য করার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় আন্দোলন দমনকারী এই আইন ও অন্যান্য অনুরূপ আইনগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় শপথ গ্রহণ করা হয়। গান্ধী বোম্বাইয়ে একটি সত্যাগ্রহ সভা আহ্বান করলে সেখানে সত্যাগ্রহ শপথের জন্য স্বাক্ষরাভিযান চালান হয়। এই আন্দোলনের সাফল্যের ফলে গান্ধী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ হন এবং এই সভার নামে ও 'রাওলাট আইনের' বিরুদ্ধে তিনি ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সারা দেশে এক সাধারণ হরতাল আহ্বান করেন। হিন্দু-মুসলিম সকলের কাছেই প্রার্থনা ও অনশনের মাধ্যমে দিনটি পালনের আহ্বান জানান হয়েছিল। হরতালের দিন ছিল ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ এপ্রিল। গান্ধীর আবেদনে ব্যাপক সাড়া এবং এই উদ্যোগে কংগ্রেসের সমর্থন থেকেই জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর অবিসংবাদিত আসন্ন নেতৃত্বের প্রমাণ মিলেছিল।

মূলত বিশ শতকের গোড়ার দিকে গড়ে-ওঠা তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের জনপ্রিয়তার মাধ্যমেই জাতীয় নেতা হিসাবে গান্ধীর দ্রুত অভ্যুদয়ের ঘটনাটি ব্যাখ্যেয়।

আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতা, বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প ও পুঁজিতান্ত্রিক নগরায়নের সমালোচনার এবং কারিগরী ও কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রসার সহ ভাবীকালের অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ গোষ্ঠীর ভিত্তিতে দেশের অর্থনীতি বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত গান্ধীর কর্মসূচির মধ্যে ভারতীয় কৃষক, কারিগর,

ক্ষুদ্র কারখানার শ্রমিক ও ছোট ব্যবসায়ীদের পেটি-বুর্জোয়া ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

তৎকালীন সামাজিক চেতনার অনুন্নত অবস্থা এবং দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সামন্ততান্ত্রিক জেরগুলির প্রকট বিদ্যমানতার প্রেক্ষিতে গান্ধীর আহ্বানের ধর্মীয় ও নৈতিক রূপটি নিরক্ষর জনগণের কাছে তাঁর মতাদর্শকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। হিন্দুধর্মভিত্তিক তাঁর এই দার্শনিক ধারণাবলীতে ইসলাম, খ্রীস্ট এবং অন্যান্য ধর্মেরও সারসত্তা আত্তীকৃত হওয়ায় কাজটি সহজতর হয়ে উঠেছিল।

ব্যক্তিগত জীবনের সন্ন্যাসীকল্প সরলতা, জনগণের সঙ্গে ব্যাপক সংযোগ, মানবচারিত্র্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোধ ও জনগণের নিরক্ষর, দরিদ্র অংশের মনোভাব উপলব্ধির ক্ষমতার জন্যও তাঁর জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের জন্য ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়াই ছিল গান্ধীর কর্মনীতির লক্ষ্য। একটিমাত্র বুর্জোয়া-জাতীয় নেতৃত্বের অধীনে ভারতীয় সমাজের সকল শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির ঐক্যসাধনই এই লক্ষ্যজাত মূল রাজনৈতিক কার্যকলাপ হয়ে উঠেছিল। গান্ধী কেন ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন এবং শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত নিরসনে নিরন্তর আপোসের ও শ্রেণী-শান্তির পথ সমর্থন করতেন, এতেই তা ব্যাখ্যেয়। ধর্ম ও বর্ণগত গভীর বৈষম্যে ছিন্নভিন্ন এই সমাজে গান্ধী হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং দেশের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণগুলির সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক পরিসরে জনগণের শরিকানার মাধ্যমেই যে শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ঐক্যসাধন ও তাঁর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সফল সংগ্রাম চালনা সম্ভবপর, গান্ধী এই সত্য যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যাগ্রহের মধ্যে গান্ধী অহিংসার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি সক্রিয় বিরোধিতার সমাবন্ধ দেখেছিলেন। তদুপরি এতে ছিল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে জনগণের ব্যাপক স্তরের শরিকানার সম্ভাবনা ও আন্দোলনের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়া শক্তিগুলির হস্তগত থাকার নিশ্চয়তা।

ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থা গঠনের সক্রিয় সমর্থক গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মসূচি ও তাঁর উদ্ভাবিত কর্মকৌশল ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের মূল অংশের ও জাতীয়তাবাদী জমিদারদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক নেতৃপদে বৃত হন। ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামের এই নতুন পর্যায়ে গান্ধী ভারতীয় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মূল প্রবণতাগুলির প্রতীক হয়ে ওঠেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বহু শহরে অনুষ্ঠিত হরতাল ছিল বৈপ্লবিক অগ্রগতির পথে একটি নতুন পর্যায়ের সূচক। এটি ছিল ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের অর্থনৈতিক ধর্মঘট থেকে শহুরে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের শরিকানা সহ কখনো কখনো সংগ্রামের চরম রূপ হিসাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে উত্তীর্ণ হওয়া একটি গণসংগ্রাম।

এই সময়কার উল্লেখ্যতম সাফল্যগুলি পঞ্জাবে অর্জিত হয়েছিল। নিম্নোক্ত কারণগুলির নিরিখেই এটি ব্যাখ্যেয়। প্রথমত, পঞ্জাবকেই সবচেয়ে বেশি 'রক্ত-কর' (এখান থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদের প্রধান অংশ নিযুক্ত হত) দিতে হত, দেশের শস্যভাণ্ডারখ্যাত এখানকার কৃষকরা সামরিক খরচার প্রধান চাপ বহন করত এবং পঞ্জাবের কারিগর ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পঞ্জাব সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার নিকটতম হওয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সংবাদ সেখানে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পৌঁছত ও শিখ সৈন্যরা দেশে ফিরলে তা আরও ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয়ত, পঞ্জাবে গদর পার্টির প্রভাব তখনো অব্যাহত ছিল ও এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগকারী প্রবাসী বিপ্লবীদের প্রভাবও এখানে অটুট ছিল।

মার্চ মাস থেকেই পঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে স্থানীয় জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশবিরোধী সভা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠান শুরু করেছিল। ১০ এপ্রিল ব্রিটিশ শাসকরা অমৃতসরের দুজন জনপ্রিয় নেতা, সৈফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালকে বহিষ্কার করলে সারা দেশে প্রতিবাদের নতুন ঝড় বয়ে গিয়েছিল। অতঃপর পঞ্জাবের আরও দুটি শহর, লাহোর ও গুজরানওয়ালায় হরতাল ও বিক্ষোভ ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপলাভ করেছিল এবং এতে শ্রমিকরা, বিশেষত রেলশ্রমিকরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিল।

এইসময় গভর্নর ও'ডয়ের এবং জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে পঞ্জাবের ঔপনিবেশিক প্রশাসন রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে নৃশংস প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছিল। এই উদ্দেশ্যেই ৯ এপ্রিল পঞ্জাবে নতুন সৈন্য তলব করা হয়েছিল। ১৩ এপ্রিল কিচলু ও সত্যপালের বহিষ্কারের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত নিরস্ত্র নরনারীর উপর সৈন্যবাহিনী গুলি চালায়। এর ফলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে প্রায় এক হাজার অসহায় মানুষ নির্মমভাবে নিহত ও প্রায় দুই হাজার আহত হয়। ডায়ার তখনই কারফ্যু জারি করে এবং সেজন্য কোন চিকিৎসা-সাহায্য পৌঁছতে না পারায় ময়দান ও আশপাশের রাস্তায় অনেকেই

বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। পরে পঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অবাধ নির্যাতন ইত্যাদি চলে।

কিন্তু এই নিষ্ঠুর অত্যাচারেও ব্রিটিশদের ঈপ্সিত ফল ফলে নি। পক্ষান্তরে, লাহোর ও অমৃতসরে প্রধানত লাঠিধারী 'দণ্ডফৌজ' নামে এক রক্ষিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। সারা প্রদেশে তখন রাজনৈতিক কার্যকলাপের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। থানা আক্রমণ ও বন্দীদের ছিনিয়ে নেওয়া নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় কৃষকদের সহায়তায় রেলকর্মীরা কয়েকটি সৈন্যবোঝাই ট্রেনও লাইনচ্যুত করেছিল।

পঞ্জাবের ঘটনাবলী সংক্রান্ত সংবাদের উপর ব্রিটিশের কড়া নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও অমৃতসরের ঘটনাগুলি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলিতেই ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। আহ্‌মদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকরা তখন ব্যাপক রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ব্রিটিশের দেয়া 'নাইট' উপাধিটি প্রতিবাদস্বরূপ পরিত্যাগ করেছিলেন।

আন্দোলনের অহিংসাচ্যুতি ঘটে এই আশঙ্কায় গান্ধী আহ্‌মদাবাদের জনগণকে শান্ত করার প্রয়াস পান এবং পঞ্জাবে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতিবন্ধে তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

লেনিন পঞ্জাবের এই ঘটনাবলী ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন। প্রাচ্যের মুক্তি-আন্দোলনের আলোচনায় তিনি ভারতে এই আন্দোলনের নতুন পর্যায় সম্পর্কে লিখেছিলেন: 'ব্রিটিশ ভারত এইসব দেশের মস্তকস্বরূপ, সেখানে একদিকে বিপ্লব আনুপাতিকভাবে পরিপক্ক হয়ে উঠছে, শিল্প ও রেলওয়ে প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা বাড়ছে এবং অন্যদিকে ব্রিটিশরা বর্বর সন্ত্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি করছে, তারা সর্বকালের তুলনায় ঘন ঘন গণহত্যা (অমৃতসর) ও ব্যাপক লাঠিচালনা ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে।'*

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ঘটনাবলী মোটেই জাতীয় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। তাই স্বীয় সম্মান ও প্রভাব অটুট রাখার জন্য গণসংগঠনগুলির কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদল কংগ্রেসের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অমৃতসরে আহূত একটি সভার বিশেষ এক প্রস্তাবে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য কংগ্রেস সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

* V. I. Lenin, 'Third Congress of the Communist International', *Collected Works,* Vol. 32, p. 455.

একই সম্মেলনে নতুন ভারতবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য আইনসভাগুলির নির্বাচন বয়কটেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ফলত, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল।

অসহযোগের শুরু। খিলাফত আন্দোলন

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধী এবার সত্যাগ্রহ পরিচালনার একটি পর্যায়িক বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়নের সিদ্ধান্তে পেঁছন। তাঁর মতে কেবল এতেই সংগ্রামকে অহিংস রাখার নিশ্চয়তা নিহিত ছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে দেশব্যাপী অসহযোগিতার ক্ষেত্রে দুটি অপরিহার্য পর্যায়ের কথা গান্ধী ভেবেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত বয়কটের ধরন হিসাবে বর্জিত হবে: সম্মানসূচক নিয়োগ ও উপাধি, সরকারী সম্বর্ধনা ইত্যাদি, ব্রিটিশ স্কুল কলেজ আদালত, আইনসভার নির্বাচন, আমদানি পণ্য বর্জন। এর দ্বিতীয় পর্যায় হবে: সরকারী করদান বন্ধ।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১ আগস্ট আন্দোলন শুরুর দিন ধার্য হয়েছিল। খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাক্রমে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীরা আন্দোলনটি পরিকল্পনা ও সংগঠিত করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ভারতীয় মুসলমান সহ সকল সুন্নি মুসলমানের অন্যতম খলিফা, তুরস্কের সুলতানের অধিকার রক্ষার জন্য মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্যোগে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আন্দোলনের নেতাদের কাছে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন ও সুলতানের পদচ্যুতি আসলে প্রাচ্যে পাশ্চাত্য-শক্তির, বিশেষত ব্রিটিশ নীতির প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে প্রকটিত হওয়ায় আন্দোলনটি অচিরেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। ভারতের ব্যাপকসংখ্যক মুসলমানের কাছে আন্দোলনের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের বদলে এটির ঔপনিবেশিকতাবিরোধী চারিত্র্যই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অতঃপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তান স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করলে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রতিবেশী এই মুসলিম রাজ্যের সংগ্রামকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংগ্রামী পাঠান উপজাতিগুলি সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিল।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা বামপন্থী পেটি-বুর্জোয়া অংশটির হাতেই খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমান্তরাল বিকাশের ফলে ভারতের দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমানের জন্য মুক্তিসংগ্রামে সহযোগিতা ও যৌথ কার্যপরিচালনার অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য, মুহম্মদ ও শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বাধীন খিলাফত কমিটির সঙ্গে

গান্ধী ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই নবগঠিত ঐক্যের প্রতীক হিসাবে গান্ধীকে খিলাফত কমিটির অন্যতম নেতা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

সমাবেশ, বিক্ষোভ ও নানা ধরনের হরতালের আকারে ১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই গান্ধী এটি ঘোষণা ও পরিচালনা করছিলেন। তাসত্ত্বেও গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মকৌশলের সাফল্য দেশের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনটিকে ক্রমেই অধিকতর মাত্রায় প্রভাবিত করছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনেই এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেপ্টেম্বরের শুরুতে কলিকাতায় আহূত এক বিশেষ অধিবেশনে লালা লজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ বহু প্রতিষ্ঠিত নেতাদের আপত্তি সত্ত্বেও গান্ধী উত্থাপিত অসহযোগ কর্মসূচির প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড সংস্কারভিত্তিক নির্বাচনে শরিকানা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটিও কংগ্রেস পুনরায় সমর্থন করে।

একই বছর ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের অর্জিত এই বিজয় চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে। অধিবেশন গান্ধীর উদ্ভাবিত রাজনৈতিক কর্মসূচি ও কর্মকৌশল গ্রহণ করে এবং তাঁর দর্শন, গান্ধীবাদ, কংগ্রেসের মতাদর্শ হয়ে ওঠে। প্রথমেই এক সনদ অনুসারে কংগ্রেসকে একটি রাজনৈতিক গণসংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়। অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে কার্যপরিচালনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। এতে ছিল ব্যাপকভিত্তিক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রদেশের স্থানীয় শাখাগুলি সহ সম্পূর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন কার্যকরী কমিটি। কংগ্রেসকে জনঘনিষ্ঠ করার জন্য এবং জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে প্রত্যেক জাতির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ সহ ঔপনিবেশিকদের আরোপিত দেশের প্রশাসনিক ও অঞ্চলবিভাগের বিরোধিতার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে, অর্থাৎ কংগ্রেসের তথাকথিত ভাষাভিত্তিক প্রদেশের ভিত্তিতে স্থানীয় শাখাগুলি সংগঠিত হয়েছিল।

অচিরেই কংগ্রেস পুনর্গঠনের এই ফলগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল: পরের বছরের শেষ নাগাদ কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা প্রায় ১ কোটিতে পেঁছেছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালের মধ্যে ১৫ লক্ষ তরুণ কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠিত হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন সংশ্লিষ্ট সমাবেশ, বিক্ষোভ ও পিকেটিং সংগঠনের দায়িত্ব স্বেচ্ছাসেবীরাই গ্রহণ করেছিল। এরাই ছিল পার্টির মেরুদণ্ডস্বরূপ।

অসহযোগ আন্দোলন ও ব্রিটিশবিরোধী খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণীভিত্তিক কার্যকলাপের পরিসরও ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল।

বিশের দশকের গোড়ার দিকের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন

১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ধর্মঘট আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল (গড়পড়তা ৪ থেকে ৬ লক্ষ কর্মী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল)। আন্দোলনের পূর্ববর্তী পর্যায়ের (১৯১৮-১৯১৯) তুলনায় বর্তমান সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে অদৃষ্টপূর্ব অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের শ্রেণী-ঐক্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা ক্রমাগত অধিক পরিমাণে সংহতিমূলক ধর্মঘটে শরিক হচ্ছিল। বোম্বাই, জামসেদপুর ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ ধর্মঘটেই এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সার্বিক রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের সম্ভাব্য নিবিড়তম সমাবন্ধ তখন আসন্ন হয়ে উঠেছিল।

বাগিচা-কর্মীদের মতো ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর অনগ্রসরতম অংশগুলিও এবার সংগ্রামের শরিক হতে শুরু করেছিল। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে আসামের চা-বাগানগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘট দেখা দেয় এবং এতে প্রায় ১২ হাজার শ্রমিক যোগ দেয়।

ধর্মঘট আন্দোলন (যাতে কার্যশর্তের উন্নতি সহ মজুরিবৃদ্ধির মূল দাবি আদায় করা হত) বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গঠনের নিশ্চিত সম্ভাবনা এভাবেই পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠানের মধ্যে এই ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার অনুকূল ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এ. আই. টি. ইউ. সি) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ছিল বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের নেতৃত্বাধীন। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা লালা লজপত রায় সংগঠনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ফলে ধর্মঘট আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল: ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯টি ধর্মঘটের স্থলে ১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে এটি যথাক্রমে দু'শো ও চারশো'য় পৌঁছেছিল। ইতিপূর্বে ধর্মঘটগুলি প্রায়ই এলোমেলোভাবে শুরু হত, দুর্বলভাবে সংগঠিত হত।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দুর্বলতা সত্ত্বেও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন

এবং ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটির প্রতিষ্ঠা অবশ্যই একটি ব্যূহভেদ হিসাবে বিবেচ্য।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংহতি জাতীয় কংগ্রেসের সামনে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তার অটুট প্রভাব ও তা বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়নগুলির মধ্যে প্রচার চালান তীব্রতর করার কাজটি উপস্থাপিত করেছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে একটি বিশেষ কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে আন্দোলন গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যুক্তপ্রদেশে, বিশেষত ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানের স্মৃতিজড়িত এর পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে ১৯২১-১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ব্যাপকতম কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। প্রথমত ফৈজাবাদ ও রায় বেরিলী জেলায় কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয়। যথানিয়মেই সেখানকার রায়ত-চাষীরা ছিল নিম্নবর্ণের। তারা স্থানীয় জমিদারদের মাঠের ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল, তাদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল এবং ব্যবসাকেন্দ্র ও ছোট শহরের মহাজন ও বণিকদের উপর হামলা চালিয়েছিল। সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকেই তাদের নেতাদের উদ্ভব ঘটছিল। এদের কেউ কেউ জনসাধারণকে উত্তেজিত করার মাধ্যম হিসাবে গ্রামীণ মেলায় প্রথাসিদ্ধ নাট্যাভিনয় এবং চারণ কবি ও বাউলদের আবৃত্তি ব্যবহার করেছিল।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধ অবধি অব্যাহত এইসব স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপ শেষে সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী নির্মমভাবে দমন করেছিল। কয়েক হাজার কৃষক এই নির্যাতনের সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল। যুক্তপ্রদেশের সুলতানপুর জেলায় অনুষ্ঠিত ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মধ্য ও শেষাংশের কৃষক আন্দোলনে একই ব্যাপারগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন অযোধ্যায় উচ্চতর পর্যায়ে পেশছেছিল। সেখানে 'ঐক্য' নামের সংগ্রামী সশস্ত্র রায়ত-চাষীরা সক্রিয় ছিল। এইসব সংগ্রামী কৃষক সেখানে তালুকদারদের জমিজমা ও বিষয়সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের দমনের জন্য পাঠান পিটুনী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই দখল দীর্ঘদিন অটুট রেখেছিল। এদের নেতাদের মধ্যে নিম্নবর্ণজাত পাসি মাদারি ও সাহরেব স্বনামখ্যাত।

স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থানীয় চারিত্র্য, বিভিন্ন দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, নির্দিষ্ট কর্মসূচির অনুপস্থিতি ইত্যাদি দুর্বলতা সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন অবশ্যই জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল।

কোন কোন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের সময় কিষান সভার আকারে কৃষক সংগঠনের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত কংগ্রেস নেতারা এইসব সংগঠনে অংশগ্রহণ করেছিল। তরুণ জওহরলাল নেহরুও কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্যই প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনের সীমিত প্রভাব সত্ত্বেও সংগঠিত জাতীয় আন্দোলন ও স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনের মধ্যে ক্রমেই সংযোগ গড়ে উঠছিল। যুক্তপ্রদেশের সংগ্রামী কৃষকরা গান্ধীর কাছে আবেদন পেশ করেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরাও সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল।

যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন সুস্পষ্ট শ্রেণী-চারিত্র্যে ও নতুন ঐতিহাসিক যুগের অগ্রগামী বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হলেও অন্যান্য ব্যাপকভিত্তিক কৃষক আন্দোলনগুলিতে (যেমন মালাবার ও পঞ্জাবে) তখনো অতীতমুখী চারিত্র্য অটুট ছিল। এইসব সংগ্রাম আগের মতোই ধর্মীয় খোলসের আড়ালে পরিচালিত হত।

১৯২১-১৯২২ খ্রীস্টাব্দে একাধিকবার শিখ কৃষকদের মধ্যে মোহন্তবিরোধী অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। ধর্মগুরু হিসাবে এইসব মোহন্তরা মন্দিরের সম্পত্তি ও আয় তদারক করত। কার্যত এটি ছিল সামন্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকের, ক্ষুদ্র জমিমালিক ও রায়ত-চাষীর সংগ্রাম, আর আপাতদৃষ্টিতে এতে শিখ সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত হয়েছিল। অতঃপর এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 'আকালী' (অমর) গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে এবং এরা শান্তিপূর্ণভাবে শিখ মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি দখলে উদ্যোগী হয়।

আকালী আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ চারিত্র্য সত্ত্বেও ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে নানকানার কাছে, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে গুরুকা বাগের অদূরে পঞ্জাবের শিখ তীর্থস্থানগুলিতে মন্দিররক্ষক মোহন্তদের ডেকে আনা পুলিশের হাতে নিরস্ত্র আকালীরা ব্যাপক নির্যাতন ভোগ করে।

আকালী আন্দোলন দমনের পর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে এই গোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে যায় এবং 'বাবর আকালী' (আকালী সিংহ) নামে একটি বামপন্থী দলের অভ্যুদয় ঘটে। এটি শেষে পঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীদের গোপন সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। অহিংস বৈশিষ্ট্যের জন্য আকালী আন্দোলন গান্ধীর সুগভীর সহানুভূতি ও কংগ্রেসের সমর্থন পেয়েছিল।

গান্ধী ও কংগ্রেস কিন্তু ঐক্যদল এবং বিশের দশকের গোড়ার দিকের মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার জেলার প্রধান প্রধান কৃষক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে মোপলা (দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে—কেরলায় বসতিস্থাপনকারী মালয়ালাম বংশোদ্ভূত মুসলিম) বিদ্রোহ দেখা দেয়। মোপলা কৃষক ও কয়েকজন মুসলিম ধর্মীয় নেতা এতে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু মোপলা বণিকরা অভ্যুত্থান থেকে দূরে থাকে।

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নাম্বুদ্রি ভূস্বামীরা তিরুরাঙাদি নামের ছোট শহরে একটি মসজিদের উপর আক্রমণ চালানোর ফলেই বিদ্রোহটি শুরু হয়েছিল। এটি ক্রমে

ক্রমে মালাবার জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মোপলা রায়ত-চাষীর সংগ্রামের আকার ধারণ করে। অনেক স্থানে হিন্দু রায়ত-চাষীরাও মোপলাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল। এই সংগ্রামের ধর্মীয় চারিত্র্য সত্ত্বেও মোপলা বিদ্রোহ স্পষ্টতই সামন্তবিরোধী, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল।

আর্নাদ ও ওয়ালুভান্দ তালুকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন উৎখাতের পর বিদ্রোহীদের উদ্যোগে সেখানে 'খলিফার রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনই বিদ্রোহীদের কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল ও স্থানীয় প্রশাসনের কার্যাদি পরিচালনা করেছিল। এই 'রাজ্যের' রাষ্ট্রপতি ছিলেন স্থানীয় মুসলিম নেতাদের প্রতিনিধিরা — প্রথমে আলী মুসালিয়ার এবং পরে কুনেআহ্‌ম্মদ খাজি।

যথাসময়ে মোপলাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ এবং জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত তাদের ঘাঁটিগুলি থেকে কৌশলপূর্ণ যুদ্ধচালনা সত্ত্বেও পরের বছরের গোড়ার দিকেই শেষাবধি বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে। এতে ৩০ সহস্রাধিক মোপলা বন্দী হয়েছিল।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছিল। বন্দীদের রেলগাড়িতে চালান দেয়ার সময় একটি কামরায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৭০ জন মোপলা মারা গিয়েছিল।

পদানুর রেলস্টেশনে সংগঠিত এই ঘটনাটি তদন্তের জন্য একটি জনপ্রতিনিধিদল গঠিত হলেও জাতীয় কংগ্রেস সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য মোপলা কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিল। এই ব্যাপারে খিলাফত কমিটিও গান্ধীর অনুরূপ মনোভাবই দেখিয়েছিল।

মালাবার উপকূল, পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের এইসব ঘটনাবলী ছাড়াও বাংলা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও দেশের অন্যান্য অংশে বিক্ষিপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। অবশ্য এইসব কৃষক আন্দোলন তখনো জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন একক বা চূড়ান্ত উপাত্ত হয়ে ওঠে নি।

আন্দোলন থেকে পশ্চাদপসরণ

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছিল। সেই বছরের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছেছিল এবং অসহযোগ আন্দোলনের শক্তিও ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটির গণসমর্থনও জোরদার হচ্ছিল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয়

অধিবেশনে কংগ্রেস সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের উপর তার দখল মজবুত করেছিল।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ নভেম্বরে প্রিন্স অব উয়েলস'য়ের ভারত আগমন উপলক্ষে বোম্বাই শ্রমিকদের চারদিনের রাজনৈতিক ধর্মঘট হল এই সময়কার উল্লেখ্যতম রাজনৈতিক ঘটনা। মাদ্রাজ ও অন্যান্য শহরেও প্রতিবাদমূলক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল।

গান্ধী বোম্বাইয়ের ঘটনার নিন্দা করলেও তখনো তিনি পশ্চাদপসরণের ইঙ্গিত দেন নি। কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে (১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর) স্বরাজ লাভ এবং খলিফার পদমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এতে গান্ধী সর্বময় ক্ষমতার অধিকার সহ আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব লাভ করেন।

এইসময় ঔপনিবেশিক সরকার আন্দোলনের শরিক, প্রধানত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক নির্যাতন চালায়। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লজপত রায় প্রমুখ বহু প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা সহ প্রায় ১০ হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই বছর ১ ফেব্রুয়ারি গান্ধী নির্যাতন বন্ধের দাবি জানিয়ে ভাইসরয় রিডিংয়ের কাছে একটি চরমপত্র পাঠান। অন্যথা তিনি অসহযোগের দ্বিতীয় পর্যায়, কর-বন্ধের জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানানোর হুমকি দেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎ গান্ধী তাঁর কর্মকৌশল পরিবর্তন করেন। কংগ্রেসের এই আকস্মিক মতবদলের অজুহাত হিসাবে চৌরি চৌরায় (যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার একটি ছোট শহর) ৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ কর্তৃক গুলিচালনার পরে একদল কৃষক তাদের তাড়া করে থানায় অগ্নিসংযোগ করার ঘটনাটি উল্লিখিত হয়।

গান্ধী প্রকাশ্যে নিহত পুলিশদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানান এবং কৃষকবিদ্রোহের শরিকদের প্রতি তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশ তাঁর মতে এখনো অহিংস আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছয় নি এবং এজন্য অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

নিজ মতানুযায়ী গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের মূলে ছিল—একদিকে বিরোধী জাতীয় শক্তি তখনো সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চাপ সহ্য করার অবস্থায় পৌঁছয় নি, অন্যদিকে গণ-আন্দোলনগুলি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাতীত হয়ে পড়েছিল।

গুজরাটের একটি ছোট শহর বারদোলিতে আহূত কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে গান্ধীকে এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সমর্থন

দেয়া হয়েছিল। আন্দোলন ত্যাগের জন্য কৃষকদের কাছে আবেদন এবং জমিদারদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনও এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে স্বেচ্ছাসেবক দলের কার্যকলাপ বন্ধেরও প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস সদস্যরা গান্ধীর প্রস্তাবিত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল এবং এই কর্মসূচির প্রধান অংশ হিসাবে সম্ভাব্য সকলভাবে তারা সুতাকাটা ও কাপড় বোনা উন্নয়নে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

ক্রান্তিকালে গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনুসৃত এই পথ স্বাধীনতা আন্দোলনের সাধারণ কর্মীদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। এতে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বহু গণসংগঠনই প্রতিবাদ জানিয়েছিল, বামপন্থীদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সন্ত্রাসবাদীদের গোপন কার্যকলাপে নতুন জোয়ার দেখা দিয়েছিল।

সুতরাং নেতৃত্বহীন আন্দোলনের কার্যকলাপ অতঃপর অব্যাহত থাকলেও বর্ধমান নির্যাতনের পরিস্থিতিতে অচিরেই এটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যাঘাত

ভারতে ব্রিটিশ নীতি: ১৯২৩-১৯২৭

১৯১৮-১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপক বৈপ্লবিক কার্যকলাপের পর জাতীয় স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলি কিছুটা পশ্চাদপসরণ করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রত্যাঘাত ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিল। পুঁজিতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ কার্যকর সার্বিক প্রক্রিয়াগুলির অংশ হিসাবেই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এবং তা পুঁজিতন্ত্রের আংশিক স্থায়ী কালপর্বের বিদ্যমানতার প্রমাণ দিয়েছিল।

ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ভারতে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিগুলি পূরণ করার চেষ্টা করছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনের উপর নির্ভরতা এবং প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কলকব্জার সাহায্যে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতে সুতিবস্ত্র সহ অন্যান্য পণ্যরপ্তানি বৃদ্ধি করেছিল। ভারতের বাজারে বিদেশী প্রতিযোগিতা নিম্নোক্ত শুল্কনীতির সাহায্যে হ্রাস করা হয়েছিল: ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অনুকূল সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতিটি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে পরিত্যক্ত হয় এবং ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে স্থানীয় লোহা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। এইসঙ্গে রেলবাহী মালের আবগারী শুল্ক এবং আমদানি-রপ্তানি শুল্কও

বাড়ান হয়। এই ব্যবস্থাবলীর ফলে ভারতে তৈরি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাত্রা হ্রাস পেয়েছিল।

টাকা বিনিময়ের নতুন হার প্রবর্তনক্রমে ফিনান্স ও মুদ্রানীতি সংস্কার ব্রিটেনের মুখোমুখি ভারতীয় অর্থনীতির বিদ্যমান অবস্থাকে মজবুত করেছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবার মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দেয়া সামান্য সুবিধাগুলিকেও ধীরে ধীরে শূন্যাবস্থায় পর্যবসিত করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন অবদমিত হওয়ার পর ঔপনিবেশিক প্রশাসন বিশেষত বাংলায় সর্বপ্রকার বিরোধিতার মূলোৎপাটনে উদ্যোগী হয়েছিল।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে এক কর্মনীতি সংক্রান্ত ভাষণে লয়েড জর্জ স্পষ্টতই ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দানে ব্রিটেনের অনিচ্ছার কথা ঘোষণা করেন। প্রদেশগুলিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মচারীদের পূর্বেকার করায়ত্ত ক্ষমতাগুলি দ্রুত প্রত্যার্পিত হয় এবং তারা খোলাখুলিভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাহী সংস্থাগুলিতে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ অগ্রাহ্য করে চলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় কর্তৃক কেন্দ্রীয় আইনসভার সংখ্যাগুরু সদস্যদের মতামত অগ্রাহ্য করে দেশীয় রাজ্যগুলিতে জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য নির্যাতন চালানোর অনুকূল একটি আইন পাশের ঘটনাটি উল্লেখ্য। বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে ১৯২৪-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে দ্বৈতশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপক ব্যবহার মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা এইসঙ্গে পুনরায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতাবৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। ফলত, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভার সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হিন্দুমহাসভার অধিবেশন ছিল হিন্দু শোভিনিজম প্রচারের একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ। এতে তারা ভারতীয় মুসলমানদের জোরপূর্বক হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার আবেদন জানিয়েছিল। এর প্রতিবাদে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি উন্মত্ত হিন্দুবিরোধী প্রচারে মেতে উঠেছিল। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ব্রিটিশরা এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংগঠনগুলির সাহায্যে ১৯২৩-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও গণহত্যা অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়েছিল। এভাবে খিলাফত আন্দোলনের সময় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে-ওঠা মৈত্রী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই সময় বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে-ওঠা সামন্ত ভূস্বামীদের দক্ষিণপন্থী দলগুলিও (যেমন পঞ্জাবের ইউনিয়ন পার্টি, মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি) ঔপনিবেশিক সরকারকে সমর্থন যুগিয়েছিল।

ব্রিটিশরা প্রতিক্রিয়াশীল দল ও সংগঠনগুলির একটি ঐক্যফ্রন্টকে জাতীয় বিরোধী দলের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোরও চেষ্টা চালিয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক বুর্জোয়া-জমিদার চক্রেব আপোসমূলক মনোভাবই দেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই অবস্থান মজবুতে সহায়তা যুগিয়েছিল। এই শেষোক্ত প্রবণতাটি বিশের দশকের মাঝামাঝি উদ্ভূত একটি পরিস্থিতিতে ভারতীয় বৃহদায়তন সংস্থাগুলির আরও উন্নতির অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির প্রেক্ষিতেই প্রজনিত হয়েছিল।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংঘাত। স্বরাজপন্থী

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় শক্তিগুলির পশ্চাদপসরণের পর গণ-আন্দোলনের মন্দাপর্ব ছিল প্রবল বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বছরগুলির শরিকদের জন্য নিজেদের অর্জিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাগুলি বিশ্লেষণের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। দেশের এই নতুন অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে অনুসৃতব্য নীতির ধরন নিয়ে তখন কংগ্রেসের মধ্যে তোলপাড় চলছিল।

সংগঠন হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসে তখন প্রকট সংকট দেখা দিয়েছিল: ১৯২১-১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এর সদস্যসংখ্যা এককোটি থেকে হ্রাস পেয়ে কয়েক লক্ষে পৌঁছেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাময়িক পরাজয়ের মধ্যে এই ব্যাপক প্রত্যাহারের কারণ নিহিত ছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তৃক 'বারদোলি প্রস্তাব' গ্রহণের পর সংগ্রামের নেতা হিসাবে কংগ্রেসের কিছুটা মানহানি ঘটেছিল।

স্বরাজ লাভের সংগ্রামের সম্ভাব্য ধরন বদল ও গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্যের ফলে পার্টির মধ্যে দুটি প্রধান দল সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রথমটিতে ছিল তথাকথিত সাবেকী দল, গান্ধীপন্থীরা। নবজাত পরিস্থিতিতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে সুপরীক্ষিত গণসত্যাগ্রহ প্রত্যাহার সহ এর স্থলবর্তী হিসাবে তথাকথিত গঠনমূলক কর্মসূচি উপস্থাপিত করেছিলেন।

এমতাবস্থায় গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের অনুসৃত মূল কার্যাবলীর ধরন ছিল: কুটিরশিল্প, বিশেষত সুতাকাটায় উৎসাহদান; অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত মানুষের প্রতি সামাজিক ও দৈনন্দিন বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য প্রচার। এই 'গঠনমূলক কর্মসূচি' বাস্তবায়নে অবশ্যই গান্ধী দুটি প্রধান লক্ষ্য মনে রেখেছিলেন: ব্রিটিশ কর্তৃক জাতীয় আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা নস্যাৎ করা এবং কংগ্রেসের গণভিত্তি, প্রধানত শহুরে জনগণের মধ্যস্তর, কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমর্থন অটুট রাখা।

১৯২৪ ও ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে গান্ধী দক্ষিণ ভারতের দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের ভাইকম শহরে সীমিত পরিসর দুটি সত্যাগ্রহ অভিযান চালান। অস্পৃশ্যদের প্রতি আরোপিত কতকগুলি ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত খাদিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কেবল চরকাই নয়, সুতাকাটুনিদের কাঁচামাল সরবরাহ সহ তাদের পণ্যাদি বিক্রিরও ব্যবস্থা করত।

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় উপদলটি ছিল তথাকথিত 'পরিবর্তনপন্থী'। এতে ছিলেন যুক্তপ্রদেশের বুর্জোয়াদের অন্যতম নেতা মতিলাল নেহরু, বাংলার কংগ্রেস-নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ। রাজনৈতিক সংগ্রামে জনগণের শরিকানার বিরোধী এই নেতারা সীমা লঙ্ঘন না করে, কংগ্রেস সদস্যগণ কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলি দখল করে স্বরাজ লাভের কথা ভাবতেন। এজন্য তাঁরা আগামী পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেসের অংশগ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশ করতেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন ও প্রধান উপাত্ত হিসাবে মেহনতিদের জায়মান শরিকানার ভয় এঁদের কর্মসূচির মর্মবস্তুকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে এলাহাবাদে এই উপদলের একটি সভায় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্বরাজ্যদল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মধ্য থেকে এবং আইনসভার মাধ্যমে প্রতিবন্ধ সৃষ্টির পদ্ধতি ব্যবহারক্রমে ঔপনিবেশিক সরকারকে জাতীয় আন্দোলনের দাবি স্বীকারে যাতে বাধ্য করা যায় সেজন্য এই দলের সদস্যরা আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান সহ একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ গয়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে গান্ধীপন্থীদের পক্ষসমর্থন করা হলেও পরবর্তী বছরে দিল্লীতে আহূত এক বিশেষ অধিবেশনে অন্যতর প্রস্তাব মাধ্যমে স্বরাজ্য দলের সদস্যদের নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানোর অনুমতি দেয়া হয়।

দলের অভ্যন্তরীণ এই তীব্র সংঘাতের ফলে গান্ধী স্বরাজ্য দলকে কিছু কিছু সুবিধাদানে বাধ্য হন এবং একটি বিশেষ দলিলে (গান্ধী-চিত্তরঞ্জন চুক্তি) অসহযোগকে কংগ্রেসের কর্মসূচির প্রধান ধরন থেকে বাতিল করে দেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে বেলগাঁও (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি) শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে এই চুক্তি অনুমোদিত হয় এবং পরের বছর কানপুরে অনুষ্ঠিত সভায় স্বরাজ্যপন্থীদের কার্যকলাপই কংগ্রেস সদস্যদের কাজের প্রধান ধরন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু আইনসভা ও উপদেষ্টা সংস্থাগুলিতে কাজের মাধ্যমে স্বরাজ্যপন্থীরা ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছ থেকে কোনই সুবিধা আদায় করতে পারল না। আইনসভা ও উপদেষ্টা সংস্থাগুলিতে স্বরাজ্যপন্থীদের ব্যর্থতার ফলে

অচিরেই বুর্জোয়া-জমিদার চক্রের মধ্যে এদের প্রভাব হ্রাস পায় এবং ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের পরাজয় ঘটে।

জাতীয় কংগ্রেসে স্বরাজ্য দলের নেতিবাচক কর্মনীতির বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়াদের ব্যাপক স্তর (বিশেষত পেটি ও মধ্যম বুর্জোয়াদের মধ্যে) ও কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাদের স্বার্থরক্ষক বিভিন্ন দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে স্বরাজ্যপন্থীদের দুর্বলতার ফল হিসাবে দলের মধ্যে শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং দলের নেতৃত্বের সংহতিও কিছুটা প্রভাবিত হয়। এভাবে ১৯২০-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি এবং স্বয়ং গান্ধীর নেতৃত্বে (রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিঠলভাই ও বল্লভভাই প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ) অন্যতর উপদলের উদ্ভব ঘটে।

কংগ্রেসে বামপন্থীদের উদ্ভব

নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের ফলজাত ব্যাপক অসন্তোষ থেকেই কংগ্রেসে বামপন্থী উপদলের উদ্ভব ঘটেছিল। এটি ছিল প্রথমত ও প্রধানত কংগ্রেস সমর্থক পেটি-বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিনিধি। আসলে এই সামাজিক ও শ্রেণীভিত্তিক দলগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যাদির সর্বাধিক কুফলভোগী বিধায় এরাই ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয়তর সংগ্রামের সমর্থক।

কংগ্রেসের তরুণ কর্মীদের সমর্থিত এই প্রবণতার নেতা ছিলেন জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ও সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)। এ'রা উভয়ই ভারতীয় উচ্চ সমাজের সন্তান ও নামী ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিশের শতকের গোড়ার দিকে নেহরু ও বসু উভয়ই গান্ধীর অটল সমর্থক হিসাবে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের উদ্ভব এবং দলের নেতৃত্বে এদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির ফলে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনায় জাতীয় বুর্জোয়ার নেতৃত্ব নিশ্চিত করেছিল।

এইসঙ্গে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ এইসব পরিবর্তন ছিল ১৯২২-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে জায়মান নিবিড় পরিবর্তনের সূচক। গণ-আন্দোলনের সাময়িক মন্দা সত্ত্বেও তা দেশের বামপন্থীদের শক্তিই বৃদ্ধি করেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বৈপ্লবিক ধারণার প্রতি সংবেদনশীল ও খোদ ভারতে সংঘটিত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিজাত পরিবর্তন সম্পর্কে বিচারক্ষম

বামপন্থী শক্তিগুলি কংগ্রেসের কর্মসূচির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও জনগণের মধ্যে কংগ্রেস সদস্যদের কার্যকলাপ বৃদ্ধির অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেছিল। লেনিনের শিক্ষা এবং অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অভিজ্ঞতা এইসব শক্তির ধ্যানধারণা পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছিল। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে জওহরলাল নেহরুর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ (তিনি মতিলাল নেহরুর সঙ্গে তরুণ বয়সে এখানে আসেন) তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কিন্তু এইসব তরুণ নেতাদের বাস্তব কার্যকলাপের মধ্য থেকে তাঁদের নির্দিষ্ট পার্থক্যগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে বসু যুবসংগঠনে, সর্বোপরি ছাত্রসংগঠনে ও বাংলা কংগ্রেসে নিজের প্রভাব মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগ ঘনীভূত করেন। এই সময় জওহরলাল নেহরু ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং বিদেশের প্রগতিশীল সংস্থা ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা ও তা প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঔপনিবেশিক জাতিগুলির ব্রাসেল্‌স্‌ অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেখানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগ গঠিত হয়। দেশে ফিরে নেহরু খোদ ভারতে লীগের শাখা গঠনের জন্য ব্যাপক কার্যকলাপ চালান।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থীরা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস মাদ্রাজ অধিবেশনে নেহরু উত্থাপিত ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। অধিবেশনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে নেহরু ও বসু কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব এবং শ্রমিক ও কৃষকের রাজনৈতিক সংস্থা গঠন

নির্বাসিত বিপ্লবী দলসমূহ

নির্বাসিত ভারতীয়দের বিভিন্ন বিপ্লবী কেন্দ্র ও তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে গড়ে-ওঠা সংযোগ তৎকালীন জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে মার্কসবাদী ভাবাদর্শ বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯১৮ ও ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় আগত ভারতীয়রা লেনিন সহ অন্যান্য সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারের ফলে এবং মস্কো, পেত্রগ্রাদ, তাশখন্দ, বাকু ও

দেশের অন্যান্য শহরে দেখা যাবতীয় ব্যাপারে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের এবং বলশেভিক কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভারতীয় পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের অস্পষ্ট ধারণা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁরা সোভিয়েত রাশিয়াকে মিত্র হিসাবেই দেখেছিলেন। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী ও মস্কোর মধ্যে যোগাযোগ প্রথমে কাবুলের ও পরে বার্লিন কেন্দ্রের মাধ্যমে রক্ষিত হচ্ছিল।

বরকতউল্লাহ, এম. পি. বি. টি আচার্য ও আব্দুর রবের নেতৃত্বে ভারতীয় বিপ্লবী সম্মেলন এবং কাবুলস্থ অস্থায়ী ভারত সরকারের যে প্রতিনিধিদলটি ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের বসন্তটি মস্কোয় কাটান ও লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁরা কয়েকমাস যাবত সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেছিলেন। পরে বরকতউল্লাহ ফারসী ভাষায় ‘বলশেভিকবাদ ও ইসলামী জাতিসমূহ’ নামে একটি গ্রন্থ (তাশখন্দ, ১৯১৯) লেখেন, যা অচিরেই অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় অনূদিত হয়। পুস্তিকাটি ভারত সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় সোভিয়েতের জাতিসংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে সত্য সংবাদ পরিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে কাবুল প্রত্যাবর্তনের পর আচার্য ও আব্দুর রব কয়েক দল ভারতীয়কে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত তুর্কিস্তানে পেঁছনোর ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছিলেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির আহবানে এই আন্দোলনের শরিক অনেকগুলি বড় বড় দল, বিশেষত জাতীয়তাবাদী মুসলিম তরুণরা ভারত-আফগান সীমান্ত অতিক্রম শুরু করে। পরবর্তীকালে তুরস্ক পেঁছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে শরিক হওয়া এবং সুলতানের (খলিফার) মর্যাদা রক্ষাই ছিল এদের লক্ষ্য। খিলাফত আয়োজিত শোভাযাত্রা ও সভায় আফগানিস্তানের আমিরের একটি বাণীতে মুহাজিরদের (উদ্বাস্তু) আন্দোলনে তাঁর সমর্থনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়। ভারত থেকে মোট ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজারের মতো মুহাজির আফগানিস্তানে পেঁছেছিল এবং ফলত, আফগান সরকার যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। অবশ্য বছরের শেষ নাগাদ অধিকাংশ মুহাজিরই ভারত প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশই শুধু নানাপথে মধ্যপ্রাচ্য পেঁছেছিল।

কাবুলের গোপন বিপ্লবী সমিতির সদস্যরা, প্রধানত আচার্য ও আব্দুর রব কর্তৃক সর্বাধিক রাজনীতি-সচেতন মুহাজিরদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানোর ফলে তিনদল মুহাজির, সর্বমোট প্রায় দু’শো জন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আফগান-সোভিয়েত সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। অচিরেই এদের অর্ধেক ভারতে ফিরে আসে, অন্যদের ট্রান্সককেশিয়ার মধ্য দিয়ে তুরস্কে পাঠান হয় এবং প্রায় ৩০ জন তাশখন্দে থেকে যায় ও সেখানে এদের মাধ্যমে আচার্য ও রব ভারতীয়

বিপ্লবী সম্মিলনীর তাশখন্দ শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মিলনীর প্রতিনিধি হিসাবে আচার্য ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কমিনটার্ন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আরও একদল ভারতীয় ওখানে পেঁছয় ও বসবাস শুরু করে। এরা ছিল প্রধানত খোরাসানের (ইরান) ব্রিটিশ ইউনিট থেকে পলাতক সৈন্য। তারা বাকুতে 'আজাদ হিন্দুস্তান আকবর' (স্বাধীন ভারতের সংবাদ) নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাকুতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যের নির্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন।

ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রমেই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটছিল। এক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখ্য।

ভারতের গোপন বিপ্লবী সমিতির কর্মী ও পরে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো প্রবাসী মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পার্টির অনুমতি অনুসারে দ্বিতীয় কমিনটার্ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বার্লিন হয়ে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মস্কো পেঁছন। কংগ্রেসে তিনি কমিনটার্নের কার্যকরী সংসদে নির্বাচিত হন এবং সেখানে প্রাচ্য-ব্যুরোর অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে ১৯২০-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ অবধি কাজ করেন।

কংগ্রেসের কার্যশেষে রায় তাশখন্দ যান এবং নির্বাসিত ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রথম দল গঠনের উদ্যোগ নেন এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে এর সদস্যসংখ্যা দশের বেশি ছিল না, কিন্তু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুহাজিরদের আগমনে এর কর্মিসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে কমিনটার্নের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যের মেহনতিদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বছরই তারা একটি ভারতীয় দল গঠন করে। দ্বিতীয় কমিনটার্ন কংগ্রেসের সময় রায়ের উদ্যোগে তৎকালে মস্কোয় আগত উদ্বাস্তু বিপ্লবীদের নিয়ে ভারতের অস্থায়ী বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। এই সংগঠনের নামেই তিনি ভারতের অভ্যন্তর ও তার সীমান্তবহিঃস্থ এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

এই দলের প্রথম সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ শফিক। নির্বাচনের আগে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় বিপ্লবী সম্মিলনীর ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'জমিনদার' [কৃষক অর্থে—সম্পাঃ] নামে একটি পত্রিকার একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন।

তাশখন্দ ও মস্কোয় শিক্ষালাভের পর মুহাম্মদ শফিক, ফিরোজুদ্দিন মনসুর, আব্দুল মজিদ, রফিক আহমেদ ও শওকত ওসমানী সহ প্রাক্তন মুহাজিরদের একটি দল ভারতে প্রত্যাবর্তন করে এবং সেখানে গঠিত কমিউনিস্ট দলগুলির

পে অংশগ্রহণ করতে থাকে। অন্যরা বিদেশে থেকে কমিনটার্নের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংগঠনগুলিতে তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে।

রায় ছাড়াও ভারতীয় প্রবাসী কমিউনিস্ট দলগুলি গঠনে অবনী মুখার্জীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দ্বিতীয় কমিনটার্ন কংগ্রেসে বার্লিনস্থ ভারতীয় স্বাধীনতা কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন।

বিশের দশকের দিকে রায় ও মুখার্জী ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন, দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি নিয়ে বই, পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন এবং এগুলি বেআইনীভাবে ভারতে পাঠান। এগুলি দেশের পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মার্কসবাদ প্রচারে ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রথম ইশতেহারে এঁদেরও স্বাক্ষর ছিল। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা ও ভারতে সামাজিক বিপ্লবের প্রস্তুতি চালানোর লক্ষ্যে জাতীয় বিপ্লবীদের রূপান্তর সাধনের সম্ভাব্য কর্তব্যগুলি এই ইশতেহার উপস্থাপিত করেছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রাথমিক পর্যায়ে রায়ের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট অসঙ্গতিপূর্ণ। দ্বিতীয় কমিনটার্ন কংগ্রেসে জাতীয় ও ঔপনিবেশিকতার প্রশ্নে লেনিনের সঙ্গে তাঁর মতবৈষম্যে প্রকটিত প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিপ্লবের মূল্যায়নে রায়ের গোঁড়ামিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক মতের ফলে বিশের দশকে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট দলগুলির পক্ষে শুদ্ধ রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা দেখা দিয়েছিল এবং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্গত বামপন্থী শক্তিগুলির ঐক্যফ্রণ্ট গঠন প্রহত হয়েছিল। রায়ের রাজনৈতিক ভুলের ফলে শেষে কমিউনিস্ট ধারা থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটেছিল এবং ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে কমিনটার্নের কার্যকরী কমিটি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

তাসত্ত্বেও মার্কসবাদী ভাবাদর্শ প্রচার এবং ভারতের কমিউনিস্টদের সংগঠনে রায়ের অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জাতীয় বিপ্লবী কর্মীদের অন্যতম হিসাবে রায় ও মুখার্জী ভারতের গোপন বিপ্লবী সমিতি, এগুলির প্রবাসী কেন্দ্রসমূহ ও জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থীদের ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আধার ভাবতেন। ফলত ,তাঁরা ভারতীয় পেটি-বুর্জোয়া যুবকদের সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবমুক্ত করাকে নিজেদের দায়িত্ব বিবেচনা করতেন। এই লক্ষ্যেই রায়, মুখার্জী ও তাঁদের নেতৃত্বে একদল প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট স্বরাজপন্থী নেতাদের থেকে শুরু করে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের পর নতুনভাবে অনুষ্ঠিত গোপন

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী দলগুলি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের জন্য রায় ও মুখার্জী একটি বিস্তারিত ইশতেহার রচনা করেছিলেন। এতে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। এই উপলক্ষে আরও বলা হয়েছিল যে, এদের দাবিগুলি কংগ্রেসের কার্যসূচিভুক্ত হওয়ার শর্তেই কেবল কংগ্রেসের পক্ষে কার্যকর জনপ্রিয় নেতৃত্বলাভ সম্ভবপর হতে পারে। ইশতেহারের একটি কপি কমিউনিস্ট কর্মী নলিনী গুপ্ত বেআইনীভাবে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী অংশে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের অস্তিত্ব, রায় ও ভারতের আরও কিছু কমিউনিস্টদের মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রাধান্য ও গোঁড়ামিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি—এই সবই বামপন্থী শক্তিগুলির একটি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণের সম্ভাবনাকে প্রহত করেছিল। বার্লিনস্থ ভারতের স্বাধীনতা কমিটির অন্যতম নেতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে মস্কোয় অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ অধিবেশনে এরই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মস্কোয় অনুষ্ঠিত নির্বাসিত বিপ্লবী দলগুলির এই আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর চট্টোপাধ্যায় বার্লিনে ফিরে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগের একটি সম্মেলন আহ্বানে উদ্যোগী হন। তিনি অতঃপর এই লীগের অন্যতম সংগঠক ও নেতা হয়ে ওঠেন।

বিশের দশকের গোড়ার দিকে খোদ ভারতেই প্রথম কমিউনিস্ট দলগুলি গঠিত হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট দলগুলির উদ্ভব ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা

বৈপ্লবিক দলগুলির পশ্চাদপসরণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতচিহ্নিত 'বারদোলি প্রস্তাবের' পর জাতীয় বিপ্লবী ও অতীতে অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় শরিক কংগ্রেসের বামপন্থীরা গান্ধীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। পুনরায় গোপন আন্দোলনে সক্রিয়তা দেখা দেয়। হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। আত্মগোপণকারী বিপ্লবীরা, বিশেষত পঞ্জাবের দলগুলি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে কাবুলে পুনর্গঠিত ও জাতীয় কংগ্রেসের শাখা হিসাবে কার্যরত নির্বাসিতদের বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখে তাদের কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। এই বছর ঔপনিবেশিক সরকার পঞ্জাবে সশস্ত্র

অভ্যুত্থান ঘটানোর একটি নতুন ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। বিপ্লবী যুবকর্মী সহ ক্রমেই অধিক সংখ্যক মানুষ তখন মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল।

১৯১৭-১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়টি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে বিবেচ্য: অক্টোবর বিপ্লবের ফলাফলের প্রচার ও তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের গৃহীত প্রথম পদক্ষেপ আর কমিনটার্ন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জী পরিচালিত নির্বাসিত ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের কার্যকলাপের ফলে প্রথম মার্কসবাদী চক্রগুলির অভ্যুদয়ের প্রস্তুতি পূর্ণ হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের মূল ধারণাবলী ব্যাখ্যার (নানা ধরনে ও নানা পরিসরে) জন্য তৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বোম্বাইয়ের ছাত্র শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে লিখিত পুস্তিকা 'গান্ধী ভার্সাস লেনিন' (১৯২১) সবিশেষ উল্লেখ্য। অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় শরিক ডাঙ্গে এই পুস্তিকায় গান্ধী ও লেনিনের রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিগুলি তুলনা সহ গান্ধীর কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের সমালোচনা করেছেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ডাঙ্গের উদ্যোগে ভারতের প্রথম মার্কসবাদী সাময়িকী 'সোশ্যালিস্ট' (ইংরেজী ভাষায়) প্রকাশিত হয়। এতে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাবলীর বিস্তৃত বিবরণী ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের তথ্যাদি থাকত এবং ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হত। ডাঙ্গের কার্যকলাপের ক্ষেত্র বোম্বাইয়ের বিভিন্ন বিপ্লবী যুবদলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'সোশ্যালিস্ট' ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভারতীয় শ্রমিক সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠনের ঘোষণা প্রচার করে। এই মার্কসবাদী দলে এস. এ. ডাঙ্গে, এস. ভি. ঘাটে, কে. এন. যোগলেকর, আর. এস. নিম্বকরের অন্তর্ভুক্তি থেকে দেখা যায় যে, তৎকালে জাতীয় আন্দোলনে মার্কসবাদী দলের অভ্যুদয় ডাঙ্গে ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে কংগ্রেসভুক্ত একটি বামপন্থী অংশের উদ্ভব হিসাবেই প্রকটিত হয়েছিল। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ের দল 'সোশ্যালিস্ট' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল।

অন্যান্য বড় বড় শিল্পকেন্দ্রেও মার্কসবাদী দলের অভ্যুদয় ঘটেছিল। শওকত ওসমানী মস্কো থেকে ফিরে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে একটি কমিউনিস্ট দল গঠন করেছিলেন। গোলাম হোসেনের নেতৃত্বে লাহোরেও একটি কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়েছিল। তাশখন্দ থেকে কাবুল প্রত্যাগত মহাম্মদ আলীর (সিপাহী) সঙ্গে গোলাম হোসেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। গোলাম হোসেন সম্পাদিত সংবাদপত্র 'ইনকিলাব' ছিল লাহোর দলের মুখপত্র। মুজাফ্ফর আহ্মদ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা-দলও তখন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমকে তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে মুজাফ্ফর আহ্মদের সম্পাদনায় 'গণবাণী' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়েছিল। সিঙ্গারাভেল্লু চেট্টিয়ার মাদ্রাজে একটি মার্কসবাদী

দল গঠনক্রমে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে 'লেবার-কিষান গেজেট' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

প্রথম মার্কসবাদী সংবাদপত্রগুলি যৌথ প্রচার ও সংগঠনের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে গোপনে ভারতে প্রচারিত 'ভ্যানগার্ড অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স' (১৯২২-১৯২৪) ও 'ম্যাসেস অব ইণ্ডিয়া' (১৯২৫-১৯২৭) পত্রিকাগুলির ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৩-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কেবল বিদ্যমান মার্কসবাদী দলগুলির আয়তনই নয়, কানপুর ও করাচীর মতো শিল্পকেন্দ্রগুলিতে নতুন নতুন মার্কসবাদী চক্রও গঠিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মার্কসবাদী কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং নির্বাসিত ভারতীয় কমিউনিস্ট দলগুলির সঙ্গেও পত্রবিনিময় চলছিল। নিজেদের কার্যকলাপ সমন্বয় এবং একটি সারা ভারত সংগঠন তৈরিই তখন ভারতের মার্কসবাদী দলগুলির প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছিল।

বিরূপ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রেক্ষিতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের পক্ষে আইনী কার্যকলাপ চালানোর সম্ভাবনা ছিল খুবই সীমিত। নির্বাসিত বিপ্লবীদের কেন্দ্রগুলির কাজে অংশগ্রহণের পর সম্প্রতি স্বদেশ প্রত্যাগত মুহাজিরদের বিরুদ্ধে ১৯২২-১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে কর্তৃপক্ষ 'পেশোয়ার ষড়যন্ত্র' নামে একটি মিথ্যা মামলা তৈরি করেছিল। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী মামলায় শ্রীপাদ ডাঙ্গে, মুজাফ্ফর আহ্মদ ও শওকত ওসমানী সহ মার্কসবাদী দলগুলির নেতাদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এতে ভারতীয় কমিউনিস্টরা 'বলশেভিক দালাল' হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এইসব নির্যাতন সত্ত্বেও ব্রিটিশ গুপ্তচররা ভারত থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন উৎখাত করতে পারে নি। পক্ষান্তরে, ১৯২৪-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে এদেশে মার্কসবাদী দলগুলি তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছিল।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সত্য ভক্ত নামে কানপুরের জনৈক সাংবাদিক একটি আইনসম্মত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এই পার্টির নেতৃবৃন্দের বিবৃতিতে এর সঙ্গে কমিনটার্ন ও বিদেশস্থ অন্যান্য বিপ্লবী কেন্দ্রের সংযোগ অস্বীকৃত হওয়ায় এটির গঠন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কিছুটা সহনশীল মনোভাব দেখিয়েছিল। সত্য ভক্ত প্রতিষ্ঠিত এই পার্টি ভারতীয় কমিউনিস্টদের একত্রীকরণের কোন কেন্দ্র হয়ে না উঠলেও তিনি ভারতীয় মার্কসবাদীদের বিভিন্ন দলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতা হিসাবে খ্যাত হাসরত মোহানীর নেতৃত্বে আগামী সংহতি-সম্মেলনের জন্য একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। ফলত, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে (২৮-৩০ ডিসেম্বর) মাদ্রাজের কমিউনিস্ট এম. সিঙ্গারাভেল্লু চেট্টিয়ারের সভাপতিত্বে কানপুরে ভারতীয়

কমিউনিস্টদের প্রথম সম্মেলন আহূত হয়। সম্মেলন বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠা সহ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। অতঃপর জে. পি. ভগীরথ ও এস. ভি. ঘাটেকে সম্পাদক নির্বাচনক্রমে ভারতের সকল কমিউনিস্ট দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ গঠিত হয়।

কমিনটার্নের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্ন নিয়ে অচিরেই এই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। সত্য ভক্ত তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'জাতীয় চারিত্র্য' রক্ষার ও কমিনটার্নের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রাখার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে অধিকাংশ প্রতিনিধি এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করলে সত্য ভক্ত পার্টি ত্যাগক্রমে ভারতের জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিলেন। এটি মূলত বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার আইনী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য তৎকালে কমিনটার্নের শরিক হয়ে না উঠলেও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে এটির সংযোগ অবশ্যই মজবুত হয়েছিল। ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকেও এই যোগাযোগ বৃদ্ধি ঘটেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমিনটার্ন কার্যকরী সংসদের একটি প্রস্তাব মোতাবেক ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির উপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে সহযোগিতা দেয়ার দায়িত্ব বর্তিয়েছিল। ১৯২৫-১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা ভারতে এসেছিলেন। ব্যাপকভিত্তিক বৈপ্লবিক সংগঠন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চা গঠনের কর্মসূচি অতঃপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাসিত ভারতীয় কমিউনিস্ট দলটি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বৈদেশিক ব্যুরোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। স্মর্তব্য, ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে এটি পার্টির সংবিধানভুক্ত হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটি নতুন পর্যায় সূচনা করেছিল, দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আয়োজিত নতুন অর্থনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে এর সন্নিপাত ঘটেছিল।

১৯২৩-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের শ্রমিক আন্দোলন। শ্রমিক ও কৃষক পার্টি

১৯২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনের মন্দাবস্থা যথারীতি শ্রমিক আন্দোলনেও প্রকটিত হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে ধর্মঘটের সংখ্যা ও এগুলির শরিক শ্রমিকদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু

এইসঙ্গে ধর্মঘটগুলি কিন্তু অধিকতর সুসংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী ও অটলতর হয়েছিল। ১৯২৪ ও ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দেই ধর্মঘট আন্দোলনে বিশেষ তীব্রতা দেখা দিয়েছিল এবং এই বছরগুলিতে যথাক্রমে ৮৭ লক্ষ ও ১ কোটি ২৫ লক্ষ কার্যদিন (যথাক্রমে ১৯২২, ১৯২৬ ও ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ৩৯ লক্ষ, ১০ লক্ষ ও ২০ লক্ষ কার্যদিনের সঙ্গে তুলনীয়) নষ্ট হয়েছিল। যথারীতি ধর্মঘটগুলি ছিল আত্মরক্ষামূলক চারিত্র্যের। মজুরি হ্রাস বা কার্যদিনের সময় বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে এগুলি সংগঠিত হয়েছিল। ১৯২৪ ও ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের বোম্বাই বস্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট এবং ১৯২৬ ও ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের রেলশ্রমিক ধর্মঘটগুলি ছিল শ্রমিক শ্রেণীর তৎকালীন বৃহত্তম উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে বোম্বাইয়ের প্রলেতারিয়েতরা ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে উঠেছিল।

শিল্পোদ্যোগী ও তাদের সমর্থক ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ তখন আক্রমণকারীর ভূমিকাসীন ছিল এবং ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে বিশেষ কারখানা আইন জারি হয়েছিল। এই আইনবলে সরকার শ্রমিক সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেয়েছিল এবং অনেকগুলি ধর্মঘটে শ্রমিকদের পরাজয় ঘটেছিল। এর মূলে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীদের অবস্থানের অবদানও কম ছিল না।

১৯১৮-১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপক বৈপ্লবিক কার্যকলাপের পর ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিকাশ ঘটেছিল এবং এগুলির সংগঠন মজবুত হয়ে উঠেছিল। সন্দেহ নেই, নতুন সদস্য হিসাবে বাবু-কর্মী ও বোম্বাইয়ের শিল্পশ্রমিকদের যোগদানের ফলেই মূলত শ্রমিক আন্দোলনে এই উন্নতি দেখা দিয়েছিল। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতের প্রায় ২০০ ট্রেড ইউনিয়নের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষের মতো। তন্মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার সদস্যের ৫৭টি ইউনিয়ন ছিল সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অনুমোদনপ্রাপ্ত।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উন্মেষ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্তন সূচনা করেছিল। প্রথম গড়ে-ওঠা কমিউনিস্ট দলগুলির সদস্যরা ধর্মঘট সংগঠন সহ শিল্পশ্রমিক ও বাবু-কর্মীদের মধ্যে স্থানীয় ভিত্তিতে সংহতি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছিল। কমিউনিস্ট দলগুলির বহু সদস্যের (মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ, গোলাম হোসেন ও বোম্বাই দলের নেতৃবৃন্দ) ইতিমধ্যেই ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কল্যাণেই এটি ঘটেছিল। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কমিউনিস্ট ও অন্যান্য র‍্যাডিকালদের প্রভাবে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত কর্মীদের কার্যকলাপ বন্ধের জন্য পুলিশ নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রস্তাব; ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের শ্রমিকদের ভোটাধিকার চালু করার প্রস্তাব; ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাব উল্লেখ্য।

এই সময়ই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দখলের জন্য কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীদের লড়াই শুরু হয়েছিল। ১৯২৫-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ লেবর পার্টি ভারতে অনেকগুলি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিজেদের প্রভাবাধীন করার প্রয়াস পেয়েছিল।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে কানপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে একটি লড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সভায় ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে 'পীত' ট্রেড ইউনিয়নের আমস্টার্ডাম আন্তর্জাতিকের সদস্যভুক্তির প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যায়। একইসঙ্গে প্রফিনটার্ন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগে এটির অন্তর্ভুক্তির জন্য বামপন্থীদের উত্থাপিত প্রস্তাবটিও সম্মেলন বাতিল করে দেয়। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদের অধিকাংশ পদ তখনো জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীদের দখলভুক্ত থাকলেও কমিউনিস্টরাও কয়েকটি পদ দখল করেছিল। বোম্বাই শ্রমিক ও কৃষক পার্টির সভাপতি ডি. আর. থেঙ্গাডি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এবং ডাঙ্গে সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কমিউনিস্টদের প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির কার্যকলাপ শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে আইনসম্মতভাবে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন মেহনতিদের সংগঠন—শ্রমিক ও কৃষক পার্টি গঠনের প্রথম ব্যর্থচেষ্টা করেছিলেন সিঙ্গারাভেল্লু চেট্টিয়ার। ১৯২৬-১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় এবং পরে বোম্বাই প্রদেশ, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে শ্রমিক ও কৃষক পার্টি গঠিত হয়। এইসব সংগঠনের নেতৃত্বে ছিল বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা।

শ্রমিক ও কৃষক পার্টিগুলি ছিল তৎকালে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও শহুরে মধ্যবিত্তদের উপর কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তারের মূল পথ। এগুলির নেতৃত্বে ত্রিশের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষান সভা জোরদার হয়ে উঠেছিল।

এই পার্টিগুলি শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের স্বার্থরক্ষা করত এবং জমিদারী প্রথা বিলোপ সহ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাত। শ্রমিক ও কৃষক পার্টিগুলির

কর্মসূচি প্রকাশ এবং জাতীয় কংগ্রেসের কাছে তাদের আবেদনের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী উপদলের কেলাসন ত্বরিত হয়েছিল। এই দলগুলির প্রকাশিত বিবিধ সংবাদপত্র তাদের প্রচারকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলার 'গণবাণী', বোম্বাইয়ের 'ক্রান্তি', পঞ্জাবের 'কির্তি' (শ্রমিক), 'মেহনতকাশ' (মেহনতি মানুষ) ও 'মজদুর-কিষান' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক ও কৃষক পার্টিগুলির কার্যকলাপ মুক্তি-আন্দোলনে একটি নতুন উচ্ছ্রয়ারম্ভের অপরিহার্য পূর্বশর্ত সৃষ্টিতে সহায়তা যুগিয়েছিল।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারত সরকারের জন্য একটি নতুন বিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে লর্ড সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের সংবাদ ঘোষণার ফলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে পুনরায় উত্তেজনা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেয়। এই কমিশনে কোন ভারতীয় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন সাইমন কমিশন বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রচারাভিযান এই সময় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও যুক্তফ্রণ্ট গঠনের সংগ্রাম (১৯২৮-১৯৩৯)

৯৯১৮-১৯২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন উন্নেতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক হেতুগুলি তখনো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে নি। পরবর্তীকালীন সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যাঘাতের ফলে ঔপনিবেশিক সরকার এবং ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে অসঙ্গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে জাতীয় পুঁজিতন্ত্রের আরও বিকাশ কেবল ব্রিটিশ একচেটিয়া ও ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়ার মধ্যেকার অসঙ্গতিকেই গভীরতর করেছিল।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। ভারতের অর্থনীতিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের অভিঘাত

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ভারতের অর্থনীতিতে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল। এর আগে সেই ১৯২৭-১৯২৮ খ্রীস্টাব্দেই কৃষিফসল বিক্রির মন্দা সহ কৃষিসংকট দেখা দিয়েছিল। এতে প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের দর যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, গমের ৫০ শতাংশ ও পাটের ৫০-৬৫ শতাংশ দরঘাটতির ঘটনাটি উল্লেখ্য। এই সময় ঔপনিবেশিক সরকার যথেষ্ট খাজনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিরাজস্বের হার পুনর্বিবেচনার প্রয়াস পেয়েছিল। এটি ছিল যথার্থ চাষীদের বড় অঙ্কের আয়হ্রাসেরই নামান্তর। প্রতিকূল বাজারের পরিস্থিতিজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য জমিদাররা দ্রব্যের বদলে নগদ অর্থে খাজনা আদায় শুরু করেছিল। ক্রমেই অধিক সংখ্যক রায়ত-চাষী ও ক্ষুদ্র চাষী দেউলিয়া হয়ে পড়ছিল এবং কৃষকের জমি বর্ধমান হারে জমিদার, মহাজন ও ধনী কৃষকের কুক্ষিগত হচ্ছিল। এই সময় কৃষিঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকায় পেঁাছেছিল।

গ্রামের উপর এইসব আঘাত ছাড়াও সংকট তখন শহরগুলিকেও বেষ্টন করেছিল। কারখানা ও ছোট ছোট শিল্পসংস্থা অচল হয়ে পড়ছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই সময়ে পুনর্গঠনের নামে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর ও সাধারণ বাবু-কর্মীদের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল।

ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা উপনিবেশগুলির মূল্যে, প্রথমত ও প্রধানত ভারতবর্ষের

ম্ল্যে এই অর্থনৈতিক সংকট এড়াতে চেয়েছিল। এই সময় ভারতীয় রপ্তানি-আমদানির (সর্বোপরি ব্রিটেন থেকে) ফারাক যথেষ্ট ব্দ্ধি পাচ্ছিল।

তৎকালীন জীবনযাত্রার ব্যয়ব্দ্ধি এবং বহ্ ক্ষ্দ্র সংস্থা দেউলিয়া হওয়ার প্রেক্ষিতে অনেক ভারতীয়ই তাদের সঞ্চয়টুকু (প্রথান্যায়ী র্পা ও সোনার অলঙ্কারের আকারে সঞ্চিত) খরচ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সংকটকালে ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগ্লি তাদের মহাজন-দালালদের মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকা ম্ল্যের ম্ল্যবান ধাতু ভারতের বাইরে পাচার করেছিল।

সংকট শ্ধ্ মেহনতিদেরই আঘাত করে নি। সারা দেশে তখন ক্ষ্দ্র ও মধ্যম আকারের শিল্প ও ব্যবসা সংস্থাগ্লিও দেউলিয়া হয়ে পড়ছিল। এমতাবস্থায় বিদেশী একচেটিয়া ও ভারতীয় ব্র্জোয়াদের ঊর্ধ স্তরগ্লির অর্থনৈতিক অবস্থানই শ্ধ্ অটুট ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের ঊর্ধ্বতন স্তরের এই শক্তিব্দ্ধির ফলে এদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থদ্বন্দ্বের তীব্রতা ব্দ্ধি পেয়েছিল।

তাই, ভারতে শ্রেণীগত ও জাতীয় অসঙ্গতি ব্দ্ধিকারী এই অর্থনৈতিক সংকট দেশের শ্রেণী-সংগ্রামে তথা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন বেগ সঞ্চার করেছিল।

শ্রমিক আন্দোলন: ১৯২৮-১৯২৯

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম থেকেই দেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের একটি নবপর্যায় শ্র্ হয়েছিল। এই সময় ধর্মঘট আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছিল, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ৫ লক্ষাধিক মান্ষ ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। গত দশ বছরের অর্থনৈতিক সংগ্রামে অন্পস্থিত কিছ্ নতুন বৈশিষ্ট্য বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে অন্ষ্ঠিত ধর্মঘটগ্লিতে য্ক্ত হয়েছিল।

পিকেটিং ও ধর্মঘট কমিটি গঠন—সংগ্রামের এই দ্টি ধরনের ব্যবহার ক্রমেই ব্দ্ধি পাচ্ছিল। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট কমিটিগ্লির নেতৃত্ব লাভের জন্য কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীদের সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই সংগ্রামের ফলে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এগ্লি একযোগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাত ও অটলভাবে শ্রমিকদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করত।

বস্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বে এই ধরনের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ে। ডাঙ্গে এবং ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট বেন ব্র্যাড্লি পরিচালিত ও 'গিরনি কামগড়' নামে বস্ত্রকল শ্রমিকদের একটি ট্রেড

ইউনিয়ন পরবর্তীকালে দেশের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কোষকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

কয়েক হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পর বোম্বাইয়ের বস্ত্রকলে ব্যাপক লকআউট ঘোষণার প্রেক্ষিতে শুরু হওয়া ধর্মঘটটি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল ও বোম্বাইয়ের সকল বস্ত্রকল শ্রমিক এতে যোগ দিয়েছিল। ছমাস স্থায়ী (১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল থেকে অক্টোবর অবধি) এই ধর্মঘটে দুকোটির বেশি কার্যদিন নষ্ট হয়েছিল। ধর্মঘটীদের অনমনীয়তা সারা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। শোলাপুর ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিক এবং রেলশ্রমিকরা সহানুভূতিমূলক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। ভারত এবং ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মঘটীদের জন্য বিশেষ তহবিল সংগৃহীত হয়েছিল।

ধর্মঘট সংগঠনকারীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা এবং ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য গুণ্ডা নিয়োগ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে ধর্মঘটীদের প্রতিরোধ দুর্বল করার চেষ্টা সত্ত্বেও শিল্পোদ্যোগীরা ও ঔপনিবেশিক সরকার শেষাবধি শ্রমিকদের সুবিধাদানে বাধ্য হয়। ফলত, ধর্মঘটীদের অর্থনৈতিক দাবিগুলি পর্যালোচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন সহ (মজুরি কাটা ও ছাঁটাই এবং অস্পৃশ্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ) গিরনি কামগড় ইউনিয়ন সরকারীভাবে বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছিল ও ধর্মঘট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর পুলিশী হামলা বন্ধ হয়েছিল।

বোম্বাই বস্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে। এটি ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত কার্যকলাপের পরবর্তী পর্যায়ে বৈপ্লবিক আধান সংযোজিত করেছিল।

গিরনি কামগড় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও এটির আশু সাফল্য সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী উপদল গঠন ত্বরিত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেইসময় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ঝরিয়ায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে জমি ও শিল্প জাতীয়করণের ভিত্তিতে ভারতে স্বাধীন, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মসূচি যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বৈপ্লবিক হয়ে উঠেছিল এই উদ্যোগের মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতাসীন ইংলণ্ডের লেবর পার্টি ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিতে বামপন্থীদের এই সংহতির প্রতি দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল: একদিকে সে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছনোর মনোভাব

দেখিয়েছিল, হুইটলির নেতৃত্বে ভারতে শ্রমিকদের জন্য রাজকীয় কমিশন গঠন করেছিল, আবার অন্যদিকে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন দমনের বিদ্যমান নির্মম নীতিও অব্যাহত রেখেছিল। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংস্থা গঠন রহিত করে ও ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ কেবল অর্থনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে সীমিত করে আইন পাশ সহ এইসঙ্গে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ দমনও তীব্রতর করা হয়েছিল।

বামপন্থী ইউনিয়নের সমর্থক কারখানা কমিটির সদস্যদের নানা ধরনের উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রমিকরা ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে গিরনি কামগড় সমর্থনে পুনরায় একটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করেছিল। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান বামপন্থী নেতারা শুরুতেই গ্রেপ্তার হওয়ায় এবার ধর্মঘটটি আর সফল হয় নি।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী কংগ্রেস সদস্যদের বর্ধমান প্রভাব বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। দশম সম্মেলনে (১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে, নাগপুরে) সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা গিরনি কামগড় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কংগ্রেসভুক্তি ব্যাহত করার প্রয়াস পেয়েছিল। নিজেদের সংখ্যালঘুত্ব লক্ষ্য করে দক্ষিণপন্থীরা সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পরিত্যাগক্রমে সেই বছর ডিসেম্বরেই ভি. ভি. গিরি ও এন. এম. যোশীর নেতৃত্বে 'ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গঠন করেছিল। এভাবেই ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রথম ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছিল।

নাগপুর সম্মেলন হুইটলি কমিশন বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সুভাষচন্দ্র বসু সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে, তখনকার বিদ্যমান অনুকূল পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও তাদের দরদী বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের পক্ষে কংগ্রেসের বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু এই সুযোগ সদ্ব্যবহৃত হয় নি। স্মর্তব্য, খোদ কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির অবদানও এতে কিছু কম ছিল না।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিস্থিতি

বিশের দশকের শেষ ও ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে ট্রেড ইউনিয়নই কমিউনিস্ট কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এবং এতে উল্লেখ্য সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। অন্যতর যেসব ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার

অনুসারীদের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে পারত সেগুলি হল শ্রমিক ও কৃষক পার্টি। শ্রমিক আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ার ফলে ওইসব পার্টির কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিভিন্ন প্রদেশে এই নামে চালু সংগঠনগুলিকে একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সারা ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির প্রথম সম্মেলন আহূত হয়েছিল।

এর বিভিন্ন প্রস্তাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বান জানান হয় যা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর মুখ্য ভূমিকাকে অপরিহার্য করে তুলেছিল। সম্মেলন শ্রমিক ও কৃষক কর্তৃক শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতর করার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল।

কমিউনিস্টরা বাংলা, পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, তারা 'নওজোয়ান ভারত সভা' ইত্যাদি যুবসংস্থা গঠন করেছিল।

গণসংগঠনে কমিউনিস্ট প্রভাববৃদ্ধি প্রহত করার চেষ্টায় ঔপনিবেশিক প্রশাসন ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের উপর বড় আকারের হামলা চালিয়েছিল। তারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ১৪ জন নেতা সহ ৩৩ জন বামপন্থী নেতা ও ১৮ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে। চার বছর দীর্ঘ 'মীরাট ষড়যন্ত্র'খ্যাত এই মামলাকে কমিউনিস্টরা সুকৌশলে ভারতে ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক নীতিকে অভিযুক্ত করার ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণাবলী প্রচারের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সহ জাতীয় জনগণের ব্যাপক স্তর তাঁদের সমর্থন দিয়েছিল। ভারত ও বিদেশে অভিযুক্তদের সমর্থনে বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল।

পার্টির যেসব নেতা গ্রেপ্তার হন নি তাঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলন তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কমিনটার্ন প্রকাশন 'ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপন্ডেন্স' কর্তৃক ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মপন্থা' থেকে দেখা যায় যে তৎকালীন ভারতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন ও সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এটি ছিল বামপন্থী হঠকারিতারই নামান্তর। এইসব প্রস্তাব মোতাবেক ১৯৩১-১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি যোগ দেয় নি।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈপ্লবিক প্রাণকেন্দ্রের উৎসাদন, এগুলির ভাঙ্গন ও

কমিউনিস্টদের বামপন্থী-সংকীর্ণতাদুষ্ট অবস্থান গ্রহণ—এসবই শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের তুঙ্গাবস্থা সত্ত্বেও এই সময় ধর্মঘট আন্দোলন ১৯২৭-১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের পর্যায়ে পেঁছিতে পারে নি।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের শ্রমিক ও বাবু-কর্মীদের ধর্মঘট ছিল ১৯৩০-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেকার বৃহত্তম ধর্মঘট। এতে আশি হাজারেরও বেশি কর্মী যোগ দিয়েছিল। বস্ত্রকল শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী অগ্রদূত হয়ে ওঠা এই রেলশ্রমিকরা নিজ লক্ষ্যসাধনে দৃষ্টান্তমূলক অটলতার পরিচয় দিয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আপোসমূলক অবস্থান, লকআউট ও সৈন্যনিয়োগ সত্ত্বেও ধর্মঘট এক বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং অন্যান্য রেলপথের শ্রমিক ও বাবু-কর্মীদের সমর্থন পেয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের দ্বিতীয় ভাঙ্গনের ফলে পুনরায় সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (কলিকাতা, ১৯৩১) কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বামপন্থীরা সংগঠন ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। রেলশ্রমিকদের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পূর্ণসদস্য হিসাবে বিবেচ্য কিনা, অধিকাংশ নেতা ও কমিউনিস্টদের মধ্যে এই প্রসঙ্গে তীব্র মতবৈষম্যের কারণেই এমনটি ঘটেছিল। অতঃপর সারা দেশে 'লাল ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র' নামে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয় ও তা প্রফিনটার্নের অনুমোদন পায়।

কমিনটার্ন ও ভ্রাতৃসুলভ কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ভারতীয় কমিউনিস্টদের ভুল সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে কমিনটার্নের সাময়িকীগুলিতে জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রস্তাবিত 'ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রতি খোলা চিঠি' প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত বামপন্থী-সংকীর্ণতার সমালোচনা সহ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট তৈরির কাজের জন্য কংগ্রেস পরিচালিত দেশজোড়া আন্দোলনের শরিক থাকতে সুপারিশ করা হয়েছিল।

এই দলিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর সুফল ফলিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর কয়েকজন নেতা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে থাকার জন্য এই বামপন্থী-সংকীর্ণতার প্রভাব এড়াতে পেরেছিলেন।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত পার্টি সম্মেলনে গঙ্গাধর অধিকারীকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এবার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কমিনটার্নের অনুমোদন পায় এবং এটি দেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। অবশ্য বৈপ্লবিক কার্যকলাপে মন্দাভাব দেখা দেয়ার পরই শুধু এসব সম্ঘটিত হয়েছিল।

১৯২৮ ও ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক কার্যকলাপ সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক জীবনে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছিল।

নতুন ভারতবিধি প্রণয়নের প্রস্তুতি। জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা

ভারত শাসনের জন্য নতুন বিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত সাইমন কমিশন ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে পেঁাছলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নতুন তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। জাতীয় কংগ্রেস ও সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 'সাইমন কমিশন ভারত ছাড়ো' আহ্বান জানিয়ে ধর্মঘট আহ্বান করে। নতুন বিধি প্রণয়নের সময় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বেচ্ছায় ভারতীয় জনমত উপেক্ষার বিরুদ্ধে শুধু জাতীয় কংগ্রেস এবং শ্রমিক ও কৃষক পার্টি, ট্রেড ইউনিয়নের মতো গণসংগঠনগুলিই নয়, মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভাও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কেবল প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার পার্টিগুলিই সাইমন কমিশনকে সহায়তা দিয়েছিল।

ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলির এই বয়কটের ডাক কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পেয়েছিল।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে আহূত আন্তঃ-পার্টি সম্মেলনগুলিতে দেশকে দেয় সম্ভাব্য ডোমিনিয়ন স্টাটাসের প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও রাজনৈতিক সংগঠনের নীতি নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চলেছিল।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশজোড়া বয়কট আন্দোলন এবং ভারতের খসড়া সংবিধান তৈরির উদ্যোগ ছাড়াও জাতীয় কংগ্রেস তখন তার গণসমর্থনের ভিতও সম্প্রসারিত করছিল। অনেকগুলি গ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠাক্রমে প্রধানত ধনী কৃষকদের এগুলিতে সংগঠিত করা হয়েছিল।

গুজরাটের বারদোলিতে গান্ধী ও বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক খাজনা বন্ধের দাবিতে পরিচালিত জমিমালিক কৃষকদের সত্যাগ্রহ কংগ্রেসের তথা ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীর সম্মান বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা দিয়েছিল। আন্দোলনটি অত্যধিক খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। পুলিশী অত্যাচার ও জমি-বাজেয়াপ্ত সত্ত্বেও অটল কৃষকদের সমর্থনে কংগ্রেস ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সারা দেশে 'বারদোলি দিবস' পালন করে এবং সর্বত্র জনসভা ও সংহতিমূলক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

সত্যাগ্রহের আংশিক সাফল্য এবং জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা হওয়ার ফলে গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'নেহরু সংবিধান' নামে খ্যাত ভারতের এই খসড়া সংবিধানটি ছিল একদিকে ডোমিনিয়ন স্টাটাস দান, বাজেটের উপর নির্বাচিত সংস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে বৈদেশিক নীতি ও প্রতিরক্ষা ব্রিটিশের হাতে থাকার শর্তাধীন। নেহরু সংবিধানে দেশীয় রাজ্যবর্গের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছিল, অথচ তা সারা দেশের মেহনতিদের অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পার্টির স্থানীয় শাখাগুলিতে নেহরু সংবিধান নিয়ে আলোচনার সময় কমিটির বিশদীকৃত কর্মসূচির চরম সীমাবদ্ধতার তীব্র সমালোচনা করা হয়। নেহরু কমিটির এই প্রস্তাবের বিরোধী কংগ্রেসের বামপন্থীরা তাদের প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে সারা দেশে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠনক্রমে 'পূর্ণ স্বরাজের' দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে নিখিল ভারত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সাইমন কমিশন অবশ্য নেহরু সংবিধানকে কোনই আমল দেয় নি। ফলত, সাংগঠনিক পন্থায় ব্রিটিশের কাছ থেকে কংগ্রেসের সুবিধালাভেচ্ছু মধ্যপন্থীদের আশাভঙ্গ ঘটে। এতে দেশের বিভিন্ন অংশে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের মাধ্যমে পার্টির ভেতরে ও বাইরে পূর্ণ স্বরাজের জন্য আন্দোলনরত কংগ্রেসের বামপন্থীদের অবস্থান আরও মজবুত হয়েছিল। কিন্তু গান্ধী সহ অধিকাংশ কংগ্রেস নেতৃবর্গ তখনো বামপন্থীদের উত্থাপিত দাবি গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে নেহরু কমিশনের রিপোর্ট অনুমোদন পায় এবং আরও একটি অসহযোগ আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত এক বছরের জন্য মুলতুবি রাখা হয়।

আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সংকট

তৎকালে সারা দেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রমিক শ্রেণীর অটল কার্যকলাপ নবপর্যায়ে গুপ্তসমিতিগুলির কার্যারম্ভে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বিশের দশকের শেষ ও ত্রিশের গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস সদস্যরাই প্রথম ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠা করলেও র‍্যাডিকাল যুবকদের কোন কোন অংশ (প্রধানত পেটি-বুর্জোয়া) এই দুই দলের কোনটির কার্যপদ্ধতিতেই সন্তুষ্ট ছিল না। স্মরণীয়, কমিউনিস্টরা তখনো ভারতীয় সমাজের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অধিকাংশ ভারতীয় যুবক সেইসময় অবিলম্বে

কিছু করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল এবং প্রথাসিদ্ধ গোপন সংগ্রামের পথই অনুসরণ করছিল।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে অনমনীয় বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় রিপাবলিকান সোশ্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে বেপরোয়া বিপ্লবী দলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়েছিল। অতঃপর পঞ্জাব, রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার, অর্থাৎ সারা উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতে এর শাখা গড়ে ওঠে। বাংলায়ও একটি বড় গুপ্তসমিতি সক্রিয় ছিল এবং অনেক সন্ত্রাসবাদীই ছিল কংগ্রেসের সদস্য।

এর শাখাগুলির মধ্যে পঞ্জাবের সংগঠনই ছিল সক্রিয়তম। এগুলি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ভগৎ সিং প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় 'নওজোয়ান ভারত সভা' থেকে সমর্থন পেত। লাহোরে সন্ত্রাসবাদীরা বোমা তৈরির গোপন কারখানা গড়ে তুলেছিল।

ব্যাপক সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের ফলে কৃষক আন্দোলনে ব্যাপ্তির উদ্দীপনা সঞ্চারিত হবে বলে এই বিপ্লবীরা নিশ্চিত ছিল। কৃষক বিপ্লব থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত চাপের ফলেই ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটবে—এটিই ছিল তাদের ধারণা। এই বিপ্লবীরা শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা এবং মেহনতিদের গণসংগঠনের কার্যকলাপের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পূর্বনির্ধারিত কার্যপরিকল্পনা অনুসারে রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইনসভাগৃহে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ এপ্রিল বোমা নিয়ে হামলা চালান এবং পরে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। ব্রিটিশ পুলিশ উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর ভেঙ্গে দেয় এবং গোপন বোমা-কারখানাটিও খুঁজে পায়। সিং ও দত্তের বিরুদ্ধে 'লাহোর ষড়যন্ত্র' মামলার অভিযোগ আনা হয়। ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোদ্ধারা জাতীয়তাবাদীদের উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি লাভ করেন। এই বন্দীরা জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করলে সারা দেশে প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

কিন্তু ভারতের আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের ফলে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে কোনই ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। সন্ত্রাসবাদীদের বিফল কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে সারা আন্দোলনের মধ্যে গভীর সংকট দেখা দিয়েছিল। বন্দী অবস্থায় ভগৎ সিং ও গুপ্তসমিতির অন্যান্য নেতারা তাঁদের ধারণাবলী পুনর্বিবেচনা করেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই শেষাবধি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুবর্তী হন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ফাঁসিতে আত্মদানের আগে যে-শেষ বইটি ভগৎ সিং পড়েছিলেন তা ছিল লেনিনের জীবনী। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের অন্তর্নিহিত নীতির ভ্রান্তি স্বীকারের মতো রাজনৈতিক সাহস তাঁর ছিল এবং তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের

উদ্দেশ্যে জেল থেকে লেখা চিঠিতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে তাদের ভাগ্যযোজনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকেই জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম স্বাধীন শক্তি হিসাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অবস্থান দ্রুত লোপ পেয়েছিল।

এইসঙ্গে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্যকলাপের মুখোমুখি সারা দেশে বৈপ্লবিক মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের এই বীরত্বপূর্ণ কার্যাদি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন। আন্দোলন হল অভ্যুত্থান

দ্রুত সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে দেশে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। গান্ধী এটিকে ঔপনিবেশিক সরকারের উপর চরম চাপসৃষ্টির সুবর্ণ মুহূর্ত বিবেচনা করেছিলেন। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন (ডিসেম্বর, ১৯২৯) একটি নতুন অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য আহ্বান জানায়। আগের মতো এবারও এর নেতা ছিলেন গান্ধী।

দেশের তৎকালীন মুখ্য পরিস্থিতি ও জাতীয় আন্দোলনভুক্ত বামপন্থীদের চাপের মুখে এই সম্মেলন জাতীয় সংগ্রামের শেষলক্ষ্যের নবতর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে। বলা বাহুল্য, এটি ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা।

জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। সংগঠকরা আশা করেছিল যে কংগ্রেস আয়োজিত এই বিক্ষোভে দেশপ্রেমিক শক্তির শরিকানার মাত্রা নতুন অসহযোগ আন্দোলনের জন্য দেশের প্রস্তুতির যথাযথ সূচক হয়ে উঠবে।

এই বছর মার্চ মাসে গান্ধী নিজের সম্পাদিত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্রে তাঁর বিখ্যাত এগারো দফা দাবি প্রকাশ করেন। এই দফাগুলিতে ব্রিটিশের কাছে ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থানুকূল্যে অর্থনৈতিক কর্মনীতি পরিবর্তন সহ হিংসাত্মক কার্যকলাপে অভিযুক্ত নয় এমন সকল রাজবন্দীর (এতে দেখা যায়, যেসব সন্ত্রাসবাদীরা তৎকালে জেলে অশেষ দুঃখ ভোগ করছিল গান্ধী তাদের পক্ষে ছিলেন না) মুক্তি দাবি করা হয়েছিল।

ভাইসরয় আরউইন কর্তৃক এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে গান্ধী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে একটি নতুন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনটি ছিল অনেকাংশে বিশের দশকের গোড়ার দিকের সেই আন্দোলনেরই মতো। এবার এতে লবণ তৈরির রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার বাতিলের একটি নতুন দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফলত,

আন্দোলনের ধারায় কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলেও তৎক্ষণাৎ দেশের জনগণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে এটির সংগঠকদের জনপ্রিয়তা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সেই বছর মার্চ মাসে গান্ধী আটাত্তর জন অনুগামী সহ গুজরাটের মধ্য দিয়ে প্রচারাভিযান চালিয়ে আরব সাগর তীরের এক ছোট শহর ডাণ্ডিতে পেঁছিনোর উদ্দেশ্যে আহ্মদাবাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সত্যাগ্রহ আশ্রম ত্যাগ করেন। সেখানে সাগরের জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরির মাধ্যমে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

দুই সপ্তাহ দীর্ঘ এই পথযাত্রার খুঁটিনাটি সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ করেছিল এবং এতে সত্যাগ্রহের ধারণা পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। অতঃপর সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এবং ঔপনিবেশিকরা এর বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রামণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য জাতীয় সংগঠন সহ কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। মে মাসে গান্ধীও গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ প্রায় ৬০ হাজার কর্মীকে সাজা দেয়া হয়।

এইসব নির্যাতন কিন্তু আন্দোলন দমনে নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। বসন্তে এই কার্যকলাপ তুঙ্গে পেঁছয় ও এটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপলাভ করে।

পেশোয়ার, চট্টগ্রাম ও শোলাপুর—এই তিনটি শহরে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। এই তিনটি কেন্দ্রে সশস্ত্র অভ্যুত্থান কোন আপতিক ঘটনা ছিল না। এটি ছিল বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে পূর্বোক্ত শহর এলাকাগুলিতে মুক্তি-আন্দোলন তুঙ্গে পেঁছিনোরই ফলশ্রুতি।

এপ্রিল মাসে পেশোয়ারে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে শহরে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ দেখা দেয় এবং অচিরেই ব্যারিকেড ধরনের লড়াই শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় পাঠান গ্রামগুলি থেকে কৃষকরা পেশোয়ারবাসীর সাহায্যে এগিয়ে আসে। শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশরা স্থানীয় দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

এইসময় গুলি চালাতে অস্বীকৃত গাড়োয়াল সৈন্যরা সংগ্রামীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করলে পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে ওঠে। স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অধিনায়করা ভারতীয় সৈন্যদের নিরস্ত্র করে ও দু'সপ্তাহের জন্য শহরের বাইরে পাঠিয়ে শহরবাসীদের পক্ষে এদের যোগদানের সম্ভাবনা এড়ায়।

পাঠান উপজাতির (মমান্দ ও আফ্রিদি) বিদ্রোহী দল পেশোয়ারের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এতে হস্তক্ষেপ করলে এবং তাদের হিংসা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানালে তারা নিজেদের পার্বত্য গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে।

৪ মে ব্রিটিশ সৈন্য পেশোয়ারে প্রবেশ করলেও এই মাসের মাঝামাঝি নাগাদই কেবল তাদের পক্ষে শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ লাভ সম্ভবপর হয়েছিল।

পেশোয়ার অভ্যুত্থান ছিল পাঠান কৃষকদের জন্য ব্যাপক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে শরিকানার ইঙ্গিতস্বরূপ। তখনই লালকুর্তা বাহিনীর বিভিন্ন দলগুলির ঐক্যবন্ধনের মাধ্যমে স্বাধীন 'পশ্‌তু-জির্গা' সংগঠিত হয়। পাঠান বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন গান্ধীর অনুসারী আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ সারা সীমান্ত প্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেখা দেয়। আফ্রিদি ও মমান্দ উপজাতিগুলির দাবিসমর্থক লালকুর্তা বাহিনী এই এলাকায় দক্ষতার সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলে ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যের প্রধান অংশকে এখানেই আনা হয়। পরের বছরও সংগ্রাম অব্যাহত থাকে এবং লালকুর্তার সংখ্যা এক বছরের মধ্যে ৮০ হাজার থেকে ৩ লক্ষে পৌঁছয়।

পেশোয়ারের ঘটনার প্রায় সমকালেই দেশের পূর্বসীমান্তের চট্টগ্রামে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। পেশোয়ার অভ্যুত্থানের সঙ্গে এর ব্যতিক্রম এই যে এটি আগেই পরিকল্পিত হয়েছিল।

সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে স্থানীয় গুপ্তসমিতি, 'চট্টগ্রাম রিপাবলিকান সৈন্যবাহিনী' এই অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিল।

লাহোর সন্ত্রাসবাদী দলের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সেন ও চক্রবর্তী দেশপ্রেমিক যুবকদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেছিলেন। অস্ত্রাগার, ব্যারাক ও রেলস্টেশনের উপর আক্রমণের মধ্য দিয়েই ১৮ এপ্রিল অভ্যুত্থান শুরু হয়। শহরটি দশদিন পর্যন্ত বিদ্রোহীদের দখলে ছিল। ব্রিটিশরা চট্টগ্রাম বন্দরে তাদের সৈন্যদের একত্রিত করার পর কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে ও সেখান থেকে সৈন্যসাহায্য চায়। তখন সামরিক শৃঙ্খলা সহ বিদ্রোহীরা শহর ত্যাগ করে ও শহরতলীর পাহাড়ে অবস্থান নেয়। অভ্যুত্থান দমন অবধি তারা সেখান থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়েছিল।

এইসব অভ্যুত্থানের তৃতীয়টি ঘটেছিল শোলাপুরে। সেখানে ৫ মে সশস্ত্র পুলিশ হামলার ফলে লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং অচিরেই তা ব্যাপক অভ্যুত্থানের রূপলাভ করে। বিদ্রোহীরা ঔপনিবেশিক প্রশাসন কার্যালয়ে আগুন লাগায় এবং ব্রিটিশ কর্মচারীরা স্থানীয় রেলস্টেশনে আশ্রয় নিলে সেটি অবরোধ করে। কয়েক দিন পর্যন্ত পথযুদ্ধ চলে। অচিরেই শহরটি বিপ্লবী পরিষদের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৬ মে অভ্যুত্থানের নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার পরই শুধু এটি অবদমিত হয়েছিল।

পেশোয়ার ও চট্টগ্রামের সঙ্গে এখানকার অভ্যুত্থানের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। পূর্বোক্ত ক্ষেত্র দুটিতে যেখানে অভ্যুত্থানের মূল শরিক ছিল পেটি-বুর্জোয়া যুবকরা সেখানে শোলাপুরের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণী।

এইসব অভ্যুত্থান অবদমিত হলেও (স্থানীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্যের ফল হিসাবে এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের জন্য) জনগণের বৈপ্লবিক উদ্দীপনার উচ্ছ্রয় ঘটিয়ে এগুলি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

১৯৩০-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও করাচী প্রভৃতি বড় বড় শহরে বহু রাজনৈতিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল।

কৃষক আন্দোলন। দেশীয় রাজ্যগুলিতে অভ্যুত্থান

অতঃপর বৈপ্লবিক আন্দোলন গ্রাম-গ্রামান্তর ও দেশীয় রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বারদোলি সত্যাগ্রহ ছিল গ্রামাঞ্চলে জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী কার্যকলাপ পরিচালনার আরম্ভবিন্দু। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস সংগঠনগুলি অনেক এলাকায়, বিশেষত যুক্তপ্রদেশে কৃষক সমিতি গঠন শুরু করেছিল। কৃষকদের আইন অমান্য আন্দোলনে আকর্ষণ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। সংগঠকরা কৃষকদের সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কাঠামোর মধ্যে সীমিত রাখতে এবং শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে, গ্রামের সামন্ত ভূস্বামীদের বিরোধিতা থেকে তাদের বিরত রাখতে চেষ্টা করত।

জাতীয় কংগ্রেস অযোধ্যায় বিরাট সাফল্য লাভ করে। সেখানে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সরকারকে দেয় জমিদারদের ভূমিরাজস্ব ও ভূমিকর কমানোর আন্দোলন সাফল্য লাভ করে।

কিন্তু যুক্তপ্রদেশে সক্রিয় কংগ্রেস কর্মীদের মতো সেখানে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীরাও কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিল।

১৯৩১-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, বাংলা, কর্ণাটক ও অন্ধ্রে কিষান সভার নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন মূলত প্রচারাভিযানের রূপলাভ করে। এতে স্থানীয় জনসাধারণকে খাজনা না দেয়ার আহ্বান জানান হত। যুক্তপ্রদেশেই সবচেয়ে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেখানে, বিশেষত এলাহাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলগুলিতে অসহযোগ আন্দোলন কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপলাভ করেছিল।

১৯২৯-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কৃষক আন্দোলন অধিকতর সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ প্রদেশেই তখন স্থানীয় কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং এগুলিতে প্রধানত কৃষকদের বিত্তশালী ও মধ্যস্তরই যোগ দিয়েছিল। অনেকগুলি জেলায়, বিশেষত যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের এলাকাগুলিতে কৃষক সমিতিগুলি প্রধানত

কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদেরই প্রভাবাধীন ছিল। এভাবে তারা কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বলাভে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন বিকাশের ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯৩১-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে এইসব রাজ্যগুলির কোন কোনটিতে সংগঠিত মুক্তি-আন্দোলন শেষাবধি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপলাভ করেছিল।

কাশ্মীরের ঘটনাই বিশেষ মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। সেই রাজ্যের প্রজাদের অধিকাংশ মুসলমান হলেও সেখানকার ক্ষমতা কেন্দ্রিত ছিল দেশের রাজা ও তাঁর অনুচরদের হাতে এবং তারা ছিল জাতিতে রাজপুত, জাতীয়তার দিক থেকে ডোগরা এবং ধর্মে হিন্দু। কাশ্মীরে সামন্ততান্ত্রিক নির্যাতনকে সেখানে অনুসৃত জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্যের দ্বারা খুবই তিক্ত করে তোলা হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানকার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কাশ্মীরের রাজার চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং ডোগরা সামন্ত ভূস্বামীদের স্বেচ্ছাচারিতায় উৎসাহ যোগাতেন।

ফলত, কৃষক ও কারিগরদের ব্যাপক স্তর সামন্ত শাসকচক্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং কাশ্মীরী বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরে কৃষকদের সামন্তবিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হয়। কৃষকরা সৈন্যদল গড়ে তোলে এবং রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর অবরোধ করে। এইসঙ্গে খোদ শহরেও কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সরকারবিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়।

ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থার মালিকদের নিয়ে গঠিত জাতীয় বুর্জোয়ারা স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে 'রিডার্স পার্টি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। সেই বছরই আগস্ট মাসে এই পার্টি জাতিগত ও ধর্মীয় কারণে অনুসৃত যাবতীয় বৈষম্যের বিলোপ এবং কতকগুলি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকার প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিল।

ব্রিটিশরা কাশ্মীরে সৈন্যবাহিনী পাঠায় এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধাতে সক্ষম হয়। কাশ্মীরে এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংঘাতের ফলে সারা ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

কিন্তু ব্রিটিশরা সম্পূর্ণভাবে কৃষক আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়। তারা বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করে। কমিশন রাজ্যপ্রশাসকের কাছে রিডার্স পার্টির যাবতীয় দাবিমঞ্জুরের সুপারিশ জানিয়েছিল।

কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে কাশ্মীরের মহারাজা অস্বীকৃত হওয়ায় ১৯৩২ খ্রীটাব্দের গোড়ার দিকে পরিস্থিতি পুনরায় মারাত্মক হয়ে উঠেছিল।

অতঃপর রিডার্স পার্টির ভিত্তিতে এবং এটির তুলনায় অধিকতর গণতান্ত্রিক একটি সংস্থা, 'জম্মু ও কাশ্মীর রাজনৈতিক সম্মেলন' প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বতন দাবিগুলির সঙ্গে মহারাজার সার্বভৌম ক্ষমতা হ্রাস, ভূমিরাজস্ব কমান ও বকেয়া কর বাতিল ইত্যাদি অনেকগুলি নতুন দাবি সহ সম্মেলন একটি কর্মসূচি প্রকাশ করে।

স্থানীয় জনসাধারণকে কর-বন্ধের আহ্বান জানিয়ে সম্মেলন তার প্রচারাভিযান শুরু করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্যে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ আন্দোলনটি দমন করা হয়। কিন্তু রাজা ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে আইনসভা আহ্বান করেন এবং স্থানীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের কিছু কিছু সুবিধাদানে বাধ্য হন।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। সেখানে কাশ্মীরের মতোই সামন্তবিরোধী সংগ্রাম ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক রূপলাভ করে। রাজ্যের রাজা, জমিমালিক ও রাজ্যের দক্ষিণাংশের কৃষকরা ছিল হিন্দু, আর উত্তরের কৃষকরা ছিল মুসলমান। শেষোক্তরা কেবল সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরই নয়, ধর্মীয় কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ বিলোপেরও দাবি জানিয়েছিল। মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ছোট ছোট মুসলিম সামন্ত ভূস্বামীরা এতে সমর্থন দিয়েছিল এবং তারা আন্দোলনটিতে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য আরোপে সফল হয়েছিল।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ কৃষকরা ৩০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে তুলে। উত্তরের কয়েকটি শহর দখলের পর তারা আলোয়ার শহরের দিকে অগ্রসর হয়। ক্রমে ক্রমে কৃষক আন্দোলনটিতে নিজ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহীরা মুসলিম সামন্ত ভূস্বামীদের উপরও হামলা চালাতে শুরু করেছিল। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ 'আলোয়ারের মুসলমানদের রক্ষার' জন্য সেখানে ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানোর দাবি জানায়। হিন্দুমহাসভাও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিল, তবে তা 'সেই রাজ্যের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য'। এরই উদ্যোগে সারা দেশে উদ্‌যাপিত 'আলোয়ার দিবস' এই দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার তিক্ততা আরও বৃদ্ধি করেছিল।

বিদ্রোহীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তাদের পরাজয় ঘটেছিল।

পশ্‌তু উপজাতি অধ্যুষিত পুলরা এবং দির রাজ্যেও ১৯৩২-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে সামন্তবিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে সংঘটিত এসব অভ্যুত্থান ছিল সারা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন বিস্তারেরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

ব্রিটিশ নীতি এবং কংগ্রেসের অনুসৃত অবস্থান বদল

সরাসরি জাতীয় আন্দোলন দমন ছাড়াও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা তাদের বিরোধীদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য রাজনৈতিক কৌশলেরও আশ্রয় নিয়েছিল।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ভারতের ভাবী সংবিধানের একটি কাঠামোর সুপারিশ সহ সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। এতে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উত্থাপিত মৌলিক দাবিগুলির কোনই স্থান ছিল না। পক্ষান্তরে ভাইসরয়ের ক্ষমতা পুরোপুরি অটুট রাখা হয়েছিল। নির্বাচনী এলাকার ভোটদাতাদের আরও বিভক্ত করে অস্পৃশ্যদেরও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের প্রভাব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্পষ্টতই ঔপনিবেশিকরা পুনরায় ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে জাতীয় শক্তিগুলিকে বিভক্তকরণ এবং রক্ষণশীল ও সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা মজবুত করার উপরই তাদের আশা ন্যস্ত করেছিল।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বিত্তশালীদের সামান্য কিছু সুবিধা দেয়া হয়েছিল: ভোটদাতাদের পরিসর বৃদ্ধি সহ সরকার মুসলিম লীগের দাবি মোতাবেক সিন্ধুকে আলাদা প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করেছিল। একটি কৃষক-অভ্যুত্থান চলাকালে তখন ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করা হয়। ব্রহ্মদেশের জাতীয় আন্দোলনকে ভারতের এই আন্দোলন থেকে পৃথক করাই ছিল ঔপনিবেশিকদের লক্ষ্য।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন বিবেচনার জন্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব পোষণের প্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেছিল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বিভিন্ন দেশীয় রাজা, মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা, লিবারেল ফেডারেশন ও ভীম রাও আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত 'তপশিলী ফেডারেশন'।

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বনের ফলে বৈঠকে কার্যত অচলাবস্থা দেখা দেয়।

এইসঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোসের ভঙ্গি হিসাবে ব্রিটিশ প্রশাসন শুল্কনীতির কিছু কিছু পরিবর্তন প্রবর্তন করে। ইতিমধ্যে জেলে বন্দী গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা হয় এবং ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৫ মার্চ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও ভাইসরয়ের প্রশাসকদের মধ্যে একটি চুক্তিতে (গান্ধী-আরউইন চুক্তি) পৌঁছন সম্ভবপর হয়। তদনুযায়ী ব্রিটিশরা দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে এবং রাজবন্দীদের মুক্তি

(যারা হিংসাত্মক কার্যাদির জন্য অভিযুক্ত নয়) দেয়। কংগ্রেস প্রকাশ্যে অসহযোগ আন্দোলন মুলতুবি রাখে এবং গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত হন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি কেবল কংগ্রেসের বামপন্থীদের মধ্যেই নয়, এর বাইরেও তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়। কয়েকটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (যেমন বাংলা ও পঞ্জাব) এতে সমর্থন দিতে অস্বীকার করে।

কিন্তু করাচীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে (মার্চ, ১৯৩১) গান্ধীর পদক্ষেপ অনুমোদন লাভ করে। ঔপনিবেশিক সরকার ও জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি অস্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তুতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ারা করাচীতে নেহরু সংবিধানের চেয়ে আরও বেশি দাবি-দাওয়া সংবলিত একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এতে পূর্ণ স্বরাজকে ('কংগ্রেসীয় স্বাধীনতা') পুনরায় তাদের সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এই শব্দসমষ্টিতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে ডোমিনিয়ন স্টাটাস অবধি বহুবিধ অর্থ উদ্ভাবনের অবকাশ ছিল। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনাভিত্তিক একটি প্রস্তাব মাধ্যমে কংগ্রেসকে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়ার দাবি জানান হয়।

এই অধিবেশনে অনুমোদিত ভারতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকার প্রবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত 'মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি' নামক দলিলে ছিল: ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার, দেশে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন ইত্যাদি। পরিকল্পনায় সর্বনিম্ন মজুরি, কর সীমিতকরণ এবং কর হ্রাসেরও শর্ত ছিল।

কংগ্রেসের নতুন কর্মসূচিভিত্তিক আনুষ্ঠানিক দলিল তৈরিতে এই প্রথম মেহনতিদের কয়েকটি প্রধান দাবির ব্যাপারটি বিবেচিত হয়েছিল। দলিলের অন্যত্রও কংগ্রেসের বামপন্থীদের প্রভাব প্রকটিত ছিল, যথা: দেশের প্রধান শিল্পশাখাগুলি জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেয়েছিল। বহু ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীর স্বার্থানুকূল্যে সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতি প্রবর্তনের প্রস্তাবও উপস্থাপিত হয়েছিল।

করাচী সম্মেলনে গৃহীত কংগ্রেস কর্মসূচির কিছু কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও এতে পার্টির কার্যকলাপের আমূল পরিবর্তন ও জনভিত্তি সম্প্রসারণে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রপদক্ষেপ চিহ্নিত হয়েছিল।

কংগ্রেস অধিবেশনের প্রায় সমকালে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন কংগ্রেসের কর্মসূচির বিকল্প হিসাবে একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি উপস্থাপিত করেছিল।

এই সম্মেলনে গৃহীত দাবিসূচক প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখ্য: আট ঘণ্টার কার্যদিন, সবেতন ছুটি, শ্রমিকদের ধর্মঘট পালনের ও শ্রেণীভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রতিফলক হিসাবে জমিদারি উচ্ছেদ, আয়কর প্রবর্তন, বেগারপ্রথা রদ, খাজনাহ্রাস এবং আপৎকালে কর, বকেয়া কর ও খাজনা আদায় বন্ধ রাখা, বর্ণবৈষম্যের নীতি উচ্ছেদ। এতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ এবং সুদূরপ্রসারী সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনই মুক্তিসংগ্রামের শেষলক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

এই পর্যায়ে 'নওজোয়ান ভারত সভা' নামক যুব সংগঠনেরও কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এর সদস্যরাও শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রামের পরিকল্পনাভিত্তিক একটি কর্মসূচি গ্রহণ সহ জমিদারি উচ্ছেদ প্রভৃতি দাবি জানিয়েছিল। এই কংগ্রেস কমিনটার্নেও একটি অভিনন্দন-বাণী পাঠিয়েছিল।

এই উভয় সভা থেকেই দেশে বামপন্থী, বৈপ্লবিক শক্তিগুলির বর্ধমান প্রভাবের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই দুটি সভাই 'দিল্লীচুক্তি' এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

কিন্তু বামপন্থী সংকীর্ণতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দরুন কমিউনিস্টরা এই পর্যায়ে গণসংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইতিমধ্যে অর্জিত সাফল্যগুলির বিকাশসাধনে ব্যর্থ হয়েছিল। এজন্যই প্রধানত ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের পর শ্রমিক ও কৃষক পার্টির কার্যকলাপ দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু শ্রেণীশক্তিগুলির আরও মেরুবর্তিতা এবং স্বকীয় রাজনীতির ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন বিকাশের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জনসাধারণের মধ্যে পার্টির সমর্থন মজবুতের লক্ষ্যে তাদের উদ্যোগ কেন্দ্রিত করার সিদ্ধান্তে পৌঁছন।

তৃতীয় অসহযোগ আন্দোলন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে লণ্ডন যাত্রা করেন। সেই বছরও পূর্ববর্তী বৈঠকের শরিকরাই এতে উপস্থিত ছিলেন।

এই আলাপ-আলোচনায়ও আগের মতোই ব্রিটিশরা অবাধে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় অসন্তোষ ছড়ানোর অভিন্ন কৌশল অনুসরণ করেছিল। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল মতাবলম্বী গান্ধী হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের মূল শর্ত হিসাবে স্বাধীনতা দানের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ক্ষেত্রে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটেছিল।

কংগ্রেসের মতে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিতর্কমূলক প্রশ্নটি ভারতীয়দের নিজস্ব মীমাংসেয় বিষয় এবং এর সমাধান কেবল ভারতের স্বায়ত্তশাসন (এটি ডোমিনিয়ন স্টাটাস কিংবা পূর্ণ স্বাধীনতা তা অনুল্লিখিত) লাভের ভিত্তিতেই সম্ভবপর। কিন্তু মুসলিম লীগ সমর্থিত ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এরূপ: কোন চুক্তিতে পেঁছিতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের এই ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে এখন বিধানিক প্রণালীতে সমস্যাটি সমাধানের জন্য সরকারকে উপদেশ দেয়াই বিধেয়।

বৈঠকের ব্যর্থতা নিশ্চিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার গান্ধী ও কংগ্রেসকে দায়ী করার ফন্দি এ'টেছিল। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৈঠক শেষে গান্ধী দেশে ফিরলে দেখা গেল যে কংগ্রেসের ভেতর বা সারা দেশে তাঁর প্রভাব মোটেই হ্রাস পায় নি। ইতিমধ্যে ভারতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির পক্ষে অপরিহার্যতর উপাদানগুলির উদ্ভব ঘটেছিল: অনেকগুলি প্রদেশে তখনো কৃষকরা সক্রিয় ছিল এবং কাশ্মীর ও আলোয়ারে অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশরা দিল্লীচুক্তি অমান্য করে কংগ্রেস অনুমোদিত গণসংগঠনগুলির কার্যকলাপ বন্ধের জন্য দমনমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিল।

এমতাবস্থায় নির্যাতন বন্ধের জন্য ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীর আলোচনা ব্যর্থ হলে তিনি ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একটি নতুন আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করেন। কিন্তু এবার সংগ্রামের ধরন ছিল ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহভিত্তিক। সেইসময় দিল্লীর অধিবেশনে উপস্থিত গান্ধী সহ সকল সদস্যকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয় এবং সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।

নতুন দমন চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন ভারতবিধি প্রণয়নের প্রাথমিক কাজ দ্রুত নিষ্পাদনে উদ্যোগী হয়। জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে ফারাক বৃদ্ধিতে ব্রিটিশরা উৎসাহ যুগিয়েছিল। তথাকথিত ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত গোলটেবিল বৈঠকে গঠিত তিনটি সাব-কমিটির সদস্যরা তখন ভারতে পেঁছিন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ভারতের আইনসভাগুলিতে সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্বের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়।

মুসলিম লীগের সঙ্গে চুক্তির কোন উপায় না দেখে গান্ধী বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের সংঘাত সৃষ্টির ব্রিটিশ উদ্যোগ ব্যর্থকরণে সচেষ্ট হন। কংগ্রেস ও গান্ধীর নিজস্ব উদ্যমী প্রচেষ্টার ফলে তপশিলী ফেডারেশন ও হিন্দুমহাসভার নেতাদের মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টি সম্ভবপর হয় এবং ফলত, আইনসভাগুলিতে অস্পৃশ্যরা নির্দিষ্টসংখ্যক সংরক্ষিত আসনলাভের সুযোগ পায়। এভাবে ব্রিটিশের

অনুমোদন মোতাবেক অস্পৃশ্যদের জন্য বিশেষ নির্বাচনী এলাকা গঠনের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়।

অক্টোবর মাসে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগঠনগুলির মধ্যে শুরু হওয়া সমঝোতার আলোচনাটি শেষাবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্যদের সংগঠনগুলির মধ্যেকার চুক্তিগুলি মজবুত করার জন্য ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ও ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে গান্ধী সারা দেশে অস্পৃশ্যতাবিরোধী প্রচারাভিযান শুরু করেন। তিনি এদের 'হরিজন' (ঈশ্বরপুত্র) আখ্যা দেন। এই নামে প্রকাশিত গান্ধীর একটি পত্রিকা অচিরেই সারা দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রথম বারের মতোই অনুপস্থিত ছিল। এতে ভারতের সংবিধানকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়।

ব্রিটিশ প্রশাসন যখন গণ-আন্দোলন বন্ধের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিল, দেশীয় রাজ্যগুলিতে সংঘটিত অভ্যুত্থানসমূহ দমন করা হচ্ছিল এবং ক্রমশ সত্যাগ্রহ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ছিল তখন ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন মুলতুবি ঘোষণা করেন।

এভাবে দ্বিতীয় পশ্চাদপসরণ ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবের নিয়তি হয়ে ওঠে।

জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থীদের দৃঢ়তর অবস্থানলাভ। নেতৃত্বলাভের সংগ্রামে তীব্রতা সঞ্চার

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

১৯২৯-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের অর্থনৈতিক সংকটের পর একটি দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দা (তথাকথিত মহা-মন্দা) অব্যাহত ছিল। অতঃপর ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে একটি নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই ঘটনাবলীর অনুক্রমে ছেদ পড়েছিল।

এই সময় শহর ও গ্রামের মেহনতিদের অবস্থা খুবই মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। সংকটকালে কৃষক ও কারিগরদের ব্যাপক দারিদ্র্য সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনীর যথেষ্ট আয়তন বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল এবং তা মূলত গ্রামীণ জনাধিক্যের ছদ্মবেশে প্রকটিত হয়েছিল। বেকার বাহিনীর অটল সংখ্যাটি তখন বহু লক্ষে পৌঁছেছিল।

কৃষি-এলাকায় বর্ধমান জনাধিক্যের ফলে ভাড়া করা প্রতিখণ্ড জমির জন্য

ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় জমিদার, তালুকদার ও ধনী কৃষকরা খাজনা বাড়ানোর অবাধ সুযোগ পেয়েছিল।

অর্থনৈতিক সংকটপর্বে ও সংকটোত্তর কালে বিপুল সংখ্যক কৃষক চরম দারিদ্র্যগ্রস্ত হওয়ায় সাধারণ কৃষকদের মধ্যে স্তরায়ণ ও শ্রেণীবিভেদ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মূলীভূত হয়েছিল। একদিকে এমতাবস্থায় সামান্য ভূমির মালিক বা ভূমিহীন হয়ে পড়া কৃষক, ক্ষুদ্র চাষী যখন দরিদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি করছিল তেমনি অন্যদিকে রায়তওয়ারি এলাকায় জমিমালিক কৃষক ও জমিদারি এলাকায় সুবিধাভোগী রায়ত-চাষীদের মতো ধনী কৃষকরা তখন নিজেদের অধিকারাদি সম্পর্কে অধিকতর সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্কের বিস্তার ও অভ্যন্তরীণ বাজার কৃষি-উৎপাদনের পরিমণ্ডলে নতুন পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ককে দ্রুত মজবুত করে তুলছিল। এইসঙ্গে ঔপনিবেশিকদের সমর্থিত কৃষিক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক জেরের অব্যাহত প্রাধান্যের ফলে (বড় বড় জমিদারি এবং ব্যবসায়িক ও মহাজনী পুঁজির অস্তিত্ব) কৃষি বদ্ধাবস্থা ও অবক্ষয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, এর প্রতিফলনস্বরূপ দেশের খাদ্য-স্থিতির অবনতি ও ভারতের রপ্তানি হ্রাসের ঘটনাগুলি উল্লেখ্য। ভারতের গ্রামীণ জীবনে পুঁজিতান্ত্রিক উপাত্তগুলির বিন্যাসের ফলে দেশের সামাজিক বিকাশের অন্তর্লীন অসঙ্গতিগুলির উদ্ভব ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। গ্রামগুলিতে প্রধান প্রধান শ্রেণী এবং শ্রেণী-স্তরগুলির মধ্যেকার অসঙ্গতি গভীরতা লাভ করছিল এবং স্পষ্টতই সামাজিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

শহরের সামান্য পণ্যোৎপাদক, মানুফ্যাকচারিং সংস্থা ও ক্ষুদ্র কারখানাগুলির জন্য এই বিধ্বংসী সংকট একইসঙ্গে পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন প্রক্রিয়াকেও ত্বরিত করেছিল। ত্রিশের দশকে এই প্রথম ভারতীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলির পত্তন শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে সিমেণ্ট শিল্প (১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে 'অ্যাসোসিয়েটে সিণ্ডিকেট' ও ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে শক্তিশালী 'ডালমিয়া-জৈন' গ্রুপ গঠিত হয়) এবং চিনি শিল্পের (১০৮টি কারখানা নিয়ে গঠিত 'ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট' নামক কার্টেল) দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ্য।

ভারতীয় শিল্প বিশেষত বৃহৎ ফ্যাক্টরি ও কারখানাগুলি ক্রমেই অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রধান ভূমিকাসীন হয়ে উঠছিল। এতে ১৯২৭ ও ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সুতিবস্ত্রের উৎপাদন যথাক্রমে ৪১ থেকে ৬২ শতাংশে এবং ১৯২৭ ও ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ধাতু-উৎপাদনে ভারতীয় সংস্থার (টাটা) অংশভাগ যথাক্রমে ৩০ থেকে ৭২ শতাংশে পেঁছেছিল।

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য পুঁজির সম্প্রসারণ শুরু হওয়ার পর ঋণের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীভবন এবং ঘনীভবনের স্বকীয় অস্তিত্ব অনুভূত হতে থাকে।

১৯১৮ ও ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতে কর্মরত ব্যাঙ্কের শাখাসংখ্যা চারগুণ এবং ১৯১৮ ও ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তপশিলী ব্যাঙ্কগুলির শোধকৃত পুঁজি ও জমা যথাক্রমে এক-তৃতীয়াংশ এবং ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

এইসঙ্গে ব্যাঙ্কিং ও শিল্পে ব্যবসায়িক ও মহাজনী পুঁজির স্থানান্তর ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

শক্তিশালী ভারতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর টাটা, ডালমিয়া, জৈন, ওয়ালচাঁদ, বিড়লা, সিংহানিয়া প্রভৃতি কোটিপতি পরিবারগুলি ইতিমধ্যে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে মুখ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের নিম্নপর্যায়ের বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত এবং প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক ও আদি-পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা ধরনের প্রাধান্য বিজড়িত এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় একচেটিয়াগুলি বাণিজ্যিক ও মহাজনী পুঁজির উপর একটি উপরি-কাঠামো হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। এজন্যই বাণিজ্য ও মহাজনী থেকে বড় বড় বুর্জোয়ারা তাদের আয়ের একটি প্রধান অংশ সংগ্রহ করত।

শুধু সামন্ত শ্রেণীই নয়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের পুরো সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ঊর্ধ্বতন স্তরের কোন কোন সংযোগ থাকলেও ভারতীয় ব্যাপকভিত্তিক ব্যবসা-উদ্যোগে চিহ্নিতব্য একচেটিয়া প্রবণতাগুলি সন্দেহাতীতভাবে জাতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঝোঁকগুলির ঘনীভবন প্রকটিত করেছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট ছিল। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের' প্রতিষ্ঠা। কেন্দ্রীয় সরকারী ব্যাঙ্কের ভূমিকাসীন এই ব্যাঙ্ক নোট-ইস্যুর ক্ষমতাভোগী ছিল। এটি রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং পুঁজি এবং বড় বড় ঋণদান সংস্থাগুলিও নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে 'ম্যানেজিং এজেন্সি আইন' পাশের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ একচেটিয়াদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়। এইসব ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ও ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ত্রিশের দশকে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ জাতীয় ও শ্রেণীগত অসঙ্গতিগুলিকে (ভারতীয় সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন ভিত্তিতে ও বিভিন্ন মাত্রায়) গভীরতর করে তুলেছিল।

কিন্তু যুদ্ধপূর্ব পর্যায়ে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিধারা ১৯৩৬-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে যে নতুন উচ্ছ্রয় ঘটিয়েছিল তা এককভাবে অর্থনৈতিক উপাত্তের নিরিখে ব্যাখ্যেয় নয়।

বর্ধমান বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বছরগুলিতে (১৯২৯-১৯৩৩) দেশের জীবনে

অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। এগুলির মধ্যে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি হল: প্রথমত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক ও কৃষক পার্টিগুলি এবং লাল ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কল্যাণে স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় আর দ্বিতীয়ত, কৃষকদের শ্রেণীসংগঠন তৈরির এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীন উপাত্ত হিসাবে তার ভূমিকাসীন হওয়ার পূর্বশর্তের উন্মেষ।

১৯৩৪-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১৯৩৪-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের চারিত্র্য হিসাবে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি ঘটেছিল।

প্রক্রিয়াটির দুটি পর্যায় ছিল। প্রথমত, বিভিন্ন ধর্মঘট ও উদ্যোগের সময় জাতীয় সংস্কারবাদী ও দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের বিরোধিতা এড়ানোর জন্য অধস্তন পর্যায় থেকে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা (১৯৩৪-১৯৩৫) শুরু হয়েছিল।

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের বস্ত্রকল শ্রমিকদের তিনমাস দীর্ঘ ধর্মঘটটি শ্রমিক আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একটি পুরো শিল্পশাখা ধর্মঘটের আওতাভুক্ত হওয়ার এটিই প্রথম ঘটনা। এই ধর্মঘটের সময় তিনটি পৃথক ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন শাখাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শরিক করা সম্ভব হয়েছিল।

এই ধর্মঘটে কমিউনিস্ট এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি চূড়ান্ত ভূমিকাসীন থাকার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এতই ভীত হয়ে পড়ে যে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার প্রভাবাধীন কয়েকটি ইউনিয়নকে বেআইনী ঘোষণা করে। এর ফলে বামপন্থী অগ্রদূতদের আরব্ধ কার্যকলাপে মারাত্মক প্রতিবন্ধ দেখা দেয়।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ডককর্মী ও রেলশ্রমিকদের এক ব্যাপক ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল।

লাল ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দের আহ্বানে এই সংগঠনটি ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে পুনরায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান করে। এই নীতিগুলিতে ছিল: শ্রেণী-সংগ্রামের নীতিসমূহ স্বীকার, প্রতিটি শিল্পে একটিমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, আন্তর্জাতিক ফেডারেশনগুলির আওতামুক্ত থাকা, পরস্পরের প্রতি আক্রমণ এড়িয়ে প্রচারকার্য চালানোর অধিকার, সংখ্যাগুরুর কাছে সংখ্যালঘুর আনুগত্য (এই শেষ নীতিটি

ছিল কমিউনিস্টদের দিক থেকে প্রতিপক্ষকে দেয়া বিশেষ সুবিধাস্বরূপ। মিলিত হওয়ার আগে 'লাল ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র' এবং সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৮০ হাজার)।

কোন কোন দক্ষিণপন্থী ইউনিয়ন নেতাদের অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও শিল্প ও পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন ইউনিয়নকে একটিমাত্র সংগঠনভুক্ত করার চেষ্টা ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে। বর্ধমান সংখ্যক ধর্মঘটে আংশিক বা পূর্ণ সাফল্যলাভ (১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে সঙ্ঘটিত মোট ধর্মঘটের ৪৭ শতাংশ) ছিল এই নতুন ঐক্যের প্রথম ফলশ্রুতি। অতঃপর সঙ্ঘটিত ধর্মঘটগুলি দীর্ঘস্থায়ী ও অটলতর হয়েছিল।

সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার সময় (১৯৩৬-১৯৩৯) শ্রমিক শ্রেণী ক্রমে ক্রমে ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকের আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের বদলে উচ্চতর মজুরি সহ ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য শিল্পোদ্যোগী ও কর্তৃপক্ষের কাজে জোর দাবি জানাতে শুরু করেছিল। এই সময় ধর্মঘটের ও ধর্মঘটীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবটি নিম্নোক্ত সারণীতেই সহজলক্ষ্য:

বৎসর	ধর্মঘটের সংখ্যা	ধর্মঘটীদের সংখ্যা
১৯৩৪-১৯৩৫	১৫০	২ লক্ষ
১৯৩৬-১৯৩৯	৪০০	৫ লক্ষ

দুটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মিলন এবং ঐক্যবদ্ধ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কর্তৃক কমিউনিস্টদের প্রস্তাবিত কতিপয় নীতি সমর্থনের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে মে-দিবস পালনের মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটেছিল। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে উদ্‌যাপিত বিশেষ শ্রমিক সপ্তাহে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগান দেয়া হয়। একই বছর সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তার ১৫তম সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক শরিকানার সম্ভাবনা ও মুক্তিসংগ্রামে অনুসৃত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সহ রাজনৈতিক ধর্মঘটকে এই সংগ্রামের অপরিহার্য উপাদান করে তোলার কথা ঘোষণা করেছিল।

এই দুটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মিলন আসলে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯৩৬-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়েছিল। মেহনতি সাধারণের উপর সারা ভারত

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এজন্য ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী নেতাদের অবস্থান যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের সাধারণ ধর্মঘটটি শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের বিকাশে এক চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল: কানপুরের বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, বেঙ্গল-নাগপুর রেলশ্রমিকদের ধর্মঘট এবং বেঙ্গল চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট। এইসব ধর্মঘট প্রলেতারিয়েতের অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় স্তরগুলিকে সক্রিয় করে তুলেছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের প্রভাব অটুট রাখার জন্য ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং শেষাবধি ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত এক যৌথ সম্মেলনে এটি বাস্তবায়িত হয়। এই দুটি সংগঠনের মিলনের মাধ্যমে ফেডারেশন কিছুটা আদর্শগত সুবিধা পেয়েছিল যা শ্রমিক ও শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে শ্রেণী-সমঝোতায় আনুকূল্য যুগিয়েছিল। নব সংযুক্ত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃপদগুলি কংগ্রেস সদস্যদের দখলে ছিল। ১৯৩৮-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপে কিছুটা মন্দা দেখা দিলেও ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির মিলন শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইসময় ভারতের অনগ্রসরতম এলাকা, দেশীয় রাজ্যগুলিতেও ধর্মঘট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে রেলশ্রমিক, নাবিক ও ডকশ্রমিক এবং বস্ত্রকল শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলির মিলনও মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নবসংযুক্ত কোন কোন ইউনিয়নের (যথা রেলওয়ে ও বস্ত্রকল শ্রমিকদের ইউনিয়ন) উদ্যোগে ১৯৩৮-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে কোন নির্দিষ্ট শিল্পশাখার সকল শ্রমিকদের নিয়ে যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা স্থানীয় পর্যায়ে পৃথক সংস্থার ইউনিয়নগুলির উপর অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমে যে-শ্রমিক শ্রেণী তার নিজস্ব পার্টি ও শ্রেণীভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে তুলেছিল অতঃপর সে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বলাভের জন্য জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। ত্রিশের দশকের শেষার্ধে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চক্রের মধ্যেকার ঘটনাবলীর ধারা এই উপাত্তটি দ্বারাই প্রধানত নির্ধারিত হয়েছিল।

সংগ্রামটি দুটি পরিমণ্ডলে কেন্দ্রিত ছিল: কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বলাভের লড়াই এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি ঐক্যফ্রণ্ট গঠনের সংগ্রাম।

কৃষক আন্দোলন।
সারা ভারত কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা

১৯৩৪-১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কিষান সভার সংগঠনগুলি কৃষকের মূল দাবি — খাজনা হ্রাস, কর হ্রাস ইত্যাদি সুবিধা আদায়ের জন্য তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিল। এই আন্দোলনের সদস্যদের অনুসৃত কার্যকলাপের মূল ধরন ছিল: গ্রাম, তহসিল ও জেলা পর্যায়ে সভা, শোভাযাত্রা ও সম্মেলন অনুষ্ঠান। কিষান সভা মূলত বিহার, পঞ্জাব ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরাঞ্চলে (অন্ধ্র এলাকা) কেবল জেলায়ই নয়, প্রাদেশিক পর্যায়েও বিশেষ সক্রিয় ছিল। কিষান সভার অধিকাংশই ছিল কমিউনিস্ট ও কৃষিজীবী গণতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এই পর্যায়েই এন. জি. রঙ্গ, ভি. ভি. গিরি সহ জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীদের একটি দল জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবাধীন একটি সারা ভারত কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সম্মেলনে রঙ্গের দলই সর্বাধিক রাজনৈতিক সমর্থন পায়। কিন্তু ঐক্যাকাঙ্ক্ষী এই কিষান সভার প্রাদেশিক নেতৃত্ব যে বামপন্থীদেরই দখলভুক্ত থাকবে এটি নতুন সংগঠনের প্রথম সম্মেলনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লক্ষ্মৌয় সারা ভারত কিষান সভার উদ্বোধনী অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের নিয়মিত অধিবেশনের সমকালে (দুটি সংগঠনের লক্ষ্যগত ঘনিষ্ঠতাকে প্রতীকিত করার উদ্দেশ্যে)। এতে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীরা সারা ভারত কিষান সভার প্রধান সংস্থা, কেন্দ্রীয় কিষান কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারে নি।

এই বছরের আগস্ট মাসের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত কৃষকদের দাবিদাওয়ার সনদটি সারা ভারত কিষান সভার মূল দলিল হয়ে উঠেছিল। এতে ছিল: জমিদারি উচ্ছেদ, রায়তওয়ারি এলাকায় রাজস্ব নীতি সংস্কার, খাজনা হ্রাস ইত্যাদি। অর্থাৎ, সনদটি ভারতীয় কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্তবিরোধী সংগ্রামের উদ্যোগকে জাতীয় শক্তিগুলির সম্ভাব্য বৃহত্তম ফ্রন্টের পরিসরে ঘনীভূত করেছিল এবং এতে গ্রামীণ বুর্জোয়া সহ এমন কি রায়তওয়ারি এলাকার জমিদারও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সামন্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সমাবন্ধ ঘটানোর মধ্যেই এই সনদের তাৎপর্য নিহিত। স্থানীয় কিষান সভার মাধ্যমে সনদভুক্ত নীতিগুলির প্রচার কৃষকদের শ্রেণীস্বার্থ চেতনা এবং

জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সমস্যাদি সম্পর্কে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়েছিল।

ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কিষান সভার পরবর্তী অধিবেশনে বামপন্থীরা তাদের অবস্থান আরও মজবুত করেছিল। এটিও আগের মতোই জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের সমকালে ও অভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (এবার মহারাষ্ট্রের এক ছোট শহর ফয়েজপুরে)। সভা কৃষকদের দাবিদাওয়ার সনদটিকে অনুমোদন দেয় এবং রঙ্গ-দলের সঙ্গে যথেষ্ট লড়াইয়ের পর কংগ্রেসের পতাকার বদলে কাস্তে-হাতুড়ি খচিত কমিউনিস্ট পার্টির রক্তপতাকাকেই সংগঠনের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে। বিহারের অন্যতম কৃষকনেতা, জনৈক বিপ্লবী গণতন্ত্রী, এস. এস. সরস্বতী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সারা ভারত কিষান সভার প্রতিষ্ঠা ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ থেকেই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ভারতীয় সমাজের এই বৃহত্তম অংশের শরিকানার সূচনা ঘটেছিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের গণসংগঠনগুলির নেতৃত্বলাভের সংগ্রামে নানা প্রকারভেদ দেখা দিয়েছিল এবং তা বহুলাংশে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও খোদ জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিবর্তনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের অগ্রগতি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

কংগ্রেস-সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রতিষ্ঠা

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে, কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠনের পূর্বাহ্নে জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কংগ্রেস সংস্থা হিসাবে স্বরাজ্য দলকে পুনরুজ্জীবিত করে। কিন্তু এই পর্যায়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রক্ষণশীলদের প্রভাব যথেষ্টই হ্রাস পেয়েছিল। সাম্প্রতিক বামপন্থী শক্তিগুলির দেশজোড়া সংহতি, মেহনতিদের গণসংগঠনের প্রধান প্রধান সংস্থাগুলিতে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দৃঢ় অবস্থান লাভের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পার্টির গণভিত্তি প্রসারের জন্য বিবিধ সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন।

জাতীয় পরিসরে কংগ্রেসের একাধিপত্য অব্যাহত ছিল এবং ১৯১৮-১৯২০ খ্রীস্টাব্দে এর উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠনের পরবর্তী বছরগুলিতে ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া-জমিদারদের পার্টি থেকে এটি যথেষ্ট ব্যাপক শ্রেণী-পরিসরের

প্রতিনিধিস্বরূপ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের নানা প্রবণতা ও দলের সংগঠন হয়ে উঠেছিল, যদিও তখনো জাতীয় বুর্জোয়ারাই এর নেতৃত্বে ছিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ চিন্তাধারার ব্যাপক পরিসরের মধ্যে এতে দুটি প্রবণতা প্রকটিত হয়ে উঠেছিল: প্রধান ভূমিকাসীন গান্ধী-সমর্থিত দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী এবং বামপন্থী। এই বামপন্থী দলে কেবল সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর সমর্থক তরুণ সদস্যরাই নয়, ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের সমর্থক দলগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শেষোক্ত দলগুলিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে সমর্থন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এই প্রবণতা মুকাবিলার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব ও অশোক মেহ্‌তার নেতৃত্বে একদল সমাজতন্ত্রী ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস-সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠন করে ও এটি কংগ্রেসের কাঠামোর মধ্যেই কার্যকর থাকে। এই বছর অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে পার্টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাবাদর্শ ও রাজনীতির দিক থেকে এই পার্টি ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল।

মেহনতিদের গণ-আন্দোলন সংগঠন এবং শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে কংগ্রেসের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল কংগ্রেসভুক্ত অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির মতো এই সমাজতন্ত্রীদেরও প্রধান লক্ষ্য।

বামপন্থী দলগুলির মধ্যে অচিরেই কার্যপদ্ধতির ক্ষেত্রে দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সংস্কারবাদীরা রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের একচেটিয়া অধিকার অটুট রেখে কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালানোই যথেষ্ট বিবেচনা করত। পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা ছিল ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সমাবন্ধের পক্ষে। তাসত্ত্বেও গণ-আন্দোলনে কংগ্রেসের নেতৃত্ব অবিভক্ত রাখার পক্ষে উক্ত বামপন্থীদের উভয় দলেরই অভিন্নমত ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, কংগ্রেস-সমাজতান্ত্রিক পার্টির সংবিধান অনুসারে কেবল কংগ্রেস সদস্যরাই এতে যোগ দিতে পারত।

কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের উপর নিজের ও তাঁর সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য গান্ধী কংগ্রেসভুক্ত বিবিধ সংস্থার কিছু কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য হন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সংবিধানের একটি পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয়: কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি (রাজনৈতিক সংস্থা) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (দুটি অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালীন সর্বোচ্চ সংস্থা) দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার বদলে প্রতি বছর

নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি দ্বারা মনোনীত হবে। বোম্বাই অধিবেশন অসহযোগ আন্দোলন মুলতুবি রাখা সম্পর্কিত গান্ধীর প্রস্তাবটি অনুমোদন সহ কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের অংশগ্রহণের প্রস্তাবটি অনুমোদন করে।

এই পর্যায়ে গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এতে সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং দলগত রাজনীতির ঊর্ধ্বে জাতীয় নেতা হিসাবে তাঁর মর্যাদা অটুট থাকে। এভাবে তাঁর পক্ষে তখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কৌশলী কার্যকলাপের এবং কৌশলগত কারণে পশ্চাদপসরণের এই কালপর্বে ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে আংশিক সমঝোতার দায়িত্ব এড়ান সম্ভবপর হয়। এই সময় তিনি পুনরায় তাঁর গঠনমূলক কর্মসূচিতে (হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, খাদি ও সুতা কাটায় উৎসাহদান ও ক্ষুদ্রায়ত শিল্পোন্নয়ন) আত্মনিয়োগ করেন। নতুনভাবে এই কার্যকলাপের ফলে শহুরে ও গ্রামীণ কারিগর, ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এবং শহরের দরিদ্রজন, অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তির মধ্যে তাঁর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়।

‘১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের সংবিধান’ এবং আইনসভার নতুন নির্বাচন

ভারতীয় বিত্তশালী সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব অটুট ছিল এবং এজন্যই ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর নির্বাচনে (ভোটদাতার সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫০ হাজার) কেন্দ্রীয় আইনসভায় সে অর্ধেক ভোট ও অর্ধেক আসন পেয়েছিল।

এই নতুন কেন্দ্রীয় আইনসভায় কোন পার্টিই সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন ও গোলটেবিল বৈঠকের সুপারিশ অনুসারে তৈরি নতুন ভারতবিধি সমর্থন করল না। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে এই নতুন ‘সংবিধান’ অনুমোদন করেছিল।

নতুন বিধি ভারতীয় পুঁজিপতি ও জমিদারদের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার ১২ শতাংশকে ভোটাধিকার দিয়ে নির্বাচনী এলাকা প্রসারিত করা হয়েছিল, অর্থাৎ সম্পদসীমা ও অন্যান্য যোগ্যতা হ্রাস করার ফলে বিত্তশালীদের অধস্তন স্তরগুলি এবং মেহনতিদের কোন কোন বর্গ (ধনী কৃষক এবং শ্রমিকদের নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটদাতা নির্দিষ্ট বর্গের শ্রমিক) ভোটদানের অধিকার পেয়েছিল। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির ক্ষমতাও কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল: প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা (পুনর্গঠিত কার্যকরী পরিষদগুলি গভর্নরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল) এখন এগুলির কাছে দায়ী ছিল।

আসলে কিন্তু এই বিধি দ্বৈতশাসনের নীতিই অনুসরণ করেছিল এবং বস্তুত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের হাতেই পূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রিত করেছিল।

তাছাড়া বিধিটি নির্বাচনী এলাকা-ব্যবস্থারও ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভবপর করেছিল এবং ফলত, জাতীয় আন্দোলনে ভাঙ্গন সৃষ্টি সহ রক্ষণশীলদের শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক জটিলতর করার জন্য এবং জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্ভাব্য সমঝোতা বন্ধের জন্য মুসলমান ও অন্যান্য 'সংখ্যালঘুদের' কতকগুলি সুবিধা দেয়া হয়েছিল। অস্পৃশ্য সহ হিন্দুরা ৭০ শতাংশ ভোটের অধিকারী হলেও তাদের আসন ছিল ৫৫ শতাংশ। এই সময় দেশীয় রাজাদেরও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা ও সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভায় তাদের প্রতিনিধি ছিল যথাক্রমে এক-তৃতীয়াংশ ও দুই-পঞ্চমাংশ।

ভবিষ্যতে দেশকে বিভক্ত করার শর্ত এই বিধিভুক্ত হলেও দেশের মর্যাদা এতে অনুক্তই ছিল। এতে তথাকথিত 'ফেডারেল পরিকল্পনার' ব্যবস্থা ছিল এবং তদনুযায়ী দেশীয় রাজন্যবর্গকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার বা এর সঙ্গে স্বাধীন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। 'ফেডারেল পরিকল্পনা' প্রবল ঘৃণা সৃষ্টি করেছিল এবং এটি কোনদিনই বাস্তবায়িত হয় নি।

ভারতের এই নতুন সংবিধান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং এটি 'দাস সংবিধান' হিসাবে অ্যাখ্যায়িত হয়।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিকে যেমন এজন্য ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়েছিল, পক্ষান্তরে ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনাও তখন তীব্র হয়ে উঠেছিল।

এই প্রস্তুতিপর্বে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা (তখনো তাদের ঐক্য অটুট ছিল) একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টের জন্য ব্যাপক লড়াই শুরু করেছিল। সপ্তম কমিনটার্ন কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ভারতীয় কমিউনিস্টদের অনুসৃত নীতির উপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। একটি খোলা চিঠিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, রজনী পাম দত্ত এবং বেন ব্র্যাড্‌লি ভারতীয় কমিউনিস্টদের কতকগুলি সুস্পষ্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সদস্যদের তখন কংগ্রেসে যোগদান অনুমোদন সহ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কংগ্রেসের একটি দল হিসাবে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদানের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সারা ভারত কিষান সভাও অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু এই

প্রতিষ্ঠানে শেষে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে একটি উপদল গঠিত হয় এই ভয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এতে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেন। এসব সত্ত্বেও শেষাবধি বহুসংখ্যক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রী কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যফ্রন্ট হিসাবে গড়ে তোলার আশায় ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসে যোগদান করে।

এসব কার্যকলাপের ফলেই কংগ্রেসের মধ্যে একটি শক্তিশালী বামপন্থী অংশের উন্মেষ ঘটেছিল। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্যেই এর প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি অতঃপর যে-ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন এটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যই ছিল বামপন্থীদের প্রতিনিধি।

ত্রিশের দশকে জওহরলাল নেহরুর অনুসৃত রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলি ছিল কিছুটা স্ববিরোধী ও টলমলে। এই পর্যায়ে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি পরিপক্কতা লাভ করেছিল এবং অংশত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তথাপি নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ধারণাবলী কতকগুলি দার্শনিক রীতির সঙ্গে, বিশেষত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সারগ্রাহীভাবে মিশে গিয়েছিল এবং এতে তিনি ছিলেন গান্ধীর অনুসারী।

সুভাষচন্দ্র বসু সহ বহু বামপন্থী কংগ্রেস নেতার মতো নেহরুও সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্জিত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য তাঁদের সহানুভূতি প্রকাশ করতেন এবং স্পেনের বীর জনগণ, চীন ও আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সমর্থন জানান।

কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের দুই প্রধান নেতার সেই বিশের দশকের শেষ ও ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকের মতানৈক্য তখনো অটুট ছিল। বসু বাংলার প্রাদেশিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন এবং ফলত, নেতৃত্বের সংস্থিতি ও পার্টিনীতি বদলাতে পারতেন। নেহরু মুখ্যত গান্ধী-উদ্ভাবিত পার্টিনীতিই অনুসরণ করতেন। তাঁর এই কার্যপদ্ধতির ফলে তিনি কংগ্রেস নেতাদের দৃঢ় সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারতেন। ত্রিশের দশকের মধ্য ও শেষভাগে বিশেষত তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সময় কংগ্রেস ও বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমঝোতা বিস্তারই ছিল নেহরুর কার্যকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নেহরু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে বৈদেশিক সংযোগ সম্প্রসারণকে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন বিকাশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবতেন।

নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে 'দাস সংবিধানের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর

সুযোগ গ্রহণের জন্য লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেসকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সেই বছর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের ফয়েজপুর অধিবেশনে কৃষকদের দাবিদাওয়ার সনদের বিকল্প হিসাবে 'কৃষিসংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক দাবিগুলি' উপস্থাপিত হয়। প্রস্তাবটিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে খাজনা, মহাজনদের দেয়া ঋণের সুদ ও ভূমিকর কমানোর দাবির ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন সম্প্রসারণের প্রশ্নটি বিবেচিত হয়েছিল। কিষান সভার নেতৃত্বলাভের জন্য কংগ্রেসের পক্ষে কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দৃঢ় সংকল্প এই দলিল অনুমোদনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে ক্রমেই সমাজের বিভিন্ন স্তর ও বর্গের মানুষ সাধারণ-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেছিল। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে 'সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন', 'সারা ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন' ও 'সারা ভারত প্রগতিশীল লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব সংগঠনে কেবল কংগ্রেস সদস্যরাই নয়, কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রীরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। এগুলি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। নির্বাচনে শ্রমিকদের নির্বাচনী এলাকায় (মোট আসনের তিন শতাংশ) নিজেদের প্রার্থীদের মনোনয়ন সীমিত রেখে কমিউনিস্টরা তখন কংগ্রেসকে সমর্থন যুগিয়েছিল।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতের পার্টিগত রাজনৈতিক কাঠামো পাঁচ বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি জটিলতা লাভ করেছিল। কংগ্রেস, লীগ আর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে হিন্দুমহাসভা ছাড়াও তখন কোন কোন প্রদেশে স্থানীয় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং কংগ্রেসের বিরোধিতা করছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য: পঞ্জাবের ইউনিয়ন পার্টি, বাংলার প্রজা কৃষক সমিতি, যুক্তপ্রদেশের জাতীয় কৃষক পার্টি, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের স্বাধীন শ্রমিক পার্টি, মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি ও ওড়িষ্যার অ্যাড্ভান্স পার্টি।

কেবল পেটি-বুর্জোয়া দলগুলিই নয়, এইসব পার্টিতে সামন্ত ভূস্বামী এবং জমিদারদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল স্তরগুলিও যোগ দিয়েছিল। এদের কোন কোনটির কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক (ইউনিয়ন পার্টি বা প্রজা কৃষক সমিতি) বা বর্ণভিত্তিক (আম্বেদকর পরিচালিত স্বাধীন শ্রমিক পার্টি এবং জাস্টিস পার্টি)।

অবশ্য, এগুলির প্রভাব ছিল খুবই সীমিত এবং হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লীগই ছিল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

মুসলিম লীগের মধ্যে মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে অধিকতর প্রগতিশীল একটি অংশ গড়ে উঠছিল। ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যাপক গণ-আন্দোলনে অনীহ এই লীগ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে নিজের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে। কিন্তু লীগ স্বাধীনতা লাভের পর দেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূহের একটি ফেডারেশন গঠনের পক্ষপাতী ছিল। মুসলিম লীগের এই নতুন কর্মসূচি প্রাক্তন কংগ্রেস সমর্থক বহু মুসলমানের সমর্থন পেয়েছিল। স্বাধীন ভারতের ফেডারেল কাঠামোর পক্ষে এই ওকালতি ছিল লীগের ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লীগ নিজেকে ভারতের মুসলিম স্বার্থের একমাত্র দাবিদার মনে করত এবং তখনো ভ্রূণবর্তী পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ভাবী দাবি উত্থাপনের স্বপ্ন দেখত।

প্রাদেশিক সরকারগুলিতে কংগ্রেস ও লীগ। রাজনৈতিক সংগ্রামে নতুন তীব্রতা

নির্বাচনে ভারতীয় কংগ্রেস এগারোটি প্রদেশের মধ্যে আটটিতেই জয়লাভ করে এবং এগুলিতে সরকার গঠন করে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উদ্যোগে আসাম ও সিন্ধু প্রদেশে মিলিত সরকার গঠিত হয়।

কংগ্রেস সরকারগুলি সুবিধাভোগী রায়ত-চাষীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য নতুন কৃষি-আইন চালু করার উদ্যোগ নেয়, কর-হারের সীমানা নির্ধারণ সহ মহাজনদের ঋণশোধ স্থগিত রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এইসব ব্যবস্থা শুধু মেহনতি কৃষকদেরই নয়, গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়াদেরও স্বার্থানুকূল ছিল।

এই সময় কংগ্রেস সরকার 'বোম্বাই শিল্পবিরোধ বিধির' মতো বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলির অধিকার সঙ্কোচক অনেকগুলি শ্রম-আইন তৈরি করে।

শ্রমিক শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মাধ্যমে কংগ্রেসের এই শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

শ্রমিক শ্রেণীর সংঘটিত কার্যকলাপ অতঃপর ক্রমেই রাজনৈতিক চারিত্র্য লাভ করতে থাকে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসম্মত করার জন্য সারা দেশে সাফল্যের সঙ্গে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দিবস' পালিত হয়। মে মাসে 'শোলাপুর বন্দীমুক্তি দিবস' (১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে শোলাপুর অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য কারাভোগী) পালন করা হয়। প্রলেতারীয় বৈপ্লবিক উৎসবের এসব আয়োজন ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগান সহ মে-দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং সারা দেশে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের দাবি জানান হয়। তৎকালের মে-দিবসের সভা ও শোভাযাত্রার মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকদের বিকশিত শ্রেণীসংহতির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ভারতের সকল শিল্পকেন্দ্র ও দেশীয় রাজ্যগুলিরও কোন কোন শহরে অনুরূপ সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনের পর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সেই সময়কার কৃষক আন্দোলনের আকারেই প্রকটিত হয়েছিল। কৃষকদের কার্যকলাপের প্রধান ধরন ছিল কিষান সভার উদ্যোগে সংঘটিত ব্যাপক প্রচারাভিযান। এগুলির মাধ্যমে কর্মীরা সভার নীতি ব্যাখ্যা করত, তার ভিত্তি প্রসারের প্রয়াস পেত, কৃষিসংস্কারের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ চালাত (প্রজাস্বত্ব আইন বদল) ও শেষে এই দরখাস্ত প্রাদেশিক সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাছে পেশ করা হত। ১৯৩৭-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্র ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে, বস্তুত সারা ভারত কিষান সভার সক্রিয় শাখাগুলির প্রভাবাধীন জেলাগুলিতেই ব্যাপক শোভাযাত্রা ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কিষান সভার প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে এর সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৬ লক্ষ ও ৮ লক্ষ।

কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং আইনসভার উপর সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের চাপের ফলে পূর্বোক্ত কৃষি-আইনগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল।

শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির সফল উন্নয়নের ফলে শ্রমিক ও কৃষক সংহতির এক উর্বর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ও মাদ্রাজের কৃষক সংগঠনগুলির উদ্যোগে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সপক্ষে সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের দিক থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রাদেশিক রাজধানী পর্যন্ত পদযাত্রায় কৃষক প্রতিনিধিদের সহায়তা দিয়েছিল।

শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির কার্যকলাপ সমন্বয়ের ব্যবস্থা দেশজোড়া পরিসরে ক্রমেই মূলীভূত হয়ে উঠছিল। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রমিকদের দাবির সনদে কৃষিসমস্যার প্রশ্নও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের শেষে ও ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, কমিউনিস্ট কর্মী এস. এস. মীরাজকর কিষান সভার নেতা এস. এস. সরস্বতীর সঙ্গে একযোগে মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে একটি প্রচারাভিযান চালান এবং শ্রমিক ও কৃষকের সভায় বক্তৃতা দেন। শেষপর্যন্ত ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও সারা ভারত কিষান সভার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী

ও কৃষক সমাজের সংহতি এভাবেই একটি রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

যুদ্ধপূর্ব বছরগুলিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান যথেষ্ট মজবুত হয়ে উঠেছিল এবং আত্মগোপনের পরিস্থিতিতে নির্মম নির্যাতনের মুখোমুখি পার্টিকে তখন কঠিন সংগ্রাম চালাতে হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণাবলী ও এইসঙ্গে পার্টির নীতিগুলি জনপ্রিয়করণে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। এই সময় কমিউনিস্ট পুস্তিকা ও প্রচারপত্র বেআইনীভাবে প্রকাশিত হত। কমিউনিস্টরা আইনী পত্রপত্রিকাও প্রকাশ করত। এক্ষেত্রে ১৯৩৮-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তখন ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনগুলির মধ্যে নিজেদের অবস্থান মজবুত করছিল এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সঙ্গে সফল সমঝোতা অটুট রেখেছিল। এই সহযোগিতার নজির হিসাবে ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ও এস. এস. সরস্বতীর কার্যকলাপ উল্লেখ্য। এইসময় কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কোষকেন্দ্রটি গড়ে উঠছিল এবং এতে ছিলেন গঙ্গাধর অধিকারী, ঘাটে. মীরাজকর, ডাঙ্গে ও মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদের মতো সেরা মানুষেরা। গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদের দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পেটি-বুর্জোয়া সংকীর্ণতাদুষ্ট ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

এই ঘটনাপ্রবাহ জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট আশঙ্কা সঞ্চার করেছিল। কোন কোন স্থানে (যেমন বিহারে) কংগ্রেস রাজনৈতিক কর্মীরা কৃষক আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানোর প্রয়াস পেয়েছিল এবং অন্যত্র (যেমন উত্তরপ্রদেশ) কিষান সভার বিকল্প সংগঠন তৈরির চেষ্টা করেছিল। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়াবি মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিহার পার্টি সংগঠন কর্তৃক কংগ্রেস সদস্যের পক্ষে কিষান সভায় যোগদান বন্ধের দাবি সম্বলিত প্রস্তাবটিতে অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু জনমতের চাপে শেষপর্যন্ত ফেব্রুয়ারি অধিবেশনে কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে।

কংগ্রেসকে একটি যুক্তফ্রন্ট হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সকল চেষ্টাই কংগ্রেস নেতাদের প্রবল বাধার মুখোমুখি হয়েছিল, কারণ এই নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।*

* নেহরু নীতিগতভাবে এই যৌথনেতৃত্বের সমর্থক ছিলেন, তবে কংগ্রেসের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত পূর্ণ আত্মসমর্পণের শর্তে।

একদিকে কংগ্রেসের বাইরে ক্রমাগত বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি এবং সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের অধিকতর কার্যকর সংগ্রাম আর অন্যদিকে প্রাদেশিক সরকার ও আইনসভার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রশাসনে কংগ্রেস সদস্যদের শরিকানা কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক ভাঙ্গন ত্বরিত করেছিল।

জাতীয় কংগ্রেসে মতানৈক্য বৃদ্ধি

ব্যাপকতর পরিসরে মুক্তিসংগ্রামের কার্যকলাপ বিস্তার এবং তার গভীর মূলীভবন শুরুর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে কেবল বিবিধ ধরনের সামাজিক ও শ্রেণীগত আধেয়লগ্ন সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিই নয়, নানা প্রকার স্থানীয় স্বার্থের পুরো একপ্রস্থ সংগঠনও আত্মপ্রকাশ করছিল। জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে ত্রিশের দশকের শেষ নাগাদ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। লক্ষ্যণীয়, খোদ এসব ঘটনার মধ্যেই ভারতে জাতিসত্তার উন্মেষ প্রতিফলিত হচ্ছিল। কংগ্রেস-শাসিত অন্ধ্র ও কর্ণাটক* প্রদেশেই এই আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছেছিল এবং সেখানে বুর্জোয়া-জাতীয় সংগঠন — 'অন্ধ্র মহাসভা' ও 'সংযুক্ত কর্ণাটক লীগ' সক্রিয় ছিল। ওড়িষ্যা এবং কাশ্মীরে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের সংগ্রামও শুরু হয়েছিল।

ত্রিশের দশকের শেষ নাগাদ ৬০০টি দেশীয় রাজ্যের সবগুলিতেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে ৬০টি দেশীয় রাজ্যে 'প্রজামণ্ডল', 'প্রজাপরিষদ' নামের রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৩৭-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে স্থানীয় বুর্জোয়া-জাতীয় সংগঠনগুলি কোন কোন প্রদেশে, যথা মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, রাজকোট (গুজরাট) ও অন্যান্য কয়েকটিতে রাজাদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা হ্রাসের দাবিতে হরতাল প্রতিপালন করে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যেই রাজ্যশাসনের শরিকানার জন্য ব্যগ্র বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর লোকদের নেতৃত্বেই এসব সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুরে এই আন্দোলন সামন্তবিরোধী এবং গাংপুর (ওড়িষ্যা) ও রামদুর্গের (বোম্বাই প্রদেশ) মতো ছোট রাজ্যে কৃষক আন্দোলন অচিরেই অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করেছিল।

দেশব্যাপ্ত জাতীয় আন্দোলনে দেশীয় রাজ্যগুলির যোগদানের ফলে কেবল খোদ আন্দোলনই নয়, জাতীয় কংগ্রেসও শক্তিশালী হয়েছিল। এইসঙ্গে আন্দোলনে

* কর্ণাটককে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বোম্বাই প্রদেশ এবং হায়দরাবাদ ও মহীশূর রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল।

এই নতুন উপাদানের অনুপ্রবেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকেও জটিল করে তুলেছিল।

কংগ্রেসের হরিপুর (বাংলা) অধিবেশনে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ বেধে যায় এবং গান্ধীর মতামত অস্বীকারক্রমে সম্প্রতি নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থকরা পূর্ণ স্বরাজের জন্য একটি সংগ্রামী কর্মসূচি গ্রহণ করে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে একটি বামপন্থী অংশের উন্মেষ এবং পরবর্তী অধিবেশনে যোগদানের জন্য নির্বাচিত প্রাদেশিক সংগঠনের সদস্যদের প্রায় ৪০ শতাংশ বামপন্থী হওয়ার ফলে বসুর অবস্থান মজবুত হয়ে উঠেছিল।

এই পরিস্থিতিতে পট্টভি সীতারামিয়া পরিচালিত এবং গান্ধী দ্বারা সক্রিয়ভাবে সমর্থিত কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে খোলাখুলি আক্রমণ চালায়। ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষ-বিরোধীরা গান্ধীর চাপে পদত্যাগ করেন। তাসত্ত্বেও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জানুয়ারি অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে খুবই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দেয়। দলের মধ্যে প্রবল তিক্ত সংঘাতের পর দক্ষিণ-মধ্যপন্থীদের অধিকাংশের প্রতিনিধি ও গান্ধীর মতানুসারী গোবিন্দবল্লভ পন্থের চেষ্টায় গান্ধীকে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়নের সর্বময় ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায়।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ ত্যাগ করলে বিহারের কংগ্রেস নেতা এবং গান্ধীর পুরনো সহকর্মী রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর স্থলবর্তী হন।

অচিরেই সুভাষচন্দ্র নিজ সমর্থকদের একটি বড় দল সহ কংগ্রেস ত্যাগ ও ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি নতুন পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির প্রভাব মূলত বাংলায়ই কেন্দ্রিত ছিল।

কংগ্রেসের এই ভাঙ্গনের ফলে বামপন্থীদের মধ্যেকার মতানৈক্যের ফারাক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। নেহরু যখন গান্ধীর পথ ও কংগ্রেস নেতৃত্বে তাঁর দলকে সমর্থন দিচ্ছিলেন তখন কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদের বামপন্থী দলগুলি (বিশেষত কেরালা, অন্ধ্র ও যুক্তপ্রদেশে) ১৯৩৯-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস ত্যাগক্রমে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনগুলির কোষকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।

কিন্তু এই পর্যায়ে জায়মান বৈপ্লবিক কার্যকলাপের নতুন তরঙ্গ এবং দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বণ্টন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে প্রহত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ

যুদ্ধের প্রারম্ভিক বছরগুলিতে (১৯৩৯-১৯৪১) রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন

ভারতবর্ষকে যুদ্ধের শরিক ঘোষণা। রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান

ইউরোপের যুদ্ধে ব্রিটেনের যোগদানের পর ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারতের যুদ্ধে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা ছাড়াই ঔপনিবেশিক সরকারের এই কর্মকাণ্ডের ফলে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে সারা দেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলের ঢেউ বয়ে যায়। একমাত্র ভারতেই (নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাকারী দেশগুলির মধ্যে) যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করেছিল।

ভাইসরয়ের এই কাজের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্যরা অধিবেশন বর্জন করেন। কিন্তু ভাইসরয় তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে ভারতবিধির সংশোধনী সহ ভারতরক্ষা আইন জারি করেন। আইনটির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রশাসন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা (সমাবেশ, সংবাদপত্র ইত্যাদি) অবদমনের অব্যাহত, কার্যত পূর্ণ অধিকার পায়। তদুপরি আনুষঙ্গিক নিবর্তনমূলক আটক আইন জারি সহ ব্রিটিশ গভর্নরদের প্রাদেশিক সরকার (আইনসভার কাছে দায়ী) ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যুদ্ধসম্পর্কে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির খসড়া সহ একটি বিশেষ ঘোষণা অনুমোদন করে। এতে ব্রিটিশের যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থনদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী আরোপিত হয়: ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা লাভের অধিকার স্বীকার; সংবিধান-সভা আহ্বান; আগামী কোন এক সময় ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির অধিকার স্বীকার; অচিরেই ভাইসরয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়ী একটি সরকার গঠন।

মুসলিম লীগও আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের অধিক সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের শর্তেই কেবল ব্রিটিশের যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থন দিতে চেয়েছিল।

দেশীয় রাজন্যবর্গ, সামন্ত ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল

দলগুলিই শুধু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যেই যুদ্ধে ভারতের যোগদান সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্ব্যর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছিল। এর একদিকে ছিল বিভিন্ন সামরিক ফরমাশ থেকে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ আর অন্যদিকে জটিল সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেষ্টিত ব্রিটিশের কাছ থেকে বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের নতুন সম্ভাবনা।

সামরিক ফরমাশ বণ্টনের জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিরা অর্থনৈতিক সম্পদ পরিষদ, সরবরাহ বিভাগ ইত্যাদি সংস্থা গঠনের কার্যাদিতে ঔপনিবেশিক সরকারকে সাহায্যদানে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ সরকার ও ভারতস্থ তার প্রতিনিধি. ভাইসরয়ের সঙ্গে জটিল দর-কষাকষি অব্যাহত রেখেছিল।

যুদ্ধসম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রস্তাবগুলিকে ভারতীয় বুর্জোয়া জাতীয়বাদীদের মতামতের অভিব্যক্তি ধরে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কিত রূপরেখা সহ একটি 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্বোক্ত ঘোষণায় উল্লিখিত দাবিগুলির প্রত্যক্ষ জবাব এড়িয়ে ব্রিটিশ সরকারের এই শ্বেতপত্রে যুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার কথা ঘোষণা করা হয়। তদুপরি ভাইসরয়ের অধীনস্থ কার্যকরী সংসদে অধিক সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের এবং সকল রাজনৈতিক দল ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি সহ এই সংসদ অনুমোদিত একটি মন্ত্রণা-পরিষদ গঠনের আশ্বাস দেয়া হয়।

শ্বেতপত্রটি ছিল বিরোধীদের প্রস্তাবের দিক থেকে পুরোপুরি একটি নেতিবাচক উত্তর।

ব্রিটিশ শাসকদের অনুসৃত এই উদ্যোগের প্রতিবাদ হিসাবে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। এই সংকট মুকাবিলায় গভর্নররা ইতিমধ্যে প্রকাশিত সংবিধানের সংশোধনী মোতাবেক নতুন কার্যকরী সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হন।

২৩ অক্টোবর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্বেতপত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলির যে-উত্তর দেন তার মর্মবস্তু এরূপ: (১) অবিলম্বে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে হবে; (২) সংবিধান-সভার মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান তৈরি করতে হবে; (৩) জাতীয় কংগ্রেসের দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে শেষপর্যন্ত আরও একটি আইন অমান্য আন্দোলন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার চেষ্টা করেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর 'কংগ্রেসী দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ' (প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলির পদত্যাগের পর) উপলক্ষে লীগ সারা দেশে 'নাজাত' দিবস পালন করে। কিন্তু আন্দোলনটি ব্যাপক পরিসর লাভে ব্যর্থ হয়। আসাম, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারভুক্ত মুসলিম লীগ সদস্যরা ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন।

মুসলিম লীগ নেতাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মূলত সংকীর্ণতাদুষ্ট এই পদক্ষেপ দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের পরবর্তী ঘটনাবলীকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির সাফল্যের উপর যে-ব্রিটিশ সরকার তার সকল আশা ন্যস্ত করেছিল মুসলিম লীগের নীতি শেষপর্যন্ত তারই খপ্পরে পড়ল। কিন্তু মুসলিম লীগের প্রভাব যে জাতীয় কংগ্রেসের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল এবং সেইসময়, এমনকি মুসলমানদের একটি অংশের উপরও যে কংগ্রেসের প্রভাব ছিল, ব্রিটিশরা তা লক্ষ্য করতে ভুল করে নি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃঢ় পদক্ষেপ তখন জায়মান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনে নতুন অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল এবং ফলত, ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গের কাছে নতুন প্রস্তাব উপস্থাপনে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বোম্বাইয়ের একটি ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভাইসরয় ঘোষণা করেন যে, রাজন্যবর্গ ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সহ অন্যান্য বিষয়াদি বিচার পূর্বক যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেয়া হবে এবং আরও ত্রিশ বছর দেশরক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটেনের হাতে থাকবে।

কিন্তু ব্রিটিশের এই নতুন প্রস্তাবগুলি পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। এর কারণ, এতে অচিরে ভারতে ভাইসরয়ের নেতৃত্বে দায়িত্বশীল সরকার গঠন সম্পর্কিত জাতীয়তাবাদীদের মূল দাবির কোন সুস্পষ্ট উত্তর ছিল না।

১৯৩৯-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের গণ-আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্লীন অসঙ্গতি

সেই ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসেই কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ শুরু করেছিল। এগুলির মধ্যে বৃহত্তমটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাদ্রাজে। এই বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কানপুর, পাটনা, ঝরিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রে যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘট অনুষ্ঠিত

হয়। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে মোট ১১০টি ধর্মঘটে ১ লক্ষ ৭০ হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। এই বছরের শেষ নাগাদ শ্রমিক মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের মানুষ যুদ্ধের প্রথম অর্থনৈতিক ফল হিসাবে নিত্যব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য ও ফটকাবাজী ইত্যাদির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থীদের কার্যকলাপ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র সংগঠনগুলির নিখিল ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী ও ফরওয়ার্ড ব্লক যোগদান করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বামপন্থীদের আপোসহীন পদক্ষেপ এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে নিগমভুক্ত হয়েছিল। ভারতীয় কমিউনিস্ট এবং এইসঙ্গে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল এবং তারা এর সঙ্গে ভারতের যেকোন সংযোগের বিরুদ্ধে ছিল।

বামপন্থী সংগঠনগুলি ও সম্মেলনের শরিকদের আহ্বানে পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, অন্ধ্র ও মালাবারে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির একটি ফ্রন্ট গঠনের পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল — জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের পদক্ষেপের দরুন এই উদ্যোগ প্রহত হয়েছিল।

কংগ্রেস তখন বামপন্থী শক্তিগুলির গণ-আন্দোলন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত এবং শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট বা কৃষক আন্দোলন এর কোনটিতেই সমর্থন যোগাত না। লক্ষণীয় যে, এমন কি ব্যাপক ব্রিটিশবিরোধী প্রচারাভিযানের সময়ও জাতীয় আন্দোলনের উপর কংগ্রেসের নেতৃত্ব অটুট রাখার চেষ্টা প্রাধান্য লাভ করত। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে যথারীতি ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। পুনরায় এটি শুরুর তারিখ ও আন্দোলনের ধরন নির্ধারণের সর্বময় কর্তৃত্ব গান্ধীকেই দেয়া হয় এবং তিনি সত্যাগ্রহের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন।

ত্রিপুরী কংগ্রেস (১৯৩৯) থেকে পার্টিনেতাদের অনুমোদনক্রমে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর ফলে সংগঠনের ঐক্যে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছিল। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বিহারের রামগড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে কংগ্রেসের অন্যতম বৃহত্তম প্রাদেশিক সংগঠন, বাংলার কোন প্রতিনিধিই যোগ দেয় নি। বাংলা কংগ্রেসের সংখ্যাগুরু অংশ সুভাষচন্দ্রের সমর্থক বিধায় তাদের নেতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে তারা সম্মেলন বর্জন করে (ত্রিপুরী

কংগ্রেসের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতা দানের জন্য তাঁকে কংগ্রেসের নেতৃপদ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়)।

সুভাষচন্দ্রের সমর্থকরা তাদের নিজস্ব 'আপোসবিরোধী সম্মেলন' আহ্বান করে এবং সেখানে গান্ধী সহ জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। কংগ্রেসভুক্ত বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই সম্মেলনে যোগ দেয় নি। তাদের মতে সম্মেলনটি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যের পক্ষে একটি মারাত্মক আঘাতস্বরূপ।

কংগ্রেস এবং বসুর সম্মেলন চলাকালে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগেরও একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গৃহীত একটি প্রস্তাব যেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাসে এক নিয়তিনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল: সেখানে পাকিস্তান নামে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনই মুসলিম লীগের শেষলক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল।

গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। তৎকালীন পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সূচক হিসাবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অন্যতম প্রধান নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন করা হয়।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির মধ্যে বর্ধমান মতানৈক্যের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ মুক্তিফ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনারোধ সহজতর হয়েছিল। অবশ্য, এগুলি দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশরোধের পক্ষে যথেষ্ট কার্যকর ছিল না।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি প্রথাসিদ্ধ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন হঠাৎ ব্রিটিশবিরোধী এক ব্যাপক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আকার ধারণ করে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে গিরনি কামগড় বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। বোম্বাই বস্ত্রকল শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি প্রদর্শনের জন্য বোম্বাই প্রদেশে অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলির শ্রমিকরাও একদিনের ধর্মঘট পালন করেছিল।

১৯৩৯-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ধর্মঘটের শরিক শ্রমিকদের সংখ্যা (৪ লক্ষ ৯ হাজার — ৪ লক্ষ ৫০ হাজার) ও মোট হারানো কার্যদিন সংখ্যাও (৫০ লক্ষ — ৭৫ লক্ষ) বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মোট ধর্মঘট সংখ্যা হ্রাস পাওয়া (৪০৬ থেকে ৩২২) সত্ত্বেও ধর্মঘটের শরিক ও হারান কার্যদিনের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে তখন ধর্মঘট

অধিকতর সংগঠিত হওয়ার এবং শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম অটলতর হয়ে উঠার প্রমাণ মেলে।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন যথারীতি এইসব গণ-আন্দোলন দমনে নির্যাতন চালাত। ইতিপূর্বে আইনী হিসাবে প্রকাশিত কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলি অতঃপর বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির সাময়িকীগুলির ক্ষেত্রেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। তদুপরি শ্রমিক এবং কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তারও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এসবই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিরোধে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন অংশের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আনুষ্ঠানিক আহবান জানান হয়। কংগ্রেসভুক্ত ১৯৫টি ট্রেড ইউনিয়নের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল সাধারণ শ্রমিক ও বাবু-কর্মী সহ ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার। অধিকাংশ মজুরি শ্রমিক তখনো সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাহিরে থাকলেও এতে ইতিপূর্বে বিদ্যমান ভাঙ্গন দূরীকরণ ছিল ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

এই কালপর্বে কেবল শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিই নয়, ভারতের ভাষাভিত্তিক অঞ্চল গঠন, তথাকথিত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ — মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র ও কেরালা (বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি একত্রিত করে) পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনও তার উদ্যোগ তীব্রতর করেছিল। আসাম ও বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলা ভাষাভাষী এলকাগুলিকে বাংলাভুক্ত করার একটি আন্দোলনও সেখানে শুরু হয়েছিল।

এইসব আন্দোলনের মধ্যে ভারতের বড় বড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলির জাতীয় চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এটি ছিল বিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকের জাতীয় সংহতিমূলক অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলি বিকাশের ফলশ্রুতি।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্মে পশ্চিম সীমান্তে জার্মানির সাফল্য ব্রিটিশের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এই অবস্থা যথাক্রমে ভারতের পরিস্থিতিকেও প্রভাবিত করেছিল।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পুনা অধিবেশনে ব্রিটিশের যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থন জানানোর শর্তগুলি পুনরুল্লিখিত হয়েছিল: (১) যুদ্ধশেষে ভারতকে স্বাধীনতা দান সম্পর্কিত ব্রিটিশ ঘোষণা; (২) একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন।

ব্রিটিশের চরম সামরিক ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে আগস্ট মাসে এই প্রস্তাবগুলি

ভাইসরয়ের কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কিছু কিছু সুবিধালাভের আশায় ব্রিটিশের উপর নতুন চাপসৃষ্টির প্রয়াস পান। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার জাতীয় আন্দোলনের উপর সর্বাত্মক আঘাত হানার সুবর্ণ মুহূর্তের অপেক্ষায় কেবল কালক্ষয় করছিল।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করেন। এটি ছিল 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহভিত্তিক': জনসমক্ষে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা অথবা শান্তির সপক্ষে স্লোগান দেয়ার জন্য গান্ধী জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছিলেন। এজন্য নির্বাচিত সক্রিয় কংগ্রেস কর্মীদের তালিকাটি পুলিশের হস্তগত হয় এবং তারা সম্ভাব্য সত্যাগ্রহীদের ক্রমান্বয়ে গ্রেপ্তার করে চলে। এভাবে প্রায় ২০ হাজার কংগ্রেসকর্মী কারাবরণ করে। অতঃপর ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের শেষপর্বের আগে পার্টির পক্ষে আর কোন ফলপ্রসু কার্যচালনা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

একমাত্র ভারতের অভ্যন্তরীণ বিপ্লবী শক্তির সাহায্যে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ এবং ব্রিটিশের আশু চূড়ান্ত সামরিক পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত সুভাষচন্দ্র বসু তখন নাৎসি জার্মানি ও তার মিত্রশক্তির উপর স্বীয় আশা ন্যস্ত করেন। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের বসন্তে তিনি বেআইনীভাবে ভারত-আফগান সীমান্ত পেরিয়ে প্রথমে বার্লিনে ও শেষে জাপান পৌঁছন। ব্রিটিশের শত্রুপক্ষ ভারতকে বিদেশী আধিপাত্য থেকে মুক্ত করবে, তিনি এমন একটি সরল বিশ্বাসেরই বশবর্তী হয়েছিলেন।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের 'আগস্ট বিপ্লব' ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে দেশের পরিস্থিতি। ক্রিপ্‌স মিশন

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে নাৎসি জার্মান কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদানের ফলে যুদ্ধের চারিত্র্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এইসব ঘটনাবলী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত পদক্ষেপকেও প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি তখন ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরের আহ্বান জানায়। ফলত, তারা অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে বাধাসৃষ্টির বিরোধিতা

করে। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সদস্য এবং কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দল, বিশেষত ত্রত্স্কিপন্থীদের সঙ্গে তীব্র ভাবাদর্শগত সংগ্রাম দেখা দেয়।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যুদ্ধের তাৎপর্য ও ব্রিটিশের যুদ্ধোদ্যোগের ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যায় মতবৈষম্যের ফলে মানবেন্দ্রনাথ, ভি. বি. কার্ণিক প্রমুখদের নেতৃত্বাধীন বাঙ্গালীপ্রধান বামপন্থী র‍্যাডিকাল অংশটি এই সংগঠন ত্যাগ করে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসত্যাগী এইসব নেতারা 'ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশন' নামে একটি নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আরও ভাঙ্গন সৃষ্টির নামান্তর।

জাতীয় আন্দোলনে বর্ধমান ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক মতবৈষম্য, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাঙ্গন এবং জাতীয় আন্দোলনের বহুসংখ্যক নেতার গ্রেপ্তার — এসবই শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক আন্দোলনের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলত, আগের বছরের তুলনায় ধর্মঘট আন্দোলনের সাফল্য যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ জাপানের জঙ্গী সরকার যুদ্ধে যোগদান করলে ব্রিটেনের এশীয় উপনিবেশগুলি আক্রান্ত হওয়ার নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। এশিয়ার স্ট্রাটেজিক পরিস্থিতির এই পরিবর্তন এবং বিদেশ থেকে ব্রিটিশ সরকারের উপর প্রত্যক্ষ চাপসৃষ্টির ফলে ঔপনিবেশিকরা ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক কৌশলী উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য হয়।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অধিকাংশ বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়; পরের বছর মার্চ মাসে কংগ্রেস নেতাদের কাছে নতুন ব্রিটিশ প্রস্তাব সহ স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স, বিশেষ দূত হিসাবে ভারতে আসেন। এই প্রস্তাবের মর্মবস্তু ছিল: (১) যুদ্ধকালে ভারতে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে, কিন্তু যুদ্ধশেষে এটি ডোমিনিয়ন হবে; (২) যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন মাধ্যমে একটি সংবিধান-সভা গঠন করা হবে এবং এতে দেশীয় রাজন্যবর্গের মনোনীত প্রতিনিধিরাও থাকবে আর এই পরিষদ ডোমিনিয়নের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে; (৩) কতকগুলি প্রদেশ ও এলাকা স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসাবে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে।

ব্রিটিশ শাসকচক্র কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশকে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করার ইচ্ছাটি এই দলিলেই প্রথম সূত্রবদ্ধ হয়েছিল।

কংগ্রেস নেতাদের উপর ক্রিপ্সের যথাসম্ভব চাপসৃষ্টি সত্ত্বেও (অন্যান্য রাজনৈতিক দলের, বিশেষত সাম্প্রদায়িক সংগঠনের নেতাদের মাধ্যমে) কংগ্রেস এই প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ক্রিপ্স মিশন ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ও দ্রুত সেটি দখল করলে যুদ্ধ একেবারে ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে পেঁছয়। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সৈন্যের পরাজয়, সেখানে ইঙ্গ-ভারতীয় কয়েকটি বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং ভারতে ব্রিটিশের সন্ত্রস্ত পাশ্চাদপসরণ জাপানী আক্রমণের মুখোমুখি দেশরক্ষায় ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের প্রস্তুতির দুর্বলতাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল আর সেইসঙ্গে তা বিদ্যমান রাজনৈতিক চাপও বৃদ্ধি করেছিল।

এই পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেস সক্রিয়তর ধরনের এক সংগ্রামে তার কৌশল পরিবর্তন করে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'হরিজন' নামক সাপ্তাহিকীতে লিখিত একটি প্রবন্ধে গান্ধী এই প্রথম 'ভারত ছাড়ো' স্লোগানটি ব্যবহার করেন। এটি ছিল ভারতকে আশু স্বাধীনতা দানেরই আহ্বান। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্ধা (বোম্বাই প্রদেশ) বৈঠকে ৬ জুলাই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ভারতরক্ষা সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে 'ভারত ছাড়ো' দাবিটিও অনুমোদিত হয়।

এই প্রস্তাব মোতাবেক গান্ধী কংগ্রেসের দাবি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেন যাতে অহিংসার সীমানা অতিক্রমও বৈধ হবে। ঘোষণাটি ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হুমকিস্বরূপ।

এই বছর ৭ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বোম্বাই অধিবেশনে একটি নতুন আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী দুদিনের মধ্যে বলপূর্বক ঔপনিবেশিক সরকার উৎখাতের একটি ষড়যন্ত্রের অজুহাতে গান্ধী সহ সকল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগটি ছিল মিথ্যা পুলিশী সাক্ষ্যনির্ভর একটি বানানো ব্যাপার। অতঃপর সরকারীভাবে কংগ্রেসের যাবতীয় কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়।

জাপানী আক্রমণ আশঙ্কার মুখোমুখি জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশবিরোধী গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে দেশের নানা স্থানে অসংখ্য বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধর্মঘট (বা হরতাল) পালিত হয়। সাধারণত কংগ্রেসী বামপন্থীদের নেতৃত্বে যুবকরা এইসময় শত শত রেলস্টেশন, পোস্ট-অফিস ও থানার উপর আক্রমণ চালায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করে এবং সড়ক ও রেলের পুল উড়িয়ে দেয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় ব্যাপক পরিসরে এই ধরনের কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়। বালিয়া ও আজমগড় জেলায় (যুক্তপ্রদেশ) ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পিটুনি বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকরা রীতিমত গেরিলা যুদ্ধ চালায়।

কিন্তু এই কর্মকাণ্ডগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের, সমন্বয়হীন, এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণবর্জিত। সামান্য অস্ত্রসজ্জিত বিদ্রোহীদের পক্ষে ঔপনিবেশিক সরকারের সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর আক্রমণ মুকাবিলা সম্ভবপর ছিল না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছিল: এতে ২ হাজারের বেশি নিহত এবং প্রায় ৬০ হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সরকার বহু স্থানে বন্দীশিবির স্থাপন করে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের আটক রেখেছিল।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের 'আগস্ট বিপ্লব' শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু এতে জাতীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল: এর সদস্যরা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও তারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেছিল।

এই ক্রান্তিলগ্নে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামও যে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানেই তা সহজলক্ষ্য: ধর্মঘট সংখ্যা ৬৯৪ (১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ৩৫৯), ধর্মঘটীদের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৭২ হাজার (১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ২ লক্ষ ৯১ হাজার) এবং মোট বিনষ্ট কার্যদিন ৫৭ লক্ষ (১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ৩০ লক্ষ)।

যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা ও ওড়িষ্যায় তখন জমিদারবিরোধী কৃষক আন্দোলনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমবর্ধমান অবনতির পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক সংগ্রাম এগিয়ে চলছিল।

যুদ্ধের শেষপর্বে (১৯৪৩-১৯৪৫)
ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

পূর্ব ভারতের দুর্ভিক্ষ। কৃষক আন্দোলন

১৯৪৩ ও ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতের অনেকগুলি অঞ্চলে অজন্মার দরুন খাদ্যহ্রাস ঘটে ও ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে এই অবস্থা মারাত্মক হয়ে ওঠে। ১৯৪৩-১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের জন্য স্থানীয় উৎপাদন ঘাটতি অপেক্ষা ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্বল বণ্টনব্যবস্থা এবং অজন্মা সত্ত্বেও অব্যাহত শস্যরপ্তানিই অধিকতর দায়ী। এই সময় ভারতের ৪০ লক্ষ টন শস্যঘাটতি সত্ত্বেও ১০ লক্ষ টন শস্য রপ্তানি করা হয়।

শস্যের দর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি যুদ্ধপূর্ব স্তরের দশগুণেরও উপরে পৌঁছয়। এই দরবৃদ্ধির প্রথম বলি ছিল গ্রামের গরীব সহ

ভারতীয় সমাজের দরিদ্র মানুষ। গ্রামাঞ্চলে কৃষকের ব্যাপক দারিদ্র্য ছিল মহাজনদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণগ্রহণ এবং প্রচুর জমিজমা মহাজন ও জমিদারদের কুক্ষিগত হওয়ারই নামান্তর।

এই দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। যুক্তপ্রদেশ ও পূর্ব ভারতের এক বৃহৎ এলাকায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলগ্রস্ত হওয়ায় এই অঞ্চলে তখন কৃষক আন্দোলনে মন্দাভাব দেখা দেয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চল, তামিলনাড়ু ও কেরালা এই সময় কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সেখানে এবং পরবর্তীকালে বাংলায় কৃষক আন্দোলন নতুন পথে অগ্রসর হতে থাকে: কৃষকরা জমিদারের পতিত জমি চাষ করতে শুরু করে ও তাদের শস্যগোলা দখল করে নেয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসম্মত করার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর দ্বারা এই গণ-আন্দোলনের বিকাশ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৪২-১৯৪৫)

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসিদ্ধ করে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালের পর যুদ্ধসম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই এই বর্তনাটি ব্যাখ্যেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট কর্তৃক যুদ্ধের' স্লোগান উপস্থাপন এবং সারা দেশে অস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা দানের প্রেক্ষিতে এই পার্টির কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ করার ফলে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের অন্ধকারতম যুদ্ধবর্ষে মিত্রবাহিনীর এশীয় পশ্চাদভূমির অবস্থান যথেষ্ট মজবুত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকচক্রের অনুসৃত এই পদক্ষেপের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যও ছিল: এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এর ফলস্বরূপ জাতীয় আন্দোলনে ভাঙ্গন সৃষ্টির, নবপর্যায়ে আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর আশা পোষণ করেছিল। এভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বস্তুত এক কঠিন অবস্থায় মুখোমুখি হয়েছিল এবং একদিকে ফাসিস্ট জোটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ জাতিগুলির স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের পক্ষসমর্থনের অনুকূল একটি বিচক্ষণ কর্মনীতি উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিল।

কংগ্রেসের ব্যতিক্রমী হিসাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ যুদ্ধোদ্যোগে

তার সমর্থনের জন্য দায়িত্বশীল সরকার গঠন ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সুবিধাদানের কোন শর্ত উপস্থাপিত করে নি। অবশ্য, এই পার্টি তখনো সমগ্র জাতির প্রধান দাবি, বিশেষত জাতীয় সরকার গঠনের দাবির পক্ষে তার সমর্থন অটুট রেখেছিল। ফ্যাসিবাদ ও জাপানী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই ব্যবস্থাই যে ভারতে বিদ্যমান সম্পদের পূর্ণতর ব্যবহারের পূর্বশর্ত, পার্টি তা স্পষ্টতই দেখিয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের জন্য জাতীয় আন্দোলনভুক্ত বিভিন্ন শক্তির ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদাই অনুকূল মত ব্যক্ত করত। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

এই বিশেষ পর্যায়ে, পার্টির রাজনৈতিক বনিয়াদ ও অনুসৃত কর্মনীতি উভয়তই কিছু কিছু ভুলত্রুটি ঘটেছিল (পরবর্তীকালে পার্টিকর্তৃক স্বীকৃত) যা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির ঐক্যের বদলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'আগস্ট বিপ্লব' সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সহ ভারতের মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতে সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের লাহোর প্রস্তাবকে সমর্থন দিয়েছিল। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাবে গান্ধী সহ সকল নেতার মুক্তিদান, নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ বন্ধ, জাতীয় কংগ্রেসকে বৈধকরণ ও অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিগুলি উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যবর্গ ও কংগ্রেস নেতাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমাবনতি ত্বরিত হয়েছিল। ১৯৪২-১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গণসংগঠনগুলিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব যথেষ্ট সংহত ও বিস্তৃত হওয়ার নিরিখেও এই ঘটনাবলী অংশত ব্যাখ্যেয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ বৈধকরণের প্রথম মাসগুলিতেই পার্টিসদস্যরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তখনো কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক সদস্য জেলে। ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে দেশের বিভিন্ন অংশে আগস্ট আন্দোলনে অল্পবিস্তর শরিকানার জন্য পার্টির বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাসত্ত্বেও বৈধকরণের ফলে পার্টির কার্যকলাপের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিগত মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। সেই অবস্থায় পার্টির পত্রিকাগুলির নিয়মিত প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছিল।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসের পর পার্টি 'পিপল্‌স্‌ ওয়ার' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক (পরে ১১টি ভারতীয় ভাষায়) প্রকাশ শুরু করে। এটি ছিল বস্তুত পার্টির যৌথ কার্যকলাপ সমন্বয়ের হাতিয়ার। বোম্বাইয়ে পার্টিকেন্দ্রের

প্রকাশনা সংস্থা তখন বহু প্রচারপুস্তিকা ও অন্যান্য বইপত্র প্রকাশ করত। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এই সংবাদপত্রের পাতায় সারা দেশের শ্রমিক, কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হত। তদুপরি কাগজটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন ফ্রন্টের পরিস্থিতি এবং ফ্যাসিস্ট হামলাকারীদের বিরুদ্ধে লালফৌজের বীরোচিত সংগ্রামের খবরাদি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করত। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রটির উপর ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কোপদৃষ্টি পড়েছিল: জরিমানা, কপি বাজেয়াপ্ত, ছাপাখানা ও সম্পাদনা দপ্তর খানাতল্লাস, পার্টি-কাগজপত্র বিলিকারীদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি পার্টির ছাপাখানার উপর হামলা সহ এটি পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু এইসব চেষ্টা সত্ত্বেও 'পিপল্‌স্ ওয়ার' মেহনতি মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ধারণাবলী প্রচার অব্যাহত রেখেছিল।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে বোম্বাইয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন পার্টির অনুসৃতব্য কার্যপ্রণালী সূত্রবদ্ধ করা সহ পূরণচাঁদ যোশীর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করে। পার্টির বৈধ কার্যকলাপের প্রথম বছরেই পার্টির সদস্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি (১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৪ হাজার থেকে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের মধ্যে ১৬ হাজার) পেয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে সদস্যসংখ্যা ও পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে পার্টি সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে ৩০ হাজার থেকে ৫৩ হাজারে পেঁছিয়।

১৯৪৩-১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের গণ-আন্দোলন

নিজের গণসমর্থন বৃদ্ধিই অতঃপর কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও অন্যান্য গণসংগঠনে তাদের প্রভাব অবশ্য কংগ্রেস এবং সর্বোপরি কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তথা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২০তম অধিবেশনে (১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে নাগপুরে) জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ও কমিউনিস্ট, কারও উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রস্তাবই সংগঠনের সনদ অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায় নি। এই ঘটনার মধ্যে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রধান দলগুলির মধ্যে একটি নতুন 'শক্তিস্থিতির' বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ডাঙ্গে সংগঠনের সভাপতি এবং কমিউনিস্ট দরদী গণতন্ত্রী এন. এম. যোশী পার্টির

সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মধ্যেই কমিউনিস্টদের অবস্থান ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল এবং ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের ভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল: ১৯৪১-১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের তুলনায় ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে হারান কার্যদিনের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২৩ লক্ষ ও ৩৪ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এই দুই বছরের ধর্মঘটে ৫ লক্ষের সামান্য কিছু বেশি শ্রমিক ও বাবু-কর্মী যোগ দিয়েছিল।

স্বল্পস্থায়িত্ব এই দুই বছরের ধর্মঘটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের জন্য ১৯৪৩-১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ-বছরের কঠিন পরিস্থিতি এবং ঔপনিবেশিকদের অনুসৃত শ্রমিকবিরোধী নীতির জন্যই অংশত এটি ঘটেছিল। ১৯৪২ ও ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতরক্ষা আইনের এক সংশোধনী বলে ধর্মঘট কার্যত বেআইনী হয়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের সুপারিশ মোতাবেক শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক, বিশেষত শ্রম-আইন সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছিল: কর্তৃপক্ষের ১০ এবং মালিকের ৫ ও ট্রেড ইউনিয়নের ৫ জন প্রতিনিধি সহ এতে ২০ জনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপক্ষীয় শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু সরকারের সরাসরি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ধর্মঘট চলছিল এবং যুদ্ধের শেষ নাগাদ ধর্মঘট আন্দোলনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল। ফটকাবাজদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও দরবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের জন্য বোনাসের দাবি সম্বলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই শ্রমিক শ্রেণী অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাচ্ছিল। এই সময় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল: ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ২৫৯টি থেকে ৫৭৫টিতে এবং এগুলির সদস্যসংখ্যা ৩ লক্ষ ৩২ হাজার থেকে ৫ লক্ষ ৯ হাজারে পৌঁছয়।

ইতিমধ্যে সারা ভারত কিষান সভার অনুমোদিত কৃষক সমিতিগুলিতে কমিউনিস্টরা তাদের প্রভাবও বৃদ্ধি করছিল। ১৯৪১-১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রথমে সমাজতন্ত্রী ও ফরয়ার্ড ব্লক সদস্যরা কিষান সভা পরিত্যাগ করে এবং শেষে এন. জি. রঙ্গ পরিচালিত এর দক্ষিণপন্থী দলটিও পূর্বোক্তদের অনুসরণ করে। এই ভাঙ্গনের ফলে কিষান সভার সদস্যসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়: যুদ্ধের প্রাক্কালীন ৮ লক্ষ থেকে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে সংখ্যাটি ২ লক্ষ ২৫ হাজারে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কমিউনিস্ট এবং কোন পার্টি-সংশ্লিষ্ট নয়, অথচ কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক এই

ধরনের গণতন্ত্রীদের (ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, এস.এস. সরস্বতী ও কার্যানন্দ শর্মার মতো প্রাজ্ঞ কৃষক নেতাদের পরিচালনাধীন) অনমনীয় সাংগঠনিক কার্যাদির ফলে কৃষক সমিতির প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কৃষক সাধারণের ব্যাপক স্তর, বিশেষত ক্ষুদ্র চাষী বা রায়ত-চাষীদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় কিষান সভার সক্রিয় উদ্যোগের জন্যও অংশত এটি ঘটেছিল। অচিরেই পুনরায় কিষান সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে: ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে এটি ৮ লক্ষ ২৫ হাজারে পেঁছয়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে নেত্রকোণায় (বাংলার ময়মনসিংহ জেলা) অনুষ্ঠিত পরবর্তী সম্মেলনে অন্যতম প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজাফ্ফর আহ্মদ কিষান সভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৪৩-১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কৃষক আন্দোলন বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল—বাংলা, বিহার, পঞ্জাব, মাদ্রাজের তাঞ্জোর, উত্তর মাদ্রাজের তেলেগু ভাষাভাষী অন্ধ্র এলাকা, মালয়ালম অধ্যুষিত মালাবার উপকূলে। এইসব সংগ্রামের সক্রিয়তম শরিক ছিল রায়ত-চাষীরা এবং তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক ভোগদখলের শর্ত পরিবর্তনের দাবিই শুধু নয়, তারা খোলাখুলিভাবে চাষযোগ্য জমি দখলও শুরু করেছিল।

শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষান সভার সক্রিয় উদ্যোগ এবং ততোধিক কমিউনিস্ট পরিচালিত যুব (ছাত্র) ও মহিলা সংগঠনের ব্যাপক কার্যকলাপের ফলে কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদের বহুসংখ্যক বামপন্থী কর্মী ক্রমশ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণে সম্মত হয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে বিশেষভাবে অন্ধ্র, কেরালা এবং যুক্তপ্রদেশেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল।

যুদ্ধশেষে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

দমনমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও গণ-আন্দোলনের অব্যাহত কার্যকলাপ এবং গণসংগঠনে বামপন্থীদের অবস্থান মজবুতের ফলে যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। সকলের অপ্রিয়ভাজন ভাইসরয় লর্ড লিন্লিথ্গোর স্থলে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়াভেল ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৬ মে গান্ধী সহ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়।

রাজনৈতিক উদ্যোগ নিজেদের হস্তগত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতের যুদ্ধপরবর্তী সমঝোতার শর্তাদি নির্ধারণের জন্য ওয়াভেলের মাধ্যমে গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে একপ্রস্থ আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করে। এই আলোচনা চলাকালে ব্রিটিশরা জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আরও ফারাক বৃদ্ধিতে সফল হয়।

জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য জনমতের চাপের ফলে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও একপ্রস্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। লিবারেল ফেডারেশনের নেতা তেজবাহাদুর সপ্রুর নামাঙ্কিত তথাকথিত 'সপ্রু কমিটি' এবার দুই দলের মধ্যগ হিসাবে কাজ করে।

কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তখন জিন্নাকে যেসব প্রস্তাব পাঠান সেগুলির মর্মবস্তু ছিল: (১) কেবল স্বাধীনতা লাভের পরই জাতীয় কংগ্রেস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সম্মত হবে; (২) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে; (৩) দেশের চূড়ান্ত রাজনৈতিক মীমাংসা না হওয়া অবধি গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগকে অবশ্যই যোগ দিতে হবে।

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের এক প্রস্তাবে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য জিন্নাকে ক্ষমতা দেয়া হয়। দুই নেতার মধ্যে পত্রমাধ্যমে আলোচনা চলে (১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২১-২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)। স্বাধীনতা লাভের আগেই রাজনৈতিক মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে পাকিস্তান সূত্রটি গ্রহণে জিন্নার অনমনীয় দাবির প্রেক্ষিতে আলোচনাটি ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধস্তন সংগঠনগুলিতে সমঝোতার দাবি ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠার প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী খাঁ এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসের পার্টিনেতা ভোলাভাই দেশাইয়ের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ভারতের ভাবী সরকার গঠনের আনুষঙ্গিক নিম্নোক্ত শর্তাবলী উল্লিখিত ছিল: (১) উভয় দলের আসন সংখ্যা ৪০ শতাংশ হবে; (২) অবশিষ্ট আসনগুলি 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের' (খ্রীস্টান, তপশিলী, শিখ ও পারসী) জন্য নির্দিষ্ট থাকবে; (৩) একজন ব্রিটিশ সেনাপতি সৈন্যবাহিনীর প্রধান থাকবেন; (৪) দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর ভারতবিভাগ এবং আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি মীমাংসিত হবে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে নতুন ও চূড়ান্ত এক সংগ্রামের মুখোমুখি এই উদ্যোগের ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির সংহতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপর্যায়
(১৯৪৫-১৯৪৭)

১৯৪৫-১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের গণ-আন্দোলন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক কৌশল

যুদ্ধশেষে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক কারণ ভারতের ঘটনাবলীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছিল: যথা, নাৎসি ও তার সহযোগীদের পরাজয়, ফ্যাসিস্ট হামলাকারীদের উৎখাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্ষমতাবৃদ্ধি, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মুক্ত মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে জায়মান বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক শক্তির বর্ধমান সংহতি। যুদ্ধকালে আফ্রিকা ও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির দুর্বলতা পুরো সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ব্যাপক সংকটকেই প্রতিফলিত করেছিল।

জাপানী হামলাকারীদের উৎখাতের সংগ্রাম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ, ফরাসি ও ওলন্দাজ বুর্জোয়াদের ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ খোদ ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও আমূল পরিবর্তনের বেগ সঞ্চারিত করেছিল।

দেশে বর্ধমান শ্রেণীগত এবং জাতীয় দ্বন্দ্বগুলি যুদ্ধকালে সংঘটিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল।

জাতীয় বুর্জোয়ার শক্তিবৃদ্ধি

যুদ্ধ-উৎপাদন সম্প্রসারণ ভারতীয় শিল্পের উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যুদ্ধপূর্ব উৎপাদনের তুলনায় ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে মোট শিল্পোৎপাদন ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও সামরিক ফরমাশের সঙ্গে যুক্ত শিল্পগুলি (ধাতুশিল্প, তুলা ও রাসায়নিক শিল্প) সরাসরি বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল তবু ভারতে অবস্থানরত ৫ লক্ষ সৈন্যের ব্রিটিশ বাহিনীর চাহিদালগ্ন শিল্পখাতগুলির (যেমন খাদ্য সরবরাহ) ক্ষেত্রেও যুদ্ধ শুভ ফল ফলিয়েছিল। তদুপরি যুদ্ধবিভাগ থেকে ফরমাশ পাওয়ায় বড় বড় কারখানা, মানুফাকচ্যারিং এবং কুটিরশিল্পগুলিও যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছিল।

সামরিক ফরমাশের দৌলতে ভারতীয় বুর্জোয়ারা বড় আকারের মুনাফা সঞ্চয়

করেছিল। ভারতের জয়েণ্ট-স্টক ব্যাঙ্কগুলিতে তাদের মোট সঞ্চয় যুদ্ধশুরুর পর কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময় ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের জন্যও কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদক, কারিগর ও কুটিরশিল্পীদের শোষণের মাধ্যমে যথেষ্ট পুঁজিসঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

নিজ অর্থসম্পদ বৃদ্ধির পর ভারতীয় ব্যবসায়ীরা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে চা-বাগান, পাটশিল্প প্রভৃতি এককালীন ব্রিটিশ পুঁজির একাধিপত্যের এলাকাগুলিতে অনুপ্রবেশ করছিল। রাসায়নিক শিল্প, মোটর শিল্পের মতো প্রধান শিল্পক্ষেত্রগুলিতে ভারতীয় ব্যবসায়ের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির উদ্যোগে ক্রমাগত অধিক সংখ্যক মিশ্র কোম্পানি গঠন শুরু হয়েছিল। টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া-জৈন ও অন্যান্য ভারতীয় একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি ব্রিটিশ একচেটিয়াদের অধস্তন শরিক হয়ে উঠছিল। ভারতীয় বড় বড় বুর্জোয়ারা দেশীয় রাজ্যগুলিতে (বরোদা, গোয়ালিয়র, মহীশুর, জয়পুর) সক্রিয়তর অনুপ্রবেশের উদ্যোগ সহ সেইসব দেশের রাজাদের সেখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করছিল।

ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের দুর্বলতা বৃদ্ধি এবং ভারতে ব্রিটিশ ও মার্কিন স্বার্থের দ্বন্দ্ব

ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির অবস্থান কিছুটা দুর্বল হওয়ার ফলেই ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ব্রিটিশশাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য উভয়তই ভারতীয় বুর্জোয়াদের অবস্থান মজবুত হয়েছিল। যুদ্ধকালে ব্রিটিশ পুঁজির স্বদেশ-স্থানান্তর ত্বরিত হয়েছিল এবং তা বাণিজ্য ও শিল্পের কয়েকটি খাতে তার একচেটিয়া আধিপত্যও হারিয়েছিল।

ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে আর্থিক সমঝোতার ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় সামরিক ফরমাশের অর্থশোধ সম্পর্কে একটি বিশেষ ইঙ্গ-ভারতীয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের বিশেষ হিসাবে নথিভুক্ত করে এগুলি ব্রিটিশ সরকারকে ঋণ হিসাবেই দেয়া হয়। এভাবে ব্রিটেনের বাজেটের উপর বাড়তি ভার এড়িয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা যুদ্ধকালে ভারতের জনশক্তি ও সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করেছিল। এইসঙ্গে ব্রিটেনের কাছে ভারত সরকারের উনিশ শতকী 'ঋণ' ভারতের স্টারলিং সঞ্চয়ের অংশ হিসাবে অবলোপন করা হয়েছিল। এই ঋণের মধ্যে ঔপনিবেশিক যুদ্ধব্যয় ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ব্রিটিশ সরকার এগুলিকে ভারতের খরচা হিসাবে ধরেছিল। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে যে আটকে পড়া স্টারলিং সঞ্চয় ১০০ কোটির বেশি স্টারলিং পাউণ্ডে পৌঁছেছিল তা যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে প্রভাবিতকরণে ব্যবহৃত হতে

পারত। যাহোক বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার অস্তিত্ব এবং ভারতের 'ঋণ' বাতিল অনিবার্যভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অবস্থান মজবুত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন পুঁজিপতিরা ব্রিটেনের তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে তাদের স্বার্থানুকূল্যে ব্যবহার এবং জাপানী প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে সম্ভাবনাশীল ভারতীয় বাজারের সর্বত্র অনুপ্রবেশের উদ্যোগ নিয়েছিল। যুদ্ধকালে ভারতে প্রেরিত মার্কিন অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল মিশনের মাধ্যমে এবং ল্যাণ্ড-লিজ সরবরাহ ও অন্যান্য সূত্রে মার্কিন বুর্জোয়ারা এই দেশের অর্থনীতির একটি সম্পূর্ণ নিরীক্ষা সহ ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। যুদ্ধশেষে ভারতীয় রপ্তানি ও আমদানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশভাগ যথাক্রমে ৮ থেকে ২১ শতাংশে ও ৬ থেকে ২৫ শতাংশে পৌঁছেছিল। ভারতীয় বাজারে ব্রিটেন ও আমেরিকার বর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্রিটিশ একচেটিয়াদের বিপরীতে ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল।

সামরিক ফরমাশ প্রাপ্তির দৌলতে ধনী হয়ে ওঠা ভারতীয় বুর্জোয়ারা (বিশেষভাবে ঊর্ধ্বতন স্তরগুলি) ঔপনিবেশিক সরকারের অন্তর্লীন দমনমূলক বিধিনিষেধ সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিল, যেজন্য তাদের পক্ষে ইতিমধ্যে সঞ্চিত পুঁজি খাটান অসম্ভব হয়ে উঠেছিল এবং তা ভারতীয় পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থাগুলির অবাধ বিকাশে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে শিল্পোৎপাদনে ঘাটতি শুরু হলে এই দ্বন্দ্ব প্রকটতর হয়েছিল।

বর্ধমান শ্রেণীসংঘাত

সামরিক ফরমাশ বন্ধের ফলে উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়, বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যাপক ছাঁটাই শুরু হয়। শিল্পোদ্যোগীরা দরবৃদ্ধির মুখোমুখি বোনাস ও মাগ্যিভাতা দিতে অস্বীকার করে ও তাদের ক্ষতির বোঝা শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপাতে চায়। বাজারের ঘাটতির দরুন ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে কারিগর ও মানুফ্যাকচারিং সংস্থার শ্রমিকরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ১৯৪৩-১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ব্যাপক সংখ্যক গ্রামত্যাগী বুভুক্ষু মানুষ শহরের বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করার ফলে মজুরি-শ্রমিকের অবস্থার উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল।

১৯৪৪-১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের কৃষিবর্ষে খাদ্যশস্য ও শিল্পলগ্ন ফসলের উৎপাদন ঘাটতির দরুন কয়েক ধরনের কাঁচামালের অভাব দেখা দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তখন ১০ কোটি মানুষের এলাকায় আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা স্বীকার করেছিল। খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ঘাটতিজনিত দর ও ফটকাবাজি বৃদ্ধির ফলে শহর ও গ্রামের

শ্রমিক, কেরানী ও মেহনতিদের অন্যান্য স্তরগুলি ক্রমেই অধিকতর আর্থিক অনটন ভোগ করছিল।

জনগণের বৃহত্তম অংশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি শ্রেণীসংঘাত বৃদ্ধি করেছিল। ব্যাপক গণ-অসন্তোষের পরিবেশে গণসংগঠনগুলির বর্ধমান তৎপরতা দেশে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলেছিল।

অতঃপর ঔপনিবেশিক শাসন উৎখাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের সকল স্তরের সমর্থন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এজন্য দেশের শ্রেণী-সংগ্রাম ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈশিষ্ট্য অর্জন করছিল। এই সময় সামন্ত ভূস্বামী, রাজন্যবর্গ ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া ছাড়া ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের আর কোন সমর্থক ছিল না।

ভারতে ব্রিটিশ নীতি: ১৯৪৫

ভারতে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় ব্রিটিশ শাসকচক্র দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল — জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতানৈক্যের উপরই তাদের আশা ন্যস্ত রেখেছিল। লন্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ওয়াভেল ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে ভাইসরয়ের অধীনে একটি কার্যকরী পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। জুন মাসে তাঁর গ্রীষ্মাবাস সিমলায় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর আগেই জেল থেকে জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আজাদকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তাঁরা গান্ধীর সঙ্গে এই বৈঠকে যোগ দেন।

বৈঠকে ওয়াভেলের কার্যকরী পরিষদ গঠনের উপস্থাপিত প্রস্তাবটি ছিল দেশাই-লিয়াকত চুক্তি-সূত্রেরই প্রায় অনুরূপ। তবে ওয়াভেলের এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের আসনগুলি রাজনৈতিক দলের বদলে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট রাখার প্রস্তাব ছিল। দুটি দলের কাছেই এটি গ্রহণীয় ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস নিজেকে হিন্দু সংগঠনের বদলে সারা দেশের একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসাবেই দেখত। অন্যপক্ষে মুসলিম লীগ নিজেকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন হিসাবে দাবি করার ফলে তার কাছে কার্যকরী পরিষদে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে কোন মুসলমানের নির্বাচন গ্রহণীয় ছিল না। তদুপরি প্রস্তাবিত এই কার্যকরী পরিষদ কেবল ব্রিটিশ সম্রাট ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছেই দায়ী ছিল।

সিমলার বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যথারীতি ঔপনিবেশিক সরকার আলোচনার শরিক রাজনৈতিক দলগুলিকেই এজন্য দায়ী করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যেকার মতবৈষম্য বৃদ্ধি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পর্কের সার্বিক অবনতির প্রেক্ষিতেই এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখার পরিকল্পনা করেছিল।

যুদ্ধোত্তর প্রথম নির্বাচনে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনে লেবর পার্টির জয়লাভের পর গোড়ার দিকে ভারতে ব্রিটিশ নীতির কোনই উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটে নি। এই বছর জুলাই মাসে ওয়াভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠান হয় এবং তিনি ফিরে আসার পর অ্যাটলি সরকার যুগপৎ লণ্ডন ও দিল্লী থেকে (১৯৪৫ খ্রীঃ, ১৯ সেপ্টেম্বর) তার ভারত-নীতি ঘোষণা করে। এতে বলা হয়: লেবর সরকার ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলী বাস্তবায়িত করবে এবং এইসঙ্গে ১৯৪৫-১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতাবিরোধী ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ফলে অচিরেই ব্রিটিশ সরকার তার মূল পরিকল্পনার ব্যাপক রদবদলে বাধ্য হয়।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালের এবং ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকের গণ-আন্দোলন

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি ধর্মঘট আন্দোলনে পুনরায় নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটে। তৎকালীন ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে এগুলিতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক চারিত্র্য প্রকটিত হচ্ছিল: শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম তখন ছাত্র ও মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনের কার্যকলাপের এই প্রবণতা থেকেই ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যেয়। এতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম প্রখ্যাত নেতা, কংগ্রেস সদস্য বরাহ্‌গিরি ভেঙ্কট গিরি কর্তৃক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে উত্থাপিত ভারতকে অচিরে স্বাধীনতা দানের দাবিটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এইসময় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ব্যাপক কার্যকলাপ শুরু হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কেবল সারা দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনাই নয়, ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের নির্ধারিত পথেও তার গতি পরিবর্তন করেছিল। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক উপদলগুলির সহযোগিতা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার

সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সকলের অগ্রণী এবং সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে তাদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভগুলি প্রায়ই সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপলাভ করছিল। পুলিশের সঙ্গে এই ধরনের প্রথম বড় সংঘর্ষ ঘটে আগস্ট মাসে বারাণসীতে। অতঃপর এর পুনরাবৃত্তি ঘটে বোম্বাইয়ে। কিন্তু এখানে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দালালদের প্ররোচনায় সংঘর্ষটি কয়েক দিন স্থায়ী এক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধোত্তরকালে এটিই ছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার প্রথম বড় সংঘর্ষ। প্রথমত এতে ইন্ধন যুগিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে সম্প্রতি গড়ে-ওঠা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা চালিয়েছিল।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে দুটি ঘটনার ফলে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা ঔপনিবশিকতাবিরোধী গণ-আন্দোলন বিকাশে সহায়তা যুগিয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণসংগঠনের একটি আবেদনের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ফরাসি ও ওলন্দাজদের পক্ষে ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যনিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা দেশে সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৫ অক্টোবর সারা দেশ রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে 'ইন্দোনেশিয়া দিবস' পালন করেছিল: এইসব দেশগমনেচ্ছু জাহাজে সামরিক মালবোঝাই করতে ডক-কর্মীরা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

নভেম্বর মাসে দিল্লীতে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র একদল অফিসরের বিচার শুরু হয়। ব্রহ্মদেশে বন্দী ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র এই সৈন্যদলটি গড়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র নিজে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ থেকে জাপান যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীরা ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার ফলে ভারতীয় জনগণ তাদের স্বাধীনতার অগ্রদূত মনে করত। সুভাষচন্দ্র বাংলায় বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর সংগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক তখনো সেখানে সক্রিয় ছিল। তিনি সারা দেশের 'নেতাজী' নামে খ্যাত হন।

ব্রিটিশ সামরিক ট্রাইবুনাল কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাধ্যক্ষ শাহ্ নওয়াজ খাঁ এবং আরও দুজন অফিসর দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় সারা দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই সময় কলিকাতায় অনুষ্ঠিত গণবিক্ষোভ এক সাধারণ ধর্মঘটের রূপলাভ করে এবং বিক্ষোভে শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, কারিগর সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে। সারা শহরে তখন অসংখ্য ব্যারিকেড গড়ে ওঠে। পরিবহণ ও মিউনিসিপাল কর্মীরা ধর্মঘটে শরিক হওয়ায় শহরের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। নভেম্বর

মাসের ২২ থেকে ২৫ অবধি পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অনেকগুলি সংঘর্ষে বহু বিক্ষোভকারী নিহত ও কয়েক শত আহত হয়। শরৎচন্দ্র বসু (নেতাজীর ভাই) সহ কংগ্রেস নেতাদের আবেদনের ফলেই কেবল শেষপর্যন্ত ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছিল। কলিকাতা থেকে এই প্রতিবাদ বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসরদের বিচার অব্যাহত রেখেছিল। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জনৈক মুসলিম অফিসর (রশীদ আলী) দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে কলিকাতায় গত নভেম্বরের ঘটনাবলীর ব্যাপকতর পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাঙ্গালী ছাত্রদল কর্তৃক ১১ ফেব্রুয়ারির আহূত হরতাল থেকে একটি নতুন সাধারণ ধর্মঘটের সূচনা দেখা দেয় এবং এটি পুলিশের সঙ্গে বহু সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি অবধি অব্যাহত থাকে। এবারও রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড তৈরি হয়। অতঃপর এই আন্দোলন কলিকাতা থেকে বোম্বাই সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু শহরে ছড়িয়ে পড়লে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্রিটিশরা সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ও জমায়েত বন্ধের জন্য বড় বড় সৈন্যদল পাঠাতে থাকে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সপক্ষে এই আন্দোলনে কেবল জাতীয় কংগ্রেসই নয়, মুসলিম লীগও সমর্থন যুগিয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধানোর যাবতীয় চেষ্টা কিন্তু এবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতির ফলে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে ধর্মঘটের আরও একটি নতুন জোয়ার দেখা দেয়। এবার দেশীয় রাজ্যগুলির শ্রমিকরাও ধর্মঘটে যোগদান করে। মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি ও গোয়ালিয়রের বস্ত্রকল শ্রমিকরা এই ধর্মঘটের শরিক হয়েছিল।

নিম্নোক্ত সারণীতে ধর্মঘট আন্দোলনের বিকাশ সহজলক্ষ্য:

বৎসর	ধর্মঘটের সংখ্যা	ধর্মঘটীদের সংখ্যা (লক্ষ)	হারানো কার্য-দিনের সংখ্যা (লক্ষ)
১৯৪৫	৮৫০	৮	৩৮
১৯৪৬ (প্রথম তিন মাস)	৪২৬	৫·৮	৩০

গ্রামাঞ্চলেও রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। সেই ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালেই ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে, সশস্ত্র

সংগ্রামের রূপলাভ করেছিল। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সৈন্যবাহিনীর কোন কোন অংশ আন্দোলনে যোগদান করার পরই রাজনৈতিক উদ্দীপনা তুঙ্গে পোঁছেছিল।

নৌবিদ্রোহ। ভারতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে 'তলোয়ার' নামের একটি প্রশিক্ষণ-জাহাজের নাবিকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিপূর্বে খারাপ খাদ্য সরবরাহের জন্য (বালুমেশান ভাত) তারা অনুযোগ করেছিল। অনুযোগকারীদের বিরুদ্ধে অফিসররা প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যোগী হলে ১৮ ফেব্রুয়ারি নাবিকরা একযোগে ধর্মঘট শুরু করে। পরদিন সেখানে নোঙর-করা ২০টি যুদ্ধজাহাজের সকল নাবিক এতে যোগ দেয়। ধর্মঘটী নাবিকদের দাবি ছিল: নৌবাহিনীতে সকল বৈষম্যের অবসান, ভারতীয় নাবিকদের জন্য ব্রিটিশ সহকর্মীদের মতো চাকুরি-শর্ত প্রবর্তন এবং শেষে জাহাজে অবস্থানকালীন জীবনযাত্রার, বিশেষত উন্নতি। তারা ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে ব্রিটিশ অফিসরদের অ৺ আচরণেরও প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

নাবিকরা একটি ধর্মঘট কমিটি নির্বাচনের পর ১৯ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে বিক্ষোভের আয়োজন করে। নৌবাহিনীর ভারতীয় কর্মীদের এই কার্যকলাপ ক্রমেই রাজনৈতিক চারিত্র্য লাভ করছিল: চাকুরি-শর্তের পূর্বোক্ত উন্নতি ছাড়াও ধর্মঘটীরা সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ইঙ্গ-ভারতীয় সেনাবাহিনী অপসারণের দাবি জানিয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই বিক্ষোভে তিনটি পতাকা ব্যবহৃত হয়েছিল। এতে ছিল: জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তিনটি শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ প্রতীকিত হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখ বিদ্রোহ দমনের জন্য বোম্বাইয়ে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। বিদ্রোহী জাহাজের নাবিকরা তাদের কার্যকলাপ সমন্বয়ের মাধ্যমে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করে।

পরদিন ব্রিটিশ সৈন্যদল আক্রমণ চালায়। দুই দলের মধ্যে সারা দিন গোলাগুলি চলে এবং কামান-যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ সুবিধালাভে ব্যর্থ হলে বিকাল ৪টায় যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়।

সারা দেশে এই বিদ্রোহের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। করাচী, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনমের নাবিকরা এবং দিল্লী, থানা ও পুনার উপকূলরক্ষীরা

ধর্মঘটীদের সমর্থন জানায়। অতঃপর রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীর সর্বত্র বিদ্রোহ প্রসারের সম্ভাবনা স্পস্ট হয়ে উঠেছিল।

বর্ণবৈষম্য ও দ্রুত সৈন্যদল ভেঙ্গে দেয়ার প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে বোম্বাইয়ের বিমানবাহিনীর বৈমানিক ও বিমানঘাঁটির কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠেছিল। কলিকাতা এবং অন্য কয়েকটি বিমানঘাঁটির বৈমানিকরাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্য ও নৌবাহিনীর এই কার্যকলাপ দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির আন্তরিক সমর্থন পেয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশে সাধারণ ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও জনসভা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। বোম্বাইয়ের মেহনতিদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সত্ত্বেও এদের বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয় এবং তারা বিক্ষোভকারীদের উপর নিষ্ঠুর হামলা চালায়। এতে প্রায় ৩০০ জন নিহত ও ১৭০০ আহত হয়।

সৈন্যবাহিনীর সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় ভূমিকার জন্য শুধু ঔপনিবেশিক প্রশাসনই নয়, জাতীয় সংগঠনগুলির মধ্যেকার বুর্জোয়া-জমিদার প্রভাবিত উপদলগুলির নেতারাও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহী নাবিকদের মূল দাবিগুলির প্রতি জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সহানুভূতি ও সমর্থন জানান সত্ত্বেও তাঁরা শেষে নাবিকদের ধর্মঘট ও প্রতিরোধ প্রত্যাহার করতে আহ্বান জানান। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে প্যাটেল নাবিকদের কার্যকরী পরিষদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে বোম্বাই আসেন।

কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের চাপে ২৩ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটীরা আত্মসমর্পণ করে কিন্তু দেশের কোন কোন অংশে সৈন্য ও নাবিকদের ধর্মঘট আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এই কার্যকলাপের মধ্যে ভারতে জায়মান একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতির আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ভারত সম্পর্কে লেবর পার্টির নীতি। দেশবিভাগের উদ্যোগ

ভারতের এই ঘটনাবলীর গুরুত্ব এড়াতে না পেরে শ্রমিক সরকার দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের উদ্দেশ্যে একটি ক্যাবিনেট মিশন রওয়ানা হয়। এতে ছিলেন ভারতসচিব পেথিক লরেন্স, নৌবাহিনীর প্রধান লর্ড আলেকজাণ্ডার ও তৎকালীন বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি ক্রিপ্‌স। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ ভারত সম্পর্কিত লেবর পার্টির

দ্বিতীয় ঘোষণায় ভারতকে ডোমিনিয়নের স্টাটাস দেয়ার কথা স্বীকার করা হয়। এই ঘোষণায় অ্যাটলি দেশব্যাপি আন্দোলন ও এতে সৈন্যবাহিনী জড়িয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করেন।

মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পেঁছয়। অতঃপর সারা এপ্রিল মাস জুড়ে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে এই মিশনের দীর্ঘ আলোচনা চলে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকের অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা উভয় পার্টির অবস্থানই প্রভাবিত হয়েছিল।

এই নির্বাচনে ১৩ শতাংশেরও কম মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিল এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সম্পর্ক জনসমক্ষে উপস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস সকল প্রদেশের সাধারণ নির্বাচনী এলাকায় (হিন্দু) এবং একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মুসলিম লীগ আবার হিন্দুপ্রধান সকল প্রদেশের মুসলিম নির্বাচনী এলাকায় ও মুসলিমপ্রধান বাংলায় অধিকাংশ আসন পায়। পঞ্জাব ও সিন্ধুর মতো মুসলমানপ্রধান দুট প্রদেশে মুসলিম নির্বাচনী এলাকার ভোট মুসলিম লীগ ও এর বিরোধী স্থানীয় পার্টিগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল।

নির্বাচন থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে: (১) দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অবিভক্ত ভারতের পক্ষপাতী; (২) অমুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলির ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম জনতা মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানের সমর্থক; (৩) মুসলিম লীগ সারা দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৩০ ও ৪৯৭। কিন্তু এক বাংলা ছাড়া আর কোথায়ও মুসলিম লীগের পক্ষে এককভাবে প্রাদেশিক সরকার গঠন সম্ভবপর ছিল না।

ভারতীয় জনগণের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ ভোটদানের অধিকারী হলেও যথানিয়মে এরাই ছিল জনগণের সর্বাধিক রাজনীতি সচেতন অংশ এবং তারা জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রভাব বিস্তার করত। এই প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে যোগ দিয়েছিল। এই পার্টি মনোনীত ১০৮ জনের মধ্যে ৯ জন জয়ী হয়েছিলেন এবং পার্টি সর্বমোট প্রায় ৭ লক্ষ ভোট পেয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তার নির্বাচনী ইশতেহারে সামাজিক পরিবর্তনের এক বিস্তৃত কর্মসূচি উপস্থাপিত করেছিল। এতে ছিল: জমিদারি উচ্ছেদ, প্রধান শিল্পশাখাগুলি জাতীয়করণ, বড় বড় কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন ইত্যাদি। প্রত্যেকটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারক্রমে জাতিসমস্যা সমাধানের এবং সংবিধান-সভা গঠনের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের

দাবিও এতে উল্লিখিত ছিল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে এই সংগ্রামের শেষলক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা তখনো দুর্বল থাকলেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তারা ভারতীয় জনগণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে কমিউনিস্ট নীতি ও পদ্ধতি প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল থেকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন তেমনি একই কারণে মুসলিম লীগ নেতারাও পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য চাপসৃষ্টিতে অটল থাকার নীতি অনুসরণ করেন।

আলোচনার সময় ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক দক্ষতার সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণের ফলে তা শেষাবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মে ব্রিটিশ সরকার এক ঘোষণায় ভারতবিভাগের ধারণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেও তা অবিভক্ত দেশে হিন্দু সংখ্যাগুরু কর্তৃক মুসলিম সংখ্যালঘুদের গ্রাস করার সম্ভাব্য আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার নিম্নোক্ত 'আপোস পরিকল্পনা' উপস্থাপিত করে:

(১) ভারত ডোমিনিয়ন সম্ভাব্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে গঠিত হবে। কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে;

(২) ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি তিনটি এলাকাভুক্ত হবে। যথা, প্রথম এলাকা — হিন্দুপ্রধান উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগুলি; দ্বিতীয় এলাকা — পশ্চিম ভারতের মুসলমানপ্রধান পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ; তৃতীয় এলাকা — মুসলমানপ্রধান বাংলা ও আসাম। প্রতি এলাকায় একটি আঞ্চলিক সরকার থাকবে;

(৩) প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচিত ও দেশীয় রাজন্যবর্গ মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংবিধান-সভা সারা দেশের সংবিধান এবং সংবিধান-সভাভুক্ত সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির প্রতিনিধিরা তিনটি অঞ্চলের সংবিধান রচনা করবেন;

(৪) হিন্দু, মুসলিম ও শিখ এই তিন ধর্মভিত্তিক নির্বাচনী এলাকা অনুসারে সংবিধান-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (১০ লক্ষে একজন প্রতিনিধি)। খসড়া সংবিধানের প্রতিটি ধারা সংবিধান-সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরুর ভোটেই শুধু গৃহীত হবে না, এজন্য অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধিদেরও সমর্থন লাগবে।

ব্রিটিশ প্রস্তাবে এমন একটি সংবিধান-সভা গঠনের কার্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করত ও

শেষপর্যন্ত তা অসম্ভব করে তুলত। এইসব শর্তাবলী সত্ত্বেও দেশবিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত মুসলিম লীগের দাবির প্রতি ব্রিটিশ শাসকচক্রের সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সঙ্গে মুসলিম লীগের কর্মসূচি ছিল সঙ্গতিশীল। ব্রিটিশদের পক্ষে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়ে যাওয়ার অসম্ভাব্যতার প্রেক্ষিতে তারা এমন একটি রাজনৈতিক 'সমাধান' খুঁজছিল যাতে দেশটি অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ শাসকদের উপর ভারতের নির্ভরতা দীর্ঘকাল অটুট থাকে।

ইতিমধ্যে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের ভাবী মর্যাদার বিষয়টি অন্যভাবে সমাধানের সকল পন্থারোধ সহ 'ক্ষমতা হস্তান্তর' যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

স্বাধীনতার পথে

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন। উত্তেজনাকর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম লীগ নেতারা কেবল ব্রিটিশ পরিকল্পনা গ্রহণই করেন নি, ১৬ মে ওয়াভেল ঘোষিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানেও রাজি হন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে (মুসলিম নির্বাচনী এলাকায় কেবল মুসলিম লীগ এবং হিন্দু নির্বাচনী এলাকায় কেবল কংগ্রেস নিজ নিজ প্রতিনিধি মনোনয়ন করবে) গঠিত হওয়ার জন্যই মুসলিম লীগ এতে আকৃষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন বিধায় কংগ্রেস এই শেষ শর্তটি প্রত্যাখ্যান করে। ব্রিটিশ প্রস্তাবগুলি কিছুটা সংশোধনের চেষ্টায় কংগ্রেস নেতারা আর একবার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাইসরয়ের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু তাঁদের যখন বলা হল যে মিশনের পরিকল্পনা পুরোপুরি গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তখন কংগ্রেস নেতারা বাধ্য হয়েই সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য ব্রিটিশ প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন।

সংবিধান-সভার কাছে দায়ী নয় এবং ভাইসরয়ের নেতৃত্বে কার্যকরী পরিষদ হিসাবে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানে কংগ্রেস অস্বীকৃত হয়েছিল।

কিন্তু লীগ এতে যোগদানে ইচ্ছা প্রকাশ করে। অবশ্য, ভাইসরয় লীগের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানক্রমে কেবল সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে এই কার্যকরী পরিষদটি গঠন করেন।

এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ কেবল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেই নয়, সংবিধান-সভার কাজেও অংশগ্রহণে অস্বীকৃত হয়। অতঃপর লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে।

জুন মাসে সংবিধান-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এর দুই বৃহৎ শরিক— লীগ ও শিখরা এটি বর্জন করে। ঘটনাটি ব্রিটিশের সহায়ক হয়ে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের অধিকাংশ সদস্য ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশবিভাগের বিরোধিতা করার ফলে পূর্ব ও পশ্চিমে মুসলিম এলাকা গঠনের কাজে জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

জুন মাসে জওহরলাল নেহরু আজাদের স্থলে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভাইসরয় নিজেকে সরকার প্রধান ও নেহরুকে উপ-প্রধান মন্ত্রী করে কার্যকরী পরিষদ হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের তাঁকে অনুরোধ জানান। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং ২৪ আগস্ট নতুন কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নাম ঘোষিত হয়। এতে উপ-প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নেহেরু সহ প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং খৃষ্টান, শিখ ও পারসী সম্প্রদায়ের নেতারা ছিলেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও এর প্রথম পদক্ষেপ, বিশেষত বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই সরকারের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই সরকার গঠন সম্পর্কে লীগের প্রতিক্রিয়া ছিল চরম ও প্রচন্ড। জিন্নার মতে এটি হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তিনি ১৬ আগস্টকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করেন। ফলত, কলিকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে এবং তা অচিরেই বাংলার অন্যান্য অংশ, পার্শ্ববর্তী বিহার, ও বোম্বাইয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

গান্ধী এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্র নিন্দা করেন এবং দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান। তিনি কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে রক্ষীদল গঠনে উৎসাহ যোগান।

সেপ্টেম্বর মাসে লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেয় কিন্তু সংবিধান-সভা বর্জন অব্যাহত রাখে। অবস্থা পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ভাবী সংবিধানের ধারা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভোটদানের ধারা বদলের সুপারিশ করে: যেসব প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এতে অনুপস্থিত সেখানে তা প্রয়োগ মুলতুবি

রাখা হয়। এতে মুসলিম লীগ সংবিধান-সভায় অবিভক্ত ভারত সম্পর্কে নেহরুর অটল দাবিটি গ্রহণ প্রহত করার সুযোগ পায়।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুদ্ধোত্তর অধিবেশন মীরাটে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। অধিবেশনে কংগ্রেসের অনুসৃত রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী অনুমোদন সহ ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করা হয়।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবিধান-সভার এক অধিবেশনে নেহেরু শর্তসাপেক্ষে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হলে দেশীয় রাজ্যগুলিতে রাজতন্ত্র অটুট রাখার কথা ঘোষণা করেন।

১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকের গণ-আন্দোলন

জাতীয় দলগুলির রাজনৈতিক কৌশলী কার্যকলাপের জন্য নয়, মেহনতি জনগণের ব্যাপক আন্দোলনের ফলেই ঔপনিবেশিক সরকার শেষ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের অব্যাহত অবনত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই শহর ও গ্রামাঞ্চলের গণ-আন্দোলনে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথ এবং উত্তর-পশ্চিম রেলপথ সহ কলিকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর, কোয়েম্বাটুর ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের কলকারখানায় কয়েকটি বড় বড় রেল-ধর্মঘট সংঘটিত হয়। এই বছর সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে নারিকেল প্রসেসিং শিল্পে সাধারণ ধর্মঘট চলাকালে পুন্নাপ্রা ও ভেলোরে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। অতঃপর ধর্মঘট অন্যান্য দেশীয় রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তা মহীশুর ও হায়দরাবাদে ব্যাপক আকার ধারণ করে।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত ২ হাজারেরও বেশি ধর্মঘটে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়েছিল। এতে বিনষ্ট কার্যদিনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষের মতো। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধ অবধি কানপুর ও কলিকাতায় ধর্মঘট আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ধর্মঘটে তখন বহু নাটকীয় ঘটনাই ঘটেছিল; ধর্মঘটীদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, দুটি শহরেই হরতাল পালিত হয়েছিল।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে গ্রামীণ জনগণও সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। সকল প্রদেশেই স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কোন কোন জেলায় এটি জমিদার ও পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপলাভ করেছিল। যুক্তপ্রদেশের

বাস্তি ও বালিয়ায় আন্দোলন মারাত্মক হয়ে উঠেছিল: সম্ভাব্য কৃষি সংস্কারের ভয়ে জমিদাররা সেখানে রায়ত-চাষীদের উৎখাত শুরু করলে এই সংঘাত বেধেছিল। সেটি ছিল এই সংস্কারের প্রস্তুতিবর্ষ।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে তখন 'তেভাগা' আন্দোলন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। এটি ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশে **খাজনার পরিমাণ** কমিয়ে আনার জন্য ভাগচাষীদের (বর্গাদার ও আধিয়ার) আন্দোলন। তেভাগার দাবি প্রদেশের ১১টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পিটুনি পুলিশ ও জমিদারদের ভাড়াটিয়া বা গুন্ডাদের বিরুদ্ধে এটি রীতিমত গেরিলা যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। অচিরেই এই আন্দোলনকারীদের সংখ্যা ৫০ লক্ষে পৌঁছয়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলার আইনসভা ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষার অনুকূল আইন পাশের পরই শুধু লড়াইটি শেষ হয়েছিল।

পঞ্জাবের লায়ালপুর জেলা ছিল কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র। সেখানে কিষান সভার নেতৃত্বে রায়ত-চাষীরা খাজনা হ্রাস ও বকেয়া ঋণ মকুবের দাবি নিয়ে সংগ্রাম চালাচ্ছিল। বোম্বাই প্রদেশে ওয়ার্লি উপজাতি মহাজনদের বিরুদ্ধে আরও একটি আন্দোলন চালায় এবং ফলত, প্রায় এক হাজার ওয়ার্লি স্থানীয় মহাজন বা 'সাহুকারদের' ঋণ থেকে মুক্তি পায়।

এই সময়কার অটলতম কৃষক প্রতিরোধ ঘটেছিল হায়দরাবাদের তেলেগু ভাষাভাষী এলাকা তেলেঙ্গানায়। সেখানে সামন্ততান্ত্রিক নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত ছিল ধর্মীয় ও বর্ণগত বৈষম্যমূলক আচরণ।

সূর্যপাত গাঁয়ের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক অভ্যুত্থান থেকেই তেলেঙ্গানা আন্দোলনের শুরু। এটি অচিরেই বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। জনগণ সেখানে হায়দরাবাদের নিজামের কর্মচারীদের বিতাড়ন সহ গণশাসন সংস্থা বা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করেছিল। জনৈক কৃষক নেতার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত একটি কৃষক বিক্ষোভের উপর গুলিচালনা থেকেই এর সূত্রপাত ঘটেছিল। বিক্ষোভকারীরা নিজেদের রক্ষীদলও গড়ে তুলেছিল।

হায়দরাবাদের এই ঘটনাবলী ছাড়াও ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরে সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। সেই দেশীয় রাজ্যে 'জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স' আয়োজিত বিক্ষোভ রাজার শাসনযন্ত্র উৎখাতের দাবি জানিয়েছিল। অচিরেই কাশ্মীরের গ্রামাঞ্চলে 'কাশ্মীর ছাড়ো' স্লোগানটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং খাজনা বন্ধের আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল।

কিন্তু শাসকরা এর উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালায়। 'কনফারেন্স' আত্মগোপনে বাধ্য হয় এবং এর নেতা শেখ আবদুল্লা গ্রেপ্তার হন।

কাশ্মীরের রাজা ও রাজার শাসকচক্রের প্রধানরা হিন্দু এবং এদের বিরোধীপক্ষ মুসলমান বিধায় কাশ্মীরের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের অবশিষ্ট অংশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা নিহিত ছিল। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে নেহরু নিজে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে কাশ্মীর যান এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। এর প্রতিবাদে সারা কাশ্মীরে হরতাল পালিত হয়। শেষপর্যন্ত নেহরুর মুক্তি এবং আইন-শৃঙ্খলার কিছুটা উন্নতি ঘটানোর জন্য সেখানে ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদ ছাড়াও রাজপুতানা ও মধ্যভারতের বহু দেশীয় রাজ্যেও (সীমিত পরিসরে) সামন্তবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

এই ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতেই সংবিধান-সভায় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের সমস্যা আলোচনার জন্য কংগ্রেস ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একটি কমিটি গঠন করে। এতে নির্ধারিত হয় যে, প্রতিনিধিদের অর্ধেক নির্বাচিত ও অর্ধেক রাজাদের দ্বারা মনোনীত হবে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রজা পরিষদের গোয়ালিয়র সম্মেলনে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের সক্রিয় শরিকানার বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ভারতবিভাগ। দুটি দেশ গঠন

ইতিমধ্যে দেশে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পরিপক্ব হয়ে উঠছিল। ভারতীয় বুর্জোয়া ও সামন্ত ভূস্বামীদের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে আর বিলম্ব ঘটলে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কাঠামোটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে এতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের নীতি সম্পর্কে অ্যাটলি তাঁর লেবর সরকারের তৃতীয় ঘোষণাটি প্রচার করেন। এতে বলা হয় যে ব্রিটিশ ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের আগেই ভারত ত্যাগ করবে এবং ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত না হলে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য মাউণ্টব্যাটেন নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত হন।

ঘোষণাটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েরই অনুমোদন পায়। এই দুই পার্টির সম্পর্ক জটিলতর করার জন্য ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় প্ররোচনা দেয় এবং তা বিশেষভাবে পঞ্জাবে মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

যুক্তভারতের সমর্থক তখনকার পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের উদ্যোগে ব্যাপক বিক্ষোভ পরিচালিত হয়।

ভারত ত্যাগে বাধ্য হওয়ার মুখোমুখি এদেশে নিজেদের অধিকারটুকু টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দেশবিভাগের উপরই তাদের শেষ আশা ন্যস্ত করেছিল। এপ্রিল মাসে মাউণ্টব্যাটেন ভারতে পেঁছন এবং ৩ জুলাই 'মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা' প্রকাশিত হয়। ভারতকে দুই দেশে বিভক্ত করার এই পরিকল্পনাটির মর্মবস্তু নিম্নরূপ:

(১) এই উপমহাদেশে দুটি ডোমিনিয়ন — ভারত প্রজাতন্ত্র ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে;

(২) ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দার প্রেক্ষিতে পঞ্জাব ও বাংলাকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভাগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির পরিষদ সদস্যরা আলাদা ভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন;

(৩) মুসলিম সংখ্যাগুরু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হবে;

(৪) প্রাদেশিক আইনসভা ভোটের মাধ্যমে সিন্ধুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে;

(৫) ডোমিনিয়নদুটির যেকোন একটিতে দেশীয় রাজ্যগুলির যোগদানের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজার একতিয়ারভুক্ত থাকবে;

(৬) সংবিধান-সভা দুটি ডোমিনিয়নের একটি করে সংসদ নিয়ে গঠিত হবে। এগুলি দুটি দেশের ভাবী মর্যাদার প্রশ্ন বিবেচনা করবে।

মুসলিম লীগের সমর্থনপুষ্ট ব্রিটিশ সরকার যে, যেকোন মূল্যেই দেশবিভাগে বদ্ধপরিকর এটি বোঝার পর কংগ্রেস অতিরিক্ত রক্তপাত এড়ানোর জন্য মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ১৫৭ বনাম ৬১ ভোটে ব্রিটিশ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এইসঙ্গে মুসলিম লীগ বাংলা ও পঞ্জাবকে অখণ্ড অবস্থায় পাকিস্তানভুক্ত করার দাবি জানায়।

পঞ্জাব ও বাংলায় ভোট গ্রহণের সময় 'হিন্দু' এলাকার সদস্যরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এইদুটি প্রদেশ বিভাগের এবং 'মুসলিম' জেলাগুলির সদস্যরা বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগের বিপক্ষে ভোট দেন।

সিন্ধুপ্রদেশ পরিষদের ভোট এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলার গণভোটের ফল এইসব এলাকার পাকিস্তান ভুক্তির সপক্ষে গিয়েছিল। এইসঙ্গে 'লালকুর্তা' নেতা খান আব্দুল গফুর খাঁ উত্থাপিত স্বাধীন পাখতুনিস্তান গঠনের জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের দাবিটি মাউণ্টব্যাটেন প্রত্যাখ্যান করেন। মোট

জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ ভোটাধিকারীর ব্যাপক সংখ্যাগুরু অংশই এই গণভোটের পক্ষে ছিল।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা'কে ভারতের স্বাধীনতা বিধি হিসাবে অনুমোদন দেয় এবং পরিকল্পনাটি এবছরের ১৫ আগস্ট আইনে পরিণত হয়।

সেইদিন দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লায় জওহরলাল নেহরু প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অবশেষে ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েক প্রজন্মের চেষ্টা সফল হল। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের এই সাফল্য থেকে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের — ভারতের স্বাধীন বিকাশপর্বের সূচনা ঘটল।

ভারত ডোমিনিয়ন

স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ

ভারতকে ডোমিনিয়ন ঘোষণার ফলে দেশের রাষ্ট্রীয়-আইনগত মর্যাদার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ফেডারেল ভিত্তিতে একত্রিত প্রাক্তন ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে গঠিত বর্তমান ভারত ইউনিয়নের পুরো এলাকাটিতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রযুক্ত আইনগুলির অপসারণ শুরু হয়েছিল। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও গান্ধীর সহকর্মী, নতুন সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে সংবিধান-সভার কাজ এগিয়ে চলছিল।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার ছিল জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন এবং তিনি একযোগে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তদানীন্তন মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন কংগ্রেস দলীয়। তদুপরি এতে তপশিলী ফেডারেশনের নেতা আম্বেদকর আইন এবং হিন্দুমহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন।

'জাতীয় সংহতিমূলক' এই সরকারের কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ের গোড়ার দিকের বছরগুলিতে দেশে জায়মান সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ভারসাম্য প্রতিফলিত হয়েছিল। নেহরু প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁর প্রতি তখনো কংগ্রেসের বামপন্থীদের সমর্থন অটুট থাকলেও এই সরকার ছিল প্রধানত মধ্যপন্থী রক্ষণশীল শক্তিগুলি দ্বারা প্রভাবিত। তৎকালীন মন্ত্রিসভার দেশরক্ষার ভারপ্রাপ্ত উপ-প্রধান মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল ততদিনে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনীতির মূল দপ্তরগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদ্বয় চিন্তামন দেশমুখ (অর্থ) ও টি. টি. কৃষ্ণমাচারী (বাণিজ্য) ছিলেন শক্তিশালী ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভা এবং তার অধীনস্থ প্রাদেশিক সরকারগুলিতেও দেশে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া ও জমিদারদের স্বার্থই প্রতিফলিত ছিল।

প্রশাসনযন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর 'ভারতীয়করণ' সরকারের কাছে খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিকে ব্রিটিশের প্রভাবমুক্ত করার পক্ষে এটি ছিল অপরিহার্য। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি

মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যের শেষ দলটি ভারত ত্যাগ করেছিল। অবশ্য, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দেও কেন্দ্রীয় সরকারে, প্রধানত কূটনৈতিক বিভাগে প্রায় এক হাজার ব্রিটিশ অফিসর কর্মরত ছিল।

সম্ভাব্য যেকোন পন্থায় ভারতে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শাসনযন্ত্রের মধ্যেকার তাদের ঘনিষ্ঠতম দালালদের সাহায্যলাভই শুধু আশা করে নি, দেশীয় রাজ্যগুলিতেও স্বীয় উদ্যোগ ঘনীভূত করেছিল যেখানে স্বাধীনতার পরও দেশের শাসনভার স্থানীয় শাসকদের উপর ন্যস্ত ছিল। এই প্রেক্ষিতে দেশীয় রাজ্যগুলির দ্রুত ভারতভুক্তি জাতীয় সরকারের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি। প্রথম প্রশাসন সংস্কার ও অঞ্চল পুনর্গঠন

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজন্যবর্গের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এই রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির একটি সূত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক রাজা একটি চুক্তিপত্র সই করলে সেগুলি সরকারী মহাফেজখানায় জমা রাখা হয়।

এই চুক্তি মোতাবেক নিজ নিজ রাজ্যে রাজন্যবর্গের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা সম্পূর্ণ অটুট থাকে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকর না হওয়া অবধি রাজন্যবর্গকে তাঁদের সকল কৃতকর্মের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। রাজারা সরকারী পেন্সন (মোট ৫·৬ কোটি টাকা) পান। দেশীয় রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরাও কিছু কিছু নিশ্চয়তার (চাকুরির নিশ্চয়তা, পেন্সন ইত্যাদি) সুযোগ পেয়েছিল।

এইসঙ্গে রাজন্যবর্গ নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা হারান, তাঁদের সৈন্যদল ভেঙে দেয়া হয় বা ভারতের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে দেশীয় রাজাদের অধীন এলাকাগুলি এবার ভারতের অংশ হিসাবে তার এক্তিয়ারভুক্ত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা বিধি (১৯৪৭) মোতাবেক দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি (বা পাকিস্তানভুক্তি) রাজন্যবর্গের ইচ্ছাধীন বিধায় অনেকেই দ্রুত নিজেদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনে তৎপর হন নি, কারণ তাঁরা আগেকার মতোই ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রক্ষায় ইচ্ছুক ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার, বিশেষত মাউণ্টব্যাটেন (১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুন অবধি ভারত ডোমিনিয়নের গভর্নর-জেনারেল) রাজন্যবর্গের

এই বিরোধিতা সমর্থন করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুসৃত ভারত সরকারের সুস্পষ্ট নীতি (যা ভারতভুক্তির জন্য রাজন্যবর্গকে অনুকূলতম সুযোগ দিয়েছিল) এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে (বিশেষত হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, ভুপাল ও ওড়িষ্যা) বর্ধমান সামন্তবিরোধী আন্দোলনের জোয়ার — এই উভয় কারণে রাজন্যবর্গ দ্রুত ভারতভুক্তির চুক্তিস্বাক্ষরে বাধ্য হন।

১৯৪৭-১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ৬০১টি দেশীয় রাজ্যের ৫৫৫টি ভারতভুক্ত হয় এবং অন্যগুলি পাকিস্তানে যোগ দেয়। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি তিন ধরনে নিষ্পন্ন হয়: ২১৬টি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশের (বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ওড়িষ্যা প্রভৃতি) পৃথক জেলা হিসাবে; ৭০টি দেশীয় রাজ্য এককভাবে (ভুপাল, মণিপুর, ত্রিপুরা) অথবা রাজ্যপুঞ্জের আকারে (হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, বিন্ধ্যপ্রদেশ) কেন্দ্রশাসিত এলাকা হিসাবে এবং ২৬৯টি ফেডারেল ইউনিট ও রাজ্য ইউনিয়ন হিসাবে (পেপসু — পাতিয়ালা ও পূর্ব পঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, মধ্যভারত, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন) অথবা প্রাক্তন সীমানার মধ্যে ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে (হায়দরাবাদ, মহীশূর, জম্মু ও কাশ্মীর)।

দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন ও পৃথক প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য — এই উভয় ধরনের প্রদেশে আইনসভার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর এই পরিষদের কাছে দায়ী সরকার গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাক্তন রাজারাই এগুলির গভর্নর বা 'রাজপ্রমুখ' নিযুক্ত হন।

এভাবে প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি চলাকালে দেশে প্রথম ব্যাপকভিত্তিক আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এইসঙ্গে নতুন জরিপ ও বন্দোবস্ত সহ রায়তওয়ারি এলাকার অনুরূপ একটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এইসময় কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে ভূমিরাজস্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।

প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি এবং পূর্বোক্ত শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত হয়েছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আপোস-রফার ফলে রাজন্যবর্গ জমিদারির একটা বড় অংশ, প্রাসাদ ও ধনদৌলতের মালিকানা সহ বিপুল অঙ্কের পেন্সন (বছরে হায়দরাবাদের নিজামকে ৫০ লক্ষ টাকা, মহীশূরের রাজাকে ২৬ লক্ষ টাকা ইত্যাদি), নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও অনেকের জন্য 'রাজপ্রমুখের' পদ পাওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁদের পক্ষে প্রাক্তন রাজ্যগুলির অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়েছিল।

১৯৪৭-১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে দেশীয় রাজ্যগুলির এই অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া তিনটি

ব্যতিক্রম — জুনাগড় (কাথিয়াওয়াড উপদ্বীপ), হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর — ছাড়া নির্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হচ্ছিল। এই দেশীয় রাজ্যগুলিতে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

জুনাগড়ের বাসিন্দাদের অর্ধেকের বেশি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যের মুসলিম শাসক পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। ফলত, সেখানে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ভারত সরকার জুনাগড়ে সৈন্য পাঠায়। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে বিপুল ভোটাধিক্যে রাজ্যটির ভারতভুক্তি সমর্থিত হয় এবং নবাব পাকিস্তানে পলায়ন করেন।

বিশাল দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের পরিস্থিতি ছিল জটিলতর। নিজাম মুসলিম হওয়ার ফলে এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে হায়দরাবাদের বিশেষ মর্যাদা সহ ব্রিটেনের সঙ্গে এই রাজ্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রক্ষার অনুকূলে প্রচার চালানোর প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের প্রতি আসক্তি বশত নিজাম এই রাজ্যের ভারতভুক্তি বিলম্বিত করছিলেন। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার নিজামের সঙ্গে এই স্থিতাবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য এক বছর মেয়াদি একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং তদনুযায়ী নিজামকে তাঁর সৈন্যবৃদ্ধি বা বাহিরের সামরিক সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

কিন্তু নিজাম অচিরেই এই শর্তভঙ্গ করেন: ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্রের একটি বড় চালান এখানে পৌঁছয়। স্বাধীন ভারতের এই মধ্যভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের একটি সামরিক ও রাজনৈতিক ঘাঁটির আয়োজন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে এই রাজ্যের অভ্যন্তরেও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে শুরু হওয়া নিজামবিরোধী গণ-আন্দোলন কৃষক অভ্যুত্থানের রূপলাভ করে এবং তা রাজ্যের সারা পূর্বাঞ্চলে (তেলেঙ্গানা) ছড়িয়ে পড়ে। অভ্যুত্থান দমনের জন্য প্রশাসন ও সামন্ত ভূস্বামীরা 'রাজাকার' নামের এক সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করে এবং তাদের হামলায় হায়দরাবাদের অমুসলিম জনগণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের প্রভাব মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলির তেলেগু ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদের ভারত ত্যাগের উদ্যোগে এবং অন্ধ্র অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের বিস্তারে উদ্বিগ্ন ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিজামকে একটি চরমপত্র দেয় এবং এতে অন্যান্যের সঙ্গে 'রাজাকার' বাহিনী ভেঙ্গে দেয়ার দাবি জানায়। ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হায়দরাবাদে প্রবেশ করে এবং পাঁচ দিনের মধ্যে পুরো রাজ্যটি তাদের দখলে আসে। নিয়মিত ভারতীয়

বাহিনী শুধু রাজাকারদেরই উৎখাত করে নি, তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষকদের উপরও আক্রমণ চালায়। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে নিজাম তাঁকে এই প্রদেশের রাজপ্রমুখের পদে বহাল করার শর্তে ভারতভুক্তির দলিল স্বাক্ষর করেন।

কাশ্মীর: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত

জম্মু ও কাশ্মীরে এই সময় ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে স্থানীয় রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে সবচেয়ে উত্তেজনাকর এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কাশ্মীর পরিদর্শনের সময় মাউন্টব্যাটেন সেখানকার রাজাকে গণভোট অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, এই রাজ্যের জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান বিধায় এর ফলে এটি পাকিস্তানভুক্ত হবে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত সৃষ্টিই ছিল হায়দরাবাদ ও কাশ্মীরে অনুসৃত ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য।

কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী কাশ্মীর পেঁৗছে শেখ আব্দুল্লার মুক্তি আদায় সহ ন্যাশনাল কনফারেন্স ও মহারাজার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পরিকল্পনাটি ব্যর্থ করে দেন। অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বাধানোই সাম্রাজ্যবাদীদের পরবর্তী লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২২ অক্টোবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান উপজাতিরা কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং ২৬ অক্টোবরের মধ্যে তারা শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পেঁৗছয়।

মহারাজার প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনি নিজে শ্রীনগর থেকে পলায়ন করেন। এই পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল কনফারেন্সের গণতান্ত্রিক অংশ ও কমিউনিস্টদের সংগঠিত জনশক্তি শহর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মাউন্টব্যাটেনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ২৭ অক্টোবর ভারতীয় ছত্রীবাহিনীকে শ্রীনগর পাঠান হয় এবং পরদিনই পাঠান উপজাতিদের অনুগামী নিয়মিত পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধে। এভাবেই এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং দুই দেশের ব্রিটিশ সেনাপতিরা যুদ্ধের তদারকি চালান (অক্টোবরের শেষপর্যন্ত জেনারেল ওকিনলেক দুই দেশেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন!)।

পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর অধিকৃত কাশ্মীরে 'আজাদ কাশ্মীর' নামে একটি সরকার গঠিত হয়।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ভারত জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে 'জাতিসঙ্ঘ কাশ্মীর কমিশন' গঠিত হয়। এই সংস্থায় মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেকার সংঘাত বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের বসন্তে সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটে এবং ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে মহারাজা সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর উত্তরাধিকারী জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন। অবশ্য, এইসঙ্গে নতুন প্রদেশটিকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় এবং ভবিষ্যৎ মীমাংসা সাপেক্ষে কাশ্মীরের মর্যাদার প্রশ্নটি উন্মুক্ত থাকে।

কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের ঘটনাবলী এই উপমহাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় -- হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেকার বিদ্যমান উত্তেজনাকর সম্পর্কে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা: গান্ধী হত্যা

ভারত বিভাগের ফলে দুটি দেশ সৃষ্টি এবং নতুন সীমান্ত গড়ে উঠায় পাকিস্তান থেকে ভারতে হিন্দু ও শিখ এবং ভারত থেকে পকিস্তানে মুসলমান উদ্বাস্তুদের ব্যাপক আগমন শুরু হয়। এই ব্যাপক প্রচরণের ফলে দুটি দেশের, বিশেষভাবে সীমান্ত এলাকাগুলিতে সংকট দেখা দেয়। ভারত থেকে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমৃদ্ধ ঊর্ধ্বতন স্তরগুলির প্রতিনিধিরাই প্রধানত পাকিস্তানে আসে। কিন্তু পাকিস্তান, বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সর্বস্তরের হিন্দু ও শিখরা ভারতে আসতে শুরু করে। হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যাপক দেশান্তর যাত্রার ফলে উভয় দেশেই এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে: দেশান্তর যাত্রী উদ্বাস্তুদের উপর আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ব্যাপক হত্যা নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে। পশ্চিম পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের উপর ধর্মান্ধদের অনুষ্ঠিত ব্যাপক নৃশংসতার ফল হিসাবে রাজস্থান, বিহার, দিল্লী সহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানদের উপরও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত গান্ধী এইসব ঘটনাবলীতে মর্মাহত হন। মুসলিম হত্যার বিরুদ্ধে তিনি অনশন শুরু করেন। গান্ধীর এই অনশনের ফলে হিন্দুমহাসভা ও এর সংশ্লিষ্ট আধা-সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুসারী জাতিদম্ভী হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কেবল হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে গান্ধীর এই উদ্যোগের জন্যই নয়, চল্লিশ দশকে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন দেখেও অসন্তুষ্ট হয়েছিল। ব্যাপক জাতিদম্ভী ধর্মীয় প্রচারের এই

মুহূর্তে হিন্দুমহাসভার এক সদস্য ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীর উপর গুলি চালায় এবং তিনি নিহত হন।

গান্ধীহত্যার ফলে সারা ভারতে বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায় এবং জনগণ হিন্দুমহাসভার মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। কোন কোন জায়গায় এই সংগঠনের সদস্যদের হত্যা করা হয়। সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং হিন্দুমহাসভা তার যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রত্যাহারক্রমে তা সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সীমিত করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের বেদনাকর ঘটনাবলীর ফল হিসাবে 'জাতির পিতা'র এই মৃত্যু সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।

নতুন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মজবুত হওয়ার পর দেশবিভাগজনিত অর্থনৈতিক ফলাফলগুলির মুকাবিলাই জাতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।

দেশবিভাগের অর্থনৈতিক ফলাফল

অজন্মা, যুদ্ধকালীন উৎপাদন হ্রাস, কোন কোন ধরনের কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্যের ঘাটতিজনিত যুদ্ধোত্তর অসুবিধাগুলি দেশবিভাগের ফলে প্রকটতর হয়ে উঠেছিল।

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত কৃষিএলাকায় ইতিপূর্বে দেশের ৪০ শতাংশ তুলা, ৮৫ শতাংশ পাট, ৪০ শতাংশ গম উৎপন্ন হত। ফলত, ভারতে অচিরেই তার প্রধান শিল্পশাখা বস্ত্রশিল্পে কাঁচামালের অভাব সহ খাদ্যঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

১৯৪৭-১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধের পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৯-১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে এক বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হলে ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে-ওঠা আন্তঃআঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় ভারত পাট ও তুলা উৎপাদনের এবং পাকিস্তান নিজস্ব বস্ত্রশিল্প নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্বাস্তু সম্পত্তির স্বত্ব, সীমান্তের ওপারের আর্থিক দাবিদাওয়া, অর্থভাণ্ডার বিভাগ ইত্যাদি অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে তাদের ব্যর্থতাও এই দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে জটিলতর করে তুলেছিল।

সাধারণ জলসেচ ব্যবস্থা এবং পরিবহণ প্রণালী অতঃপর ভেঙ্গে পড়ে। এমতাবস্থায় দীর্ঘকাল আসামের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশ কেবল বিমানপথেই যুক্ত ছিল।

বস্ত্রশিল্পের সরবরাহ হ্রাস এবং এর বাজার সংকীর্ণ হয়ে ওঠার ফলে বস্ত্রকলের কোন কোনটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও বাকিগুলিতে সাপ্তাহিক কার্যদিন

কমান হয়েছিল। কাঁচামালের অভাব ও হঠাৎ বাজার ছোট হয়ে যাওয়ায় ক্ষুদ্র উৎপাদক, ও তাঁতিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে প্রধান শিল্পশাখাগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন উৎপাদন মাত্রায় ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল। কাঁচামালের ঘাটতি ও তৈরী পণ্যের বাজারের অভাবের জন্যই শুধু এই মন্দা ঘটে নি, প্রধান যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ও এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। পরিবহণ ব্যবস্থার পরিস্থিতিও ছিল অনুরূপ: ৬০ শতাংশ রেলইঞ্জিন ও বগি বদল জরুরী হয়ে উঠেছিল।

উৎপাদন ঘাটতির অনিবার্য ফল হিসাবে চাকুরির ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। অনেক এলাকায় কারখানা-শ্রমিক ও গৃহশিল্পের কারিগরদের মধ্যে ব্যাপক বেকারী দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পূর্ব পঞ্জাবে ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছিল। উদ্বাস্তু আসার ফলেও পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠেছিল এবং এদের সংখ্যা ৭০ লক্ষ অতিক্রম করেছিল।

এই সময় শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের ঘাটতির সঙ্গে খাদ্যাভাবের সন্নিপাত ঘটেছিল: স্বাধীনতার প্রথম দিকের বছরগুলিতে যুদ্ধপূর্ব উৎপাদনের ৯০ ভাগ ফসল উৎপন্ন হচ্ছিল।

দেশবিভাগ অর্থনীতির ঔপনিবেশিক কাঠামোর অসঙ্গতিজাত ভারতীয় অর্থনীতির অন্তর্লীন অসঙ্গতির পরিসর আরও বৃদ্ধি করেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বছর ভারত অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশই রয়ে গিয়েছিল এবং তার অর্থনৈতিক কাঠামোয় প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক ধরনই প্রাধান্য পেয়েছিল। ১৯৪৮-১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় আয়ের অঙ্কেই এটি সহজলক্ষ্য: ৪৮·১ শতাংশ কৃষি থেকে, ১১·৫ শতাংশ কুটিরশিল্প ও কারিগরি থেকে এবং ৮·৩ শতাংশ বৃহদায়তন উৎপাদন থেকে। জমির মালিকানা ও জমি ব্যবহার প্রণালীর সামন্ততান্ত্রিক জেরের প্রাধান্য এবং কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যযুগীয় স্তরের মধ্যেই এদেশে শ্রমের উৎপাদনশীলতার স্তর (বিশ্বের নিম্নতমদের অন্যতম) স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও ছিল বিশ্বের নিম্নতমদের অন্যতম: ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ২৪৬ টাকা অর্থাৎ, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের যথাক্রমে ১০ ও ৫ শতাংশ।

অর্থনীতির প্রধান শাখাগুলিতে বিদেশী, মূলত ব্রিটেনের মুখ্য অবস্থানের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোন কৌশল গ্রহণের পরিসর ছিল খুবই সীমিত। ভারতে বিদেশী লগ্নির প্রথম জরিপ অনুসারে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত এদেশে অনুরূপ বিনিয়োগের মোট

৩২০ কোটি টাকার মধ্যে ব্রিটেনের অংশভাগ ছিল ৭২ শতাংশ। বিভিন্ন শিল্পে বিদেশী লগ্নির হিসাবটি নিম্নরূপ (শতাংশ হারে): তেল-সংগ্রহ ও তেলশোধনের — ৯৭, রবার শিল্পের — ৯৩, ন্যারো গেজ রেলপথের — ৯০, দেশলাই উৎপাদনের — ৯০, পাটশিল্পের — ৪৯, চা-বাগানের — ৮৬ ও খনিশিল্পের — ৭৩ ইত্যাদি।

বিদেশী একচেটিয়ারা ভারতে লগ্নিকৃত পংজি থেকে বার্ষিক গড়পড়তা ১২০ কোটি থেকে ১৫০ কোটি ডলার অবধি মনাফা অর্জন করত।

ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক কাঠামো এবং বিদেশী পংজির প্রাধান্য আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ প্রণালীর মধ্যেও ভারতের অবস্থান নির্ধারণ করেছিল। আগের মতো ভারত এখনো শিল্পপ্রধান পংজিতান্ত্রিক দেশগলির, বিশেষত ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী উপাঙ্গেরই কাজ করছিল। ১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের মোট আমদানির ৬০ শতাংশই ছিল শস্য ও তৈরী পণ্য এবং রপ্তানির ৫২ শতাংশ ছিল কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য।

এভাবে নব্যস্বাধীন ভারত শতাব্দীকালের অনগ্রসরতা উত্তরণ সহ বহমখী আধনিক অর্থনীতি গঠনের এক দঃসাধ্য কর্মকাণ্ডের মখোমখি দাঁড়িয়েছিল।

অর্থনৈতিক কর্মনীতি: মিশ্র অর্থনীতি

স্বাধীনতার প্রথম বছরগলিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের মল উদ্যোগগলি দেশবিভাগজনিত অসবিধা দরীকরণেই প্রধানত কেন্দ্রিত ছিল।

সরকার ক্রমে ক্রমে পাট ও তুলা চাষের এলাকা বাড়ান (যথাক্রমে ৬০-৭০ এবং ২০-২৫ শতাংশ) সহ নতুন নতুন জলসেচ প্রকল্প তৈরি করেছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দেই অনাবাদী জমিচাষ পরিকল্পনার সহযোগিতায় একটি সরকারী ট্যাক্টর সংস্থা গঠিত হয়েছিল।

তব খাদ্যোৎপাদনে প্রায় কোনই উন্নতি ঘটে নি। স্থায়ী খাদ্যাভাবের দরন ১৯৪৭-১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারত ১ কোটি টনের বেশি গম আমদানি করতে বাধ্য হয়েছিল।

বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও মাথাপিছ মল খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস অব্যাহত ছিল। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে শহরগলিতে মল খাদ্যসামগ্রীর রেশনিং চাল হয়। খাদ্যসামগ্রী ও জররী ভোগ্যপণ্য নিয়ে অবাধ ফটকাবাজী শ্রমিক, কারিগর, বাব-কর্মীদের অধস্তন ও মধ্য স্তরগলি এবং শিল্পোদ্যাগীদের নিম্নস্তরগলির পারিবারিক সংস্থানের উপর কঠোর আঘাত হেনেছিল। এইসঙ্গে ফটকা লেনদেনের মাধ্যমে বিপল বিত্তসঞ্চয় চলছিল. প্রাথমিক সঞ্চয় প্রক্রিয়ায় তীব্রতা দেখা দিয়েছিল।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছুটা সুস্থিতি দেখা দিলে নিজ সঞ্চয় শিল্পে লগ্নির জন্য দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনে অব্যাহত ঘাটতি সত্ত্বেও এই সময় ভারি শিল্পের কোন কোন খাতে (সিমেন্ট, রাসায়নিক ও ইস্পাত শিল্পে) উন্নতি দেখা দিয়েছিল। শিল্প ও বেসামরিক নির্মাণে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্যই এটি ঘটেছিল।

রেলপথের জন্য নতুন ইঞ্জিন সরবরাহ শুরু সহ মুখ্য যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধির কল্যাণে কারখানার জন্য বাড়তি মেশিন টুল্‌স যোগান দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

স্বাধীনতার গোড়ার দিকের বছরগুলিতে যুদ্ধের সময় সঞ্চিত স্টার্লিং ভাণ্ডার থেকেই (১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে মোট ১৫০০ কোটি টাকা) প্রধানত ভারত তার যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যয় মেটাত। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-ভারত অর্থ-চুক্তি মোতাবেক সামরিক সাজসরঞ্জাম, ব্রিটিশ কর্মচারীদের পেন্সন ইত্যাদির জন্য ৫০০ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ১০০০ কোটি টাকা ভারতের শিল্পসামর্থ্য বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে এখানে ব্রিটিশ শিল্পের মূল যন্ত্রপাতির একটি বাজার গড়ে তোলার জন্য ব্যয়িত হয়েছিল।

দুই দেশের মধ্যেকার এই চুক্তির বলে দেশের শিল্পবিকাশের ধারায় কিছুকাল ব্রিটিশ একচেটিয়াদের প্রভাব অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু তা ভারতে বিদেশী একচেটিয়াদের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানি) অনুপ্রবেশ বা ভারতীয় বুর্জোয়াদের শক্তিবৃদ্ধি ঠেকাতে পারে নি।

আর্থিকভাবে দুর্বল এবং কৃৎকৌশলগত সাজসরঞ্জাম ও জ্ঞানের দিক থেকে বিশেষ অনগ্রসর ভারতীয় বুর্জোয়ারা সাধারণত বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে নতুন শিল্পশাখা নির্মাণের জন্য মিশ্র কোম্পানি গঠন করেছিল। স্বাধীনতার প্রথম তিন বছরে মোটর-গাড়ি ও ট্যাক্টর যোজন, সাইকেল নির্মাণ ও উৎপাদনের অন্যান্য খাতে ৮৮টি মিশ্র কোম্পানি গঠিত হয়েছিল।

সরকার রক্ষামূলক শুল্কনীতি প্রবর্তন এবং ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজির কার্যকলাপের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ব্যক্তিগত সংস্থা গঠনে উৎসাহ যুগিয়েছিল। শিল্পনির্মাণের জন্য ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ১০ কোটি টাকার মূলধন সহ রাষ্ট্রীয় শিল্প ফিনান্স কর্পরেশন গঠিত হয়েছিল।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংবিধান-সভায় পঠিত জওহরলাল নেহরুর শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই বিশেষত ভারতের অর্থনৈতিক কর্মনীতির ধারাগুলি সূত্রবদ্ধ হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি তথাকথিত মিশ্র অর্থনীতি উন্নয়নের ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিল যাতে বিশেষ কয়েকটি শিল্পখাতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার সুরক্ষিত ছিল। অস্ত্রনির্মাণ, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন

ও রেলপথে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লৌহঘটিত ধাতুশিল্প, কয়লা ও তেল শিল্প, বিমান নির্মাণ, কয়েক ধরনের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়রিং সহ ভারী শিল্পের কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে নতুন সংস্থা গঠনের অধিকার কেবল রাষ্ট্রেরই এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। তদুপরি ভারী ও লঘু শিল্পের আরও ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ শাখা সরকারী পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে এসেছিল।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে 'ব্যাঙ্কিং কোম্প্যানি বিধি' প্রণয়ণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জয়েন্ট-স্টক ব্যাঙ্কের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কায়েমের ফলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের নতুন গতিপথ স্পষ্ট হয় উঠেছিল।

প্রাক্তন ঔপনিবেশিক সরকারের সম্পত্তির (প্রধান অস্ত্রনির্মাণ কারখানা, রেলপথ ও বিদ্যুৎ স্টেশনগুলি) ভিত্তিতে তৈরি রাষ্ট্রীয় খাতে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে মোট শিল্পোৎপাদের মাত্র ৬ শতাংশ উৎপন্ন হয়েছিল।

নেহরু সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই প্রাথমিক উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্মরণীয় যে, তাঁর অর্থনৈতিক কর্মনীতি ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের এই প্রচেষ্টা থেকে মূলগতভাবে আলাদা।

ডোমিনিয়ন সরকারের বৈদেশিক নীতি

ডোমিনিয়ন সরকারের বৈদেশিক নীতির মধ্যেই জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। সেই ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর ঔপনিবেশিক ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিরপেক্ষ নীতির প্রতি সমর্থন সহ সকল সামরিক জোটে যোগদানে অস্বীকৃত হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর শান্তি ও সক্রিয় নিরপেক্ষতার নীতি সম্প্রসারণ ও বিকাশসাধনের পূর্ণতার সুযোগ দেখা দিয়েছিল। ভারতকে কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কোন পর্যায় অতিক্রম করতে হয় নি এবং তাই সক্রিয় বৈদেশিক নীতি অনুসরণের পক্ষে তার অবস্থান ছিল খুবই অনুকূল: ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে ৩৯টি রাষ্ট্রের সঙ্গে সে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে শাসকদল কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনে একটি বিশেষ প্রস্তাবে ভারতের বৈদেশিক নীতি সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। এটি ছিল ঔপনিবেশিকতাবিরোধী এবং শান্তি, নিরপেক্ষতা ও জোটবহির্ভূত নীতিভিত্তিক।

জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি জাতিসংঘের অনুমোদনক্রমে পররাষ্ট্রশাসিত দেশগুলিকে জাতিসংঘের অছিভুক্ত দেশে পরিণত করার আহ্বান জানান। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গঠিত জাতিসংঘের বিভিন্ন

কমিটিতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের কার্যকলাপের মধ্যে ভারতের বৈদেশিক নীতির ঔপনিবেশিকতাবিরোধী দিকগুলি প্রকটিত হয়ে উঠেছিল।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে 'এশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সম্মেলন' আহ্বানের মাধ্যমে ভারত এশীয় দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপক সংযোগ প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে ৩২টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। কিন্তু সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্যের অনুপস্থিতির দরুন এতে কার্যকর ফললাভের সম্ভাবনা ছিল খুবই সীমিত।

নেহরু সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। ভারত ছিল চীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতিদাতা অন্যতম প্রথম দেশ।

তবু এই সময়ই ভারতের বৈদেশিক নীতিতে কিছুটা দোদুল্যমানতা ও অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল। এটি অবশ্য খোদ দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং বিশেষত ব্রিটেনের চাপের জন্যই ঘটেছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তখনো ব্রিটেনের পর্যাপ্ত প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এইসব অসঙ্গতির অন্যতম দৃষ্টান্ত হল: ভারত সরকার হো চি মিন সরকারকে সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে মালয়ে ব্রিটিশ নীতিতেও মদত যুগিয়েছিল। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে ইন্দোনেশীয় সমস্যা আলোচনার জন্য আহূত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারত জাতিসঙ্ঘে গৃহীত আনুষঙ্গিক প্রস্তাবটি (যে-প্রস্তাবে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের কার্যত কোন সাহায্যই দেয়া হয় নি) অনুমোদনের চেয়ে বেশি আর কিছুই করে নি।

এই কালপর্বে ভারত তার শিল্পায়নে মার্কিনী অর্থ ও কৃৎকৌশল সাহায্যের আশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। নেহরু ভারত-মার্কিন যোগাযোগ বিস্তারের মাধ্যমে ভারতের উপর ব্রিটেনের চাপ কমানোর প্রয়াস পান। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ১১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত নেহরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। এতে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক নৈকট্যবৃদ্ধির চেষ্টা সফল না হলেও পরবর্তী বছরগুলিতে তাদের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল এবং তা ভারতে মার্কিন পুঁজি প্রবেশে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

ভারতের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কাশ্মীর সমস্যাজনিত কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। কাশ্মীর সমস্যা জাতিসঙ্ঘে আসায় ইঙ্গ-মার্কিন জোটের পক্ষে মধ্যগ হিসাবে কাশ্মীর সম্পর্কিত জাতিসঙ্ঘ কমিশনকে উভয় ডোমিনিয়নের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাব বার বার

প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে প্রকটিত ভারতের দৃঢ় পদক্ষেপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী বিশ্বের অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা —কাশ্মীরকে ন্যাটোর একটি ঘাঁটিতে পরিণত করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির এক অতিগুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয় সমাজের বিত্তশালী সম্প্রদায়ই কেবল এই প্রগতির ফলভোগের সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৪৭-১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট অবনমিত হয়েছিল এবং ফলত, দেশে সামাজিক উত্তেজনা ও শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাম-বিচ্যুতি

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষ ও মার্চের গোড়ার দিকে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি ১৯৪৮-১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কংগ্রেসে উপস্থিত ৮৯ হাজার প্রতিনিধির সংখ্যাটি ছিল পার্টির পর্যাপ্ত শক্তিবৃদ্ধির এক সূচক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর প্রতিবেদনটি সেখানে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। যোশী সহ পার্টির নেতৃবৃন্দ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

একটি গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনকে এই কংগ্রেস বিপ্লবী শক্তিগুলির প্রধান কার্য হিসাবে চিহ্নিত করে এবং এর কর্মসূচিতে থাকে: সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের সূচক হিসাবে বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ; সকল ব্রিটিশ শিল্পসংস্থা সহ প্রধান শিল্পশাখা ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ; নিম্নতম মজুরি ও ৮ ঘণ্টার কার্যদিন প্রবর্তন; কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু; দেশীয় রাজ্যগুলি বিলোপ ও জাতীয় ভাষার ভিত্তিতে এগুলির প্রশাসন পুনর্গঠন; ভারতের সকল জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ঘোষণা; বর্ণগত ও অন্যান্য সকল বৈষম্যমূলক

ব্যবস্থা উৎখাত ইত্যাদি। কংগ্রেস ভারতবিভাগকে একটি সাম্রাজ্যবাদী ষড়্যন্ত্র হিসাবে নিন্দা করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের দাবি জানায়।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের এই কর্মকৌশলের ঘোষণা সত্ত্বেও জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে অধিকাংশ সদস্যই বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদকেই সমর্থন দেয় এবং এতে নেহরু সরকারকে সাম্রাজ্যবাদীদের জোটভুক্ত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। বি টি. রণদিভের পরিচালনায় নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ কার্যত সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করারই আহ্বান জানান।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের বাম-সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির ফলে সারা দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন এলাকায় পার্টি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সে জনগণের রাজনীতি সচেতন স্তরগুলির অনেকেরই সমর্থন হারিয়েছিল।

দেশের দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি তখন কমিউনিস্টদের উপর নির্বিচার হামলা চালায়। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বাধীন গণসংগঠনগুলি আত্মগোপনে বাধ্য হয়। কোন কোন রাজ্যে (মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন) সরকার পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে এবং শুরু হয় কমিউনিস্ট ও গণসংগঠনগুলির সক্রিয় কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক নির্যাতন। অচিরেই পুলিশ পলিট ব্যুরোর বহু সদস্য, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষান সভার অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। আত্মগোপনের অবস্থায় সংগ্রাম চালনার কঠোর পরিস্থিতিতে পার্টির নিটোল কোষকেন্দ্রটি ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠলেও এতে গণসংগঠনগুলির কার্যকলাপ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল।

শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন

কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে অনুসৃত দমনমূলক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সভা ও ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। কিন্তু এই সময়কার ধর্মঘট আন্দোলনের নিম্নমাত্রা লক্ষণীয়: ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল এবং ৭৮ লক্ষ কার্যদিন বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে হিসাবটি যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার শ্রমিকে এবং ৬৭ লক্ষ কার্যদিনে পৌঁছেছিল। শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের এই মন্দা কেবল শ্রেণীগত ক্লান্তি, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর অবদমন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির জন্যই ঘটে নি, খোদ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যেকার ভাঙ্গনও এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসেই জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয়

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয় এবং এর নেতৃবৃন্দ ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের (শিল্পে শান্তিরক্ষার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আবেদন) প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলের প্রভাবাধীন হিন্দ্ মজদুর সভা ও সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে আরও দুটি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গঠিত হয়। এই শেষোক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে প্রধানত ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

এমন কি, তিনটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যে তখনো ভারতীয় মেহনতিদের বৃহত্তম সংগঠন ছিল ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এর অধিবেশনই তা প্রমাণ করেছিল। এই সময়কার বৃহত্তম ধর্মঘটগুলির মধ্যে কোয়েম্বাটুরের কয়েক মাস স্থায়ী বস্ত্রকল শ্রমিক ধর্মঘট এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের বাবু-কর্মীদের ধর্মঘট উল্লেখ্য। কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও কতকগুলি ধর্মঘট সফল হয়েছিল: সারা বছর চালু কয়েকটি সংস্থায় কার্যদিন হ্রাস সহ কোন কোনটিতে মজুরিবৃদ্ধি ও বর্ধমান দ্রব্যমূল্যের প্রেক্ষিতে মাগ্‌গী ভাতা আদায় করা গিয়েছিল।

১৯৪৮-১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় শ্রম-আইনের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত কয়েকটি আইন ছিল শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামেরই গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি। এগুলি: 'শিল্পবিরোধ আইন' (১৯৪৭), 'ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন' (১৯৪৭), 'কারখানা আইন' (১৯৪৮), 'কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন' (১৯৪৮), 'সর্বনিম্ন মজুরি আইন' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

সরকারীভাবে গৃহীত শ্রম-আইনের বাস্তবায়নই অতঃপর ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কর্মকাণ্ড হয়ে উঠেছিল।

১৯৪৭-১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ছাড়াও তখন দেশের কতকগুলি এলাকায় ভারতীয় কৃষক সমাজের কোন কোন স্তর ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেছিল। রায়ত-চাষীদের নিম্নতম স্তরের নানা দলের মধ্যেই এই ধরনের কার্যকলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা খাজনাহ্রাস, দ্রব্যের বদলে অর্থ দিয়ে খাজনাশোধ, ভূমিস্বত্বের উপর বংশানুক্রমিক অধিকার ইত্যাদি দাবি জানাচ্ছিল। এই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, পঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের ভাগচাষীরা লড়াই শুরু করেছিল। বড় বড় জমিদার ও ধনী কৃষক কর্তৃক জমি থেকে ঘন ঘন প্রজা-উচ্ছেদের ঘটনাগুলিই প্রধানত রায়ত-চাষীদের এই আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক আইনসভায় উপস্থাপিত জমিদারি উচ্ছেদের খসড়া আইনটি দ্রুত প্রবর্তনের দাবিতে রায়ত-চাষীদের ধনী অংশ সহ কৃষকদের ব্যাপক স্তর আন্দোলন শুরু করেছিল। যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি জেলা (বালিয়া), পেপসু ও দেশের দক্ষিণাংশে কৃষকদের উদ্যোগে জমিদারদের জমিদখল শুরু হয়েছিল।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে কৃষক-আন্দোলনপুষ্ট তেলেঙ্গানায় কৃষকদের এই ধরনের কার্যকলাপ তুঙ্গে পৌঁছেছিল। এই প্রদেশের যেসব এলাকায় আন্দোলন সফল হয়েছিল সেখানে কৃষকরা তাদের গঠিত গ্রামপরিষদ বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষিসংস্কার, বড় বড় জমিদারদের জমিজমার পরিমাণ হ্রাস, এভাবে পাওয়া জমি ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে পুনর্বণ্টন চালু করেছিল। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ এভাবে পুনর্বণ্টিত জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১২ লক্ষ একরেরও বেশি।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে এই অভ্যুত্থান দমনের জন্য সরকার হায়দরাবাদে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাঠায়। অতঃপর এই আন্দোলন গেরিলা যুদ্ধের রূপলাভ করে এবং ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগ্রামীদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ১৯৪৯-১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত কৃষিসংস্কারের ফলে অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকদের দাবি মিটে যাওয়ায় এবং পঞ্চায়েতে গরীব কৃষকদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আন্দোলন ত্যাগ করে। গরীব কৃষকদের উপরই শেষে আন্দোলনটি পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায়।

কৃষকদের এই সংগ্রাম বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর সরকারকে কৃষিসংস্কার বিশদকরণ ও এটি দ্রুত বাস্তবায়নে বাধ্য করেছিল। অবশ্য, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পরই কেবল এর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছিল।

নতুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন ও সংবিধান গ্রহণ

উপরোক্ত ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড সমাধানের পূর্বে জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তররোধী এই সংবিধান তৈরিতে যথেষ্ট শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরির সময় যে-দুটি ক্ষেত্রে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয় তা হল: ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যেকার সাংবিধানিক সম্পর্কের ধরন এবং জাতিসমস্যা।

ভারতের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ পুঁজির সুবিধাজনক অবস্থান এবং ব্রিটিশ বাজারের উপর নির্ভরশীল ভারতীয় মালিকদের উৎপাদন — এই দুই কারণে স্বদেশী বুর্জোয়ারা ভারতের কমনওয়েল্থভুক্তির সপক্ষে ছিল। কিন্তু এইসঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষতি এড়িয়ে দেশকে কমনওয়েল্থে রাখার একটি পন্থা উদ্ভাবনে অধিকতর উদ্বিগ্ন ছিলেন।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েল্থ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এই প্রশ্নাবলী আলোচিত হয়েছিল। এতে নির্ধারিত হয়: ভারত,

পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের সদস্য থাকলেও এইসঙ্গে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্রিটিশ সম্রাটের অধীনতামুক্ত থাকবে।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জয়পুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরবর্তী সম্মেলনে একদল প্রতিনিধি কর্তৃক ব্রিটেনের সঙ্গে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের দাবি উত্থাপন সত্ত্বেও ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের লন্ডন কমনওয়েল্‌থ সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ধারা মোতাবেক সরকারকে আলাপ-আলোচনা চালানোর অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত পরবর্তী কমনওয়েল্‌থ সম্মেলনের সূত্রানুসারে সার্বভৌম ভারত প্রজাতন্ত্র ব্রিটিশ সম্রাটকে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ জাতিগুলির প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও সংবিধান-সভা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। (সবিশেষ লক্ষণীয়, মূল সংবিধানে ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের সম্পর্ক অনুল্লেখিত)।

সেই ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে 'মতিলাল নেহরু সংবিধান' অনুসারে প্রস্তাবিত ভাষাভিত্তিক (জাতিসত্তা অনুসারে) প্রদেশ গঠন নিয়ে জয়পুর কংগ্রেসে অনুরূপ উত্তেজিত আলোচনা চলেছিল। ইতিমধ্যে অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরালা ও মহারাষ্ট্র গঠন সমর্থকদের চাপে সংবিধান তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংবিধান-সভা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সমস্যা বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি (ধর কমিশন) গঠন করে। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ কমিশন প্রদত্ত প্রতিবেদনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের শুধু বিরোধিতাই নয়, বহু বৎসরে গড়ে ওঠা প্রশাসনিক এবং আঞ্চলিক বিভাগগুলির যেকোন রদবদলের বিরুদ্ধেও আপত্তি জানান হয়।

ধর কমিশনের প্রতিবেদন বিবেচনা ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনে একটি কমিটি (জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও পট্টভী সিতারামিয়া সহ গঠিত এই কমিটিকে তিন নেতার নামের আদ্যাক্ষরচিহ্নিত জে. বি. পি. কমিটি বলা হত) গঠিত হয়। সাম্প্রতিক দেশবিভাগের পর ভাষাগত জাতিসত্তাগুলির সংহতি শেষাবধি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার উদ্ভব ঘটাবে — এই অজুহাতে জে. বি. পি. কমিটিও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতি প্রত্যাখ্যান করে। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্ভাব্য সীমানা বদলের ফলে একটি দেশ হিসাবে ভারতের ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে কমিটির প্রতিবেদনে ভারতের প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক বিভাগ লঙ্ঘন অবাঞ্ছিত বলে উল্লিখিত হয়।

এভাবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু এসব রাষ্ট্র (কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মহাগুজরাট ইত্যাদি) গঠনের আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার সংহতি ও নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের চেষ্টাপ্রসূত ভারতের এই সংবিধান ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর সংবিধান-সভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।

প্রভূত ক্ষমতাশালী একজন রাষ্ট্রপতির অধীনে ভারত সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। তিনি হন ভারতের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, দেশের প্রধান মন্ত্রী সহ শেষোক্তের সুপারিশ মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীবর্গের এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের স্থানীয় প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্যপালদের নিয়োগকর্তা; তদুপরি পার্লামেণ্টের বিরতিকালে অর্ডিন্যান্স জারি এবং প্রয়োজনমতো জরুরী অবস্থা ঘোষণাও ছিল তাঁরই ক্ষমতাধীন। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও প্রাদেশিক আইনসভায় গৃহীত বিলগুলি ছিল তাঁরই অনুমোদননির্ভর। পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের জন্য যেকোন আইনকে আইনসভায় ফেরত পাঠানোরও তিনি অধিকারী হন।

দেশের সর্বোচ্চ বিধানিক সংস্থা, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট হল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট: লোকসভা ও রাজ্যসভা। লোকসভার মতো পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলি হল রাজ্য বিধানসভা। যাবতীয় নির্বাচন হল সর্বজনীন, প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটদানভিত্তিক। ২১ বছরের অধিক বয়সী সকল ভারতীয় নাগরিকই ভোটদানের ও ২৫ বছরের বেশি বয়সী যেকেউ নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার (রাজ্যসভায় ৩০ বছরের বেশি) অধিকারী হয়।

রাজ্যসভার সদস্যদের রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হওয়ার নিয়ম চালু হয় (বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও জনসেবার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য রাজ্যসভার ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত)।

পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধানসভাগুলির সদস্যদের দ্বারা গঠিত বিশেষ নির্বাচনী এলাকা হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অধিকারী।

সংবিধানে আইন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিতকরণের নীতি নির্ধারিত হয়। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি হল (প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে) কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও রাজ্য পরিষদের কাছে দায়ী।

ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ও রাজ্যের হাইকোর্টগুলি আইন চালু করা, সংবিধানবিরোধী আইন বাতিল করার অধিকার লাভ করে।

সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সুস্পষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত রয়েছে এবং সেজন্য পুরো প্রশাসন ব্যবস্থায় অত্যুচ্চ মাত্রার কেন্দ্রীভবন সহ ফেডারেলবাদের কিছু উপাদানেরও মিশ্রণ ঘটেছে।

তাই সংবিধানে জাতীয় বিপ্লবের জয়লাভ পরবর্তী সাধারণ গণতান্ত্রিক অবস্থার মূল সাফল্যাদি সংহত হয়েছে: এতে রয়েছে নাগরিকদের জন্য বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি এবং জাতি, বর্ণ ও ধর্মগত সর্বপ্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা।

সংবিধানের ৩১ ধারায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতার স্বীকৃতি সহ জনগণের স্বার্থে তা বাজেয়াপ্ত করলে প্রতিটি ক্ষেত্রে খেসারত দেয়ার ব্যবস্থাদি উল্লিখিত হয়েছে।

নতুন সংবিধানে ভারতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রকটিত রয়েছে এবং তা জাতীয় পুঁজিতন্ত্র বিকাশের আইনগত নীতিসমূহ রচনা করেছে।

সংবিধান-সভা কর্তৃক নতুন সংবিধান অনুমোদনের ফলে দেশের ঐতি ভবিতব্যের ক্ষেত্রে একটি মহৎ সন্ধিক্ষণ সূচিত হয়। সংবিধান-সভা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবীণ নেতা ও গান্ধীব সহকর্মী রাজেন্দ্র প্রসাদকে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে এবং জওহরলাল নেহরু ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন।

১৯৫০ খৃীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা দিবসে সংবিধান কার্যকর হয়। অতঃপর জাতীয় ছুটি সহ এই দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে অদ্যাবধি পালিত হচ্ছে।